ঘরের মধ্যে ঘর

শংকর

ঘরের মধ্যে ঘর

শংকর

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র : শ্রী ইন্দ্র দুগার

অন্যান্য অলংকরণ : শ্রী অন্নদা মুন্সী ও
শ্রী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৬৯, এপ্রিল ১৯৬২

মুদ্রক শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

আমার এই ছন্দোহীন মেঘাচ্ছন্ন বিড়ম্বিত জীবনের আর-এক অসংবদ্ধ পরিচ্ছেদ-কাহিনী রচনার পূর্বে সুরূপা প্রমদারূপা দিব্যাভরণভূষিতা দেবী পৃথিবীকে নতমস্তকে স্মরণ করি।

"ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
পৃথিবীমর্চয়ে দেবীং সর্বলোকধরাং ধরাম্॥"

হে উদাসীনা, হে বিচিত্রছলনাময়ী, তুমিই আমার প্রথম প্রণতি গ্রহণ করো।
—ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ!

আমাকে মনে পড়ে কী? সেই কতদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের ছায়ায় ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের আদালতী কর্মক্ষেত্রে এক অপরিণতবুদ্ধি কৃশকায় বালকের সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তারপর বিনা অনুমতিতে সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করে মধুসূদন-দাদারূপী এক বিদেশী ব্যারিস্টারের গল্প শুনিয়ে সে নিজেকে ধন্য করেছিল।* ছলনাময়ী এই পৃথিবীতে সেই তার প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপ।

তারপর আবার দেখা হয়েছিল আলোয়-আলোকিত চৌরঙ্গীর সুবৃহৎ শাজাহান হোটেলে। পরম সুহৃদ স্যাটা বোসের স্নেহপ্রশ্রয়ে নগর কলকাতার আর-এক বিস্ময় তার হৃদয়-ক্যামেরার আলো-আঁধারিতে ধরা পড়েছিল। অনভিজ্ঞ দর্শকের চোখের সামনে বিচিত্র মানব-মানবীর এক অন্তহীন শোভাযাত্রা সেদিন যেন কোনো কল্পলোক থেকে এই পৃথিবীতে অকস্মাৎ নেমে এসেছিল।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, স্যাটাদা-সান্নিধ্যের সেই সামান্য সৌভাগ্যও স্থায়ী হলো না। হোটেলের চাকরি হারিয়ে, মধ্যরাতে জনহীন কলকাতার

রাজপথে নেমে এসে সহায়সম্বলহীন নিরাশ্রয় শংকর আপনাদের শেষ নমস্কার জানিয়েছিল।*

শতাব্দীপ্রাচীন শাজাহান হোটেলের বহুবর্ণ নিয়নআলো তখনও আপন খেয়ালে জ্বলছে আর নিভছে—আর আমি ভাবছি, অতঃ কীম্? আমার না-আছে অর্থ, না-আছে বিদ্যা, না-আছে কোনো পরিচয়। আমার আপনজন নেই, আশ্রয়দাতাও নেই। এবার আমি কি করবো? আমি কোথায় যাবো?

এক সঙ্গে বেকার ও নিরাশ্রয় হয়ে সাময়িকভাবে বোধহয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। সান্ত্বনা ও সাহায্যের আশায় প্রথম ছুটেছিলাম সদানন্দ রোডে এক সচ্ছল আত্মীয়ের বাড়িতে। বাণিজ্যলক্ষ্মী সম্প্রতি আমার এই আত্মীয়ের প্রতি বিশেষ সদয়া হয়েছেন। শাজাহান হোটেলের ছোট ব্যাংকোয়েট রুমে কয়েকবার পার্টি দেবার ব্যাপারে তাঁকে আমি বিশেষ সাহায্য করেছি।

চামড়ার ব্যাগ ও সতরঞ্জিতে-মোড়া বিছানা হাতে তাঁর সুসজ্জিত গৃহে আমাকে প্রবেশ করতে দেখে এই আত্মীয় মনে মনে বিশেষ শঙ্কিত হলেন। শাজাহান হোটেল থেকে আমি বরখাস্ত হয়েছি জেনে তাঁর দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেলো। সিগারেটে সুখটান দিয়ে বরফঠাণ্ডা কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, "এতো ঘন ঘন তোমার চাকরি যায় কেন? অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো, শাজাহান ইজ এ গুড প্লেস।" সিগারেট ফেলে ভদ্রলোক এবার তাঁর নিত্যসঙ্গী চাবির রিংটা ডান হাতের আঙুলে আপন মনে ঘোরাতে লাগলেন।

আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না-করেই শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "নিশ্চয় ওখানকার পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছিলে?" তাঁর পরবর্তী মন্তব্য, "বাঙালীদের ওই এক মহৎ দোষ! মন্দির থেকে শ্মশান পর্যন্ত এভরিহয়্যার শুধু পলিটিক্স আর পলিটিক্স।" মৃদু একটি ঢেকুর তুলে তিনি উপদেশ দিলেন, "ওরে বাবা, জেনে রাখবে, পলিটিক্স থেকে হানড্রেড টাইমস পাওয়ারফুল আর একটা ফোর্স রয়েছে, তার নাম ইকনমিক্স। রাজনীতি উইদাউট অর্থনীতি ইজ লাইক রাইফেল উইদাউট বুলেট!"

আমার স্বল্পপরিসর কর্মজীবনে পলিটিক্সের নামগন্ধ ছিল না। এ-কথা এই সন্দেহপ্রবণ আত্মীয়কে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না।

আমার মনের মধ্যে কয়েকদিনের আশ্রয় প্রার্থনার পরিকল্পনা রয়েছে আঁচ করে এই আত্মীয়মহোদয় দ্রুত এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। বহু-মূল্যবান কাপ-ডিস আমার দিকে অবহেলাভরে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, "এই যে আমার বিজনেস দেখছো, সব আমি নিজের চেষ্টায় করেছি—কোনো আত্মীয়-স্বজন আমার জন্যে কুটোটি পর্যন্ত নাড়েন নি। আমার ইকনমিক্সের একটা মূল নীতি হলো বিজনেসে কোনো আত্মীয়-স্বজনকে না-নেওয়া।"

আমি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। জীবন-সংগ্রামে সম্মানিত এই আত্মীয়টি সদর্পে নিজের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা শুরু করলেন, "এটা হলো বিলিতী স্টাইলের বিজনেস ফিলজফি।"

"সায়েবরা বুঝি ব্যবসায় আত্মীয়-স্বজনদের দেখেন না?" আমি অসহায় ভাবে জানতে চেষ্টা করি। এবিষয়ে আমার কোনোরকম জ্ঞান নেই।

ভদ্রলোক ভারিক্কী চালে উত্তর দিলেন, "একই আপিসে দুই সাহেব ভাই

কাজ করেছে এমন আপিস আছে—কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত গোল্লায় গেছে।"
এই বলে ফিস-ফিস করে দু' একটা বিখ্যাত বিদেশী কোম্পানির নাম শোনালেন। এই সব জাঁদরেল কোম্পানির নাকি এখন ডুবু-ডুবু অবস্থা। শ্রদ্ধেয় আত্মীয় তারপর বললেন, "আমার আদর্শ হলো, শা-ওয়ালেশ কোম্পানি। বড়সায়েব থেকে বেয়ারা পর্যন্ত এক বংশের দুজনের ওখানে স্থান নেই। কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা লিখিত ওই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। রাম না-জন্মাতেই রামায়ণ লেখা একেই বলে, বুঝেছো?"

না-বুঝে কোনো গতি নেই। আর সময় নষ্ট না করে সদানন্দ রোডের আত্মীয় আমাকে দ্রুত বিদায় করলেন, বাড়িতে কয়েকদিন আশ্রয় দেবার কথাও তুলতে দিলেন না। তাঁর শালার সুবৃহৎ ফ্যামিলি নাকি আগামী কাল কলকাতায় বেড়াতে আসছেন।

কালিঘাট ট্রাম ডিপোর কাছেই সনাতন দাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরা থেকে নেমে আমাকে দেখেই সনাতন দাস জিজ্ঞেস করলো, "সায়েব না? কেমন আছেন?"

উড়িষ্যানিবাসী সনাতন এক সময় শাজাহান হোটেলে বেয়ারার চাকরি করতো। যথাসময়ে শাজাহানের চাকরি ছেড়ে দূরদর্শী সনাতন সাহেবপাড়ার এক অফিসারস্ ক্যানটিনে কাজ নিয়েছিল।

সনাতন অনেকদিন আগে হোটেল ছাড়লেও শাজাহানকে একেবারে ভুলতে পারে নি। সনাতন সাগ্রহে আমার কাছে হোটেলের খবরাখবর জানতে চাইলো এবং ওখানকার সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলো।

স্যাটা বোসের জন্যে চোখের জল ফেললো সনাতন। আমার জন্যেও বেচারা বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। কোনো একটা কাজের জন্যে সনাতন কালিঘাট পাড়ায় এসেছিল, কিন্তু সে প্রোগ্রাম পাল্টে ফেললো। একটু ইতস্তত করে বললো, "সায়েব, যদি কিছু মনে না করেন তা হলে একটা কথা বলি। কোথায় এখন থাকবার জায়গা খুঁজবেন, আমার কোয়ার্টারে চলুন।"

সামান্য ক্যানটিন কর্মচারী সনাতন দাসের মহানুভবতায় আমার বাকশক্তি রহিত। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। সনাতন বললো, "এতো কী ভাবছেন সায়েব? আমি যদি আপনার আত্মীয় হতাম, তা হলে কি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন?"

"সনাতন।"

"কী বলছেন সায়েব?" সনাতন সহজভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"তোমার আপিসের নাম শা-ওয়ালেশ নয় তো?"

"মোটেই না। আপিসের নাম ফোর্ডসন ইন্ডিয়া। আপনি ভুলে গেলেন সায়েব, আপনাকে তো নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম।" ঠিকানা লেখা ঝকঝকে কার্ড আমার আত্মীয়ও তো আমাকে দিয়েছিলেন!

সারা জীবন ধরে কত লোক আমাকে তাঁদের নাম ঠিকানা দিয়েছেন।

শিল্পপতি পাকড়াশির সঙ্গে সদানন্দ রোডের আত্মীয়ের প্রথম পরিচয় আমিই করে দিয়েছিলাম। সেই পরিচয় থেকে আমার আত্মীয় বেশ লাভবান হয়েছেন. কিন্তু কে তা মনে রাখে?

ক্যামাক স্ট্রীটের কাছে ফোর্ডসন কোম্পানির আপিসের সামনে সনাতন নিজেই আমার মালপত্তর নামালো। সে এখনও আমাকে সায়েব বলছে। আমি সনাতনকে অনুরোধ করেছি, "আমি এখন তোমার সায়েব নই। এখন তুমি আমার বন্ধু, আশ্রয়দাতা, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকো।"

কিন্তু সনাতন সেসব কথা শুনলো না। বললো, "কেন আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন সায়েব?"

ফোর্ডসন কোম্পানির বিরাট লোহার গেটের সামনে আমরা যখন এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আপিস অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে। আপিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উৎসাহী মেম্বাররাও ক্যারাম ও তাসের পাট চুকিয়ে বিদায় নিয়েছেন। শুধু গেটের কাছে দারোয়ান বসে রয়েছে। ইউনিফর্ম-পরা দারোয়ানের ছুটি নেই—ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী কেবল ডিউটি বদল হয়।

দারোয়ানের অনুমতি ছাড়া অপরিচিত লোকের এই সব আপিসে প্রবেশ নিষেধ। সনাতন একটু এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে চুপি-চুপি কী কথা বলে এলো।

"বাইরের লোককে তোমার ঘরে নিয়ে আসবার অনুমতি আছে তো? আমার জন্যে তুমি না আবার বিপদে পড়ে যাও সনাতন।" আমি একটু ভয়ে-ভয়ে সনাতনকে জিজ্ঞেস করলাম। সনাতনকে যা বলতে পারলাম না, তা হলোঃ এ-সংসারে আমাকে যারাই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তারাই বিপদে পড়ে যায়। আমার জীবনে বার বার তাই ঘটেছে।

আমার মাল-পত্তর নিজেই ঘরের ভিতরে তুলে সনাতন বললো, "অফিসারস্ ক্যানটিনের কুক-বেয়ারার সঙ্গে দারোয়ান কখনও অসদ্ভাব রাখবে না, স্যার! আমার নিজের লোককে ঢুকতে না-দিলে দারোয়ানজীকে ওই খৈনি খেয়েই দিন কাটাতে হবে—পেটে চপ-কাটলেট আর পড়বে না। ফাউল কাটলেট পেলে হনুমান সিং আনন্দে আটখানা হয়ে যায়—অথচ খাতায়-কলমে একেবারে নিরিমিষি বাবা!"

আপিস ক্যানটিন বেশ সাজানো-গোছানো। সারি সারি গোদরেজের স্টীল চেয়ার ও টেবিল। দেওয়ালে কয়েকটি স্নিগ্ধ ছবি টাঙানো। হল্-এর পাশে আধুনিক কিচেন। কিচেনের লাগোয়া ছোট্ট একটা ঘরে সনাতনের বসবাস। সনাতন সেখানেই আমাকে তুললো।

ঘরের মধ্যে কোনোক্রমে একখানা খাটিয়া রাখার জায়গা আছে। দু'জন লোকের এখানে একত্রে আশ্রয় পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সনাতন কিন্তু আমাকে কোনো কথা তুলতে দিলো না। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এইভাবে বললো, "শোবার জায়গার এখানে কোনো অভাব নেই। এতোবড় ক্যানটিন হল-এ গোটা দুয়েক বেড়াল ছাড়া রাত্রে কেউ থাকে না। দু'খানা করে টেবিল জোড়া দিয়ে দিব্যি শুয়ে পড়া যাবে। অনেক পাখা আছে—একেবারে ফাস্ট ক্লাস হোটেলের ব্যবস্থা, সায়েব।"

সব বুঝেও ব্যাপারটা মেনে নিতে হলো। এ ছাড়া এই মুহূর্তে আমার কী উপায় আছে?

কোনো আপিসের নির্ধারিত সময়ের বাইরে ক্যানটিন রুমে এইভাবে

কখনও আশ্রয় নিই নি। বিরাট এই বাড়িটায় এখন লোকজন নেই।

সনাতন বললো, "স্নান সেরে নিন সায়েব। আপনার একটু অসুবিধে হবে, এখানে শাওয়ার নেই শাজাহানের মতো।"

সনাতন ঘর থেকে একটা প্লাসটিক পাইপের টুকরো এনে বেসিনের কলের মুখে লাগিয়ে দিলো। বললো, "এবার কল খুলে দিন। দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ ইচ্ছে শরীর ঠান্ডা করুন। এখানে জলের অভাব নেই।"

প্লাসটিক টিউবটা সাবধানে ধরে অনেকক্ষণ মাথায় জল ঢাললুম। ঠান্ডা জলের ধারা শ্রান্ত শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়ে দেহ-মন স্নিগ্ধ করে তুললো। স্নানটা আমার প্রয়োজন ছিল। নতুন এক পরিতৃপ্তির অনুভূতি দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত আশ্রয় খুঁজে পাবার এই আনন্দ একমাত্র তিনিই বুঝতে পারবেন যিনি কোনোদিন আমার মতো নিরাশ্রয় হয়েছেন।

ভিজে-গামছায় শরীর মুছে শান্তভাবে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি ইতিমধ্যেই যেন আমার অতীতকে বহু দূরে ফেলে এসেছি। সনাতনের এই আশ্রয়েই যেন আমি আজন্ম বসবাস করছি।

সনাতন ইতিমধ্যে আমার জন্যে চা বানিয়ে ফেলেছে।

"তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন?" সনাতনের আতিথেয়তায় আমি রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করলাম।

সহজভাবে সনাতন বললো, "কষ্ট কি সায়েব! চা করবার জন্যেই তো আমার জন্ম! এই আপিসের চারশ' জন লোকের জন্যে প্রতিদিন আটশ' কাপ চা এখানেই তৈরি হয়। তাছাড়া সায়েবদের জন্য কফি আছে। বাবুদের চায়ের টাইম বাঁধা—সকাল সাড়ে-ন'টা থেকে সাড়ে-দশটা আর বিকেল আড়াইটে থেকে তিনটে। কিন্তু কফির কোনো টাইম নেই—সায়েবরা টেলিফোনে হুকুম করলেই কফি বানাতে হবে। চা-কফি তৈরি করতে আমার কোনো কষ্টই হয় না, সায়েব। বরং ছুটির দিনগুলোতে অস্বস্তি লাগে। একদিন সকালে তো ভুল করে চায়ের জল ফুটিয়ে ফেলেছিলাম—তারপর খেয়াল হলো, রবিবার।"

সনাতন বললো, "আপনার নিজের জায়গা মনে করে, এখানে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করুন। আজ শুক্রবার—সুতরাং কাল পরশুও আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, আপিস বন্ধ থাকবে। হপ্তায় দু'দিন আপিস বন্ধ, এ এক মস্ত সুবিধে।"

আমার এঁটো কাপটা সরিয়ে নিতে নিতে সনাতন বললো. "আপনার মনে আছে সায়েব, শাজাহান হোটেলে আমাদের ছুটির বালাই ছিল না? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ কাজ আর কাজ। নাম-কা-ওয়াস্তে একটা অফ্-ডে দেখানো থাকতো, কিন্তু ছুটি পাওয়া যেতো না।"

একগাল হেসে সনাতন আবার বললো, "আপনাদের আশীর্বাদে আমার একটা হিল্লে হয়ে গিয়েছে। ক্যান্টিনের বেয়ারা বটে, কিন্তু মাইনে পাই ছ'শ টাকা। তিন মাসের বোনাস আছে পুজোর সময়। তা ছাড়া 'পার্মেণ্ট' ফান্ডে মাসে-মাসে টাকা কাটে। এ-এক ভারি মজার জিনিস সায়েব. মাইনে থেকে যত টাকা কাটে তার ডবল জমা পড়ে। মাসে মাসে সুদসমেত এই টাকা বাড়তে-বাড়তে শেষ পর্যন্ত যে কত হয়ে যাবে হিসেব করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়! শাজাহান হোটেলে যে প্রভিডেণ্ট ফান্ড ছিল না তা সনাতনের কথায় মনে পড়ে গেলো।

নিজের সংসারের খবরাখবর দিলো সনাতন। ছেলেকে গ্রামের ইস্কুলে পড়াচ্ছে। ইচ্ছে আছে, ওকে কলেজে পাঠাবে।

সনাতন বললো, "আপনি বসুন সায়েব, আমি একটু ফ্লিটের ব্যবস্থা করি—না হলে মশার জ্বালায় রাত্রে আপনার শোবার কষ্ট হবে।"

দারোয়ানের কাছ থেকে ডি-ডি-টির টিন ও স্প্রে-গান নিয়ে সনাতন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিলো। রাত্রে শোবার আগে সে বললো, "আমার মশারিটা বড় নোংরা, তাই আপনাকে দিতে পারলাম না, সায়েব। আপনার খুব কষ্ট হবে।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এবার আমার চোখ সজল হয়ে উঠছে। কিন্তু আমি সনাতনের সামনে ধরা পড়তে চাই না। ভিজে গলায় কোনোরকমে বললাম, "সনাতন, তোমাকে আমি অনেক অসুবিধেয় ফেলেছি। তুমি শুধু-শুধু আমার জন্যে কেন এতো কষ্টে পড়তে গেলে?"

"এসব কী বলছেন, সায়েব? এই চাকরি, এই কোয়ার্টার, এ সবই তো আপনার জন্যে।"

সনাতনের কথা শুনে আমি তো তাজ্জব। সনাতন বললো, "আপনি ভুলে গেলেন সায়েব? এই চাকরির দরখাস্ত তো আপনিই টাইপ করে দিয়েছিলেন। অত ভালো করে আপনি না লিখে দিলে আমার কিছুই হতো না।"

দেখছি এ সংসার তা হলে এখনও মরভূমি হয় নি। সনাতনের মতো মানুষেরা আজও বেঁচে আছে।

সনাতন আমার মুখের অবস্থা লক্ষ্য করলো না। সে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলো।

অপরিচিত অনিশ্চিত এই পরিবেশে সমস্ত রাতই জেগে কাটাতে হবে এমন একটা আশংকা ছিল। অন্ধকারের আড়ালে দুশ্চিন্তার বিষাক্ত পোকাগুলো নানাদিক থেকে সদলে আমাকে আক্রমণ করবে ভেবেছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ কী? কেমন করে এবার দিন কাটবে? হতভাগ্য এই দেশে কত অসহায় মানুষ তো চাকরির সন্ধানে চঞ্চল হয়ে রয়েছে। তাদের ক'জনেরই বা শেষ পর্যন্ত কিছু জুটছে?

এই সব দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে সমস্ত রাতই বিনিদ্র বিছানায় কেটে যাবে—শরীর ও মন আরও দুর্বল হওয়া ছাড়া তাতে অন্য কোনো ফল হবে না। সর্বক্লেশহর নিদ্রা এমন অবস্থায় আমাকে সাময়িক শান্তির দেশে নিয়ে গেলো। চরম দুঃখের মধ্যেও নিদ্রা দেবী আমাকে পরিত্যাগ করেন নি; অশান্তির অগ্নিদগ্ধ আমার ওপর তিনি অকাতর করুণা বর্ষণ করলেন।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন ঘড়ির ছোট কাঁটা সাতটা পেরিয়েছে। প্রতি দিনের মতো সনাতন ইতিমধ্যেই দাড়ি কামানো ও স্নান শেষ করে ফেলেছে। আমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখেই কাছে এলো। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। তারপর ওর দন্তরক্ষণ চূর্ণের প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "চায়ের জল গ্যাসের উনুনে গরম হয়ে

আছে। আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।"

পুরনো আপিসের বেকার বাবুকে এই ভোরবেলাতেও সনাতন যেভাবে আদর-যত্ন করছে তা আমার কাছে অকল্পনীয়। জন্ম-জন্ম ধরে সনাতনের সেবা করলেও এই ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না।

দারোয়ানের জিম্মা থেকে সনাতন একখানা ইংরিজী খবরের কাগজ এনে দিলো। আপিসের কাগজগুলো সকালবেলায় গেটের কাছে পাহাড় হয়ে থাকে। সংবাদপত্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর ছেড়ে প্রথমেই কর্মখালির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

সনাতনের অনেক আশা আমার ওপর। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে যা বললো তার অর্থ এই রকম ঃ আমার কলমে জাদু আছে। তার এক খোঁচাতেই এই ফোর্ডসন কোম্পানিতে সনাতনের চাকরি জুটে গিয়েছিল। সেই একই কলমে নিজের জন্যে দরখাস্ত ছাড়লে মোটা-মাইনের চাকরি হতে কতক্ষণ?

আমি সনাতনের নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকালাম। আমার জন্যে সত্যই তার একটুও চিন্তা হচ্ছে না। স্যাটা বোসবাবুর চেলাদের কখনও ভগবান যে কষ্ট দিতে পারেন না, এ-বিষয়ে সনাতন নিঃসন্দেহ। সনাতন এখনও বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে যারা মানুষকে ভালবাসে, ভাল কাজ করে, যারা অপরের কোনো ক্ষতি করে না, ঈশ্বর তাদের অঢেল সুখশান্তি দেন—যত দুঃখ-কষ্ট এবং শাস্তি তোলা আছে পাপীদের জন্যে।

সংসারের নিষ্করুণ পথে-পথে অনেকদিন ঘুরে-ঘুরে নিয়মের এই রাজত্ব সম্পর্কে আমি বোধহয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। পাপ-পুণ্যে নির্ভরশীল সনাতনের সরল মুখের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে তাকে হিংসে করতে ইচ্ছে হলো—নিরাশার ধূসর মেঘ যখন সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, বিশ্বাসের ক্ষীণ প্রদীপশিখাও তখন অনেককে সাফল্যের নির্ভয় পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

সনাতন আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা বুঝতে পারলো না। সে আচমকা ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলো, "সায়েব আমার মন বলছে, আপনি একদিন মস্ত বড় লোক হবেন।"

কী প্রলাপ বকছে সনাতন! যার একটা চাকরি নেই, সামান্য মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, অথচ অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, তার মধ্যে বিরাট কারুর ছায়া কি করে দেখছে?

আর সময় নষ্ট না করে জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চষে ফেলার জন্যে আমি ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সনাতন আমাকে ভাগ্যশাস্ত্রের গোপন তথ্য সরবরাহ করেছে। দারোয়ান মিশিরজীর কাছে সে শিখেছে, যাদের কপাল উঁচু শনিবারটা তাদের পক্ষে বিশেষ শুভ ফলদায়ক। বড় বড় সৌভাগ্যের সূচনা নাকি ওই বিশেষ বারেই হয়ে থাকে। আজ যখন শনিবার তখন আর সঙ্কোচের মানে হয় না—কলকাতার কোনো এক প্রশস্ত রাজপথে সৌভাগ্যের কমলাসনা লক্ষ্মী আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

কলকাতার কয়েকটা জানাশোনা আপিসে ঢুঁ মারলাম। অ্যাপ্লিকেশন হাতে নিয়ে চাকরি জোগাড় করবার দিন অভাগা এই জন্মভূমি থেকে যে অনেকদিন বিদায় হয়েছে তা জেনেও পরিচিত কয়েকজনের দরজায়

ধরনা দিলাম। সনাতনের ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করেছে।

কপাল উঁচু হলেও ফলাফল মোটেই ভাল হলো না। বেশীরভাগ আপিসেই আজকাল দরজার কাছে নো-ভেকান্সি নোটিশবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে। এক সময় অনায়াসে এই সব আপিসের ভিতরে ঢুকে খোঁজখবর করা যেতো। কোনো কোনো জায়গায় এক-আধজন সহৃদয় মানুষেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেতো। কিন্তু আজকাল সে-পথ বন্ধ। চাকরি-সন্ধানীকে দেখলে দারোয়ান, লিফটম্যান, বেয়ারা থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সবাই বিরক্ত হয়।

বড় বড় দু'একটা আপিসে ঢুকে মনের মধ্যে বিস্ময় জেগে ওঠে। বিরাট হল্‌ঘরে ঝলমলে টিউবল্যাম্প ও ফ্যানের তলায় এই যে শত শত মানুষ কাজ করছে, এরা কীভাবে চাকরি জোগাড় করলো? অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সঙ্গে নিয়ে এরা নিশ্চয় জন্মগ্রহণ করে নি।

মাঝারি-সাইজের এক আপিসে ইউনিয়নের কর্মকর্তার সঙ্গে চেনা-জানা ছিল। দারোয়ানের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক কষ্টে আপিসের ক্যানটিন রুমে চা-পানরত অবস্থায় তাঁকে পাকড়াও করলাম। গণেশদা একসময় আমাদের ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন।

আমাকে দেখেই গণেশদা চিনতে পারলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পারিবারিক খোঁজখবর নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় আছিস?"

কীভাবে কলকাতায় মাথাগুঁজে আছি তা লজ্জায় গণেশদাকে বলতে পারলাম না। "এই আছি আর কী," কোনোরকমে ঢোঁক গিললাম। কিন্তু তাতে গণেশদার কৌতূহল নিবৃত্তি হলো না। অগত্যা বললাম, "এক ফ্রেন্ডের কাছে আপাতত আছি।" ক্যানটিনের কথা বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে বেরুলো না।

চাকরি নেই শুনেই গণেশদা আঁতকে উঠলেন। বললেন, "চাকরি থাকলে ইউনিয়ন থেকে চাপ-টাপ দিয়ে আমরা মাইনে বাড়াতে পারি, সুযোগ-সুবিধে কম থাকলে সে-সবের ব্যবস্থাও করতে পারি। কিন্তু চাকরি না-থাকলে আমাদের তো কিছুই করবার নেই, ব্রাদার। মাথা থাকলে তবে তো টেরিবাগানো।"

গণেশদা সান্ত্বনা দিলেন, "দুঃখ করিস না—বেকারদের ট্রেড ইউনিয়ন রাইট এদেশেও হবে একদিন।"

গণেশদাকে খুব শক্তিমান বলে মনে হলো আমার। ওঁর হাত চেপে ধরে আবেদন করলাম, "একটা কিছু করে দিন, গণেশদা। সারাজীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।"

গণেশদা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "একজোড়া হাত থেকেও আমরা নুলো হয়ে আছি, ভাই। এতোগুলো আপিসে ট্রেড ইউনিয়ন করি, কিন্তু একটা আপিসেও চাকরি করে দেবার ক্ষমতা নেই আমার।" গণেশদা তারপর ভিতরের খবর দিলেন, "চাকরি কোথায়? ক্লাইভ স্ট্রীট পাড়ায় যত আপিস তার বেশীর ভাগ হয় অসুস্থ না-হয় মৃত। কী যে হলো এদেশের! কোথাও শুনি না যে কল-কারখানা ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ছে।"

গণেশদা যা বলছেন তা হয়তো সত্য, কিন্তু ওসব বিশ্বাস করে বসে থাকলে আমার তো চলবে না। কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য ধুঁকুক, ভিরমী খাক, কিন্তু আমাকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

সহৃদয় গণেশদা আমার জন্যে আন্তরিক দুঃখ বোধ করলেন। ইস্কুলের

পুরনো দিনের কথা তুললেন। বললেন, "তুই তো ভাল ছাত্র ছিলি। আমাদের তো আশা ছিল তুই একটা কেষ্ট-বিষ্টু হবি।"

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। চরম অধঃপতনের মুহূর্তে পুরনো দিনের সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার কথা মনকে আরও ভারাক্রান্ত করে তোলে।

গণেশদা এবার আমাকে নিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, "হাঁড়িতে জল চড়িয়ে চাকরি খোঁজার দিন বেঙ্গল থেকে অনেকদিন চলে গিয়েছে। এখন ধৈর্যের প্রয়োজন।"

একটা কিছু করে দেবার জন্যে আর একবার গণেশদার কাছে কাতর আবেদন করলাম। "এর পর আমি অনেক ধৈর্য দেখাবো, গণেশদা।"

গণেশদা বললেন, "চল তোকে রাধেশ্যাম দুবেজীর কাছে নিয়ে যাই। মস্ত কোম্পানির মুকুটহীন লিডার। আমার সঙ্গে অনেক কাজকর্ম করেছেন --কয়েকবার রাধেশ্যামজীর উপকারও করেছি।"

কোম্পানির নাম বললেন গণেশদা। নাম শুনেই আমার জিভ দিয়ে জল পড়ার মতো অবস্থা। গণেশদা জিজ্ঞেস করলেন, "এনি জব তো ?"

আমি বললাম, "যে কোনো চাকরি।"

"বেয়ারার চাকরি ?" গণেশদা বুঝি এবার আমাকে বাজিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন।

"একটুও আপত্তি নেই, গণেশদা। ওই আপিসের বেয়ারাদের মাইনে অনেক আপিসের বাবুদের ডবল।"

গণেশদার প্রশ্নমালা এখনও শেষ হয় নি। বললেন, "যদি হোয়াইট কলার না-হয়ে ব্লু-কলার হয় ?"

ঘাবড়ে গিয়ে এবার আমি গণেশদার ঘাড়ের দিকে তাকালাম। ওঁর গলায় শাদা অথবা নীল কোনো কলার নেই—নরম সিল্কের পাঞ্জাবি পরে আছেন গণেশদা। হোয়াইট-কলার কথাটা এক-আধবার শুনেছি—যার অর্থ বোধহয় ফর্সা জামাকাপড় পরে আপিসের কাজ। খাকি রংয়ের কথাও শুনেছি—যার অর্থ হলো পুলিশ অথবা মিলিটারি। কিন্তু কাদের কলারের রং নীল আমার জানা নেই।

"কিরে উত্তর দিচ্ছিস না কেন ? ব্লু-কলার কাজ পছন্দ নয় বুঝি ?" গণেশদা এবার একটু অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞেস করলেন। "এদেশের সবাই যদি আপিসে বসে বাবুগিরি করতে চায় তা হলে প্রোডাকশন হবে কী করে ? ব্লু-কলারের ওপরেই তো দেশের ভবিষ্যৎ।"

এবার মানে বুঝতে পারলাম। কায়িক পরিশ্রমের কাজে আমার আগ্রহ আছে কিনা, গণেশদা জানতে চাইছেন।

আমার কোনো আপত্তি নেই। সাদা কালো হলদে লাল নীল যে-কোনো রংয়ের একটা কাজ পেলেই আমি গণেশদার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

গণেশদা বললেন, "রাধেশ্যাম দুবেজীর কথায় কোম্পানির মালিকরা ওঠে-বসে। ওঁর হাতে সব সময় চাকরি থাকে।"

এবার আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। ঘাম মুছতে গিয়ে সাবধানে নিজের কপালটা টিপলাম। শরীরের এই অংশটা সত্যিই উঁচু বুঝে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

গণেশদার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কালো ছিপছিপে চেহারা—এক সময় স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। ইস্কুলে গণেশদা স্বামীজীর রচনা

ও বাণী থেকে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। ম্যাগাজিনে দু' একটা বিবেকানন্দ সংক্রান্ত প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

গণেশদা বললেন, "বিবেকানন্দ ইস্কুলে পড়ে এই এক মহা মুশকিলে পড়া গিয়েছে। কোনো লাভ হলো না, অথচ সারাজীবন হ্যান্ডিক্যাপড্ হয়ে থাকতে হবে। ঘুষ-টুষ নিতে কেমন একটা অস্বস্তি লাগে।"

গণেশদার কথা আমি মন দিয়ে অথচ নীরবে শুনে যাচ্ছি। গণেশদা বললেন, "এই জন্যে আমার কিছু হলো না। কিন্তু আমাদের লাইনের কেউ-কেউ মোটর গাড়ি ছাড়া নড়ে না, দামী সিগারেট ছাড়া খায় না। বউ অথবা আত্মীয়-স্বজনের নামে কলকাতায় দু'একখানা বাড়ি আমার জানাশোনা অনেকেই করেছে।"

গণেশদা এসব কথা কেন তুলছেন এবার বুঝতে পারলাম। এর পরেই বললেন, "রাধেশ্যাম দুবে আমার চেনা-জানা বটে। কিন্তু একেবারে খালি হাতে কিছু করবার পাত্র নয়। শুনেছি, ওর ওখানে চাকরি বিক্রি হয়।"

কলকাতা শহরে বাঘের দুধ বিক্রি হয় জানতাম, কিন্তু চাকরিও যে বিক্রির সামগ্রী তা আমার জানা ছিল না।

পরিপুষ্ট শরীরখানা সিল্কের পাঞ্জাবি ও দুধসাদা পাজামাতে আবৃত করে রাধেশ্যাম দুবে আপিস ঘরে বসে ছিলেন। গণেশদাকে দেখে ভদ্রলোক খুবই খাতির করলেন। দু'চারটে কথাবার্তার পর রাধেশ্যামজী জানালেন, ফাইট করবার জন্যেই তাঁর জন্ম—মালিকদের নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি একাই লড়াই করে যাচ্ছেন। কোম্পানির অনেক টাকা আছে, বড় বড় ওকালতী মাথা কেনা আছে। রাধেশ্যামজীর কিছুই নেই, তবু সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাধেশ্যামজীকে নিয়ে গণেশদা আপিস থেকে বেরিয়ে এলেন। মিশন রোয়ের কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে বসিয়ে ফিস ফিস করে জানতে চাইলেন কোনো চাকরি খালি আছে কিনা।

দু'জনের মধ্যে একান্তে কিছু কথা হলো। তারপর রাধেশ্যামজী হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন।

আমি অন্য এক টেবিলে বসে দূর থেকে ওঁদের দুজনকে লক্ষ্য করছি। গণেশদা এবার আমার কাছে এসে নিচু গলায় জানালেন, "রাধেশ্যামজীর এই আপিসে কোনো লোক রিটায়ার করলে তার পরিবারের কাউকে চাকরিতে নেওয়া হয়। অনেক ফাইট করে ইউনিয়ন এই সুবিধে আদায় করেছে।"

এ তো ভাল ব্যবস্থা, এর বিরুদ্ধে কার কী বলবার থাকতে পারে? গণেশদা বললেন, "পুরনো আপিস, প্রায়ই কেউ না কেউ রিটায়ার হচ্ছে। তার ফলেই রাধেশ্যাম অনেক টাকা বানাচ্ছেন। বহু লোক ওঁর থ্রু দিয়ে চাকরি বিক্রি করছে।"

ব্যাপারটা এখনোও আমার মাথায় ঢুকছে না। গণেশদা বকুনি লাগালেন, "সোজা ব্যাপার বুঝতে এতো দেরি হলে চলবে কেন?"

"রামচন্দ্র রায় রিটায়ার করছেন। তিনি হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে চাকরিটা বিক্রি করলেন। তাকে আপিসে নিয়ে এসে বললেন, ইনিই আমার ছেলে অথবা ভাইপো হরেন্দ্রনাথ রায়। রাধেশ্যামবাবু ফর্মে লিখে দিলেন, আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করছি—দি ফ্যামিলি ইজ পার্সোনালি নোন টু মি ফর এ লং টাইম। এর পর হরেন্দ্রনাথ রায় এক বছর চাকরি করে পার্মানেণ্ট হলো। তারপর ঝট করে আদালতে গিয়ে এক এফিডেভিট করো এবং চোঁতা কোনো

কাগজে বিজ্ঞাপন দাও ঃ 'আমি হরেন্দ্রনাথ রায়, পিতা রামচন্দ্র রায়, এখন হইতে হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামে পরিচিত হইব।' দুবেজীই সব ব্যবস্থা করে দেবেন—তুমি তোমার পুরনো নাম ফিরে পেলে ; কেউ কিছু করতে পারলো না।"

আমি এই ধরনের ব্যবসার কথা জানতাম না। গণেশদা বকুনি লাগালেন, "হাঁদা গঙ্গারামের মতো তাকিয়ে দেখছিস কী? চাকরির জন্যে কত লোক বাপের নাম পাল্টে দিচ্ছে। অমুক-অমুক রাজ্যের কর্মচারী হলে তো কথাই নেই—হুদো হুদো লোক চাকরির প্রয়োজনে বয়স ভাঁড়াচ্ছে, সার্টিফিকেট জাল করছে আর অন্য লোককে বাপ বলছে।"

আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছি। গণেশদা বললেন, "এখন কয়েক শ' টাকা দিয়ে দেওয়া যাবে। আমি রাধেশ্যামকে বলেছি, বাকি টাকা প্রথম ছ'মাসের মাইনে থেকে কিস্তিতে দেওয়া হবে। রাধেশ্যাম আমার চেনা পার্টি, অনেক উপকার করেছি আমি—এক্ষেত্রে পঁচিশ পার্সেণ্ট ডিসকাউণ্টে কাজ করবে, যদিও ব্ল্যাক-মার্কেটে চাকরির দাম বেড়েই চলেছে। দশ হাজার টাকা ফেললেও আজকাল চাকরি পাওয়া যায় না।"

মিনিট দশেক পরে রাধেশ্যামজী ফিরে এলেন। মুখে তাঁর একগাল হাসি। আমাদের টেবিলে এসে বললেন, "ইউ আর ভেরি ল্যাকি। আর একদিন দেরি হলে কিছু করা যেতো না। ড্রাইভার যদুনিধি সামন্ত রিটায়ার করছে। যদুনিধির হোম টাউন দেখানো আছে পূর্ণিয়া। ভালই হয়েছে, কলকাতার কোনো ঠিকানা থাকলে এনকোয়ারির রিস্ক থাকতো। যদুনিধির ছেলে নেই, মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে—শুধু-শুধু চাকরিটা হাতছাড়া করবে কেন?"

আমার মুখ দিয়ে এখনও কোনো কথা বেরুচ্ছে না।

রাধেশ্যামজী বললেন, "ওনলি ফর ইউ গণেশবাবু—আজ এ স্পেশাল কেস সাড়ে-তিন হাজার টাকায় চাকরিটা ট্রান্সফার করিয়ে দেবো।"

"কোনো গোলমালে পড়ে যাবে না তো?" চিন্তিত গণেশদা জিজ্ঞেস করলেন।

"দু তিন শ লোক এইভাবে চাকরি করছে—আজ পর্যন্ত কারও কোনো অসুবিধে হয় নি। সবাই সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে।"

রাধেশ্যামজী এবার আমার দিকে তাকালেন। মুচকি হেসে আমাকেও ভরসা দিলেন। বললেন, "খুবই ইজি বেপার। শুধু মনে রাখতে হোবে আজ থেকে আপনার টাইটেল সামন্ত। আর আপনার বাপের নাম—যদুনিধি সামন্ত অফ পূর্ণিয়া।"

আমার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে গণেশদাও একটু উদ্বিগ্ন হলেন। রাধেশ্যামজীকে বললেন, "বাবার নাম-টাম চেঞ্জ করা!"

ফিক করে হেসে রাধেশ্যামজী বললেন, "ওসব মাইনর ব্যাপার ছাড়ুন। বাংলাতেই তো বোলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

এবার একটা ফর্ম আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে রাধেশ্যামজী ঝটাঝট নির্দেশ দিলেন, "বোঝাই করে ফেলুন। দেখবেন, বাপের নাম ভুল না হয়!" এবার নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন রাধেশ্যাম দুবেজী।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাধেশ্যামজী বললেন, "গণেশবাবু, ফর্মটা ততক্ষণ লেখা হোক। আমি যদুপতি সামন্তকে ধরে নিয়ে এসে বাপের সঙ্গে ছেলের

আলাপ করিয়ে দিই।”

চাকরির অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে প্রথমেই নিজের নাম বসাতে হয়। তার পরের লাইনেই লেখা—ফাদারস নেম।

সেই শূন্য স্থানটার দিকে তাকিয়েই আমার পরলোকগত পিতৃদেবের মুখটা মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে দপ করে জ্বলে উঠলো। আমার বাবার নাম হরিপদ। বাবার হাত ধরে আমি ছোটবেলায় ইস্কুলে যেতাম। নিজের অকাল বিয়োগের সম্ভাবনা আশঙ্কা করেই দূরদর্শী বাবা বোধহয় আমাকে একবার বলেছিলেন, “পৃথিবীতে আমাদের সকলকে একা থাকবার অভ্যাস করতে হবে। কারুর বাবা-মা চিরদিন বেঁচে থাকেন না। এই যে আমি কেমন একলা কাজকর্ম করছি। আমারও তো বাবা-মা ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা নেই।”

চেয়ার থেকে আমি তড়াং করে উঠে পড়লাম। গণেশদা নিজেও আমার ব্যবহারে তাজ্জব। ব্যস্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কী হলো?”

“চাকরির জন্যে টাকা খরচ করতে রাজী আছি, গণেশদা। কিন্তু বাবার নাম বদলাতে পারবো না।”

অভিজ্ঞ রাধেশ্যামজী বিরক্তভাবে মন্তব্য করলেন, “কোত্থেকে একে পাকড়াও করলেন, গণেশবাবু? রীতিমত সেণ্টিমেণ্টাল ইয়ংম্যান।”

“আপনার কাছে বাবার নামটা সামান্য ব্যাপার মনে হচ্ছে?” আমি বিরক্তভাবে দুবেজীকে জিজ্ঞেস করলাম।

“অতি সামান্য ব্যাপার—খাতায় কলমে আপনার বাবার নাম কি লেখা থাকলো তাতে কি এসে যায়?”

রাধেশ্যামজীর কথায় আমি শান্ত হতে পারলাম না। উত্তেজনায় আমার মাথাটা আরও গরম্ হয়ে উঠছে।

ফর্মটা সই না-করে, কাউকে আর কিছু না-বলে, আমি এবার মিশন রোয়ের রাজপথে নেমে এলাম।

“পরে এর জন্যে আফসোস করতে হবে।” আমার সম্পর্কে রাধেশ্যামজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী কানে এসে তীরের মতো বিঁধলো ; কিন্তু তবু আমি পিছন ফিরে তাকালাম না।

মিশন রো ধরে পশ্চিম দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে পড়লাম। ম্যানটনের বন্দুকের দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আপিসপাড়ার অন্তহীন জনপ্রবাহ দেখলাম। তারপর নিজের খেয়ালে র‍্যানকেন কোম্পানির সুটের দোকানের সামনে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। এবার রাস্তা পেরিয়ে, রাজভবনকে বাঁ পাশে রেখে চললাম হেস্টিংস স্ট্রীটের দিকে।

এই হেস্টিংস স্ট্রীট এবং ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের আইনপাড়ায় একদিন আমার অনেক পরিচিত লোকজন ছিলেন। ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েবের বাবুর সঙ্গে কিছু লোকের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আজ কী তাঁরা

বেকার শংকরকে চিনতে পারবেন?

উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে বটুবাবুর দোকানের সামনে হাজির হলাম। দেখলাম, ছোট্ট টিনের সাইনবোর্ডটা রংচটা অবস্থায় এখনো টাঙানো রয়েছে—'এখানে টাইপ করা হয় : টাইপিং ডান হিয়ার ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলী।'

জরাজীর্ণ এক বাড়ির ছোট বারান্দার কোণে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বটুবাবু এবং এক চানা-মুড়িওয়ালা শান্তভাবে সহ-অবস্থান করছেন।

বটকৃষ্ণ বটব্যাল আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। মোটা কাঁচের চশমার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ বটকৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বারওয়েল সায়েবের বাবু না? অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে ব্রাদার?"

কথার মধ্যে বটুবাবুর দশ আঙুল কিন্তু স্তব্ধ হচ্ছে না—টাইপরাইটার কী-বোর্ডের ওপর অভিজ্ঞ আঙুলগুলো ক্যাবারে নর্তকীর মতো ফুল ফোর্সে নেচে চলেছে।

দেখলাম, বটুবাবুর দপ্তরের কিছুই পরিবর্তন হয় নি। সেই আদিকালের আন্ডারউড টাইপরাইটার। বটুবাবু একবার হাতে-লেখা কপির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "মরা-হাতি লাখ টাকা—আন্ডারউড ইজ আন্ডারউড। এ-রকম জান কোনো মেশিনের পাবে না। আলিপুর চিড়িয়াখানার বুড়ো কচ্ছপ এবং এই মেশিন একই সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল—এখনও সমান তেজে লড়ে যাচ্ছে। সেঞ্চুরি না করে ছাড়বে না।"

বটুবাবু আমাকে আদর করে বসালেন। হাজার হোক পুরনো খদ্দের—এক সময় অনেক কাজকর্ম দিয়েছি।

বটুবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার বাংলা মেশিনটা কি হলো?"

ওঁর মুখে অন্ধকার নেমে এলো। মেশিন চালানো বন্ধ না রেখেই বললেন, "জানো না তুমি?"

বটুবাবুর ছেলে নেই। একটি মেয়ে খুব আদরের। এ-পাড়ার একটি মনোমতো টাইপিস্ট ছেলেকে জামাই করেছিলেন। বিয়েতে নগদ টাকা যৌতুক না দিয়ে বটুবাবু জামাইকে একখানা বাংলা মেশিন ও একখানা হাল মডেলের রেমিংটন মেশিন কিনে দিয়েছিলেন। বটুবাবুর ইচ্ছে ছিল জামাইয়ের সহযোগিতায় এই টাইপিং-এর ব্যবসা অনেক বাড়িয়ে যাবেন।

প্রশ্ন করেই কৃশকায় বটুবাবু কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন। উত্তরের জন্যে তাঁর একটুও ব্যস্ততা নেই।

প্রিয় আন্ডারউড মেশিনের রোলারের মধ্যে খান-পাঁচেক কাগজ এবং কার্বন পেপার ঢোকাতে ঢোকাতে বৃদ্ধ বটকৃষ্ণ বটব্যাল একবার আমার দিকে তাকালেন। "বাংলা মেশিনটা বেচে দিয়েছি। যার জন্যে মেশিন সেই যখন পালালো।"

"আপনার জামাই? কোথায় পালালো?" আমি জানতে চাই।

রহস্যজনকভাবে হেসে বটকৃষ্ণ শিরা ফোলা শীর্ণ হাতটা তুলে আকাশের দিকে নির্দেশ করলেন। "আর কোথায় পালাবে? কোনোদিন খদ্দেরকে ঠকালাম না, একটা পয়সা বাড়তি চার্জ করলাম না, বাইশ লাইনের জায়গায় আঠারো লাইনে পাতা ভর্তি করলাম না, তবু ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিলেন—আমার একমাত্র মেয়ে থান-কাপড় পরে আমার ঘরে ফিরে এসেছে।"

কাজ থামিয়ে বটুবাবু এবার রেমিংটন রিবনের পুরনো কৌটো থেকে

একটা বিড়ি বার করলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আগে যখন এপাড়ায় ছিলে তখন তো বিড়ি সিগ্রেট চলতো না। এখন হাতেখড়ি হয়েছে নাকি?"

নিজের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা নেই যার তার আবার বিড়ি-সিগ্রেট! আমার রেড সিগন্যাল পেয়ে বটুবাবু নিজের বিড়ি ধরালেন।

বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে আধাবিকল স্টেটবাসের মতো একসঙ্গে অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বটুবাবু মোটা চশমার মধ্য দিয়ে আমার কথা শুনলেন।

"তোমার চাকরি নেই?" জিজ্ঞেস করলেন বটুবাবু। "কোথায় তুমি মস্ত কী এক হয়েছো যেন শুনেছিলাম।"

"চাকরির ভাগ্য সকলের সমান নয়, বটুদা। মস্ত এক হোটেলে ছোট্ট এক চাকরিতে ছিলাম; কিন্তু তাও কপালে সহ্য হলো না।"

ঠোঁট থেকে বিড়ি সরিয়ে নিয়ে বটুদা আমার দিকে আবার তাকালেন। "বাক্সবাজানোর অভ্যাসটা এখনও সড়গড় আছে?"

এক সময় সায়েব ব্যারিস্টারের স্টেনোগ্রাফার ছিলাম আমি। ও-বিদ্যে সাইকেল চালানো এবং সাঁতারের মতো—একবার আয়ত্ত হলে কেউ কখনও ভোলে না। বড়জোর একটু মরচে পড়ে যায়—কিছুক্ষণ মেশিনের ওপর আঙুল নাচালেই আবার পুরনো গতি ফিরে আসে।

বটুদা বললেন, "সারা জীবন পেজ-বাই-পেজ রেটে টাইপ করে জীবনটা ঝরঝরে হয়ে গেল। আমাদের না আছে ছুটি, না আছে ইনক্রিমেণ্ট, না আছে বোনাস, না প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, না পেনসন। এ-এস-ডি-এফ-জি টিপতে-টিপতেই এই বুড়োকে একদিন মেশিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে মরতে হবে।"

বটুদা বোধহয় হঠাৎ বুঝলেন যার কাছে এই সব দুঃখের কথা বলছেন তার বর্তমান অবস্থা আরও শোচনীয়। সামনে-রাখা কাঁচভাঙা গোল টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বটুবাবু বললেন, "আমার গপ্পো করার সময় নেই। গোবরা মিত্তিরের এই ব্রীফ আজ টাইপ শেষ করতেই হবে, আর্জেন্ট ম্যাটার।"

বটুদা এবার হিসেব করতে বসলেন, আজও কিছু কুচো কাজ পড়ে আছে। আজ নিজের হাতে সব কাজ তোলা বেশ কষ্টকর হবে। বটুদা এবার আমার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। বললেন, "চাকরি-বাকরি যখন নেই তখন নগদ কিছু কামিয়ে নেবে নাকি ভায়া? জামায়ের মেশিনটা তো পড়েই রয়েছে—বসে পড়ো।"

মা লক্ষ্মীর নাম করে রেমিংটন মেশিনের সামনে বসে পড়লাম।

বটুদা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বললেন, "ভালই হলো—তুমি না-বসলে আমাকে রাত দশটা পর্যন্ত মেশিন ঠেঙাতে হতো। অথচ মেয়েটার আজ একাদশী—কিছু ফলপাকড় কিনে সকাল সকাল বাড়ি না ফিরলে বেচারার খাওয়াই হবে না।"

আমাদের দুজনের এক-কুড়ি আঙুল মেশিনের কী-বোর্ডের ওপর দক্ষ নর্তকীর মতো দ্রুততালে নেচে চলেছে। বটুদা রসিকতা করলেন, "এ যে পাকা হাত দেখছি—তবলার ওপর চাঁটি শুনেই বুঝতে পারি কে ওস্তাদ আর কে আনাড়ি।"

বটুদার এমন অভ্যাস যে হাতে লেখার ওপর তেমন নজর দেন না। ঝড়ের মতো মেশিন চালাতে-চালাতে বললেন, "এই ব্যাটা আণ্ডারউডের গতর ঠিক আমার মতো—যতই খাটুক কখনও অসুখ করে না। কত দিন তেল পর্যন্ত দিই নি, তবু সমানে লড়ে যাচ্ছে।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কিছু পয়সা রোজগার হলো। ভাবলুম বটুদাকে চা, টোস্ট খাইয়ে দেওয়া যাক। আমার নিজেরও খিদে পেয়েছে। চাওয়ালাকে অর্ডার দিতে যাচ্ছি, বটুদা বাধা দিলেন। "শুধু চা।"

"কেন টোস্ট?"

বটুদা মুহূর্তের জন্যে আঙুল নাচানো বন্ধ করলেন। তারপর ভিজে গলায় বললেন, "আমি এবং তোমার বউদি একাদশীতে মেয়েটার সঙ্গে উপোস করি।"

পরিবেশটা কেমন থমথমে হয়ে উঠলো। বৃদ্ধ বটুবাবুর অবস্থা দেখে আমিও চা ছাড়া কিছু খেতে পারলাম না।

"নাঃ, হাত চালাই", চায়ের কাপটা সরিয়ে দিয়ে বটুবাবু নিজের মনেই বললেন। "দুঃখ করবার সময় কোথায়? হাত বন্ধ হলেই পেটে টান পড়বে। ভগবান অনেক ভেবেচিন্তে গরীবকেই দুঃখী করেছেন।"

আমি অবাক হয়ে বটুবাবুর কাজ দেখে যাচ্ছি। বললাম, "ব্লাইন্ড ফোল্ড টাইপ আপনিই শিখেছেন! হাতের লেখার দিকে তেমন তো তাকাচ্ছেন না।"

বটুদা বললেন, "চল্লিশ বছরে এ-পাড়ার সব কাজ মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। পিটিশন, রিটন্ স্টেটমেণ্ট, এফিডেবিট এসব দু'লাইন পড়লেই বাকিটা চোখ বুজে লিখে যেতে পারি।"

বটুদা বললেন, "আগে এই পাড়ায় কেবল এটর্নি-ব্যারিস্টারদের দাপট ছিল। এখন দিনকাল পাল্টেছে কিছুটা।"

আমি কাজের ফাঁকে-ফাঁকে বটুদার মুখের দিকে তাকাই। বটুদা চোখ বন্ধ করে মেশিন চালাতে চালাতে বললেন, "সায়েবরা এদেশ থেকে চলে যাবার সময় উকিল-ব্যারিস্টারদের হাতে ক্ষ্যামতা দিয়ে গিয়েছিল। জহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, জিন্না, শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে এ'রা সবাই ল'ইয়ার। তাই এ-দেশকে বলা হতো উকিল-রাজ। এখন আসছে গোমস্তা-রাজ। ব্যবসাদারদের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। যে যত ভাল হিসেব রাখতে পারে সে তত বেশী টাকা কামাতে পারে। যার যত টাকা তার তত ক্ষ্যামতা, যার যত ক্ষ্যামতা তার তত সুখ। তাই অ্যাকাউনটেণ্টদের এখন রমরমা। এ-পাড়ায় অনেক গোমস্তা-অফিস খুলেছে। দিনে এটর্নি ও এডভোকেট—কিন্তু সন্ধ্যে হলেই সেই একই আপিসে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট ও অডিটরদের দাপট।"

বটুদা বললেন, "আমাদের সুবিধেই হয়েছে। রাত এগারোটা পর্যন্ত এ-পাড়ায় কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল আমার ভাই কাজে মন নেই। জামাইটা আমার যে কী সর্বনাশ করে গেলো। বিয়ের আগে কুষ্ঠিটাও ভাল করে মেলালাম না।"

বটুদা মাথা নিচু করে তাঁর হাইপাওয়ার চশমার ঝাপসা কাঁচ দুটো কাপড়ের খুঁটে সযত্নে মুছতে লাগলেন।

এবার আমি নিজের কথা ভাবতে শুরু করলাম। শাজাহান হোটেল থেকে বেরিয়ে এখন পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তা আমার চোখের সামনে আবার ভেসে উঠতে লাগলো। বিশেষ করে কিছুক্ষণ আগে বাবার নাম পাল্টানোর ব্যাপারটা। জানি, কেউ কেউ আমাকে বোকা বলবে; কিন্তু আমি ঠিকই করেছি। নাই বা হলো ভাল কোম্পানিতে সুখের চাকরি: তার বদলে প্রয়োজন হলে এই বটকৃষ্ণ বটব্যালের ফুটপাথের টাইপ কোম্পানিতেই পেট চালিয়ে নেবো।

এই সব চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ে কখন যে টাইপিং-এর গতি কমে গিয়েছে খেয়াল হয়নি। সংবিৎ ফিরে এলো বটুদার বকুনিতে। "কী গো, ঘুম আসছে নাকি? তোমার হাত যেন চলছেই না! অমন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো রেমিংটন মেশিন! ঝড় উড়িয়ে বেরিয়ে যাও।"

আমি এবার লজ্জা পেয়ে টাইপের স্পিড বাড়িয়ে দিলাম। বটুদা বললেন, "কী রকম বুঝছো যন্তরখানা?"

"ভালই তো।"

আমার মন্তব্যে সন্তুষ্ট হলেন না বটুদা। বলেলন, "একেবারে ফেদার টাচ। বোতামে আঙুল ঠেকবার আগেই রেসের ঘোড়ার মতো টাইপগুলো ছুটতে আরম্ভ করে। জামাইটা খুব শোখীন ছিল—বেশী ধকল সহ্য করতে চাইতো না। ওর জন্যে ম্যাঙ্গো লেন থেকে স্পেশাল মিস্ত্রি এনে মেশিন তৈরি করিয়েছিলুম—বলেছিলুম, এমনভাবে নরম করে দাও যাতে মেমসায়েবরা টাইপ করতে পারে।"

আমি কাজে মন দিয়েছি, কিন্তু অবাধ্য মনটা মাঝে-মাঝে পুরনো অনেক কথা চোখের সামনে তুলে ধরছে। বিশেষ করে বাবার কথা। বাবা জেলা কোর্টের প্রতিষ্ঠিত উকিল ছিলেন। বিদগ্ধ সৎ ভদ্রলোক বলে তাঁর সুনাম ছিল। কত লোক তাঁর চেম্বার ও সেরেস্তায় আসতেন। জেলা ইস্কুলে পড়বার সময় আমি নিজেও আদালতের সেরেস্তায় কতবার ঘুরেছি। সেরেস্তার গায়েই একজন টাইপিস্ট ছিলেন। নাম বীরেশ্বরবাবু। আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। দুজনে কত গল্প হতো।

বীরেশ্বরবাবু প্রায়ই বাবাকে বলতেন, "হরিবাবু, এ-ছেলে আপনাকে ছাড়িয়ে যাবে। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

বাবা বলতেন, "বুদ্ধিসুদ্ধি আছে—কিন্তু পড়াশোনায় মন নেই।"

জেলা কোর্ট সম্বন্ধে বীরেশ্বরবাবুর তেমন উঁচু ধারণা ছিল না। বললেন, "এ ছেলে যদি হাইকোর্টে যায় কী হয় দেখবেন!"

সেই হাইকোর্টেই এলাম। কিন্তু বীরেশ্বরবাবু আজ নেই, থাকলে দেখিতেন হরিপদ উকিলের ছেলে রাস্তায় তিন আনা রেটের টাইপিস্ট হয়েছে।

এই তিন আনাও যে হাতের মুঠোর মধ্যে নেই তা বটুবাবুর পরবর্তী কথাবার্তায় জানতে পারলাম। ভাগ্যক্রমে আজ কাজ বেশী আছে। কিন্তু অনেক দিন বটুদা নিজেই কাজের আশায় হাত-পা গুটিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকেন।

আমার একটা ড্রাফ্‌ট ডিড টাইপ শেষ হওয়া মাত্রই বটুদা বললেন, "দেখি কী রকম করলে।"

কাজ দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে বটুদা বললেন, "ঝটপট একখানা ব্যাকশিট লাগিয়ে ফেলো এটর্নির নামে।"

বটুদা এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাজটা যখন হয়েই গেলো তখন একটা রিকোয়েস্ট রাখবে ভাই?"

"আপনি আমাকে নিজের মেশিনে বসিয়ে কাজ দিয়েছেন, আর আপনার কথা শুনবো না?"

বটুদা বললেন, "একটু হেঁটে-চলে পায়ের ঝিনঝিন সারিয়ে নাও। কাগজগুলো পার্টির অফিসে দিয়ে এসো, ওরা খুশী হবে।"

এ পাড়ার সব ক'টা বাড়িই আমার চেনা। নম্বর যখন লেখা আছে তখন খুঁজে বার করতে মোটেই অসুবিধে হবে না।

"গণপতিবাবুর হাতে কাগজগুলো দিও। উনি না-থাকলে ফেরত নিয়ে এসো। গণপতি সামন্ত", বটুবাবু আর একবার মনে করিয়ে দিলেন।

এ নামের কোনো এটর্নিকে জানি না। "নতুন এটর্নি বুঝি?" আমি জানতে চাই।

"এটর্নির বাবা!" একগাল হেসে ফেললেন বটকৃষ্ণ বটব্যাল।

দশ নম্বর বাড়ির বিরাশি নম্বর ঘরের সামনে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। ওখানে গণপতি সামন্তর নাম লেখা কোনো সাইন-বোর্ড নেই। অন্য দু-একজন পরিচিত এটর্নি ও অ্যাডভোকেটের নাম লেখা আছে।

সামনের টুলে বসে বেয়ারাটা ঝিমুচ্ছিল—দেখলেই বোঝা যায় আফিমের নেশা আছে।

তাকে সামান্য ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্টার গণপতি সামন্তর আপিস এইটা?"

বেয়ারা বেশ বিরক্ত হলো। ওকালতি কায়দায় আমাকে যা নিবেদন করলো, তার অর্থ, এটা সিন্‌হা অ্যান্ড লায়ন, এটর্নির আপিস, তবে এই আপিসে গণপতিবাবু মাঝে-মাঝে এসে থাকেন।

আমার অনুরোধে বেয়ারা এবার গণপতি সামন্তকে সনাক্ত করলো। রোগা প্রায় ছ'ফুট লম্বা এই গণপতি সামন্ত গেরুয়া রঙের হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরে একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। গণপতি সামন্তর বেশ ধারালো বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। নাকটা বাঁশির মতো। চুলগুলোর আনা চারেক এই বয়সেই সাদা হয়ে গিয়েছে। শুঁয়োপোকার মতো একটা দু ইঞ্চি লম্বা গোঁফও আছে গণপতিবাবুর। দাড়িটা আজ বোধহয় কামান নি—চিবুকের কাছে কয়েকটা সাদা চুল তাই সহজেই নজরে পড়ছে। ও'র ভ্রু-জোড়াও নজরে পড়তে বাধ্য।

গণপতিবাবুর হাতে কাগজগুলো তুলে দিলাম। নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজটা ফেরত পেয়ে গণপতিবাবু খুব খুশী হলেন। বললেন, "আমি এখনই বটুবাবুর কাছে তাগাদা দিতে যাচ্ছিলাম।"

গণপতিবাবু এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমিও গণপতি-বাবুর মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছি। মুখটা যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন ভদ্রলোককে দেখেছি, অথচ মনে করতে পারছি না।

গণপতিবাবু যে আমাকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখে নিলেন, তা বুঝলাম। উনিও বোধহয়, স্মরণ করবার চেষ্টা করছেন, আমাকে কোথাও দেখেছেন কিনা।

গণপতিবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, "টাইপের পর চেকিং হয়েছে?"

মেলানো হয় নি শুনে গণপতিবাবু মিষ্টি ভাষায় বললেন, "খুব ব্যস্ত আছেন নাকি ভাই? না-হলে কপিটা ধরতেন, হুস করে কয়েকটা পাতা মিলিয়ে নিতাম। কখন যে কী বাদ পড়ে যায় ঠিক নেই।"

মেলানো শুরু হলো। কোনো একটা সম্পত্তি বেচা-কেনার খসড়া দলিল মনে হচ্ছে। তবে কোন সম্পত্তি, কে কিনছে, কে বেচছে তা বোঝবার উপায় নেই। বিশেষ-বিশেষ জায়গায় নামধামের বদলে কেবল ড্যাস-ড্যাস, ডট-ডট।

দু'পাতা মিলিয়ে গণপতিবাবু হাতে-লেখা কপিটা টেবিলে ফেলে রাখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "খুব তো রেসের ঘোড়ার মতো টাইপিস্ট আপনারা—বলুন তো, টাইপ-করার সময় কোন শব্দটা বাদ পড়ে যাওয়া সবচেয়ে ডেঞ্জারাস?"

উত্তরটা দিতে আমার এক-মিনিটও দেরি হলো না। বললাম, "ইংরিজী শব্দটা হলো 'নট্'—যার ফলে দলিলের মানে পাল্টে 'না' হয়ে যেতে পারে 'হ্যাঁ' এবং 'হ্যাঁ' হয়ে যেতে পারে 'না'।"

চটপট জবাবে সন্তুষ্ট গণপতি সামন্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রশংসা জানিয়ে বললেন, "আমার পরীক্ষায় একশর মধ্যে একশ দশ পেয়ে গেলেন! কিন্তু উত্তরটা এতো তাড়াতাড়ি দিলেন কী করে?"

এবার আমাকে সত্য কথা স্বীকার করতে হলো। উত্তরটা আমাকে মাথা খাটিয়ে বার করতে হয় নি। আমার বাবা জেলা কোর্টে টাইপিস্টকে সাবধান করে দিয়ে ওই 'নট্'-এর কথা বলতেন—একবার নাকি কোন মামলায় মূল্যবান ওই তিনটে ইংরিজী অক্ষর বাদ পড়ায় খুব ভুগতে হয়েছিল।

গণপতি সামন্ত মধুর বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। "কী বলছেন মশাই! আমার একটা মামলায় এগজ্যাক্টলি এই বিপদ ঘটেছিল। আপনার বাবার ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল?"

"অ্যাঁ! হাওড়া কোর্টে?" গণপতিবাবু আমার উত্তর শুনে আরও কৌতূহলী হচ্ছেন। "আমার ব্যাপারটাও তো হাওড়ায় ঘটেছিল। আপনার বাবার নাম কী?"

আমার বাবার নাম শুনে গণপতি সামন্ত তিড়িং করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। "তুমি হরি উকিলের ছেলে!" এবার তিনি আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর শান্তভাবে নিজের চেয়ার পুনর্দখল করে গণপতিবাবু বললেন, "তোমাকে বহুবার দেখেছি আমি—তখন তুমি ছোট ছিলে। হাফপ্যাণ্ট পরে হাওড়া জেলা ইস্কুলে পড়তে আসতে হরিপদবাবুর সঙ্গে! তোমাদের মুহুরীর নাম ছিল যোগেন মান্না।"

অজানা পরিবেশে একজন পরিচিতজনকে আবিষ্কারের আনন্দে আমি নিজেও মধুর উত্তেজনা অনুভব করলাম।

গণপতি সামন্ত তাঁর সরু স্টীল ফ্রেমের চশমার মধ্য দিয়ে আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে নিলেন। "আমাকে চিনতে পারছো না তুমি?"

সত্যিই চিনতে পারছি না আমি; তবু বন্ধু হারানোর ভয়ে বললাম, "একটু একটু—ঠিক মনে করতে পারছি না।"

গণপতিবাবুর দলিল মেলানো মাথায় উঠলো। সমস্ত কাগজ-পত্তর টেবিলে কাঁচের পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখলেন। "তুমি আমাকে চিনবে কী করে? আমি যে একেবারে পাল্টে গিয়েছি। অকালে এই ভ্রূ-জোড়া পেকে গিয়ে আমার মুখের আদল একেবারে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে—আমার মেজ-শ্যালকই অনেকদিন পরে আমাকে দেখে সেবার চিনতে পারে নি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, অন্য কিছুতেই বার্ধক্য এলো না—প্রথমেই পাক ধরলো এই ভূরুতে!"

ভ্রূ-যুগল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললেন গণপতিবাবু। "এই ভ্রূ-জিনিসটা ডেনজারাস—সামান্য একটু চেঞ্জ করলেই মুখের আদল

অন্যরকম হয়ে যায়। এই জন্যেই তো ইংরেজ আমলে আমাদের থানার হালিম দারোগা রাস্তায় ভ্রূ-কামানো ছোকরা দেখলেই ফেরার স্বদেশী ডাকাত সন্দেহ করে সোজা হাজতে পুরতো!"

ভ্রূ থেকে নানাপ্রকার ভ্রান্তি হতে পারে বুঝতে পারছি। গণপতিবাবু বললেন, "হিসট্রি সবার ওপর রিভেঞ্জ নেয়। সেদিন হালিম দারোগার মেয়ের সঙ্গে পার্কসার্কাসে দেখা হয়ে গেলো। এমনই সময় যে হালিম দারোগার মেয়ে ভ্রূ কামিয়ে ফেলেছে—চোখের চুল নাকি সৌন্দর্যকে বাধা দেয়।"

মনের আনন্দে গণপতিবাবু গল্প করে চলেছেন। আমার পিতৃপরিচয় পেয়ে গণপতিবাবুর ব্যবহার একেবারে পাল্টে গিয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, চাকরির সন্ধানে কয়েকঘণ্টা আগে এই পিতৃপরিচয় পরিবর্তনের ফাঁদেই আমি পা-দিতে চলেছিলাম!

গণপতিবাবু আমার জন্যে চা-টোস্টের অর্ডার দিলেন। বললেন "নামকরা লোকের ছেলে তুমি! আমার এই হোল লাইফে হরি উকিলের মতো বুদ্ধিমান এবং সৎ মানুষ আমি গাদা-গাদা দেখি নি।"

গত রাত্রের পর এতোক্ষণ গরম জল ছাড়া পেটে অন্য কিছুই পড়ে নি। প্রচণ্ড খিদের মাথায় চিনি-মাখানো এক জোড়া টোস্ট যেন অমৃত মনে হলো।

আমার খাওয়ার ধরন দেখেই গণপতিবাবু বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝলেন। বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "ওরে আরও দু'খানা মাখন-টোস্ট ঝটপট নিয়ে আয়।"

আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না।

গণপতিবাবু বললেন, "এই যে আজ করে খাচ্ছি, এ-তোমার বাবার দয়ায়, আর তুমি দু'খানা টোস্ট খেতে লজ্জা পাচ্ছো!"

আমাকে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে গণপতি সামন্ত প্রশ্ন করলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেই আমার গপ্পো শুনতে। হরি উকিল নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছিলেন আমাকে তাই আজও কাউকে তোয়াক্কা করি না আমি। যদি দু'একখানা পরীক্ষা পাশ-এর রবারস্ট্যাম্প থাকতো তা হলে এতোদিনে এডভোকেট হয়ে চড়চড় করে কোথায় উঠে যেতাম।"

গণপতিবাবু বললেন, "আমাকে তোমার মনেই পড়ছে না! অথচ তোমার বাবার কাছে কতবার গিয়েছি। তা হলে, শোনো আমার গপ্পো এবং তোমার বাবার গপ্পো।"

কাজকর্ম ফেলে রেখে গণপতিবাবু শুরু করলেন—"জেলা কোর্টে তখন দুই হরিপদ মুখুজ্যে উকিল। প্লেন-হরি এবং গুঁফো-হরি। তোমার বাবার সেসময় মস্ত গোঁফ ছিল।

"তোমার বাবা বেশী বয়সে ভাগ্য সন্ধানে বনগাঁ কোর্ট থেকে বেরিয়ে এই হাওড়ায় হাজির হয়েছেন। একবার একটা কেসে তোমার বাবা রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট হলেন। জজসায়েব তোমার বাবার ভক্ত ছিলেন। দিন-আনা দিন-খাওয়ার দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যেই গুণগ্রাহী জজ সায়েব তোমার বাবার জন্যে এই জমিদারী এস্টেটের রিসিভারির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এমনই কপাল, পেয়াদা সেই হুকুম ভুল করে প্লেন-হরির সেরেস্তায় দিয়ে এলো।

"বিকেলবেলায় জজ সায়েব গুঁফোহরিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জমিদারী

এস্টেটের রিসিভারির অর্ডারটা পেয়েছেন তো?'

"তোমার বাবা খবর পান নি শুনে হৈ-হৈ কাণ্ড। জজসায়েব পেশকারকে ডেকে পাঠালেন। দেখা গেলো প্লেন-হরি ইতিমধ্যে কাগজপত্র সই করে নিয়োগপত্র নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই কাজটা তোমার বাবার কাছে ফিরে এলো।"

গণপতিবাবু বললেন, "তার কিছুদিন পরেই যুদ্ধ বাঁধলো। এবং সেই সময়েই আমার সঙ্গে হরি উকিলের আলাপ হলো।"

একটু থেমে গণপতিবাবু প্রশ্ন করলেন, "আমার তখন কী কাজ বুঝতে পারছো?"

আমি কি করে বুঝবো? উকিলের কাছাকাছি কাজ হচ্ছে মুহুরীর—ভদ্রভাষায় যাকে বলে 'মোহরার'।

মুহুরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় বিরক্ত হলেন গণপতি সামন্ত। "কোন দুঃখে আমি মুহুরী হতে যাবো? আমাকে বলতে পারো থ্রি-ফোর্থ উকিল। আমাদের কোনো রবার স্ট্যাম্প নেই—লোকে তাই বলে তদ্বিরকারক।"

আমি শুনছি গণপতি সামন্তর কথা। কিন্তু তিনি আমার হাবভাবে সন্তুষ্ট না-হয়ে বললেন, "হাসপাতালে যেমন নার্স, আদালতে তেমনি এই তদ্বিরকারক। ডাক্তার যত বড়ই হোক, নার্সিং-এর দোষে রোগী যেমন রাতারাতি পটল তুলতে পারে; তেমনি যত বড়ই উকিল রাখা হোক এক্সপার্ট তদ্বিরকারক না থাকলে কেস গোল্লায় যেতে বাধ্য।" ,

গণপতি সামন্ত এবার ব্যাখ্যা করলেন, "উকিল তো কেস উঠলে হাকিমের সামনে গাউন পরে ইওর-অনার অথবা মিলার্ড মিলার্ড করবে। কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ, দলিল-দস্তাবেজ, প্রমাণ এবং অপরপক্ষের হাঁড়ির খবরাখবর কে জোগাড় করবে? শুধু মন্তর পড়লেই তো রথ চলবে না—জগন্নাথের রথের চাকায় তেল দেবার লোকও তো দরকার! তার নামই তদ্বিরকারক।

"কিন্তু..." গণপতিবাবু এবার মুখে এক খিলি পান গুঁজলেন। "কিন্তু তদ্বিরকারক বলে যারা জেলা কোর্টে ঘুরে বেড়ায় তাদের বেশীরভাগ তদ্বিরের 'ত'ও জানে না—তারা আসলে উকিলবাবুদের টাউট। বাংলায় যাকে বলে দালাল। সরল লোকদের তাতিয়ে তাতিয়ে এরা মামলায় নামায়। তারপর গ্রামগঞ্জ থেকে সেইসব কেস নিয়ে এসে তারা মক্কেল এবং উকিলবাবু দু'পক্ষের কাছ থেকেই টাকা কামায়।

"সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম দিকে আমি নিজেও ওইরকম টাউট ছিলাম। কাজকর্ম কিছুই বুঝতাম না। গাঁয়ের লোকদের সুড়সুড়ি দিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় নামাতাম। তারপর গরম-গরম সেইসব ব্রীফ নিয়ে সোজা উকিল-বাবুদের কাছে চলে আসতাম। জিজ্ঞেস করতাম ফী-এর কত পার্সেন্ট আমাকে দেবেন?

"তারপর তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হলো। হরিপদ উকিলের তখনও খুব পসার হয় নি। কিন্তু একরোখা লোক। গম্ভীরভাবে বললেন, "গণপতি, কাজকর্মের তুমি কিছুই জানো না। এই বিদ্যে নিয়ে তুমি সারাজীবনই টাউট থেকে যাবে। তোমার জেনে রাখা ভাল, কোনো ভদ্র উকিল টাউটের থ্রু দিয়ে কেস জোগাড় করে প্র্যাকটিশ জমাবে না।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গণপতিবাবু পানের গুলিটা বাঁদিক থেকে ডান গালে ট্রানসফার করে বললেন, "তখন ওঁর কাছে স্যারেনডার করলাম। ওঁর কাছে বসে বসে ক্রমশ অনেক কাজকর্ম শিখলাম।

"কয়েক বছর পরে আমি বেশ একসপার্ট হয়ে উঠলাম। হরি উকিল আমার কাজকর্মে এতো সন্তুষ্ট হলেন যে নিজেই বললেন, 'গণপতি তোমার যদি ইস্কুল কলেজের লেখা-পড়া থাকতো তা হলে ভাল উকিল-মোক্তার হতে পারতে।' কথাটা তখনও আমি তেমন সিরিয়াসলি নিই নি। গাঁয়ের ছেলে, সিক্সথ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে—সে আবার বি এ-এম-এ পাস করে উকিল হবে!

"কিন্তু তোমার বাবাই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। হরি উকিল একদিন আমাকে বললেন, 'তুমি আমার মুহুরী হতে পারো। কিন্তু এখানে দলিল নকল করে আর হাজিরি জমা দিয়ে কত টাকা পাবে? তাছাড়া সারাজীবন তুমি এইভাবে নষ্ট করো তাও আমি চাই না।"

গণপতি সামন্ত এবার নাকের ডগায় নেমে-আসা চশমাটা যথাস্থানে তুলে দিলেন। বললেন, "তোমার বাবার কথাগুলো মনে ধরে গেলো। ওঁরই পরামর্শমতো কাশীপুরের জমিদারদের তদ্বিরকারকের কাজে ঢুকলাম। ওখানে মাত্র কয়েক বছর ছিলাম। তারপর মস্ত এক পার্টির কাজ জুটে গেলো।"

ফিসফিস করে সেই বিখ্যাত পার্টির নাম বললেন গণপতিবাবু। "বেজায় বড়লোক। কত যে টাকা আছে, কত যে কোম্পানি আছে, কত যে শেয়ার আছে, কত যে গহনা আছে—তা মালিক নিজেও জানেন না! একমাত্র আমিই বোধহয় কিছুটা জানি।"

আমি বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করলাম। গণপতিবাবু বললেন, "বেশী টাকা, বেশী ব্যবসা, বেশী সম্পত্তি থাকলে কী হয় বলো তো?"

"অশান্তি", আমি সরল মনে উত্তর দিলাম।

"কচু জানো তুমি", বেশ বিরক্ত হলেন গণপতি সামন্ত। "গরীবরা ওইসব স্তোকবাক্যে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। ওই সুখেই থাকো যে বড়লোকদের বড় অশান্তি। যেমন আমাদের গ্রামে বলতো, সুন্দর ছেলের কালো বউ হয়। একদম মিথ্যে কথা! বড়লোকদের বাড়িতে যাও—যেমন সুন্দর বউ, তেমন সুন্দর বর—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ!"

"বেশী টাকা থাকলে তাহলে কী হয়?" গণপতিবাবুর প্রশ্নটা এবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে হলো।

"বিষয়-সম্পত্তি থাকলেই থানা-পুলিস, কোর্ট-কাছারি, উকিল-ব্যারিস্টার এসব একটু আধটু লাগবেই। এসব কাজের জন্যে বিশ্বাসযোগ্য লোক চাই। সেই কাজই আমি করছি।"

একটু হেসে গণপতিবাবু বললেন, "কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে আমার বিদ্যে সিকসথ ক্লাস পর্যন্ত। হরি উকিলের ট্রেনিং-এর জোরে আমি বাঘা-বাঘা এটর্নি ব্যারিস্টারকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি।"

গণপতিবাবু বললেন, "ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটে, সিটি সিভিল কোর্টে, আলিপুরে বারাসতে, হাইকোর্টে আমার কাজকর্ম লেগেই আছে—মামলা তদ্বিরের জন্যে চরকির মতো সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। বাড়িতে অথবা বাবুদের আপিসে আমাকে ধরাই দায়। খাতায় সইয়েরও বালাই নেই আমার—মালিক জানেন গণপতির হাজিরার দরকার নেই।"

এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে গণপতিবাবু বললেন, "এই সিন্‌হা এন্ড লায়ন, এটর্নি আপিসে আমি প্রায়ই এসে থাকি। আমার সঙ্গে যোগাযোগের এইটাই বেস্ট জায়গা। এখানে এই টেবিলে লোকে আমার চিঠিপত্তর কাগজ-টাগজ সব রেখে যায়। এটর্নি শিখীন্দ্র সিনহার সঙ্গে আমার পাকাপাকি ব্যবস্থা আছে।"

মনে হচ্ছে অনিশ্চিত জীবনের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে এবার আমি শক্তিমান শুভানুধ্যায়ীর সন্ধান পেয়েছি।

গণপতিবাবুকে আমার সব কথা বললাম। গণপতিবাবু সেই বৃত্তান্ত শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন।

তাঁর প্রিয় হরি উকিলের ছেলের যে এমন অবস্থা হতে পারে তা গণপতিবাবু এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

রুমালে কপাল মুছে তিনি বললেন, "বড় ডিফিকাল্ট কেস। এই শহরে সবচেয়ে দরকারী তিনটে জিনিস—চাকরি, আশ্রয় এবং অর্থ—তিনটের কোনোটাই নেই তোমার।"

গণপতিবাবুকে আমি আর কিছুই বলতে পারছি না—পারিবারিকভাবে পরিচিত কারও কাছে নিজের দুঃখের কথা আবেদন-নিবেদন করতে লজ্জায়, অপমানে মাথা নিচু হয়ে আসে।

গণপতিবাবু মাথা চুলকে বললেন, "জাস্ট-নাউ আমার ব্রেন ঠিক কাজ করছে না। বুদ্ধির পাম্প চালু করতে একটু সময় লাগবে মনে হচ্ছে। তুমি বরং আরও কিছুক্ষণ বটকৃষ্ণ বটব্যালের দোকানে কাজ করোগে যাও। ঘণ্টা-খানেক পরে আমি নিজেই খোঁজ করবো'খন।"

বটুবাবু আমাকে অনেকক্ষণ না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এতোক্ষণ কী করছিলে? আমি তো ভাবলাম গণপতি সামন্ত নিশ্চয় তোমাকে ধরে কপি মেলাতে বসে গিয়েছেন। কপি মেলানো আমাদের কাজ নয়—যে-দামে আমরা টাইপ করি তাতে কোনো টাইম ফাউ দেওয়া সম্ভব নয়।"

বটুবাবু খবর দিলেন, "লালবাজারের কাছে একখানা ইটালিয়ান টাইপিস্টের ভেকান্সি আছে।"

ইটালিয়ান মানে যে রাস্তার ওপর ইটে বসে টাইপ করা তা আমি জানি।

বটুবাবু বললেন, "কিন্তু মুশকিল হলো, অনেক টাকা সেলামী চাইছে। অত টাকা কি জোগাড় করতে পারবে?"

রাস্তার ওপর ইটে বসে টাইপ করবার জন্যেও নভোস্পর্ধী প্রাসাদের এই নগরীতে মূলধন এবং সেলামীর প্রয়োজন হয়। হে ঈশ্বর, হৃদয়হীন এই কলকাতায় আমার মতো সহায়হীনরা কেমন করে বেঁচে থাকবে?

বটুবাবু বললেন, "দু'পাতার এই এফিডেভিটখানা টাইপ করে দাও—তারপর তোমার ছুটি। আমিও আজ বেশীক্ষণ বসবো না। একাদশী এলে কাজকর্মে একটুও মন থাকে না—মেয়েটার কথা কেবলই মনে পড়ে যায়।"

কাজকর্মে আমারও মন বসছে না। প্রায়ই ঘড়ির দিকে নজর দিচ্ছি এবং গণপতিবাবুর আবির্ভাব প্রত্যাশা করছি। এক-একবার মনে হচ্ছে আমার

কিছুই হবে না—গণপতিবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতেই আসবেন না। আবার মনে হচ্ছে, একদিকে যেমন আমি অভাগা, অন্যদিকে তেমনি আমার সৌভাগ্যের শেষ নেই। সংসারের নিষ্করুণ পথে একলা বেরিয়ে বারবার কত সহজে স্বল্প পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষের সাক্ষাৎ-সান্নিধ্যে এলাম —তাঁদের অপ্রত্যাশিত অকৃপণ ভালবাসাই তো আমাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। হে উদাসীন ও পরমশক্তিমান ভাগ্যবিধাতা, তুমি আমার স্বল্প-পরিসর জীবনে মেঘ ও রৌদ্রের যে বিচিত্র লীলা ক্রমান্বয়ে খেলে চলেছো তার জন্যে আমার অভিমান ও কৃতজ্ঞতা দুই-ই গ্রহণ করো।

গণপতিবাবু সম্বন্ধে আমার অধীর প্রত্যাশা বিফল হয় নি। ঘণ্টা দুয়েক পরে সিনহা এন্ড লায়ন কোম্পানির চাপরাসী স্ট্র্যাপছেঁড়া চটি কোনোক্রমে পায়ে টানতে টানতে হাজির হলো। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, "আপনিই কি শংকরবাবু?"

বটুবাবু বেয়ারার কথাবার্তার উগ্র ভঙ্গীতে বিরক্ত হয়ে বললেন, "উনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর যে-বাবুই হোন, কী দরকার তোমার?"

বেয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে খবর দিলো, "গণপতিবাবু আপনাকে এখনই ডাকছেন।"

"এখন ডাকলে এখনই যেতে হবে এমন কোনো আইন নেই," বিরক্ত বটুবাবু তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করলেন।

তারপর আমাকে বললেন, "যাও একবার দেখে এসো। নিশ্চয় টাইপের কোনো পাতায় দু'এক লাইন ছাড় গিয়েছে। পয়সা দিয়ে টাইপ করালে এপাড়ার কর্তাব্যক্তিরা নুলো হয়ে যায়! একটি কথা হাতে লিখবে না। কম্পিটিশনের বাজার—মুখের ওপর কিছু বলাও চলে না। নিশ্চয় তোমাকে দিয়ে বিনা পয়সায় দু'একখানা পাতা রিটাইপ করিয়ে নেবে, সেইজন্যে ডেকে পাঠিয়েছে।"

শনিবারের পড়ন্ত বিকেলে হেস্টিংস স্ট্রীট এবং ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের আইনপাড়ার তেমন প্রাণচাঞ্চল্য থাকে না। গাড়িতে-গাড়িতে বোঝাই দ্বিমুখী জনস্রোতের অস্বস্তিকর ধাক্কাধাক্কির প্রশ্নও ওঠে না। তাই চোখের নিমিষে সিনহা এন্ড লায়নের আপিসে হাজির হলাম।

সুইং-ডোর ঠেলে আমাকে আপিসে ঢুকতে দেখেই গণপতি সামন্ত সাদর সম্ভাষণ জানালেন, "আরে এসো, এসো।"

গণপতিবাবুর সদয় ব্যবহারে আমি মুগ্ধ, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

গণপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন চা খাবো কিনা। আর এক কাপ চা এই সময়ে পেলে মন্দ হতো না, কিন্তু অপরের ভদ্রতার সুযোগ কতবার নেওয়া যায়?

গণপতিবাবু ব্যাপারটা বুঝে বকুনি লাগালেন। বললেন, "তোমার বাবার

কাছে আমরা কতবার চা-জলখাবার খেয়েছি। আর তা ছাড়া...” গণপতিবাবু বাক্য সমাপ্ত করলেন না। সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় ফিসফিস করে বললেন, “হরি উকিলের ছেলের কাছে মিথ্যে বলবো না, চা খাওয়াতে আমার গাঁটের কড়ি খরচ হয় না। মালিকদের কাছে গিয়ে বিল করে দিই। কত জায়গায় যাই, কত লোকের কাছে সুযোগ-সুবিধে চাইতে হয়—চা, পান, বিড়ি, সিগ্রেট না বার করলে কাজ এগুবে কেন?”

গণপতিবাবু আমাকে সাবধান করে দিলেন, “এসব কথা ঘুণাক্ষরেও ফাঁস করবে না। তোমার সঙ্গে এখন থেকে আমার স্পেশাল সম্পর্ক।”

কয়েকঘণ্টা আগেও যাঁকে জানতাম না, তিনি কত সহজে আমার আপনজন হয়ে উঠলেন। ইট কাঠ কংক্রিটের এই বৈশ্যতন্ত্রী শহরে আজও ভালবাসার কত ফল্গুধারা এমনিভাবেই প্রবাহিত হচ্ছে। গণপতিবাবুর মতো সহৃদয় মানুষরা আছেন বলেই পৃথিবী আজও সম্পূর্ণ মরুভূমি হয়ে ওঠে নি।

আজ এতোদিন পরে লিখতে বসে আমার দুঃখদিনের সেইসব ছোটখাটো ভালবাসার মহামূল্যবান স্মৃতি মনকে গভীর কৃতজ্ঞতায় ভারী করে তোলে, চোখ সজল হয়ে ওঠে। সিস্টেম, ক্লাস ইত্যাদি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার যুক্তিজালে জড়িয়ে পড়েও কোনো মানুষকে আজও সেই কারণে পরিপূর্ণ ঘৃণা করতে পারি না—অসংখ্য অযাচিত ভালবাসার ছোট ছোট ছবি মনকে অকারণে উদ্বেল করে তোলে।

গণপতিবাবু বললেন, “তোমাকে ডাকতে দেরি হয়ে গেলো। তুমি নিশ্চয় চিন্তা করছিলে।”

যাদের কোনো ভরসা নেই চিন্তা তো তাদের নিত্যসঙ্গী। চিন্তার অ্যাসিডেই তো তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলো ক্রমশ ক্ষয়ে-ক্ষয়ে নষ্ট হয়।

গণপতিবাবু জানালেন, “আমি অবশ্য হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলুম না। এটর্নি মিঃ হাজরার কাছে গিয়েছিলাম, উনি যদি তোমাকে প্রোভাইড করতে পারেন। ভেকান্সি থাকলে আমার কথা ওঁরা কিছুতেই ঠেলতে পারবেন না—আমার বাবুদের অনেক কাজ হাজরা সায়েব করেন। কিন্তু ব্যাড লাক, ওখানে লোকজন নেওয়া তো দূরের কথা কিছু ছাঁটাই করতে পারলেই ভাল হয়।”

এজাতীয় কথা শুনে-শুনে আমার কান পচে গিয়েছে। এই বিশাল পৃথিবীর কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মখালি আছে বলে এখন আমার বিশ্বাস হয় না। পুরনো কাসুন্দি আর একবার ঘাঁটবার জন্যে গণপতিবাবু আমাকে আবার ডেকে না-আনলেই ভাল করতেন।

“যে-কাজ আমি হাতে নিই তা সসম্মানে ফিনিশ না করা পর্যন্ত আমার ছুটি নেই,” আমার শুকনো মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে হুঙ্কার ছাড়লেন গণপতি সামন্ত। “হাজরা এটর্নির আপিসে চাকরি খালি নেই তো কী হয়েছে? এই কলকাতা শহরে হাজার-হাজার লাখ-লাখ কাজকর্মের সুযোগ রয়েছে।”

এসব কথায় আমি আর বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো কিছুতে অবিশ্বাস প্রকাশ করার মতো মানসিক ক্ষমতাও আমি হারিয়ে ফেলেছি।

বললাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যারিস্টারের বাবু ছিলাম—তারপর বিখ্যাত

গণপতিবাবুর

শাজাহান হোটেলের অ্যাসিসটেন্ট রিসেপসনিষ্ট।"

নিরাশার গভীর অন্ধকারের মধ্যে গণপতিবাবু এবার যেন আশার ম্লান প্রদীপশিখা দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর মুখখানা সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

প্রায়-শাদা ভ্রূযুগল বেঁকিয়ে গণপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে ডকুমেণ্টখানা টাইপ করলে, তার থেকে কি বুঝলে?"

স্বীকার করলাম কিছুই বুঝতে পারি নি। অক্ষরের পর অক্ষর মেশিনে নকল করতে গিয়ে বাক্যের অর্থ অনেক সময় টাইপিস্টের মগজে প্রবেশ করে না।

"তবু।" গণপতিবাবু জেরা করলেন।

বললাম, "কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরের খসড়া দলিল মনে হলো। যদিও কোথাকার সম্পত্তি, কে নিচ্ছে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

হেসে ফেললেন গণপতিবাবু। "বিষয়-সম্পত্তির অনেক জিনিসই এরকম কুয়াশার মধ্যে ঢেকে রাখা হয়। তুমি তো উকিলের ছেলে এবং ব্যারিস্টারের বাবু। বোঝোইতো! কানাকানি থেকে জানাজানি এবং জানাজানি থেকে সাতভূতে টানাটানি। তাই সম্পত্তির ট্রানজাকসন যত চুপি-চুপি হয় ততই দু'পক্ষের কাজের সুবিধে।"

আমি ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারি নি। বড় একটা সম্পত্তি হস্তান্তরের গোপন চেষ্টা চলেছে এবং গণপতি সামন্তর সে-ব্যাপারে কিছুটা হাত আছে—কেবল এইটুকু আন্দাজ করতে পারছি।

গণপতিবাবু বললেন, "আমি যে এসবের মধ্যে আছি তা যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়। এমন কি তুমি যে আমার চেনা, তোমার বাবার সঙ্গে আমার যে ভাব-ভালবাসা ছিল তাও যেন বেরিয়ে না পড়ে।"

এসবে আমার মোটেই আপত্তি নেই।

গণপতিবাবুর মুখ এবার যেন নতুন কোনো মতলবের ফ্ল্যাশবাল্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আমার মাথায় একটা ভাল বুদ্ধি খেলে যাচ্ছে! একই ঢিলে দু-পাখী মারার—অর্থাৎ তোমার চাকরি এবং আশ্রয়ের জোড়া ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে মনে হচ্ছে।"

আমাকে বসিয়ে রেখে গণপতিবাবু আপিসের ভিতর থেকে কোনো গোপন টেলিফোন করতে গেলেন। মনে হলো, তাঁর মালিকদের কারও সঙ্গে সলা-পরামর্শ করলেন। তারপর ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন, "সুখবর আছে। প্রথম দানেই ছক্কা পড়েছে—ঘুঁটি ঘর থেকে বেরিয়ে চিকে বসেছে।"

এসব রহস্যময় কথার অর্থ বুঝতে পারছি না। গণপতিবাবু বললেন, "এবার যদি সেকেণ্ড ছক্কা ফেলতে পারি তা হলে কোনো কথাই নেই!"

আমি উৎসুকভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। গণপতিবাবু এবার আর একটা টেলিফোন করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

"হ্যালো, হ্যালো মিস্টার লাহা? আমি গণপতি সামন্ত কথা বলছি। ওই যে প্রপার্টি—যেটার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। আজ্ঞে, মামাবাবু বলছিলেন, ওখানে একজন বিশ্বস্ত লোক বসালে মন্দ হতো না।"

ওদিকে এটর্নি লাহা যে রাজী হচ্ছেন না তা বেশ বুঝতে পারছি। ছক্কা তা হলে পড়ছে না।

কিছুক্ষণ পরে বিরক্তভাবে টেলিফোন নামিয়ে গণপতি সামন্ত বললেন, "খুব শক্ত বাদাম—সহজে খোলা ভাঙা যায় না। লাহামশায়, কোনো দায়িত্ব

না নিয়ে বললেন, সম্পত্তির মালিকের সঙ্গে কথা বলতে। তা ঠিক হ্যায়, গণপতি সামন্ত এই লাইফে হাজারখানেক প্রপার্টি এ-হাত থেকে ও-হাত করিয়েছে। এসব কাজ তার কাছে নস্যি।”

হাত-ঘড়ির দিকে তাকালেন গণপতিবাবু। বেলা পাঁচটা প্রায়। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “শনিবারের বারবেলা—আবার শুভস্য শীঘ্রম্। কোনটায় বিশ্বাস তোমার?”

ক্যানটিনের সনাতন সকালবেলায় আমার উঁচু কপালের ওপর শনির শুভ-প্রভাবের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা এখনও আমার কানে লেগে রয়েছে। শনিবারের বারবেলা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই ক্ষতিকারক হতে পারে না।

“ভেবে দ্যাখো ভাল করে।” গণপতিবাবু আমাকে শেষ সুযোগ দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঝুলে পড়বার পক্ষেই ভেটো প্রয়োগ করলাম।

“চলো তা হলে নর্থ ক্যালকাটায়। পরবর্তী ছক্কা ওখানেই ফেলতে হবে।”

গণপতিবাবু উঠে পড়লেন এবং আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁকে অনুসরণ করলাম।

পুরনো পরিচিত ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীট ধরে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা বিধানসভা ভবন দেখতে পেলাম। টেম্পল-চেমবারসের পাশে বিশাল টাউন হল বাড়িটার সামনে এসে গণপতিবাবু একটা বিড়ি ধরালেন। বললেন, “ভগবানের আশীর্বাদে এখন যা-রোজগার হচ্ছে তাতে উইলস ক্যাপস্টান খেতে পারি। কিন্তু তাজা বিড়ি খেয়ে যে-সুখ তা কোনো সিগ্রেটে নেই। এর জাতই আলাদা। এর সঙ্গে একমাত্র লড়তে পারে গড়গড়া—যা তোমার বাবা খেতেন।”

আমি চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছি। গণপতিবাবু বললেন, “তোমার একটা গতি হয়ে যাক, তারপর একদিন অষ্টপ্রহর গপ্পোগুজব হবে। আমার লাইফের অনেক ঘটনা, আমার ফ্যামিলির সব কথা তোমাকে বলবো।”

এসব গপ্পো শুনতে বলাবাহুল্য আমার খুবই ভাল লাগে। সুযোগ পেলে সেই ছোটবেলাতেও আমি বাবার বৈঠকখানার এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতাম। জুনিয়র উকিল, মুহুরী, গোমস্তা, মক্কেলরা আসতেন—কতরকম আলোচনা হতো, আর আমি সেসব কথা গোগ্রাসে গিলতাম।

আমরা এসপ্ল্যানেডের দিকে হাঁটছি। গণপতি সামন্ত বললেন, “এই যে তদ্বিরের লাইনে এলাম—এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। হারুখুড়োর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। বাবা মৃত্যুর সময় কয়েক বিঘে জমি রেখে গিয়েছিলেন। সেই জমির আয় থেকে আমার মা অসহায় নাবালককে মানুষ করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কম বয়সের বিধবা আমার মা, না ছিল কোনো শিক্ষা, না ছিল কোনো বন্ধু। সেই সুযোগে খেঁকশিয়ালের মতলব নিয়ে মায়ের সঙ্গে ভাব করতে এলেন বাবার দূর সম্পর্কের ভাই হারু। আমি তখন নিতান্ত নাবালক—অনাথা বিধবাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কয়েক বিঘে জমি হাত করতে হারুখুড়োর বেশী দিন লাগলো না।”

বিড়ি থেকে লম্বা ধোঁয়া ছাড়লেন গণপতিবাবু। ইতিমধ্যে আমরা রাজভবনের দক্ষিণ দিকে এসে গিয়েছি। গণপতিবাবু তখনও নিজের কথা

বলছেন। "একটু বড় হয়ে যখন সব বুঝলাম তখন মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। এই যে লাটসায়েবের বাড়ি দেখছো, এখানেও দরখাস্ত দিয়েছি—বিধবার সম্পত্তি ঘোগের পেটে গিয়েছে, একটা বিহিত করুন।

"কিন্তু কিছুই হলো না, বুঝলে।" গণপতিবাবু নিজের প্রথম জীবনের কথা বলতে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন মনে হলো। "দেখলুম উকিল-মোক্তার ছাড়া বিচার পাওয়া যায় না—সুবিচার গরীবের জন্যে নয়। তা তখন আমারও বেজায় গোঁ চেপে গেলো। মনে মনে পণ করলাম, উকিল-মোক্তারির রহস্যটা আমাকে বুঝতেই হবে। হাওড়া ডিসট্রিক্টের বাজেপ্রতাপ ছেড়ে সোজা চলে এলাম মামার বাড়ি জয়নগরে। পণ করেছিলাম, হারুখুড়োর ওপর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত জন্মভূমিতে ফিরবো না।"

গণপতিবাবু আর একটা বিড়ি ধরালেন। গড়ের মাঠের ওই ঝোড়ো হাওয়াতেও দক্ষ গণপতিবাবুর মুখাগ্নিতে কোনো অসুবিধে হলো না।

গণপতিবাবু বললেন, "তোমার বাবা বেঁচে থাকলে জেনে সুখী হতেন যে বাজেপ্রতাপের সেই চার বিঘে জমির মালিক আমিই হয়েছি আবার। শুধু আসল নয়!" এবার হা-হা করে হাসলেন গণপতিবাবু। "সুদ হিসেবে হারুখুড়োর আরও আড়াই বিঘে ভদ্রাসন আমি নীলামে চড়িয়ে কিনে নিয়েছি।"

আমি গণপতিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। গণপতিবাবু তখন বলে চলেছেন, "আমার এই রোগা দেহটা গাঁজার কলকের মতো—প্রতিশোধের আগুন এখানে একবার জ্বললে আর নিভতে চায় না। দেশের ওই সম্পত্তিটুকু কিনতে আমার অনেক খরচা হয়েছে—অনেকে বুঝিয়েছে, ওই পয়সায় কলকাতার কাছাকাছি মাথা গুঁজবার ঠাঁই হতো। কিন্তু আমার তখন এক লক্ষ্য—যারা আমার বিধবা মাকে সর্বস্বান্ত করেছে, তাদের আমি ভিটেমাটি-ছাড়া করবোই।"

এসপ্ল্যানেড থেকে ভায়া-চিৎপুর একখানা ট্রামে চড়ে বসলাম আমরা। গণপতিবাবু বললেন, "একদিন সব বলবো তোমায়। হরি উকিলের নিজের হাতে শেখানো বিদ্যেয় কী করে কলকাতায় আচ্ছা-আচ্ছা বি-এ এম-এ পাশ লোকের সঙ্গে লড়ছি সব শিখিয়ে দেবো।"

ইংলন্ডে সমিতিবদ্ধ ট্রাম কোম্পানির নড়বড়ে গাড়িখানা ধুঁকতে ধুঁকতে গ্রে স্ট্রীটের দিকে লাউয়ের মতো গড় গড়িয়ে চলেছে। দু'খানা ছ্যাকড়া গাড়ির চার পিতামহ ঘোটকও সাহেব কোম্পানির ট্রামকে অপমান করে সামনে এগিয়ে গেলো।

গণপতি সামন্ত বললেন, "তদ্বিরের লাইনে সমস্ত জীবন কাটিয়ে এইটুকু বুঝেছি যে আমাদের এই দেশে আইনের এক বাদশাহী রাজত্ব চলেছে। এদেশের আইন এক বিচিত্র জিনিস—স্বয়ং ঈশ্বরের মতো, নানাজনের কাছে একই আইনের নানা রূপ। আইনের মারপ্যাঁচ লক্ষ্য করে যদি ঝোপবুঝে কোপ মারতে পারো, যদি ভাল উকিল-মোক্তারের পিছনে টু-পাইস ঢালতে পারো, যদি গণপতি সামন্তর মতো তদ্বিরকারককে রাহা খরচ, জলখাবার এবং কমিশনে রাখতে পারো—তা হলে আইনটা তোমার।"

আমার এক প্রিয় লেখকের কথা মনে পড়ে গেলো। "অচলপত্রের এক স্তম্ভে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল লিখেছিলেন, "বসুমতী এককালে বীরভোগ্যা ছিলেন—এখন তদ্বিরভোগ্যা।"

কথাটা শুনে গণপতিবাবু খুব খুশী হলেন। বললেন "গীতার লাস্ট পেজে কথাটা জুড়ে দিতে পারো। বারেন্দ্র বাউন কলিযুগের সার সত্যটা বুঝে নিয়েছেন। একদিন আলাপ করিয়ে দিও, সান্ন্যালমশায়ের পায়ের ধুলো নেবো।"

দীপ্তেন্দ্রকুমার আমার অপরিচিত নন—একদিন গণপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াটা মোটেই শক্ত হবে না। কিন্তু এখন এসব আলোচনা আর ভাল লাগছে না। যে-উদ্দেশ্যে গণপতিবাবুর সঙ্গে ট্রামে চড়ে বসেছি তার পরিণতির কথা ভেবে অধৈর্য হয়ে উঠছি।

ট্রাম থেকে নেমে আমরা বিডন স্ট্রীট ধরে পশ্চিমদিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

গণপতিবাবু বললেন, "আমরা এখন চলেছি বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। উইডো অফ লেট অর্ধচন্দ্র গুপ্ত।"

অর্ধচন্দ্র যে কারও নাম হয় তা আমার জানা ছিল না—শব্দটা অন্য অর্থে স্কন্ধে ব্যবহৃত হয় বলেই আমার ধারনা ছিল। গণপতিবাবু বললেন, "কত রকমের নাম হয় তার কি আর ঠিক-ঠিকানা আছে। ওই যে সামনের বাড়িটা দেখছো ওর মালিকের নাম আশ্রিতধন মল্লিক। ওঁর পরিবারের নাম আরও মিষ্টি—শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী মল্লিক।"

গণপতিবাবু জানালেন, "বিলাসিনী দেবীর অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে। তারই একটা কেনা-বেচার ব্যাপারে গোপন কথাবার্তা হচ্ছে, আমার বাবুদের এক আত্মীয় সম্পত্তিতে ইণ্টারেস্টেড। আমি দু'পক্ষকে রেজিস্ট্রি আপিসের পিঁড়িতে বসাতে চেষ্টা করছি। দু' পক্ষই আমাকে ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন। দেখি তোমার কিছু হিল্লে করতে পারি কিনা।"

বিরাট এক বাড়ির সামনে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। কতদিনের পুরনো বাড়ি তা আন্দাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। উত্তর কলকাতার কয়েকটা রাস্তায় এইরকম কিছু বাড়ি আজও দেখা যায়।

গণপতিবাবু বললেন, "তুমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি ভিতরে ঢুকে যাবো। তারপর প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো। তুমি নিজে থেকে একটি কথা বলবে না। আমি যা জিজ্ঞেস করবো তুমি তাতেই হ্যাঁ বলে যাবে। তারপর যে-মুহূর্তে চোখের সিগন্যাল দেবো, অমনি একটা নমস্কার ঠুকবে।"

আমাকে গেটের সামনে রেখে গণপতিবাবু ভিতরে উধাও হয়ে গেলেন। আমি এই বিশাল বাড়িটার বিরাট গেটখানার কারুকার্য দেখছি। এই বাড়ির প্রথম মালিক যে শৌখীন লোক ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গেটের কয়েক জায়গায় তাঁর নামের আদ্যক্ষরের মনোগ্রাম এখনও জ্বলজ্বল করছে। বিলাসিনী দেবীর দ্বাররক্ষী একবার আমার দিকে আড়চোখে দৃষ্টিপাত করলেন। গণপতিবাবু নিশ্চয় এই দারোয়ানজীর সুপরিচিত—কারণ আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে দেখে একটি কথাও তুললেন না, কোনোরকম প্রশ্নবানে আমাকে জর্জরিত করলেন না।

কিছুক্ষণ পরে হন্তদন্ত হয়ে গণপতিবাবু বেরিয়ে এলেন। আমাকে ডাকলেন, "এসো এসো—ভিতরে এসো।"

অন্দরমহলে বিলাসিনী দেবী নাম্নী কোনো এক বিষণ্ণবদনা বর্ষীয়সী

রাজভবনের দাক্ষিণ [illegible]

বিধবার সাক্ষাৎ পাবো আশা করেছিলাম। কিন্তু কোথায় সেই শ্বেতবসনা নিরাভরণা যোগিনী মূর্তি? ভিতরের বৈঠকখানায় অপরূপা এক পঞ্চদশীকে দেখলাম। দূর থেকে মনে হলো, ঠিক যেন মোমের পুতুল।

মোমের পুতুলের মিষ্টি হাসিতে অপরিচিত এই জলসাঘর মুহূর্তের জন্যে মুখর হয়ে উঠলো। সামনের সোফায় আর একজন পুরুষ—বয়স সাতাশ-আটাশ।

গণপতিবাবু নাটকীয় কায়দায় আমাকে উপস্থাপিত করলেন। বললেন, "এর কথাই বলছিলাম। ধুরন্ধর ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েব হাতে ধরে নিজের চেম্বারে একে কাজ শিখিয়েছিলেন।"

তারপর হুড়হুড় করে আমার বিবিধ সদ্‌গুণের লিস্টি গণপতিবাবু এমন দ্রুত বলতে লাগলেন, যেন আমার সঙ্গে গত দশ বছর প্রতিদিন তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। গণপতিবাবু যে বর্ণনা দিলেন, সেই অনুযায়ী বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে আমি মহামূল্যবান এক অ্যাসেট। জমি-জমা সংক্রান্ত সব রকম জটিল সমস্যা সমাধানে আমার মতো ম্যাজিসিয়ান ভূভারতে দুটি নেই। গণপতিবাবুর বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি অস্বস্তি বোধ করছি—কারণ, জমিজমা বাড়িঘরের ব্যাপার আমি বিশেষ কিছুই বুঝি না।

গণপতিবাবু ততক্ষণে আমার অন্য গুণাবলীর তালিকা দিতে শুরু করেছেন। "কলকাতার সবচেয়ে নামকরা হোটেলের রিসেপসনিস্ট। সেখান থেকে এরকম লোক ভাঙিয়ে আনা কি সহজ কথা। নেহাত, হোটেলের চাকরি ওর পছন্দ নয় তাই।"

"পছন্দ নয় কেন?" সোফায়-বসা গম্ভীর সেই ভদ্রলোক এতোক্ষণে মুখ খুললেন।

আমি হয়তো গোলমেলে উত্তর দিয়ে বসতাম। গণপতিবাবু নিজেই উত্তর দিলেন, "সদ্‌ব্রাহ্মণের সন্তান—কতদিন আর ম্লেচ্ছ সংসর্গ ভাল লাগে বলুন? বড় হোটেল মানেই তো গোমাংস এবং যতরকমের অনাচার, অত্যাচার।"

ভদ্রলোক সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারপর গণপতিবাবুকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বলছেন, এস্টেটের কাজের পক্ষে উনি খুব ভাল হবেন?"

"ভাল বলে ভাল—এক টাকার অসুখে পাঁচ সিকের ওষুধ একেই বলে", গণপতিবাবু ব্যাখ্যা করলেন।

এবার আমার মনে হলো গণপতিবাবু আমাকে চোখের ইশারা করলেন। সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই আমি নিচু হয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার করতে গেলাম।

আমার ভাবভঙ্গি দেখে পঞ্চদশী বালিকা এবার খিল খিল করে হেসে উঠলো।

গণপতি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভদ্রলোক বললেন, "তা হলে আর কী। মা-জননীকে যা বলবার বলা যাক।"

গণপতিবাবু যেন এই কথাটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে এবার বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন।

মিনিট পনেরো পরে গণপতিবাবু জলসাঘর থেকে আমাকে নিয়ে দ্রুত-বেগে বেরিয়ে এলেন। দেখলাম গণপতিবাবুর হাতে একটা খাম।

গণপতিবাবু আমাকে বকুনি লাগালেন, "তুমি একেবারে বোকা। ওকে

কেন ওইভাবে নমস্কার করতে গেলে?"

বুঝলাম কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি। অথচ মালিককে নমস্কার জানাবো না তা কেমন করে হয়? জলসাঘরে ঢুকবার আগে গণপতিবাবু তো সেরকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

গণপতিবাবু বাড়ির বাইরে এসে একটা খাবারের দোকানে ঢুকলেন। শুনলাম, কচুরি সিঙাড়া ছাড়াও এখানে সম্প্রতি চা বিক্রি শুরু হয়েছে। সময়ের চাপে এ-পাড়ার অনেক মিষ্টির দোকান তাদের বাঙালী কৌলীন্য বজায় রাখতে পারছে না—কেউ চা-কফি, কেউবা আলু-টিকিয়া, দইবড়া, কেউ বা কুলপি বরফের সহ-অবস্থান নতমস্তকে মেনে নিচ্ছে।

গণপতিবাবু দোকানে ঢুকে খুশী মনে চারখানা করে ছোট কচুরি ও আলুতরকারি অর্ডার দিলেন। শালপাতার একখানা গরম ঠোঙা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খেয়ে দ্যাখো—এমন টুকরি আলুর চচ্চড়ি হোল-ওয়ার্লডে কোথাও পাবে না। কচুরি কিনলে আলু ফ্রি। আলু বেশী পাবার আশায় অনেকে দফে-দফে দু'খানা করে কচুরি অর্ডার দেয়।"

কড়া করে ভাজা হাতে-গরম টাকা-সাইজের সোনা-রং কচুরি সেই মুহূর্তে অমৃত মনে হলো। গণপতিবাবু মিষ্টিভাবে হাঁক দিলেন, "আর একটু চচ্চড়ি দেখাও না ভাই—বড্ড কম দিয়েছে।"

দোকানের কৃশকায় বালকটি কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে আরও দু' চামচ ফ্রি-চচ্চড়ি আমাদের ঠোঙায় আলগোছে ঢেলে দিলো। প্রসন্ন গণপতিবাবু আশীর্বাদ জানালেন, "জয় হোক তোমাদের। সাধে কি আর ডেলি আড়াই মণ আলুর তরকারি কেটে যায় এখানে।"

গণপতিবাবু এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন। মচমচে কচুরির শেষাংশ মুখের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার কান্ডকারখানা দেখে পমা তো হেসেই বাঁচে না।"

পমা বলতে গণপতিবাবু যে জলসাঘরের বালিকাকে বোঝাচ্ছেন তা আন্দাজ করতে পারছি। গণপতিবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "বিলাসিনী দেবী নাম রেখেছেন অনুপমা—কিন্তু সবাই ওই শেষ অক্ষর দুটো ব্যবহার করে।"

আমি জানতে চাইলাম, লোক হাসাবার মতো কী করলাম?

গণপতিবাবু এবার বললেন, "পমাই তো সব—শেষ পর্যন্ত এই বিরাট বিষয়-সম্পত্তি সব ও পাবে। সামনে যে-ভদ্রলোক বসেছিলেন তুমি তাকেই মালিক ঠাউরে সেলাম ঠুকলে! কিন্তু উনি কিসসু নন। বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে মা-ঠাকরুন বললেন, তুমি বরং মাস্টারের সঙ্গেও একবার কথা বলে নাও। ভদ্দরলোক এ-বাড়ির মাস্টার—পমার প্রাইভেট টিউটর।"

গণপতিবাবুই খবর দিলেন, ভদ্রলোকের নাম বিপুলভূষণ বারিক। প্রাইভেট ট্যুশনি করতে এসে নিজের কপাল ফিরিয়ে ফেলেছেন। বিলাসিনী দেবী ওঁর ওপর খুব নির্ভর করেন—সব ব্যাপারেই বারিক মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।

গণপতিবাবু এবার শালপাতার খালি ঠোঙাটা বিরাট এক ড্রামের মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজের মনেই বললেন, "বারিকবাবু, যতই তোমার হাতযশ থাকুক—তুমি কিন্তু মালিক নও। সুতরাং, গণপতি সামন্ত কিছুতেই তোমাকে সেলাম ঠুকবে না।" গণপতিবাবু আমাকে বকুনি লাগালেন, "আর তুমি এমনই বোকা যে, বারিকের কাছেই মাথা নোয়ালে আর সেই দেখে পমা খিল-

খিল করে হেসে উঠলো।"

জটিল প্রোটোকলের এই সব চুলচেরা বিশেলষণে এখন আমার মোটেই আগ্রহ নেই। চাকরিটার কী হলো তাই জানতে চাই। জলসাঘর থেকে আমাকে বিদায় করে দিয়েও গণপতিবাবু ওখানে মিনিট পনেরো বসে ছিলেন। সেই সময়েই যে আমার ভাগ্যনির্ধারিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

রাস্তায় নেমে এসে বাস স্টপেজের সামনে দাঁড়িয়ে গণপতিবাবু সুসংবাদ দিলেন, "শনিবারের সন্ধ্যেটা তোমার পক্ষে সত্যিই খারাপ নয়। তোমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে।"

অনাস্বাদিত আনন্দের মধুর উত্তেজনায় আমি গণপতিবাবুর হাত দুখানা উষ্ণভাবে জড়িয়ে ধরলাম। প্রসন্ন গণপতিবাবুর স্নিগ্ধ ডান হাতখানা আমার পোড়া কপালের কাছে রাখলাম। গণপতিবাবু বোধহয় বুঝলেন আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তিনি বললেন, "আঃ, করো কী। আগে যাও, চাকরিটা দখল নাও—তারপর।"

চোখের জল মুছে বললাম, "আমার কথা ভাববার মতো লোক এ-পৃথিবীতে বেশী নেই, গণপতিবাবু।"

গণপতিবাবু সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। "যার কেউ নেই, তার জন্যেই তো ওপরওয়ালা আছেন"—এই বলে তারাভরা আকাশের দিকে গণপতিবাবু তাঁর সরু লম্বা হাতখানা এগিয়ে দিলেন।

গণপতিবাবু আমাকে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ থেকে বিরত করলেন, বললেন, "কাজটা কেমন তাও আন্দাজ করতে পারছি না। কিন্তু শাস্ত্রে যখন বলছে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল তখন জয় দুর্গা বলে ফিলডে নেমে পড়ো।"

জয় মা দুর্গা। জয় বিপত্তারিণী। জয় দশভুজা। রেখো মা দাসেরে মনে এ-মিনতি করি পদে।

রবিবারের ভোরবেলায় খ্যাত-অখ্যাত, জ্ঞাত-অজ্ঞাত সুরলোকবাসী সকল দেবদেবীকে নিষ্ঠাভরে স্মরণ করে আমি সনাতনের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়েছি। গণপতিবাবুর দেওয়া সাত রাজার ধন এক মানিক খামখানা বুকে আগলে ধরে গতকাল রাত ন'টা নাগাদ আমি ফোর্ডসন কোম্পানির ক্যানটিনে সনাতনের সাময়িক আশ্রয়ে ফিরে এসেছিলাম।

ওই রাত্রেই আমি নতুন চাকরির পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্যে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সদাসতর্ক স্নেহশীল সনাতন আমাকে যেতে দিলো না। মৃদু বকুনি লাগিয়ে বললো, "এতো রাত্রে কোথায় যাবেন সায়েব? তাছাড়া অজানা জায়গা, সময় ভাল নয়, কোথায় কী বিপদে পড়ে যাবেন ভগবান জানেন।"

সনাতনের ইচ্ছে, অত তড়বড় না-করে, সেই রাত্রে তার হাতে-তৈরি রান্না আমি টেস্ট করি। আমার কোনো ওজর আপত্তি টিকলো না। আমার সঙ্গে পুরনো দিনের নানা গল্প করতে করতে রেকর্ড টাইমে সনাতন রুটি, আলু-পিঁয়াজ ভাজা ও পটল বেগুন কুমড়ো ঢেঁড়স ইত্যাদির সমন্বয়ে একটা মিশ্র তরকারি রেঁধে ফেললো।

আমি একাই খেতে বসেছি, সনাতন নিজের কোনো ব্যবস্থা করে নি। সনাতন হেসে জানালো, শনিবারের রাত্রে বারের দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সে উপোস করে। এ জানলে আমি কিছুতেই সনাতনকে রাঁধতে দিতাম না, কিন্তু সনাতন আমার কথামতো চলতে মোটেই রাজী নয়।

রান্না নয় তো, অমৃত! তবু সনাতন সলজ্জভাবে ক্ষমা চাইলো, "মাছ নেই, আপনার অসুবিধে হচ্ছে নিশ্চয়।"

তরকারিটা মুখে দিয়ে স্যাটা বোসের কথা মনে পড়ে গেলো। হোটেলের বিলিতি সুপ এবং মোগলাই কারিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বোসদা মাঝে মাঝে এই পাঁচমিশেলী বেঙ্গলী ঘ্যাঁটের জন্যে কুককে ফরমাস করতেন। একান্তই স্বদেশী এই চচ্চড়ির বিলিতি নাম দিয়েছিলেন—মিক্সড গার্ডেন চার্চারি!

সনাতনও ব্যাপারটা ভোলে নি। আমাকে বললে, "আপনার মনে আছে? স্যাটাবাবু এই তরকারি খেতে খুব ভালবাসতেন।"

সমস্ত রাত চাপা উত্তেজনায় ঘুম এলো না। মশা না-থাকা সত্ত্বেও পোকামাকড়ের কাল্পনিক কামড়ে বিছানায় ছটফট করছি। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখছি—গণপতিবাবুর দেওয়া মহামূল্যবান খামটা কলুটোলার মোড়ে পকেটমার হয়েছে! ধড়মড় করে উঠে দেখি খামটা হারায় নি। বালিশের তলায় যেমনটি রেখেছিলাম ঠিক তেমনটি আছে। অলীক উত্তেজনায় সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

শুভরাত্রি জানাবার আগে সনাতন নিজেও আমার চাকরি সম্বন্ধে খবরা-খবর নিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোনো খবর নিজেই এখনও জানি না। তবু উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলাম, "বেশ ভাল চাকরিই জুটেছে মনে হচ্ছে, সনাতন।"

সুখবরে বেজায় খুশী হয়ে সনাতন বলেছিল, "আমি জানতাম, আপনার বড় চাকরি জুটবে। শাজাহান হোটেলে যাদের ট্রেনিং হয়েছে তাদের সঙ্গে কমপিটিশনে ইণ্ডিয়ায় কেউ পেরে উঠবে না—আমরা সব জায়গায় চাম্পিয়ন হবো।"

সনাতন তুমি আমার দুঃখদিনের বন্ধু—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু এ-চাকরি তো আমি কমপিটিশনের জোরে নিজের এলেম দেখিয়ে পাই নি। পিতৃবন্ধু গণপতি সামন্তর ধরাধরিতেই কোনোক্রমে ভাগ্যের সিকে ছিঁড়েছে। কিন্তু এমনই কপাল, সে-কথা কাউকে বলবার উপায় নেই। গণপতিবাবুর নির্দেশ, "তোমার এই চাকরির পিছনে যে আমি আছি, এ-কথা যেন কাকপক্ষী জানতে না পারে।"

সনাতনকে অন্তত ব্যাপারটা বলবার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নামটা প্রকাশ করতে সাহস পেলাম না, গণপতিবাবুর গা ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। গণপতিবাবু শুধু শুধু কেন যে এমন দিব্যি করালেন।

ভোরবেলায় আমি উঠে পড়েছি। আমার চলাফেরার খুটখাট শব্দে সনাতনেরও ঘুম ভেঙে গেলো।

সনাতনের এই সময় ওঠবার কথা নয়—রবিবার সকালে সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ঘুম থেকে উঠেও আলস্য করে, অর্থাৎ বিছানা ছেড়ে ওঠে না, কুমিরের মতো গা-ছড়িয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে।

সনাতন আজ উঠে পড়লো। কুলুঙ্গিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেব-

দেবীকে আলাদা-আলাদা নমস্কার করে সে গ্যাসের উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিলো। ততক্ষণ আমি বেসিনের কল খুলে দিয়ে একটা ফুটো টিনের কৌটকে মগের মতো ব্যবহার করে স্নান সেরে ফেলেছি। রবারের নল চাই নি বলে সনাতন রাগ করলো। তারপর সে নিজেও দ্রুত স্নান সেরে নিলো। সদ্য-স্নাত অবস্থায় সনাতন চা তৈরিতে মন দিয়েছে।

গোলাপী রঙের সুন্দর একটা কাপে সনাতন আজ আমাকে চা দিলো। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট। সনাতন ব্যাপারটা চেপে রাখলো না। ফোর্ডসন ইন্ডিয়ার খোদ বড়সায়েব প্রতিদিন যে-কাপে চা-কফি পান করে থাকেন সেই পাত্রটাই সনাতন আজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে! বড়সায়েবের নাম শুনে সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠলো। খোদ বড় সায়েব যদি একবার জানতে পারেন তাঁরই কাপে ক্যানটিনের এক শরণার্থী চা খেয়েছে! দ্বিতীয় দফা দেব-দেবীর নমস্কার সেরে সনাতন আমাকে শান্ত করলো, "কেন? বড় সায়েবের গেস্ট আসে না? এমনও তো হতে পারে, একদিন গটগট করে আপনি এই কোম্পানির খোদকর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—ঘণ্টি বাজিয়ে বড় সায়েব আপনাকেই চা দেবার হুকুম করবেন।"

সনাতন তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু ওসব এ জন্মে সম্ভব হবে না। মনে মনে ওড়িশানিবাসী সনাতনকে জিজ্ঞেস করলুম "তুমি তো আমার কেউ নয়—তোমার ও আমার ভাষা, জন্মস্থান, জাত, শিক্ষা সব আলাদা। তবু কেন তুমি আমাকে এমনভাবে আপন করে নিয়েছো?"

চায়ের শেষে সনাতন সজল চোখে আমাকে বিদায় দিয়ে বলেছিল, যেখানে যাচ্ছি সেখানে যদি কোনো অসুবিধে হয় তা হলে যেন আমি সোজা সনাতনের ক্যানটিনে ফিরে আসতে দ্বিধা না করি। "দারোয়ানের কাছে পারমিশন তো নেওয়াই আছে—যতদিন খুশী থাকবেন, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না", সনাতন আশ্বাস দিয়েছিল।

ভোরবেলায় কলকাতার ট্রামে তেমন ভিড় থাকে না। পিক-আওয়ারের অনেক নিয়মকানুন সদাশয় কন্ডাক্টররা এই সময় প্যাসেঞ্জারকে মেনে চলতে বাধ্য করেন না। আমার বাইশ ইঞ্চি চামড়ার ব্যাগ ও শতরঞ্চিমোড়া বেডিংটা ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে তুলতে তেমন অসুবিধে হলো না।

সোনালী রোদে ভোরের কলকাতা পরিচ্ছন্ন পবিত্র হাসিতে ঝলমল করছে। চলমান ট্রামের জানালা দিয়ে গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে মনে হলো মহাকাশের অদৃশ্য আয়ুষ্মতীরা কুমারী পৃথিবীর গাত্রহরিদ্রা উৎসবে সমবেত হয়েছে। রসবতী কোনো নভোচারিণীর প্রগলভ নির্দেশে লজ্জাবতী পৃথিবীর সর্বদেহে ফ্লুওরেসেণ্ট হলুদ রঙ ছড়িয়ে পড়ছে।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রকৃতির এই আনন্দ যজ্ঞে অনেক দিন আমি অংশ গ্রহণ করি নি। নতুন জীবন শুরু করার প্রথম প্রভাতে আমি অকস্মাৎ নতুন এক অনুভূতির স্পন্দনে বিভোর হয়ে উঠেছি।

সংসারের এই বিচিত্র যাত্রার পথশ্রান্তিতে আমি মাঝে মাঝে হাতাশা অনুভব করেছি। জীবনের অদৃশ্য দেবতাকে একান্তে করজোড়ে করুণ-ভাবে প্রশ্ন করেছি, 'প্রভু, আর কতদিন?' কিন্তু রবিবারের এই প্রসন্ন প্রভাত আমাকে প্রাণবন্ত করে তুললো—অনেক হারিয়ে-যাওয়া আশা আবার হৃদয়ে ফিরে আসছে। নতুন পরিবেশে নব জীবনের মুখোমুখি হওয়ার

জন্যে আমি প্রস্তুত। আমার কীসের দুঃখ? কীসের দৈন্য? সনাতন ও গণপতিবাবুর মতো বন্ধুকে যে খুঁজে পেয়েছে তার কীসের ভয়, কীসের ভাবনা?

পার্ক স্ট্রীট মেয়ো রোড পেরিয়ে উত্তর বাহিনী ট্রাম এবার 'মরা-সোসাইটির' হলদে বাড়িটার সামনে দিয়ে অভয়ারণ্যে হরিণীর মতো আপন আনন্দে ছুটছে। আমার লটবহরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে মধ্যবয়সী কন্ডাক্টর সায়েব নির্ধারিত স্টপেজের একটু আগেই ঘণ্টি মারলেন। সকালবেলায় পৃথিবীর সবাই বোধহয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রসন্ন থাকেন—কারণ কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ না-করেই ড্রাইভারসায়েব সংগে সংগে নির্দেশ মান্য করলেন। কয়েক মুহূর্তের সেই সুযোগে আমি চৌরঙ্গীর রাজপথে নিরাপদে নেমে পড়লাম।

চৌরঙ্গীর প্রশস্ত রাজপথে এখনও সদাব্যস্ত যানবাহনের চিহ্ন নেই। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে চৌরঙ্গী এই ভোরবেলাতে যেন একটু ঘুমিয়ে নেয়।

প্রশস্ত রাজপথ নির্দ্ধিধায় পেরিয়ে এসে মিউজিয়ামের উত্তর দিকের সরু রাস্তার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। এইমাত্র গড়ের মাঠে যে ঝলমলে সূর্য দেখে এলাম, কোনো অজ্ঞাত কারণে সেই খেয়ালী সূর্য পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া এই রাস্তার কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

পকেট থেকে গণপতিবাবুর দেওয়া খামটা বার করে ঠিকানাটা দেখে নিলাম। রাস্তার নাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার তাকালাম অপরিচিত এই পথের দিকে। অদূরে সায়েবী নামাঙ্কিত এক বিরাট বিভাগীয় বিপনির বন্ধ দরজা। তারই পাশে আর একখানা পুরনো বাড়ি। শীর্ণ বিবর্ণ একসারি রেলিং গলিত নখদন্ত সান্ত্রীর মতো বৃদ্ধ বাড়িখানা পাহারা দিচ্ছে। সেই রেলিংয়েরই এক কোণে এই পথের অস্পষ্ট বিবর্ণ পরিচয়পত্র ঝুলছে। ধুলোতে ঢাকা হলেও সামান্য চেষ্টাতেই পড়া যায়—সাডার স্ট্রীট। আমি ভাবলাম—হ্যারিংটন স্ট্রীট, মেয়ো রোড, কিড স্ট্রীট ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় সায়েবদের নামাঙ্কিত পথ পেরিয়ে এবার হয়তো সাডার নামের কোনো এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজনন্দনের ঐতিহাসিক স্মৃতিধন্য এলাকায় হাজির হলাম। স্বাধীন কলকাতার এই অঞ্চলে সায়েবরা এখনও 'পাস্ট টেন্‌স' হন নি—রীতিমত 'প্রেজেণ্ট টেন্‌স' হয়ে রাজত্ব চালাচ্ছেন।

অনেক দিন পরে জেনেছিলাম, সাডার আসলে 'সদর'। কিন্তু এখন মানসচক্ষে সাডার সায়েবের একটা ছবি দেখতে পেলাম।

মিউজিয়মের লাগোয়া ফুটপাথের কাছে নিষিদ্ধ পার্কিং অঞ্চলে একখানা রিকশা মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভোরবেলায় রাস্তায় আর একটিও মানুষ নেই। সায়েবী সাডার স্ট্রীট এখনও রবিবাসরীয় প্রভাতী ঘুমে আচ্ছন্ন।

"রিকশ, রিকশ"—দু'বার ডাকেও রিকশওয়ালা কোনো আগ্রহ দেখালো না। মালপত্র ফুটপাথের ওপর রেখে রিকশর সামনে গিয়ে দেখলাম, নিজের দেহটাকে বিচিত্র কায়দায় কয়েকভাঁজ করে রিকশওয়ালা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গমুরারি এই রূপ দেখে আমার মনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ক্ষমাসুন্দর ছবিটি ভেসে উঠলো। আমি কিছুক্ষণ ওই ঘুমন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বেশ কয়েক ডাকেও ঘুম ভাঙছে না রিকশওয়ালার। এই সময় এ-পাড়ায়

যে নতুন যাত্রীর যাতায়াত একটু কম তা আন্দাজ করতে পারছি। রিকশ-ওয়ালাকে কয়েকবার ডাকবার পর সে মুহূর্তের জন্যে চোখ খুললো। আমাকে এক ঝলকে দেখে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে বিরক্তভাবে সে যা নিবেদন করলো তার অর্থ—আমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অনেক ব্যাপারে আমার যে অযথা দেরি হয়েছে তা অবশ্যই আমার অজানা নয়। কিন্তু আজ কিসে দেরি করলাম? এবং আমি দেরি করলেও রাস্তার রিকশওয়ালার তাতে কী এসে যায়? শুভ কাজে বেরিয়ে প্রথমেই এই বাধা আমার ভাল লাগলো না।

বিরক্ত রিকশওয়ালার ঘণ্টাটা এবার নিজেই বাজিয়ে দিলাম। রিকশ-ওয়ালা অর্ধজাগ্রত অবস্থায় বললো, "সমস্ত রাত এখানে জেগে কাটিয়ে দিলাম তখন এলেন না। এখন সূর্য উঠে গিয়েছে—সব দরজা বন্ধ, কোনো জেনানা পাওয়া যাবে না। সকাল দশটার পরে আসুন", এই বলে রিকশ-ওয়ালা আবার ঘুমুতে যাচ্ছিল—কিন্তু এবার আমি বকুনি লাগালাম। বললাম, "রাস্তায় রিকশ দাঁড় করিয়ে রেখে কী সব আবোল তাবোল বকছো? যদি রিকশ না-ই চালাবে, তাহলে গাড়ি গ্যারেজ করে দাও নি কেন?"

রিকশওয়ালা এবার সংবিৎ ফিরে পেলো। ধড়মড় করে উঠে পড়ে আমাকে সেলাম করলো। আমার গন্তব্যস্থান ও খামের ওপর লেখা নাম বলায় সে আর একবার সেলাম ঠুকলো। বললে, "হুজুর, সকালবেলার বউনি! পুরো পাঁচসিকে লাগবে।"

দূরত্ব কতখানি কীভাবে যেতে হবে জানি না—সুতরাং রিকশওয়ালার শর্তে রাজী হয়ে গেলাম।

আমার ব্যাগ ও বিছানা রিকশয় তুলতে তুলতে কাঁচা-ঘুম-ভাঙা রিকশ-ওয়ালা বললো, "হুজুর আমার কসুর মাফ করবেন। কাল রাত সাড়ে-এগারোটা থেকে রাস্তায় জেগে বসে আছি। একটা পেসিঞ্জার মিললো না।"

রিকশওয়ালার মুখে শুনলাম, রাত্রে সওয়ারী না-মিললে রিকশওয়ালাদের চোখের ঘুম অদৃশ্য হয়ে যায়। বহু ঘণ্টা ব্যর্থ অপেক্ষা করে ভোরের আলো ফুটে উঠলে তবেই নিরাশ রিকশওয়ালার চোখের পাতা বুজেছে। এ সময় এ-পাড়ায় খদ্দের আসে না। বাসায় চলে যাবে ভেবেছিল রিকশওয়ালা—কিন্তু বউনি না করে একেবারে খালি হাতে ঘরে ফিরতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

ঠুন ঠুন। রিকশওয়ালা এবার গাড়ির হ্যাণ্ডেল তুলে ফেললো। "হুজুর আমি ভেবেছিলুম—কোনো ফালতু আদমি।"

ঠিকই ভেবেছে রিকশওয়ালা—ফালতু আদমি ছাড়া আমি কী?

ফালতু আদমির আরও অর্থ আছে তা অচিরেই বুঝলাম। রিকশওয়ালা বললো, "এই ফালতু আদমিরা একদম ফালতু আছে! সারারাত প্রাইভিট মদ খেয়ে রাস্তায় টোঁটোঁ করে ঘুরবে—ভোরবেলায় এসে রিকশওয়ালাকে জ্বালাবে গার্ল ফিরেণ্ডের জন্যে। একদম ফালতু আদমি বাবু—এদের পকেটে একটা পয়সাও থাকে না; রিকশ ভাড়া পর্যন্ত আদায় হয় না।"

রিকশওয়ালা ঘুমের ঘোর কাটাবার জন্যেই যেন একটানা ঘণ্টি বাজানো শুরু করলো—ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন। ঘুমন্ত সাডার স্ট্রীটের মধ্য দিয়ে আমার রিকশ এবার মধ্যগতিতে চলতে শুরু করলো।

রিকশ, রিকশ—আর কতদূর নিয়ে যাবে আমাকে? কোনো উত্তর না দিয়েই রিকশওয়ালা এগিয়ে চললো।

সাডার স্ট্রীটের মোড় থেকে দুটি বৃদ্ধা হোটেল, একটি জরাজীর্ণ চার্চ ও ইস্কুল আমরা বাঁ-দিকে ফেলে এসেছি। স্যালভেশন আর্মির সেই জগদ্বিখ্যাত হোস্টেলও আমার নজরে পড়েছে। সামান্য অর্থে রাতে মাথা গুঁজবার এমন প্রশস্ত স্থান কলকাতা শহরে কোথাও নেই।

রিকশ এবার দক্ষিণ দিকে বাঁক নিলো। বড়লোক চৌরঙ্গী রোডের গরীব আত্মীয় এই চৌরঙ্গী লেন। নাম ছাড়া দুই রাস্তার মধ্যে আর কোনো সাদৃশ্য নেই। এক-আধখানা খাবারের দোকান, চীনা হেয়ার ড্রেসিং শপের বন্ধ দরজা এবং কয়েকখানা জরাজীর্ণ বাড়ি ছাড়া এই সরু গলির মধ্যে চলমান রিকশ থেকে আর কিছুই নজরে পড়লো না।

রোড থেকে লেন, লেন থেকে বাইলেন। ঘুমন্ত নগরীর শীর্ণ শিরা-উপশিরা বেয়ে খেয়ালী রিকশওয়ালা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে? আমার দ্বিচক্রবাহন কয়েকবার এদিক ওদিক বাঁক নিলো—একসঙ্গে এতগুলো লাবণ্যহীন গৃহমালা অনেকদিন আমার নজরে পড়ে নি।

রিকশ এবার যে রাস্তায় পড়লো তার নাম কয়েকটা দোকানের সাইন-বোর্ডে স্পষ্ট লেখা আছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। কোনো একদিন এই পবিত্র-পথে বিনামূল্যে বিদ্যাচর্চার যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু আজ একটা সুবিশাল পানশালা প্রথম নজরে পড়লো। বার-এর বৈদ্যুতিক আলোকিত সাইনবোর্ড এই ভোরবেলাতেও নির্লজ্জভাবে জ্বলছে।

ঘুরে ফিরে আবার যেন সাডার স্ট্রীটেই পড়া গেলো। তারপর সরু রাস্তা বেয়ে বিরাট এক বাড়ির সামনে আচমকা হাজির হলাম। বাহন থামিয়ে রিকশওয়ালা ঘোষণা করলো 'ঠাকুরে' ম্যানসন এসে গিয়েছে।

এক, দুই, তিন, চার, বিরাট ম্যানসনের চারটা তলা গুণে ফেললাম। গেটের কাছে এসে প্রথমেই নজর পড়লো এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তির দিকে:

বিল মারিও না।
প্রস্রাব করিও না।
নো থরোফেয়ার।

শেষের লাইনটি অপেক্ষাকৃত বড় বড় অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। যদিও এর অর্থ ঠিক আমার হৃদয়ংগম হলো না।

গেটের ভিতর একটা খাটিয়ায় রাতডিউটির দারোয়ানজী তখনও চোখ বন্ধ করে শুয়ে আরাম করছেন এবং একটি এগারো-বারো বছরের নিষ্ঠাবান বালক দারোয়ানজীর পদসেবায় ব্যস্ত রয়েছে। রিকশর ঠুন-ঠুন আওয়াজে শয্যাশায়ী দ্বাররক্ষী ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আড়মোড়া ভেঙে পাশ-ফিরে ছোকরাটিকে হুকুম করলেনঃ "আচ্ছাসে লাগাও।"

ছোকরাটি দ্বিগুণ উৎসাহে সেই হুকুম তামিলের জন্যে লেগে পড়লো।

রিকশর ওপর মালপত্র রেখে একবার অন্তঃপুরে খোঁজ করে আসবো কিনা ভাবছি। আমার দোনো-মনো ভাব লক্ষ্য করে রিকশওয়ালা রীতিমত অধৈর্য হয়ে উঠলো। জানতে চাইলো, কাকে খুঁজছি আমি? রিকশওয়ালার সন্দেহ, আমি এ-বাড়ির কাউকেই জানি না, স্রেফ কোনো সাময়িক ধর্মশালার খোঁজ করছি। আমি তখনও সোজাসুজি কোনো উত্তর দিতে পারছি না দেখে সায়েবপাড়ার মেজাজী রিকশওয়ালা এবার খাটিতি তার প্রাপ্য পাঁচ সিকে দাবি করে বসলো। অগত্যা গেটের কাছেই মাল নামিয়ে রিকশ বিদায়ের ব্যবস্থা করা গেলো।

এমন সময় আধ-ময়লা হাফ-শার্ট ও হাফ-প্যান্টপরা এক ভদ্রলোককে গেটের কাছে দেখতে পেলাম। টাকমাথা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরছেন। সাতসকালে অপরিচিত বঙ্গ-সন্তান দেখেই ভদ্রলোক উৎসুক হয়ে উঠলেন। আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কোত্থেকে আসছেন? কাকে খুঁজছেন?"

বিডন স্ট্রীটের বিলাসিনী দেবীর কাছ থেকে আসছি এবং সরকার-বাবুর খোঁজ করছি শুনেই ভদ্রলোকের কাছে আমার পরিচয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। বিনয়ে বিগলিত হয়ে ভদ্রলোক আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, "আসুন, আসুন। আপনিই তো শংকরবাবু। কাল রাত্রেই আপনার সম্বন্ধে কী সব যেন শুনছিলাম—কিন্তু এতো সকালে আপনি এসে পড়বেন আমরা ভাবি নি।"

যথাবিহিত নমস্কারান্তে নিজের পরিচয় দিলেনঃ "আমার নাম কালিপদ বিশ্বাস। কিন্তু লোকে আমাকে তেলকালি বলে ডাকে। আপনিও আমাকে তেলকালি বলবেন, স্যার।"

চাকরিতে ঢোকবার আগেই এ-রকম রাজকীয় অভ্যর্থনা পেয়ে আমি তো তাজ্জব। তেলকালিবাবু বিরক্ত হয়ে এবার দারোয়ানের দিকে তাকালেন। চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন, "রামসিংহাসন, দেখছো কী। আমাদের নতুন সায়েব—যাঁর খবর কাল রাত্রে টেলিফোনে পেলে!"

বালক শিষ্যের পদসেবা প্রত্যাখ্যান করে রামসিংহাসনে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে আমার সামনে চলে এলো এবং একটা প্রমাণ সাইজের সেলাম ঠুকলো।

তেলকালিবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, "রামসিংহাসন চৌরাশিয়া—ওয়ান অফ আওয়ার সিনিয়র দারওয়ানস। রামসিংহাসন অথবা চৌরাশিয়া—যে কোনো নামে ওকে ডাকতে পারেন।"

রামসিংহাসন এবার জিজ্ঞেস করে বসলো, রিকশওয়ালা আমার কাছে কত "লিয়েছে?" আমি উত্তর দিতে ইতস্তত করেছিলাম। কিন্তু রামসিংহাসন নিজেই সব লক্ষ্য করেছে, "পাঁচ সিকে?" চৌরঙ্গী-সাডার স্ট্রীটের মোড় থেকে আমি রিকশ নিয়েছি কিনা জানতে চাইলো রামসিংহাসন। এবং এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্রই অকস্মাৎ সে ব্যাঘ্রবিক্রমে বেরিয়ে গেলো।

ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না। তেলকালিবাবু বললেন, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

মালপত্তর তুলতে যাচ্ছি—রামসিংহাসনের পদসেবারত ছোকরাটি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলো। আমি কিছু বলবার আগেই কোনো অদৃশ্য নির্দেশে সে আমার লাগেজ মাথায় তুলে ফেললো। সিমেণ্ট বাঁধানো পথ ধরে আমরা কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি এমন সময় রামসিংহাসন বীরবিক্রমে সেই রিকশ-ওয়ালাকে বন্দী করে আমার সামনে হাজির হলো।

বামাল ধরা পড়লে চোরেরও এমন শোচনীয় অবস্থা হয় না! অপরাধী রিকশওয়ালা মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—আমি যেন থানার দোর্দণ্ড প্রতাপ বড়বাবু। রামসিংহাসন হুঙ্কার ছেড়ে যা বললো, তার অর্থ দাঁড়ায়ঃ 'ওরে ব্যাটা পাষণ্ড তোর পাপের পাত্র পূর্ণ হতে আর দেরি নেই। তুই মরাসোসাইটির সামনে থেকে এইটুকু আসবার জন্যে আমার সায়েবের কাছ থেকে পাঁচ সিকে আদায় করেছিস!'

রামসিংহাসনের জেরাতে আরও খবর বেরিয়েছে। নতুন আদমী দেখে রিকশওয়ালা সোজা পথে না-এসে আমাকে বেশ কিছুটা ঘুরিয়ে ঠাকুরে ম্যানসনে এনেছে। "কাকে তুই ঘুরিয়ে নাক দেখিয়েছিস!" রামসিংহাসন আবার হুংকার ছাড়লো।

সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলো রিকশওয়ালা। করজোড়ে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে বললো, "হুজুর, আর কখনও এমন হবে না। আমি লোক চিনতে পারি নি।"

শুরুতেই এমন অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়বার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার। রিকশওয়ালাকে বিদায় করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মালপত্র পিছনে রেখে আমি কালিপদ বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুরে ম্যানসনের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই রামসিংহাসন আবার ছুটে এলো। "আপকা রুপীয়া হুজুর", বলে এক টাকার নোট ফিরিয়ে দিলো। পাঁচসিকের মধ্যে রিকশওয়ালার কাছ থেকে একটাকা উদ্ধার করে রামসিংহাসন আমাকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিলো।

আজ এই ভোরবেলায় আমার অন্ধকার জীবনে আশার সূর্য আবার উঁকি মারছে। এই মুহূর্তে রিকশওয়ালাকে বাড়তি কিছু পয়সা দিয়ে আমি নিজেও কিছু বাড়তি আনন্দ উপভোগ করতে চাই। কিন্তু রামসিংহাসন আমাকে ভুল বুঝলো। ভাবলো, রিকশওয়ালাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা না দেওয়ায় আমি এখনও কর্তব্যরত দারোয়ানের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারি নি! রামসিংহাসন এবার যা বললো তার অর্থঃ "নমকহারাম বলতে যা বোঝায়, রিকশওয়ালা তাই। আমাদের এখনেই সিঁড়ির তলায় ওর কম্বল থাকে। আজই.. ।"

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আমি যেন কেউকেটা হয়ে গিয়েছি। যার মাথা গুঁজবার আশ্রয় ছিল না সে যেন কোন যাদু বলে হঠাৎ একজন কর্তা-ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে! অনভ্যস্ত এই অভিজ্ঞতায় রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছি। হাফ-প্যাণ্টপরা তেলকালিবাবু তখনকার মতো আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। রামসিংহাসনকে বললেন, "সায়েব পরে এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। এখন রিকশওয়ালার বিরুদ্ধে অন্য কোনো স্টেপ নিতে হবে না।"

সমস্যার ফয়সালা সঙ্গে-সঙ্গে না করতে পেরে রামসিংহাসন একটু যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো।

তেলকালিবাবু বললেন, "তা হলে, স্যর সরকার মশায়কে ডেকে পাঠাই।"

এ-বাড়ির সরকারবাবুর কাছে লেখা চিঠি হাতে করেই আমি এখানে এসেছি। প্রথমে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সরকারবাবুকে ডেকে পাঠাবার প্রস্তাবটা আমার ভাল লাগলো না। আমি নিজেই তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করতে চাই।

তেলকালিবাবু বললেন, "তা হলে, আসুন।"

বহু কালের পুরনো এক পিতামহী লিফটের দরজা খুলে তেলকালিবাবু আমাকে ভিতরে ডাকলেন। কোলাপসিব্‌ল্ গেট টেনে বন্ধ করে তেলকালিবাবু লিফটের হাতল ঘুরিয়ে দিলেন। লিফট্ তখনও ঘুমিয়ে আছে—একবার হাতল ঘুরিয়ে তাকে জাগানো গেলো না। অপ্রস্তুত

তেলকালিবাবু আবার হাতল ঘোরাতে ক্যাঁচ—ক্যাঁচ করে আওয়াজ হলো।

"মাগীর তেল খাবার ইচ্ছে হয়েছে!" তেলকালিবাবু নিজের মনে আচমকা কটু মন্তব্য করে হঠাৎ আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হলেন। জিভ কেটে লজ্জিতভাবে ক্ষমা চাইলেন, "কিছু মনে করবেন না! বাপ-মা তুলে গালাগালি না-করলে এসব যন্তরপাতি কাজ করে না। ঘোর কলিকাল তো।"

মেজাজী লিফট্ এবার সত্যিই চলমান হয়েছে। এই অন্ধকার খাঁচার বাক্সর মধ্যে বিরাট একটা আয়না আছে। আর আছে বিচিত্র এক গন্ধ—এ-ধরনের গন্ধ রিপন স্ট্রীট, রয়েড স্কুল, টোটী লেন অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও বোধ হয় পাওয়া যায় না।

লিফটের যন্ত্রপাতির সঙ্গে তেলকালিবাবুর যে বিশেষ ভাব-ভালোবাসা আছে তা ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী থেকে বুঝতে পারছি! পকেট থেকে রুমাল বের করে ড্রাইভিং যন্ত্রের পিতলের নব্‌টা আদর করে মুছে দিলেন। আমাকে বললেন, "খোদ সায়েব পাড়ার কলকব্জা তো! সব সময় সাজুগুজু করে ফিটফাট থাকতে চায়।"

অন্য কোথাও এ ধরনের কথা শুনলে আমি অবশ্যই হেসে উঠতাম। কিন্তু নতুন এই পরিবেশে কথাগুলো বিশ্বাস করতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। মানুষের মতো, কলকব্জাও যে সায়েব-মেম হতে পারে, তাদের যে সায়েবী মেজাজ থাকতে পারে তা অনুমান করতে পারছি।

তিন তলায় লিফট্ শেষ হলো। এর ওপরের তলাটা হেঁটে উঠতে হবে। পথপ্রদর্শক তেলকালিবাবু বললেন, "বাড়ির ডিজাইন এমন যে চার তলায় লিফট্ বসানো গেলো না। তিন তলায় এসেই কাজ শেষ। এর পর সিঁড়ি ভাঙা ছাড়া গতি নেই।"

চারতলার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে তেলকালিবাবু সরকারমশায়ের খোঁজে ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এসে বললেন, "ব্যাড লাক, স্যার। সরকারমশায় এই মাত্র পুজোয় বসেছেন।"

এর মধ্যে ব্যাড লাকের কী থাকতে পারে? একজন ধর্মপ্রাণ ভদ্রলোকের অবশ্যই সকালবেলায় পুজো-অর্চনায় বসবার অধিকার আছে। তা ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।

তেলকালিবাবু পকেট থেকে রুমালের খুঁটে-বাঁধা ঘড়িটা বার করে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, "দ্যাট মিনস, ফেস রাউনড—অর্থাৎ কিনা গণ্ড-গোল! দুটি ঘণ্টা খরচের খাতায়। উনি এখন নট নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু।"

তেলকালিবাবু আমাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "কিছু মনে করবেন না। এই পুজোর সময় সরকারমশায়ের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। পাছে আমরা জ্বালাতন করি বলে আজকাল ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন। ঘণ্টার আওয়াজ এবং ভারী ভারী মন্তর দরজায় কান পেতে শুনে আমাদের বুঝতে হয় সরকারমশায় পুজোয় বসেছেন।

তেলকালিবাবু এবার দ্রুতবেগে বেরিয়ে গিয়ে কোথা থেকে একটা কাপে চা নিয়ে এলেন। সামনে চা এগিয়ে দিয়ে সলজ্জভাবে বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যার—ঘরে যে-ক'টা কাপ আছে সবগুলো ফাটা।"

"কাঁচের জিনিস—যতই সাবধানে রাখুন ফাটতে পারে", আমি ব্যাপারটা

সহজ করবার জন্যে মতামত দিলাম।

তেলকালিবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কেন মিথ্যে বলবো—কাপের কোন দোষ নেই। এখানে এসে ফাটে নি। ত্যাড়া-বাঁকা-ফাটা অবস্থাতেই আমার ঘরে এসেছে। যত কম দামে পাওয়া যায়, বুঝছেনই তো।"

চা-পর্ব শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখলাম। পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে নিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "আমার সাহস নেই—রামসিংহাসনকে একবার সরকারমশায়ের কাছে পাঠাবো না কি?"

রামসিংহাসনকে পাঠানো চলে, অথচ তেলকালিবাবু নিজে যেতে চান না কেন? ভদ্রলোকের নিজের কথাতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। বললেন, "নামে কালী, কিন্তু জাতে খ্রীস্টান। সাহস হয় না—কখন সরকারমশায়ের কোন পুজো ভণ্ডুল হয়ে যায়। তাই ওঁর পুজো-আচ্চার সময়টা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি।"

তেলকালিবাবু বললেন, "এখানে মোর দ্যান ওয়ান কালী পাবেন। পাম্পিং হাউস, মোটর, লিফটের মেরামতি এই সব আমি দেখি। অয়েলিং ক্লিনিং-এর কাজটা বেশী বলে সবাই আমাকে তেলকালি বলে ডাকে। জলের কল এবং প্লামবিং-এর কাজ করে আর একজন কালি—স্বয়ং কালিদাস। গোড়ায় গোড়ায় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চড়ে বসতো—ভাড়াটে খবর দিলো কালিকে এখনই ডাকো। আমি তেলকালি অন্য কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে দেখি—জলের কল খারাপ হয়েছে, ভদ্রলোক আসলে অন্য কালিকে ডেকেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত সরকারমশায় নিজেই ভেবে চিন্তে আমাদের আলাদা নাম করে দিলেন। আমি তেলকালি, আর কলের মিস্ত্রি কালিদাস হলো কলকালি। আমাদের এক সুইপার আছে, কপালের চার ইঞ্চি অপারেশনের দাগ, মাথা ফেটে গিয়েছিল। তার নাম ফাটাকালি।"

কোনোরকমে হাসি চাপলাম। তেলকালিবাবু বললেন, "কালিতে কালিতে কালিঘাট। আর এক ব্যাটা কালী কয়েক দিনের জন্যে টেম্পোরারি দারোয়ান হয়ে এসেছিল। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম—রক্ষেকালী। সেই শুনে সরকারমশায়ের কী রাগ! বললেন, মায়ের নাম নিয়ে রসিকতা চলবে না।" দারোয়ানের কাজই তো রক্ষে করা—আপনি বলুন তার নাম যদি কালী হয়—তা হলে তাকে রক্ষেকালী বললে কী দোষ হয় কে জানে। সরকারমশায় এমন রেগে গেলেন যে প্রথম চান্সে দারোয়ান কালীকে বিডন স্ট্রীটে বদলী করিয়ে দিলেন। বললেন, তিন কালিতে আমি ভিরমী খাচ্ছি—আর চতুর্থ কালিতে দরকার নেই।"

তেলকালিবাবুর কাজকর্ম হয়তো আমার জন্যেই আটকে যাচ্ছে। বললুম, "আমার জন্যে আপনি নিজের সময় নষ্ট করবেন না, কালিবাবু।"

তেলকালিবাবু বললেন, "তাহলে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি উঠি। দু'খানা মেশিনকে উপোস করিয়ে রেখে এসেছি—আজ একটু তেল খাওয়াবো। সব মেম-মেসিন তো! ভীষণ খেয়ালী আর মেজাজী—যার তার হাতে তেল খেতে দিলেই বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তেল খাওয়াবার সময় কিছু বুঝতে পারবেন না। কিন্তু চালু করবার সময় দেখবেন মেমসায়েব বিগড়ে বসে আছেন—দিদিমণিকে বাগে আনতে এই কালিপদ বিশ্বাসের তখন নাকের জল চোখের জল এক হবে।"

লম্বা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেওয়ার আগে তেলকালিবাবু ঘরের পাখা

খুলে দিলেন। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। এখনও আমি চাকরিতে যোগ দিই নি—তবু বেশ কিছুটা নিরাপত্তা অনুভব করছি। অপরিচিতজনদের কৃপাভিক্ষা করতে-করতে আমিই যে হঠাৎ পাকে-চক্রে কিছু লোকের সেলামের পাত্র হয়ে উঠেছি তা চোখ বুজে ভাবতে মন্দ লাগছে না। এই নিশ্চিন্ত পরিবেশে হয়তো গতরাত্রের ঘাটতি ঘুমের শোধ তুলে নেওয়া যেতো। কিন্তু মাথার ওপর কালো রংয়ের বিরাট সাইজের কিং-কং পাখা বিকট শব্দ তুলে তার খিট-খিটে মেজাজের পাবলিসিটি শুরু করেছে। মেজাজী পাখাটা ঠিক মাথার ওপর যেভাবে দুলছে তাতেও আমার মাথা ব্যথার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তেলকালিবাবু মধ্যিখানে একবার খবর নিয়ে গেলেন আমার কোন অসুবিধা ঘটছে কিনা। আমার নজর ঊর্ধ্বমুখী দেখে তেলকালিবাবু বেশ সন্তুষ্ট হলেন।

বিশেষ গর্বের সঙ্গে বললেন, "পাখা দেখছেন! দেখবারই জিনিস। খোদ পঞ্চম জর্জের আমলে তৈরি। মেড-ইন-ইংল্যান্ড। এসব অরিজিন্যাল জিনিস এখন খোদ বিলেতেও পাবেন না, স্যার—যেমন দম তেমন গতর এই সব পাখার। এখন এই একখানা পাখার মাল ভেঙে দশখানা পাখা তৈরি হচ্ছে ; বডিতে কিছুই থাকে না—ঠিক আজকালকার মেয়েমানুষের মতো, দেখতে-শুনতে খুব ঝকঝকে চকচকে, কিন্তু দম নেই, লংসার্ভিস দেবার মতো শরীরও নেই!"।

তেলকালিবাবুর এই আধুনিকাবিদ্বেষ থেকে বুঝতে পারছি না ভদ্রলোক বিবাহিত না ব্যাচেলর! কিন্তু মাথার ওপর ওই বিপুলাঙ্গিনীর হাবভাব আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। অভিজ্ঞ তেলকালিবাবু পাখার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসলেন। তারপর জানালেন, "কিছুই হয় নি—শুধু একটু তেল খাবার ইচ্ছে হয়েছে। অয়েলিং না করলে এসব যন্তরের মেজাজ বিগড়ে থাকে—কখন যে কী করে বসবে বোঝা যায় না।"

তেলকালিবাবু বিদায় নেওয়া মাত্রই আমি উঠে পড়ে ফ্যানটা বন্ধ করবার জন্যে রেগুলেটরটা 'অফ'-এর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। কিন্তু তাতে উল্টো ফল হলো—বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা ভূতুড়ে ফ্যানটা এবার টাইফুনের বেগে বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগলো। সেই সঙ্গে আড়াইমণি ফ্যান হেলে-দুলে নাচছে এবং কসাইখানার পশুর মতো বিকট আওয়াজ তুলছে। রেগুলেটরকে এবার দ্রুত পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে আনলাম—তারপর পুরো 'অন'-এর দিকে ঠেলে দিতে হস্তিনী সাইজের পাখাটা তার নৃত্য বন্ধ করে গুম হয়ে থমকে দাঁড়ালো।

এক অপরিচিত বালক এই সময় ঘরে ঢুকে পড়ে আমাকে দেখে গেলো। পাখার ব্যাপারে আমার পক্ষপাতিত্ব তার নজর এড়ালো না। সে ফিক করে হেসে জানতে চাইলো, "তেলকালিবাবুকে ডাকবো?" না, ওঁকে বার বার ডাকাডাকি করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া পাগলা হস্তিনীকে সাময়িকভাবে অকেজো করা গিয়েছে। ছেলেটি এবার যা বললো তার অর্থ: "জ্বালবার দরকার হলে নিভোবেন—নেভাবার দরকার হলে জ্বালবেন।"

এ-বাড়ির এমনই নিয়ম নাকি? উল্টো পুরাণের রাজত্বেই তো এরকম হয়ে থাকে জানতাম। ছেলেটি ভাবলো আমি তার কথা বুঝতে পারছি না। তাই আবার ব্যাখ্যা করলো, "খুলতে হলে বন্ধ করবেন, বন্ধ করতে হলে খুলবেন। বুঝলেন?" না-বুঝে আমার গতি কী? তাই হাসিমুখে 'হাঁ'

বললাম।

ছেলেটি সুসংবাদ দিলো, সরকারমশায়ের পুজো শেষ হয়েছে। এখন প্রসাদ দিচ্ছেন। ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, "আপনি একটু চা খাবেন?"

না, আর চায়ের প্রয়োজন নেই। ঠাকুরে ম্যানসনের সরকারমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটাই এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ। আমার পকেটের চিঠিখানা ওঁর হাতে তুলে না-দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছে না।

এমন সময় বাইরে খট-খট আওয়াজ হলো। কেউ যেন কাঠের খড়ম পরে বেশ দ্রুতগতিতে এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছেন।

সশব্দ খড়মের মালিক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো।

তেল-চকচকে পাকা সোনালী বাঁশের মতো মেদমুক্ত ঋজু দেহ। সাধারণ বাঙালীর থেকে সামান্য ছোট চেহারা বলা যেতে পারে। অন্তত দিন তিনেকের সাদা-পাকা দাড়ি মুখের সর্বত্র ক্ষৌরকর্মের অপেক্ষায় রয়েছে। নাকটা একটু চাপা, ওপরের ঠোঁটের তুলনায় নিচের ঠোঁট একটু বেরিয়ে এলেও বেশ প্রসন্ন স্নিগ্ধ চেহারা।

অনেকদিনের পুরনো একটা সরু ফ্রেমের গোল্ড-প্লেটেড পাকানো চশমা পরেছেন ভদ্রলোক। সেই চশমার দুটো বাই-ফোকাল নীলাভ কাঁচের মধ্য দিয়ে খড়মের মালিক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমার দৃষ্টি কোন সময়ে ওঁর মাথার দিকে চলে গিয়েছে নিজেই খেয়াল করি নি। সৌজন্য বিনিময়ের জন্যে তৈরি হচ্ছি, কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় প্রশ্নবান ছুঁড়লেন, "মাথার দিকে তাকিয়ে দেখছেন কী! চুল একদিন আমারও ছিল—আপনার মতোই একখানা সুন্দরবনের জংগল মাথায় বয়ে বেড়াতাম। নাপিতরা কাঁচি ধরবার আগে ডবল পয়সা চাইতো। কিন্তু এই ঠাকুরে ম্যানসনের ঝামেলায় সব চুল গিয়েছে। যে কটি অবশিষ্ট আছে তাও এবার যাবে।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে নিলাম।

আমি ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে পকেট থেকে চিঠি বার করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি কোনো আগ্রহ দেখালেন না। বললেন, "আসুন, আসুন—অত তড়িঘড়ির কী আছে? পেটের ছেলে তো পড়ে যাচ্ছে না! আগে একটু পুজোর প্রসাদ আর ঠাকুরের চরণামৃত নিন।"

ভদ্রলোকের হাতের বারকোশটা এবার ভালভাবে নজরে পড়লো। ডান হাতে সামান্য চরণামৃত ঢেলে দিলেন। সাবধানে কপালে ঠেকিয়ে গঙ্গোদক সেবন করে নিলাম। তারপর ভক্তিভরে কয়েক টুকরো কলা ও পেয়ারার কুচি প্রসাদ গ্রহণ করলাম।

ভদ্রলোক এবার ব্যস্তভাবে বিদায় নেবার আগে বললেন, "একটু বসুন—আমি তেলকালি বিশ্বাসকে একটু পেসাদ খাইয়ে আসি। কয়েকবার ঘুর-ঘুর করে গিয়েছে। খেস্টান মানুষ—মায়ের পা-ধোয়া জলটা ওকে দিই না, কিন্তু পেসাদ পেতে খুব ভালবাসে।"

ব্যাপারটায় আমি বেশ মজা অনুভব করছি। ভদ্রলোক বোধহয় আমার মনোভাব অনুমোদন করলেন না। বললেন, "তেলকালি অধার্মিক নয়। ডিসেম্বর মাসে ওদের দুর্গাপুজোর সময় মস্ত বড় কেক-প্রসাদ সবাইকে খাওয়ায়।"

ডিসেম্বরে আবার দুর্গাপুজো কোথায়! বললাম, "আপনি ক্রিস্টমাসের

কথা বলছেন?”

“ওই হলো। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। ডিসেম্বর মাসেই ওদের দুর্গা পুজো—তেলকালি বিশ্বাস নতুন জামা-কাপড় কেনে, ওই সময় খুব ভক্তি-ভরে পুজো-আচ্চা করে, আমাদের জন্যে কেক পেসাদ আনে।”

তেলকালির সন্ধানে বারকোশ হাতে ভদ্রলোক এবার বিদায় নিলেন। আমি তাঁর ধুতিপরা দেহের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

মিনিট পনেরো পরে সরকারমশাই ফিরে এলেন। এবার খড়মের খট-খট শব্দ নেই। সরকারমশাই এখন কালো ক্যাম্বিসের নিউকাট, রাবারসোল জুতো পরেছেন, গায়ে চড়িয়েছেন হাফসার্ট। প্রসাদের বারকোশও ইতিমধ্যে যথাস্থানে রেখে এসেছেন।

“ভেরি স্যরি, অনেক লেট করে ফেললাম”, এই বলতে-বলতে ভদ্রলোক এবার আমার মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

আমার নাম বললাম তাঁকে। নাম শুনে সরকারমশাই নমস্কার করে বলেন, “ভোলা শঙ্কর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। আপনার কীসের চিন্তা?”

আমি এবার পকেট থেকে খামখানা বার করবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। সরকারমশাই তখনও খুব কাছে সরে এসে আমার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখছেন। আমাকে অপ্রস্তুত হতে দেখেও তাঁর খেয়াল নেই।

ভদ্রলোক যে এতোক্ষণ আমার মুখচন্দ্রে তিল সন্ধান করছেন তা একটু পরেই বুঝতে পারলাম। বেশ অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার নিশ্চয় কোনো দুঃখ নেই।”

প্রথম পরিচয়েই সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ তোলার কোনো মানে হয় না। তাই কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে হাসলাম। চশমার মধ্য দিয়ে ভদ্রলোক আর একবার তিলের খোঁজ করলেন। তারপর বললেন, “ললাটের দক্ষিণ পাশে নাকের ওপর তিলটি নতুন না পুরনো?”

তিলতত্ত্ব নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাই নি। ভদ্রলোক বকুনি লাগালেন, “অবহেলার জিনিস নয় মশাই। তিল থেকেই তাল হয়। যথাস্থানে ছোট ওই ফুলস্টপের দাম কত জানেন?”

আমি তখনও চুপ করে বসে আছি। সরকারমশাই ঘোষণা করলেন, “আপনি ভাগ্যবান লোক। আপনার দৈবধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।”

মনে মনে হেসে নিলাম। ফুটপাথের টাইপিস্টের যশোলাভ সম্ভাবনা থাকবে না তো কার থাকবে!

সরকারমশাই বললেন, “আপনারা আধুনিক শিক্ষিত—হয়তো এসব বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আমারও একটা তিল আছে। কোথায় বলুন তো?”

শরীরটা এগিয়ে দিয়ে, ও'র মুখের তিল খুঁজতে আমাকে বাধ্য করলেন। অবশেষে তিল খুঁজে পেলাম। সরকারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায়?”

“ভ্রূ-এর নিচে মনে হচ্ছে।”

“নজর আপনার ভালই” সার্টিফিকেট দিলেন সরকারমশাই। “ভ্রূ-নিম্নস্থ তিলের অর্থ কী জানেন?”

আমি কোত্থেকে জানবো? এসব ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। সরকারমশাই বললেন, “আজন্ম দুঃখের শীলমোহর ওই তিলটা।” এবার হা-হা করে হাসতে লাগলেন তিনি।

আমি পকেট থেকে চিঠিটা বার করলাম। বিলাসিনী দেবীর এই নির্দেশনামা তাঁর হাতে তুলে দেবার নির্দেশ পেয়েছিলাম। এই চিঠিতে পত্রবাহকের কিছু পরিচয় আছে এবং তারপর লেখা আছে 'উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট' পত্রবাহককে ম্যানসনের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছে। নতুন ম্যানেজারকে সব রকম সহযোগিতা দেবারও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গত রাত্রে টেলিফোনে যে আগাম খবর এসেছিল, তার সঙ্গে এই চিঠির বোধহয় পুরোপুরি মিল হচ্ছে না। মুখের খবর থেকে বরদাপ্রসন্ন হালদার হয়তো আন্দাজ করেছিলেন, আরও একজন কালেকশন সরকারকে এই ম্যানসনে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু সম্পত্তির সর্বময় কর্ত্রীর দস্তখত থেকে সোজাসুজি জানা যাচ্ছে, আমিই এখন থেকে এই ম্যানসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবো।

চিঠি পড়তে পড়তেই বরদাবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে আমাকে নমস্কার জানালেন। তাঁর মনের অবস্থা কীরকম হচ্ছে তাও আন্দাজ করতে পারছি না। উড়ে এসে ঘাড়ের ওপর জুড়ে বসবার জন্যে তিনি যে আমার ওপর বিরক্ত হবেন এমন আশঙ্কা করছি।

বরদাপ্রসন্নর মুখ কিন্তু একটুও অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো না।

বললেন, "আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো এবার। ছাগল দিয়ে এঁরা এতোদিন ধান মাড়াচ্ছিলেন। আমি অর্ডিনারি কালেকশন সরকার, লেখাপড়া তেমন নেই আমার। আমি এই ম্যানসনের চাকরিতে হিমসিম খাচ্ছি, আর সুযোগ পেলেই মা-ঠাকরুনের কাছে দরবার করছি—একটা বিহিত করুন।"

বরদাবাবু এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁকে জোর করে বসালাম। বললাম, "আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

আমার কথায় বরদাপ্রসন্ন হালদার সন্তুষ্ট হলেন বোধ হয়। চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বললেন, "অনেক কথা আছে—সেসব বলতে-বলতে মহাভারত হয়ে যাবে। তার আগে আপনার থাকার একটা ব্যবস্থা করি। লাগেজগুলো তখন থেকে মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে।"

থাকার ব্যাপারে আমি নিরুত্তর। এখানে চাকরি করে অন্য কোথাও থাকবার মতো আর্থিক সংগতি আমার এখনও নেই। গণপতিবাবু সেই কথাটাই বিলাসিনী দেবীকে অন্যভাবে বুঝিয়ে এসেছেন। বলেছেন. "আমরা খুব লাকি -শংকরবাবু ওই বাড়িতেই থাকতে রাজী হয়েছেন। ঠাকুরে ম্যানসনের যা অবস্থা তাতে ম্যানেজারের সারাক্ষণ উপস্থিতি আপনাদের খুবই কাজে লাগবে।"

বরদাবাবু বললেন, "যদি কিছু না মনে করেন, স্যার।"

বেকার অবস্থা থেকে সাকার হয়েই 'স্যার' কথাটা কানে যেন মধুবর্ষণ করলো। কিন্তু এই বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ ভদ্রলোকের মুখে স্যার শব্দটা শুনতে ভাল লাগছে না। বরদাবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "আপনার মনে যখন যা আসবে তা আমাকে নির্দ্বিধায় বলবেন—কখনও অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আর দয়া করে ওই স্যার কথাটা বলবেন না।

বরদাপ্রসন্ন হালদার খুশী হলেন। ধুতির খুঁটে টাকের ওপর জমে-ওঠা ঘামের বিন্দুগুলো মুছে ফেলে বললেন, "বেশ! এক ঢিলে দু'পাখি মারার ইচ্ছে হলে আপনার পৈতৃক নাম ব্যবহার করবো—ভগবানের নামও হবে,

আপিসের কাজও হবে। তবে মাঝে-মাঝে আপনাকে 'স্যার' বলবো, যাতে সম্পর্কটা ভুলে না যাই।"

এবার হাসতে হাসতে বরদাবাবু হাত ধরে টানলেন, "চলুন শংকরবাবু, আপনার থাকবার একটা ব্যবস্থা করা যাক।"

একবার বলতে গেলাম, ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে কর্মজীবনে ওই ছোট্ট নামটুকু চালু করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এক আশ্চর্য ইংরেজ। বিরাট এই বিশ্বের চাবি আচমকা আমার জন্যে খুলে দিয়ে তিনিই চিরতরে বিদায় নিলেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে আমাকে এইভাবে পথে-পথে ঘুরতে হতো না।

বলতে গিয়েও কিন্তু এসব বলা হলো না। কি জানি, সামান্য সময়ের পরিচয়—আমার সুখ-দুঃখের কথা শোনবার আগ্রহ এঁর নাও থাকতে পারে।

•

ঘরের একটা ব্যবস্থা হলো। চারতলার এই ঘরখানা ছোট হলেও সুন্দর। ঘরের মধ্যিখানে একখানা খাট দেখে আমি অবাক হলাম।

আমাকে আধঘণ্টা বিশ্রাম নেবার সময় দিয়ে বরদাবাবু কেটে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, "আপনার ঘর-সংসার ছড়িয়ে বসুন, আমি দু-একটা কাজ ঝপ করে সেরে নিয়ে ফিরে আসছি।"

খাটের ওপর আমার কম্বল ও চাদর বিছিয়ে দিলাম। বহু ব্যবহারে মলিন ও শিথিল বালিশখানা তার ওপর রেখে শরীরটা বিছানায় ছড়িয়ে দিলাম। নতুন এক আনন্দের অনুভূতিতে সমস্ত শরীর শির-শির করছে।

এখন আমি আর তা হলে বেকার নই। অবশেষে আমার একটা চাকরি জুটেছে। দু'জন বয়োজ্যেষ্ঠ ইতিমধ্যেই আমাকে স্যার বলেছেন। এখন আমি নিরাশ্রয়ও নই। বিলিতী পাড়ার সায়েবী ম্যানসনে আমার নিজস্ব একটা আশ্রয় জুটেছে। চারতলায় উঁচু এই ঘরের প্রশস্ত জানালা দিয়ে আমি রাজপথের অনেকখানি দেখতে পাচ্ছি।

জামা খুলে পা-ছড়িয়ে আরও আরাম করবার আগে ভাগ্যের দেবতাকে স্মরণ করলাম। বললাম, "তোমার মনে এবার কী খেলা খেলবার ইচ্ছা আছে জানি না। তবু এই আনন্দের মুহূর্তে তোমাকেই প্রণাম করি।"

গণপতিবাবুর মুখটাও চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কিন্তু তিনি নিজে বারবার বলে দিয়েছেন, "আমার সঙ্গে যে তোমার জানাশোনা আছে তা যেন মোটেই প্রচার না হয়।"

•

সায়েবপাড়ার রাজপথ দিয়ে এখন রীতিমত লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে। উঁচু তলার নিরাপদ দূরত্ব থেকে আমি নিচু তলার জীবন দেখতে পাচ্ছি। কয়েকজন পথচারীর উদ্দেশ্যহীন হাঁটার কায়দা থেকে মনে হচ্ছে, তারাও আমারই মতো কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। রবিবারের এই প্রসন্ন প্রভাতে পৃথিবীর সব মানুষকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। এই ভুবনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার আমার ওপর থাকলে, আমি কাউকে কর্মহীন রাখতাম না। পৃথিবীর পথে-পথে অনেক ঘুরে-ঘুরে অনেক অবহেলা-অপমানের বোঝা কুড়িয়ে আমি জেনেছি বেকারত্ব বিষের জ্বালা কী।

মধ্যাদিনে ঘুমিয়ে পড়বার অভ্যাস নেই আমার। কিন্তু অনেক পথ হেঁটে অবশেষে একখানা মাথা গুঁজবার ঘব খুঁজে পেয়ে, আমার রণক্লান্ত দেহ এবার

বিশ্রামবিলাসী হতে চাইছে। কিছুক্ষণের জন্য বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চটকা ভেঙে গেলো। ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখলাম নতুন চাকরির নতুন ঘরে আমি বহাল তবিয়তে রয়েছি। বরদাপ্রসন্ন হালদার তাঁর কাজকর্ম সেরে আমার ঘরে ফিরে এসে আমাকে ঘুমন্ত দেখে চুপচাপ বসে আছেন।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, "আমাকে ডাকলেন না কেন?"

বরদাপ্রসন্ন হেসে উত্তর দিলেন, "সাত রাজার ধন এক মানিক এই ঘুম। সমস্ত রাত ধরে কত সাধ্য-সাধনা করি এক ফোঁটা ঘুমের জন্যে। শুধু-শুধু ঘুমন্ত মানুষকে খোঁচা দিয়ে জাগানো মহাপাপ।"

বরদাপ্রসন্নর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হাসলাম। তারপর লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিলাম। প্যানের ফ্লাশ টানবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঢক-ঢক আওয়াজ ছাড়া কিছুই হলো না। বাথরুমে আমার বিপদ বুঝতে বরদাপ্রসন্নের দেরি হলো না। তিনি চীৎকার করে পরামর্শ দিলেন, "এখন বেসিন থেকে জল নিয়ে ঢেলে দিন। প্লাম্বার কলকালিকে খবর পাঠাচ্ছি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বরদাপ্রসন্ন বললেন, "বোতাম টিপলেই আলো, কল টিপলেই জল, চেন টানলেই বান—এসব সুখ এই পৃথিবী থেকে ক্রমশই উবে যাচ্ছে মিস্টার শংকর। হাতের গোড়ায় তেলকালি ও কলকালি না-থাকলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি।"

চোখে অন্ধকার দেখবারই কথা। বাথরুমের কমোড কাজ না-করলে রীতিমত এমার্জেন্সি অবস্থা। বরদাপ্রসন্ন এবার ফিস-ফিস করে বললেন, "যা-সব হাড়হারামজাদা যন্তরপাতি এই বাড়ির। আপনাকে-আমাকে দেখে বিগড়ে বসে রইলো—শত টানেও সাড়া দিলো না; আর যেমনি কলকালি আসবে অমনি হাত তুলবার আগে সুড়-সুড় করে বন্যা বইয়ে দেবে। মিস্তিরি আপনাকে মিষ্টি-মিষ্টি করে দু'চার কথা শুনিয়ে দেবে। বলবে, 'কই কিছুই তো হয় নি!' যেন দেঁতো কলকালির ওই ঘেমো মুখখানা দেখবার জন্যেই আপনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"কাজকর্ম বুঝে নেবেন নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার।

"হাজার হোক রবিবার ছুটির দিন। যদি কোনো অসুবিধে না থাকে আপনার।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ছুটির দিনেই তো বেশী কাজ এখানে। ক্রমশ বুঝে যাবেন।"

বরদাপ্রসন্ন শুনিয়েছিলেন, "নৃপাভিষেক, যুদ্ধযাত্রা, রাজকার্য, রাজদান এবং অগ্নিক্রিয়ার পক্ষে রবিবারই প্রশস্ত। ভানুভূসুতমন্দানাং শুভকর্মসু কেথপি," একটা লম্বা সংস্কৃত শ্লোক ভদ্রলোক গড়গড় করে আউড়ে গেলেন।

আমি এবার উঠে পড়লাম। বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, "তালা লাগালেন না?"

এর আগে কোথাও তালা লাগাতে অভ্যস্ত ছিলাম না। বরদাপ্রসন্ন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "তালা লাগিয়ে পকেটে চাবি না পুরে এখান থেকে এক-পা বেরোবেন না।" আমার সঙ্গে কোনো তালা-চাবি নেই শুনে সামনের এক সুইপারকে হাঁক ছাড়লেন, "লক্ষ্মী-সোনা আমার, যা তো আপিস থেকে একটা তালা-চাবি নিয়ে আয়। দারোয়ানকে বলিস আমি চাইছি।"

"আপিসে তালা-চাবি রাখেন বুঝি?"

আমার আনাড়ি প্রশ্নে বরদাপ্রসন্ন বোধ হয় একটু কৌতুক বোধ করলেন। বললেন, "রাখবো না? তালা-চাবিরই তো কাজ! কোন ঘরে কখন ডবল চাবি ফেলতে হবে কিসসু ঠিক নেই। চাবির গোছা দেখলে আপনার খুব আনন্দ হবে। নট্ লেস দ্যান টু-হানড্রেড ফিফটি ফাইভ চাবি আছে আমার কালেকশনে। কতরকমের সাইজ। বেঁটে মোটা চ্যাপটা লম্বা গোল—কোনোটা লোহার, কোনোটা পিতলের, কোনোটা তামার একসঙ্গে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

আমি আগ্রহের সঙ্গে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে চাবিচর্চা করছি। উৎসাহিত বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চাবি ছিল সেকালে! যেমন স্বাস্থ্য তেমন সেবা। একখানা আলীগড়ের তালা ইজিকলটু একখানা দারোয়ান! এখন যেমন যুগ তেমন চাবি! গায়ে একটু হাড়মাস নেই। চ্যাপ্টা চেহারা। দেখলে মনে হবে দুর্ভিক্ষের গোরু!"

তালাচাবি হাতে সুইপার এবার ফিরে এলো। বরদাপ্রসন্ন জিনিসটি দেখে খুব খুশী হলেন। তালাটাকে নিজেই দু'বার হাতে তুলে তারিফ করলেন। তারপর আমার দিকে চাবি-সমেত এগিয়ে দিয়ে বললেন, "একবার হাতে নিয়ে দেখুন। অলমোস্ট একসের ওজন। মেড্ ইন বার্মিংহাম একেবারে অরিজিন্যাল জিনিস। প্রত্যেক বাড়িতে এরকম একখানা তালা থাকলে, উইদিন ফিফটিন ডেজ কলকাতার সমস্ত চোর না-খেতে পেয়ে লালবাজারের সামনে মরে পড়ে থাকবে!"

চাবি-তালা লাগাবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় বরদাপ্রসন্নর নজর পড়লো ঘড়ির দিকে। সময়টা হিসেব করেই তিনি আঁতকে উঠলেন। "চাবি-তালা লাগানোর সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন কাজ শুরু করার প্রশ্নই ওঠে না।"

আবার কী হলো?

বরদাপ্রসন্ন ভক্তিভরে বললেন, "বার বেলা পড়ে গেলো। বড় ডেনজারাস জিনিস এই বারবেলা। এই সময় যাত্রা করলে মরণ, বিয়ে করলে বৈধব্য, ব্রত করলে ব্রহ্মবধ। সমস্ত শুভকর্ম নিষেধ। এবার তিনি মন্ত্র আওড়ালেন, "যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে। ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্বকর্মসু তং ত্যজেৎ॥"

বরদাপ্রসন্ন আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, "রবিবারের চতুর্থ ও পঞ্চম দিবাযামার্ধে শুভকর্ম নিষিদ্ধ।"

কাজ শুরুর প্রথমেই বাধা পড়ায় আমার ভাল লাগলো না। ঘর-পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আপনি বসুন। আমি আসছি।"

বিলাসিনী দেবীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গণপতিবাবু যখন চাকরির সুখবর দিয়েছিলেন, তখন প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলাম, কাজটা কী ধরনের? গণপতিবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "কাজ ইজ কাজ! সুশৃঙ্খল বুদ্ধিমান ব্যাটাছেলের কাছে কোনো কাজই ইমপসিব্‌ল নয়।"

বুঝতে পেরেছিলাম গণপতিবাবু আমাকে আশ্বাস ও বকুনি দুটোই একসঙ্গে দিয়েছেন। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আবার জানতে চেয়েছিলাম কাজটা কী ধরনের?

গণপতিবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "ম্যানেজারির কাজ। পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা এবং সবচেয়ে শক্ত কাজ!"

ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারি! এই ধরনের বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত আমি জীবনে ঢুকি নি। "আমার যে কোনো অভিজ্ঞতা নেই," আমি গণপতিবাবুর কাছে করুণ আবেদন জানিয়েছিলাম।

গণপতিবাবু হেসে ফেলেছিলেন। "তোমার বাবা একবার হাঁওড়া কোর্টে খুব দামী কথা শুনিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা নিয়ে পৃথিবীতে কেউ জন্মায় না। জন্মাবার সময় ভগবান যে একজোড়া চোখ, একজোড়া কান এবং একখানা মাথা দেন তা খাটিয়ে অভিজ্ঞতা জমিয়ে নিতে হয়।" গণপতিবাবু ঘাড় নাড়লেন, "মহামূল্যবান কথা। হরি উকিলের সাকরেদ হয়ে অশিক্ষিত আমি বিষয়সম্পত্তির ডাক্তারি করছি; আর তুমি তাঁর ছেলে হয়ে একখানা ছোট প্রপার্টির ম্যানেজারি করতে পারবে না!"

গণপতিবাবু সাহস জুগিয়েছিলেন, "মাথার ওপর গড্-গডেসরা রয়েছেন, হরি উকিলের রক্ত রয়েছে বডিতে—তোমার আবার চিন্তা কীসের?"

আমাকে ভবানীপুরের বাসে তুলে দেবার আগে গণপতিবাবু দ্বিতীয়বার আশ্বাস দিয়েছিলেন, "পৃথিবীতে কী এমন কাজ আছে যা পুরুষমানুষের অসাধ্য? মনের আনন্দে কাউকে তোয়াক্কা না-করে নিজের কাজটি করে যাবে—ভুল হলে ফাঁসি তো হবে না।"

শেষ কথাটা আমার কাছে এখনও মহামূল্যবান হয়ে আছে। আজও যখন সংশয়মেঘে মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশানিরাশার দুরন্ত দোলায় দুলতে থাকি, তখন গণপতিবাবুর স্নেহময় মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমি শুনতে পাই—"মনের আনন্দে নিজের কাজ করে যাও, ফাঁসি তো হবে না?"

সায়েবপাড়ায় ঠাকুরে ম্যানসনে এই মুহূর্তে অবশ্য ফাঁসির চেয়েও বড় ভয় রয়েছে—চাকরি হারিয়ে নিরাশ্রয় হবার আশঙ্কা।

বরদাপ্রসন্ন হালদার অপরাহ্ণে আমার সঙ্গে আবার দেখা করতে এলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই ক্ষমা চাইলেন বরদাপ্রসন্ন। "ডিসটার্ব করলাম না তো? রবিবারের এই সময়টা সায়েবদের কাছে বড় পবিত্র—যত রাজকাজই থাক, ওঁদের ডিসটার্ব করা চলবে না।"

"তাই বুঝি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

বরদাপ্রসন্ন চোখ বড় বড় করে শোনালেন, "এসব কি আর বই পড়ে জানা যায়। ঠেকে শিখেছি! আমাদের এখানেই এক টেনাণ্ট—অধর সায়েব। একেবারে সেণ্ট পার্সেণ্ট খাঁটি সায়েব—এক ফোঁটাও ভেজাল নেই। কিন্তু একেবারে খাঁটি বাঙালী নাম—এখানে সবাই অধর সায়েব বলে ডাকতো। অদ্ভুত এইজায়গাটি সব লোকের নাম নিয়ে এখানে টানাটানি। অ্যাডেয়ার হয়ে গেলেন অধর সায়েব!"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "লোকেরও দোষ নেই! বড্ড শক্ত-শক্ত সব উচ্চারণ তাই বাধ্য হয়ে নিজেদের সুবিধে মতো নামধাম কাটছাঁট করে নেয়।"

বরদাপ্রসন্নের মনে পড়লো, অধর সায়েব রবিবারের সকালবেলায় এক আর্জেণ্ট স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। তখন বরদাপ্রসন্ন এখানে নতুন এসেছেন। কাজকর্মের অত ঘাঁত-ঘোঁত বোঝেন না। নানা ঝঞ্ঝাটে সকাল বেলায় সায়েবের

সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। "রবিবারের দুপুরে ভাত-টাত খেয়ে একটু ফ্রি হয়ে ভাবলুম কাজে ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই ; কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাক, এখনই সায়েবের সঙ্গে দেখা করে আসি। তখন সাড়ে-তিনটে বাজে! সায়েবের দরজায় বেল বাজিয়েই চলেছি। আমি ভেবেছি বেল খারাপ। তারপর মশায়, সায়েবের-বাচ্চা রাগী কুকুরের মতো মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে এলেন—খালি গা, একখানি জাঙিয়া ছাড়া সর্বাঙ্গে কিছু নেই! কাঁচা ঘুম ভেঙে বুলডগের মতো মুখের চেহারা হয়েছে।"

বরদাপ্রসন্ন স্বীকার করলেন, "তারপর যা নিগ্রহ হয়েছিল সে কাউকে বলা যায় না। কোনোরকমে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষে হয়েছিল। সায়েব সারা জন্মের মতো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোনো লোককে জীবনে কখনও রবিবারের আফটার-নুনে ডিসটার্ব করবে না।"

গম্ভীর মুখে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "খুব শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, মশাই। আমি তাই এসময় কোনো টেনাণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করি না। আর্জেণ্ট ডেকে পাঠালেও না। সুযোগ পেয়ে আমার সব কর্মচারী এসময় মনের সুখে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। অথচ শাস্ত্রে বলছে দিবানিদ্রা নিন্দনীয়।"

ঠাকুরে ম্যানসনের কর্মচারীদের সম্বন্ধে বরদাপ্রসন্ন এবার মন্তব্য করলেন। "অনেক বকাবকি করেছি। কিন্তু প্রায় সবাই এখানে দিবানিদ্রার খপ্পরে পড়ে যায়। দোষ ওদের নয়—দেখে-দেখে শ্লেষ্মাপ্রধান লোকদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলে এর থেকে ভাল কী হবে?"

শ্লেষ্মাপ্রধান বলতে বরদাবাবু কী বলছেন তা বুঝতে পারছি না। বরদাবাবু একগাল হেসে জানালেন, "বাপ-পিতামহের আমল থেকে পরিবারে একটু আধটু আয়ুর্বেদ চর্চা আছে। আমার কাছে ব্যাপারটা অ্যাজ-ইজি অ্যাজ-ওয়াটার—জলের মতো সোজা। লোক দেখলেই বলতে পারি, বায়ু পিত্ত কফ কোন্‌টা প্রবল। রামসিংহাসন থেকে আরম্ভ করে আমাদের দারোয়ানগুলো দেখুন—সব শ্লেষ্মাপ্রধান। যাদের শ্লেষ্মা প্রবল তাদের দেখলেই চিনতে পারবেন—একটু মোটা চেহারা, কথায় কথায় ঘুমুতে পছন্দ করে, স্বভাবে একটু কুঁড়ে—গতর নড়তেই চায় না, খাওয়া-দাওয়া যত কমই হোক এদের মেদ বেড়েই চলেছে।"

বরদাবাবু আরও ব্যাখ্যা করলেনঃ "আর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে—মিষ্টি খাবার পেলে এরা বেজায় খুশী হয়। রামসিংহাসন আধ সের জিলিপি জলখাবার খায়।"

একটু থেমে বরদাবাবু বলে চললেন, "শ্লেষ্মাপ্রধান এই রাজত্বে আমিই একমাত্র বায়ুপ্রধান। বায়ুপ্রধানদের চেনা খুব সহজ! রোগা চেহারা, একটু খিটখিটে—ঘুমুতে চাইলেও ঘুম আসবে না। বেশী শীত সহ্য হয় না। অল্পে উত্তেজনা—এই অনুরক্ত তো এই বিরক্ত! আর একটা লক্ষণ আপনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন।"

কী লক্ষণ? বরদাবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। "বেশী কথা বলবার অভ্যাস!" হা-হা করে হেসে উঠলেন বরদাপ্রসন্নবাবু। "বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদের ওই একটি দোষ।"

বরদাপ্রসন্নবাবু যে তাঁর অভিজ্ঞ চোখে আমাকেও পরীক্ষা করছেন তা বুঝতে পারছি। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "যতটুকু আপনাকে বুঝেছি—আপনি গরম সহ্য করতে পারেন না, ঠাণ্ডা খোঁজেন একটু বেশী। অল্পতেই আপনার

চোখ লাল হয়। আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখেন বলুন তো?"

এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। স্বপ্নের জমাখরচ রাখতে আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু বরদাপ্রসন্ন আমাকে সহজে ছাড়বেন না। প্রশ্ন করলেন, "রাগারাগি হচ্ছে, মারামারি হচ্ছে—এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখেন কী?"

"মনে করতে পারছি না", আমার উত্তর।

বরদাপ্রসন্ন ছাড়লেন না। "ফুলের বাগানের স্বপ্ন দেখেন?"

কয়েকদিন আগে স্বপ্নে নিউমার্কেটের ফুলের দোকানগুলো দেখে-ছিলাম একবার। "ওই হলো। নিউমার্কেটের ফুলের দোকান ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ফুলের বাগান", মন্তব্য করলেন বরদাপ্রসন্ন। তারপর সগর্বে রায় দিলেন, "আমার মনে হচ্ছে আপনি পিত্তপ্রধান। ঝিঙে, পানিফল, লাউ—দই, রসুন, পেঁয়াজ, যতটা পারেন এড়িয়ে চলবেন।"

বরদাবাবুর মতামতে আমি মনে-মনে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম। বায়ু-পিত্ত-কফ তিনটাই এবার ঠাকুরে ম্যানসনে প্রবল হতে চলেছে, এই অজানা আশঙ্কায় আমি শিউরে উঠলাম, যদিও বরদাপ্রসন্নবাবু তার কিছুই বুঝতে পারলেন না।

রবিবারের অবসন্ন অপরাহ্নে আমি নিজের বিছানায় পা-মুড়ে বসে আছি। দিবানিদ্রায় অনভ্যস্ত বরদাপ্রসন্ন বারবেলা বিদায়ের প্রতীক্ষায় সামনের চেয়ারেই শান্তভাবে বসে আছেন। দূর থেকে একজোড়া কাকের ক্লান্তিকর কর্কশ কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে ভেসে আসছে। সায়েবপাড়ার কাকগুলো এখনও সায়েবী কেতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে নি।

এমনি এক পরিবেশে বরদাপ্রসন্ন হালদার ঠাকুরে ম্যানসনের পুরনো ইতিহাস বর্ণনা শুরু করলেন।

নিজের চশমাটা কাপড়ের খুঁটে পুঁছে নিয়ে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "সেই ছোটবেলায় ছড়া শুনেছিলাম—

ঘরের মধ্যে ঘর
নাচে কন্যে-বর।

ছেলে-ঠকানো ধাঁধার উত্তরে ঘরের মধ্যে ঘর বলতে আমরা মশারি বুঝে এসেছি। মফস্বলের লোক, তখন কী জানতাম আজব এই কলকাতা শহরে বাড়ির মধ্যে বাড়ি জিনিসটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। বাড়ির মধ্যে বাড়ির পায়রা-খুপরীকে এই শহরে ম্যানসন বাড়ি বলে।

"আপনি তো এতোদিন হোটেলের কামরা দেখে এসেছেন—এবার ম্যানসন বাড়ির ম্যাজিক দেখুন," রসিকতা করলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার।

"কতরকমের ম্যানসন বাড়ি আছে এ পাড়ায়—কারনানি ম্যানসন, কুইন্স ম্যানসন, পার্ক ম্যানসন, মোহিনী ম্যানসন, আর আমাদের এই ঠাকুরে ম্যানসন—যেখানে হাজির হয়েছেন আপনি।"

সংসারের লক্ষ্যহীন স্রোতে ভাসতে-ভাসতে শেষ পর্যন্ত একদিন যে এই ঠাকুরে ম্যানসনে হাজির হবো তা কল্পনা করি নি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ভাবছেন নিশ্চয় ঠাকুরে ম্যানসনের এই ঠাকুরটি কে? অনেকেই মশাই প্রথমে ঠকে যায়। ভাবে নিশ্চয় কোনো ধর্মস্থান—কালীঘাটের কাছে জাগ্রত ঠাকুরদেবতার পীঠস্থান হবে। কিন্তু ঠাকুরের 'ঠ' নেই এখানে। ম্লেচ্ছস্থান বলতে যা বোঝায় তাই। দেড়গজ দূরে গোমাংস বিক্রি হয়ে। তারই পাশে সুঁড়িখানা। এমন জায়গায় কে ঠাকুরের নামে ম্যানসন বানালো লোকে ভাবে।"

বরদাপ্রসন্নের কথার ভঙ্গীতে জানা গেলো, এই ম্যানসনের প্রতিষ্ঠাতা সায়েব নাকি এক সায়েব-গপ্পো লিখিয়ের খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস পেলে সায়েবের নাকি আর কিছুই রুচতো না। মদ, মাংস, মেয়েমানুষ ফেলে সায়েব ওই ঠাকুরে সায়েবের লেখা গোগ্রাসে গিলতেন।"

"লেখাপড়া কিছু করেছেন?" বরদাপ্রসন্ন এবার সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

লেখা-পড়ার অভ্যেস এই চরম দারিদ্র্যর মধ্যেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারি নি। অবশ্য এর একটা কারণ, পৃথিবীর অন্য যে কোনো আনন্দের জন্যই কিছু খরচের প্রয়োজন। কিন্তু পকেটে একটি পয়সা না থাকলেও বড় বড় শহরে এখনও বিনামূল্যে বই পড়ার আনন্দ উপভোগ করা যায়। মনে পড়লো, একবার ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত চলচ্চিত্র এ টেল অফ টু সিটিজ এসেছিল। বন্ধুরা অনেকে টিকিট কেটে সেই ছবি দেখতে গেলো। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আমার যাওয়া হলো না। কিন্তু সেদিনই হাঁটতে-হাঁটতে ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে ডিকেন্সের সেই উপন্যাসটা আমি সংগ্রহ করি, সমস্ত রাত জেগে বই শেষ করে পরের দিন বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের আলোচনায় যোগ দিই। বন্ধুরা বিশ্বাসই করে না যে আমি সিনেমা দেখি নি—বই পড়ে আমার মানসলোকে যে চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই সিনেমা দেখার আনন্দ মিটিয়েছিলাম।

বরদাপ্রসন্ন মন্তব্য করলেন, "লেখা-পড়া করে থাকলে নিশ্চয় ওঁর নাম শুনেছেন। কয়েক পা-দূরে ওই ফ্রি স্কুল স্ট্রীটেই ওঁর নাকি জন্ম হয়েছিল।"

উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে, নামটা মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে জ্বলে উঠলো। ইংরিজী সাহিত্যকে নগর কলকাতার সবচেয়ে মূল্যবান উপহারের নাম থ্যাকারে।

বরদাপ্রসন্ন জানালেন, "ওই থ্যাকারে সায়েবের নামেই এই ম্যানসনের নাম। থ্যাকারে কী করে পাকে-চক্রে ঠাকুরে হলেন তা যীশুকেষ্টই জানেন!"

থ্যাকারে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন। এক সময় খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে তিনি সমকালীন লেখক ডিকেন্স থেকে এক কাঠি এগিয়ে ছিলেন এ কথাও আমার অজানা নয়। কয়েক যুগের বিস্মরণের পর তিনি আবার সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, এ-খবরও আমার কানে এসেছে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "লেখালেখির খবর আমি অত রাখি না। তবে ব্রাউন মেম-সায়েবের কাছে শুনেছি 'ভ্যানিটি ব্যাগ' না কী নামে মস্ত এক বই আছে ভদ্রলোকের। মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহারের রেওয়াজ নিশ্চয় তখন থেকেই চালু হয়েছে।"

"ভ্যানিটি ব্যাগ না, ভ্যানিটি ফেয়ার।"

"ওই হলো। যাঁহা চুয়ান্ন তাঁহা পঞ্চান্ন। কী বলেন?"

বরদাপ্রসন্ন আরও বললেন, "খুব বেশী দিনের কাসুন্দি নয়। এই শতখানেক বছরের। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ওপর থ্যাকারে সায়েবের জন্মস্থান। আপনাকে দেখিয়ে দেবো। আর্মেনিয়ানদের কী একটা ইস্কুল না কলেজ রয়েছে ওখানে। থ্যাকারে সায়েবের পৈতৃক ভিটে এখনও কলকাতায় টিকে রয়েছে।"

আমার অবগতির জন্যে বরদাপ্রসন্ন জানালেন, "হলদে রংয়ের ইস্কুল বাড়িটার গেটের বাইরে একখানা কালো গ্রানাইট পাথরের ওপর খোদাই করা আছে—হিয়ার ওয়াজ বর্ন উইলিয়ম মেকপিস্ থ্যাকারে।"

সাল তারিখও হুড় হুড় করে শুনিয়ে দিলেন বরদাপ্রসন্নঃ ১৮ জুলাই, ১৮১১।

"ভ্যানিটি ব্যাগ-ফ্যাগে আমার মশায় আগ্রহ নেই। কিন্তু পাথরখানা দেখে-দেখে সন তারিখ আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আমাদের মদন আছে না?"

"মদন আবার কে?" এখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি।

বরদাপ্রসন্ন মুখ বিকৃত করলেন। "আমাদের মদনা মশাই! এখানে থাকলে তার সঙ্গে আলাপ হবেই। ওই মদনা, প্রতি সন্ধ্যেয় থ্যাকারে সায়েবের পাথরখানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেই।"

একটু নিশ্বাস নিলেন বরদাপ্রসন্ন। "মদনাকে কতবার আমি বকেছি। আমার পায়ের ধুলো খেয়ে দিব্যি করেছে সে আর ওখানে দাঁড়াবে না। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়।"

মদন ওরফে মদনা সম্পর্কে আমার কৌতূহল বাড়ছে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "পরশুদিনও দেখলাম একখানা ফুলহাতা বুশশার্ট ও ছুঁচলো প্যান্ট পরে মদনা ওই পাথরখানার সামনে শিকার ধরবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। রাস্তার ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলো ওই কালো পাথরখানার ওপর এসে পড়েছে। উইলিয়ম বলুন, থ্যাকারে বলুন সায়েবী নামের একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু ওই মধ্যনাম—মেকপিস্—কথাটা যেন কীরকম কানে বেসুরো বাজে!"

আমার মনে পড়লো নেপোলিয়নী বিক্রমে যখন প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকার বিপর্যস্ত উইলিয়ম মেকপিস্ থ্যাকারের জন্ম। আমাদের রিপন কলেজে ইংরেজী অধ্যাপক সুধাংশু সেনগুপ্ত থ্যাকারে ভক্ত ছিলেন। সম্রাট তৃতীয় জর্জের কাহিনী পড়াতে-পড়াতে তিনি থ্যাকারের জীবনের নানা ঘটনা বলতেন। বিশেষ করে মেকপিস্—"অর্থাৎ নেপোলিয়নের সঙ্গে মিটমাট করে শান্তি ফিরিয়ে আনো" এরকম কী একটা যেন বলেছিলেন। ১৮১১ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে দুটি স্মরণীয় ঘটনাঃ সম্রাট নেপোলিয়নের পুত্রসন্তান লাভ ও উইলিয়ম মেকপিস্ থ্যাকারের জন্ম।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "অতশত বুঝি না। মদনাকে আমি সেদিনও বকুনি লাগালাম। হারামজাদা, তোর সাহস কম নয়। তুই বিদ্যাস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে পাপকর্ম করছিস। ওই ঠাকুরে সায়েবের ভূত কোনদিন তোর ঘাড় মড়মড় করে ভাঙবে—তোর রক্ত চুষে-চুষে খাবে।"

"কিন্তু দুঃখের কথা কী বলবো আপনাকে, হতভাগা ওই মদনা আমাকে একটুও পাত্তা দিলো না। উল্টে মুলোর মতো দাঁতগুলো বার করে নির্লজ্জ-

বেহায়ার মতো হাসতে লাগলো।"

অপরিচিত এই মদন সম্পর্কে আমিও এবার কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। থ্যাকারে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে এখন জানতে চাই—কে এই মদনা? থ্যাকারের জন্মফলকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতি সন্ধ্যায় সে কী কাজ করে?

সন্ধ্যায় সক্রিয় মদনা ও সাহিত্যিক থ্যাকারের সম্পর্কটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বরদাপ্রসন্ন প্রথমে একটু সঙ্কোচ বোধ করলেন। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললেন, "এ-পাড়ায় যখন চাকরি করতে এসেছেন, তখন ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট, চৌরঙ্গী লেন, সাডার স্ট্রীট মাহাত্ম্য আপনার অজানা থাকবে না। একদিকে থ্যাকারের মতো মহাপুরুষের জন্মস্থান অন্যদিকে এই হতভাগা মদনাদের লীলাক্ষেত্র।"

বরদাপ্রসন্ন এবার সোজাসুজি বলে ফেললেন, "আপনার কাছে চেপে রেখে লাভ নেই, মদনা ঐখানে দাঁড়িয়ে পার্টটাইম ব্যবসা করে—বাবু ধরার ব্যবসা!"

ঠোঁট বেঁকিয়ে বরদাপ্রসন্ন দুঃখ করলেন, "ঘোর কলি যে! মদনার বাপ সুইপার। বুড়ো হয়েছে। সারাজন্ম জঞ্জাল সাফাই করে শরীরটা ভেঙেছে। তার ইচ্ছে ছেলেটাকে এবার কাজে ঢোকায়। আমার কাছে এক আধবার পিটিশনও করেছে। কিন্তু ছোঁড়ার মতিভ্রম হয়েছে—ঝাড়ু ধরতে, কমোডে বুরুশ বোলাতে মোটেই ইচ্ছে নেই। বাপের সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই আছে। এখন আবার সোনায় সোহাগা—সন্ধ্যেবেলায় গায়ে হাওয়া লাগিয়ে মদনা দালালির কাজ শুরু করেছে। বাপ বেচারা এখনও বোধহয় খবর পায় নি।"

বরদাপ্রসন্ন খবর দিলেন, "ছোকরাকে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আমি সন্দেহ করেছি। তা হতভাগা, কোম্পানির রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুই যা খুশি কর—এ তো আমার প্রাইভেট বাগান নয় যে আমার অর্ডার মতো কাজকর্ম হবে। কিন্তু তা বলে মহাপুরুষের জন্ম-ফলকের সামনে দাঁড়াবি তুই?"

বরদাপ্রসন্ন আবার ঠোঁট বেঁকালেন। তিনি মদনাকে বকুনি লাগিয়েছিলেন। কিন্তু মদনা কিছুই বুঝতে পারলো না। কে থ্যাকারে, কী করেছেন তিনি, কিছুই জানে না সে। জানবার মাথাব্যথাও নেই তার। যদি তিনি মহাপুরুষই হন—কবে কোন্ কালে তিনি এখানে জন্মেছিলেন বলে তাঁর বাড়ির সামনে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না?

মর্মাহত বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ছোঁড়াটার অসুবিধের কথা পরে জানতে পারলাম। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে ফেনার কোম্পানি এবং ডানলপের আপিস পেরিয়ে কারনানি ম্যানসনের কাছে যাবার উপায় নেই। ওখানে অন্য একটা দল অনেকদিন ধরে একই বিজনেস করছে—তারা নতুন কাউকে ওখানে দাঁড়াতে দেবে না। মদনা ছোকরা আমার বকুনি খেয়ে, দু' একদিন ওখানে সরে যাবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু অন্য পার্টির তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসবার পথ পায় নি।"

বুঝলাম, মদনা নামক বিপথগামী যুবকের সঙ্গে যথাসময়ে আমার মুলাকাত হবে। বরদাপ্রসন্নর ইচ্ছা, থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন ম্যানেজার হিসেবে আমি তার সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলি।

বরদাপ্রসন্ন এরপর শুরু করলেন, থ্যাকারে ম্যানসনের ইতিবৃত্ত। বললেন, "অনেকখানি খালি জমি আছে এই বাড়ির। সেকালে এ-পাড়ায় জমির দাম কীই বা ছিল! জমির দাম বাড়তে-বাড়তে এখনকার অবস্থায় আসবে তাও কেউ স্বপ্নে ভাবতে পারে নি।"

"বুঝতে পারলে কি, এরকম জমি ফেলে-ছড়িয়ে বাড়ি তুলতো?" আরও শুনলাম, এই বাড়ির আদি মালিকদের তালিকায় জনৈক থ্যাকারের নামও লেখা রয়েছে। থাকা অস্বাভাবিক নয়—বরদাপ্রসন্নর মতে, "ব্রাউন মেমসায়েবের মুখে শুনেছি, কলকাতায় ওঁদের বিষয়সম্পত্তি অনেক ছিল। আলিপুর, একবালপুর, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট কোথায় থ্যাকারেদের জমি ছিল না? আলিপুরে চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির নাম তো এখনও থ্যাকারে হাউস।"

থ্যাকারে ম্যানসনের জমির মালিক ছিলেন সাহিত্যিক থ্যাকারের বাবা অল্পবয়সে বেঘোরে মারা না-গেলে হয়তো এই সম্পত্তি তাঁরা হাতছাড়া করতেন না। রিচমণ্ড থ্যাকারে কলকাতায় যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন ইংরেজদের বড় দুর্দিন। ইউরোপে নেপোলিয়নের সঙ্গে লড়াইয়ের আঁচ এখানেও লেগেছে।

সাহিত্যিক থ্যাকারের পিতৃদেবের মৃত্যু তারিখ আমার অজানা নয়—এই পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে নিতান্ত খেয়ালের বশেই এক সময় কিছু খোঁজখবর করেছিলাম। সে বোধ হয় ১৮১৫ সালের কথা—ঔপন্যাসিক থ্যাকারে তখন চার বছরের শিশু। কলকাতার দুরন্ত ইংরেজ শিশুদের তখন ঘুম পাড়াবার জন্যে সুর করে ভয় দেখানো হতো—Hush hush! Napo comes! চুপ চুপ—ওই আসছে নেপো, অর্থাৎ নেপোলিয়ন। বাংলা ছড়া, ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশের, বিলিতী সংস্করণ আর কি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "রিচমণ্ড সায়েব তো মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর বউটি নাকি বিধবা হবার আগে থেকেই অন্য কার সঙ্গে প্রেম-টেম করছিলেন। কতদূর সত্যি জানি না, ব্রাউন মেমসায়েব আমাকে এইসব গপ্পো শুনিয়েছিলেন।"

বরদাপ্রসন্নর মুখ থেকে আমি শুনলাম থ্যাকারে পরিবারের এই জমি কেনেন একজন আর্মেনিয়ান ক্রিশ্চান জন এরাটুন। কয়েক বছর পরে এরাটুন এই সম্পত্তি বিক্রি করেন এক ইহুদিকে। তিনি সম্পত্তি বদলি করেন গলস্টন নামে এক ধন-কুবেরকে। তাঁর কাছ থেকেই সম্পত্তি বিক্রি হয় মার্টিন সায়েবের কাছে। কলকাতায় জন্ম, কর্ম এবং মৃত্যু এই মার্টিন সাহেবের।

সাহিত্যিক থ্যাকারের মস্ত ভক্ত ছিলেন এই ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন। রেসের ঘোড়া এবং বিষয় সম্পত্তির কেনা-বেচা থেকে সে যুগে বহু লক্ষ টাকা কামিয়েও তিনি বই পড়বার সময় পেতেন।

কলকাতায় তখন সবাই আলাদা-আলাদা বাড়িতে থাকা পছন্দ করে। ম্যানসন বা ফ্ল্যাট বাড়ির কথা শোনে নি। নতুন ঘোড়ার সন্ধানে ডেভিড মার্টিন সেবার বিলেত গিয়েছিলেন। ঘোড়ার সঙ্গে নিয়ে এলেন নতুন ব্যবসার মতলব। তৈরি করবেন এই নতুন ধরনের বাড়ির-মধ্যে-বাড়ি—যার

নাম আগে থেকেই পছন্দ করা ছিল 'থ্যাকারে ম্যানসন'।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "যখন এ-বাড়িতে থাকতেই এসেছেন তখন আস্তে আস্তে এর গোড়াপত্তনের গপ্পো শুনবেন। বুঝবেন, ঠাকুরে ম্যানসন সম্বন্ধে কেন আমার দুশ্চিন্তা—এর ভবিষ্যৎ ভেবে কেন আমি কুলকিনারা পাই না।"

দীর্ঘদিন ধরে এ-বাড়ির তদারকি করতে করতে বরদাপ্রসন্ন কখন যে বাড়িটার ভালবাসায় পড়ে গিয়েছেন তা তিনি নিজেও বোধ হয় জানেন না।

"ইঁট-কাঠে তৈরি হলে কী হয়, প্রত্যেকটা বাড়িরই নিজস্ব সুখ দুঃখ আছে। মানুষের মতো মুখ ফুটে কথা ফথা বলতে পারে না বলে এদের কিছু বলবার নেই ভাববেন না।"

পকেট থেকে কৌটো বার করে বরদাপ্রসন্ন এক খণ্ড কবিরাজী আদ্রক মুখে পুরলেন। জানতে চাইলেন, অম্ল-পিত্ত নাশক রৌদ্রজারিত আদ্রক আমিও আস্বাদন করবো কি না। এই কবিরাজী ওষুধের গুণে লোহা পর্যন্ত কয়েক মুহূর্তে জঠরানলে বিগলিত হয়!

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "প্রত্যেকটি বাড়ি অন্তর্যামী! বোবা কিন্তু বোকা নয়!"

আমার মুখে অবিশ্বাসের কী ছায়া দেখলেন বরদাপ্রসন্নই জানেন। আদা-কুচি আলটাকরায় ঘষে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? থাকুন এখানে—ক্রমে ক্রমে সব বিশ্বাস করবেন। এই গরীবের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগবে।"

গাছের মতো বাড়িরও প্রাণ আছে এমন ভাববার মতো কল্পনা-শক্তি এখনও আমার হয় নি। এসব কথার উত্তর দিয়ে কখনও লাভ হয় না।

বরদাপ্রসন্ন শুনিয়ে দিলেন, "আজ আপনার ওপনিং-ডে। এই শুভদিনে এই পুওর-ম্যানের দু' একটা কথা শুনে রাখুন। মানুষের মতো বাড়িরও জন্ম-লগ্ন আছে—গ্রহ নক্ষত্রের শুভ-অশুভ দৃষ্টি আছে। বাড়ির কুষ্ঠি-বিচার খুব শক্ত কাজ—কিন্তু তেমনভাবে বিচার করাতে পারলে সব ঘটনা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায় : শুরুতে দাঁড়িয়েই আপনি শেষ বুঝতে পারবেন!"

গ্রহ-নক্ষত্রের অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধেও এই মুহূর্তে আমি কৌতূহলী নই। অনেক কষ্টে অনেক ঘোরাঘুরির পরে কোনোরকমে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। আমার পুরুষকারে এবং পরিশ্রমে এই চাকরিটা এখন নিরাপদ করতে চাই। দূর আকাশের কুটিল গ্রহ-নক্ষত্রের কপট সন্তুষ্টিবিধানের কোনো ইচ্ছা নেই আমার।

কিন্তু বরদাপ্রসন্ন অন্য জগতের মানুষ। তাঁকে এড়িয়ে যাবার জন্য বললুম, "শুরুতেই যদি শেষের সব কথা জানা হয়ে গেলো তাহলে আমাদের আর কী করবার থাকবে বলুন?"

কবিরাজী আদা চুষতে-চুষতে সন্তুষ্ট বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আঃ! মুখখানা যেন এয়ারকণ্ডিশন হয়ে গেলো—একেই বলে দ্রব্যগুণ।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন বরদাপ্রসন্ন। "কিছু মনে করবেন না স্যার,—আপনার বয়স কম, মুখে যা আসে, বলে ফেলতে পারেন। আমরা যারা ভুক্তভোগী তারা বুঝি—শুরুতেই শেষটা জানা থাকলে অনেক সুবিধে। ওই সিনেমা-থিয়েটারের কথা ধরুন। মেট্রো, লাইট-হাউস, গ্লোবে কত লে তো পুরো গপ্পোটা পরের মুখে শুনে তবে সিনেমা দেখতে আসে। বিদেশ্যে

অসুবিধে হয় তাতে? মোটেই না। বরং কী-হবে কী-হবে দুশ্চিন্তা না-থাকায় ধীরে সুস্থে বাইস্কোপটা দেখা যায়।"

আদা কুচির শেষ অংশটা মুখ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, "এক সময় আমারও রক্ত গরম ছিল। আপনার মতোই ভবিতব্যকে অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন করি না।"

মনে হলো বরদাপ্রসন্ন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। বুকের অন্ধকারে, হয়তো কোনো গভীর দুঃখ লুকিয়ে আছে।

আমরা আবার কথাপ্রসঙ্গে থ্যাকারে ম্যানসনের আদি-পর্বে চলে এলাম। ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন থ্যাকারে পরিবারের জমিতেই নতুন ধরনের ইমারতের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। রাজা-মহারাজা বা সওদাগরী অফিসের বড়সায়েব মেজসায়েবদের জন্যে ভাড়া বাড়ি তৈরি করবার কোনো-ইচ্ছে নেই সদ্য বিলেতপ্রত্যাগত ডেভিড মার্টিনের। মার্টিন স্বপ্ন দেখছেন ঘরের মধ্যে ঘরের। মার্টিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী করুণাপ্রসন্ন তখন মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। বিলেত বেড়িয়ে এসে সাহেবের কি মাথা খারাপ হলো!

নতুন বাড়ির নক্‌শা দেখে করুণাপ্রসন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, সাহেব এবার ডুববেন। লিন্ডসে স্ট্রীটের দক্ষিণে এই পাণ্ডব-বর্জিত পাড়ায় পায়রার খোপগুলো কে ভাড়া নেবে? ভগবানের ইচ্ছেয় কলকাতা শহরে গাঁটের কড়ি ফেললে বাড়ির অভাব নেই।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ভাড়া বাড়িতে থাকাটা সেকালের বাঙালী ভদ্দরলোকেরা মোটেই পছন্দ করতেন না। নিজস্ব বাটী যাঁর নেই তিনি আবার কীসের ভদ্দরলোক? 'বাসাড়ে' বাবুদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতেও অসুবিধে হতো। যার নিজস্ব চাল-চুলো নেই তার ঘর থেকে মেয়ে আনলে লক্ষ্মী কুপিতা হবেন, এমন কথাও বলতো তখন।"

ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন কিন্তু বাবুর বুদ্ধিতে মত পাল্টালেন না। হুইস্কির হোঁচটে সায়েব বোধ হয় ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। প্রিয় কর্মচারী করুণাপ্রসন্নকে তিনি বলেছিলেন, "ডোণ্ট ঘাবড়াও কারুণা!"

পুরনো দিনের স্মৃতি বরদাপ্রসন্নর মুখ উজ্জ্বল করে তুললো। বললেন, "গোরু-খেগো ম্লেচ্ছ হলে কী হয়—একেবারে ঋষিবাক্য! 'কারুণা, মার্ক মাই ওয়ার্ড' এই বলে সায়েব নিবেদন করলেন, একদিন নাকি এই কলকাতা শহরে সো-কল্ড পিজিয়ন হোল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না—সমস্ত লোক ফ্ল্যাট বাড়িতে বসবাস করবে। ফ্ল্যাট বাড়িতে না থাকাটাই তখন আশ্চর্য ব্যাপার হবে।"

একটু থামলেন বরদাপ্রসন্ন। "বুঝুন মশাই। নাইন্টিন ফিফটি-ফাইভ নয়, ইন দি ইয়ার নাইনটিন হানড্রেড টুয়েল্‌ভে সায়েব বাচ্চা ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ফোরকাস্ট করছেন, একদিন বড় বড় সব শহর পায়রার খোপে বোঝাই হয়ে যাবে!"

বরদাপ্রসন্নর মুখে এবার অন্ধকার মেঘ নেমে এলো। "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সায়েবের এমন দৃষ্টি, এতো জ্ঞান—কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। শুভ কাজ শুরুর আগে যে দিন-ক্ষণ দেখার ব্যাপার আছে তা রক্ত-গরম সায়েব বুঝলেন না।"

মার্টিন, সায়েবের সরকার করুণাপ্রসন্ন ধর্মপ্রাণ এবং বিচক্ষণ মানুষ। করুণাপ্রসন্ন চেয়েছিলেন, "এতোই যখন হচ্ছে, তখন দিনক্ষণ দেখে

ভূমিপুজোর ব্যবস্থা করি।"

গো-খেগো মার্টিন সায়েব জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হোয়াট?"

"বাস্তুপুজো সায়েব", করুণাপ্রসন্ন বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। "ওয়ারশিপ অফ্ লর্ড বাস্তু।"

"তোমাদের কী বিল্ডিং-এর জন্যেও সেপারেট গড্ আছেন?" জিজ্ঞেস করেছিলেন বিরক্ত ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন।

সায়েবের প্রিয় সরকার করুণাপ্রসন্ন তখন পরামর্শ দিয়েছিলেন, "অকারণ ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ? দিজ্ বাস্তু গডস অ্যান্ড গডেসেস—এঁরা খুবই পাওয়ারফুল। নেগলেকটেড হলে এঁদের 'হৃস্যিদীর্ঘ' জ্ঞান থাকে না, সায়েব।"

মনিবের মুখ-চোখ দেখে করুণাপ্রসন্ন ভাবলেন, মার্টিন সায়েব একটু নরম হয়েছেন। তখন তিনি বোঝালেন, "খুবই মাইনর পুজো—নো হাঙ্গামা। জমিতে প্রথম কোদাল ফেলবার আগে ভিত-পুজো।"

"হোয়াট?" পাইপ টানতে-টানতে সায়েব জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"ওয়ারশিপ অফ দি প্লিনথ।" করুণাপ্রসন্ন সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

"বাই জোভ!" মার্টিন সায়েব বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। "বাড়ির জন্য একজন গড্—আবার প্লিনথের জন্যে সেপারেট গড্!" সায়েব এবার বুঝতে পারছেন, হিন্দুদের কেন থ্রি-হানড্রেড-থার্টি-মিলিয়ন গড্স এবং গডেস প্রয়োজন।

মার্টিন সায়েব তাঁর প্রিয় সরকারের ঘাড়ে হাত রেখে বলেছিলেন, "কারুণা, আমরা অনেক লাকি। উই হ্যাভ ওয়ান গড্ এবং তিনি ভিত থেকে বাড়ি পর্যন্ত সব ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ।"

করুণাপ্রসন্ন অত সহজে দমবার পাত্র নন। সায়েবকে এই সব বিষয়ে অধৈর্য হতে বারণ করে উপদেশ দিয়েছিলেন, "ফর দি সেক অফ গডেস কালী তুমি দেব-দেবী সম্বন্ধে লুজ রিমার্ক কোরো না। তোমাদের নিজেদের দেশে গোরু খেয়ে যা-খুশী করতে পারো। কিন্তু দিস ইজ স্পেশাল জামিনদারী অফ মাদার কালী—যাঁর জন্যে এই শহরের নাম কলিকাতা।"

সায়েব এবার হেসে উঠলেন। "তুমি বলছো 'রোম শহরেই যখন বসবাস করছো তখন রোমানদের মতো আচরণ করো'।"

সায়েব নরম হচ্ছেন মনে করে করুণাপ্রসন্ন বুঝিয়েছিলেন, "খুবই সিম্পল সেরিমনি! মোর দ্যান দু-তিন টাকা আপনার খরচ হবে না। আমি কালিঘাট থেকে স্পেশাল পুরুত আনাবো।"।

খেয়ালী সায়েব হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন, এইসব প্রেয়ারে অনেক সময় লেগে যাবে নাকি?

করুণাপ্রসন্ন সায়েবকে ভরসা দিয়েছিলেন, সময় মোটেই লাগবে না।

করুণাপ্রসন্নর পুরনো কাহিনী বলতে বলতে বরদাপ্রসন্ন একবার থামলেন। তার পর শুরু করলেন, "হাজার হোক হালদারবাড়ির ছেলে—পুজো-আচ্ছার মন্তর-টন্তর মুখস্থ। উনি সঙ্গে সঙ্গে বাস্তু-সাপের পৃথিবী প্রণামের মন্তরটা গড় গড় করে সায়েবকে শুনিয়ে দিলেনঃ ওঁ সুরুপাং প্রমদারুপাং দিব্যাভরণভূষিতাম।......ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ।"

সায়েব মিটি মিটি হেসে জানতে চাইলেন একখানা বাড়ির পুজোর জন্যে

কতজন গডের গুড উইশেস ভিক্ষা করতে হবে?

করুণাপ্রসন্ন প্রথমেই নাগরাজের কথা তুললেন। মাটি খোঁড়া মানেই নাগের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানো। ভাদ্রাদি তিন-তিন মাস যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মুখ রেখে নাগ বাম পাশে শুয়ে থাকেন—নাগের কোলে গৃহারম্ভই শুভ।

নিষ্ঠাবান করুণাপ্রসন্ন এরপর বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "সায়েব. বাড়ি তৈরী সামান্য ব্যাপার নয়। মানুষ যেখানে মাথা গুঁজবে সেখানে দেবতাদের বিরক্তি থাকলে বড়ই মুশকিল।"

মার্টিন সায়েবের অবগতির জন্যে করুণাপ্রসন্ন ব্যাখ্যা করলেন. "শুধু দেবদেবী নন, যাঁরাই মানুষের সুখ শান্তিতে বিপত্তি ঘটাতে পারেন তাঁদের সকলকেই গৃহারম্ভের সময় নমস্কার জানানো হয় যেমন—অসুরায়. পাপায়. রোগায়, অগ্নেয়, সর্পায়, জরায়, পাপ-রাক্ষসৈ।"

সায়েবের আগ্রহ দেখে করুণাপ্রসন্ন তালিকা দীর্ঘতর করেছিলেনঃ "ওঁ শিখিনে নমঃ। জয়ন্তায়, সূর্যায়. যমায়. সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায় নমঃ।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "করুণাপ্রসন্নের কথায় সায়েব মজে গেলেন। বললেন, "নো হার্ম । তুমি যখন বলছো—ব্রিং ইওর পুরোহিত। উই উইল হ্যাভ দি সেফটি পুজা।"

"কিন্তু ভবিতব্য!" আফশোস করলেন বরদাপ্রসন্ন।

সায়েবের কথা মতো করুণাপ্রসন্ন পরের দিন কালিঘাটে পুরোহিতের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে বললেন. মস্ত বাড়ি হবে, অনেক লোক থাকবে—নিষ্ঠার সঙ্গে পুজা-আচ্চা করাতে চাই আমরা।

পুরুতমশায় ফর্দ করে দিলেন। করুণাপ্রসন্ন নিজে ভবানীপুরের বাজার থেকে ফর্দ অনুযায়ী পুজোর সমস্ত জিনিস-পত্তর যোগাড় করলেন। সকাল বেলায় স্নান সেরে করুণাপ্রসন্ন আবার পুরুতের বাড়ি গেলেন।

পুরুতমশায় ইতিমধ্যে পাঁজি দেখে বসে আছেন। বললেন, "করুণাপ্রসন্ন, আজ তো কোনোরকমেই পুজো করা চলে না। গৃহারম্ভের পক্ষে মোটেই শুভদিন নয়। তুমি অন্তত একদিন শুভকাজটা পিছিয়ে দাও।"

করুণাপ্রসন্ন সায়েবকে খুব ভালবাসতেন। সায়েবের যাতে মঙ্গল হয় তাই প্রার্থনা করতেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মার্টিন সায়েবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছুটলেন। কিন্তু বেপরোয়া সায়েব সেদিন করুণাপ্রসন্নর অনুরোধ রাখতে রাজী হলেন না। মাথায় খাকি রঙের সোলা-হ্যাট পরে জমির কাছে দাঁড়িয়ে মার্টিন সায়েব কুলিদের হুকুম করলেনঃ মাটি খোঁড়া আরম্ভ করো।

পুরনো দিনের গল্প বলতে বলতে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আস্পর্ধাটা বুঝুন। সায়েব হুকুম করছেনঃ স্টার্ট ডিগিং—গড্‌স উইল টেক কেয়ার অফ দেমসেলভস।"

করুণাপ্রসন্ন তখন মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছেন। মার্টিন সায়েব বললেন, "কারুণা, আই অ্যাম স্যরি। আমি আমার কাজ করি, তুমি দেবতাদের ফর্মালিটি সামলাও।"

অজানা ভয়ে করুণাপ্রসন্ন সেদিনই শিউরে উঠেছিলেন। আবার ছুটেছিলেন কালিঘাটে পুরোহিতের বাড়ি। জিজ্ঞেস করলেন, কোনোরকমে দোষ

শোধন করানো যায় কিনা।
"পণ্ডিতমশায় বই খুলে সেদিন কী বলেছিলেন জানেন?" বরদাপ্রসন্ন আমাকে এবার প্রশ্ন করলেন।
এসব ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ বা কৌতূহল নেই।
কিন্তু বরদাপ্রসন্ন জোর করলেন, "শুনুন, মশাই, শুনুন। যে-বাড়ির দায়িত্ব নেবেন, তার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিন। পণ্ডিতমশায়ের পুরনো কথা এখনও মিথ্যে হয় নি।"
গম্ভীর মুখে পুরুতমশায় সেদিন করুণাপ্রসন্নকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়ির মুখ কোন্ দিকে হচ্ছে? কলকাতার সব ভাল বাড়িই তো দক্ষিণ মুখো হয়, উত্তর দিয়েছিলেন করুণাপ্রসন্ন। "নিষিদ্ধকালে গৃহনির্মাণ তাও আবার দক্ষিণমুখে," মুখ কুঞ্চিত করেছিলেন পুরুতমশায়। আর কোনো মন্তব্য না করে তিনি শাস্ত্রীয় বইখানাই করুণাপ্রসন্নর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন: "কর্কট, কুম্ভ, সিংহ ও মকর রাশিতে সূর্যের অবস্থান সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম-মুখ গৃহ কর্তব্য। যে দুর্মতিবিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার অন্যথা করে তার সর্বনাশ হয়।"
বিষণ্ণ বদনে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "সামান্য সরকারের উপদেশ সায়েব শুনলেন না। গরীবের কথা বাসী না হলে মিষ্টি লাগে না।"
গ্রহ নক্ষত্রের গোপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করে অশুভ মুহূর্তে গৃহারম্ভের ফলাফল কী হয়েছিল তা যথাসময়ে বরদাপ্রসন্নের মুখে আমি বিস্তারিতভাবে শুনেছিলাম।
সেসব কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের ইতিহাস বলতে গিয়ে বরদাপ্রসন্ন এমনভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন যেন মাত্র গত সপ্তাহে মার্টিন সাহেবের ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছে এবং তিনি এখনও পার্ক স্ট্রীটের অভিজাত পল্লীতে বসবাস করছেন।
বরদাপ্রসন্ন বললেন, "বাড়ি তৈরি তো আরম্ভ হলো, কিন্তু গৃহপ্রবেশের অনেক আগেই প্রথম বোমা ফাটলো! মার্টিন মেমসাহেব, যাঁকে সবাই সাধ্বী স্ত্রী বলে জানতো, তিনিই কেলেঙ্কারী করলেন। বলা-নেই কওয়া-নেই অমন শিবের মতো স্বামীকে ত্যাগ করে মেমসায়েব এক পাটকলের ছোকরা সায়েবের সঙ্গে বজবজ না ভদ্রেশ্বর কোথায় উধাও হলেন। সমস্ত কলকাতার সায়েব সমাজে সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড।"
করুণাপ্রসন্নের কাছে বরদাবাবু শুনেছেন, মার্টিন সায়েব মনের দুঃখে কিছুদিন কাজকর্ম ছেড়ে চৌরঙ্গী রোডের ওপর কনটিনেণ্টাল রেস্তোরাঁর দোতলায় সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একলা চুপচাপ বসে থাকতেন। সায়েবের পকেটে থাকতো ছ-ঘরা বিলিতি রিভলবার—ফুললি লোডেড।
একদিন তো রটেই গেলো সায়েব ওই রিভলভার পকেটে নিয়ে এসপার-ওসপার করবার জন্যে বজবজ যাচ্ছেন।
খবর পেয়ে করুণাপ্রসন্ন তো ছুটলেন ফিরিঙ্গী কালীর কাছে মানত করতে, "রাগ না চণ্ডাল। মাগো, মার্টিন সায়েবকে সুমতি দাও—ও'র ঘাড় থেকে প্রতিশোধের ভূত নামিয়ে দাও।"
আমরা হয়তো বিশ্বাস করছি না, কিন্তু পাঁচসিকের পুজো মানতের সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রের মতো ফল হলো। মার্টিন সায়েব কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের দোতলায় হুইস্কি সেবন করতে-করতে সেদিন হঠাৎ বললেন, "প্যামেলা যদি

একটা জুট-মিলের ছোঁড়ার সঙ্গে বসবাস করে সুখী হয়—লেট হার বি। আমার অন্য কোনো লজ্জা নেই। আই ওনলি ফিল অ্যাশেশ্‌ড্‌ ফর হার টেস্ট। আমার সঙ্গে টোয়েণ্টি ইয়ার্স ঘর করবার পরেও প্যামেলার এমন রুচি হলো কী করে?”

নতুন ম্যানসন তৈরির কাজকর্ম ইতিমধ্যে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সোলা টুপি ও খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট পরে সায়েব হঠাৎ পরেরদিন ওয়ার্ক সাইট-এ আবার ফিরে এলেন। কয়েক সপ্তাহে কাজকর্ম একটুও এগোয় নি দেখে তিনি রেগে উঠলেন। করুণাপ্রসন্ন কৈফিয়ত তলব করলেন, “কারুণা, কার হুকুমে কাজে ঢিলে পড়েছে?”

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে করুণাপ্রসন্ন বলে ফেললেন, “মেমসায়েবের দুঃখে এখানে সবাই যেন কীরকম হয়ে গিয়েছিল।”

বাঘের মতো হুঙ্কার ছেড়েছিলেন মার্টিন সায়েব। ঠিক যেন নাকের ডগায় বাজপড়ার শব্দ! সায়েব বলেছিলেন, “আমার যা ইনকাম তাতে আই ক্যান কীপ ওয়ান ডজন মেমসায়েব! তোমরা মেমসায়েবের জন্যে দুঃখ কোরো না—পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাও।”

বন্ধ কাজ আবার চালু হলো। কিন্তু সায়েব আর সেই পুরনো সায়েব রইলেন না। হঠাৎ একদিন করুণাপ্রসন্নকে বাড়ির নকশাসমেত ডেকে পাঠালেন। হুকুম দিলেন, “কাজ বন্ধ করো, আমি ডিজাইনে রদবদল করবো।”

সায়েব বোধহয় তখন হুইস্কির বিষে বদ্ধ পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরনো নক্‌শার দিকে নজর দিয়ে হঠাৎ জানতে চাইলেন, প্রত্যেক ফ্ল্যাটে রান্নাঘর তৈরি হচ্ছে কেন? প্রত্যেক ফ্ল্যাটে কিচেন তৈরি হচ্ছে কেন, এ-প্রশ্ন পাগল ছাড়া কেউ তোলে?

একমাত্র করুণাপ্রসন্ন তখন সায়েবের মুখের ওপর দু-একটা কথা বলতে পারতেন। তিনি সায়েবকে বোঝালেন, “গেরস্তবাড়িতে রান্নাঘরই তো সব! রান্নাঘর না-থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সংসারধর্ম চলবে কী করে?”

মদের ঝোঁকে সায়েব বকুনি লাগালেন, “চিরকালই যে প্রত্যেক মানুষের বউ থাকবে এমন গ্যারাণ্টি তো কলকাতা শহরে দেওয়া যাবে না। বউ না-থাকলে রান্নাঘর নিয়ে কী হবে? তা ছাড়া আমি ভাবছি যাদের বউ নেই তাদেরই আমি ভাড়াটে হিসেবে অগ্রাধিকার দেবো।”

করুণাপ্রসন্ন বুঝতে পারছেন সায়েবের মাথার ঠিক থাকছে না। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ইঞ্জিনীয়ারের ডাক পড়লো। সায়েবের হুকুমে, প্রত্যেক ফ্ল্যাট থেকে রান্নাঘর উধাও হলো। মার্টিন সায়েব বললেন, “ছাদের ওপর একটা বিরাট হলঘর থাকবে—সেখানে যত ইচ্ছে উনুন বসাও—চাকররা ওখানেই রান্না-রান্না সেরে সায়েবের ঘরে নিয়ে যাবে।”

বরদাপ্রসন্ন বললেন, “আমাদের কোনো ফ্ল্যাটেই আইনত রান্নার ব্যবস্থা নেই। কেউ তর্কাতর্কি করলে আমরা বলি এসব স্পেশাল ডিজাইনের বাড়ি—ইউরোপীয়ান চামেরী টাইপ ফ্ল্যাটে রান্নার ব্যবস্থা থাকে না।”

এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। বরদাপ্রসন্ন জানালেন, “ব্যাপারটা এই ঠাকুরে ম্যানসন থেকে শুরু—কিন্তু তারপর অনেক ম্যানসন বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে।” এবার তিনি হুড় হুড় করে পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের

কয়েকখানা বিখ্যাত বাড়ির নাম করে গেলেন যেখানে রান্না-বান্নার জন্যে কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা। সায়েব অথবা মেমসায়েবের নির্দেশ অনুযায়ী মালপত্তর নিয়ে বেয়ারা-কাম-বাবুর্চিরা ছাদের ওপর সার্বজনীন রান্নাঘরে চলে যায় এবং নিজের নির্দিষ্ট উনুনে রান্নাবান্না সেরে নেয়।"

"রান্নার সময় তাহলে বাবুর্চিদের নড়াচড়ার উপায় নেই?" আমি জানতে চাই।

একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন উত্তর দিলেন, "তা কেন? প্রত্যেক ফ্ল্যাটের জন্যে একখানা করে জালের আলমারি আছে। মাছমাংস, তরি-তরকারি, মশলাপাতি সেই আলমারিতে রেখে যতবড় সাইজের গোদরেজের তালা ঝুলিয়ে দিক, আমরা আপত্তি করবো না!"

মার্টিন সায়েবের অমঙ্গলের লিস্টি এখনও শেষ হয় নি। বহুদিন আগেকার সেই সব ঘটনার পুঙখানুপুঙখ বিবরণ বরদাপ্রসন্ন হালদার স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছেন। এসব বিবরণ তিনি আবার এই প্রত্যক্ষদর্শী করুণাপ্রসন্নর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। করুণাপ্রসন্ন লোকটি কে তা এখনও বরদাপ্রসন্নর কাছে জানতে পারছি না, তবে আন্দাজ করছি তিনি বরদাপ্রসন্নর কোনো আপনজন হবেন। দুটো নামের মধ্যে অনেকখানি মিল রয়েছে।

রবিবার অপরাহ্নের রোদ অনিচ্ছুক অফিসকর্মীর মতো নির্ধারিত সময়ের আগেই দপ্তর গোটাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দিবসের শেষ আলোক পশ্চিমের জানালা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দূর নগর সৌধের পিছনে লুকিয়ে পড়লো।

এই মুহূর্তে আমি নিরাপত্তা সুখ অনুভব করছি। তক্তপোষের ওপর আমার কম্বল ও সতরঞ্চিখানা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর নিশ্চিন্তে অর্ধশায়িত হয়ে আছি। আমার বহুদিনের সঙ্গী বালিশটা সস্নেহে তীক্ষ্ম কনুয়ের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে।

এই সময়ে এক পেয়ালা গরম চা পেলে মন্দ হতো না। কিন্তু তার জন্যে এখান থেকে কতদূর যেতে হবে জানি না। বরদাপ্রসন্নর সামনে ও-প্রসঙ্গ তুলতেও একটু সঙ্কোচ বোধ হলো।

বরদাপ্রসন্ন ইতিমধ্যে আবার অতীতে ফিরে গিয়েছেন। ওঁর বর্ণনায় এমন বিশেষত্ব আছে যে আমিও এই মুহূর্তে গালপাট্টাওয়ালা ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের রিভলভারের মতো টিকলো নাক, ছুঁচলো মুখ ও বিশুদ্ধ মাখনের মতো গৌর অঙ্গটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আরও দেখতে পাচ্ছি ধুতির ভিতরে শার্ট গোঁজা এবং চোখে চশমা প্রৌঢ় করুণাপ্রসন্নকে।

করুণাপ্রসন্নকে সায়েব যে বিশেষ ভালবাসতেন সে-খবরও ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছি। এতোই ভালবাসতেন যে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের স্টুডিওতে গিয়ে দুজনের একখানা ছবিও তুলিয়েছিলেন। "সে ছবি এখনও আমার প্যাঁটরায় যত্ন করে রাখা আছে, আপনাকে দেখিয়ে দেবো", ঘোষণা করলেন বরদাপ্রসন্ন।

"বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের নাম শুনেছেন তো?" বরদাপ্রসন্ন এবার আমাকে বাজিয়ে নিলেন। "খোদ বড়লাটের ছবি তুলতো এই সায়েব কোম্পানি। আর সায়েবদের তোলা সে কী ছবি! ফটো বলে মনেই হয় না। যেন জ্যান্ত মানুষটাকেই ক্যামেরার মধ্য দিয়ে পাশ করিয়ে কাগজের ওপর

ঢেলে দিয়েছে!"

সেকালের বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের নাম আমার অজানা নয় শুনে বরদাপ্রসন্ন বেশ সন্তুষ্ট হলেন। দুঃখ করলেন, "এখনকার দিনকালই আলাদা। বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড, কুক অ্যান্ড কেলভি, হ্যামিলটন, র‍্যাঙ্কেন এসব নামের দামই বোঝে না আচ্ছা আচ্ছা লোক। কালকা যোগীরা পয়সার জোরে যেখানে-সেখানে বড় বড় দোকান ফেঁদে বসছে—পুরনো চাল যে ভাতে বাড়ে সেকথা আজকালকার বড়লোকদেরও মগজে ঢোকে না।"

ফটোর কথা বলতে গিয়ে বরদাপ্রসন্ন তাঁর উৎসাহ চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না। এখনই সেই ফটো উদ্ধারের জন্যে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন একটা প্রাচীন বেনারসী শাড়ির প্যাকেট হাতে।

লাল রংয়ের এই বেনারসী শাড়ির ভাঁজেই যে বরদাপ্রসন্ন কয়েকখানা প্রাচীন ছবি বহুদিন সযত্নে রেখে দিয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। প্রথমেই একটি ঘোমটা-পরা সালঙ্করা নববিবাহিতার অস্পষ্ট ছবি বেনারসী শাড়ির ভাঁজ থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলো। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে লজ্জাবিধুরা সেই নববধূকে উদ্ধার করে বরদাপ্রসন্নর হাতে তুলে দিলাম। বরদাপ্রসন্ন শান্তভাবে একবার দৃষ্টিপাত করে তাকে সরিয়ে রাখলেন, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করলেন না।

আরও দু'একটা অস্পষ্ট বিবর্ণ ছবি বিনা মন্তব্যে বরদাপ্রসন্ন সরিয়ে রাখলেন। তারপর বেরিয়ে এলো বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের শিরোনামাঙ্কিত সেই বিখ্যাত ছবি। প্রাচীন এক এডওয়ার্ডিয়ান চেয়ারে সম্রাটের মতো সমারূঢ় ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন এবং পদতলে একটি গলাবন্ধ কোট ও ধুতি পরিহিত বিনয়াবনত করুণাপ্রসন্ন হালদার। ছবির এক কোণে কালো চাইনীজ কালিতে মোটামোটা অক্ষরে সায়েবের স্বাক্ষরঃ 'টু কারুণা উইথ লাভ'।

"সায়েব কোম্পানির তোলা ছবি কী জিনিস দেখুন!" ছবিটা হাতে নিয়ে আর একবার তারিফ করলেন বরদাপ্রসন্ন। "খোদ সায়েবকেই যেন চেপ্টে রুটির মতো বেলে আঠা দিয়ে বোর্ডের ওপর লাগিয়ে দিয়েছে।"

ছবিটা সত্যই যে জীবন্ত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। সময়ের সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্র মার্টিন ও হালদারের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। শুধু ছবির একটা কোণ সর্বভূক পোকায় ফুটো করে দিয়েছে।

বরদাপ্রসন্ন আমার হাত থেকে নিয়ে ছবিটা আবার মন দিয়ে দেখলেন। "ভাগ্যে আপনার জন্যে প্যাঁটরা খুললাম। ন্যাপথলিন দেওয়া হয় নি অনেকদিন—রুপোলী মেছো পোকাগুলো কোত্থেকে যে আসে।"

বরদাপ্রসন্ন এবার যেন নতুন কোনো সত্য আবিষ্কার করলেন। "দেখুন, দেখুন—পোকারাও সব কিছু বুঝতে পারে। ফুটো করেছে ঠিক কপালে। সায়েবের কপাল যে ফুটো হয়ে গিয়েছিল, তা এ'রেও অজানা নয়।"

গৃহরচনার সময় গৃহলক্ষ্মী হাতছাড়া হয়ে যাওয়া অবশ্যই ফুটো-কপালের লক্ষণ, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

কিন্তু বরদাপ্রসন্ন জানালেন, "ওই তো শুরু! দ্বিতীয় অঘটন ঘটলো টালিগঞ্জের ঘোড়ার আস্তাবলে। আস্তাবলে আগুন লেগে সায়েবের তিন-তিনটে হীরের টুকরো ঘোড়া একদিন রাত্রে খোঁড়া হয়ে গেলো।"

"প্রাণে বেঁচেছিল, এই যথেষ্ট!" আমি স্বস্তি প্রকাশ করলাম।

"আপনি মশাই, ঘোড়া সোসাইটির কিছুই জানেন না!" ৬৭ শতাংশ বিরক্তির সঙ্গে ৩৩ শতাংশ বকুনি মিশিয়ে মন্তব্য করলেন বয়োজ্যেষ্ঠ বরদাপ্রসন্ন।

আমাকে তিনি বোঝালেন, "এখানে অনেক ঘোড়দৌড় এক্সপার্ট আছে—তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবো'খন। রেসের ঘোড়া আর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া এক জিনিস নয়, বুঝলেন।" পোড়া ঘোড়ার চেয়ে মরা ঘোড়া যে 'বেটার' তা বরদাপ্রসন্ন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই সহজ ব্যাপারটা আমার মাথায় সহজে প্রবেশ করছে না দেখে ভদ্রলোক আরও বিরক্ত হলেন।

বললেন, "শুনে রাখুন, রেসিং ওয়ার্লডে খোঁড়া ঘোড়ার কোনো দাম নেই—সুতরাং তাকে ডেসট্রয় করতে হবে। ডেসট্রয় করা মানেই খরচাপাতি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কেন মরা ঘোড়া ইজ বেটার দ্যান পোড়া ঘোড়া।"

"মাত্র তিন মাস আগে তিনখানা ভেরি হাই ফ্যামিলির ঘোড়া অস্ট্রেলিয়া থেকে মার্টিন সাহেব বহু টাকা খরচ করে আনিয়েছিলেন। আস্তাবলে আরও অনেকের ঘোড়া ছিল, কারুর কিছু হলো না—বেছে বেছে মার্টিন সায়েবের তিনখানা ঘোড়া দাগী হয়ে গেলো।"

মেমসায়েব বিদায় হবার তিনমাস পরেই যে ব্যাপারটা ঘটলো তা করুণাপ্রসন্নর নজর এড়ায় নি। শান্তি স্বস্ত্যয়ন ছাড়া যে গতি নেই তা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টি বাঁধবে কে? বদমেজাজী মার্টিন সায়েবের কাছে কে এই পুজো-আচ্চার প্রস্তাব তুলবে?

বউ হারিয়ে, ঘোড়া পুড়িয়েও সায়েব তখনও টগবগ করছেন, রোজ নতুন বাড়ির খোঁজখবর করতে এ-পাড়ায় স্ট্রীটে আসেন।

বাড়ি তৈরি প্রায় শেষ। বাড়ির ছাদে জলের ট্যাঙ্ক বসেছে, বিলেত থেকে ইলেকট্রিক মোটর পাম্পও এসে গিয়েছে। এই যন্তরের জোরে পাতালের জল সোজা স্বর্গে উঠে যাবে।

থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন ম্যানেজার হয়েছেন করুণাপ্রসন্ন। এ-বাড়ির ভিত খোঁড়া থেকে সব কাজকর্ম যিনি করেছে, এ-সম্মান অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।

করুণাপ্রসন্ন সবিনয়ে একদিন মার্টিন সায়েবকে নিবেদন করলেন, শুভদিন দেখে গৃহপ্রবেশের পুজোটা সেরে ফেলা যাক। গৃহস্বামীকে তিনদিন তিনরাত নতুন বাড়িতে বসবাসেরও অনুরোধ জানালেন করুণাপ্রসন্ন।

কিন্তু গরীবের কথা মেজাজী সায়েবের কানে গেলো না। মার্টিন সায়েবের তখন নতুন বন্ধু হয়েছেন কলকাতার বিখ্যাত ইহুদি এস্টেট এজেন্ট রবার্ট কোহেন।

"এস্টেট এজেন্ট বোঝেন তো?" বরদাপ্রসন্ন আমাকে প্রশ্ন করলেন।

এই ধরনের এজেন্টের কী কাজকারবার আমার ভালভাবে জানা নেই। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "বাড়ি বেচা কেনা, ভাড়া দেওয়া থেকে শুরু করে বিষয়সম্পত্তি তদ্বির তদারকীর সব কাজ এজেন্ট করে থাকেন। এখনও নানা কোম্পানি এই লাইনে খুব ভাল কাজ করে যাচ্ছেন।"

আমার মনে পড়ে গেলো, অনেকদিন আগে ট্যালবট কোম্পানির আপিসে একবার গিয়েছিলাম। এক সময়ে এসপ্ল্যানেডের এই টাওয়ার হাউসই ছিল

কলকাতার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি।

বরদাপ্রসন্ন বিরক্তভাবে মন্তব্য করলেন, "নিশ্চয় কোনো খাশ সাহেবের সঙ্গে ওখানে যান নি।"

বরদাপ্রসন্ন ঠিকই আন্দাজ করেছেন, আমি গিয়েছিলাম এক পূর্ববঙ্গীয় বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু বরদাবাবু কী করে বুঝলেন?

একগাল হেসে তিনি বললেন, "এর মধ্যে হস্তরেখা বা কোষ্ঠীবিচার কিছুই নেই। স্রেফ টু প্লাস টু ইজিকল্টু ফোর—অঙ্কের ফরমুলায়।"

রহস্য উন্মোচনের আশায় আমি আরও উৎসুক হয়ে উঠলাম।

বরদাপ্রসন্ন ব্যাখ্যা করলেন, "দিশী লোকরা বলে ট্যালবট। কিন্তু খাঁটি সায়েবের বাচ্চারা উচ্চারণ করবে টলবাট।" প্রকৃত উচ্চারণ দেখাতে গিয়ে বরদাপ্রসন্ন গলা দিয়ে কীরকম ঘড়-ঘড় আওয়াজ বার করলেন। তারপর আমাকেও সঠিক নামোচ্চারণে উৎসাহিত করলেন। আমার আপাতব্যর্থতায় বিরক্ত হলেন না বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "চিঁড়ে-মুড়িখেগোদের কম্মো নয়, স্যার। গোরু মোষ মদ অনর্গল পেটে না পড়লে সব ইংরিজী উচ্চারণ সঠিকভাবে গলা দিয়ে বেরোয় না।"

"আপনার তো বেরুচ্ছে।" আমার এই মন্তব্যে হুঙ্কার ছাড়লেন বরদাপ্রসন্ন হালদার। "আমার কথা আলাদা। চাকরি বাঁচাবার দায়ে আমাকে সঠিক উচ্চারণের রিহার্শাল দিতে হয়েছিল।"

গলার ভল্যুম কমিয়ে দিলেন বরদাপ্রসন্ন। "আপনাকে বলতে বাধা নেই, সেবার যে গুজব উঠলো, এ-বাড়ি ম্যানেজমেণ্টের দায়িত্ব টলবাট কোম্পানিকে দেওয়া হবে। আমরা তখনও সরল মনে আপনার মতো ট্যালবট-ট্যালবট উচ্চারণ করে যাচ্ছি। খবর পেয়েই রিহার্শাল দিয়ে নিলুম—শেষ পর্যন্ত কী যে হলো, এই সম্পত্তির দায়িত্ব টলবাটের কাছে গেলো না।"

কোহেন প্রসঙ্গে ফিরে আসবার জন্যে বরদাপ্রসন্নকে মনে করিয়ে দিতে হলো। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "যা বলছিলুম, নিজের স্বার্থে ইহুদি কোহেন তখন মার্টিন সায়েবকে খুব ভজাচ্ছেন। দুদিন সায়েবের সঙ্গে টালিগঞ্জের আর-সি-জি-সিতে ডাণ্ডাগুলি খেললেন—তারপর একদিন সায়েবকে নিয়ে চলে গেলেন সল্ট লেকে পাখি মারবার জন্যে।"

"মার্টিন সাহেবের ওই মহৎ দোষ। বন্ধুত্ব হলে তার সাতখুন মাপ! কোহেনের সঙ্গে তখন সায়েবের হলায়-গলায় ভাব। করুণাপ্রসন্নর প্রস্তাবটা আলোচনা করবার লোক পেলেন না মার্টিন সায়েব—কোহেনের সঙ্গেই শলাপরামর্শ হলো।"

বরদাপ্রসন্ন এবার মন্তব্য করলেন, "বিনাশকালে বিকৃতবুদ্ধি! তখন মিষ্টি উপদেশও তেতো লাগে, বন্ধুকে মনে হয় শত্রু, আর শত্রুকে আপনজন।"

ইহুদি কোহেন সাহেব করুণাপ্রসন্নর প্রস্তাব ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। পরামর্শ দিলেন, "ইফ ইউর বাবু টু পাইস কামাতে চায়, ওকে কয়েকটা টাকা বাকশিস দাও। হোয়াট আই সাজেস্ট ইজ প্রপার হাউস ওয়ার্মিং!"

"বাড়ি গরম মানে বুঝতেই পারছেন," টিপ্পনী কাটলেন বরদাপ্রসন্ন। কলকাতার এই নতুন ধরনের ফ্ল্যাট বাড়ি কেষ্ট-বিষ্টুদের দেখাবার জন্যে স্পেশাল আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা হলো। তৈরি হলো বন্ধু-বান্ধবদের স্পেশাল লিস্টি। কোহেন সায়েব মতলব দিলেন, এর ফলে ভাল প্রচার হবে

এবং শাঁসালো ভাড়াটে পাবার সুবিধে হবে।

কোহেন সাহেবের নিজস্ব মদের দোকান ছিল, সেখান থেকে বাক্স-বাক্স মদ এলো। খাবার দাবারের এলাহি ব্যবস্থা। একসময় করুণাপ্রসন্ন শুনেছিলেন, স্বয়ং লাটসায়েব আসবেন এই পার্টিতে।

"ভাগ্যে আসেন নি লাটসায়েব!" বরদাপ্রসন্ন এমনভাবে কথাগুলো বললেন যেন গতকালই ব্যাপারটা হয়েছে এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা না-করে লাটসায়েব মহাবিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন।

"বিপদ বলে বিপদ!" বরদাপ্রসন্ন আমাকে শুনিয়ে দিলেন। সন্ধ্যে সাতটা থেকে নাচ-গান হৈ-হল্লা আরম্ভ হলো এই বাড়িতে। সোডা ও হুইস্কির বোতল খুলতে খুলতে বেয়ারারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

"তারপর কী যে হলো ভগবান জানেন," ফিসফিস করে বললেন বরদাপ্রসন্ন। "এক এক করে সায়েবরা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, টয়লেটগুলো কোন্ দিকে? প্রথমে দু' তিনজন। তারপর জনা-দশেক। করুণাপ্রসন্ন তো তাজ্জব। মার্টিন সায়েবের অনেক পার্টিতে তিনি খাটাখাটনি করেছেন, কিন্তু কখনও একসঙ্গে এতোজন অতিথিকে বাথরুমের খোঁজখবর করতে দেখেন নি।"

"বুঝতে পারছেন কিছু মশাই?" বরদাপ্রসন্ন আমাকে কোশ্চেন করলেন।

"ফুড পয়জেনিং?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ঠিক ধরেছেন—খাদ্যে বিষক্রিয়া। শুভদিনে হিতে বিপরীত। এক ঘণ্টার মধ্যে বেশ কয়েকজন অতিথিকে ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়ে পি-জি হাসপাতালে চালান করতে হলো। গভীর রাতের দিকে মিস্টার ডেসমণ্ড টোটী গত হলেন। এমনই পোড়াকপাল, এই টোটী সায়েব হলেন আবার মার্টিন মেমসায়েবের নিকট আত্মীয়—নিজের কাকা।"

হৈ-চৈ পড়ে গেলো সারা কলকাতা শহরে। বিশ্রী সব গুজব ছড়িয়ে পড়লো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। কেউ বললো, মার্টিন সায়েব নাকি নিজের ভূতপূর্ব বউকেও নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে নাকি বেঘোরে মারা পড়লেন টোটী সায়েব।

মার্টিন সায়েব নিজেও মদ গিলেছেন কিন্তু তাঁর কিছুই হয় নি। একবারও বাথরুমে যান নি তিনি। পরের দিন লজ্জায় ও দুঃখে তিনি মাথার চুল ছিড়ছেন। কলকাতা শহরে এতোগুলো অতিথির একসঙ্গে এমন বিপদের কথা অনেকদিন কেউ শোনে নি।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হলো না। যথাসময়ে পুলিশের আবির্ভাব। গৃহপ্রবেশ করতে গিয়ে খোদ মার্টিন সায়েব লালবাজারের শ্রীঘর প্রবেশ করলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেলো, যথাসাধ্য চেষ্টা করেও করুণাপ্রসন্ন লালবাজারের ফাটক খোলাতে পারলেন না। বাজারে গুজব, যথাস্থানে দশ হাজার টাকা প্রণামী দেবার চেষ্টা করেও সায়েবের বন্ধু রবার্ট কোহেন কোনো সুবিধে করতে পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত আসরে উপস্থিত হলেন মার্টিন সায়েবের ভূতপূর্ব সহধর্মিণী প্যামেলা। টোটী সায়েবের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্যামেলা মেমসায়েব কালো জামাকাপড় পরে বজবজ থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। স্পেনসেস হোটেলে লাগেজ জমা দিয়ে সোজা গিয়েছিলেন কবরখানায়। কবরখানার পুজোআচ্ছা সেরে সোজা চলে গেলেন লালবাজারে। সেখানে

মেমসায়েব নাকি মার্টিন সায়েবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পরে প্রাক্তন স্বামীর দুঃখে বিগলিত হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে হাজির হয়েছিলেন পুলিশের বড়কর্তার কাছে।

ষড়যন্ত্রের গাল-গল্পটা ততক্ষণে কলকাতায় বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই আশা করেছিল মেমসায়েব নিজেও কাকার মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে তদন্ত চাইবেন। কিন্তু পুলিসকর্তাদের সামনে মেমসায়েব নিজের ভূতপূর্ব স্বামীর জন্যেই কান্নাকাটি করলেন। বললেন, "ডেভিডকে লালবাজার থেকে না বার করা পর্যন্ত আমি বজবজ ফিরছি না। আমি জানি, বেচারা ডেভিড ইনোসেন্ট, ওর কোনো দোষ নেই। কোহেনের পাঠানো দুটো নোংরা ইন্ডিয়ান কুকের গাফিলতীর জন্যে বেচারা ডেভিড কষ্ট পাবে, আমি ভাবতে পারছি না।"

একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "তখন সায়েবী আমল। খোদ মেম-সায়েবের চোখের জলে লালবাজারের লোহা গলে গেলো।"

মার্টিন সায়েব সসম্মানে ছাড়া পেলেন। তার বদলে হাজতে ঢুকলো বাবুর্চি লিন্টো এবং বাবুর্চি আখতার আলী, এনটালির কোন গলি থেকে কোহেন সায়েব এদের জোগাড় করে এনেছিলেন।

হাজত থেকে যে-মার্টিন সায়েব বেরিয়ে এলেন তিনি যেন অন্য লোক। বাহাত্তর ঘণ্টার ঝড়ে তিনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছেন।

নতুন বাড়ির দিকে সায়েব আসেনই না। করুণাপ্রসন্ন ততদিন নতুন বাড়ির পুরো দায়িত্ব নিয়েছিল। ভাড়াটের জন্যেও নানাদিকে চেষ্টা-চরিত্র লাগিয়েছেন। কিন্তু এ-পাড়ায় তখন থ্যাকারে ম্যানসন সম্বন্ধে গোপনে নানা গুজব ছড়িয়েছে—কেউ এখানে সাহস করে ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চায় না।

সায়েবের অনুমতি নিয়ে ভাড়ার রেট কমানো হলো। তিন মাসের ভাড়া জামানত নেবার যে-পরিকল্পনা কোহেন সায়েব দিয়েছিলেন তাও মকুব করা হলো। একটি পয়সা খরচ না করেও যে কোনো লোক সোজা এই থ্যাকারে ম্যানসনে সংসার তুলে আনতে পারে। তবু চারে মাছ নেই।

ওপনিং নাইটের গোলমালের পর কোহেন সায়েবের সঙ্গে মার্টিন সায়েবের মুখ দেখা পর্যন্ত বন্ধ। মার্টিনের ধারণা, কোহেনের গাফিলতির ফলেই কলকাতার হাই সোসাইটিতে তাঁর এই অপমান হলো।

মনের দুঃখে মার্টিন সায়েব একদিন প্রিয় করুণাপ্রসন্নকে বললেন, "ভাবছি, কলকাতা ছেড়ে হংকং চলে যাবো। আমার নতুন বাড়িখানা তুমিই কিনে নাও।"

করুণাপ্রসন্ন ভাবলেন, মদের ঘোরে সায়েব তাঁর সরকারের সঙ্গে রসিকতা করছেন। এই বিরাট প্রাসাদ কিনবে কি না কালিঘাটের সামান্য একজন সরকার! সায়েব বলেছিলেন, "পেমেন্টের জন্যে কোনো চিন্তা নেই। ধীরে-সুস্থে নেকসট পঁচিশ বছর ধরে বাড়িভাড়ার একটা অংশ পাঠিও—তাতেই দাম শোধ হয়ে যাবে।"

পুঁটিমাছের ছিপে আধমণি কাতলা তুলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না করুণাপ্রসন্ন হালদার।

সায়েবের প্রস্তাবটা তিনি অবাস্তব স্বপ্নের মতো হেসে উড়িয়ে দিলেন।

তারপর মার্টিন সায়েব শ্যামলাল গুপ্তা নামে এক জাঁহাবাজ কালোয়ারের

সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। শ্যামলালজী টুটা-ফাটা বাসনপত্তর কেনার ফেরিওয়ালা হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ভাঙা শিশি-বোতল এবং ছেঁড়া কাগজ সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে যথাসময়ে তিনি টুপাইস কামিয়েছিলেন। শ্যামলালজী রদ্দি মালের ব্যবসা থেকে এই ব্র্যান্ড নিউ বাড়ির লাইনে আসতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু স্ক্র্যাপের দামেই বিরাট এই বাড়ি পাওয়ায় নিজের লোভ সামলাতে পারলেন না।

মার্টিন সায়েব অবশ্য করুণাপ্রসন্নর কথা একেবারে ভোলেন নি। শ্যামলাল গুপ্তার সঙ্গে করুণাপ্রসন্নর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন, করুণাপ্রসন্নকে চাকরিতে বাহাল রাখতে। সাহেব বলেছিলেন, "মিস্টার গুপ্টা, কিপ কারুণা। এ-বাড়ির প্রতিটা ব্রিক সে চেনে। কারুণার জন্যে তোমাকে কোনোদিন ট্রাবল পেতে হবে না—ইউ উইল নেভার রিগ্রেট ইট।"

দূরদর্শী সাহেব বোধ হয় শ্যামলাল গুপ্তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেন নি। বিক্রির আগে আর এক শর্ত দিয়েছিলেন। ওপরের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে করুণাপ্রসন্ন যতদিন খুশী থাকতে পারবেন—শ্যামলাল গুপ্তার চাকরি না করলেও করুণাপ্রসন্নকে ভাড়া দিতে হবে না।

সায়েবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কালোয়ার শ্যামলাল গুপ্তা সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন—কিন্তু সেই সুযোগে জলের দাম থেকেও হাজার খানেক টাকা কমিয়ে নিয়েছিলেন।

তারপর ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একদিন কলকাতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে হংকং-এ পাড়ি দিলেন। বরদাপ্রসন্ন হালদারের স্মৃতি ছাড়া কলকাতার আর কোথাও আজ তাঁর স্থান নেই।

মার্টিন সায়েবের দুঃখে এই এতোদিন পরেও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার। বললেন, "গৃহ করতে গিয়ে গৃহহারা হলেন ভদ্রলোক—গ্রহনক্ষত্রের এমনই লীলাখেলা।"

"তবে শুনেছি, কলকাতা ত্যাগ করে হংকং গিয়ে সায়েবের সপ্তম স্থানটা আবার ঠিক হয়ে গেলো। মার্টিন মেমসায়েব বজবজের পাটকল সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করে আবার একদিন ফিরে গিয়েছিলেন স্বামীর কাছে। সায়েব ততদিনে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন—তবু শেষ জীবনে দাম্পত্য সুখ ফিরে পেয়েছিলেন ভাবতে আনন্দ হয়।"

"শ্যামলাল গুপ্তার কী হলো ?" আমি জানতে চাই।

বরদাপ্রসন্ন উত্তর দিলেন, "যে-কপালে ডাস্টবিনের ভাঙা শিশি বোতল এবং ছেঁড়া কাগজ থেকে লাখ-লাখ টাকা রোজগার হয় সে কি যা-তা কপাল! তার ওপর ভদ্দরলোকের দেবদ্বিজে অগাধ বিশ্বাস। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যেখানে যত দেবদেবীর মন্দির আছে সেখানে পুজো আর প্রণামী দিয়ে সব দেবতাকে সন্তুষ্ট করে রেখেছেন।"

শ্যামলালজী প্রথমেই করুণাপ্রসন্নর সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। বললেন, "কাগজে কলমে মালিক আমি, কিন্তু কাজকর্মে এই থ্যাকারে ম্যানসনের কর্তা তুমিই।"

ভাল করে পুজো-আচ্ছার ব্যবস্থা করলেন শ্যামলালজী। বেনারস থেকে দ্বাদশটি পুরোহিত আনালেন সেই জন্যে। দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্যে একবার ভাবলেন, বাড়ির নাম পাল্টে বাসুকী ম্যানসন করবেন। কিন্তু করুণাপ্রসন্ন

উৎসাহিত হলেন না—ম্লেচ্ছ নামে যে-বাড়ি একবার এ‍ঁটো হয়ে গিয়েছে তা আবার নাগ দেবতাকে নিবেদন করাটা নিরাপদ হবে না। বুদ্ধিমান শ্যামলাল গুপ্তা সরকারমশায়ের কথা শুনলেন। কিন্তু সরকারমশায়ের সঙ্গে তিনি বালিয়া জেলার যে দারোয়ান রাখলেন, তার মুখে-মুখে ম্লেচ্ছ 'থ্যাকারে ম্যানসন' ক্রমশ 'ঠাকুরে ম্যানসন' হয়ে উঠলো।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এতো পুজো-আচ্ছা করেও প্রথম কয়েক মাস ভাড়াটে জুটলো না। শুধু একতলায় রাস্তার ধারে কিছু চীনে দোকানদার জুটলো। ওদের খাদ্য-অখাদ্য, ধর্ম-অধর্ম, শুভ-অশুভ জ্ঞান নেই! কেনা-বেচার পছন্দমতো জায়গা পেলেই ওরা দোকানপত্তর খুলে বসে।"

দু' মাস পরে অধৈর্য শ্যামলাল গুপ্তা করুণাপ্রসন্নকে ডেকে পাঠালেন। করুণাপ্রসন্ন বললেন, "আরও কয়েকটা মাস দেখুন, তারপর যা-হয় করবেন। বদনাম যা ছড়িয়েছে তা মুছতে সময় একটু লাগবে।"

তারপরেই দুম করে শ্যামলালজীর চাপা ভাগ্যের ঢাকনা খুলে গেলো। ১৯১৮ সালে ইউরোপে ইংরেজ-জার্মানের মধ্যে রাম-রাবণের লড়াই শুরু হলো এবং বেশ কিছু নতুন সায়েবকে মাথা গোঁজবার ঠাঁই দেবার জন্যে সরকার বাহাদুর হঠাৎ সমস্ত থ্যাকারে ম্যানসন রাতারাতি দখল করে বসলেন।

"বুঝুন মশাই! একখানা ঘরের ভাড়া জুটছিল না; হঠাৎ গোটা বাড়ি-খানাই ভাড়াটেতে বোঝাই হয়ে গেলো।" বরদাপ্রসন্নর চোখে মুখে বিস্ময়।

"আধা-পল্টনী সায়েবদের আজব কাণ্ডকারখানা দেখে করুণাপ্রসন্ন তো থ্যাকারে ম্যানসনে নিজের কোয়ার্টারে চাবি মেরে সস্ত্রীক আবার কালী-ঘাটের সদানন্দ রোডে বাসা ভাড়া নিলেন। ধনুর্ধর শ্যামলাল গুপ্তা সুযোগ বুঝে গভরমেণ্টের বড় বড় অফিসারের কাছে গিয়ে এমন পিটিশন করতে লাগলেন যেন আচমকা পুরো বাড়িখানা দখল করে নিয়ে সরকার তাঁকে পথে বসিয়েছেন।"

শ্যামলালজী কেন এরকম করলেন আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম না। বরদাপ্রসন্ন ব্যাখ্যা করলেন, "টুটা-ভাঙা বাসন বেচা বুদ্ধি! কোথায় লাগে ব্যারিস্টাররা। এই কায়দায় শ্যামলালজী বাড়ি ভাড়ার রেট যতখানি পারলেন বাড়িয়ে নিলেন। বাড়ির মেরামতির দায়িত্বও নিজের ওপর রাখলেন না—গভরমেণ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বললেন, আধা-মিলিটারির ব্যাপার, ওখানে প্রাইভেট মিস্ত্রি কুলি ঢুকতে না-দেওয়াই ভাল।"

"কপাল মশাই কপাল!" মন্তব্য করলেন বরদাপ্রসন্ন। "কপাল না থাকলে, পাঁচ সিকের মালের জন্যে কেন আপনি পাঁচ টাকা ভাড়া পাবেন, বলুন? এর পরেও যখন কেউ বলে দেবদ্বিজে ভক্তি করে লাভ নেই তখন রাগে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।"

বার্ধক্যে করুণাপ্রসন্নর নাকি আফসোসের সীমা ছিল না। হিসেব করে দেখেছিলেন যে, সাহস করে মার্টিন সায়েবের কাছে বাড়িটা নিলে মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়ে যেতো—সরকারী ভাড়াতেই কয়েক বছরের মধ্যে সায়েবের পাওনা টাকা শোধ হয়ে যেতো। সায়েব তো ক্যাশ টাকাও চান নি—বলেছিলেন যতদিন ধরে খুশী শোধ কোরো।

এরকম ঘটনা এদেশে এই শেষ নয়। বরদাপ্রসন্ন একটা পুরনো ম্যানসনের সরকারগিরি করলেও খবরাখবর রাখেন। বললেন, "এরকম গপ্পো হলেও

সত্যি কত হচ্ছে! দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে হিল স্টেশনের এক ছোট্ট হোটেলের সায়েব-মালিকের শরীর খারাপ করলো। কিস্তিবন্দীতে হোটেলটা সায়েব বিক্রি করে গেলেন তাঁর কেশিয়ারকে। হিল স্টেশনের সেই কেশিয়ারের ভাগ্য খুললো কিন্তু আমাদের এই কলকাতায়।"

"আপনি তো হোটেলে চাকরি করেছেন?" বরদাপ্রসন্ন আমার সম্বন্ধেও কিছু খবরাখবর জোগাড় করে ফেলেছেন। "তা হলে ওমুক হোটেলের গপ্পো নিশ্চয় শুনেছেন—এই বলে মস্ত এক হোটেলের নাম করলেন তিনি। কেউ মরে বিল ছেঁচে কেউ খায় কই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক খরচাপাতি করে অমন রাজপ্রাসাদের মতো হোটেল তৈরি করলেন এক সায়েব। কিন্তু এমনই কপালদোষ জলের ট্যাঙ্কের কোনো গোলমালে নতুন হোটেলে শতখানেক বাসিন্দার রাতারাতি জন্ডিস রোগ ধরলো। এপিডেমিক বলতে যা বোঝায়! খাপ্পা হয়ে কর্পোরেশন হোটেল বন্ধ করে দিলো—চারদিকে বদনামের ঢিঢি পড়ে গেলো।"

বরদাপ্রসন্ন শোনালেন, "তারপর তা জানেনই। ইঁটের দামে হোটেল বাড়িখানা বেঁচে দেবার জন্যে ভদ্দরলোক কত চেষ্টা করলেন। বাঙালী ধনী রায়, দত্ত, মল্লিকমশায়রা এটর্নির সঙ্গে শলাপরামর্শও করলেন। কিন্তু ওই বাঙালীর যা দোষ—নরম মাটি দেখলে আরও দরদস্তুর করতে ইচ্ছে হয়। সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্যে তারা লেবু তেতো করে ফেললো। ইতিমধ্যে হিল স্টেশনের ছোট হোটেলের নতুন মালিক মায়ের নাম করে কলকাতায় হাজির হলেন এবং বড় ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।"

"তারপর?" আমার প্রশ্নের উত্তরে বরদাপ্রসন্ন হেসে ফেললেন।

"গড়ই বলুন, আল্লাই বলুন, আর মা-লক্ষ্মীই বলুন এঁরা যাঁকে দেন তাঁকে ছপ্পর ফুঁড়েই দেন। ভগবানের নাম করে বুক ঠুকে বন্ধ হোটেল-বাড়ি কেনবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেলো এবং বিরাট এই হোটেলবাড়ি পুরোপুরি রিকুইজিশন করলো সাদা চামড়ার মিলিটারিরা। পাঁচটি বছরের জন্যে হাউস ফুল—মদ মাংসের মোচ্ছব লেগে রইলো ডে অ্যান্ড নাইট, পুরো ফাইভ ইয়ারস। যে-বাড়ির খদ্দের জুটছিলো না তাই হয়ে গেলো জেনুইন হীরে। ভাবা যায় না!"

"আপনি এসব খবর জানলেন কী করে?" আমি প্রশ্ন করি।

"কলকাতার অর্ধেক লোক এই গপ্পো জানে, মশাই। আপনি কী বলছেন।" তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন বরদাপ্রসন্ন। "সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো, ওই মল্লিক ফ্যামিলির লোকরা করুণাপ্রসন্নর ঘটনাটা জানতেন। করুণাপ্রসন্নর ছোট ভাই ওঁদের বাড়িতে কুলপুরোহিত ছিলেন। আর ঠাকুরে ম্যানসন হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখটা করুণাপ্রসন্নর মনে এতোই লেগেছিল, যে শেষ জীবনে ডেকে-ডেকে আত্মীয়বন্ধুদের কাছে দুঃখ করতেন, "স্বয়ং লক্ষ্মী রিক্সা চেপে এসে আমার ঘরে কড়া নাড়লেন—আমি বুঝতে পারলাম না, তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিলাম না।"

করুণাপ্রসন্নর সঙ্গে বরদাপ্রসন্নর সম্পর্ক কী তা জানবার জন্যে আমি ক্রমশ আরও বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠছি। কিন্তু কোনো কারণে বরদাপ্রসন্ন ও-ব্যাপারে আলোকপাত করতে উৎসাহী হলেন না। এতো কথা হচ্ছে, কিন্তু ওই ব্যাপারে যখন বরদাপ্রসন্ন নির্বাক তখন নিশ্চয় কোনো বিশেষ যুক্তি আছে। এ বিষয়ে আমি আপাতত কৌতূহল নিবারণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

ওদিকে কালোয়ার শ্যামলাল গুপ্তার কপালে কী হলো তা বরদাপ্রসন্ন চেপে রাখলেন না। বললেন, "টুটা-ফাটা বিক্রি করা কপালের সব ফুটো ঈশ্বর এবার মেরামত করে দিলেন। রমরমা হয়ে উঠলো এই ঝিমিয়ে-পড়া সাডার স্ট্রীট। গোরা অফিসারদের দয়ায় ঠাকুরে ম্যানসনের চীনে দোকানগুলোও টু-পাইস কামাতে লাগলো। একজন লোকাল চাইনীজ ছোকরা বেণ্টিক স্ট্রীটে জুতোর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে এখানে চাইনীজ খাবারের দোকান করে-ছিল। গোরা অফিসার তো, মুচির দোকানের চাকরের চাইনীজ রান্না খেয়েই তোফা তোফা করতে লাগলো। আসলে মদের নেশায়, সয়াবীন সসে চামড়া ডুবিয়ে দিলেও ওরা বুঝতে পারবে না।"

বুড়ো চাইনীজ প্রথমে দোকানের নাম দিয়েছিল হোয়াং-হো। গোরাদের সাপোর্ট পেয়ে চীনে সায়েব মদের লাইসেন্স নিলো। নাম পাল্টে রাখলো সিলভার ড্রাগন।

বরদাপ্রসন্নকে চীনাদের ওপর খুব সন্তুষ্ট মনে হলো না। বললেন, "এ-জাতের কাজকর্মের কিছুই মানে বুঝি না, মশাই। মুখ দেখে বুঝতেই পারি না হাসছে না রেগে আছে।"

শাজাহান হোটেলের আমল থেকেই আমি চীনা ভক্ত। ওই হোটেলে একটা বড় চীনা সেকশন খোলবার জন্যে সত্যসুন্দরদা অনেকবার চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু তেমন সুবিধে হয়নি।

বরদাপ্রসন্নকে আমার মতামত জানালাম, "যাই বলুন, চীনা রান্নাটা খুব ভাল। শত শত বছরের সাধনায় ঐ বিদ্যে ওরা আয়ত্ত করেছে।"

মুখ বিকৃত করলেন বরদাপ্রসন্ন। "কী জানি মশাই, আমার তো মোটেই ভাল লাগে না। আমার এখানে এক চাইনীজ ছুতোর কাজ করতো। সে একবার ট্যাংরায় তার বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। যাবার আগে বেটাকে দিয়ে মা-কালীর নামে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিলুম, যে আমার খাবারে গরু, শুয়োর, পাখীর বাসা, কিছু মেশাবে না। কিন্তু মশাই, মাছের রান্না মুখে দিয়েই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে আর কি! যারা ভাজা কাকে বলে জানে না, তাদের আবার রান্না কী? খাবার সময় মশলাপাতি সব আলাদা আলাদা করে আমার সামনে বসিয়ে দিলো, বললে তোমার পছন্দ মতন এইসব মিশিয়ে নাও। আরে বাপু, আমিই যদি সব মিশিয়ে নেবো, তাহলে তুমি কী রান্না করলে?"

বরদাপ্রসন্ন নিতান্ত অবুঝ লোক নন—চাইনীজ রান্না সম্বন্ধে সবাই যে তাঁর সঙ্গে একমত হবে না সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ। একটু কেশে বললেন, "ঠিক হ্যায়; তোমার ছাগল তুমি যেভাবে খুশী কাটো—তোমার রান্না তুমি যেভাবে ইচ্ছে করো কিন্তু তা বলে খাবার সময় ভূতপ্রেত দৈত্যদানার নাম করবে? খাবার আগে আমরা মশাই ঠাকুর দেবতাদের স্মরণ করি—যারা অভুক্ত তাদের কথা ভেবে ছিটেফোটা উৎসর্গ করি। আর এই চীনেরা দেখুন, খাবার টেবিলের সামনে একটা দাঁত বার করা ড্রাগন এঁকে রেখে দিয়েছে। রাক্ষসের থেকেও খারাপ জীব এই ড্রাগন—দেখলে দাঁতকপাটি লেগে যায়!"

মনে হলো, এ বিষয়ে বরদাপ্রসন্নর কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

সাধারণত ড্রাগন দেখে অনেকে মজা পেয়ে থাকে। বরদাপ্রসন্নকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, "রেস্তোরাঁর ড্রাগন তো হয় সিলভার, না-হয় গোল্ডেন —পুতুলে ভয়ের কী থাকতে পারে?"

আমার কথায় বেশ বিরক্ত হলেন বরদাপ্রসন্ন হালদার। "আপনিও এই কথা বলছেন! ড্রাগনের মুখোমুখি এখনও তো হন নি। কিন্তু ঠাকুরে ম্যানসনে যখন এসেছেন তখন নিশ্চয় ড্রাগনকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।"

বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। এ-বাড়ির পূর্বদিকে বস্তিপাড়া থেকে তোলা-উনুনের ধোঁয়া ঝাঁক-ঝাঁক পিতৃপরিচয়হীন মেঘের মতো ঠাকুরে ম্যানসনের সন্ধ্যাকে ধূসরতর করে তুলেছে। বরদাপ্রসন্ন ফিসফিস করে বললেন, "বাস্তুসাপ বোঝেন? যিনি বাড়িতে থেকেই সবাইকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষে করেন? এ-বাড়িতেও তিনি ছিলেন। করুণাপ্রসন্নর আমলেই তাঁকে কয়েকবার দেখা গিয়েছিল—দারোয়ানরা কিছুই বলতো না। বলবেই বা কেন? বাস্তু সাপ তো কারুর ক্ষতি করে না। কিন্তু ওই চীনে চামার—জুতোর দোকান ছেড়ে এসে যে বাউনঠাকুরের কাজ নিলো—টুং টাং না ওই ধরনের কী একটা নাম, এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না।"

বাক্য সমাপ্ত না করে বরদাপ্রসন্ন মাথা চুলকোতে লাগলেন। তারপর বললেন, "না, ভুল হয়ে গিয়েছে টুং টাং না, পিন উটাং নাম ছিল ওই চীনে হোটেলের মালিকের। সে মশাই বলা নেই কওয়া নেই একদিন ওই বাস্তু সাপকে লাঠি দিয়ে সবার সামনে মেরে ফেললো! ওই যে রামসিংহাসন চৌরাশিয়া আমাদের দারোয়ান, ওর বাপ নীতিরাজ সিং তখনও এখানে কাজ করছে। চীনে সায়েবকে সে বারণ করেছিল—কিন্তু চীনে সায়েবের তখন টাকার মেজাজ, যুদ্ধের বাজারে গোরাঅফিসারদের কাছে অর্ধেক হুইস্কি অর্ধেক জল বেচে অনেক টাকা কামিয়েছে। নীতিরাজের কথা সে শুনলোই না।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "তারপর মশাই, ওই পিন উটাং-এর ভাইপো, হংকং না ক্যান্টন কোথা থেকে আর এক চীনেকে ধরে নিয়ে এলো। শুনেছি, তাকে দেখলে মনে হতো গুণ্ডা—গুলি গুলি চোখ, ঝুলে-পড়া গোঁফ, মাথায় হাফ টাক হাফ বেণী, অনেকটা আর্ধনারীশ্বর গুণ্ডার মতন! অথচ চীনে সায়েবের ভাইপো বললো, ইনি নাকি চীনে সন্ন্যাসী। দু চারদিনের পুজোআচ্ছার জন্যে এখানে এসেছেন।"

এই ঠাকুরে ম্যানসনে কত গল্প যে জমা হয়ে আছে তা আন্দাজ করতে পারছি না।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আসলে ওই চীনে সন্ন্যাসী তুকতাক করে, মন্তর পড়ে আমাদের বাসুকীকে হটিয়ে ওই হোটেলের মধ্যে সিলভার ড্রাগন বসিয়ে গেলো। দেড়মাস ধরে কী সব স্পেশাল রং এবং আরও সব জিনিসপত্তর দিয়ে লোকটা দেওয়ালের গায়ে ওই ড্রাগনকে বসালো, তারপর তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলো।"

"প্রাণ প্রতিষ্ঠা কী জিনিস?"

"বাউনের ছেলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বোঝেন না!" বিরক্ত হলেন বরদাপ্রসন্ন। "মাটির মূর্তি তো গড়লেই হলো না—আসল পুজোর আগে পুরুতমশাই প্রথমে মন্তর ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ওঁ বাঙমনশ্চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগতা সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।... ইহা গচ্ছ, ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।"

"বোধ হয় গোপন সব চীনে মন্তর বলিয়ে ওই আঁকা-ড্রাগনকে ওরা জাগ্রত করে ফেললো।"

"কোথায় এই ড্রাগন ঠাকুরকে বসালো জানেন? এক স্পেশাল ঘরে—মাটির তলায়। ঘরের মধ্যে ঘর শুধু নয়,—এখানে ঘরের তলাতেও ঘর! বেসমেণ্টে সবাই ঢুকতে পেতো না। গোপন কোনো পুজো-আচ্ছার ব্যাপার হয়তো আছে। গভীর রাতে ধূপ টুপ জেবলে কী সব যাগযজ্ঞও হতো। তেমনি এক গভীর রাতে আমি লাইফে একবার সেই রূপালী-ড্রাগনকে দেখেছিলাম। ভাবলে আমার গা এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে!"

মুখ বেঁকালেন বরদাপ্রসন্ন। "নানা লোকের পাল্লায় পড়ে বাড়িটার জাত নষ্ট হয়েছে ভাবতে কষ্ট লাগে।"

যথাসময়ে বরদাপ্রসন্ন হালদার আমাকে ঠাকুরে ম্যানসনের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারের কী কাজ তা ঠিক আমার জানা নেই। কিন্তু সেজন্য আমি চিন্তা করছি না। আমার পিছনে ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েবের আদালতী অভিজ্ঞতা রয়েছে। শাজাহান হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে অসংখ্য মানুষকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এই দুই মিলিয়ে কাজ চালিয়ে দেবো এমন মনোবল হয়েছে।

বরদাপ্রসন্ন স্মৃতির বন্ধ দরজা খুলে অতীতের গল্প শুনিয়েছেন। কিন্তু কাজের ব্যাপারে কতখানি কী সহায় হবেন তা এখনও জানি না। আমি যে এই কাজে একেবারেই অনভিজ্ঞ তা বরদাপ্রসন্ন এখনও বোধ হয় আন্দাজ করতে পারেন নি।

উকিল পাড়ার একটা চালু কথা মনে পড়ে গেলো। ভাল উকিলকে যে দুনিয়ার সব আইন জানতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু তিনি জানেন কোথায় কোন আইনের খোঁজ করতে হবে। আশঙ্কিত মনকে আশ্বস্ত করলাম, "বিরাট বড় এই বাড়িটা চৌরঙ্গী থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; প্রত্যেক ফ্ল্যাটে ভাড়াটে বসবাস করছে। ম্যানেজারের কী এমন রাজকার্য থাকতে পারে যা তোমার সাধ্যে কুলাবে না?"

যথেষ্ট মনোবল নিয়েই বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে একতলায় আপিস ঘরে নেমে এসেছি। ছোট্ট একখানা টেবিল এবং গোটা তিনেক চেয়ারের সঙ্গে একখানা দড়ির খাটিয়াকে আপিস ঘরে সহ-অবস্থান করতে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। সবুজ রংয়ের দেওয়ালে দুখানা রঙীন রাম-সীতার ছবি সযত্নে টাঙানো রয়েছে। অন্য দেওয়ালে অবহেলা ও অযত্নে বিবর্ণ একখানা মাঝারি সাইজের অয়েল পেণ্টিং নজরে পড়লো। ছবিটার ওপর জমে-ওঠা ধূলোর পরিমাণ দেখেই বলা যায় অনেকদিন কেউ ওটিকে স্পর্শ করে নি। কিন্তু রাম-সীতার ছবির সামনে ইতিমধ্যে দ্বাদশটি সুগন্ধী ধূপ জেবলে দেওয়া হয়েছে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "শ্যামলাল গুপ্তাজীর ছবি। আগে ওখানেও ধূপধুনো দেওয়া হতো। কিন্তু সম্পত্তি ওঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবার পরে কেউ আর ওই ছবি নিয়ে মাথা ঘামায় না।"

আপিস ঘরে খাটিয়ার দিকে আমার নজরটা দ্বিতীয়বার পড়লো। বরদাপ্রসন্ন চুপিচুপি বললেন. "রামসিংহাসনের সিংহাসন। ওসব খাটিয়া-টাটিয়ার ব্যাপারে যা-জিজ্ঞেস করবার দারোয়ানদের করবেন। আমি তো এ-বাড়ির দারোয়ানদের মালিক নই!"

ওঁর কথায় আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। এ-বাড়ির দারোয়ানরা কি ম্যানেজারের আন্ডারে নয়?

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "একটু ধৈর্য ধরুন। এসেছেন যখন. আস্তে-আস্তে সব জানতে পারবেন। লোকে দয়া করে আমাকে একটু খাতির করে, তাই যা। আমি তো এখানকার বিল সরকার। আমার কাজ বিল লেখা. মাসে-মাসে ভাড়াটেদের কাছে বিল পাঠানো এবং আদায় করা টাকার হিসেব রাখা।"

এই মুহূর্তে বরদাপ্রসন্নকে আর ঘাঁটানো নিরাপদ মনে হলো না। ঘরের এক কোণে একটা খাকি রংয়ের স্টীলের আলমারী রয়েছে। বরদাপ্রসন্ন কোমর থেকে চাবি বার করলেন। একটা বিকট আর্তনাদ করে আলমারির দরজা খুলে গেলো। গম্ভীরভাবে বরদাপ্রসন্ন বললেন. "কীরকম আওয়াজ শুনলেন তো! জন্মের পর থেকে একবারও তেল খায় নি। তেলকালিবাবুকে অন্তত দু'হাজারবার বলেছি—ওঁর সময় আর হয় না! জোর করবারও উপায় নেই—সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন আলমারিকে তেল মাখানো ওঁর কাজ নয়।"

আলমারির ভিতর থেকে চামড়ায় বাঁধানো ডজন খানেক খাতা ঝটপট নামিয়ে ফেললেন বরদাপ্রসন্ন। আরও খাতা টানতে যাচ্ছিলেন। এক এক-খানার ওজন বোধহয় আধমণ! বরদাপ্রসন্ন সগর্বে ঘোষণা করলেন, "প্রত্যেক ফ্ল্যাটের ঠিকুজি কোষ্ঠী হাতের গোড়ায় রেখে দিয়েছি। কোন ফ্ল্যাটের কোন ভাড়াটে কোন মাসের কত তারিখে ভাড়া দিয়েছে—সব এখানে লেখা আছে! তিরিশ বছর আগের খবরও তিরিশ সেকেন্ডে পেয়ে যাবেন।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "মস্ত বড় বাড়ি, মশাই। সবার সঙ্গে তাল রাখতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। এক একখানা ভাড়াটে মশাই এক-একটি অবতার।"

এবার শুনলাম, এ-বাড়িতে ভাড়াটের সংখ্যা সাড়ে একাত্তর!

বরদাপ্রসন্ন বললেন. "কিছু-কিছু জানাশোনা লোক কলকাতায় এলে আমাদের এই হাফ-ফ্ল্যাটের খোঁজ করে। আমরাও বিল কেটে, রসিদ স্ট্যাম্প লাগিয়ে ভাড়া দিই।"

এরকম ধরনের আশ্রয় যে কলকাতা শহরে এখনও পাওয়া যায় তা আমার জানা ছিল না।

বরদাপ্রসন্ন জানালেন, "এই হাফ-ফ্ল্যাটের একটা হিসট্রি আছে। কালোয়ার গুপ্তা সাহেব যখন প্রথম ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন মাথা গুঁজবার জায়গা পেতে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। প্রথম রাতটা তিনি হাওড়া স্টেশনে কাটিয়েছিলেন। তারপর কয়েক রাত বড়বাজারের এক ধর্মশালায়। যথা-সময়ে প্রচুর পয়সার মালিক হয়েও গুপ্তাজী সেই দুঃখের কথা ভোলেন নি। মার্টিন সায়েবের এই ম্যানসন বাড়িতে ছোট্ট এই হাফ-ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা রেখে-ছিলেন।"

বাকি একাত্তরখানাই যে ফ্ল্যাট নয় তা বরদাপ্রসন্নর লিস্টির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি। এর মধ্যে দোকান আছে, রেস্তোরাঁ আছে, চুল ছাঁটার

সেলন আছে—এবং আরও কত কী আছে তা ভগবান জানেন।

বরদাপ্রসন্ন এরপর আমাকে এ-বাড়ির কর্মচারীদের কথা একে একে জানিয়েছিলেন। তালিকায় এক নম্বর ব্যক্তিটি অবশ্যই রামসিংহাসন চৌরাশিয়া।

রামসিংহাসন আমাকে একটা মাঝামাঝি সাইজের নরম নমস্কার জানালেন। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আমি সামান্য ভাড়া-সরকার। রামসিংহাসনের ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। রামসিংহাসন আমার আণ্ডারে থেকেও আণ্ডারে নয়। মালিক-দের সঙ্গে ওর সোজা যোগাযোগ আছে।"

অভিজ্ঞ রামসিংহাসন বিনয় ও ঔদ্ধত্যের মিশ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো এবং জিজ্ঞেস করলো চা-পানি করেছি কিনা।

এ-ব্যাপারে রামসিংহাসনকে ব্যস্ত না হতে অনুরোধ করবার আগেই হাতকাটা গেঞ্জি ও খালি হাফ-প্যাণ্টপরা বার-তেরো বছরের একটি ছেলে কেটলী ও খুরি হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বালকের মৃত্তিকাভাণ্ডের দিকে তাকিয়ে রামসিংহাসন সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তার কণ্ঠে এবার বিরক্তির মেঘগর্জন। নির্ভুল হিন্দিতে যে মন্তব্য বেরিয়ে এলো তার অর্থঃ 'ওরে মূর্খ, মাটির খুরি কেন? তোর মালিকের দোকানে যত ভাল ভাল কাঁচের কাপ-ডিস ছিল তার সব কি তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে এসেছিস?'

কেটলি ফেলে শশব্যস্ত ছোকরা অদৃশ্য হলো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিউ কাপডিস সহ ফিরে এলো।

রামসিংহাসন ঘরের কোণ থেকে একটা লাল রংয়ের কৌটা নিয়ে এলো। ছোকরাকে হুকুম করলো, কাপের এবং ডিসের তলায় লাল নম্বরী দাগ বসাতে। এই কাপ্ এখন থেকে যে সায়েবের জন্যে রিজার্ভ থাকবে তাও জানা গেলো।

ছেলেটি কেটলি থেকে গরম চা ঢেলে আমার দিকে অতি সাবধানে এগিয়ে দিলো। রামসিংহাসনজীর উপস্থিতিতে সে যে ভি-আই-পিকে চা পরিবেশন করছে তা ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে।

রামসিংহাসন এবার ছোকরাকে দ্বিতীয়বারের মতো সাবধান করে দিলো। "সায়েবের এই ইস্পেশাল কাপে যদি কখনও অন্য কাউকে চা খেতে দেখি তাহলে কী হবে? "

ছেলেটি ভয়ে উত্তর দিলো, "আমার মাথা ভেঙে দেবেন।"

গরম চায়ে মুখ দিয়ে বেশ আনন্দ হলো। কালোপাতার ছদ্মবেশী এই অমৃতটি কে যে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জানি না। কিন্তু মনে মনে সেই মহাপুরুষকে আর একবার কৃতজ্ঞ নমস্কার জানালাম। উষ্ণ চায়ের অমৃত স্পর্শে কয়েক মুহূর্তে অবসন্ন শরীর তাজা হয়ে উঠলো।

রামসিংহাসন এবার জানতে চাইলো আমার কোনো তকলিফ হচ্ছে কিনা। কোনোপ্রকার অসুবিধা হলে সে যেন অবশ্যই জানতে পারে।

বরদাপ্রসন্ন কিন্তু দ্বিতীয়বার পুরনো প্রশ্ন তুললেন। বললেন, "ঠিক করে জেনে নেবেন রামসিংহাসন আপনার আণ্ডারে কিনা।"

রামসিংহাসনের মুখে-চোখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। ব্যাপারটা নিয়ে সে তেমন ব্যস্ত নয়।

এই ব্যাপারে আমিও তেমন ব্যস্ত নই। কোনোরকমে কাজকর্ম ম্যানেজ

হলেই হলো।

বুঝলাম, এ-বাড়িতে রামসিংহাসনের বিশেষ একটা পোজিশন আছে। মনে পড়লো, হাইকোর্ট পাড়ায় বারওয়েল সায়েবের কাছে ইণ্ডিয়ার বড়লাট ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের সম্পর্ক সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলাম। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, মহামান্য বড়লাট যতই পরাক্রমশীল হোন না কেন, সি-ইন-সিকে সব সময় আয়ত্তে আনতে পারতেন না। বড়লাটকে ডিঙিয়ে সমুদ্রের ওপারের অধীশ্বরদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবার স্বাধীনতা সি-ইন-সির ছিল। এ বিষয়ে অনেক বড়লাট খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। গুজব শুনেছি, কোনো কোনো প্রধান সেনাপতি বড়লাটের চেয়েও শক্তিমান ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে শক্তির পাঞ্জা লড়তে গিয়ে কোনো কোনো বড়লাট অপমানিত ও পরাজিত হয়েছেন। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় একজন বড়লাটকে চাকরি ছেড়ে বিলেতে ফিরে যেতে হয়েছিল।

মনে মনে আমি বরদাপ্রসন্ন ও রামসিংহাসনকে যথাক্রমে ভাইসরয় ও সি-ইন-সির উচ্চাসনে বসিয়ে দিলাম। সাডার স্ট্রীটের এই পরিবেশে প্রতিরক্ষার গুরুত্ব কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না!

বরদাপ্রসন্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু ভাবছেন?"

কী ভাবছি বললে, ভদ্রলোক এখনই মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। সুতরাং মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম।

স্টীল আলমারির মাথায় যে-একটা বড় টাইমপিস ঘড়ি ছিল তা এতোক্ষণ লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ ঘড়ির এলার্ম ঘণ্টা তারস্বরে বেজে উঠলো—ঠিক যেন দমকলের শব্দ। এরকম এলার্ম ঘণ্টাধ্বনি জীবনে শুনিনি।

বরদাপ্রসন্ন তিড়িং করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। "একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কেলেঙ্কারি হচ্ছিল আর কী! ভাগ্যে কলকালি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছে।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কলকালির মতো মানুষ হয় না! কলকালি আমাদের এই বাড়ির জলের কল সারায়। তেলকালিবাবুর সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে— কলকালির সঙ্গেও দেখা হবে। রোববারের সন্ধ্যেবেলায় ওকে পাওয়া একটু মুশকিল। সূর্য ডোবার আগেই হুট করে পালায়, কিন্তু দেখুন নিজের কাজটি ঠিক করে গিয়েছে। এতোক্ষণে আমার নিজের ঘরেও নিশ্চয়ই এলার্ম ঘড়ি বাজছে।"

হঠাৎ কেন এলার্ম বাজলো? এবং বাজলেও একই সঙ্গে দু' ঘরে কেন?

বরদাপ্রসন্ন ততক্ষণ নতুন রহস্য সৃষ্টি করছেন। "ঘড়ির এলার্মখানা কেমন শুনলেন? আপনাব ঘুম গাঢ় না পাতলা?"

"ঘুমটা আমার গাঢ়ই বলা যেতে পারে।" এতো দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ঘুমের ব্যাপারে ঈশ্বর আজও আমার প্রতি কোনো কার্পণ্য করেননি।

বরদাপ্রসন্ন খুশী হলেন। "কোনো চিন্তা নেই। কলকালিকে বলে দেবো'খন এই ঘড়িটা আপনার ঘরে রেখে আসতে। আমার তো শুধু রবিবার সন্ধ্যায় দরকার।"

ঘড়ির বাজনাখানি যে মোক্ষম, তা বরদাপ্রসন্নকে জানিয়ে দিলাম। মরা মানুষও এই ঘড়ির বাজনায় জেগে বিছানায় উঠে বসবে!

একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এমন জিনিস কোথাও পাবেন না।

কালা কিটসন সায়েব বিলেত যাবার আগে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছেন।"

আন্দাজ করছি কিটসন সায়েব বরদাপ্রসন্নর বিশেষ পরিচিত—হয়তো এই থ্যাকারে ম্যানসনেরই বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "একে কানে কালা তায় ভীষণ ঘুমকাতুরে ছিলেন এই কিটসন সায়েব। সেবার, ওই ঠিক সময় ঘুম থেকে না-উঠতে পারার জন্যে সায়েবের জীবনে অমন কাণ্ড হয়ে গেলো! সে এক বিরাট ব্যাপার, আপনাকে পরে একদিন সে গপ্পো বলবো'খন। তা সেবারের ওই ঘটনার পরে কিটসন সায়েব স্পেশালি অর্ডার দিয়ে এলার্ম ঘড়ি এনেছিলেন। যাবার সময় আমার কাছে জিম্মা রেখে গিয়েছেন।"

এই ঘড়ি যে বরদাপ্রসন্নর বেশ কাজে লাগছে তাও শুনলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, "আমিও ভুলো লোক। সেবার এই আপিসে বসে বাড়ি ভাড়ার হিসেব করতে করতে ভুলেই গিয়েছি রবিবারের সন্ধ্যে আটটায় আমার স্পেশাল পুজো আছে। নিয়মের পুজো—হুট করে বাদ হলেই হলো না। তিনদিন নিরম্বু উপবাস করে আমাকে অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। আমার সেই অবস্থা দেখে বেচারা কলকালির মনে দয়া হলো। বললো, 'সরকারমশায় আপনি ভাববেন না। রবিবারের পুজো আপনি আর কখনও ভুলবেন না। আমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখবো।"

আমি বরদাপ্রসন্নর মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, "কলকালি জানে, আমি হয় নিজের ঘরে, না-হয় এই আপিসে রবিবার সন্ধ্যে-বেলায় বসি। তাই দুটো ঘরে দু'খানা এলার্ম ঘড়ি বসিয়ে দিয়েছে। এ-ঘড়িটা তো ছিলই—আর একটা ঘড়ি কোথা থেকে ধার করে এনেছে।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চিরকালের পুজো নয়। অনেকটা ব্রতর মতো—তেরো সপ্তাহ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা আটটার সময় আমাকে আসনে বসতে হয়।"

বরদাপ্রসন্ন ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। পুজোয় যাবার আগে আমাকে নখ কাটতে এবং স্নান সেরে নিতে হবে।"

বরদাপ্রসন্ন এবার রামসিংহাসনের ওপর আমার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। "রামসিংহাসন, তুমি সায়েবকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাও—আমি চলি।"

রামসিংহাসন প্রতিশ্রুতি দিলো সে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমার সম্বন্ধে সরকারমশায়ের কোনো চিন্তা নেই।

কিন্তু বরদাপ্রসন্নর দেহ থ্যাকারে ম্যানসনের অন্ধকার উঠোনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্রই রামসিংহাসনের মুখ-চোখের ভাব পালটে গেলো! সে আমাকে জানাতে দ্বিধা করলো না যে সরকারমশায়ের হাবভাবের কিছুই সে বোঝে না। ইদানীং পুজো আচ্ছার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। দেবদ্বিজে ভক্তি রামসিংহাসনেরও আছে, কিন্তু সরকারমশায়ের মতো রামসীতা হনুমানজীর চরণে সে এতো জড়িয়ে পড়তে রাজী নয়।

রামসিংহাসন এবার ড্রয়ার থেকে একটা টর্চ বার করলো। এই সাইজের টর্চ সচরাচর নজরে পড়ে না। আলো-জ্বালানো এবং শত্রুর মাথা-ভাঙা দু কাজেই জিনিসটাকে সমান সাফল্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

রামসিংহাসন আমাকে নিয়ে বাড়িটা দেখতে বেরুবার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। আমার অবশ্যই আপত্তি থাকবার কথা নয়।

এই সময় চা-বালকটি এঁটো কাপের সন্ধানে ফিরে এলো। আমি পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলাম। রামসিংহাসন হাঁ-হাঁ করে উঠলো—এই

চায়ের দায়িত্ব সেই বহন করতে চায়।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "চায়ের কাপের দামটা আমিই মিটিয়ে দিতে চাই।" প্রথম দিন থেকেই আমি রামসিংহাসনের আশ্রিত হতে চাই না।

রামসিংহাসন তখন বললো, "নগদ পয়সা দেবার কিছু দরকার নেই। যখন খুশী ডাক দিয়ে চায়ের হুকুম করবেন।"

গুরুগম্ভীর গলায় রামসিংহাসন এবার নির্দেশনামা জারি করলো, "নগদ লেনদেন বন্ধ। মালিককে বোলো, এই সায়েবের নামে খাতা-বানাতে। ঝটপট খাতা রেডি করে মালিক যেন আগামীকাল সকালে অবশ্যই দারোয়ানজীর সঙ্গে দেখা করে।"

এঁটো কাপ হাতে ছেলেটি এবার দ্রুতগামী হরিণের মতো অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

টর্চ হাতে বিনয়াবনত রামসিংহাসন বললো, "চলিয়ে সাব।"

থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন এক পৃথিবীতে আমার চলাচল শুরু হয়ে গেলো। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের অধীশ্বর ঈশ্বরকে আর একবার প্রণাম—তাঁর ইচ্ছায় বহু মানুষের বিচিত্র এক মেলায় নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারের দুর্লভ সুযোগ পেলাম।

কালের অবহেলায় মলিন এই প্রাসাদপুরীর পাশ দিয়ে এর আগেও কয়েকবার যাতায়াত করেছি। বাড়িটা যে নজরে পড়েনি এমনও নয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে সাজানো এই ঘরের ম্যানসনে যে মানুষের এতো কাহিনী এমনভাবে সঞ্চিত হয়ে ছিল তা কে জানতো?

এই মুহূর্তে আমি একটু ক্লান্ত। অপরিচিত পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করি, উত্তেজিত দেহ-মন অল্পে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ আমি কিছুতেই পিছিয়ে পড়তে চাই না। রবিবারের এই ঝিমিয়ে-পড়া সন্ধ্যাতেই থ্যাকারে ম্যানসনের সঙ্গে আমার পরিচয় হোক।

প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে আমি থ্যাকারে ম্যানসনে পদযাত্রা করেছি। সাড়ে-একাত্তরটা ফ্ল্যাটই আমার দেখা হয়েছে। দেখা মানে ভিতর থেকে দেখা নয়। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক-একটা বন্ধ দরজার দিকে আমার নজর পড়েছে। রামসিংহাসন মুখস্থ বলে গিয়েছে ঃ দশ নম্বর ফিলাট, এগারো নম্বর ফিলাট।

দশের পরে যে এগারো আসবে ধারাপাতের এই জ্ঞানটুকু সবারই আছে। এই ফ্ল্যাটগুলো সম্বন্ধে আমি আরও অনেক কিছু জানতে চাই। এই মুহূর্তে ক্রিম-রংয়ের বিরাট-বিরাট বার্মা-টিকের দরজা ছাড়া আমি কিন্তু আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। প্রতিটা দরজা ঠিক একই সাইজের এবং একই রকমের দেখতে। নয় নম্বরের সঙ্গে দশ নম্বরের, এবং দশ নম্বরের সঙ্গে এগারো নম্বরের এক চুল পার্থক্য নেই।

ফ্ল্যাটের নম্বরগুলো কানে শুনলেও চোখে দেখতে পাচ্ছি না। রাম-সিংহাসন বহুদিনের অভ্যাসে এদের পরিচয় আয়ত্ত করেছে। আমাদের মতো আনাড়িকে এখানে নম্বর খুঁজে বার করতে বেশ কষ্ট পেতে হবে।

"সায়েবের তৈরি বাড়ি—কিন্তু নম্বর লেখা নেই কেন?"

রামসিংহাসন আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলো। "কী বলছেন সায়েব? প্রত্যেক ফিলাটের নম্বর 'বিরাশ' পিলেটে লেখা আছে।"

রামসিংহাসন এবার ন' ফুট উঁচু দরজার ফ্রেমের ওপরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ফ্রেমের একটা বিশেষ অংশের ওপর সে এবার বোম্বাই-সাইজ টর্চের তীব্র আলো ফেললো। "দেখতে পাচ্ছেন?" একটু ব্যঙ্গ মিশিয়েই যেন রামসিংহাসন প্রশ্ন করছে।

পিতলের কাট-আউট টাইপে নম্বরের মতো কী একটা যেন রয়েছে। কিন্তু তার ওপর চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে একের পর এক দরজা-জানলা এবং বাড়ি-ঘরের নানা রংয়ের পেণ্ট ও ভার্নিশ পড়ে বিচিত্র এক চেহারা ধারণ করেছে। রামসিংহাসন এবং সরকারী আর্কিয়োলজিক্যাল বিভাগের গুপ্ত-লিপি বিশেষজ্ঞ-ছাড়া আর কারও পক্ষে এই সব নম্বরের পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।

প্রত্যেক দরজার মধ্যিখানে একটি নেমপ্লেট শোভা পাচ্ছে। প্রতি ঘরের নেমপ্লেটের সাইজ এবং লেখার ভঙ্গী একেবারে এক দেখে একটু কৌতূহলী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো ভাড়াটের ফ্ল্যাটের সামনে নাম-লেখার দায়িত্ব বাড়িওয়ালা নিয়েছেন। কিন্তু পরে জেনেছি, সেইরকম কোনো নিয়ম-কানুন এখানে নেই। তবে রামসিংহাসনের অদৃশ্য হস্ত এখানে বিশেষভাবে কাজ করে। রামসিংহাসনের আশ্রিত এক সাইন-পেণ্টার ছাড়া আর কারও এ-বাড়িতে প্রবেশ অধিকার নেই। পরিবর্তে রামসিংহাসন অতি সামান্য চার্জ করে থাকে—মোট পাওনা বিলের এক চতুর্থাংশ রামসিংহাসনের শ্রীচরণকমলে ভক্তিভরে অর্পণ না করলে পেণ্টারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গুপ্তভাবে এর নাম 'চৌথ'। যদিও দু'-একজন এই ব্যবস্থাকে 'প্রণামী'ও বলে থাকেন!

কোনো টেনাণ্টের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার উৎসাহ দেখাচ্ছে না রামসিংহাসন। সে গম্ভীরভাবে জানালো, এর নাম সায়েবপাড়া। 'অ্যাপয়েণ্টমিণ্ট' ছাড়া এখানে কারও সঙ্গে হঠাৎ দেখা করা ঠিক নয়। "আপনার কী কোনো 'ইমেরজিন্সি' দরকার আছে কারও সঙ্গে?" রামসিংহাসন ইংরিজী, বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো।

এ-বাড়ির কাউকে চিনিই না আমি—সুতরাং জরুরী প্রয়োজনের প্রশ্নই ওঠে না।

আমি শুধু নেমপ্লেটের ওপর নামগুলো পড়ে যাচ্ছি। কয়েকখানা বোস, ঘোষ, মজুমদারের নাম দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম। ভয় পেয়েছিলাম, এ-পাড়ায় মাতৃভাষা ব্যবহারের কোনো সুযোগই পাবো না। রামসিংহাসন যতোই সংকোচ বোধ করুক, এক সময় আমি এঁদের সঙ্গে আলাপ করে নেবো। এতো বড়ো বাড়িতে দু-একজন পরিচিত প্রিয়জন না-থাকলে আমি অস্বস্তি বোধ করবো—নিঃসঙ্গ কর্মজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

লম্বা রেড-অক্সাইড সিমেণ্টের করিডর ধরে আমরা দুজনে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছি। এই সব করিডরে অনেক আলো থাকা উচিত ছিল। কিন্তু

একখানা মুমূর্ষু তিরিশ পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব ছাড়া কিছুই নজরে পড়লো না।

করিডরের দু-দিকেই ফ্ল্যাটের সারি। কোনো কোনো ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেটের কাছে একটা ঠুলি-পরানো ছোট আলো ক্রিমকলার একপাল্লা দরজার ওপর রহস্যময় ছায়া বিস্তার করেছে। সব দরজাতেই কিন্তু এই সাঁঝের প্রদীপ নেই।

রামসিংহাসন দুঃখের সঙ্গে নিবেদন করলো, "কী বলবো সাব, সব আদমী 'ইকসট্রা' রুপেয়া খরচ করতে চায় না।" অথচ এক সময় নাকি এ-বাড়িতে নিয়ম ছিল প্রত্যেক ভাড়াটেকে দরজার কাছে এমন একটি সান্ধ্য পাদপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

নিয়মটা মন্দ লাগলো না। মনে পড়লো শাজাহান হোটেলে চাকরির সময় হ্যারি হবস সায়েবের কাছে শুনেছিলাম, কলকাতায় সরকারী খরচে গ্যাস লাইট বসাবার আগে রাস্তা আলোকিত করবার জন্যে কিছু কিছু অঞ্চলে একই ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল। পৌর সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গৃহস্থকে আবশ্যিকভাবে বাড়ির সামনে একটি আলো জ্বেলে রাখতে হতো। হয়তো, মিস্টার ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন সরকারী সেই আইনের কথা স্মরণ করেই নিজের ম্যানসন বাড়িতে এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

নয়, দশ, গিয়ারা, বারা—একের পর এক ফ্ল্যাট নম্বরের নামতা পড়তে পড়তে রামসিংহাসন ধীর পদক্ষেপে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বারোর পরে এসেই সে কোনো অজ্ঞাত কারণে একেবারে চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

রামসিংহাসনকে সকাল থেকেই দেখছি আমি। কিন্তু তার ওপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপনের মতো মানসিক অবস্থা আমার এখনও হয় নি। কেন জানি না, মাঝে-মাঝে একটু অস্বস্তিই বোধ করছি তার সান্নিধ্যে।

এমতাবস্থায়, মনের মধ্যে সন্দেহের লাল সাবধান বাতিটি জ্বলে উঠলো। সেখানে প্রশ্নঃ বারোর পরে তো চোদ্দ নয়। এই দুয়ের মধ্যে একটি তেরো নম্বর ফ্ল্যাট আছে। তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটি নতুন ম্যানেজারবাবুকে দেখাতে রামসিংহাসন চৌরাশিয়া কেন উৎসাহী নয়?

মনের মধ্যে আরও অনেকগুলি আলো জটিল ট্রাফিক সিগন্যালের মতো একই সঙ্গে জ্বলতে-নিভতে লাগলো।

রামসিংহাসনকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সে বহু-অভিজ্ঞতাধন্য দু-পুরুষের দারোয়ান হতে পারে, কিন্তু আমার ধমনীতেও ওকালতি রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার বাবা যে উকিল ছিলেন এবং আমি নিজেও কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের শেষ বাবু তা স্মরণে না-রাখলে রাম-সিংহাসনের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে আমি এবার থমকে দাঁড়ালাম। পিছিয়ে গিয়ে তেরো নম্বরের খোঁজ করবো কি না ভাবছি। হয়তো লোভনীয় কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা পরিদর্শনের প্রথম সন্ধ্যাতেই ধরা পড়ে যাবে। হয়তো এমন কিছু সংবাদ সংগ্রহ করবো, যা-পাঠিয়ে এই ম্যানসন বাড়ির স্বত্বাধি-কারিণী ও আমার কর্মদাত্রী শ্রীমতী বিল্যাসিনী দাসীকে অবাক করে দেওয়া যাবে। রিপোর্ট শুনে তিনি নিজেই হয়তো বলবেন, 'নতুন ম্যানেজার নিয়োগ করা আমার সার্থক হয়েছে।'

রামসিংহাসন আমাকে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নিজেও থমকে গেলো। পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এইভাবে দাঁড়ানো যে মোটেই নিরাপদ নয় রামসিংহাসন তা আমাকে চাপা গলায় বোঝাবার চেষ্টা করলো।

আমাকে তখনও নিশ্চল দেখে চিন্তিত রামসিংহাসন খবর দিলো. এই ফ্ল্যাট নিয়ে নানা গোলমাল চলছে। তিন তলার বাথরুম থেকে জল চুঁইয়ে দোতলার এই ফ্ল্যাটে টপটপ করে পড়ছে। গতকাল মেমসায়েবকে 'ডবল গোসল' করতে হয়েছে। স্নান সেরে জামা-কাপড় পরে বেরুবার সময়েই মাথার ওপর বাথরুমের কয়েক ফোঁটা জল মেমসায়েবের 'ডিরেস' বরবাদ করে দিয়েছে।

মেক-আপ নষ্ট হওয়ায় মেমসায়েব যে আহত বাঘিনীর মতো ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন এবং একাধিকবার কলকালিবাবুকে খবর পাঠিয়েছেন এ-কথাও রামসিংহাসন আমাকে অতি দ্রুত জানিয়ে দিলো। জরুরী বার্তা পেয়েও কলকালিবাবু যে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেন নি, সে কথাও রামসিংহাসন আমার কানে তুলে দিলো। এমতাবস্থায় রামসিংহাসন এবং নতুন ম্যানেজারকে একই সঙ্গে হাতের গোড়ায় পেলে পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটের অধিশ্বরী যে ছোটখাট একটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবেন এ-বিষয়ে রামসিংহাসনের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রামসিংহাসন চায় না, আমার কর্মজীবনের প্রথম সন্ধ্যায় কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটুক, ভাড়াটিয়াদের কটুভাষণ শোনবার জন্যে আমার সামনে তো সারাজীবন পড়ে রয়েছে।

সন্দেহের রঙীন অথচ সতর্ক সিগন্যালগুলো এখন আমার মনের মধ্যে আরও দ্রুত জ্বলছে-নিভছে। সেই সব ভাবনার কোনো রকম বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে শান্তভাবে রামসিংহাসনকে বললাম, "তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটা আমি একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই।" মনে-মনে ভাবলাম, রামসিংহাসনের যদি কোনো রকম গোলমাল থাকে তা এবার সহজেই ধরা পড়ে যাবে।

আমার প্রশ্ন শুনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রামসিংহাসন। টর্চের হ্যাণ্ডেল দিয়ে সে ঘাড় চুলকে নিলো। তারপর আবার ছোট ছেলের মতো নামতা পড়তে লাগলো দশ, গিয়ারা, বারা, চৌদা। নামতা পড়ায় ব্রেক কষলো রামসিংহাসন। আবার হিসাব করতে লাগলো—দশ, গিয়ারা, বারা, চৌদা।

আমি সুযোগ বুঝে গম্ভীর হয়ে হাফ-ইংলিশে প্রশ্ন করলাম, "হোয়ার ইজ তেরা নম্বার? তেরো নম্বর ফ্ল্যাটই আমি দেখতে চাই।"

রামসিংহাসন বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। ফ্ল্যাটের হিসাব মেলাতে পারছে না সে। রামসিংহাসন বললো, সতেরো বছর বয়সে সে যখন বাবার কাছ থেকে এ-বাড়ির চার্জ নিয়েছে, তখনও তো তেরো নম্বর ছিল না। যা ছিল না, তা সে কোথা থেকে পাবে?

কিন্তু একখানা গোটা ফ্ল্যাটই যে উধাও এ-প্রশ্নটা রামসিংহাসনের মনে কখনও উঠলো না কেন, আমি বুঝতে পারছি না। শক্তিমান রামসিংহাসন এবার বেশ নরম হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, "সাব, যা আছে তারই তদারকীর কাজ দারোয়ানের। যা নেই, তা আমি কোথায় পাবো?"

আমাকে করিডরে ফেলে রেখে দ্রুত পদক্ষেপে রামসিংহাসন হঠাৎ অদৃশ্য হলো। এমতাবস্থায় কী করবো ভাবছি। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে রামসিংহাসন বীরবিক্রমে নাট্যমঞ্চে ফিরে এলো।

ইতিমধ্যে সে বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে কথা বলে এসেছে। একগাল হেসে রামসিংহাসন খবর দিলো, তেরো নম্বরটা সায়েবদের কাছে অপয়া বলে এ-বাড়িতে কোনোদিনই ফ্ল্যাট নম্বর থার্টিন ছিল না। বারোর পরেই চোদ্দ। ব্যাপারটা নাকি মার্টিন সায়েবের আমল থেকেই চলে আসছে—তিনি নিজেই কোন ঘরের কত নম্বর হবে ঠিক করেছিলেন।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করলো রামসিংহাসন। কানে গোঁজা পেন্সিলটাও সে নামিয়ে ফেললো। তারপর নোটবইয়ের ওপর টর্চের আলো ফেলে কী সব হিসেব করলো।

এবার রামসিংহাসন বললো, "আপনি হিসেব দেখুন। আমাদের ফ্ল্যাটের সংখ্যা সাড়ে-একাত্তর অথবা বাহাত্তর—কিন্তু শেষ ফ্ল্যাটের নম্বর তিয়াত্তর। সুতরাং তেরো নম্বর বেপাত্তা হলেও, গুনতিতে হিসেব মিলে যাচ্ছে।"

দ্বিতীয়বার হিসেব মেলাবার জন্যে রামসিংহাসন আবার নামতা পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ততক্ষণে আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় পড়ে গিয়েছি। তেরো নম্বরটা যে এ-পাড়ার অধিবাসীদের কাছে এতোখানি ভীতির কারণ তা আমার খেয়াল ছিল না।

অকারণে রামসিংহাসনকে সন্দেহ করায় একটু অনুশোচনা হলো। আমাদের ইস্কুলের অবনীবাবু স্যার বলতেন, "বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল। সন্দেহ করলে, যে সন্দেহ করে তারই বেশী ক্ষতি।" গুরুবাক্যটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়, তা নিজের জীবনে বেশ কয়েকবার উপলব্ধি করেছি।

রামসিংহাসনের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে সে-রাত্রে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, সহদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার মধ্যে একটি।

তিনতলার করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখলাম সাদা ইউনিফর্ম পরে একটি লোক বিলিতী কায়দায় ডান হাতে একটি ট্রে ধরে এগিয়ে আসছে। ট্রের ওপর ধবধবে সাদা ন্যাপকিন ঢাকা রয়েছে। লোকটা মাথায় একটা হেডগিয়ার চাপিয়েছে।

রামসিংহাসনকে দেখে লোকটা থমকে দাঁড়ালো এবং ভক্তিভরে সেলাম করলো। একা সেলাম পেয়ে রামসিংহাসন জানালো, ইনিই আমাদের নতুন 'ম্যানজার' সায়েব। চোখের ইশারায় আমাকেও একটা স্যালুট দেবার নির্দেশ যে রামসিংহাসন লোকটিকে দিলো তা আমি বুঝতে পারলাম। ঢাকা ট্রে কোনোরকমে সামলে লোকটি নিপুণভাবে ওরই মধ্যে রামসিংহাসনের নির্দেশ মান্য করলো।

এবার লোকটির মুখ আমি ভালভাবে দেখতে পেলাম। কোথায় যেন দেখেছি একে!

কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সহদেব না? সহদেব দাশ। শাজাহান হোটেলেই আমাদের সঙ্গে কাজ করতো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "শাজাহান হোটেলে আপনি কখনও কাজ করেছেন?"

প্রশ্নটা সহদেবের মোটেই ভাল লাগলো না। একটু দেমাকের সঙ্গেই সে জানিয়ে দিলো, "শাজাহান হোটেলের সঙ্গে সাতপুরুষে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।" মালিকের খানা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এই কথা ঘোষণা করে লোকটি আর দাঁড়ালো না, আমাদের চোখের সামনেই ট্রে হাতে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লো।

লোকটি আমাকে অবজ্ঞা করেই চলে গেলো। অথচ রামসিংহাসন চিৎকার

করে বললো, "সহদেব, তুমি কাল সকালে আমার সংগে দেখা কোরো।"

সহদেব। নামটা তো একই। মুখটাও একরকম। অথচ লোকটা আমাকে চিনতে পারলো না।

সে-রাত্রে নিজের ঘরে ফিরে এসে খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে অন্য অনেক কথার সংগে সহদেবের ঘটনাটাও বার বার ভাবছি। রাত্রে খাওয়ার হাংগামা তেমন রাখি নি। এক সময়ে টুক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে একখানা পাঁউরুটি ও কিছুটা চিনি কিনে এনেছি। ফারপো কোম্পানির ভিটামিনসমৃদ্ধ মিল্ক ব্রেডের সংগে চিনি অতি উপাদেয় খাদ্য। শরীরের সমস্ত প্রয়োজন চিনি-পাঁউরুটিতে মেটানো যায় এরকম একটা বিশ্বাস মনের মধ্যে দারিদ্র-তাড়িত জীবনে তৈরি করে রেখেছিলাম। বিশেষ করে ফারপোর মিল্ক ব্রেড। এমনই নাম মাহাত্ম্য: মনে হতো অদৃশ্য দুধের সংগে পাঁউরুটি ও চিনি মিশিয়ে খাচ্ছি। মিল্ক ব্রেডে যে কোনো মিল্ক নেই—তা অনেকদিন পরে শুনেছি; কিন্তু কোনোরকম মোহভঙ্গ হয় নি, কারণ ততদিনে ভাগ্যের দেবতা প্রসন্ন হৃদয়ে আমার অভাবতাড়িত অন্ধকার জীবনে আলোর স্নিগ্ধ প্রদীপ শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

চিনি-পাঁউরুটি খেয়ে ঠোঙাটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে মুড়ে ফেলে দিয়ে চৌকির ওপর হোল্ড-অল পেতে দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছি।

এখনও ঘরের আলো জ্বলছে। সহদেবের ব্যাপারটা তখনও মনের মধ্যে খচ খচ করছে। সহদেবকে আমি ভালভাবেই চিনতাম। একবার ওকে স্যাটাদার নির্দেশে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। হাতে ভাঙা কাঁচ ফুটে গলগল করে রক্ত পড়ছিল। আমার সংগে একটা রিকশায় চড়ে সে ডাক্তারখানায় গিয়েছে। অথচ সে আজ বললো কিনা সাতপুরুষে শাজাহান হোটেলের সংগে তার সম্পর্ক নেই।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বো ভাবছি, এমন সময় আমার বন্ধ ঘরের দরজায় খুব সন্তর্পণে তিনবার টোকা পড়লো।

একটু থেমে আবার শব্দ হলো টক-টক। এবার উঠে দরজা খুলে দেখি স্বয়ং সহদেব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"এ কি? সহদেব? তুমি? এখন?"

"ভিতরে আসতে দিন," সহদেব চাপা গলায় বললো।

ভিতরে ঢুকে নিজেই দরজা ভেজিয়ে দিলো সহদেব। তারপর ঝপাং করে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললো, "এতো রাতে আপনাকে ডিসটার্ব করলাম—কিছু মনে করবেন না। এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না।"

সহদেবকে আমার বিছানায় বসতে বললাম। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার সে বললো, "তখন ওইভাবে কথা বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আপনি সব বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।" সহদেব একটু ভয় পেয়েছে মনে হলো।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

এবার সহদেব নিজেই ব্যাখ্যা করলো। "শাজাহান হোটেলে আমি কিসের কাজ করতাম?"

"সুইপার ছিলে তুমি। ঝাঁট দিয়ে ময়লা টিনে তুলতে গিয়েই তো কাঁচে তোমার হাত কেটে গেলো সেবার।"

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো সহদেব। "স্যার, আমি জাতেও ধাঙড়। কিন্তু কদিন আর কমোড সাফের কাজ ভাল লাগে বলুন ? ওখানে কুক এবং বেয়ারাদের কাজ করতে দেখেছি—ওরা কীভাবে হাঁটে চলে সব শিখে নিয়েছি।"

একটু থামলো সহদেব। "আমি লাইন পাল্টে ফেলেছি আপনাদের আশীর্বাদে। এখানে আমি রান্না করি—কুক বেয়ারা। আমি হোটেলের সুইপার ছিলাম তা যদি এরা জানতে পারে তা হলে আমার হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে।"

"জাত ভাঁড়িয়ে কাজ করছি হুজুর। না হলে কে আমাকে রাঁধুনি রাখবে ?"

কান্নায় ভেঙে পড়লো সহদেব। বললো, "এই রামসিংহাসন এতদিন আমার রান্না খেয়েছে। যদি একবার জানতে পারে আমি ধাঙড়। উঃ আমার কী যে হবে !" সহদেবের কান্না আর থামতে চায় না।

সহদেব কেন যে তখন আমাকে চিনতে পারে নি তা এবার বুঝতে পারছি। আশ্বাস দিলাম, "আমার থেকে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, সহদেব।"

সহদেব পা ধরে বললো, "লোকে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন আপনার পুরনো সায়েবের কাছে কাজ করতাম।"

পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত না-হতে পেরে সহদেব আবার আপন মনে বললো "কুকের চাকরি করতাম বলবেন, কেমন ?"

আমার নীরব আশ্বাস আদায় করে সহদেব যখন ঘর থেকে বিদায় নিলো তখন রাত প্রায় বারোটা।

যাবার আগে সে আচমকা আমার পা-জড়িয়ে ধরলো। পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যা নিবেদন করলো তার অর্থ—আমার মতো মানুষ ত্রিভুবনে বিরল। অন্য যে-কেউ হলেই নাকি এই সুযোগে সবাইকে জানিয়ে দিতো, একজন জমাদার এই বাড়িতে জাত ভাঁড়িয়ে বাউনের কাজ করছে।

পরবাসের প্রথম রাত্রেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারে আমাদের এই দেশের হতভাগ্য মানুষরা এখনও কোথায় পড়ে আছে তার নগ্ন নমুনা পেলাম।

সহদেব বলেছিল, "আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছে, শংকরবাবু। কী কুক্ষণে যে কাক হয়ে ময়ূর সাজবার লোভ হলো। দেশে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই, কাউকে ঠিকানা দিই না—কখন কে রামসিংহাসনজীর জেরার সামনে পড়ে সব ফাঁস করে দেবে।"

সহদেব আরও বলেছিল পাপের শাস্তি গুরুতর হতে পারে। সে শুনেছে, রান্না-বান্নার লাইনে আসতে গিয়ে তাদেরই জানাশোনা এক আত্মীয় গ্রামের মধ্যে খুন হয়েছিল। "মেথরের হাতে খেলে যে জাত যায়," সহদেব আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

বুঝতে পারছি সমাজের চাপে পড়ে সহদেব নিজেও এই জাত যাওয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে—তার মনের গভীরেও পাপবোধ রয়ে গিয়েছে।

বলেছিলাম, "সহদেব, যে-কাজ তোমার পছন্দ তাই করবার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে। এসব নিয়ে ভেবো না।"

আজ অনেক দিন পরে শাজাহান হোটেলের সত্যসুন্দর বোসের অভাব অনুভব করছি। তিনি থাকলে এই সব অবস্থায় আমার কোনো অসুবিধাই হতো না। সংসারের জটিল সমস্যাগুলোর সহজ সমাধান খুঁজে দিতে তাঁর

জুড়ি ছিল না।

ঘুম ভাঙলো পাখির ডাকে। নাম না-জানা একটা দিশী পাখি কেমন করে এই সায়েব পাড়ায় আমার ঠিকানা সংগ্রহ করলো কে জানে। ঘরের সবুজ রঙের জানালার পাল্লার ওপর বসে মিষ্টি গানে সে নতুন ম্যানেজারবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। অন্য জানালা দিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনের কমপাউণ্ডের দিকে তাকালাম। হাফ-প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক মিলিটারি কায়দায় সেখানে অনেকক্ষণ ডবলমার্চ করছেন।

স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকটি বাড়ির উঠোনেই বারবার পাক খাচ্ছেন—দু একটি বেওয়ারিশ কুকুর ছাড়া কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখছে না!

দরজায় টোকা পড়লো। গত রাত্রে পরিচিত সেই চা-বালকটি ঘুম-ভরা চোখে আমাকে লম্বা সেলাম করলো। জিজ্ঞেস করলো, চা আনবে কিনা।

এই সকালে ঘরে বসে চা খাবার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মতো মনোবল সংগ্রহ করতে পারলাম না।

কিন্তু ছেলেটিকে দেখে মায়া হলো। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি?"

সে থতমত খেয়ে গেলো। কিছুতেই স্বীকার করলো না এখনও তার চোখে ঘুম লেগে রয়েছে। "কী বলছেন সাব! আমি অনেকক্ষণ উঠেছি। আগে না-উঠলে এখনও তো পায়খানায় লাইন লাগাতে হতো!"

আন্দাজ করলাম, এখানকার অসংখ্য বেওয়ারিশ কর্মচারীর জন্যে একটি মাত্র কলঘর আছে, যেখানে ভোরের আলো ফোটবার আগেই লম্বা লাইন পড়ে।

চা-বালক জানালো, ইতিমধ্যেই সে কয়লা ভেঙে উনুনে আঁচ দিয়েছে। আগুন ধরতে অন্তত আধঘণ্টা লাগে, তারপর একটব জল গরম চাপিয়েছে। কয়েক কেটলি চাও ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি, আমার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু মালিক তাকে খুব বকুনি লাগিয়েছে, জানতে চেয়েছে এখনও নয়া সায়েবের খোঁজ করে নি কেন?

চায়ের সঙ্গে দুখানা নিমকি বিস্কুটের বিলাসিতায় ডুব দেওয়া গেলো। আমার গেলাসে বাড়তি একটু চা ঢেলে দেবার জন্যে ছেলেটি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি চা খেয়েছো?"

আমার প্রশ্নে মোটেই সন্তুষ্ট হলো না সে। একটু বিরক্ত হয়েই জানিয়ে দিলো সে চা খায় না। "চা খেলে তবিয়ত খারাপ হয়"—গাঁ থেকে আসবার সময় তার পিতাজী বলে দিয়েছেন!

আমি ওর চোখে এখনও ঘুমের অদৃশ্য উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। সে জানালো, প্রথম যখন কলকাতায় এসেছিল তখন খুব ঘুম পেতো তার। মায়ের কথা, বাবার কথা, গাঁয়ের কথা মনে পড়লেই ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করতো না। মালিক তাকে ঠেলে তুলে দেবার জন্যে টানাটানি করতো। একদিন রামসিংহাসনজীর চা দিতে দেরি হওয়ায় কেলেংকারি কাণ্ড।

শুনলাম, দোকানের তৈরি প্রথম কাপ চা রামসিংহাসনজীকে প্রতিদিন নিবেদন করা হয়। এই ব্যবস্থা বহুদিন ধরে চলে আসছে।

আরও শুনলাম, কর্মচারীকে ঘুম থেকে তুলবার জন্যে মালিকের স্পেশাল ব্যবস্থা আছে। রোজ-রোজ গলা ফাটিয়ে ডাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্পেশাল ব্যবস্থাটি হলো, আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া। ঘাড়ের কাছে জ্বলন্ত

বিড়ি, সিগারেট কিংবা দড়ির আগুনের গোটাদুয়েক চাপ পড়লেই গ্রাম্যঘুম সদ্য আগত বালকের চোখ থেকে ছুটে পালাবার পথ পায় না।

চায়ের এঁটো কাপ নিয়ে ফিরে যাবার পথে ওর ঘাড়ের কাছে বেশ কয়েকটা কালো দাগ দেখলাম। না-দেখলেই ভাল হতো। বিহারের অসহায় এক গ্রাম্য বালকের বিষণ্ণ সরল হাসি নাম-না-জানা পাখির প্রভাতী গানকে কেমন বেসুরো করে তুললো।

একটু পরেই বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। একটি খাদি ফতুয়া, এবং চপ্পল পরে থ্যাকারে ম্যানসনের একতলায় নেমে এসেছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুম হয়েছিল তো?"

বিনীতভাবে 'হ্যাঁ' বললাম।

"কোনো আজে-বাজে স্বপ্ন দেখেন নি তো? নতুন লোক দেখলেই এখানকার আজে-বাজে চরিত্রগুলো রাত্রে জ্বালায়", বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে খবর দিলেন।

"আমি মশাই আর্লি রাইজার। ছোটবেলায়, মুখস্থ করেছিলাম : আর্লি টু বেড, অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ—মেকস এ ম্যান হেলথি, ওয়েলথি অ্যান্ড ওয়াইজ।"

একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "দুখানা আইটেম মিলেছে। হেলথি এবং ওয়াইজ হয়েছি। বলা যায় না, কবে হয়তো ধনী হয়ে উঠবো।"

আমি কথাবার্তা শুনে যাচ্ছি। বরদাপ্রসন্ন নিজের থেকেই জানালেন, "আমাদের কলকালিবাবু পয়লা নম্বরের ফোক্কড়। বলে কিনা বড় লোকেরা কখনও সকাল-সকাল ঘুম থেকে ওঠে না। ওয়েলথি মাত্রই লেট রাইজার।"

ভোরবেলায় যে-পাখিটা আমাকে গান শুনিয়েছে তার কথা বরদাপ্রসন্নকে না-বলে পারলাম না। নতুন এই পরিবেশে একটা লোককে তো চাই যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়।

আঁতকে উঠলেন বরদাপ্রসন্ন। "আপনি পোয়েট্রি-ফোয়েট্রি লেখেন নাকি?" রীতিমত জেরা শুরু করলেন তিনি।

তারপর বললেন, "আপনি ভাগ্যবান, মশাই। আমি তো স্লেচ্ছ মুরগীর কোঁকড়-কোঁ ডাক ছাড়া সকালে কিছুই শুনতে পাই না। কী বলবো, ব্রাহ্মণ-সন্তান—সকালবেলায় ওই নোংরা জিনিসের ডাক শুনে গা ঘুলিয়ে ওঠে। কত পাপ করেছি, তাই এই ঠাকুরে ম্যানসনে 'নির্ব্বাসন যন্ত্রণা' ভোগ করতে হচ্ছে।"

"মুরগী কোত্থেকে এলো?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ছাদের ওপর বাবুর্চিগুলো ডজনে-ডজনে পুষেছে। এক টাকার মাল নিজের সায়েবের কাছে সাত টাকায় বেচবার লোভ কে ছাড়তে চায়? এক চিলতে শোবার ঘর—কোথায় নিজে একটু হাত পা ছড়িয়ে থাকবি। তা না, ওরই মধ্যে হাঁস-মুরগী গিজগিজ করছে।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "সকালবেলায় ওই কোঁকড়-কোঁ শুনলেই মনে হয় সমস্ত দেহটা নোংরা হয়ে গেলো। তখনই স্নান সেরে না ফেললে গা ঘিন ঘিন করে। 'ওঁ অশ্বত্থাম্নে নমঃ' এই বলে তিনবার তিন ফোঁটা তেল মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে ঝপাঝপ তেল মেখে ফেলি।"

কীভাবে তেল মাখতে হয় এবার তার বিশ্লেষণ শুরু করলেন বরদা-

প্রসন্ন। "তেল মাখার আইন আজকাল কেউ মানে না—তাই তো দেশে এতো দুঃখু কষ্ট। 'শিরোভ্যঙ্গবশিষ্টেন তৈলনাঙ্গং ন লেপয়েৎ'। মাথায় তেল লাগিয়ে অবশিষ্ট তেল দিয়ে অঙ্গলেপন মহাপাপ। সবসময় নিম্ন অঙ্গ থেকে ওপরের দিকে তেল মাখতে হয়। বুকে হাতে তেল দিয়ে তারপর পায়ে তেল মাখা ইজ এ ভেরি ভেরি ব্যাড হ্যাবিট!"

ফতুয়ার পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলেন বরদাপ্রসন্ন। "সর্বনাশ! কথা বলতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছি। এখনই একবার মার্কেটে ঘুরে আসতে হবে।"

মার্কেট বলতে আমি নিউ মার্কেটের বাজার বুঝেছি। সকালে হয়তো কিছু শাকসব্জী তরিতরকারি কিনতে চান বরদাপ্রসন্ন।

"মার্কেটে যাবার অভ্যাস আছে তো?" জানতে চাইলেন বরদাপ্রসন্ন।

একসময় বাজার-যাওয়া আমি খুব পছন্দ করতাম। বাজার সম্পর্কে আমার ছোটখাট একটা রেকর্ডও আছে। সাত বছর বয়স থেকে নিয়মিত একলা-একলা বাজার করেছি আমি, পাকে-চক্রে পড়ে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চলুন, আমার সঙ্গে। এখন তো হাতে কোনো কাজ নেই।"

খুশী মনেই বেরিয়ে পড়লাম বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে। নিউ মার্কেটের কাঁচাবাজার সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে গেলে কিছু লোকের সঙ্গে চেনা হয়ে যাবে।

বাজারে যাচ্ছেন, অথচ ওঁর হাতে কোনো থলে দেখলাম না। থলে ছাড়া বাজারযাত্রী কোনো বাঙালীকে কল্পনাও করা যায় না। আমার এক দক্ষিণ-ভারতীয় বন্ধুর স্ত্রী একবার বলেছিলেন, বাঙালীদের মতো এমন কদর্য, নোংরা এবং দুর্গন্ধ থলে পৃথিবীর আর কোনো জাত ব্যবহার করে না। এমন বাজার-পাগল জাতও নাকি ভূ-ভারতে নেই!

ভাবলাম, থলের কথাটা বরদাপ্রসন্নকে একবার মনে করিয়ে দিই। তারপর ভাবলাম, হয়তো সামান্য কিছু তরিতরকারি কিনবেন। নিউ মার্কেটের ব্যাপার—নিশ্চয় ওখানে ঠোঙায় আলু-পটল বিক্রি হয়।

রাস্তায় যেতে-যেতে বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলেন, "সকালের এই বাজারটা কারও ওপরে ছাড়বেন না। কাউকে বিশ্বাস করেছেন কি ডুবেছেন।"

হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেট পেরিয়ে গেলাম—কিন্তু বাজারে প্রবেশ করবার কোনো লক্ষণই বরদাপ্রসন্নর মধ্যে দেখা গেলো না।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা চৌরঙ্গীর গ্র্যান্ড হোটেলের কাছে এসে পড়েছি। এবার বাধ্য হয়ে ওঁকে মনে করিয়ে দিলাম, "বাজার করবেন না?"

আমার প্রশ্নে বেশ অবাক হয়ে গেলেন বরদাপ্রসন্ন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিশ্চয় করবো। সওদা না থাকলে কেউ সাত-সকালে শখ করে জাত-বেজাতের দুর্গন্ধ শুঁকতে বাজারে আসে?"

এরপর আমার নিজেরই অবাক হবার পালা। তরি তরকারি মাছ মাংস নয়, অন্য এক মানুষের বাজারে চলেছেন বরদাপ্রসন্ন!

দুধের বাজার বসে হাওড়া স্টেশনে এবং নতুন বাজারে, পুরনো কাপড়ের বাজার বসে কলাবাগান বস্তির কাছে, গোরু ছাগলের বাজার বসে খিদিরপুরে—কিন্তু এখনও যে কলকাতায় মানুষের বাজার বসে তা জানা ছিল না।

শুধু শুনেছি, গত-শতাব্দীতেও কলকাতার মুর্গীহাটায় ক্রীতদাস কেনা-বেচার বাজার বসতো। নিজেদের পছন্দ মতো দিশী কিংবা কাফ্রি স্লেভ কেনবার জন্যে সাহেব-মেমরা এই বাজারে আসতেন। কিন্তু এখনকার মানুষ-বাজারে কী হয়?

হোয়াইট-ওয়ে ল্যাডলোর কাছে রাস্তা পেরোতে পেরোতে বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে বললেন, "এই বাজারে নিজের দরকার মতো সবরকম মানুষ পাবেন না। এখানে কেবল পাবেন রাজমিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি এবং জোগাড়ে।"

এসপ্ল্যানেডের বুকের ওপরে খোলা মাঠে মানুষের বাজার বসেছে। চৌরঙ্গী পেরিয়ে পশ্চিম দিকে আসতে আসতে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কলকাতার বিগেস্ট মানুষ-মার্কেট। পছন্দ-করে নিতে পারলে, ন্যায্য দামে খুব ভাল জিনিস পেয়ে যাবেন এখানে।"

আমি দেখলাম, ভোরবেলায় এসপ্ল্যানেডে কয়েকশ লোকের হাট বসেছে। লুঙি আর গেঞ্জি, পাজামা আর শার্ট, ফতুয়া আর ধুতি পরে সারে-সারে লোক অধীর আগ্রহে বসে আছে। তাদের সামনে কয়েকটা ছোট-ছোট রাজমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি। কিছু ক্রেতাও গম্ভীরভাবে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে বিভিন্ন পণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বরদাপ্রসন্নকে দেখে কয়েকজন পণ্য এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো। "আসুন না স্যার! কী দরকার?"

বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে বললেন, "না বাপধন, আজ আমার রাজমিস্ত্রির দরকার নেই।"

বরদাপ্রসন্নর কথা ওরা বিশ্বাস করলো বলে মনে হলো না। ভাল বাংলায় বললো, "বাজার মন্দা আজ, তাই ডাকছি। টপক্লাশ লোক সবদিন পাবেন না।"

আমার মনে হলো শত শত বছর আগের কোনো রোমান মানুষ-বাজারে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কোনোরকম আগ্রহ নেই এমন ভাব দেখিয়ে বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, "বাজার দর কত যাচ্ছে?"

চাপা-গলায় একটি লোক ইঁটের ওপর বসে থেকেই উত্তর দিলো, "ছ'টাকা তিন টাকা।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ডিমান্ড থাক না-থাক, দর পড়ে না। রাজমিস্ত্রি ছ'টাকা রোজ, আর জোগাড়ে তিন টাকা।"

একটু এগোলেন বরদাপ্রসন্ন। ফিস ফিস করে বললেন, "ওই দাম হাঁকছে। কিন্তু একটু চাপ দিলেই পেয়ে যাবেন পাঁচ টাকা বারো আনা/পৌনে তিন টাকা রেটে।"

এইসব দৃশ্য আমার দেখতে ভাল লাগে না। দরদস্তুর করে নিয়ে নিলেই পারতেন বরদাপ্রসন্ন। উনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "ভেজাল মালে বাজার বোঝাই! হাতে একখানা কর্ণিক নিয়ে বসলেই জোগাড়ে মিস্ত্রি হয় না, মশাই। ভাল মিস্ত্রি যদি চান তাহলে আপনাকে সকাল-সকাল আসতে হবে। সেসব জিনিস পড়তে পায় না- বাজারে আসা মাত্রই বড় বড় পার্টিরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তারা দরও কমাবে না।"

বাজারের মধ্যে একটা দ্রুত চক্কর দিলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "আমার রাজমিস্ত্রির দরকার নেই। চলুন ছুতোর মার্কেটে।"

একটু দূরে কয়েকজনকে দেখা গেলো—যাদের সামনে কাঠের যন্ত্রপাতি। অভিজ্ঞ বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আজ বাজার চড়া মনে হচ্ছে—ছুতোরের সাপ্লাই নেই বললেই চলে।"

ছুতোরদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বরদাপ্রসন্নর মন্তব্য, "এদের বাজার ভাল হবে না তো কাদের হবে? আজকালকার কাঠের যা-অবস্থা। সিজন না-করা শাল সেগুনে কাজকর্ম হচ্ছে। ফলে রিপেয়ার লেগেই আছে। প্রতি বাড়িতে এখন হোলটাইম ছুতোর রাখতে পারলে ভাল হয়।"

একটি লোক বরদাপ্রসন্নর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে বললো, "নমস্কার হুজুর।"

বরদাপ্রসন্ন তার নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু আপন মনেই বললেন, "তোমাকে আবার নিচ্ছি বটে! সেবার আমার তিনখানা পাল্লার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে এসেছো। দরজা-জানলার কালাপাহাড় তুমি!"

ঠোঁট বেঁকালেন বরদাপ্রসন্ন। "টানের বাজার—ইনিও এখনই চলে যাবেন। কারও বাড়ির সব্বোনাশ হবে আজ।"

"আরও আগে আসা উচিত ছিল। ছুতোরমিস্ত্রির বাজারে এমন আগুন লাগবে কী করে জানবো?"

এবার স্বগতোক্তি করলেন বরদাপ্রসন্ন, "আকবরকে দেখছি যেন।"

একখানা থান ইঁটের ওপর বসে দাড়িওয়ালা আকবর আপন মনে বিড়ি খাচ্ছিল। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এসে বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, "হাত খালি তো?"

বিড়িতে একটা টান দিয়ে আকবর জিজ্ঞেস করলো, "পুরো দিনের কাজ তো?"

এবার মুশকিলে পড়লেন বরদাপ্রসন্ন। "না বাবা, গোটা কয়েক দরজা জানলার ছিটকিনি লাগানো। হাফ্-ডের কাজ।"

অর্ধেক দিনের কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছে না আকবর। তবে পুরনো পার্টি, তাই বললো, "হাত খালি থাকলে কোনো সময়ে করে দিয়ে আসবো।"

বরদাপ্রসন্ন সন্তুষ্ট হলেন না। সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিলেন, "সেবারেও তো বললি গত শনিবারে এসে ঠিক করে সেরে দিয়ে যাবি।"

"ছেলের অসুখ করেছিল," বিড়িতে টান দিলো আকবর।

মিষ্টি কথায় আকবরকে ভিজিয়ে কাজ হাসিল করবার জন্যে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "চল না—যাবি আর আসবি। ছেলে এখন কেমন আছে?"

"বাঁচলো নি। কালই গোর দিয়ে এসেছি." বিড়িতে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়ে আকবর নিজের দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলো। তারপর উদাসভাবে বললো "আজ ঠিক বাজারে চলে এসেছি। দিন-মজুরের কি কাঁদবার সময় আছে, হুজুর?"

কী উত্তর দেবেন বুঝতে পারছেন না হতভম্ব বরদাপ্রসন্ন। কিন্তু আকবর নিজেই উত্তর দিলো। "একটু দাঁড়ান, হুজুর। কাছাকাছি কাজ না পেলে আপনার সঙ্গেই চলে যাবো। কাজ নিয়ে আজ বেশী দূরে যাবার ইচ্ছে নেই।"

মানুষ-বাজার থেকে ফিরে আকবরকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো। দশ এবং বাইশ নম্বর ঘরে অনেকগুলো দরজা-জানলার কব্জা উধাও হয়ে

বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

আকবর বললো, "আধ দিন বলছেন। হুজুর, এ বাড়িতে আধ বছরের কাজ জমা হয়ে আছে।"

"তোকে বাজে বকতে হবে না। কাজকর্ম সেরে রোজ নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যা।" সস্নেহ বকুনি লাগালেন বরদাপ্রসন্ন।

আকবরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে বরদাপ্রসন্ন আমাকে বললেন, "একটুও মিথ্যে বলে নি আকবর। এ-বাড়ির এখন হাড়-মড়মড়ি ব্যারাম ধরেছে! সব ক'টা দরজা-জানলা মেরামত করালে মন্দ হয় না। অ্যাদ্দিন যে কীভাবে চলেছে তা ভগবান রামচন্দরই জানেন। নেহাত বার্মা-সেগুনে তাই এখনও টিকে রয়েছে। কিন্তু স্ক্রু এবং কব্জা তো বার্মা থেকে আসে নি!"

আমি গম্ভীরভাবে ম্যানেজারোচিত ব্যবহারের চেষ্টা করলাম। জানতে চাইলাম, "এতোদিন এসব রিপেয়ার হয় নি কেন?"

"সেসব জিজ্ঞেস করে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?" সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন বরদাপ্রসন্ন। বুঝলাম, এর পেছনেও কোনো অস্বস্তিকর অভিযোগ আছে, যা বরদাপ্রসন্ন এই ভোরবেলায় আমার সঙ্গে আলোচনা করতে উৎসাহী নন।

গম্ভীর হয়ে বরদাপ্রসন্ন নিজেই বললেন, "মনিব হচ্ছেন আমাদের অন্নদাতা দেবতা। পাপ আর বাড়াবো না!"

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "দরজা-জানলার এই অবস্থা তো রাখা চলে না। মেরামতির একটা হিসেব করে রাখা প্রয়োজন। সমস্ত বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে একটা এস্টিমেট তৈরি করে ফেলতে চাই। লিখিত হিসেবপত্তর থাকলে কাজকর্মের সুবিধে হয়। মালিকের সঙ্গে সোজাসুজি কথাবার্তা বলা যায়।"

ফিক করে হেসে ফেললেন বরদাপ্রসন্ন। "লেখাই সার হবে। এ-বাড়িতে কত দরজা জানলা আছে, জানেন?"

এই ধরনের সেনসাসের কথা আমার মাথায় ছিল না। অর্ধনিমীলিত চোখে বরদাপ্রসন্ন দ্রুত মানসিক হিসেব করতে লাগলেন। এ বাড়ির প্রতিটা দরজা-জানলার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে মনে হচ্ছে। চোখ খুলে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আমার হিসেব রেডি।"

আমি একটু গম্ভীরভাবেই ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। বরদাপ্রসন্ন ঘোষণা করলেন, "বারোশ আশিখানা দরজা জানলা আছে। তার মধ্যে বারোশ সাতাত্তরখানারই তদারকী প্রয়োজন।"

তিনখানা বাদ দিলেন কেন বরদাপ্রসন্ন?

একগাল হেসে ফেললেন তিনি। "রামসিংহাসনের ঘরের দরজা জানালা-গুলো বেশ ভাল কন্ডিশনেই আছে।"

অপ্রিয় ব্যাপার। আমি ও-ব্যাপারে আলোচনা চালাতে উৎসাহী নই। অকস্মাৎ দশ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে আকবর বেরিয়ে এসে আমার সুবিধে করে দিলো।

আকবর বললো, "ফর্দটা লিখে নিন হুজুর। মালপত্তরগুলো এখনই আনিয়ে দিন। কব্জাগুলো সবই পাল্টাতে হবে।"

"পালটাতে হবে!" বরদাপ্রসন্ন যে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না তা তাঁর কথার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

আকবর বললো, "কব্‌জার আর দোষ কী? একশ বছর মালিকের সেবা করেছে। আর কদ্দিন জল-ঝড়ের সঙ্গে লড়বে? কব্‌জা বলে কি পেনসেন নিতে সাধ হয় না!"

অনিচ্ছুক বরদাপ্রসন্ন পকেট থেকে নোটবই বের করে মালের তালিকা লিখে নিলেন।

আকবর বললো, "এর মধ্যে চারখানা পাল্লা বাইরের। সেই বুঝে মাল কিনবেন। লোহার কব্‌জা এবং ইসকুরুপ আনলে তিন হপ্তা পরে আবার আমাকে ডেকে পাঠাতে হবে।"

"তোমাকে ওই জন্য ডাকতে ইচ্ছে করে না আকবর। সব সময় বড় বড় অর্ডার! আকবর, এটা সম্রাট শাজাহানের প্যালেস নয়—এটা ঠাকুরে ম্যানসন। ভাড়া-বাড়িতে কোন সাহসে তুমি পিতলের কব্‌জা এবং পেরেক চাইছো?"

"বাইরের জানালা যে হুজুর। সব সময় জল-হাওয়া লেগে মরচে পড়ে যাবে। পিতলের জিনিসে তার ভয় নেই।"

"যত মধু ঢালবে তত মিষ্টি লাগবে তা আমিও জানি।" মৃদু বকুনি লাগালেন বরদাপ্রসন্ন।

আকবর আবার দশ নম্বর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো। বরদাপ্রসন্ন বললেন, "শুনলেন তো? ওই ক'খানা পাল্লা পরাতেই একশো টাকার মেটিরিয়াল অর্ডার দিলো। উপায়ও নেই। সেদিন একখানা পাল্লা খুলে দড়াম করে তিনতলা থেকে একতলায় পড়েছে। ভাগ্যে কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। থাকলে নির্ঘাৎ মৃত্যু! পুলিসের যা স্বভাব, হয়তো সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে এই বেঁড়ে শালাকেই কোমরে দড়ি পরাতো।"

"যাক! আপনি এসে গেছেন—এসব দায়িত্ব আমার চুকে গেলো", এই বলে বরদাপ্রসন্ন বেরিয়ে গেলেন। মনে হলো, তিনি আকবরের জিনিসগুলো কেনার জন্য কাছাকাছি কোনো দোকানে ছুটলেন।

কিছুক্ষণ একা-একা ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পাওয়া গেলো। থ্যাকারে ম্যানসনের এই বিচিত্র জগতটা দিনের আলোয় নিজের চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না-দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এ-বাড়ির প্রতিটা বাঁক এবং গলি-ঘুঁজি ঠিক মতো চিনতে আমার অনেক সময় লাগবে। রাতের অস্পষ্ট আলোতে তাকেই অন্যরকম মনে হচ্ছে।

থ্যাকারে ম্যানসনের করিডর ধরে হাঁটতে বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করছি। নতুন চাকরি পেয়ে আমি যেন রাতারাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আমি কেমন শান্তভাবে গম্ভীরমুখে নিজের মধ্যে নিজেকে সমাহিত রেখে এগিয়ে চলেছি—আমার হাঁটার কায়দাই পাল্টে গেছে! বেকারদের হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়—কথাটা নিছক বানানো নয়।

বিভিন্ন তলায় পাক খেতে খেতে এবং দরজায় লেখা বিভিন্ন নামের প্লেটগুলো দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে কতরকম প্রশ্ন জাগছে। এইসব নামাঙ্কিত সামতানী ভারনানী, কারনানি, ডিসুজা, ছাবড়ারা কারা? এঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় না হলেও একদিন সবাইকে আমি জেনে ফেলবো। তখন এইসব নেম-প্লেটগুলোর সঙ্গে এক একটা পরিবারের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

উদ্দেশহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যে ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালাম

সেখানে এক ঘোষ মহাশয়ের নামাঙ্কিত রয়েছে। আর সি ঘোষ। রামচন্দ্র কিংবা রমেশচন্দ্র ওই ধরনের কিছু একটা হবেন নিশ্চয়। নিজের দেশের লোকের নাম দেখে মনটা হঠাৎ ছটফট করে উঠলো। ইচ্ছা হলো একটু আলাপ করি। নিজে থেকে আলাপের অনেক সুবিধা। বরদাপ্রসন্ন অথবা রামসিংহাসনের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করলে এ-বাড়ির সব ধরনের মানুষের সঙ্গে সহজে আমার পরিচয় কোনদিনও না-হতে পারে।

মনে মনে ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে একটা ছবিও এঁকে নিলাম। এ-পাড়ার বঙ্গ-সন্তান নিশ্চয় একটু সাহেবী মেজাজের হবেন। হাওড়া অথবা ভবানীপুরের মার্কামারা গৃহস্থ জীবনযাত্রা এই সাডার স্ট্রীট অথবা সাডার লেনে সম্ভব নয়। দেখে-শুনে যে মিস্টার ঘোষ এখানে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন তাঁর প্রয়োজন ও রুচি নিশ্চয় সাধারণ বাঙালী-জীবন থেকে একটু আলাদা হবে।

ঘোষজায়ার একটি ছবিও মানসপটে এঁকে নিতে দেরি হলো না। মেম-সাহেবী মেজাজ ছাড়া এই থ্যাকারে ম্যানসনে দিনের পর দিন সংসারযাত্রা নির্বাহ করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয় সম্ভব হতো না। দীর্ঘদিন ধরেই যে এঁরা এখানে ভাড়া রয়েছেন তা বরদাপ্রসন্নর খাতা না-খুলেই আমি বলে দিতে পারি। এ-ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটই তার ইঙ্গিত বহন করছে। নামের ওপরে জমে-ওঠা ধুলোর পরিমাণ থেকে সহজেই বলে দেওয়া যায়, রামসিংহাসন চৌরাশিয়ার সাইন আর্টিস্টকে এখানে বেশ কয়েক বছর কাজ করতে হয় নি।

এসব খবর একেবারে খোদ ঘোড়া অর্থাৎ শ্রী আর সি ঘোষ মহাশয়ের মুখ থেকেই এখন জানতে পারবো। থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি নিজেও নিশ্চয় খুশী হবেন। হয়তো, এ-বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে এমন সব কথা শ্রীঘোষের মুখ থেকে শুনবো যা আমাকে কিছুটা অভিজ্ঞ করে তুলবে, হয়তো আমি নতুন পথও দেখতে পাবো।

বেল বাজাতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। রামসিংহাসনের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেলো। হয়তো রিপেয়ার সংক্রান্ত নানা অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি এখনই আমাকে মন দিয়ে শুনতে হবে এবং কিছু কিছু কাজ দ্রুত করিয়ে দিতে না-পারলে মান-সম্মান থাকবে না।

এ-বাড়ি সম্পর্কে আমার যে এখনও কোনো অভিজ্ঞতা নেই তা ক্ষণেকের উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছি। দুঃসাহসী মন আমাকে উৎসাহ যোগাবার জন্যে বললো, "তুমি না এখন এই থ্যাকারে ম্যানসনের কর্তা? এ-বাড়িতে যারা ভাড়া দিয়ে থাকে তাদের সুখ-দুঃখ সুবিধে-অসুবিধের কথা জানাটাই তো তোমার কাজ। অপ্রিয় বক্তব্য শুনতে এতো সঙ্কোচ কেন?"

জয় মা কালী, আমি বেল টিপে দিচ্ছি। তেমন বুঝলে আমি নিজেই ফ্ল্যাটের সুবিধে-অসুবিধের কথা জানতে চাইবো। আদর্শ ম্যানেজারের তাই তো কর্তব্য!

বেল বাজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। বেল বাজছে কিনা তাও এখান থেকে বুঝতে পারছি না। এক-একটা বেল রীতিমত বেয়াড়া থাকে—অপরিচিত লাজুক হাতের মর্দনে, প্রথমবারে সাড়াই দেয় না। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার বেল-টেপার কথা ভাবছি, এমন সময় ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হলো।

সামান্য ফাঁক দিয়ে একটি প্রসাধন-স্নিগ্ধ সুন্দরী নারী-মুখের কিছু অংশ বেরিয়ে এলো। আমার দিকে একবার সুগম্ভীর দৃষ্টি হেনেই তাঁর

মসৃণ তরুণী মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়লো।

আমি ওই সুদেহিনীকে সুপ্রভাত জানালাম। এ-বাড়ির গৃহিণী বোধ হয় আমার পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছেন। কারণ আর কিছু বলবার আগেই আমাকে অবাক করে দিয়ে ঝকঝকে কলিনোস দাঁতের সারি বিকশিত হলো। গৃহিণী মধুর ভঙ্গিমায় আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন 'আসুন।' যেন আমি কতদিনের চেনা মানুষ।

দরজার ফাঁক আরও একটু বড় হয়ে উঠলো এবং ভদ্রমহিলা দ্রুত আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন।

এ-বাড়ির সুন্দরী গৃহিণীর সর্বাঙ্গ এবার আমি এক ঝলক দেখে নিলাম। দীর্ঘাঙ্গিনী নন, কিন্তু বাঙালীদের পক্ষে ছোট নন। তন্বী শরীরে এই সকালে একটা ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের ভারী দক্ষিণী সিল্কের শাড়ি পরেছেন তিনি। মাথার চুল এয়ার হোস্টেসদের স্টাইলে বাঁধা। প্রশস্ত সিঁথিতে বিবাহের রাঙা চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে—বেশ মোটা করেই এই সীমন্তিনী সিঁদুর লাগিয়েছেন, যা এ-পাড়ায় দুর্লভ হবে ভেবেছিলাম।

"প্লিজ, বসুন—আমি দু'মিনিটে আসছি"' এই বলে কাঠের পার্টিশনের ওধারে দ্রুত উধাও হয়ে গেলেন ফ্ল্যাটের মধুরহাসিনী গৃহলক্ষ্মী।

অগত্যা আমিও সুন্দরভাবে সাজানো ড্রয়িং রুমের সোফার ওপর নিশ্চিন্তে বসে পড়লাম। বসে বসে লক্ষ্য করলাম, বিরাট ঘরখানার প্রধান অংশ সুদৃশ্য এক টেম্পোরারি পার্টিশনের সাহায্যে দৃষ্টির অগোচর রাখা হয়েছে। সাংসারিক প্রয়োজনে ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করে নিয়েছেন এই ঘোষ পরিবার। দুটি যামিনী রায়ের আঁকা ছবি ঝুলছে দেওয়ালে। সামনের নিচু টেবিলে কয়েকখানা ইংরিজী সাময়িকপত্র। ঘোষ পরিবারের সুরুচি ছোট্ট এই ঘেরাটুকুর মধ্যে ফুটে উঠেছে, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

আন্দাজ করছি, শ্রীযুক্ত ঘোষ ভিতরেই রয়েছেন। এবং তাঁকে ডেকে আনবার জন্যই শ্রীমতী ঘোষ হয়তো চটুল পদক্ষেপে অন্দরমহলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ওমা! শ্রীমতী ঘোষ স্বামীকে ডাকতে যান নি। মুখের মেক-আপের সামান্য যা দোষ ত্রুটি ছিল তাই আর্জেন্ট মেরামতের জন্যেই যেন তিনি ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তাঁকে আরও ফিটফাট ও ঝকঝকে দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটিও লিপস্টিকের সদ্য ছোঁয়াচে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বেশবাস যাই হোক, অন্তত আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন এ-বাড়ির গৃহলক্ষ্মী। মধুর হেসে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খাবেন?- চা না ঠান্ডা?'

আমি না-বলতে গেলাম। কিন্তু রীতিমত ধমকের কায়দায় তিনি বললেন, "আমি কিছুই শুনতে চাই না। কিছু না খেলে আমি খুউব রাগ করবো।"

প্রথম পরিচয়ে টেনান্টের অর্ধাঙ্গিণীকে চটাবার দুঃসাহস পৃথিবীর কোন ম্যানসন ম্যানেজারের আছে? অতএব সস্নেহে হুকুমের সুমধুর স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিলাম।

চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবার আমার খুব কাছে এসে বসলেন। এই সকালেই ওঁর সুবন্ধ শরীর থেকে বিলিতি সেন্টের মিষ্টি গন্ধ ভুর ভুর করে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমার সাম্প্রতিক খবরাখবর যে ওঁর কিছুই অজানা নয় তা পরের প্রশ্ন থেকেই জানতে পারলাম।

ভ্রূধনভঙ্গ করে উনি বললেন, "কবে এলেন ?"

"গত কাল সকালেই তো হাজির হলাম।"

"ও মা!" কচি মেয়ের মতো আদুরে গলায় মিসেস ঘোষ বললেন, "আমি শুনলাম পরশুদিন বিকেলেই আপনি এসে গিয়েছেন।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। পরশুদিন বিকেলে আমি যখন বিলাসিনী দেবীর প্রাসাদে চাকরিতে বহাল হচ্ছি, তখন থেকেই তা হলে এ-বাড়িতে গুজব ছড়াতে আরম্ভ করেছে! নিজের চাকরি সম্বন্ধে রীতিমত উচ্চ ধারণা হচ্ছে আমার। আমার প্রতিটি মুভমেন্টের খবর এ-বাড়ির গৃহিণীদের কানেও অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে দেখে একটু চাপা গর্ব বোধ করলাম।

ঘোষ ফ্ল্যাটের সুবেশিনী গৃহলক্ষ্মী এবার আমাকে আরও অবাক করে দিলেন। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সস্নেহ ও অনুযোগের সুরে প্রশ্ন করলেন, "কাল রাত্রে এলেন না যে বড় ?"

কাল রাত্রে আমি যে রামসিংহাসনের সঙ্গে থ্যাকারে ম্যানসন পরিক্রমায় বেরিয়েছি সে-খবরও এখানে তাহলে এসে গিয়েছে! আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি।

ভদ্রতার খাতিরে এখন কিছু উত্তর দিতে হয়। ওঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললাম, "প্রথম দিন—ঘুরতে ঘুরতে বেশ দেরি হয়ে গেলো।"

ফ্ল্যাটের গৃহলক্ষ্মী এবার আচমকা বিপজ্জনকভাবে আমার খুব কাছে সরে এলেন। দেহ স্পর্শ করে অভিমানভরা কণ্ঠে বললেন, "আপনি আসবেন বলে আমি এখানে বসে আছি, আর আপনি নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!"

রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছি এবার। এসব কী বলতে চাইছেন ভদ্রমহিলা ? উনি আরও কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বললেন, "আজ যদি না আসতেন, তা হলে আড়ি করে দিতাম। ডেকে পাঠালেও কিছুতেই আসতাম না," একি ! কথা বন্ধ রেখে আচমকা নরম হাতে আমাকে নিবিড় এবং উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন ঘোষ ফ্ল্যাটের রহস্যময়ী গৃহলক্ষ্মী।

অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অপরিচিতা নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থেকে কী সব ভয়ঙ্কর বিপদ আসতে পারে তা হোটেলের প্রাক্তন কর্মচারী হিসেবে আমার অজানা নয়। কীভাবে বাহুডোর থেকে মুক্তি পাবো ভাবছি এমন সময় তীব্র সুরে বেল বেজে উঠতেই মহিলাটি বিদ্যুৎবেগে আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করলেন এবং দ্রুত বুকের আঁচল সামলে নিলেন। বিরক্তভাবে এগিয়ে গিয়ে তিনি দরজা খুলতেই আর এক ভদ্রলোককে অ্যাটাচি কেস হাতে দেখা গেলো।

আগন্তুক বললেন, "মিসেস সেন ? নমস্কার।"

ভদ্রমহিলা বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে ? এইভাবে ডিস্টার্ব করছেন ?"

আগন্তুক সবিস্ময়ে বললেন. "আমি মিঃ চট্টরাজ ! এই মাত্র আপনার সঙ্গে ফোনে কথা হলো—দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি বললাম।"

শিউরে উঠলেন ভদ্রমহিলা। আমি ততক্ষণে প্রায় ঠকঠক করে কাঁপছে

শুরু করেছি। প্রচণ্ড কোনো গোলমাল হয়ে গিয়েছে। শ্রীমতী সেন নিশ্চয় এতোক্ষণ আমাকে চট্টরাজ বলে ভুল করেছেন।

মিসেস সেন এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তাহলে কে?"

আমার কোনো দোষ নেই। এতোক্ষণ আমাকে কোনোরকম পরিচয় দেবার সুযোগ দেন নি এই স্বল্পবসনা সুন্দরী। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পরিচয় দিলাম। বললাম, "আমি এসেছিলাম মিস্টার ঘোষের খোঁজ করতে।"

"ঘোষ? সে আবার কে?" আকাশ থেকে পড়লেন ফ্ল্যাটের চঞ্চলা গৃহলক্ষ্মী।

"মিস্টার আর সি ঘোষ। এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে। বাইরে যাঁর নাম লেখা আছে।" আমি তখনও হাঁপাচ্ছি।

"ফ্ল্যাট তো জেঠমালানি ট্রেডিং কোম্পানির!" খিলখিল করে হেসে উঠলেন সুন্দরী।

যথা সময় নষ্ট না করে নতুন আগন্তুককে হাত ধরে ভিতরে টেনে নিলেন সুন্দরী। ওঁকে বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কাল রাত্রে আসেন নি, আমি খুউব রাগ করেছি। ফ্ল্যাট বন্ধ করে আমি চলে যাচ্ছিলাম এমন সময় আপনার ফোন এলো।"

আমার দিকে তাকিয়ে স্বল্পদেহিনী বললেন, "ওমা! কী ভীষণ ভুল হয়ে যাচ্ছিল! আপনি অন্য কোথাও খোঁজ করুন—এখানে মিস্টার ঘোষ বলে কেউ নেই।"

চট্টরাজকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে দ্রুত আমার নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন মিসেস সেন। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে।

ভোরবেলায় আরব্য রজনীর অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে সোজা চলে এসেছিলাম অফিস ঘরে। কিছুক্ষণ আগের আচমকা বিপদ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে সাহস হলো না।

এবার আর সি ঘোষের খোঁজ করা প্রয়োজন।

খাতাপত্র ঘেঁটে দেখলাম, আমার ভুল হয় নি। ফ্ল্যাটের ভাড়াটে অবশ্যই রমেশচন্দ্র ঘোষ।

রামসিংহাসনকে ডাকলাম আমি। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে কে?"

"মিস্টার আর সি ঘোষ।" তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো রামসিংহাসন। এসব বিবরণ তার কণ্ঠস্থ।

জিজ্ঞেস করলাম, "ভাড়া কতদূর দেওয়া আছে?"

"ভেরি গুড পে মাস্টার।"

আমি দু'মিনিট আকাশ-পাতাল ভাবলাম। তারপর গম্ভীরভাবে বললাম, "রামসিংহাসন, আমি ৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটের মিস্টার আর সি ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দু'একদিনের মধ্যেই শ্রীযুক্তবাবু আর সি ঘোষ যে সত্যিই সশরীরে আমার সামনে আবির্ভূত হবেন এমন প্রত্যাশা করি নি। কিন্তু সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে সত্যিই তিনি দেখা দিলেন।

তখন বেলা প্রায় বারোটা। থ্যাকারে ম্যানসনের আপিস ঘরে বসে মাথা নিচু করে বিভিন্ন রেকর্ড থেকে কিছু জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় একটা আধাময়লা পাঞ্জাবি এবং মিলের ধুতি পরে বগলে-ছাতি এক ভদ্রলোক আমার সামনে হাজির হলেন। ভদ্রলোকের বয়স যে অন্তত পঞ্চাশের ঘরে তা তাঁর কাঁচাপাকা খ্যাংরা-টাইপ গোঁফ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বিভিন্ন কাগজ এবং নোটবুকের চাপে ভদ্রলোকের বুক পকেটের বাঁদিকটা প্রায় আড়াই ইঞ্চি ফুলে রয়েছে।

ছাতা নামিয়ে একগাল হেসে ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার জানালেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

মুখের পান সামলে ভদ্রলোক ঘোষণা করলেন, "শুনলাম আর সি ঘোষকে খুঁজছেন আপনি।"

এই ধরনের নোংরা জামা-কাপড়ের মালিককে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের টেনান্ট বলে ভাবতে আমার বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

ভদ্রলোক নিজেও সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। এইভাবে মুখোমুখি হবার আমন্ত্রণ যে তাঁর পছন্দ নয় তা হাবভাবে এবং কথাবার্তায় ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

এই মুহূর্তে আমি নিজেও কিছু বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করছি। তার একটি হলো : জামা-কাপড় দেখে মানুষকে চেনার চেষ্টা বৃথা। রাস্তায় এই ভদ্রলোককে দেখলে নিশ্চয় ধরে নিতাম ইনি ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী। সাহেবপাড়ায় ইনি যে ফ্ল্যাট ভাড়া রেখেছেন একথা এই ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে কে বলবে? আমি আন্দাজ করছি, আধাময়লা জামাকাপড়ের শত শত লক্ষপতি আমাদের এই শহরে পাওয়া যাবে।

কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় সন্দেহের নতুন ঢেউ খেলে গেলো। যিনি আমার সামনে বসে রয়েছেন তিনি স্বয়ং আর সি ঘোষ নন, তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

গম্ভীরভাবে বললাম "মিঃ ঘোষের সঙ্গে পার্সোনাল কিছু কথাবার্তা ছিল।"

সন্দেহ নিরসন করে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন "বলুন।"

"এই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের টেনান্ট আপনি?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ! সে তো আজকের কথা নয়।" ভদ্রলোক যে অনেকদিন এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে রয়েছেন তা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক এবার কায়দা করে আইন দেখিয়ে দিলেন। "কোনো কিছু জানবার দরকার হলে চিঠি লিখবেন। কথায়-কথায় ডেকে পাঠানো।"

"কথায় কথায় নয়—মাত্র একবারই আপনার খোঁজ করেছি মিস্টার ঘোষ।" শান্ত অথচ শক্তভাবে বললাম ভদ্রলোককে। আইনের কিছু কিছু যে আমারও জানা আছে তা এই ভদ্রলোককে বোঝানো প্রয়োজন।

"কী ব্যাপার বলুন তো?" ভদ্রলোক এবার যেন একটু নরম হয়েছেন।

চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্বাচিত কিছু অংশ এবার তাঁর কাছে নিবেদন করলাম। বললাম, "আপনার নাম দেখে যেচে ভাব করতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়ে গেলাম।"

ভদ্রলোক একেবারে চুপসে গেলেন। এই ধরনের খবরের জন্যে তিনি বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ লজ্জা পেলেন। বললেন, "কী বিপদ বলুন তো! ভদ্রলোকের ছেলে আমি—আমার নাম নিয়ে টানাটানি।"

মনের দুঃখে আর সি ঘোষ এবার স্বীকার করলেন, বহু বছর ধরে এ-বাড়ির টেনাণ্ট হলেও নিজের ফ্ল্যাট এখনও তিনি চোখে দেখেন নি।

"তাহলে?"

"আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান—মুখের ওপর মিথ্যে কথা বলবো না। বেনামী মশাই—সমস্ত কলকাতা শহরটাই তো বেনামীতে চলছে। সামনে শিখণ্ডী খাড়া রেখে অন্য লোকেরা আড়াল থেকে দুনিয়ার কলকাঠি নাড়ছে।"

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

ভদ্রলোকের কাতর নিবেদন : "আমাকে দয়া করে বিপদে ফেলবেন না, সত্যি কথা সব আপনাকে ফাঁস করে দিচ্ছি। আমি মশাই দুশো কুড়ি টাকা মাইনের কেরানি। থাকি হাওড়া হাজার-হাত কালীতলার কাছে ওলাবিবিতলা লেনে। আমি কোথেকে সাহেবপাড়ায় ফ্ল্যাট রাখবো বলুন তো?"

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাচ্ছি। কাপড়ের খুঁটে নাক মুছে আর সি ঘোষ বললেন, "ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন আমার আপিসের মালিক। জেঠমালানি ট্রেডিং কোং-এর ম্যানেজিং পার্টনার জগদীশ জেঠমালানি। যে সমস্ত পুরনো কর্মচারিদের ওপর মালিকদের একটু বিশ্বাস থাকে তাদের নামটাম ওঁরা অনেক কাজেকর্মে ব্যবহার করেন। কারও নামে জমি কিনছেন, কারও নামে বাড়ি। কারও নামে টাকা ধারও দেখাচ্ছেন। কাগজপত্তর সব ওঁদের কাছে থাকে—আমরা নিমিত্ত মাত্র। এসব আমাদের আফিসে চিরকাল হয়ে আসছে। নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়—যেখানে বলে সেখানেই বুক ফুলিয়ে সই করে দিই। মাথা ঘামাই না। নিশ্চয় ওইসব সইটই থেকে মালিক কিছু সুবিধে পান। কিন্তু আমি স্যার কোনো খবরই রাখি না।"

খবরাখবর না রেখে আর সি ঘোষ মশাই নিশ্চয় ভাল করেন নি। ওঁর নামে ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে মিস্টার জেঠমালানি যেসব দুর্নীতির ব্যবস্থা করেছেন তা বিস্তারিত জানতে পারলে ওলাবিবিতলা লেনের এই ছা-পোষা কেরানি ভদ্রলোক হয়তো ভিরমি খাবেন।

ইতিমধ্যেই কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করেছি। ব্যাপারটা যে কলকাতা শহরে খুবই চালু তা আবিষ্কার করে আমি নিজেও একটু চিন্তিত হয়েছি। ছোট এবং মাঝারি সাইজের অনেক ধনপতি এ-পাড়ায় পাকাপাকিভাবে বিলাস কক্ষ ভাড়া নিয়ে রাখেন। জনসংযোগের কাজে এইসব ফ্ল্যাটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিজনেসের প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও কাস্টমার, কখনও পারচেজ অফিসার, কখনও শক্তিধর সরকারী অফিসারদের পদধূলিতে পবিত্র হয়ে ওঠে এইসব শয়নমন্দির। ইয়ার-বন্ধু-সহ খোদ মালিকদের সশরীর উপস্থিতিতেও এইসব ফ্ল্যাট মাঝে মাঝে ধন্য হয়।

ভিতরে যিনিই এসব ফ্ল্যাট ভোগ দখল করুন, বাইরে নাম থাকে আর সি ঘোষদের। অনেক সুবিধে এই ব্যবস্থার। জেঠমালানি কোম্পানির নামটা অহেতুক প্রচারিত হয় না। যে-কোম্পানির সঙ্গে কাজকর্মের সম্পর্ক রয়েছে বিলাসকক্ষে সান্ধ্য বিশ্রামের সময়েও সেই কোম্পানির নাম নাকের ডগায় দেখলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসাররাও একটু অস্বস্তি বোধ করেন। অনেক ভিতু এবং সন্দেহপ্রবণ অফিসার একটু বেশী খুঁতখুঁতে। যে-

কোম্পানির খোঁজখবর করতে এসেছেন তাঁদের মালিকদের সঙ্গে প্রকাশ্য রেস্তোরাঁয়, ক্লাবে সামাজিকতা করতে অনেকে চান না।

মিস্টার জেঠমালানি অথবা তাঁর ভাগ্নে জিজ্ঞেস করেন, "সন্ধ্যে-বেলাটা কী করছেন? সারাক্ষণ কাজ-কাজ করে শরীরটা নষ্ট করবেন না, স্যার। ডক্টররাও বলছেন, আপনাদের মতো 'রেস্তো' লোকদের একটু রিলাক্সেশন দরকার।"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেব যদি এই মধুর ইঙ্গিতে একটু নরম হলেন, তাহলে জেঠমালানির ভাগ্নে বলবেন, "আপনাদের কথাই আলাদা। কত ব্রেনের কাজ করেন—সবসময় ঐভাবে ব্রেন চালানো হেলথের পক্ষে ভাল নয়, স্যর।"

এর পরেই প্রস্তাব উঠবে। ভাগ্নে বলবেন, "আমার ফ্রেন্ডের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট আছে, বিকেলে চলে আসুন না। আপনার খুব ভাল লাগবে।"

সাহেবের মনে তখনও দ্বিধা থাকলে, ভাগ্নে আশ্বাস দেবেন, "আমার ফ্রেন্ড দু'একদিন ট্যুরে বাইরে গিয়েছে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না স্যর, একদম প্রাইভেট। পুরোপুরি রিল্যাক্স করতে পারবেন।"

বিশ্বস্ত মহল থেকে এই ধরনের খবর পেয়ে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। ভেবেছিলাম, আর সি ঘোষ মশাই এসব জানেন। কিন্তু বাড়িওয়ালার খাতায় নিজের নামটি লেখানো ছাড়া আর কোনো খবরই তাঁর কাছে নেই।

এসব খবর যার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যার নাম বাইরে লেখা আছে, তাঁর তাহলে কোনো দায়িত্বই নেই?

তিনি হেসে বলেছিলেন, "আইনের প্যাঁচ অতশত বুঝি না ভাই। তবে অপ্রিয় কিছু ঘটলে জেঠমালানি ট্রেডিং কোম্পানির সঙ্গে এ বাড়ির কোনো যোগাযোগ খুঁজেই পাওয়া যাবে না! তখন হয়তো খোঁজ পড়বে কে এই ফ্ল্যাটের মালিক। মিঃ জেঠমালানি এবং তাঁর ভাগ্নে স্রেফ বলে দেবেন, আমরা কিছুই জানি না স্যর! বিপদ আপদ সামলাবার সমস্ত ঝুঁকি তখন আর সি ঘোষের। বড় জোর আড়াল থেকে জেঠমালানি কোর্ট-কাছারির খরচটা জুগিয়ে যাবে।"

অনেকদিন আগে হাইকোর্টে বাবুদের বারান্দায় বসে ছোকাদা যেসব মহামূল্যবান বাণী বিতরণ করতেন তার একটি মনে পড়ে গেলো। ছোকাদা বলেছিলেন, "অমন যে অমন নারায়ণ, তিনিও একটি নামে সমস্ত লীলাখেলা ম্যানেজ করতে পারেন না—তাঁরও অষ্টোত্তরী শতনাম। বেনামী ছাড়া বিশ্ব চলে না, ভায়া।"

আর সি ঘোষ ইতিমধ্যে পকেটের পানের ডিবে থেকে আর একটি পান বের করে মুখে পুরেছেন। সরল শিশুর মতো এবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া কত মশাই?"

ফ্ল্যাটের ভাড়াটে নিজেই জানেন না, কত টাকা ভাড়া, এমন পরিস্থিতি আমার কাছে অকল্পনীয়।

পান চিবোতে চিবোতে আর সি ঘোষ বললেন, "কী করে জানবো মশাই? ম্যাশিয়ার হনুমানপ্রসাদজী আমাদের পাত্তাই দেয় না। কাকে কী দিচ্ছে কিছুতেই মুখ খুলবে না। আমার বাড়ির ভাড়া কত তাও আমাকে বলবে না।" এই বলে রাগে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের টেনান্ট আর সি ঘোষ।

চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের পরিস্থিতি আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিল।

নতুন কর্মজীবনের প্রথম অভিজ্ঞতাটাই অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। এ-বিষয়ে এখনই কিছু করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সম্মুখসমরে কোনো পক্ষ থেকেই তেমন উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি না।

বরদাপ্রসন্নকে আমার সন্দেহ হয় না। কিন্তু এ অঞ্চলে বহু বছর জীবন কাটিয়ে তিনি অনেক কিছু মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়েছেন। আমার নতুন আবিষ্কারে তিনি মোটেই উত্তেজিত বোধ করছেন না।

তিনি সোজা বললেন, "কার নামে ফ্ল্যাট, কে ভোগ দখল করলো এসব জেনে আমার মতো সামান্য কর্মচারি কী করবে? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কখন সাপ বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক আছে! সাপ তো বেরিয়েই ম্যানসনের মালিকের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে না—আমাকেই ছোবল মারবে।"

বরদাপ্রসন্নর মধ্যে এক ধরনের দার্শনিক নিরাসক্তিও লক্ষ্য করছি। আপন মনেই তিনি বললেন, "যার নামে যা লেখা থাকে তা দুনিয়ায় ক'জন ভোগ করছে? সবই তো নেপোয় মারে দইয়ের কেস।"

আমি এখনও যে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না তা বৃদ্ধ বরদাপ্রসন্ন বোধ হয় লক্ষ্য করলেন। বললেন, "যতক্ষণ আমি রেগুলার ভাড়া পেয়ে যাচ্ছি ততক্ষণ আমি ছোটখাট ব্যাপারে নাক গলাই না। রামসিংহাসন ঠিক সময়ে আমাকে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়া এনে দেয়। আমি ক্যাশ গুণে নিই। তবে ব্যাংকের চেক দিলে আমি সাবধান হয়ে যাই। সেবার রাম-সিংহাসন আমাকে জেঠমালানি কোম্পানি না কার ক্রসড্ চেক এনে দিয়ে-ছিল। আমি চেকটি সংগে সংগে ফেরত দিয়ে ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসে রইলাম। সোজা বলে দিলাম, খাতায় কলমে আমি আর সি ঘোষ ছাড়া আর কাউকে চিনি না, বাছা রামসিংহাসন। আর চিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাটসায়েবকে। গভর্নরের সই করা ক'খানা নোট এনে দাও, আমি সন্তুষ্ট থাকবো। ব্যাটা রামসিংহাসন জিভ কেটে বললো, গলদ হয়ে গিয়েছে। আর সি ঘোষের চেক আনতে গিয়ে সে ভুলে জেঠমালানির চেক এনে ফেলেছে।"

বরদাপ্রসন্ন শান্তভাবে বললেন, "রামসিংহাসন বলেছিল টোয়েণ্টিফোর আওয়ার্সের মধ্যে আর সি ঘোষের নতুন চেক আনবে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে ক্যাশ টাকা দিয়ে গেলো।"

"চেকে আপত্তি কী?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"আইনের সর্বনাশা ফাঁদ! বুঝতে পারছেন না!" শিউরে উঠলেন বরদাপ্রসন্ন। "আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে ওই ফাঁদ পাতা হয়েছিল। আম যদি সরল মনে জেঠমালানির চেক নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করে দিতাম, তাহলে ওরা প্রমাণ করতো যে আমরা জানি ফ্ল্যাটটা জেঠ-মালানির বেনামে রয়েছে। ওদের চেক নিয়ে আমরা তা স্বীকার করে নিয়েছি। আইন থেকে আমি শতহস্ত দূরে থাকতে চাই। অতি সর্বনাশা জিনিস এই মামলা-মোকদ্দমা!"

দুপুরবেলায় নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে জেঠমালানি এবং আর সি ঘোষের কথা ভাবছিলাম। বেনামি এই ফ্ল্যাটের সমস্যাটা আমার মাথা থেকে বিদায় নিয়েও নিচ্ছে না। রাম-সিংহাসনের ওপরে আমি একটু বিরক্ত হয়ে আছি।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। "কাম ইন," বলে আমি বিছানায় উঠে বসলাম।

শ্রীমান সহদেব এবার সশরীরে প্রবেশ করলেন। সহদেবের শ্রীঅঙ্গে এখন কুকবেয়ারার শ্বেতশুভ্র বসন, মুখে এক গাল হাসি।

"বিশ্রাম করছিলেন নাকি?" সহদেব আরও একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"বোসো। বোসো। বিশ্রাম আর কি। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম।"

সহদেব বসলো না। দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আমার হাতে একটা চিরকুট এগিয়ে দিলো।

বললো, "চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণি পাঠিয়ে দিলেন।"

"চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণির সঙ্গে আপনার চেনা আছে বুঝি?" সহাস্য সহদেবের বিনয়াবনত প্রশ্ন।

"তুমি ওঁকে চেনো!" আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

বিগলিত সহদেব মাথা চুলকে বললো, "আমি কাকে চিনি না, স্যার?"

আমি সহদেবের মুখের দিকে তাকালাম।

সহদেব বললো "আমি চাকরি করি ছাব্বিশ নম্বরে। কিন্তু কিছু সাইড বিজনেস আছে। কিছু কিছু জল খাবার তৈরি করে সাপ্লাই দিই স্যার। চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণি তো এখানে রেগুলার থাকেন না। যখন আসেন মাঝে মাঝে, তখন এই অধম সহদেবের খোঁজ পড়ে। আমার হাতের তৈরি ফিশ ফ্রাই খেতে খুব ভালবাসেন দিদিমণি।"

দিদিমণি নিজেই সহদেবের কাছে আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন। সহদেব উত্তেজনার মাঝেই বলে ফেলেছে, আমাকে অনেকদিন থেকে চেনে সে। আমি নাকি খুউব ভাল লোক!

দিদিমণির লেখা চিরকুটখানা আমার হাতে দিয়ে সহদেব ফিরে গেলো। উনুনে সে নাকি ঘুগনির ডাল চাপিয়ে এসেছে। এ-বাড়ির এক পিওনের সঙ্গে সে ঘুগনির ব্যবসা করে। সহদেবের সহযোগী রীতিমত করিতকর্মা ব্যক্তি। সে সকালে খবরের কাগজ বিলি করে, দুপুরে নাম-কা-ওয়াস্তে সরকারী অফিসে পিওনগিরি করে এবং ঠিক আড়াইটের সময় সহদেব-নির্মিত ঘুগনি কালো টিনের বাক্সে পুরে গলায় ঝুলিয়ে সিনেমা হল্-এর সামনে বেচতে বেরোয়।

ছোট্ট চিঠির টুকরো। তাতে মাত্র এক লাইন লেখা। 'একবার দেখা হওয়া কী একান্তই অসম্ভব? সুলেখা সেন'।

দুপুর বেলা। ঘড়ি প্রায় দুটোর ঘরে ঢুকে পড়েছে। থ্যাকারে ম্যানসনের সামান্য ম্যানেজার বৃহস্পতিবারের বহুনিন্দিত বারবেলায় সুলেখা সেনের এই চিরকুট নিয়ে কী করবে?

চৌত্রিশ নম্বর ঘরের সেদিনের অভিজ্ঞতায় আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তবু ঘরে বসে থাকতে পারলাম না।

"আসুন, আসুন," চৌত্রিশ নম্বর ঘরের সুলেখা সেন আমাকে বিনীত

নমস্কারে সাদর আহ্বান জানালেন।

সুন্দরী সুলেখা সেনকে আজ সেদিনের মতো প্রচণ্ড সাজা-গোজা অবস্থায় দেখলাম না।

সুলেখা সেনের প্রিয় রং বোধ হয় নীল। দেওয়ালে হাল্কা নীল পর্দা। তিনি একটা হাল্কা নীল রংয়ের বাংলা তাঁতের শাড়ি পরেছেন। বিশাল চওড়া পাড় যেন ওঁর ছোট্ট শরীরকে ঢেকে রেখেছে।

আমাকে ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সুলেখা সেন বাইরের দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। আমার মুখে কোনো অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল কিনা জানি না। হঠাৎ কী ভেবে সুলেখা সেন দরজা পুরোপুরি বন্ধ করলেন না। একটু খোলা রেখে দিলেন।

আমাকে বসতে আহ্বান করে সোফার এক কোণে বসে পড়লেন সুলেখা সেন। তারপর খুব সহজভাবে বললেন, "আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো আপনি আসবেন না।"

আমি সুলেখার দিকে তাকিয়ে আছি। বয়স আমার থেকে কয়েক বছর কমই হবে। সেদিন যাকে অভিনেত্রীর ভূমিকায় দেখেছিলাম তিনি এখন খুব কাছের মানুষের মতো। আমি কী উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পারছি না।

সুলেখা মিষ্টি হেসে বললেন, "একবার ভাবছিলাম, আমি নিজেই আপনার ঘরে গিয়ে দেখা করে আসি। কিন্তু ভয় হলো, তাতে আপনার অসুবিধে হবে।"

দীর্ঘ নীরবতা। কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে দুজনের।

সুলেখা এবার আমার দিকে তাকালেন। করুণভাবে বললেন, "চলে যাচ্ছি আপনাদের এই শহর থেকে।"

আমি বলতে চাই, কে এখানে এলো কে এখান থেকে গেলো তাতে আমার কিছু এসে যায় না। "কলকাতা শহরটা যে আমার নয় তা আপনার জানা উচিত মিসেস সেন।"

আমার মন্তব্য শুনে হেসে উঠলেন সুলেখা সেন। "মিসেস বলছেন কাকে?"

সুলেখা সেনের সীমন্তে লাল সিঁদুর এখনও জ্বলজ্বল করছে। আমাকে সেই দিকে তাকাতে দেখে সুদেহিনী সুলেখা বললেন, "সিঁদুরটা তো মেক-আপ! এ লাইনে বেশীর ভাগ লোক মিস থেকে মিসেসদেরই পছন্দ করে। হাঙগামা কম, কোথাও গিয়ে এক সঙ্গে থাকলে পাবলিকের নজরে পড়তে হয় না। এই যে আমি মিস্টার জেঠমালানির রিকোয়েসটে মিস্টার চট্টরাজের সঙ্গে ধানবাদ যাচ্ছি, কপালে সিঁদুর অনেক সাহায্য করবে। মিস্টার চট্টরাজের দিকেও কারও নজর পড়বে না—মিসেস বলে পরিচয় দিলে আমাকেও কোনো হাঙগামা পোয়াতে হবে না।"

সুলেখা সেন তাহলে অবিবাহিতা। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার একটু মায়া হলো।

এরপর সুলেখা সেন আমাকে অবাক করে দিলেন। বললেন, "এই তো যাচ্ছি কবে আবার ফিরবো কে জানে। অন্তত দু-তিন মাসের আগে নয়। ততদিনে মিস্টার জেঠমালানি এখানকার জন্যে হয়তো অন্য কোনো ব্যবস্থা করে ফেলবেন।"

একটু থামলেন সুলেখা সেন। আন্তরিকতা মেশানো স্বরে শান্তভাবে

বললেন, "এ বাড়ির সমস্ত স্টাফের সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক—কখনও কারও সঙ্গে গোলমাল হয়নি। যাবার আগে সেদিনকার ব্যাপারের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, শংকরবাবু। এরকম ভুল আমার জীবনে হয়নি।"

সুলেখা সেন হঠাৎ সলজ্জভাবে মাথা নিচু করলেন। এবং দিশেহারা আমি পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

যে সব ভাড়াটে যথাসময়ে পাওনা ভাড়া মিটিয়ে দেন তাঁরা যে-কোনো ম্যানসন বাড়ির কর্মচারীদের লক্ষ্মী।

"মাসের পয়লা তারিখে যে ভাড়া দেয় তাকে আমি নিজের ছেলের থেকে বেশী ভালবাসি", মন্তব্য করেছিলেন কলকাতার এক ডাকসাইটে বাড়িওয়ালা। বিলম্বিত লেনদেনে ভুক্তভোগী এই ভদ্রলোক আমাকে আরও বলেছিলেন "আমার ছেলের ঘরে এবং যে-ভাড়াটে পয়লা-তারিখে টাকা দেয় তার ঘরে যদি একই দিনে বৃষ্টির জল পড়ে তাহলে আমি আগে ভাড়াটের ছাদে মিস্ত্রি পাঠাবো!"

এই মূল্যবান মন্তব্য থ্যাকারে ম্যানসনে এসে আবার মনে পড়ে গেলো। বরদাপ্রসন্ন নিজেও ভাড়া আদায়ের ভুক্তভোগী। তাই চৌত্রিশ নম্বর ফ্লাটের রেগুলার পে-মাস্টার জেঠমালানির ওপর তিনি কিছুটা সদয়।

এ বাড়িতে এসে নতুন কিছু কাজ দেখাবার জন্যে আমিও ছটফট করছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আর সি ঘোষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার তেমন সাহস পাচ্ছি না। বরদাপ্রসন্ন সাবধান করে দিয়েছেন, "এ-সি লাইনে হাত দিতে যাবেন না। জেঠমালানিরা অতি ধুরন্ধর লোক। ওদের পকেটে কত উকিল-মোক্তার রয়েছে। আর সি ঘোষের পান থেকে চুন খসলেই এই সব উকিল মোক্তার অ্যালসেসিয়ান কুকুরের মতো আপনার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে।"

আইন-আদালতের ব্যাপারে অত সহজে নার্ভাস হয়ে যাবার জন্যে আমি জন্মগ্রহণ করিনি। আমার ধমনীতেও যে ওকালতি রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা বোধহয় বরদাপ্রসন্নের খেয়াল নেই।

তবে অভিজ্ঞ বরদাপ্রসন্নের একটি মূল্যবান উপদেশ অবহেলা করবার নয়। তিনি বলেছেন, "ধীরে বন্ধু ধীরে। উকিল-মোক্তারের কাঁটাতারে জড়াবার আগে একটু ভেবে-চিন্তে দেখে নেবেন। প্রথম ফায়ারিং করতে দু-একদিন দেরি হলে বিশ্বসংসার ভেসে যাবে না!"

সুতরাং শ্রীযুক্ত জেঠমালানি, আর সি ঘোষ এবং চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটকে আরও কিছুদিন লক্ষ্য করা যেতে পারে এবং পরে সময় বুঝে যথাবিহিত কর্ম সম্পাদিত হবে।

অগত্যা আমার সমস্ত নজর এবার উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ওপর পড়লো।

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট। গ্রহ-নক্ষত্র বিড়ম্বিত কোন্ বারবেলায় আমার সঙ্গে প্রথম উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল তা এখন স্মরণ করতে

পারছি না।

শুধু এইটুকু মনে আছে, উত্তর-দক্ষিণের করিডর ধরে ম্যানসন পরিক্রমার সময় বিশেষ একটি কারণে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হতো। না, কোনো দেশোয়ালী ভাইয়ের নাম সেখানে অঙ্কিত ছিল না। উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের আকর্ষক বস্তুটি একটি তালা। সকাল দুপুর সন্ধ্যা যখনই উত্তর দক্ষিণ করিডর ধরে হাঁটি তখনই ঐ ফ্ল্যাটে তালা ঝুলতে দেখি। কে কখন ফ্ল্যাটে থাকেন, কখন তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন তা আমার নজরে পড়বার কথা নয়। কিন্তু তালার সাইজটি একটু স্পেশাল হওয়ায় ওদিকে চোখ চলে যায়।

একদিন কী খেয়াল হওয়ায় উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের কাছে গিয়ে স্পেশাল তালাটি পরীক্ষা করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।

তালার কাছে গিয়ে সবে একটু নজর দিয়েছি এমন সময় তেলকালি-বাবুর গলা শুনতে পেলাম ঃ "কী দেখছেন স্যর?"

এইভাবে ধরা পড়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি। প্রশ্নের উত্তরে যদি বলি স্রেফ তালাখানা দেখছি তাহলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই অর্থ-হীনভাবে হেসে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার চেষ্টা চালালাম। আশা করেছিলাম, তেলকালিবাবু আমার দিকে আর নজর না-দিয়ে নিজের কাজে চলে যাবেন।

প্রচেষ্টা সফল হলো না। তেলকালিবাবু নিজেও একগাল হেসে বললেন, "দেখুন, দেখুন। দেখবার জিনিস যখন, তখন কেন দেখবেন না?"

তালার সাইজটা যে স্পেশাল সে-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তেল-কালিবাবু মন্তব্য করলেন, "আপনি তো পড়া-লেখা করা লোক। হাইকোর্টে মস্ত উকিল ছিলেন আপনি।"

মিথ্যে পরিচয়টা গ্রহণ করতে রুচিতে বাধলো। বললাম, "উকিল ছিলাম না—মস্ত উকিলের কাছে কাজ করতাম।"

"ওই হলো স্যর! আমাদের কাছে যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। আচ্ছা, তালাক শব্দটা কি তালা থেকে এসেছে?"

তেলকালিবাবুর হেঁয়ালি আমি এখনও বুঝতে পারছি না। ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তেলকালিবাবু বললেন, "যথাসময়ে সব বুঝতে পারবেন স্যর। তালা-কের সঙ্গে নিশ্চয় তালার স্পেশাল সম্পর্ক আছে। উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট এক-খানা তালার কেস নয়। বাড়ির মধ্যে বাড়ি, ঘরের মধ্যে ঘর এবং তালার মধ্যে তালা।"

তেলকালিবাবু নিজেই এবার ওপরের বিরাট তালাটা ডানহাতে তুলে ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট আর একটি তালা আমার নজরে পড়লো।

অভিজ্ঞ চোখে তেলকালিবাবু ছোট তালাটি খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "এ কী অবস্থা! কদ্দিন এইভাবে ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। শেষে দরকারের সময় চাবি লাগিয়েও খোলা যাবে না।"

হাতের নাইলন ঝোলার ভিতরে নজর দিলেন তেলকালিবাবু। "দাঁড়ান স্যর, উপোসী জীবনটাকে একটু তেল খাইয়ে দিই।"

ছোট একটা লুব্রিকেটিং ক্যান বের করে তেলকালিবাবু সস্নেহে এমন ভাবে তলার তালাটায় তৈলসিঞ্চন আরম্ভ করলেন, মনে হলো নবজাত একটি শিশুকে তিনি ড্রপারে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

লুব্রিকেটিং ক্যানের সরু মুখটা চাবির গর্তে ঢুকিয়ে ওপরের দিকটা টিপতে টিপতে তেলকালিবাবু বললেন, "দেখুন স্যার, তৃষিত চাতক হয়ে রয়েছে। খা বাছা খা। যত প্রাণ চায় খেয়ে নে—তোর সায়েব একদিন আমাকে অনেক বকশিশ দিয়েছে।"

চাবির মুখ থেকে ক্যান বের করে অন্য জোড়ের কাছেও তেল ঢাললেন তেলকালিবাবু। আমি ভাবলাম, এবার ওপরের বড় তালাটার দিকেও তিনি নজর দেবেন।

কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আমি রসিকতা করে জানতে চাইলাম, "ওপরের তালাটার তেষ্টা পায়নি?"

ক্যানটা ঝুলির মধ্যে পুরে দু হাত তুলে তেলকালিবাবু বললেন, "নমস্কার স্যার! মালিকের পারমিশন না নিয়ে আমি কখনও ওই তালার মধ্যে নাক গলাই? উনি হুকুম করলে তখন দেখা যাবে। বড় তালার তো স্যার গার্জেন রয়েছে, নিচের তালার মতো এখনও অনাথ হয়নি!"

এবার রহস্যটা ঘনীভূত হচ্ছে। "দুটি তালার মালিক তা হলে এক লোক নন!"

"এক্কেবারে নয়!" মন্তব্য করলেন তেলকালিবাবু।

আমার ঘরে বসে ভদ্রলোক গল্প করতে করতে বললেন, "এক নম্বর তালার মালিক হলেন ফিলিপ সাহেব। উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে। আর দুনম্বর তালার গার্জেন আমাদের বরদাপ্রসন্নবাবু। তালার ওপর তালা লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি।

একগাল হেসে তেলকালিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? এ বাড়ির প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের দরজায় তালা লাগাবার কড়া স্পেশালি তৈরি। এমন ডিজাইন যে দরকার হলেই তালার ওপর তালা লাগানো চলবে। অনেক বাড়িতে মালিক এমন বোকা যে ক' পয়সা খরচ বাঁচানোর জন্যে আংটির মতো ছোট সাইজের বালা লাগান। পরে তাঁদের আপসোস করতে হয়। তালার ওপর তালা লাগানোর উপায় থাকে না!"

কে এই ফিলিপ সায়েব? কেন তাঁর তালার ওপর বরদাপ্রসন্নর তালা পড়লো?

তেলকালিবাবুর মুখে শুনলাম, নামেতেই কেবল সায়েব ছিলেন এই ফিলিপ সায়েব। তেল-চকচকে মেহগিনি কাঠের মতো রং এবং জেল্লা ছিল তাঁর। যেমন লম্বা, তেমনি টাইট চেহারা, দেখলেই মনে হতো এক পিস কাঠ থেকে কুঁদে বার করা বডি।

তেলকালিবাবু বললেন, "ভারি আমুদে লোক ছিলেন এই ফিলিপ সায়েব। ফ্ল্যাটে দিন রাত ইলেকট্রিক কলের গান চলতো। কত রকমের বাজনার রেকর্ড নিয়ে আসতেন ভদ্রলোক দেশ-বিদেশ থেকে।"

তেলকালিবাবু যে ফিলিপ সায়েবের ওপর খুবই সন্তুষ্ট তা কথাবার্তার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। বললেন, "কলকব্জা অন্ত প্রাণ ছিল ফিলিপ সায়েবের। প্রত্যেকবার ফরেন থেকে ফেরবার সময় নতুন নতুন যন্তরপাতি কিনে আনতেন। একখানা বাঁদর যা এনেছিলেন না!"

"নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে!" সগর্বে উত্তর দিলেন বরদাপ্রসন্ন। "কলের লাঙল হয়েছে রামসিংহাসনের। সেই ট্র্যাকটরে চড়ে দেশে-ঘরে ওরা বর নিয়ে যায় পর্যন্ত। মোটর গাড়ি যদি ও ইচ্ছে করে না কেনে!"

আমি এবার উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। বললাম. "এই ফিলিপ সায়েবটা কে? এখন কোথায়?"

"তা যদি জানতাম, তা হলে তো কোনো সমস্যাই থাকতো না। সায়েব যে কোথায় উধাও হলেন, তা হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার অনেকদিনের ভাড়া বাকি।"

বাকি ভাড়া আদায়ের ওপর আমার যে স্পেশাল নজর তা থ্যাকারে ম্যানসনের কর্মীরা ইতিমধ্যেই ভালভাবে জেনে গিয়েছেন।

দার্শনিকের মতো মাথা নেড়ে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কখন যে কী হয় কিছুই বলা যায় না। এই যে ফিলিপ সায়েব। এ রকম ভাল ভাড়াটে আমার একটিও ছিল না। আমাকে ডেকে তিন মাস পর্যন্ত আগাম ভাড়া আমার হাতে গুঁজে দিতেন। হ্যাঁ মশাই, এই ঘোর কলি কালে, যেখানে বকেয়া ভাড়া আদায় করতে বাপের নাম ভুলে যেতে হয়, সেখানে একজন বলছে বরদা, 'প্লিজ তিন মাসের আগাম ভাড়া নিয়ে রাখো।'। আমার মনে হতো স্বপ্ন দেখছি!"

সেই সায়েবেরও অবশেষে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেলো।

আমি গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিলাম "আগে কে কত ভাল লোক ছিলেন তা জেনে এখন আমাদের কোনো লাভ হবে না।"

"সে-কথা কি আমার জানতে বাকি আছে! কে কবে কী করেছে সেই হিসেব দেখিয়ে আজকের দুনিয়া চলে না, তা আমি সব সময় মনে রেখেছি বলতে পারেন," আমার কথায় বরদাপ্রসন্ন একটু দুঃখ পেয়েছেন বোঝা গেলো।

ওঁকে আঘাত দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মালিকের পাওনা ভাড়া বাকি রাখবার জন্যেও আমরা কেউ এখানে চাকরি করতে আসিনি।

বরদাপ্রসন্নকে জিজ্ঞেস করলাম, "ফিলিপ সায়েব এতই যখন রেগুলার পে-মাস্টার ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি কেন?"

"কার সঙ্গে দেখা করবো?" তিনি কোথায়? এই বলে মুখ গম্ভীর করে ফেললেন বরদাপ্রসন্ন হালদার।

"অনেক বছর ভাড়াটে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। কে চারশ-বিশ পার্টি এবং কে জেনুইন ভদ্রলোক তা আমি ঠিক বুঝতে পারি। আমার মন বলছে, ফিলিপ সায়েব আমাদের সমস্ত পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেবেন,"- বরদাপ্রসন্ন আমাকে বলেই ফেললেন।

কালেক্‌শন সরকারের মন কি বলছে তার ওপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার শিক্ষা আমার নয়। গণপতিবাবু আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে কখনও পরের মুখে ঝাল খাবে না। কখনও চক্ষু-লজ্জাতে ভুলবে না। আদায়ের কাজে নরম ভাব দেখিয়েছো তো মরেছো।"

সুতরাং আমি এখন বেশ কড়া। আমার মেজাজ আন্দাজ করেই বরদা-প্রসন্ন আর কথা না বাড়িয়ে পুরনো খাতাপত্তর একে একে আমার সামনে খুলে ধরলেন। প্রতি বছর হালখাতার দিনে বরদাপ্রসন্ন ভাড়াটেদের

জন্যে একখানা নতুন খাতা খোলেন। পয়লা বৈশাখ সকালবেলায় সেই খাতা কালীঘাট থেকে মন্ত্রঃপূত হয়ে আসে। পরের পর কয়েকটা খাতার দিকে তাকিয়ে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

একটু বিরক্তভাবে শুনিয়ে দিলাম, "করেছেন কী! মাসের পর মাস, বছরের পর বছর উনিশ নম্বরের ভাড়া বাকি!"

"মাসের পর মাস। কিন্তু বছরের পর বছর নয়। মাত্র এক বছর পেরিয়েছে," মাথা নিচু করে মৃদু প্রতিবাদ জানালেন বরদাপ্রসন্ন হালদার।

"উনিশ মাস ভাড়া নেই, বছরের পর বছর হতে আর দেরি কই?" আমার কথার ধরন থেকেই ম্যানেজারের বর্তমান মেজাজ সম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া উচিত।

এবার বরদাপ্রসন্ন প্রতিবাদ জানালেন। হাত পা গুটিয়ে তিনি নাকি মোটেই বসে নেই। যেসব প্রয়োজনীয় স্টেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নাকি ইতিমধ্যেই তিনি নিয়েছেন।

শুনেছি, অনেক বাড়িতে মোটা টাকা ভাড়া বাকি ফেলে রেখে কেউ কেউ আকস্মিক অন্তর্ধানের গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। প্রথম পর্যায়ে আস্তে আস্তে দুটো-চারটে করে মাল-পত্তর বাড়ি থেকে অন্যত্র সরতে আরম্ভ করে। তারপর ভাড়াটে তাঁর গৃহিণী এবং পুত্রকন্যাসহ একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। আর তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় না। যখন কেয়ার টেকারের টনক নড়ে তখন পাখি পালিয়েছে। ফ্ল্যাটের মধ্যে একখানা ভাঙা খাটিয়া এবং গোটা দুয়েক হাতল ভাংগা চেয়ার ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। সেই খাটিয়াও বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয় না, কারণ অকুস্থলে হঠাৎ এণ্টালি কিংবা রফি আমেদ কিদওয়াই রোড থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড ফার্নিচার কোম্পানির পোড়খাওয়া প্রতিনিধি হাজির হন।

এঁদের পকেটে ভাড়া-দেওয়া ফার্নিচারের তালিকা-বই থাকে। সেখানে ফেরারী ভাড়াটের সই জ্বল জ্বল করছে। লালখাতার জোরে দু মিনিটেই প্রমাণ হয়ে যায় খাটিয়া এবং হাতলভাঙা চেয়ারের মালিক নিরুদ্দিষ্ট ভাড়াটে নন, এই ফার্নিচার কোম্পানি। বিনা বাক্যব্যয়ে তখন অবশিষ্ট জিনিসপত্তরগুলোও ফার্নিচার কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হয়।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "সব জানি। অ্যাদ্দিন এ লাইনে আছি, ভাড়াটে ভ্যানিশ হবার প্রসেস জানি না, তা কখনও হয়?"

নেমে-যাওয়া চশমাটা নাকের যথাস্থানে তুলে দিয়ে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এও শুনে রাখুন, এ-রকম অন্তর্ধান যখন হয়, তখনই তার পিছনে দারোয়ানদের হাতযশ থাকে। মোটা টাকা বকশিশ খেয়ে তারা ষড়যন্ত্রে যোগ না দিলে কোনো ভাড়াটের পক্ষেই দফে-দফে ফ্ল্যাট খালি করা সম্ভব নয়।"

বরদাপ্রসন্ন জানালেনঃ "আমাদের পাশের ভাবনানি ম্যানসনে তো এক ব্যাটা ঘুঘু ভাড়াটে ট্রাক নিয়ে এসে মালপত্তর সরিয়ে ফেললো। যাবার সময় বাড়িওয়ালার চারখানা ফ্যান এবং ডজনখানেক ইলেকট্রিক সুইচ পর্যন্ত খুলে নিয়ে চম্পট দিলো। বেচারা কেয়ার-টেকার কিছুই জানতে পারলো না। সমস্ত ব্যাপারটা হলো রাত বারোটা থেকে ভোর চারটের মধ্যে। আপনি বলুন, কে কখন ভাড়া না দিয়ে চম্পট দিচ্ছে তা পাহারা দেবার জন্যে বাড়ির সরকার কি রাতেও একটু ঘুমুবে না? তাহলে দারোয়ান

কেন আছে?”

বরদাপ্রসন্নর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারছি না। বিরক্ত বরদাপ্রসন্ন ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, “কলকাতার প্রত্যেক বাড়িতে মিনিমাম আধ ডজন দারোয়ান কী করে আমাকে বলতে পারেন? ঈশ্বর এদের কী কাজের জন্যে ম্যানুফাকচার করেছেন, দয়া করে একটু বলে দেবেন?”

আমি চুপ করে থেকেও নিষ্কৃতি পেলাম না। বরদাপ্রসন্ন বললেন, “আপনি তো শাজাহান হোটেলে দুনিয়ার লোকজনদের সঙ্গে কাজ কারবার করেছেন। কলকাতার মতো এমন নুলো জগন্নাথ দারোয়ান হোল-ওয়ালর্ডের কোথাও আছে বলে শুনেছেন?”

বরদাপ্রসন্ন তাঁর প্রিয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ করলেন। “এরা কিসসু কম্মের নয়। পাখীমারা বন্দুকের শব্দ শুনলে মহাবীররা ভিরমি খায়। চুপচাপ খাটিয়ায় বসে থেকে থেকে এদের বাড়িতে এতো চর্বি জমেছে যে এক-পা দৌড়বার ক্ষমতাও নেই। চোরের সঙ্গে লড়বে এরা? একটা ছাগল তাড়াবার ক্ষমতা নেই যাদের।”

“উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যাপারেও দারোয়ানের কোনো গোপন যোগসাজস সন্দেহ করছেন নাকি।”

জিভ কেটে বরদাপ্রসন্ন বললেন, “কেন মিথ্যে-মিথ্যে অভিযোগ করবো? ফিলিপসায়েবের কেসটা আলাদা। আপনাকে গপ্পোটা পুরো বলবো। বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল লোক ছিলেন। কেরালার লোক তো—ঠিক বাঙালীদের মতো। একটুতেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আবার একটুতেই চোখে জল গড়ায়।”

ফিলিপ সায়েবের গল্প অন্য সময় শোনা যাবে। তার আগে আমি নিজের কাজকর্ম সারতে চাই। এতোদিন ধরে কেন ভাড়া বাকি তার একটা ফয়সালা প্রয়োজন।

বরদাপ্রসন্ন তবু বললেন, “বড্ড ভালো-বাসতেন বউটাকে। বউ অন্ত প্রাণ বলতে পারেন, ফিলিপ সায়েবের।”

বরদাপ্রসন্ন এবার আমার দিকে তাকালেন। “বিয়ে-থা করেছেন নাকি?”

মনে মনে হাসলাম। নিজের অন্ন জোগাতে পারছি না, আবার বিয়ে!

বরদাপ্রসন্ন বললেন, “বিয়ে জিনিসটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার।”

মানুষের বাপ-মা নির্বাচন স্বয়ং ভগবান করে দেন, সেখানে আমাদের কোনো হাত থাকে না। কিন্তু বউ নির্বাচনটা এতো শক্ত কাজ যে ভগবান নিজেও পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে সাহস পান না। ঝুঁকিটা মানুষের ঘাড়েই তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন।”

গম্ভীরভাবে বরদাপ্রসন্ন বললেন, “কলিকালে বউই সব। খুব বুঝে-সুঝে ওয়াইফ সিলেকশন করবেন, ঘরে লক্ষ্মী বসবাস করবে, না-ঘুঘু চরবে তা সেণ্ট-পার্সেণ্ট নির্ভর করে এই বউয়ের ওপর। অমন যে অমন চমৎকার ফিলিপ সায়েব—তিনিও কেবল রূপে অন্ধ হলেন। বে-করবার আগে একবার মেয়ে-মানুষের গুণের কথা ভেবে দেখলেন না।”

আমি ইতিমধ্যে অধৈর্য হয়ে উঠছি। এবার বললাম, “ভাড়াটা বাকি পড়লো কী করে বলুন?”

“সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম তা আপনি যখন ডিটেল শুনতে চান না, এখন পয়েণ্ট-বাই পয়েণ্ট কোশ্চেন করুন আমি উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।”

আমার প্রশ্নঃ “কত মাসের ভাড়া বাকি?”

বরদাপ্রসন্নঃ "উনিশ মাস।"

আমার প্রশ্নঃ "কতদিন আগে আপনার সঙ্গে ফিলিপ সায়েবের শেষ দেখা হয়েছে?"

"কুড়ি মাস আগে।"

আমিঃ "হিসেবে মিলছে না শেষ মাসের ভাড়াটা ফিলিপ সায়েব কী অন্য কারুর হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

"মোটেই না। হিসেব ভালভাবেই মিলছে। ফিলিপ সায়েব চিরকাল আগাম ভাড়া দিয়ে রাখতেন।"

"ভাড়া বাকি পড়লো কেন?"

বরদাপ্রসন্নঃ "সেই কথাই তো বলতে চাইছিলাম। বউয়ের সঙ্গে কী যে হলো। হঠাৎ একদিন ঘরে চাবি লাগিয়ে সায়েব বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেলেন।"

"এবং আপনারাও কোনো খবরাখবর করলেন না", ঈষৎ ঝালমিশ্রিত আমার মন্তব্য।

বরদাপ্রসন্নঃ "এর আগেও এক-আধবার উনিশ নম্বর দরজায় তালা পড়েছে। কিন্তু সে ম্যাক্সিমাম দু'দিনের জন্যে। ঘরের পাখী আবার ঘরে ফিরে এসেছে। সেই জন্যে এবারও আমরা মাথা ঘামাই নি। যতক্ষণ আমি আগাম ভাড়া পেয়ে যাচ্ছি ততক্ষণ কে দরজায় তালা ঝোলালো, আর কে দরজা খুলে রাখলো তা আমার জানবার কথা নয়।"

"তারপর?"

বরদাপ্রসন্নঃ "আমার প্রথম চিন্তা হলো পরের মাসে। সেই প্রথম ফিলিপসায়েবের ভাড়া বাকি পড়লো। কিন্তু যে গোরু নিয়মিত দুধ দিয়ে এসেছে, সে যদি একদিন শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়, আপনি কী করবেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্যই কিছু করবার নেই, আমি মনে মনে স্বীকার করি।

"শেষ পর্যন্ত কী করলেন?" আমার প্রশ্ন।

"আমি তখনও ওয়েট করছি আর করছি। বাজারে নানা রকম গুজব। কেউ বলছে, মেমসায়েবটি আমাদের সায়েবের মনে খুব দাগা দিয়েছেন। এমন দাগা যে সায়েব সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছেন। কেউ বলছে, এ-ঘর মেমসায়েবের কনট্রোলে চলে আসবে। দুজনের মধ্যে কেস চলছে।"

"কোথায় কেস?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তা আমি কী করে জানবো? এই দুনিয়াতে কোর্ট কী একটা! কত জায়গায় টেবিল-চেয়ার পেতে ধড়াচুড়ো পরে জজ-সায়েব এবং উকিল মোক্তাররা বসে আছেন। আর আমাদের এই ফিলিপ সায়েব এবং তাঁর বউ বিশ্বসংসার চষে বেড়াবার ক্ষমতা রাখেন। কোথায় কোন কোর্টে তাঁরা ঢুকে পড়েছেন, তা খুঁজে বের করা কি সহজ কাজ!"

"তাহলে, আপনি কিছুই করলেন না?"

বরদাপ্রসন্নঃ "তা কখনও হয়। লেখাপড়া তেমন শিখিনি বলে, ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই?"

আমার পরবর্তী প্রশ্নঃ "কী করলেন?"

বরদাপ্রসন্নঃ "আমাদের তেলকালিকে পাকড়াও করলাম। বললাম, তেলকালি, তোমার সঙ্গে মেমসায়েবেরও তো খুব খাতির ছিল। একটু গতর নাড়াও—কী হলো খোঁজখবর করো।"

তেলকালিবাবু প্রথমে নাকি একটু ফোঁস করে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, "আমার কাজ যন্তরে তেল লাগানো, ভাড়াটেরা কোথায় কী করছেন আমি জানবো কী করে?"

কিন্তু এক বকুনিতে শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়েছিলেন তেলকালিবাবু। বরদাপ্রসন্ন বলেছিলেন, "বেশী এস্টাইল দেখিও না তেলকালি। চালকলা নিয়ে দিনরাত ঠাকুর-ঘরে পড়ে থাকি বলে ভেবো না আমি খোঁজ-খবর রাখি না? তুমি ফিলিপ মেমসায়েবের আপিসে যাওনি? লুকিয়ে-লুকিয়ে ওখান থেকে কল সারাইয়ের কাজ জোগাড় করো নি?"

"তা করেছি। সৎপথে খেটে দু'পয়সা যদি রোজগার করেই থাকি?" তেলকালি নরম গলায় উত্তর দিয়েছে।

"পথে এসো বাছাধন! আমি তোমার রোজগারে বালি ছড়াতে আসিনি। আমি স্রেফ বলছি, মেমসায়েবের আপিসে গিয়ে খোঁজ করে এসো, ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছে।"

তেলকালি তখনও ভয় পাচ্ছে। বলছে, "সায়েব-মেমে মন কষাকষি, তার মধ্যে আমার মতো সামান্য মিস্ত্রির নাক-গলানো কেন?"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "শেষ পর্যন্ত ঠেলে-ঠুলে তেলকালিকে পাঠানো হয়েছিল মেমসায়েবের আপিসে। কিন্তু সেখান থেকে সে মুখ গোমড়া করে ফিরে আসতেই আমার চিন্তা আরম্ভ হলো।"

তেলকালি আপিসে মেমসায়েবকে খুঁজেই পায়নি। ওদের লিফট-ম্যানের কাছে জিজ্ঞেস করতে সে বলেছে, রাঙা মেমসায়েব তো অনেক দিন আপিসে আসে না। খুব সম্ভব চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

"আপিসে স্টাফ ডিপার্টমেণ্টে কারও কাছে খোঁজ করলো না কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আর বলবেন না," বরদাপ্রসন্নর খেদোক্তি। "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তেলকালির যত কিছু কেরামতি ওই আপিসের লিফটম্যান পর্যন্ত। লিফটম্যান আবার কত রসের কথা বলেছে। জানতে চেয়েছে, কী হলো ভায়া—হঠাৎ মেমসায়েবের খবর কেন? আপিসের লিফটম্যান অনেক সময় মেমদের নাম জানে না। জানলেও ব্যবহার করতে সাহস পায় না। বলে, কার নাম কখন পাল্টে কী হচ্ছে তার বলা খুব শক্ত! এ-মাসে যিনি ইস্মিথ মেমসায়েব, সামনের মাসেই তিনি হয়ে গেলেন মুলার মেমসায়েব। দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতে মুলার মেমসায়েব হয়ে গেলেন মেদোরা মেমসায়েব। কার পক্ষে এসব হিসেব রাখা সম্ভব?"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "জানেন মশাই, ফিলিপ মেমসায়েবের আফিসের লিফটম্যান আমাদের তেলকালিকে কী বলেছিল?"

আমি কৌতূহল চাপতে পারছি না।

লিফটম্যান বলেছিল, "মেমসায়েবদের নাম পাল্টায়, জামা পাল্টায়, সাইজ পাল্টায়। একেবারে হাড়-লিকপিকে যে-মেমসায়েব জয়েন করে ছ'মাস পরে সেই মোটাসোটা হয়ে যায়। কিন্তু কখনও ওঁদের গন্ধ পাল্টায় না। এক-এক মেমসায়েবের গা থেকে বছরের পর বছর একই রকম সেণ্টের গন্ধ বেরোয়। লিফটের এককোণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এইসব গন্ধ লিফটম্যানের মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। চোখ বেঁধে দিলেও স্রেফ গন্ধ শুঁকেই লিফটম্যান বলে দিতে পারে, কোন মেমসায়েব লিফটে চড়েছেন।"

আসল খবরটা কিন্তু কিছুই সংগ্রহ হয়নি। ফিলিপ মেমসায়েব চাকরি ছেড়ে হঠাৎ কোথায় গেলেন সে-খবর তেলকালিবাবু সংগ্রহ করতে পারেন নি। লিফটম্যান বলেছে, "বাবুদের এবং সায়েবদের সমস্ত খবরাখবর সে মুখস্থ বলে দিতে পারে। কারণ একবার জয়েন করলে রিটায়ার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এখানেই থেকে যান। কিন্তু টাইপিস্ট মেমসাহেবদের কথা আলাদা। দঙ্গল বেঁধে-বেঁধে আসছে, কোম্পানির গাড়ি থেকে নেমে লিফটে উঠছে—তারপর কিছুদিন পরে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে কত-বার নাম পাল্টা-পাল্টি হচ্ছে, কারও বিয়ে ভাঙছে, কারও বিয়ে হচ্ছে। এরা তো নোয়া সিঁদুর পরে না তাই বিয়ে-সাদীর ব্যাপারটা লিফটম্যান কিছুই বুঝতে পারে না। কেউ-কেউ হঠাৎ এস্টাইলের জামা ছেড়ে ঢোলকা এক-রকম জামা পরতে আরম্ভ করে। লিফটম্যান তখনই বুঝতে পারে, এ-মেমসায়েবের ছেলে হবে। ছেলে হবার পরে অনেকে আর ফিরেই আসে না। অন্য মেমসায়েব দেখা যায় তার জায়গায়। নতুন মুখ দেখলেই লিফটম্যান বুঝতে পারে, পুরনো মেমসায়েব আর ফিরবে না।"

ফিলিপ মেমসায়েবের আপিসের লিফটম্যান তেলকালিবাবুকে বলেছিল, "দেখোগে নিশ্চয়ই বাচ্চা হবে—তাই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।"

তেলকালিবাবু আর কোনো উচ্চবাচ্য করেননি—সোজা ফিরে এসে বরদাপ্রসন্নর কাছে রিপোর্ট করেছেন।

"তারপর?" আমি এবার প্রশ্নমালা নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি।

"তারপর, আমি কী করব-করব ভাবছি। ব্যাপারটা খুব চাউর হতে দিইনি। যা দিনকাল। সায়েবের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না খবর পেয়ে যদি উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটে চুরি শুরু হয়! এখানে কিছুই অসম্ভব নয়।"

ভাবতে-ভাবতেই সময় কাটিয়ে দেননি বরদাপ্রসন্ন। তিনি বললেন, "ব্যাপারটা প্রথমে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম আমি। চাউর করেছিলাম সায়েব এই ফিরে এলেন বলে। ওরা ভেবে নিলো, আমি নিশ্চয় রেগুলার ভাড়া পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এইভাবে বেশী দিন চললো না।"

"গণ্ডগোল বাধালেন ইলেকট্রিক কোম্পানি। তাঁরা তো ছাড়নেওয়ালা নন। পরপর দু'খানা নোটিশ পাঠালেন। তারপর একদিন খোদ কাটাকেষ্ট-বাবু নিজেই যন্তরপাতি নিয়ে হাজির হলেন এই থ্যাকারে ম্যানসনে।"

"কাটাকেষ্ট! তিনি আবার কে?" কলির কেষ্ট শুনেছি। কিন্তু কাটা-কেষ্ট নাম তো কখনও শুনিনি।

একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "কেষ্টপদ কাঞ্জিলাল—এ অঞ্চলের ইলেকট্রিক লাইন ডিসকানেক্ট করবার ইনসপেকটার। লাইন কাটেন বলে, সবাই ওঁকে কাটা কেষ্ট বলে ডাকেন। অতি অমায়িক লোক, এই কাটাকেষ্ট কাঞ্জিলাল। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো'খন। কাটাকেষ্টবাবুকে দেখলেই বুঝতে পারি, আজ কারও ঘরে আলো নিভবে।"

বরদাপ্রসন্ন আবার শুরু করলন, "ওইরকম ঘটোৎকচ চেহারা কাটা-কেষ্টবাবুর, কিন্তু মনটা শিশুর মতো। কারুর বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইন কাটতে খুব কষ্ট পান। কিন্তু ভদ্রলোক কী করবেন, বলুন?"

"কাটাকেষ্টবাবু আমার কাছে এসে হাত জোড় করে বললেন, 'অপরাধ মার্জনা করুন। দূত অবধ্য! লাইন-কাটতে আমার নিজেরই চোখে জল এসে যায়। বুঝি তো, ইলেকট্রিক ছাড়া আজকাল কারও চলে? কিন্তু

কী করবো? ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির অন্ন খাই। এই-কম্মের জন্যে রেখেছে। লোকের বাড়িতে আলো নেভানোই আমার কাজ'!"

বরদাপ্রসন্নও আপত্তি করলেন না। "চলুন। আপনি কী করবেন। শাস্ত্রে বলছেঃ যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি। আমাকে যেভাবে নিয়োগ করবে, তাই করবো।"

কাটাকেষ্টবাবু তবু বললেন, "ক'মাসের বিল বাকি? ফিলিপ সায়েবকে বলুন না, আজকেই মিটিয়ে দিতে। সেক্ষেত্রে আমি না হয় সাড়ে-এগারোটার সময় আসবো।"

"কোথায় সায়েবমশাই? কাকে বলবো?" বরদাপ্রসন্ন দুঃখ করেছিলেন।

"তারপর?" আমার প্রশ্ন।

"খুব অসুবিধেয় পড়তে হলো। কারণ ঘরের সামনে তালা ঝুলছে। ওই তালা ভেঙে লাইন কাটবার ক্ষমতা নেই কাটাকেষ্ট কাঞ্জিলালের।"

কিন্তু এ-বাড়ির অরিজিন্যাল মালিকের দূরদৃষ্টির তারিফ করতে হয়। এইসব সমস্যা যে আসবে তা মার্টিন সাহেব বোধহয় মানসচক্ষে দেখতে পেয়ে মেন সুইচ এবং মিটারগুলো ফ্ল্যাটের মধ্যে না-রেখে সিঁড়ির তলায় এক জায়গায় বসিয়েছিলেন।

কাটাকেষ্টবাবু তবু একবার অভ্যেসমতো উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে গেলেন। তালা-ঝোলানো সত্ত্বেও জোরে বেল টিপলেন। ভিতরে বেলের আওয়াজ হলো।

বরদাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তালা ঝুলছে, তবু বেল বাজালেন!"

কাটাকেষ্টবাবু হাসলেন, "দুঃখের কথা আর বলবেন না। আমাদের ঠকাবার জন্যে অনেকে বাইরে তালা ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু আচমকা বেল-বাজালে অনেক সময় ঝি-টি কেউ বেরিয়ে আসে।"

কাটাকেষ্টবাবু নিচে চলে এলেন। বিড় বিড় করে মন্তরের মতো বললেন, "জয়-গুরু! দোষ নিও না! আমি নিমিত্ত মাত্র।" এবার পকেট থেকে যন্তর বের করে কট্ করে লাইন কেটে দিলেন।

"আমি বুঝলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খবরটা চারদিকে রাষ্ট্র হবে। আর হাতগুটিয়ে বসে থাকা যাবে না।"

"তখন?" আমি বরদাপ্রসন্নর কাছ থেকে জানতে চাই।

"বলছি স্যর, বলছি। অনেক কথা। একটু গলাটা ভিজিয়ে নিতে দিন।"

অফিস ঘরের কুঁজো থেকে দু গ্লাস ঠাণ্ডা জল আলগোছা নলির মধ্যে অবলীলাক্রমে ঢেলে দিয়ে শরীরকে ঠাণ্ডা করলেন বরদাপ্রসন্ন। এক ফোঁটা জলও বাইরে পড়লো না—কয়েকবার মাত্র ডগ-ডগ শব্দ হলো। কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছে বরদাপ্রসন্ন আমাকে উপদেশ দিলেন, "এই আল-গোছা জল খাবার অভ্যাসটা করে নেবেন,—অনেক উপকারে লাগবে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কোন্ জাত কোন্ গেলাসে কখন মুখ লাগাচ্ছে ঠিক নেই—বাউনের ছেলে অন্নসংস্থান করতে এসে কেন বেঘোরে জাত এবং প্রাণ খোয়াবেন?"

জাতের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রাণের ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার নয়। বরদাপ্রসন্ন মুখ বিকৃত করলেন। "বিষ মশাই, বিষ। দুনিয়ার যত জার্ম এই সব গেলাসের ধারে ধারে জমা হয়ে আছে—কেউ

কখনও তো ভাল্ করে ধোয় না। নাম-কা-ওয়াস্তে ম্যানেজারবাবুর জন্যে একখানা এসপেশাল কাঁচের গেলাস এখানে আছে, কিন্তু আপনি যেমনি পিছন ফিরলেন অমনি ঐ গেলাসের বারওয়ারি মোচ্ছব লেগে গেলো!"

কোনো তিক্ত ঘটনার স্মৃতিতে বরদাপ্রসন্নর মুখ এবার আরও বিকৃত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "আমাদের মদনা, ওর বাপ কালীচরণ আমাদের সুইপার, চেনেন তো। মদনার কাকা পাশের ভাবনানি ম্যানসনে কমোড সাফ করতো। তার কি অভ্যেস ছিল জানেন? চান্স পেলেই অন্য লোকের কাপ-গেলাস এঁটো করে দেওয়া। আপনি দেখলেন, মন দিয়ে ঘরের মেজে মুছছে—কিন্তু যদি সামনে খাবারের প্লেট বা গেলাস কিছু দেখলো অমনি চারদিকে বোঁ করে তাকিয়ে চোখের নিমিষে এঁটো করে দেবে। খাবার কিছু চুরি করে খাবে না। কিন্তু ঐ এঁটো করে পরের জাত মেরেই আনন্দ।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আমি কি আর এসব জানতাম মশাই! সেবার পেটের যন্তন্নায় লোকটা ছটফট করছে। জলপড়া দেবার জন্যে ওর ভাইপো আমাকে হাতে-পায়ে ধরে এ-বাড়ির ছাদে নিয়ে গেলো। সেখানেই ব্যাটা স্বীকার করল। 'আমি মহাপাপী। শত শত লোকের খাবার ঝুটো করেছি। আমাকে শাস্তি দিন'।"

এবার বরদাপ্রসন্নের মন্তব্যঃ "আমি শাস্তি দেবার কে মশাই? আমি কি ভগবানের ম্যাজিস্ট্রেট? আমি মায়ের নাম করে মুখে মন্তর পড়া জল ঢাললুম—কিন্তু যার আয়ু খরচ হয়ে গিয়েছে আমি তার কী করবো? সে মারা গেলো। কিন্তু যাবার আগে আমাকে পইপই করে বলে গেলো, কাউকে বিশ্বাস করবেন না, সরকারমশাই জলটা সব সময় আলগোছা খাবেন।"

বরদাপ্রসন্ন আবার ফিলিপ সায়েবের স্মরণ নিয়ে বললেন, "ইলেক-ট্রিকের লাইন কেটে কাটাকেষ্ট কাঞ্জিলাল চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমি মনস্থির করে ফেললাম। রামসিংহাসনকে গোদরেজের তালাচাবি বের করতে বললাম।"

বরদাপ্রসন্ন বিরক্তভাবে বললেন, "ভাবলুম একবার মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করি। কিন্তু নামেই তো মালিক! কাকে জিজ্ঞেস করবো বলুন? বিলাসিনী দেবীকে? পুজো-আচ্ছা ছেড়ে বিধবা মানুষ কি আমার ওই তালা লাগাবো কি লাগাবো না তার উত্তর দেবেন? অনুপমা? সে তো নাবালিকা, সংসারধর্মের কিছুই বোঝে না। বেশী ঘাঁটালে বিলাসিনী দেবী এখনই ওই মাস্টারবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। তখন ডবল মুশকিল! রোগীর মুখে জল ঝাপটা দেবো, না কুটুমের তত্ত্বতল্লাস করবো? কিসসু বোঝে না ভদ্রলোক। তার থেকে মা গঙ্গার নাম জপতে-জপতে নিজের কাজ নিজে করাই ভাল মনে হলো।"

"কিন্তু!" বরদাপ্রসন্ন একটু থামলেন। "ভাল বল্লেই কি এখানে ভাল করবার উপায় আছে? সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার অনেকগুলো বিনি-পয়সার অ্যাডভাইসার জুটে গেলো। তেলকালিবাবু সাবধান করে দিলেন, করছেন কি মশাই! কোনো রকম কোর্ট-ঘর না-করে আপনি ভাড়াটের তালার ওপর ওপর তালা লাগাচ্ছেন, একতরফা! আপনার যে কোমরে দড়ি পড়বে।"

বরদাপ্রসন্ন দুঃখ করলেন, "এরা মশাই আপনাকে কখনও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে না, সব সময় শুধু পিছনে টানবে। আমি বললাম, তালা আমি লাগাবোই—তারপর যা-হয় হবে।"

"রামসিংহাসনও আমাকে কী-সব আইনের পরামর্শ দিতে এসেছিল—এখানকার সবাই তো গাউন না-চড়িয়েই এক-একটি লর্ড সিনহা। আইন-আদালতের ভয়ে উনি আমার হাতে তালা-চাবিটি ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়লেন—উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট পর্যন্ত গেলেন না। তা আমার মশাই, অত জেল-হাজতের ভয় নেই—আমার তো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলায় পুরো এক কলকে গাঁজা খাবার অভ্যেস নেই। গাঁজা না-পেলে আমার চোখ তো কপালে উঠবে না। বড় জোর সন্ধ্যে-আহ্নিকের একটু কষ্ট হবে—কিন্তু তাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হাজতে ভগবানকে ডাকা যাবে না, এমন কোনো নিয়ম আছে বলে তো শুনিনি!"

"বেশ করেছেন আপনি তালা ঝুলিয়ে", আমি এবার বরদাপ্রসন্নকে ভরসা দিলুম।

খুশী হলেন বরদাপ্রসন্ন, "ফিলিপ সায়েবের যাতে ভাল হয় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা নিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, ভদ্রলোক যদি চটে যান, আমি সংগে সংগে দরজার তালা খুলে নেবো, বলবো এই তালা না লাগালে আপনার ফ্ল্যাটের জিনিসপত্তর সব লুটপাট হতো। বেশ লোক মশাই আপনি, বলা-নেই কওয়া নেই হুট করে কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেলেন। এখন থাকুন অন্ধকারে। ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে লাইন ফেরত পেতে অন্তত দুটি মাস।"

কিন্তু কাকে এসব কথা বলবেন বরদাপ্রসন্ন? ফিলিপ সায়েবের দেখা নেই। তার পরেও তো কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। এতোদিন কি বরদাপ্রসন্ন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন? যদি ফিলিপ সায়েব আর না আসেন। ফ্ল্যাট কি চিরকাল এভাবে বন্ধ থাকবে?

বরদাপ্রসন্ন আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। এক দৃষ্টিতেই তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন।

ঠোঁট উল্টে তিনি বললেন, "হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো কেন? বাকি ভাড়া আদায় এবং উচ্ছেদের জন্যে যা-করবার সবই করেছি। কোর্টে কেসও ফাইল হয়ে গিয়েছে।"

"তারপর?"

আমার প্রশ্নে ভদ্রলোক এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। "তারপর আবার কী? কেস ফাইল করবার পরে বাদীর আর কী করবার থাকে? আমি তো মশাই জজ হয়ে এজলাসে বসে মামলার রায় লিখে দেবো না!"

"আহা চটছেন কেন?" আমি বরদাপ্রসন্নকে শান্ত করবার চেষ্টা করি।

"চটছি কি আর সাধ করে! অ্যাদ্দিন কোর্টে কাজ করে এসেছেন, জানেন না আদালতে সব জিনিসই দেরিতে হয়? কত হাজার-হাজার মামলা কোর্টে বছরের পর বছর জমা হয়ে থাকে, জানেন না? আঠারো মাসে বছর কথাটা শুনেছেন. না শোনেননি?"

কথাটা শুনলেও আমি যে মেনে নিতে রাজী নই তা বরদাপ্রসন্ন এখনও আমার হাবভাব দেখে বুঝতে পারছেন না।

গম্ভীর মুখে তিনি উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ফাইলখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাগজপত্তর বিশেষ কিছু নেই, সবই উকিলের কাছে।

কিন্তু আমার গোঁ চেপে গিয়েছে—এতোদিন ধরে আইনের যত হাতুড়ে জ্ঞান আহরণ করেছি, তা কাজে লাগাবার সময় আগত।

সময় নষ্ট না-করে প্রথম সুযোগেই আইনপাড়ায় চলে এলাম। পুরনো পল্লীতে পদার্পণ করেই স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম—শরীর ও মন একই সঙ্গে কোনো এক শক্তির মঙ্গলময় উপস্থিতিতে হাল্কা হয়ে গেলো। স্বক্ষেত্রে ফিরে এসে নিজের অজান্তেই কখন বলে ফেললামঃ নম নম নম সুন্দরী মম ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীট।

এখানে আসবার আগে থ্যাকারে এস্টেটের উকিল গোলাপ বক্সীর খোঁজ করেছি। কিন্তু তাঁর দেখা পাইনি।

ভাবলাম এই সুযোগে গণপতিবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। নতুন চাকরিতে বহাল হবার পরে তাঁর সঙ্গে একবারও যোগাযোগ হয়নি।

•

সিন্হা অ্যান্ড লায়ন অ্যাটর্নির আপিসে গণপতি সামন্ত তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। দিন-দুপুরে আপিস পাড়ায় এইভাবে কাউকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে দেখলে অবাক হবারই কথা।

আমি কী করব, ঠিক করে উঠতে পারছি না। আমার অবস্থা দেখে অ্যাটর্নি আপিসের পুরনো বেয়ারা হেসে ফেললো এবং বললো, "বিশ্রাম করছেন !"

এত জোরে যাঁর নাক ডাকছে তিনি যে বিশ্রাম করছেন তা বলার প্রয়োজন নেই। বেয়ারা এবার ঘোষণা করলো, "খুব খাটা-খাটনি হয়েছে।"

প্রচুর খাটাখাটনি না-হলে গণপতিবাবু যে এইভাবে ঘুমোবার পাত্র নন তা আমিও জানি।

বেয়ারা বললো. "একটু বসুন—এখনই উঠে পড়বেন।"

ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন—আমি শুধু শুধু কেন তাঁর বিঘ্ন ঘটাবো ? এমন জরুরি প্রয়োজন নেই আমার।

বেয়ারা একগাল হেসে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলো আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুলে দেবার হুকুম আছে। বেয়ারা অতি সাবধানে ঘড়ির প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে।

এবং নির্ধারিত সময় হওয়া মাত্রই বেয়ারার মৃদু ডাকে গণপতিবাবু গভীর ঘুমের অজানা রাজ্য থেকে ওকালতি পাড়ায় ফিরে এলেন এবং চোখ খুলেই আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। "আরে তুমি !"

বেয়ারাকে গণপতিবাবু বকুনি লাগালেন, "আমাকে ডেকে দিলি না কেন আগে ?"

বেয়ারা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলো, "এই যে বাবু আপনি বললেন, খোদ লাটসায়েব এলেও যেন আপনার ঘুমের ডিসটার্বো না করি ?"

গণপতি আড়মোড়া ভেঙে বললেন. "ওঃ, তোকে নিয়ে পারা যায় না। লাটসায়েব, চীফ জাস্টিস এসব এক জিনিস, আর গুরুপুত্র অন্য জিনিস, যা. আমাদের জন্যে একটু চা নিয়ে আয়।"

গণপতিবাবু এবার আমাকে জানালেন. "বাবুদের স্পেশাল কাজে গতকাল খুব ধকল গিয়েছে। একটা সম্পত্তি নিয়ে কিছু গোলমাল চলছিল। গতকাল

চারটের সময় গোপন খবর পেলাম আদার পার্টি আজ কোর্টে আমাদের বিরুদ্ধে ইনজাংশন নেবে।"

"কিন্তু আমিও গণপতি সামন্ত! খবর শুনেই সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়লাম। তোমার বাবা বলতেন, এ-লাইনে যারা বড় হতে চায় তাদের ছ' মাসে বছর—একই সঙ্গে ডবল স্টেপে এগিয়ে না গেলে শত্রুকে পরাস্ত করা যায় না। যাদের দৌড় হরিণের মতো এবং চোখ ঈগল পাখির মতো, তারাই টিঁকবে।"

"ইনজাংশনের আগাম খবর শোনামাত্র বাবুদের ফোন করলাম। তারপর রাজমিস্ত্রি এবং মিতা জোগাড় করে হাজির হলাম জমিতে। হ্যাজাক জ্বালিয়ে হোল নাইট জমিতে কাজ হলো। পঁচিশটা রাজমিস্ত্রি, তোমায় বলবো কি অসাধ্য সাধন করেছে—এক রাতে অতখানি জমির চারধারে উঁচু পাঁচিল গেঁথে ফেলেছে। সকাল দশটা পর্যন্ত একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ চালিয়েছি—চোখের পাতা ফেলতে পারিনি। মিস্ত্রির জাত তো—ওদের বিশ্বাস নেই। একটু ঢিলে দিয়েছো তো ওরা হাত-পা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে!"

সকাল দশটা পর্যন্ত মিস্ত্রির কাজ করিয়েও ছুটি হয়নি গণপতিবাবুর। সোজা চলে এসেছেন হাইকোর্টে।। সেখানে অন্য পার্টির বিখ্যাত ব্যারিস্টার তখন গাউন চড়িয়ে গণপতিবাবুর মালিকের বিরুদ্ধে ইনজাংশন চাইছিল। গণপতিবাবু বললেন, "হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের ব্যারিস্টারের সঙ্গে কথা কইলাম। তিনি তো আমার কাণ্ডকারখানা শুনে তাজ্জব।"

গণপতিবাবুর ব্যারিস্টার এর পর বললেন, "মাই লর্ড, অপর পক্ষ কী সব আবোল তাবোল বকছেন? মনে হচ্ছে ওঁরা সম্পত্তির কাছে লাস্ট এক বছর যাননি। ওখানে তো কোনো অশান্তি নেই—বেশ কয়েক মাস আগে সেখানে পাঁচিল ওঠানো হয়েছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, কেউ কোনো আপত্তি করেননি। বিশ্বাস না-হয় এই ছবি দেখুন।" বুদ্ধিমান গণপতি ফটোগ্রাফার ডেকে ভোরবেলায় ছবিও তুলে নিয়েছেন।

ইনজাংশন টিকলো না। একগাল হেসে গণপতিবাবু বললেন, "পরিশ্রমটা সার্থক হয়েছে—ওদের মামলা ফেঁসে গেলো। সব সময় সজাগ না-থাকলে আইন-আদালতের কাজ চলে না ভায়া। সাধে কি আর হরি উকিল বলতেন, ইটারনাল তদবির ইজ দি প্রাইস অফ জাস্টিস! অন্য পার্টি তো অত বড় ব্যারিস্টারকে ব্রীফ দিলো, কিন্তু কিছু হলো কী? তদ্বির যে কাঁচা হয়ে রয়েছে।"

আদালত থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে বেরোতে-বেরোতে আড়াইটে বেজে গিয়েছে। গণপতিবাবুকে আজকেই আবার একটা পিটিশন ফাইল করতে হবে। ব্যারিস্টার ইতিমধ্যে খসড়া অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছেন। পিটিশন টাইপ ও ফাইলের মধ্যেকার সময়ে গণপতিবাবু চেয়ারে বসে গতরাত্রের বিনিদ্র দেহটাকে একটু স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

চা খেতে-খেতে গণপতিবাবু টাইপ-করা কাগজপত্তরের দিকে নজর দিতে লাগলেন। দেখলুম এখনও সই-টই হয়নি। তার মানে এখনই ওঁকে কাগজপত্তর সই করানোর জন্যে ছুটতে হবে।

গণপতিবাবু বললেন, "বোসো,—ব্যস্ত হবার কিছু নেই! সই এখানেই হবে—কারুর কাছে ছুটতে হবে না। আমার মালিকরা অতি চালাক লোক

—এই সব সামান্য লাখখানেক টাকার প্রপার্টির জন্যে নিজেদের হাত গন্ধ করেন না। আমাকে 'পাওয়ার' দেওয়া আছে—রণক্ষেত্রে কি আর মালিকের পারমিশনের জন্যে চেয়ে থাকলে যুদ্ধ জয় হয়?"

শরীরের এই ক্লান্ত অবস্থাতেও গণপতিবাবু আমার নতুন চাকরির সমস্ত খবরাখবর শুনলেন। "আমার কথা কাউকে বলোনি তো? ওই বরদাপ্রসন্ন হালদার যেন কোনো রকমেই জানতে না পারে যে তোমার সঙ্গে আমার জানা-শোনা আছে।"

আমি গণপতিবাবুকে আশ্বাস দিলাম, "সায়েব বাড়ির ট্রেনিং—পেটের মধ্যে কথা ঢুকলে কিছুতেই তা লিক হবে না!"

গণপতিবাবুর মন্তব্যঃ "কিন্তু অনেকে ভুলে যায় ঢেকুর বলে একটা জিনিস আছে—নিজের অজান্তেই গুপ্ত কথা বেরিয়ে আসে। এই যে ইনজাংশনের কথা, অন্য পার্টির এটর্নি আপিসের টাইপিস্ট গতকাল চা খেতে-খেতে আমাদের বিনয়বাবুকে বলেছেন। টাইপিস্ট বেচারা জানে না, বিনয়বাবুর আপিসেই গণপতি সামন্ত রেগুলার বসে থাকেন।"

আমি আবার ধন্যবাদ জানালাম গণপতিবাবুকে। অনিশ্চিত এই সংসারে তাঁর মতো অভিজ্ঞ মানুষের উপদেশ আমার কাছে মহামূল্য মণির মতো।

গণপতি বললেন, "তোমাদের এই বরদাপ্রসন্নর পরিচয় পেয়েছো?"

আমার ধারণা ছিল পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু গণপতিবাবু আমাকে অবাক করে দিলেন। বললেন, "বেচারার জন্যে দুঃখ হয়। ভগবানের ইচ্ছে থাকলে ভদ্রলোক আজ বিষয়-সম্পত্তির আয় থেকেই ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে খেতে পারতেন। কিন্তু সবই কপাল।"

বরদাপ্রসন্ন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ছে। গণপতিবাবু বললেন, "ও-বাড়ির যিনি প্রথম মালিক সেই ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের ম্যানেজার করুণাপ্রসন্ন হালদার, তাঁরই দত্তকপুত্র এই বরদাপ্রসন্ন। করুণাপ্রসন্ন মশায় ওই বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর গিন্নীর খুব প্রাণে দুঃখ, ছেলেপুলে হয় না। করুণাবাবুও ভাবলেন, হয়তো বাড়ির দোষ তাঁর ওপর বর্তেছে, সংসারে ছেলেপুলে আসবে না। তখন ঝটপট ওই বরদাকে জোগাড় করলেন তিনি—পুজোরী বাউনের ছেলে। জাঁকজমক করে দত্তক নিলেন। বরদারও মাথাটা একটু ঘুরে গেলো। হাজার হোক নতুন বাপের অনেক টাকা, অনেক সম্পত্তি। মার্টিন সায়েবের কাছে কাজ করে কালীঘাটে নেই-নেই করেও করুণাপ্রসন্ন বেশ বিষয় সম্পত্তি কিনেছেন। কিন্তু কপাল বরদাপ্রসন্নের..."

"কেন বরদাপ্রসন্নর কী হলো?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"দত্তক পুত্রের যা ওয়ার্স্ট হতে পারে তাই হলো।"

"আমি দত্তকপুত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। শুধু গল্পে পড়েছি, এরা হয় ভীষণ সৎচরিত্র না-হয় ভীষণ উচ্ছৃংখল। অন্তত জমিদার ও রাজাদের কাহিনী পড়লে এইরকম ধারণা হয়।"

গণপতি জানালেন, "সে সব তো পরের কথা। তার আগেই পালে বাঘ পড়লো। শেষ বয়সে, এতো কাণ্ডকারখানা করে দত্তক নেবার পরে, করুণা-প্রসন্ন হালদারের একটি ছেলে হলো। ভদ্রলোকের পক্ষে সে এক উভয়সংকট। উনি চেয়েছিলেন, দত্তক এবং ঔরসজাত সন্তান দু'জনকেই সমানভাবে মানুষ করতে। কিন্তু গিন্নী পেটের সন্তান পেয়ে, মন্তর-পড়া সন্তানকে

আগের মতো ভালবাসতে পারলেন না। আর এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে বরদাপ্রসন্নর মাথাতেও যে কী সব ভাবনা ঢুকলো—ক্রমশ কেমন হয়ে গেলেন। না-হলো পড়াশোনা, না-রইলো বিষয় সম্পত্তিতে মন।"

বরদাপ্রসন্ন আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেছেন, মার্টিন সায়েবের বাঙালী ম্যানেজার করুণাপ্রসন্নর অনেক কাহিনী শুনিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে করুণাপ্রসন্নর সম্পর্কটা কী তা আমাকে একবারও বলেননি। আমি তো ভেবে নিয়েছিলাম, উনিই করুণাপ্রসন্নর বংশধর। হয়তো কোনো এক সময়ে বয়ে-টয়ে গিয়েছিলেন। বাবার সব কিছু খুইয়ে এখন থ্যাকারে ম্যানসনের সরকারগিরি করে জীবনের শেষ কটা দিন কোনোক্রমে অতিবাহিত করছেন।

গণপতি বললেন, "শুনেছি, করুণাপ্রসন্নর ইচ্ছে ছিল দত্তক ছেলে এবং নিজের ছেলে দু' জনকে সমানভাবে সমস্ত টাকা কড়ি ভাগ করে দেন। কিন্তু বউ-এর কিছুতেই মত হলো না। নিজের ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে তিনি থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে কালীঘাটের বাড়িতে উঠে গেলেন। থ্যাকারে ম্যানসনের বিনাভাড়ার ফ্ল্যাটখানা শেষ পর্যন্ত করুণাপ্রসন্ন মন্তর-পড়া ছেলেকেই দিয়ে গেলেন। তিনি মারা যাবার পরে বরদাপ্রসন্নকে ওঁর নতুন মা সম্পত্তির কিছুই দিলেন না।"

গণপতি হেসে বললেন, "এই জন্যেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যং। কপালে যদি ঘি না-থাকে রাজার দত্তকপুত্র হয়েও ভাগ্য পাল্টাবে না। ভাগ্য পাল্টাবার জন্যে বরদাপ্রসন্নর অরিজিন্যাল বাবা পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছেলের গোত্রনাশ করলেন, তাকে পরের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু অঙ্ক গুবলেট করার জন্যে বিয়ের দু'যুগ পরে বাঁজা গাছে ফুল ধরলো।" দুঃখ করলেন গণপতিবাবু।

আমি ততক্ষণ অন্য কথা ভাবছি। বরদাপ্রসন্ন হালদারের সঙ্গে গণপতি সামন্তর একটুও পরিচয় নেই। যতদূর জানি দু' জনের কখনও দেখাও হয়নি। তবু গণপতিবাবু এতো খবরাখবর কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?

গণপতিবাবু তখনকার মতো প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। বুঝলাম, নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণ আছে, যার জন্যে গণপতিবাবু থ্যাকারে ম্যানসন সম্পর্কে এতো খবরাখবর জোগাড় করে রেখেছেন।

আমার কিছু বলবার নেই, নতুন এই কর্মজীবনে সম্পূর্ণ নির্ভর করবার মতো মানুষ একটিই আছেন, তাঁর নাম গণপতি সামন্ত। তিনি থ্যাকারে ম্যানসন সম্বন্ধে যত জানবেন, আমার ততই উপকার হবে। সত্যি কথা বলতে কি প্রথম কয়েক দিনের কাজে এখনও তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারিনি। দৈনন্দিন জীবন কাটছে, কিন্তু কর্মজীবন এখনও ঠিক দানা বাঁধছে না—কোথায় যেন ধারাবাহিকতার অভাব হচ্ছে। এখনও যেন থ্যাকারে ম্যানসনে আমার উপক্রমণিকা পর্ব চলছে, ঐ আশ্চর্য বাড়িটার ততোধিক আশ্চর্য পরিবেশের কোনো রহস্যই এখনও পর্যন্ত আমার কাছে ধরা দিচ্ছে না।

আইনপাড়ায় আমার আকস্মিক আগমনের কারণ এবার গণপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন। গোলাপ বক্সীর নাম শুনে বললেন, "রীতিমত পাকা উকিল, ওঁর মক্কেলের তো উদ্বেগের কোনো কারণ থাকতে পারে না।"

কিন্তু আমার যে চিন্তা আছে তা গণপতিবাবু বুঝতে পারছেন। চায়ের কাপ নিঃশেষ করে গণপতিবাবু বললেন, "যত বড় উকিল দেবে তত

বেশী তদবিরের প্রয়োজন। বড় বড় উকিলের মাথায় ডজন ডজন কেসের চিন্তা. একটু আলগা দিয়েছো তো তোমার কেসের কথা ভুলে বসে থাকবেন।”

কথাটা যে মিথ্যা নয় তা আইনপাড়ায় আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও জানি। গণপতি বললেন, “কাউনসেল কানু চাকলাদারের বাবু তো এই সুযোগে বড়লোক হয়ে গেলো! তহুরি ছাড়াও হাতে দুখানা দশ টাকার নোট গুঁজে না-দিলে কেস উঠবার সময় সায়েবকে ডেকে আনবে না। তুমি যখন কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজের গভভো যন্তণ্নায় ছটফট করছো. তখন শুনবে কানু চাকলাদার অন্য কোনো জজের কোর্টে অন্য কারুর মামলা করছে। ওখান থেকে টেনে-হেঁচড়ে তাঁকে বের করে আনা এবং তোমার মামলার পয়েণ্টগুলো তাঁকে যথাসময়ে মনে করিয়ে দেওয়া সোজা কম্ম নয়।”

“অথচ কিছু বলবার উপায় নেই,” দুঃখ করলেন গণপতিবাবু। “তোমার ব্রীফ ফেরত দেওয়ার জন্যে কানু চাকলাদার উঁচিয়ে আছেন—ব্রীফ ফেরত দেওয়াটাই যেন ওঁর ব্যবসা. তোমার মনে হবে।”

আমি আইনপাড়া ছাড়বার পরে তাহলে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে সময় কানু চাকলাদার অত ব্যস্ত আইনজ্ঞ হননি—ওঁর বাবুও সায়েবকে খুঁজে দেবার জন্যে সার্চিং ফি চার্জ করতেন না।

গণপতিবাবু বললেন. “আমি অনেককে বলি. কিন্তু ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বড় ডাক্তার. বড় উকিল—এসব শুনতে খুব ভাল. কিন্তু সময়কালে এঁদের স্টেজে হাজির করানোর জন্যে গুরুনাম জপতে হয়।”

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা শুনলেন গণপতিবাবু। বললেন. “মামলা রুজু করবার পর কোনোরকম তদবির হয়নি মনে হচ্ছে।”

“বরদাবাবু দুঃখ করছিলেন. আইন-পাড়ায় আঠারো মাসে বছর।”

এক গাল হাসলেন গণপতি। “তোমার বলা উচিত ছিল, এখানে নানা মাসের বছর আছে। আঠারো মাস কেন ? চব্বিশ মাস. ছত্রিশ মাস. একশকুড়ি মাসে বছরও পাবে—তবে পার্টি অনুযায়ী! যত লুজ তদবির তত লম্বা সময়ে বছর।”

“এবার তদবিরের অভাব হবে না। উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা আমি রেকর্ড সময়ে ফয়সালা করতে চাই।”

আমার উৎসাহ দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন গণপতি সামন্ত। বললেন, “এই তো চাই। হাতে-হাতে কাজ না-পেলে মালিকও বুঝবেন কী করে ম্যানেজার রাখার লাভ কত ?”

আমি বললাম, “গোলাপ বক্সী উকিলকে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি যে কোথায় গিয়েছেন তা তাঁর মুহুরিও জানে না।”

একগাল হেসে গণপতি ঘোষণা করলেন. “তাঁকে পাবে কী করে ? গোলাপ বক্সী তো সকাল থেকে আমার কেসে জড়িয়ে রয়েছেন। এখনই আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।”

আর সময় নষ্ট না করে গোলাপ সান্নিধ্যে হাজির হলাম। গণপতির উপস্থিতিতে আইন সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনার পরে যথাসময়ে আমি আবার থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে এলাম।

বরদাপ্রসন্ন আমার হাত থেকে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ফাইলখানা নিয়ে

আলমারিতে তুলে রাখতে-রাখতে বললেন, "এ কি অনাসৃষ্টি! মনের দুঃখে বনে যাবি যা, কিন্তু বাড়িওলার ফ্ল্যাটে চাবি মেরে যাওয়া কেন?"

"এ-চাবি খোলবার সহজ পথ কী?"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আগেকার দিন কাল থাকলে কোর্টঘর করার দরকারই হতো না। দারোয়ানকে বললে সে চাবি ভেঙে ঘরের দখল পাইয়ে দিতো। ভাড়াও দেবো না, চোখও রাঙাবো এসব সে যুগে অচল ছিল।"

ভাড়া সংক্রান্ত জটিল আইন কানুনগুলো ইংরেজ আমলেই যে চালু হয়েছে এ-কথা বরদাপ্রসন্নকে মনে করিয়ে দেবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু ওঁর সঙ্গে অযথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

বরদাপ্রসন্ন বললেন. "উকিলের কথা মতোই আমাদের কাজ হয়েছে। বাকি ভাড়ার আদায় এবং সেই সঙ্গে উচ্ছেদের জন্যে মামলা চলছে। অন্য পার্টি যদি ফাইট না করে তবে একতরফা হিয়ারিং হবে। কোর্টের ডিক্রি পেলেই দখল নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গণপতিবাবু এবং আমি একমত যে এই পথে অনেক সময় লাগবে। এর থেকে অনেক সহজেই কার্যোদ্ধার হতো যদি ম্যাজিসট্রেটের শরণাপন্ন হয়ে একটা আর্জি পেশ করা যেতো। 'ধর্মাবতার. আমাদের উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে শ্রীআর্থার জন ফিলিপ অকস্মাৎ উধাও হয়েছেন। বাড়িতে তালা ঝুলছে. কোনো খবরাখবর নেই এবং দীর্ঘদিন ফ্ল্যাট বন্ধ থাকায় বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ বিপন্ন হচ্ছে। এর ফলে বাড়ির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে এবং অন্যান্য বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।'

বিস্মিত বরদাপ্রসন্ন বললেন. "আপনার মাথায় পাকা ওকালতি বুদ্ধি। ঠিক যেন নবেলের চ্যাপটার মনে হচ্ছে! ভাড়াটে বিদেয় করে আমরা ফ্ল্যাট ফেরত চাই। অথচ আপনার পিটিশন পড়ে মনে হবে. ফিলিপ সায়েব এবং থ্যাকারে ম্যানসনের অন্য ভাড়াটেদের দুঃখের কথা ভেবে-ভেবে রাত্রে আমাদের ঘুম হচ্ছ না!"

"সিভিল কোর্টের হাঙ্গামা অনেক। বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত কোর্টে কোনো কিছুই সহজে নড়তে চায় না—বছরের পর বছর দেখতে-দেখতে কেটে যায়।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "এসব খবর তো আমার তেমন জানা ছিল না। এখন থেকে শিক্ষা হলো।"

গণপতিবাবুর কথাগুলো এবার নিজের মতো করে শুনিয়ে দিলাম বরদাপ্রসন্নকে। "দেওয়ানি কোর্ট এবং ফৌজদারি কোর্টের মধ্যে চয়েস থাকলে যতদূর সম্ভব ফৌজদারি কোর্টেই কাজ সারবেন। তাতে সময় এবং খরচ দুই কম লাগবে।"

বরদাপ্রসন্নকে আরও বললাম, "ঘাঘী লোকরা বলেন, ক্রিমিন্যাল কোর্টে যদি যেতেই হয় তবে চেষ্টা করবে আসামী হয়ে যেতে।"

"অ্যাঁ! সে কি মশাই. আপনি কি বললেন?"

"অর্থাৎ আদালতের বাইরে যা-কিছু দখল-পত্তর করে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন—অন্য পক্ষ আপনাকে কোর্টে টানুক। ইংরেজের আইনে জামাই এবং আসামীর সমান খাতির। আইনের চোখে. অভিযুক্ত আসামী নিরপরাধ. তার পান থেকে চুন খসানো কিছুতেই চলবে না। শাস্তি না-হওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত আব্দার রাখতে হবে।"

"তার মানে, আপনি বলছেন, কোর্ট-কাছারিতে না গিয়ে প্রথমেই তালা ভেঙে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটে ঢুকে-পড়া উচিত ছিল। তারপর মামলা-মকদ্দমা যা-কিছু ফিলিপ সায়েব ফিরে এসে করতেন।"

বরদাপ্রসন্নকে এবার আইনপাড়ার একটা মহা মূল্যবান প্রবচন শুনিয়ে দিলাম ঃ 'পজেসন ইজ নাইন-টেনথ অফ ল।' সম্পত্তি যার দখলে চোদ্দ আনা আইনও তার পক্ষে! সুতরাং কোর্ট ঘরে যাবার আগে যেন-তেন প্রকারেণ দখলটি নিয়ে নাও।

আইনের ব্যাপারে বরদাপ্রসন্ন নিরাসক্ত। এ-সবের মধ্যে তিনি বেশী ঢুকতেও চান না। তিনি সোজা বলে দিলেন, "তা হলে কী করতে চান বলুন? ম্যাজিসট্রেটের অর্ডার করিয়ে, পুলিশ এনে দরজা ভাঙাবেন?"

সেইটাই সহজ পথ ছিল, কিন্তু বাকি ভাড়া এবং উচ্ছেদের দেওয়ানি মামলাটাই গোলমাল বাধাচ্ছে। ওই মামলার খবর পেলে ম্যাজিসট্রেট কি দরজা ভাঙার হুকুম দেবেন?

তবু সহজ পথটাই একবার ঘুরে আসতে চাই। ম্যাজিসট্রেটের দ্বারস্থ হওয়ার অনেক সুবিধে। ঝটপট অর্ডার বের করে পুলিশের সঙ্গে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটে হাজির হও এবং তালা ভাঙো। ভিতরে যেসব জিনিসপত্তর আছে তার তালিকা বানাবার জন্যেও পুলিশের উপস্থিতি প্রয়োজন।

লিস্টি বানিয়ে বেওয়ারিশ মালপত্তর পুলিশই সরকারী তোষাখানায় পাঠিয়ে দেবে—যদি কোনোদিন মালিকের আবির্ভাব ঘটে তাহলে সোজা তাঁকে গভরমেনটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

আমার প্রস্তাবেই বরদাপ্রসন্ন রাজী হলেন।

ম্যাজিসট্রেটের আপিসে স্টাম্প মারা হলফনামায় সই করবার জন্য বরদাপ্রসন্ন যখন কলম বের করেছেন তখন বললুম, "সই করার আগে একবার ভাল করে পড়ে নিন। না-পড়ে কখনও সই লাগানো উচিত নয়।"

আমার কথায় কান দিলেন না বরদাপ্রসন্ন। "সারাটা জন্ম না-বুঝে, না-পড়ে, উকিল মোক্তার পেশকারের কথামতো দস্তখত বসিয়ে এলাম, এখন আপনি কেন উলটো সুর গাইছেন?"

"পড়ুন, পড়ুন। ম্যাজিসট্রেট যদি কাঠগড়ায় ডাকেন এবং প্রশ্ন করেন তখন উত্তর দিতে হবে তো।"

জেরার সম্ভাবনায় একটু অস্বস্তি বোধ করলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "তাহলে আমাকে জড়ালেন কেন মশাই? আপনি নিজেই তো সই করলে পারতেন।"

সই করতে আমার মোটেই আপত্তি ছিল না। ইচ্ছে করে এই বৃদ্ধলোককে আমি আদালতে টেনে আনিনি। কিন্তু আমি নতুন লোক, ফিলিপ সায়েবকে রক্তমাংসে কখনও দেখিনি, তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধানের পরবর্তী ঘটনাও আমার নিজের চোখে দেখা নয়।

সইপত্তর সেরে বরদাপ্রসন্ন বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। থ্যাকারে ম্যানসনে ফেরবার পথে নিজের মনেই বললেন, "অমন হাসি-খুশী প্রাণখোলা লোকটা ছিল। কোত্থেকে যে কি হয়ে গেলো।"

বরদাপ্রসন্ন হঠাৎ বললেন, "মেয়েছেলের মুখের হাসি আর চোখের নাচ দেখে কখনও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন না। মেয়েমানুষ মনে ধরলেই যে

তাকে বিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।”

হঠাৎ এইসব জ্ঞানগর্ভ বাণী কেন? আপাতত আমার জীবনে তো কোনো সুহাসিনী সুন্দরীর আবির্ভাব হয়নি।

বরদাপ্রসন্ন আসলে ফিলিপের কথা ভাবছেন। এই মানুষটি সম্বন্ধে এ-বাড়ির কর্মচারীদের বেশ দুর্বলতা রয়েছে। ভদ্রলোকের দাম্পত্য জীবনের পুরো ইতিহাস এই মুহূর্তে বরদাপ্রসন্নর চোখের সামনে ভাসছে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, “আমি নিজে কিছু দেখেছি। বাকিটা তেলকালির কাছে শুনেছি। সায়েবের অনেক খবরাখবর ও রাখতো।”

বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা যে-কাহিনী বরদাপ্রসন্ন বর্ণনা করলেন তা অনেকটা এইরকম:

তরুণ ইনজিনিয়ার আর্থার জন ফিলিপ কর্মসূত্রে কলকাতায় এসেছিলেন। কেরালার খৃষ্টান না অ্যাংলো ইনডিয়ান এ-বিষয়ে থ্যাকারে ম্যানসনের কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ ছিল। খুব সম্ভবত সামান্য বিদেশী রক্ত ফিলিপের মধ্যে প্রবাহিত ছিল।

মায়ের সঙ্গে এখানে বসবাস করে তিনি সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। এমন দিলদরিয়া অথচ নির্বিরোধী ভালমানুষ এ-বাড়ির লোকেরা বেশী দেখেনি।

হঠাৎ কী যে হলো, বাঙালী মেয়েরা সায়েবের মনে গভীর দাগ কাটলো। বাঙালী বিয়ে করবার জন্যে সায়েব অস্থির হয়ে উঠলেন।

পাত্রীসন্ধানে সায়েব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন, এখবর তেলকালিবাবু নিজে তাঁর মায়ের মুখে শুনেছেন। মায়ের এসব ব্যাপারে আপত্তি ছিল, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আজকাল কোন ছেলে মা-বাপের কথা শোনে?

এই বাঙালী বিয়ের ব্যাপারে তেলকালিবাবুও খুব উৎসাহিত বোধ করেননি। ফিলিপের মাকে বলেছিলেন, “তেলে-জলে কখনও মিশ খায় না।”

সায়েবের কপালে শেষ পর্যন্ত বাঙালী জুটলো না। সম্বন্ধ করে কোন বাঙালী মেয়ের গার্জেন এমন পাত্রকে কন্যাদান করবেন?

কিন্তু তার বদলে ফিলিপ সায়েবের কপালে জুটলো এক হাফ বাঙালী মেয়ে, মিস এডিথ সিং।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, “আমি পুরো ব্যাপারটা মনে রাখতে পারি না। তবে তেলকালির মুখে বিস্তারিত বিবরণ শুনেছিলাম। জগাখিচুড়ি ব্যাপার। এডিথ সিং-এর বাবা পাঞ্জাবী—কিন্তু তার মা নাকি বাঙালী। হতেও পারে, কারণ বিয়ের পরে দু একদিন বাঙালী কায়দায় শাড়ি-টাড়ি পরে এডিথ যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন তখন ঠিক মনে হতো আমাদের ঘরের বাঙালী বউ। কিন্তু আসলে জগাখিচুড়ি—পাঞ্জাবি খৃষ্টান এবং বাঙালী বাউনটাউনের মধ্যে বে-থা হয়ে সে-এক গোলমেলে ব্যাপার।”

বরদাপ্রসন্নকে আমি মনে করিয়ে দিলাম, “বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে প্রত্যেক বাঙালীই জগাখিচুড়ি। বহু-জাতের রক্ত মিশ্রিত রয়েছে আমাদের ধমনীতে।”

কিন্তু বরদাপ্রসন্ন মুখ বেঁকিয়ে বললেন, “রাখুন মশাই। বিচক্ষণ লোকরা নিজের জাতের বাইরে বিয়ে করে না, একথা ফিলিপ সায়েবের মা নিজে আমাকে বলেছেন।”

এডিথ সিং-এর সঙ্গে ফিলিপের প্রথম পরিচয়ের ব্যাপারটাও বরদাপ্রসন্নর

অপছন্দ। তখন থ্যাকারে ম্যানসানের বিরাট চত্বরের মধ্যে অনেক গাড়ি থামতো। একখানা পিক-আপ ভ্যান আসতো কোনো আপিসের মেয়ে-টাইপিস্টদের তুলতে। আমাদেরই এক ফ্ল্যাটে তখন থাকতো মিস ভাবনানি। সে উঠতো এই গাড়িতে, মিনি-ভ্যানের মধ্যে তখন বসে থাকতেন মিস এডিথ সিং।

ফিলিপ সায়েব নিজে এই সময় মর্নিংওয়াক থেকে ফিরতেন। গাড়ির মধ্যে অপেক্ষারত অফিস-ললনার সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেলো।

এডিথ সিং দেখতে রাঙা টুকটুকে। রীতিমত লম্বা। মাথায় একরাশ কালো চুল। চোখগুলো একেবারে বাঙালীদেরই মতো। ফিলিপ একটু কালো হলেও সুপাত্র। কল-কব্জার ইনজিনীয়ার, অনেক টাকা মাইনে পান, নিজের তখন ছোট্ট একটা হেরাল্ড গাড়িও ছিল।

এডিথের রূপটাই আছে। কিন্তু আর সবই অন্ধকার। বাপ-মা কোথায় কে জানে। তিনি থাকেন এক লেডিজ হোস্টেলে।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "শুভকাজে এত তড়ি-ঘড়ি ভাল নয়। কথায় বলে, লক্ষ কথা না-হলে বিয়ে হয় না। কিন্তু, আলাপ হবার দিন-দশেকের মধ্যে ওদের বিয়ে হয়ে গেলো।"

"সুন্দরী বউ পেয়ে সায়েব নিজের মাকে পর্যন্ত ভুলে গেলেন। বুড়ীর অনেক অভিজ্ঞতা, নিশ্চয় সবই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কীসের ছুতো তুলে নতুন মেমসায়েব শাশুড়ীকে বিদেয় করলেন। কর্তা তখন বউয়ের কথায় উঠছেন আর বসছেন—সুতরাং মাকে কেরালায় পাঠিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করলেন না।"

"তারপর ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঠোঁট উলটে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। মাকে যদি সংসারে রাখতেন তা হলে নিজের যে সর্বনাশ হতো না তা ফিলিপ সায়েবের মাথায় ঢুকলো না!"

বরদাপ্রসন্ন নিচু গলায় বললেন, "বাড়িতে একটা পাকা মাথা থাকার অনেক সুবিধে। বউয়ের মোহে পড়ে আজকালকার ছোকরারা তা বুঝতে চায় না। বিশেষ করে কর্তার যখন ঘুরে বেড়াবার চাকরি। দু চারদিন ঘরকন্না করে তুমি তো কয়েক মাসের জন্যে জাহাজে চলে গেলে। তখন বউয়ের কাছে মাতৃস্থানীয়া কেউ থাকলে অনেক সুবিধে।"

কিন্তু ফিলিপ সায়েবের মাথায় তখন দুষ্টগ্রহ ভর করেছে। কলকাতায় বউয়ের কাছাকাছি থাকবার জন্যে সায়েব জাহাজী চাকরি ছাড়লেন। মাইনে অনেক কমে গেলো। নতুন যে-চাকরি তাতে মাঝ-দরিয়ায় ভাসতে না-হলেও মাঝে মাঝে অন্য জায়গায় ট্যুরে যেতে হয়।

পৃথিবীতে কত লোকই তো এইভাবে ঘোরাঘুরির চাকরি করছে, আমি বরদাপ্রসন্নকে মনে করিয়ে দিলাম। তার জন্য তো তাদের দাম্পত্যজীবনে কোনো গোলমাল হচ্ছে না।

বরদাপ্রসন্ন ঘাড় নাড়লেন। বললেন, "কিন্তু যারা গোলমালে পড়ছে, তারা একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে। আমাদের এডিথ মেমসায়েব নিজের কর্ম-স্থলেই শেষে তরী ডোবালেন। এই জন্যেই বলে আগুন আর ঘি কখনও কাছাকাছি রাখতে নেই। কো-এডুকেশন, কো-ওয়ার্ক এসব মোটেই ভাল জিনিস নয়। এই জন্যে তো এ-বাড়িতে মেয়েছেলে জমাদারনী পর্যন্ত রাখতে

রাজী হইনি আমি।”

“জমাদারনী রাখার সঙ্গে ফিলিপ সায়েবের বউয়ের কাহিনীর কী সম্পর্ক?” মুখ ফসকে এই কথা বলতেই বেশ বিরক্ত হলেন বরদাপ্রসন্ন।

“আছে স্যার, সম্পর্ক না-থাকলে এডিথ মেমসায়েবের লাইফে নতুন সমস্যা দেখা দেবে কেন? বলছি সে-কথা, শুনুন মন দিয়ে।”

“বড্ড ছটফটে এবং বোকা টাইপের মেয়ে এই এডিথ মেমসায়েব। দুঃখের কথা কী বলবো! রকমসকম দেখে মেয়ে জাতটার ওপর ভরসা নষ্ট হয়ে যায়।”

বরদাপ্রসন্নর মুখে এই ধরনের মন্তব্য যে আমি প্রত্যাশা করিনি ভদ্রলোক বোধহয় তা বুঝতে পারলেন। “মায়ের জাতই যে মায়াবিনীর জাত তা ভাবতে কষ্ট হয় বুঝি! কিন্তু কথাটা যে মোটেই মিথ্যে নয় তা এই থ্যাকারে ম্যানসনে জীবন কাটিয়ে বুঝে গিয়েছি।”

এডিথ মেমসায়েবের সঙ্গে প্রথম বিস্তারিত কথাবার্তার সব কথা বরদাপ্রসন্নর মনে আছে। “প্রথম বারে আমি তো মেমসায়েবের সঙ্গে পুরো ইংরেজীতে কথা চালিয়ে যাচ্ছি। খুব ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। জল চুঁইয়ে এবং নোনা ধরে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটে দেওয়ালের চাবড়া খসে পড়ছে—এর ইংরিজী করতে বহু ইন্ডিয়ানের গা দিয়ে ঘাম ঝরবে! আমি তো জয় মা কালী বলে কোনো রকমে খাদি ইংলিশে ফিলিপ সায়েবের বউকে বুঝিয়ে যাচ্ছি কেন এইভাবে দেওয়াল থেকে বালির চাঙড় খসে পড়ে। কেন এ ব্যাপারে বাড়িওয়ালার তেমন কিছু করবার নেই। বদ্যির অসাধ্য এই বার্ধক্য রোগ। বাড়ি পুরনো হলে হাড়-মড়মড়ানি রোগ ধরবেই।

“কিন্তু মেমসায়েব আমাকে অবাক করে দিলেন—মুচকি হেসে বাংলায় কথা বলতে লাগলেন। আর সে কী বাংলা—কাশ্মিরী আঙুরের মতো মিষ্টি!”

মাতৃভাষা সম্বন্ধে নানা প্রশস্তি এর আগে শুনেছি. কিন্তু কাশ্মিরী আঙুরের সঙ্গে তুলনা এই প্রথম।

মেমসায়েব প্রসঙ্গে বরদাপ্রসন্ন বলে চললেন. “ওঁর মা বাঙালী ছিলেন। লাহোরে কোথায় যেন ওঁদের বাড়ি ছিল—আর মায়ের আদি বাড়ি যশোর। বুঝুন মশাই! যশোরের মেয়ে কোত্থেকে লাহোরে চলে গেলো এবং সেখানে বে করে বসলো পাঞ্জাবী খেস্টানকে। কার বিয়ের ফুল কোথায় ফুটবে তা কেউ বলতে পারে না।”

“মেমসায়েব সেদিন যা ব্যবহার করলেন আপনাকে কী বলবো। দেওয়ালের চুন বালি খসে পড়ছে. সুতরাং বকুনি খাবার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়েই গিয়েছিলাম। এসব ক্ষেত্রে কর্তাদের সঙ্গে দেখা হওয়া অনেক ভাল—মেমসায়েবদের খপ্পরে পড়লে ডবল কথা শুনতে হয়। কমপ্লেনের ব্যাপারে মেয়েরা সব সময় সংহার মূর্তি ধারণ করে—ওঁদের শরীরে তখন কোনো মায়াদয়া থাকে না। কিন্তু অবাক কাণ্ড! বকুনির বদলে এডিথ মেমসায়েব আমার জন্যে ভিতর থেকে রসগোল্লা নিয়ে এলেন।”

সায়েবের বাড়িতে বসে রসগোল্লা খাচ্ছি—বুঝুন ব্যাপারটা। আমার হোল ওয়ার্কিং লাইফে এই থ্যাকারে ম্যানসনে টেনান্টরা অনেক জিনিস খাইয়েছে, কিন্তু রসগোল্লা সেই প্রথম। আমি তাজ্জব। মনটা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেলো। মহিলার ওপর যত রাগ ছিল তা মন থেকে ধুয়ে মুছে গেলো। আমি ভাবলাম. ফিলিপ সায়েব কাকে বিয়ে করবেন, ফ্ল্যাটে মাকে রাখবেন

কিনা এসব তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। আমি সামান্য বিলডিং সরকার, এসব ব্যাপারে আমার কোনো মতামত থাকা উচিত নয়!"

একটু থেমে বরদাপ্রসন্ন শুরু করলেন: "মায়াবিনীর মায়া বলতে পারেন! আমি তো পুরো ফিলিপ মেমসায়েবের বশ হয়ে গেলাম। সময় পেলেই ওঁর কাছে গিয়ে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বলি। খবর নিই কোনো রিপেয়ারের দরকার আছে কি না। বলতুম, আমি তোমার মায়ের দেশের লোক। আমাদেরও আদি বাড়ি যশোর জেলায়!"

"ফিলিপ সায়েবের কী অবস্থা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "তিনি তো ক'মাসের মধ্যে মেমসায়েবের বুড়ো আঙুলের তলায় চলে গিয়েছেন। বউ অন্ত প্রাণ। জাহাজে কাজকর্ম করলে একটু-আধটু পদস্খলনের ভয় থাকে শোনা যায়। কিন্তু আমাদের এই সায়েব অতি ধর্মভীরু সাত্ত্বিক লোক। ওঁর চরিত্র সম্বন্ধে এ-বাড়ির কোনো ব্যাটা কোনোদিন একটি কথা বলতে সাহস করেনি। রামসিংহাসন পর্যন্ত স্বীকার করেছে, সায়েব যখন ব্যাচেলর ছিলেন, তখনও কোনোদিন নিজের ফ্ল্যাটে মেয়েমানুষ ঢোকাননি। রামসিংহাসনটা মহা শয়তান তো, কে কি করছে সব নজরে রাখে!"

বরদাপ্রসন্ন দুঃখ করলেন, "অত ভাল লোক ফিলিপ সায়েব, বউকে এতো ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন, কিন্তু বিশ্বাসের মর্যাদা রইলো না।"

ফিস ফিস করে বরদাপ্রসন্ন শুনিয়ে দিলেন, "হঠাৎ একদিন দেখলুম, এডিথ মেমসায়েব শাড়ি পরা ধরেছেন। শাড়ি পরে মেমসায়েবকে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দেখাচ্ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে আমি তেমন মাথা ঘামাইনি—আজকালকার মেয়েমানুষ, তাদের যে কখন কী ধরনের সাজ করতে ইচ্ছে হবে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু শ্রীমান তেলকালির নজর কড়া। সে হঠাৎ বলে বসলো, ব্যাপারটা সুবিধে মনে হচ্ছে না!"

বরদাপ্রসন্ন বকুনি লাগিয়েছিলেন তেলকালিকে। "সব ব্যাপারের মানে খুঁজে বের করবার চেষ্টা কোরো না, তেলকালি। মেমসায়েবদের শখ হতে পারে শাড়ি পরবার, তাতে তোমার কী?"

তেলকালি জিভ কেটে বলেছিলো, "দাদা, নারী জাতের কথাই আলাদা। ওঁরা শুধু শুধু কিছু করেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। ওঁদের সব কাজের পিছনে একটা মানে থাকতে বাধ্য।"

"কালি, নিজের কাজকর্ম ছেড়ে তুমি এক-একটা মেয়েমানুষ দেখ এবং এক-একখানা মানে-বই লেখবার চেষ্টা করো।" ব্যঙ্গ করেছিলেন বরদাপ্রসন্ন।

কিন্তু ক'দিন পরেই বরদাপ্রসন্নর কাছে তেলকালি রিপোর্ট করলেন! "তখন তো খুব আমার ওপর রাগ করে চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুনিয়ে দিলেন। এবার বুঝুন দাদা। ফিলিপ সায়েবের বউ এখন তো সব সময় বাঙালী স্টাইলে সাজগোজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শান্তিপুরী বাংলা তাঁতের কাপড় পরছেন।"

বরদাপ্রসন্নর মাথায় তখনও সন্দেহবিষ প্রবেশ করেনি। তিনি বলেছেন, "আহা, তেলকালি, কেন মনটাকে আস্তাকুঁড় বানাচ্ছো? বেচারা মেমসায়েবের মা বাঙালী ছিলেন এ-কথা ভুলে যাচ্ছো কেন?"

একগাল হেসে তেলকালি বলেছিল, "ফিলিপ সায়েব যে এখন কলকাতার বাইরে লম্বা ট্যুরে রয়েছেন এ-কথাটা কানে তুলছেন না কেন দাদা?"

তেলকালি এবার মোক্ষম খবরটা বরদাপ্রসন্নকে শুনিয়ে দিয়েছিল। এডিথ মেমসায়েবের সঙ্গে নতুন এক কেষ্টঠাকুরকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। এই ছোকরার বয়স নাকি তেইশ-চব্বিশের বেশী নয়, মেমসায়েবের আপিসেই কাজ করে। বোধ হয় কোনো অফিসার। তেলকালির টীকাঃ "মার্চেণ্ট আপিসের মেয়ে-টাইপিস্টদের নজর অফিসারদের দিকে—তারা অল্পে সন্তুষ্ট হয় না!"

যথাসময়ে তেলকালি আরও খবর এনেছিল। "যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই। ছোকরা ভাল চাকরি করে—চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট না কী। এবং বাঙালী। নাম রমেন সরকার। এতোক্ষণে টু-প্লাস-টু ইজিকল্টু ফোর হলো। বুঝতে পারলাম, কেন বিলিতী ড্রেস ছেড়ে শাড়ি ধরেছেন ফিলিপ সায়েবের গিন্নী।"

বরদাপ্রসন্ন তখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করেননি। দূর থেকে তিনি ছোকরাকে একদিন দেখেছেন—বিকেল বেলায় এডিথ মেমসায়েবের সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নামছে। তেলকালি সামনে দাঁড়িয়েছিল। একগাল হেসে সে কোশ্চেন করলোঃ "ট্যাক্সি কেন বলুন তো?"

বরদাপ্রসন্ন ঝটপট উত্তর দিতে পারছেন না দেখে তেলকালি বললো, "কোম্পানির পিক-আপ ভ্যান যে ফর লেডিজ ওনলি—মেমসায়েবদের বয়-ফ্রেণ্ডদের সেখানে নো-অ্যাডমিশন!"

"আঃ, তেলকালি," আবার প্রতিবাদ করেছিলেন বরদাপ্রসন্ন। তেলকালি কি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না, ছোকরাটির বয়স খুবই কম। মেমসায়েবের থেকে বয়সে ছোট হবারই চান্স বেশী।

কিন্তু এই ছোকরা সহকর্মীকে প্রায়ই থ্যাকারে ম্যানসনে দেখা যেতে লাগলো। ফিলিপ সায়েব আপিসের কাজে কলকাতার বাইরে গেলেই রমেন সরকারের যাতায়াত শুরু হয়। আজকাল আর ট্যাক্সি নয়। নতুন স্কুটারের মালিক হয়েছে রমেন সরকার। আপিসের পরে অনেক সময় সরকারবাহিত হয়েই শ্রীমতী এডিথ সহাস্যবদনে থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে আসেন। সবুজ রংয়ের এই স্কুটার দেখলেই তেলকালি বুঝতে পারে ফিলিপ সায়েব কলকাতার বাইরে রয়েছেন।

ফিলিপ সায়েব কলকাতায় ফিরলেই কিন্তু পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়। তখন এডিথ মেমসায়েব বাঙালী বধূর সাজ বর্জন করে আবার পুরোপুরি মেমসায়েব হয়ে ওঠেন। এবং সেই ড্রেসেই মাথা নিচু করে কোম্পানির পিক-আপ ভ্যান থেকে নেমে পড়ে উচ্ছল কণ্ঠে ভ্যানের অন্য বান্ধবীদের শুভরাত্রি জানিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনের ফয়ারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান।

অতিমাত্রায় কৌতূহলী তেলকালিকে বরদাপ্রসন্ন উপদেশ দিয়েছিলেন. "যেখানে যা হচ্ছে হোক। থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়াটিয়ারা কেউ নাবালক নন।" কিন্তু কথাগুলো তেলকালির মাথায় ঢুকলো না। দূর থেকে পুরো নাটকটার ওপর অতি সাবধানে সে লক্ষ্য রেখে চলেছে। এডিথ মেমসায়েবের ব্যাপারটা তার মাথায় নেশার মতো চেপে বসেছে।

তেলকালি বলে, "মেয়েমানুষের কাণ্ডকারখানা দেখলে মাথা গরম হয়ে যায়, দাদা। কোনটা যে অ্যাকটিং আর কোনটা যে আসল বোঝে কার সাধ্যি! ফিলিপ সায়েবকে সেদিন ট্যুরে বিদায় দেবার আগে মেমসায়েব আমার সামনে যেভাবে চুমু খেলেন, কী বলবো দাদা। সিন আর শেষ হতে চায় না—আমি যে মেশিন সারাবার কাজে এসে বৃন্দাবনলীলায় বেকুব বনে যাচ্ছি

তা ওঁদের খেয়াল নেই! কে বলবে এসব অ্যাকটিং।"

"অ্যাকটিং বলছো কেন?" প্রতিবাদ জানালেন বরদাপ্রসন্ন। "ময়লাটা তোমাদের মনে—আপিসের সহকর্মী একটু দেখা করতে এল, আর তুমি ভদ্দরলোকের বউ সম্বন্ধে আষাঢ়ে গপ্পো ফেঁদে বসলে।"

চটে উঠলেও তেলকালি তখন কোনো উত্তর দেয়নি। কিন্তু দু'দিন পরে বীরদর্পে সে ফিরে এল. এবার হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছে তেলকালি।

প্রমাণ সংগ্রহের লোভেই তেলকালি ছোটখাট একটি ফাঁদ পেতে এসেছিল। সেদিন শুক্রবার। গরমও পড়েছিল প্রচণ্ড। অভিজ্ঞ তেলকালি অন্য এক কাজে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল এবং সেই সুযোগে মেমসায়েবের শোবার ঘরে ইলেকট্রিক পাখার কী একটা গোলমাল করে এসেছিল। এমন গোলমাল যে ওই ফ্যান কিছুক্ষণ চালালেই হঠাৎ খারাপ হয়ে যাবে।

তারপর মন্ত্রের মতো ফল হয়েছিল। চোখ গোল গোল করে তেলকালি বলেছিল, "যা-ভেবেছেলুম ঠিক তাই। রাত ন'টার সময় আমার জরুরি ডাক পড়লো। যা গরম! ওই সময় পাখা না-ঘুরলে কি মেজাজ ঠিক থাকে?"

গলার স্বর নামিয়ে তেলকালি বলেছিল, "কোনো লাজলজ্জা নেই। নিজের চোখে দেখলাম স্লিপিং গাউন পরে মেমসায়েব ওই বাঙালী ছোকরা মিস্টার সরকারের মাথাটি খাচ্ছে। ছোকরা নিজে বুশ শার্ট ও প্যাণ্ট পরে আছে বটে, কিন্তু আমার ডিটেকটিভ চোখে ফাঁকি ধরতে দু' মিনিটও লাগলো না। নিজের চোখে দেখলাম, আর একটা স্লিপিং স্যুট চেয়ারের ওপর বের করা রয়েছে। তাড়াতাড়িতে হয়তো সরাতে ভুলে গিয়েছে, কিংবা সরাবার প্রয়োজন মনে করেনি। সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কে আর মানুষের মধ্যে মনে করে?"

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের গল্প আমাকে শোনাতে-শোনাতে বরদাপ্রসন্ন এবার মূল্যবান মন্তব্য করে বসলেন: "ছুটির দিনের আগের রাত্রিগুলো বড় ডেনজারাস। যাদের কেবল রবিবার ছুটি তাদের শনিবারে এবং যাদের সপ্তাহে দু'দিন ছুটি শুক্রবার রাত্রে তাদের মেজাজে আচমকা আগুন ধরে যায়—আচ্ছা-আচ্ছা লোকের ব্রেক ফেল করে।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "হতভাগা তেলকালিটা আই-বি-তে চাকরি করলে ডবল প্রমোশন পেয়ে যেতো! চুপি-চুপি আমাকে খবর দিয়ে গেলো সে-রাত্রে রমেন সরকারের স্কুটার আমাদের ম্যানসন থেকে ফেরেনি। ভোর চারটের সময় বেড়াতে বেরুবার সময় তেলকালি দেখেছে থ্যাকারে ম্যানসনের কমপাউণ্ডে সবুজ রঙের বাহন মুখ শুকনো করে একলা দাঁড়িয়ে আছে!"

বেচারা ফিলিপ সায়েব দু'দিন পরেই ট্যুর থেকে ফিরলেন। সংগে বউ-এর জন্যে প্যাকেট-প্যাকেট উপহার। বউ-অন্ত প্রাণ ভদ্রলোকের।

এইভাবে লুকোচুরির মধ্যে আসল খেলা ক্রমশ বেশ জমে উঠলো। মেমসায়েব ওই বাঙালী ছোকরার সংগে কী ঠিক করলেন ভগবান জানেন। কিন্তু সত্যিই একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো। রমেন সরকারের প্রেমে ডগমগ এডিথ মেমসায়েব হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হলেন।

দু'রকম গুজব শুনেছেন বরদাপ্রসন্ন। "কেউ কেউ বলে, ফিলিপ সায়েব একদিন ট্যুরে না-গিয়ে ট্রেন ফেল করে আচমকা ফিরে এসেছিলেন এবং নিজের ফ্ল্যাটে ওই ছোকরাকে দেখেছিলেন। ধরা পড়ে গিয়ে মেমসায়েব সোজা স্বামীকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি আর এখানে ঘরকন্না করতে ব্যস্ত

নয়। আবার কেউ-কেউ বলে, মেমসায়েব নিজেই আচমকা একদিন সত্যি কথাটা ফিলিপ সায়েবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ততক্ষণে এ'দের বন্দোবস্ত পাকা। সাময়িক গোলমাল এড়াবার জন্যে রমেন সরকার দুর্গাপুর না কোথায় বদলি হয়ে গিয়েছেন। দু' জনের মধ্যে কী গোপন ব্যবস্থা হয়েছে তা কেউ জানে না।"

"হঠাৎ মেমসায়েব উধাও হয়ে গেলেন। কয়েক দিন আমরা তাঁকে দেখতে পেলাম না। ফিলিপ সায়েবও ফ্ল্যাটের মধ্যে একলা বন্দী হয়ে বসে রইলেন। কী যে হলো, কারও সঙ্গে কথা বলেন না, সুইপারকে পর্যন্ত দরজা খুলে দেন না।"

কেউ বললো সায়েব বোধ হয় পাগল হয়ে যাবেন। মাথা খারাপের লক্ষণ নাকি পুরোপুরি দেখা দিচ্ছে। দামী দামী জিনিসপত্তর সায়েব জলের দামে বেচে দিয়েছেন।

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আমি মশাই, শেষবার যা দেখেছিলাম তা পাগলেরই চেহারা। স্নান হয়নি, লাল চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্য—কুলির মাথায় চাপিয়ে দু' তিন বস্তা চুন কিনে সায়েব বাড়ি ফিরছেন। এ-বাড়ির কোনো ভাড়াটেকে এর আগে কখনও চুন কিনতে দেখিনি।"

সায়েবকে বরদাপ্রসন্ন গুডমর্নিং জানিয়েছিলেন, কিন্তু সায়েব কোনো উত্তর দেননি।

বরদাপ্রসন্ন দুঃখ করলেন, "তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার। কিন্তু মাথায় অত বুদ্ধি খেলেনি। হঠাৎ একদিন শুনলাম ফ্ল্যাটে তালা ঝুলছে। হাজার হোক আমিও তো পুরুষমানুষ—বউ পালিয়ে যাওয়ায় ওঁর মনের অবস্থা কী হয়েছে আন্দাজ করতে পারি। সায়েবের ওপর আমার নিজের কোনো রাগ থাকতো না, যদি ফ্ল্যাটের চাবিটা তিনি আমাকে দিয়ে যেতেন। তা হলে, আমাকে এই অযথা হাঙ্গামায় পড়তে হতো না।"

হাঙ্গামা বলে হাঙ্গামা। কেস ফাইল করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে আরও কত বছর কেটে যেতো তার হিসেব নেই। কিন্তু গণপতিবাবুর প্রদর্শিত তদ্বির পদ্ধতিতে অবিশ্বাস্য ফল হলো।

ম্যাজিসট্রেট সাহেব আমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন না। দেওয়ানি আদালতের আঙিনায় যে-মামলা একবার প্রবেশ করেছে ফৌজদারি আদালতে সে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হলো। কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। গণপতি-বাবু আমাকে ভরসা দিলেন, "চোখের সামনে রবার্ট ব্রুসের ছবিটা সবসময় স্মরণ করবে। আদালতের ইতিহাসে অদ্য রজনীই শেষ রজনী নয়। এক বারে না পারলে, শত বার চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

দেওয়ানি আদালতে ঘোরাঘুরিতে মন্ত্রবৎ ফল হলো। একদিন ইংরিজী সংবাদপত্রে নিরুদ্দিষ্ট মিস্টার ফিলিপের নামে পাবলিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলোঃ 'যে-হেতু আপনি অমুক নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়া দিচ্ছেন না এবং যেহেতু আপনি ভাড়াটের অধিকার ছাড়ছেন না এবং যেহেতু আপনাকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাওয়া যাচ্ছে না, যেহেতু... দীর্ঘ 'যেহেতুর শেষে নিবেদন, এই নোটিশ প্রকাশের নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে আদালতে হাজিরা না দিলে আপনার বিরুদ্ধে মামলার এক-তরফা শুনানী হবে।'

'যেহেতু' মার্কা নোটিশের একটা অস্পষ্ট কপি সাড়ম্বরে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার ওপরও এ'টে দেওয়া হলো।

বরদাপ্রসন্ন মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। যে-বাড়ির দরজা দীর্ঘদিন তালা বন্ধ তার ওপর নোটিশ এ'টে লাভ কী? কিন্তু এইটাই দীর্ঘদিনের নিয়ম। আমাদের কাছে ফিলিপ সায়েবের এইটাই 'লাস্ট নোন অ্যাড্রেস'—শেষ পরিচিত ঠিকানা।

এর পর অ্যাডভোকেট গোলাপ বক্সীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা রেকর্ড স্পিডে মামলার ঘোড়া বাজিমাৎ করে সবাইকে বিস্মিত করেছিল। স্বয়ং গণপতি-বাবুও স্বীকার করলেন, "তুমি সত্যিই খেলা দেখালে।" তারপর তিনি যে মন্তব্যটি যোগ করলেন, তা হলো, "তুমি তো জিতবেই। হরি উকিলের ছেলে ভেল্কি দেখাবে না তো কে দেখাবে?"

বহুমূল্য উপদেশও দিয়েছিলেন গণপতিবাবু। "শুভস্য শীঘ্রম্। এক ঘণ্টাও দেরি কোরো না। আদালতের ডিক্রি এখনই জারির ব্যবস্থা করো এবং হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর স্টাইলে দুড়ুম করে ফ্ল্যাটের দখল নিয়ে নাও।"

আদালতের এজলাসে মামলার ডিক্রি পাবার পরে ডিক্রি জারির নির্দেশ বের করাও এক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার কাহিনী। অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের এই পর্বটি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

পেশকার-পেয়াদা-পুলিশ এবং উকিল-উমেদার-ঘটিত নানা জটিল পথ পেরিয়ে অবশেষে সেই বহু প্রত্যাশিত মুহূর্ত সমাগত হলো যেদিন বেলিফ এবং পুলিশের নিশ্চিন্ত সাহচর্যে আমরা বন্ধ উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দ্বারোন্মোচনের আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করলাম।

ডিক্রি জারির আদালতী হুকুমনামা পকেটস্থ করতে পেরে আমার উল্লাসের সীমা নেই। গোপনে গোপনে যে রীতিমত গর্ববোধ করছি তাও স্বীকার করতে লজ্জা নেই। গোলাপ বক্সী অ্যাডভোকেট নিজেও আমাকে অভিনন্দন জানালেন। জ্বলন্ত চুরুট ঠোঁট থেকে সরিয়ে আঙুলের ফাঁকে ধরে বক্সী সায়েব বললেন, "ভাড়াটে কোর্টের হিসট্রি লেখা হচ্ছে না তাই। হলে আপনার নাম উঠে যেতো। এতো অল্প সময়ের মধ্যে কাউকে মামলা জিতে দখল নেবার ব্যবস্থা পাকা করতে দেখিনি।"

মনে মনে গণপতিবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। গোরুর গাড়িকে বোম্বাই মেলের স্পীডে চালিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা তাঁরই। অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষদের মতো তিনি কখনও প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেননি, নেপথ্য থেকে সমস্ত কলকাঠি নেড়ে গুরুপুত্রকে সাহায্য করেছেন।

বেলিফ শীতলাপ্রসাদ কোলে হাতের কাগজপত্র সামলে আমাকে বললেন, "আর দেরি করছেন কেন? শুভস্য শীঘ্রম! চলুন আপনাকে দখলটা দিয়ে আসি।"

পাকানো দড়ির মতো শুকনো এমন অদ্ভুত চেহারা সহজে নজরে পড়ে না। ভদ্রলোকের হাফ শার্টখানাও দেখবার মতো—বহু জায়গায় সেলাই খোলা। দু এক জায়গায় বিড়ির আগুনে পোড়া মনে হচ্ছে।

বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "দখল দেবার সময়

আমি এসপেশালি এই জামাখানা পরে যাই। জানেন না তো, আমাদের কাজের রিস্‌ক কতো। আমাদের দেখলে লোকে তো সন্দেশ-রসগোল্লা পাঠিয়ে অভ্যর্থনা করে না! অনেকে এসে রেগে-মেগে জামার কলার চেপে ধরে, যা তা গালাগালি দিয়ে শাসায়—যদি জান না রেখে যেতে চাস তো হলে এখনই কেটে পড়।"

হাসির নাটকের টাইপ চরিত্রের মতো চশমার ফাঁকে আড়চোখে তাকিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "আমাদের গায়ে হাত দেওয়া যা আর স্বয়ং গভরমেণ্টের গায়ে হাত দেওয়াও তা—কেলেঙ্কারি কান্ড হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অনেকে মারধোর করে, পরে কোর্টের শমন পেয়ে কাঠগড়ায় উঠে অভিযোগ স্রেফ অস্বীকার করে বসে। হলফ নিয়ে বলে, ধর্মাবতার সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, আমি বেলিফকে চলে যেতে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, কখনও ওঁর বডি স্পর্শ করিনি। ছি ছি! আমি ধর্মাবতারের প্রতিনিধির গায়ে হাত তুলবার কথা ভাবতেও পারি না।"

শীতলাপ্রসাদ বললেন, "ঠেকে-ঠেকে আমিও মতলব বের করেছি। এই যে শার্টখানা দেখছেন, এর সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না! এমন পচা শার্ট যে কলার ধরেছে কি ধড়-ফড় করে ছিঁড়ে যাবে। এমন এভিডেন্স হয়ে থাকবে, যে কোর্টে গিয়ে মিথ্যে বলা চলবে না।"

"তোর আবার সব তাতেই পাকামো!" শীতলাপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন গজাননকে। তারপর আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন, "গত সপ্তাহে দু'বার ক্ষতিপূরণ আদায় করেছি বলে, ওর বুক টাটাচ্ছে! পার্টি তো জানে না শার্টের অবস্থা—রেগেমেগে যেমনি আমার কলার টেনে ধরেছে, অমনি ফ্যাঁশ! গজানন অমনি চিৎকার করে উঠলো, 'বেলিফের গায়ে হাত দিয়েছেন—আপনার ভাগ্যে ছ' মাস শ্রীঘর-বাস নাচছে।' লোকটা তখন ভয় পেয়ে গিয়ে মাপ চাইলে। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়ে দিলাম, শার্টের ক্ষতিপূরণ না-দিলে মাপ করবার কথাই ওঠে না। শার্টের জন্যে আঠারো টাকা আদায় করেছি। বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে দিয়ে ছেঁড়া শার্ট সেলাই করাতে মাত্র দশ মিনিট লাগলো!"

গজানন এবার একগাল হেসে বললো, "খুব পয়মন্ত শার্ট। দু' দিন পরে আবার ছিঁড়লো এবং বাবুর পকেটে উনিশ টাকা এলো!"

"মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পেলি না?" প্রতিবাদ জানালেন শীতলাপ্রসাদ। "দ্বিতীয়বার পেয়েছি সাড়ে-আঠারো টাকা! তোকে আটগণ্ডা পয়সা দিলাম না?"

"নেমখারাম মশায়, পয়সাও নেবে অথচ সত্যি কথা বলবে না। তুই তো আপিসের মাইনে খাচ্ছিস, তোর তো এক পয়সা উপরি পাওয়া উচিত নয়। কী মশাই? ঠিক বলছি কিনা?" শীতলাপ্রসাদ আমাকে দলে টানবার চেষ্টা করলেন।

গজানন ততক্ষণে অন্য প্রসঙ্গ তুলে ফেলেছে। রাস্তার অদূরে চায়ের দোকান দেখে সে চা-পানের জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করলো। শীতলাপ্রসাদ সঙ্গে-সঙ্গে গজাননের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালেন এবং বললেন, "দখল দিতে কতক্ষণ সময় লাগবে কেউ বলতে পারে না। আগে একটু গলা ভিজিয়ে গেলে আপনারই কাজের সুবিধে।"

অগত্যা আইনপাড়ার এক মিষ্টান্ন-কাম-চায়ের দোকানে ঢুকে পড়া গেলো।

বহুদিন আগে, দীর্ঘদিনের গবেষণার পরে হাইকোর্টের বিশিষ্ট বাবু ছোকাদা বলেছিলেন, "দেশের সর্বত্র আদালতের কাছাকাছি মিষ্টির দোকানগুলোর রমরমা ভাব—এরকম মিষ্টির সাইজ এবং স্টক আদালত ছাড়া অন্য কোথাও দেখতে পাবে না।"

মামলা মোকদ্দমার সঙ্গে মিষ্টান্নের কি অদৃশ্য যোগসূত্র আছে জানি না. কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের বিশেষ জানা শোনা একজন ব্যারিস্টারের বাবু তো দাবি করতেন, খাবারের দোকানের কাঁচের শো-কেসের দিকে তাকিয়েই তিনি বলে দিতে পারেন কাছাকাছি কোনো আদালত আছে কিনা! কতকগুলো রাক্ষুসে সাইজের রাজভোগ ও চমচম নাকি আইনপাড়া ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না।

দোকানের একটি টেবিল দখল নিয়েই গজানন চোখের সিগন্যালে পরিচিত বয়কে তৎক্ষণাৎ হাজির করালো এবং হোস্টের সৌজন্যের জন্য অপেক্ষা না করেই বেলিফ শীতলাপ্রসাদের মতামতের প্রত্যাশায় বললো. "দু'খানা করে খাঁটি ঘিয়ের খাস্তা কচুরি, দু'খানা করে গজা, দু'খানা করে স্পেশাল পাশবালিশ এবং দু'খানা আপীলভোগ বলা যাক?"

পাশবালিশ বলতে যে রাক্ষুসে সাইজ পান্তুয়া এবং আপীলভোগ বলতে যে রাজভোগের তিনগুণ সাইজের ছানার টেনিস-বল তা আমার অজানা নয়।

দোকানের ছোকরাটি আদেশমান্য করবার জন্য তড়িৎগতিতে বিদায় নিচ্ছিল। কিন্তু শীতলাপ্রসাদ তাকে বাধা দিলেন। এবং গজাননকে তীব্র বকুনি লাগালেনঃ "সব জিনিসের একটা সীমা আছে গজু। ইনি কে জানো? গণপতিবাবুর আপন ছোট ভাই?"

গণপতিবাবুর নামোচ্চারণ করতেই সাপের ফনার ওপর যেন মন্ত্রঃপূত জল পড়লো। একবারে চুপসে গেলো গজানন। বিনয়ে বিগলিত হয়ে গজানন বললো, "কিছু মনে করবেন না, স্যর। বলবেন তো, আপনি গণপতিবাবুর 'ব্রাদার অফ সেম উম্ব'। আমি শুধু এককাপ গরম চা খাবো।"

শীতলাপ্রসাদও বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু এক এককাপ চা হলেই চলবে।"

মুখের খাবার নিয়ে এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে জীবনে পড়িনি। আমার স্বর্গত পিতৃদেব মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসতেন এবং নিঃস্ব হয়েও অতিথি আপ্যায়নে বিশ্বাস করতেন। বিব্রত অবস্থায় গজাননকে কিছু খাবার জন্যে অনুরোধ করলাম। কিন্তু গজানন কিছুতেই সে পথে আর পা বাড়ালো না। বললো, "চা ছাড়া কিছছু নয়—এখন খিদেই পায়নি।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "গণপতিবাবুর ছোট ভাই আপনি —আমাদের লাইনের সুখ-দুঃখের কথা সব শুনেছেন নিশ্চয়। বাপ বোধ হয় বুঝেসুঝেই আমার নামকরণ করেছিলেন। কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন মা-শীতলার ঝাঁটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। হাঁড়ি-কুঁড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে লোককে ভদ্রাসন থেকে টেনে বের করে পথে বসিয়ে পার্টিকে সম্পত্তি দখল দেওয়াই আমাদের কাজ। কত লোক যে অভিশাপ দেয় আপনাকে কী বলবো।"

বেলিফের কাজের এই অপ্রিয় দিকটার কথা আমার কখনও খেয়াল হয়নি। চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "আমরা কী করতে পারি বলুন? আমরা তো হুকুমের চাকর। ধর্মাবতার যদি হুকুম

দেন, তা হলে নিজের বাপকেও ভিটে-মাটি ছাড়া করতে হবে আমাদের।”

গজানন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালো। “বিশ্বাস করছেন না বুঝি, স্যর? সাধে কি আর আমাদের দেওয়ানি কোর্টের জল্লাদ বলে! জল্লাদরা ক্রিমিন্যাল কেসে ফাঁসি দেয়, আর আমরা সিভিল কেসের পর লোককে উচ্ছেদ করি, তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ঠেলাগাড়ি করে কেড়ে নিয়ে চলে আসি ; একজনের মাথা গুঁজবার ঠাঁই আর একজনকে দখল দিই।”

শীতলাপ্রসাদ কোনোরকম প্রতিবাদ করছেন না। চায়ের সঙ্গে একটা বিড়ি ধরিয়ে আপন মনে টানছেন। এবার কোমর থেকে একটা ট্যাঁকঘড়ি বের করে সময়টা দেখে নিলেন।

গজানন একগাল হেসে শীতলাপ্রসাদকে দেখিয়ে বললেন, “এঁর কাছে কাজ ইজ কাজ। একেবারে গুরুদেব লোক। ডিক্রিজারির অর্ডারে শীলমোহর করিয়ে ওঁর হাতে দিলে ওঁর আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। দখল উনি পার্টিকে দেওয়াবেনই—সে যে করেই হোক। নিজের বাপকে ভিটেমাটি ছাড়া না করলেও গত মাসে তো বাপের বোনকে উচ্ছেদ করে এলেন!”

মানে? আমি রীতিমত অবাক হচ্ছি। উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দখল নিতে গিয়ে যে এ-রকম বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হবে আন্দাজ করিনি।

শীতলাপ্রসাদ আপন মনে বললেন, “মিথ্যে বলেনি গজু। যখন কাজে বেরিয়েছিলাম তখনও জানতাম না। জানলে হয়তো অবলা মিত্তিরকে পাঠাতাম নিজে না গিয়ে। আপনার দাদা গণপতিবাবুরই কেস। ওঁর মালিকদের এক-খানা বারওয়ারি ভাড়াটে বাড়ি নিয়ে অনেকদিন ধরে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। শেষে ডিক্রি পেয়েই জারি করবার জন্যে ছোটাছুটি। আপনার দাদার আবার আমাকে না হলে পছন্দ হয় না। হুড়মুড় করে রাধারমণ দত্ত লেনের সেই বাড়িতে ঢুকে দেখি তখন অনেক ভাড়াটে রান্না-বান্না চাপিয়েছে। দু-একখানা তোলা উনুন থেকে ঝটপট হাঁড়ি নামিয়ে দিলুম—আমাদের দেখে বাড়িতে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি লাগিয়ে দিলো। তারপর মশাই, উচ্ছেদ করতে-করতে দোতলায় উঠে দেখি আমার সুধা পিসি একখানা প্যাঁটরা নিয়ে নেমে আসছে। এই ব্যাটা গজানন আমার সুধা পিসির ভাতের হাঁড়ি উনুন থেকে নামিয়ে দিয়েছে।”

“আমি কী করে বুঝবো যে উনি আপনার পিসীমা? জানলে বলতুম, ঠিক হ্যায়। রান্নাবান্না সেরে তাড়াতাড়ি সরে যান।”

শীতলাপ্রসাদ নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, “আমার আপন পিসী নয়—বাবার মাসতুতো বোন।”

“ঐ হলো—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন,” মন্তব্য করলো গজানন।

“আমাকে দেখে পিসী তো তাজ্জব। আমিও স্তম্ভিত। কিন্তু কী করবো? আমি তো হুকুমের চাকর। হুকুম না-মানলে আমারও অন্ন উঠবে। যে-বাড়িতে ভাড়াটে আছি, সেখানেও একদিন এই হতভাগা গজানন গিয়ে হয়তো আমাকে উচ্ছেদ করে আসবে।”

দাঁত বের করে গজানন বললো, “আমি কিন্তু অত নির্দয় হতে পারবুনি। আপনাকে ফিস ফিস করে বলে দেবো, দাদা, রান্নাবান্না শেষ করে, খেয়েদেয়ে, একপ্রস্থ ঘুমিয়ে নিয়ে বিকেল তিনটে-চারটে নাগাদ রাস্তায় বের হোন।”

বেলিফ শীতলাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু গজাননের কথা শেষ হতে চায় না। পানের কষে খয়েরী হয়ে-যাওয়া দাঁতগুলো বের করে

সে বললো, "যেমন কম্মো তেমন ফল—ধম্মের কল যে বাতাসে নড়ে!"

কী বলতে চায় গজানন তা বুঝতে পারছি না। গজানন শান্তভাবে জানিয়ে দিলো, "আপনার বড়দার কাজকম্ম সেরে পুরো দখল দিয়ে সেদিন রাধারমণ মিত্তির লেন থেকে বেরিয়ে দেখি দাদার বিধবা পিসী তাঁর প্যাঁট-রাটির ওপর গতরখানি রেখে তখনও রাস্তায় বসে আছে। তখন নিজের ময়লা নিজেকেই সাফ করতে হলো—ওই রাধারমণ মিত্তির লেন থেকে রিকশ ভাড়া করে পিসিকে নিজের বাড়িতে তুলতে হলো দাদাকে। কী করবে বলুন—হাজার হোক পিসী তো!"

শীতলাপ্রসাদ এবার কাজের কথা তুললেন। অর্ডারের কাগজপত্রে তিনি এখনও ভালভাবে নজর দেননি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন তালাচাবির ব্যবস্থা রেখেছেন তো? এক একজন পার্টি এত অনভিজ্ঞ থাকে যে দখল নিতে যায় অথচ সংগে তালাচাবি রাখে না। দখল নেবার পরে তখন ছোটাছুটি কোথায় তালা কোথায় চাবি দেখো।"

বেলিফকে আশ্বস্ত করলাম তালাচাবির অসুবিধা হবে না। আমাদের ম্যানসনে সব সময় স্পেশাল সাইজের তালাচাবি মজুত থাকে। সকালে তেলকালিবাবুকে রিকোয়েস্ট করে এসেছি, একটু পরেই যেন আমাদের লাগানো তালার-ওপর-তালাটা উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা থেকে খুলে নেওয়া হয়। পুলিস এবং আদালতে লোকের সামনে আমাদের তালাটা যেন দেখতে পাওয়া না যায়।

আর একটা বিড়ি ধরাবার জন্যে শীতলাপ্রসাদ দেশলাইয়ের খোঁজ করলেন। "তেইশ বছর চাকরি করছি, তবু যুদ্ধে নামবার আগে আমার নার্ভাসনেস বেড়ে যায়। এই সময়টা আমি ঘন ঘন বিড়ি ধরাই।" বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ক'জনকে উচ্ছেদ করতে হবে?"

ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাদের ম্যানসনে উচ্ছেদটা অন্য রকমের। সেখানে কেউ ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে উনুনের সামনে বসে নেই।

"বলবেন তো মশাই! এ তো মেডিক্যাল কেস—সার্জিক্যাল কোনো হাঙ্গামাই নেই! যাঁকে উচ্ছেদ করতে হবে তাঁর পাত্তা নেই। এ তো নাম-কা-ওয়াস্তে বেলিফের বুড়ি ছুঁইয়ে রাখা!"

পুলিসকে খবর দিয়ে রেখেছি কিনা জানতে চাইলেন শীতলাপ্রসাদ। গণপতিবাবুর কথা চিন্তা করেই বোধ হয় ভদ্রলোক আমার ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ নিচ্ছেন।

পুলিসে খবর দেওয়া আছে শুনে শীতলাপ্রসাদ বললেন "পুলিস অনেক সময় বেশী দেরি করিয়ে দেয়। ঠিক সময়ে হাজির হয় না। অথচ আমাদের এই উচ্ছেদের কাজে বেলিফ এবং পুলিস হলো পুরুত আর নাপিত। দুজনেই সমান ইমপর্টাণ্ট!"

আদালতের এই অপ্রিয় কাজে কে পুরুত এবং কে নাপিত তা বুঝতে পারলাম না।

শীতলাপ্রসাদ বললেন, "আপনার ক্ষেত্রে পুলিসকে খুব প্রয়োজন। কারণ বেওয়ারিশ মালপত্তর সব রাস্তায় টেনে বের করে দিতে হবে। এবং পুলিস সে-সব মালের লিস্টি বানিয়ে তোষাখানায় পাঠিয়ে দেবে। কুলি এবং ঠেলা-গাড়ির ব্যবস্থা রখেছেন তো? যদি ভেবে থাকেন পুলিস নিজে ঠেলাগাড়ি ডেকে এনে আপনার ভাড়াটের মাল নিয়ে গিয়ে আপনাকে ভেকাণ্ট পজেশন

দেবে, তা হলে খুব ভুল করেছেন।”

গণপতিবাবুর গোপন উপদেশ মতো এ সব ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করে রেখেছি। যাঁর অনুপস্থিতি আজ বিশেষ করে অনুভব করছি তিনি হলেন বরদাপ্রসন্ন। কয়েকদিন আগে তিনি ছুটি নিয়ে বাবা বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছেন। হোল লাইফে কোনোদিন ছুটি পাননি ভদ্রলোক—একাই এই যক্ষের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে এসেছেন, একদিনের জন্যেও মুক্তি পাননি। আমি আসার সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজী হননি ভদ্রলোক—দিন কয়েকের জন্যেও উধাও হয়েছেন।

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা যে এত অল্প সময়ে পাকা হবে তা আমি নিজেও আন্দাজ করতে পারিনি। পারলে. অবশ্যই উচ্ছেদ না-হওয়া পর্যন্ত বরদাপ্রসন্নকে ছাড়তাম না। কিন্তু অসুবিধার কিছু নেই। তেলকালিবাবু আমাকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেছেন. “আমি তো আছি, আপনার কোনো চিন্তা নেই। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শুভ কাজ নির্বিঘ্নে শেষ করিয়ে দেবো।”

তেলকালিবাবুকে আমি পুলিসের খবরাখবর নেবার জন্যে পাঠিয়েছি। বাড়ির ঠিকানা দেখে শীতলাপ্রসাদ বললেন, “খুব সম্ভব অ্যাসিসটেণ্ট দারোগা গনেশ সরকার আসবেন। ও-পাড়ায় যত উচ্ছেদের মামলায় যাই সব জায়গাতেই তো গনেশবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়। একেবারে সিদ্ধিদাতা লোক—আপনার কোনো চিন্তা নেই! আগে থাকতে যদি একটু পুজো-আচ্ছার ব্যবস্থা করে রাখেন তা হলে কোনো অসুবিধাই হবে না—তরতর করে কাজ হয়ে যাবে। ভাড়াটে তাড়াচ্ছেন মনেই হবে না .ভাববেন ঠিক যেন নতুন তৈরি নিজের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করছেন!”

থ্যাকারে ম্যানসনের আপিস ঘরের সামনেই তেলকালিবাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। গনেশ সরকার তখন তাঁর ফোর্স সহ আপিসঘরের ভিতর বসে চা খাচ্ছিলেন। বুদ্ধিমান তেলকালি ওঁর সামনে এক ডিশ পানও রেখেছেন।

বোঁটায় চুন লাগিয়ে জিভে ঠেকাতে ঠেকাতে গনেশ সরকার তাঁর পরিচিত বেলিফ শীতলাপ্রসাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ শুরু করলেন। আমরা কিছু হাঙ্গামা প্রত্যাশা করছি কিনা জানতে চাইলেন গণেশবাবু।

তেলকালি মনের দুঃখে আমার কানে কানে বললেন, “ট্রাবল দেবার মতো লোক তো ছিলেন না, ফিলিপ সায়েব।”

গোলমালের সম্ভাবনা কম শুনে পুলিস ও আদালতের প্রতিনিধিরা খুশী হলেন। গণেশ সরকার জিজ্ঞেস করলেন, “আজ যে আপনারা দখল নিচ্ছেন খবরটা বেশী ছড়াননি তো?”

“কাক-পক্ষীতে পর্যন্ত জানে না, স্যর।” তেলকালি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

গণেশ সরকার বললেন, “যত চুপে চুপে ব্যাপারগুলো সারা যায় ততই ভাল। পাঁচ কান হলেই বিপদের সম্ভাবনা।”

ট্যাঁকঘড়ির দিকে তাকিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, “তা হলে এবার ওঠা যাক, চলুন পার্টিকে পজেসন দিয়ে তারপর বরং গপ্পো-গুজব করা যাবে।”

গণেশবাবু বললেন, “সাক্ষী? দুজন নিরপেক্ষ সাক্ষী নেওয়া যাক—

লিস্টি তৈরির সময় দরকার হবে।”

মুচকি হেসে শীতলাপ্রসাদ বললেন, “যাকে খুশী তুলে নিন। পুলিসের সব সাক্ষীই তো নিরপেক্ষ!”

গণেশবাবু মুচকি হাসির অর্থ বুঝলেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কথা স্মরণ করেই বোধ হয় কোনো মন্তব্য করলেন না।

এবার সত্যই আমি বিজয়গর্ব অনুভব করছি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট আমাদের অধিকারে এসে যাবে। থ্যাকারে ম্যানসনে আমার স্মরণীয় কাজের মধ্যে এইটাই যে উজ্জ্বলতম হতে চলেছে তা ভাবতে বেশ আনন্দ হচ্ছে।

তেলকালি ও দুজন সাক্ষী আমাদের সঙ্গে সিমেণ্ট-বাঁধানো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফয়ারের দিকে চলেছেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায় পুরনো ফ্ল্যাটের ভাড়াটের কথা ভদ্রলোক কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

“বিবাগী হয়ে সায়েবটা কোথায় চলে গেলো বলুন তো” আমার কাছে দুঃখ করলেন তেলকালি। মেমসায়েবকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না তেলকালি। আমার কানে কানে বললেন. “কি মেয়েমানুষ দেখুন। লোকটা কোথায় বিবাগী হয়ে ভেসে গেলো একবার খোঁজ পর্যন্ত করলে না।”

পুরোপুরি এডিথ মেমসায়েবকেই যে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তেল-কালিবাবু তা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রেমের এই সব জটিল পরচর্চায় আমার একটুও উৎসাহ নেই। তাই চুপ করে রইলাম। তেলকালি আবার শুনিয়ে দিলেন, “বড় শান্ত নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন ফিলিপ সায়েব। দেখবেন. ওই প্রেমিক বাঙালী ছোকরার ভাল হবে না। পরস্ত্রী ভাঙানোর চেয়ে মহাপাপ আর হয় না।”

বেলিফ শীতলাপ্রসাদ যে তালা ভাঙায় এত অভ্যস্ত তা আমার জানা ছিল না। প্রয়োজনীয় আইনপ্রক্রিয়ার শেষে পুলিসের উপস্থিতিতে তিনি কড়াং করে ফিলিপ সায়েবের তালা ভেঙে ফেললেন। তারপর একগাল হেসে আমাকে বললেন, “এই নিন আপনার পজেসন। লাগান আপনার তালা।”

রসিক গণেশ সরকার বললেন. “এখনই তালা লাগাচ্ছেন কি? এখনও ভিতরে কী আছে দেখা হয়নি!”

“খালি বাড়িতে কী এমন কোহিনুর মণি রেখে যাবেন, স্যার? ডিফলটার ভাড়াটেদের তো আমার জানতে বাকি নেই! তার ওপর প্রেমবিবাগী সায়েব!” রসিকতা করলেন শীতলাপ্রসাদ। তারপর গণেশবাবুকে অনুরোধ করলেন. “ভিতরে তো আপনার কাজ। লিস্টি বানিয়ে মালপত্তর নিয়ে চলে যান। তবে একটু হাত চালিয়ে স্যার. মেয়েটার এখন-তখন অবস্থা—কখন ডেলিভারির ব্যথা ওঠে ঠিক নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাবার দ্বিতীয় লোক বাড়িতে নেই।”

জয়ের আনন্দে আমি রামসিংহাসনকে কয়েক কাপ চা এখানে দ্রুত আনিয়ে দেবার নির্দেশ দিলাম।

দরজা ঠেলে খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে এলো। বহুদিন ফ্ল্যাটের দরজা জানলা বন্ধ থাকলে বোধ হয় এরকম হয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে হাল্কা মেজাজে সকলে উনিশ নম্বরে পদার্পণ করলাম। তেলকালিবাবু দুঃখ করলেন. “আহা সাজানো সংসার।”

শীতলাপ্রসাদ বললেন, “তেমন কিছু মালপত্তর দেখছি না। গণেশবাবু,

আপনার লিস্টি তৈরি হতে বেশী সময় লাগবে না।"

গণেশ সরকার ততক্ষণে নিজের কাজে লেগে গিয়েছেন। ফ্ল্যাটের আকারের তুলনায় সত্যি কিছুই জিনিসপত্তর অবশিষ্ট নেই।

গণেশবাবু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন. "এর মধ্যে আবার চুনের বস্তা এলো কী করে ? সায়েব কি নিজের ঘর নিজেই রং করবার ব্যবস্থা করছিলেন ?"

তার পরেই বিস্ফোরণ ঘটলো, এই রকম চাঞ্চল্যকর ঘটনার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

শীতলাপ্রসাদ একটা কাঠের ওয়ারড্রোব খুলে ফেললেন। ভিতর থেকে কয়েকটা সিল্কের শাড়ি হুড়ুস করে মেঝেতে পড়লো। দেখলাম কিছু ব্লাউজ এবং মহিলাদের অন্তর্বাস একদিকে হ্যাঙারে ঝুলছে।

তেলকালি ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "মেমসায়েবের জামাকাপড়। সায়েবকে ছেড়ে গেলেও মেয়েরা তো এই সব জামাকাপড় ছাড়ে না !"

"মেয়েদের মন কিছুই বোঝা যায় না", আমি তেলকালিকে শুনিয়ে দিলাম।

তেলকালি আবার সামনের স্টীল আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। আলমারির এক পাল্লায় মানুষ-প্রমাণ কাঁচের আয়না। বিছানায় শুয়ে শুয়েও এই আলমারির আয়নায় প্রতিফলন দেখা যায়।

পাশেই বিরাট এক কালো রঙের টিনের তোরঙ্গ। চাবিটা তোরঙ্গের গায়েই ঝুলছে। গণেশ সরকারের নির্দেশে তেলকালি এবার চাবি ঘুরিয়ে ট্রাঙ্কের ডালা খুলে ফেললেন এবং ভিতরে নজর দিয়েই তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন—"মেম সাহেব !" তারপর হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে মেঝেতে ফেণ্ট হয়ে পড়লেন তেলকালিবাবু।

"মেমসাহেব এখানে কোথেকে আসবেন ?" আমি দ্রুত তেলকালির দিকে এগিয়ে গেলাম। গণেশ সরকারও ছুটে এলেন।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। ট্রাঙ্কের মধ্যে চুনের গুঁড়োর ভিতরে শায়িতা এক নারীদেহ। চুনের কটু গন্ধ ভেদ করেও অবর্ণনীয় এক দুর্গন্ধে সমস্ত শরীর ঘুলিয়ে দিলো।

এডিথ মেমসায়েবকে চিনতে তেলকালির একটুও অসুবিধা হয়নি। বিগলিত দেহের চারদিকে তাঁর প্রিয় আকাশী রঙের সিল্ক শাড়িটা তখনও অক্ষত রয়েছে।

হতভম্ব গণেশ সরকার জিজ্ঞেস করলেন. "আপনাদের মিষ্টার ফিলিপ কি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন ? বউকে গলাটিপে খুন করেছেন মনে হচ্ছে। এবং খুনের পর চুনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে যে বাইরে একটুও দুর্গন্ধ ছড়াবে না সে খবরটাও রাখেন তিনি।"

সামান্য দশ মিনিটে যা শেষ হবে আন্দাজ করেছিলাম তা যে এমন জটিল ব্যাপার হয়ে উঠবে কে জানতো ? পুলিসের বড় বড় অফিসারদের পদধূলিতে আমাদের উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট ধন্য হয়ে উঠলো। কিন্তু কোথায় ফিলিপ সাহেব ? তিনি এখন পৃথিবীর কোন প্রান্তে অথবা কোন দরিয়ায় আত্মগোপন করে রয়েছেন তা কেউ জানে না।

অফিসাররা সবাই স্বীকার করলেন "বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। এত দিন পরে মৃতদেহ আবিষ্কারের খবর তাঁদের জানা নেই।"

আমার মনে পড়লো, বরদাপ্রসন্ন শেষবারে ফিলিপ সায়েবকে চুনের

বস্তা কিনে আনতে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানে নেই। বেচারাকে আর এই বীভৎস ব্যাপারে জড়াতেও ইচ্ছে করলো না। বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনলাম, "সাধারণত, কয়েকদিনের মধ্যে মৃতদেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু জাহাজের বিরাট ট্রাংকটা চুনে বোঝাই করে তারই মধ্যে মৃতদেহ শুইয়ে দিয়ে আসামী অবিশ্বাস্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে, পুলিসের হাঙ্গামা সাময়িকভাবে চুকিয়ে রাত্রে ছাদের ঘরে আমি অসুস্থ তেলকালিকে দেখতে গিয়েছিলাম।

গায়ে একটা বিছানার চাদর জড়িয়ে শুকনো মুখে তেলকালিবাবু পাথরের মতো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

"কেমন আছেন?" আমি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

"আসুন স্যর," বরফের মতো ঠাণ্ডা স্বরে তেলকালিবাবু আমাকে আহ্বান জানালেন।

এবার দীর্ঘ নীরবতা।

তারপর তেলকালি বললেন, "খুব নরম মানুষ ছিলেন ফিলিপ সায়েব। তিনি এই কাজ কী করে করলেন, স্যর?"

আমি কী উত্তর দেবো? বললাম, "আমাদের জানাশোনা এক বুড়ো দারোয়ান ছিল—সে বলতো, বাবুজী যব হোতি হ্যায় তব্ এইসী হোতি হ্যায়! কখন কী হয়, কেউ জানে না।"

তেলকালিবাবুর ঘরে আলো নেভানো। কিন্তু দূরে ছাদের আলোর কিছুটা এসে ঘরে অস্পষ্ট আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে।

তেলকালি রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার পাপের শেষ নেই, স্যর।"

"এসব কী বলছেন আপনি?" ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম আমি।

চাদর দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে তেলকালি বললেন, "আমিই সায়েবকে মেমসায়েব সম্বন্ধে একটা উড়ো চিঠি দিয়েছিলাম। কী বদখেয়াল হলো কে জানে, মেমসায়েবের কাণ্ডকারখানা দেখে লিখে দিলুম সায়েবকে। আমি ভেবেছিলুম, মেমসায়েব হাতে-নাতে ধরা পড়লে বেশ জমবে—দূর থেকে মজা দেখবো।"

"কিন্তু এমন হবে কেমন করে জানবো? আমার যে নরকেও স্থান হবে না। আমি নাক কান মলছি আর কখনও কাউকে উড়ো চিঠি লিখবো না।" এই বলে তেলকালি আমারই সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এডিথ মেমসায়েব ও ফিলিপ সায়েবকে নিয়ে যথেষ্ট হাঙ্গামা হজম করেছি। নগরপালের সতর্ক প্রতিনিধিরা বেশ কিছু দিন বারবার যাতায়াত করে এবং উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটকে তালাবন্ধ অবস্থায় নিজস্ব অধিকারে রেখেও নিরুদ্দিষ্ট ফিলিপ সায়েবকে সংগ্রহ করতে পারেননি। শুনেছি, রহস্যের অনুসন্ধানে তাঁরা সুদূর কেরালা পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো লাভ হয়নি। ফিলিপ সায়েবের মা অনেক দিন আগেই

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পুত্রের কীর্তির জন্য পুলিসের প্রশ্নমালা থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

অবশেষে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের তালা আবার খুলেছে এবং ফিলিপ সায়েবের কেসটা ফাইলবন্দী হয়েছে। ফিলিপ সায়েব এখন কোথায়? এই বিশাল পৃথিবীর কোনো প্রান্তে তিনি নিশ্চয় নতুন কোনো নামে জীবন অতিবাহিত করছেন।

আপাতত উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট এবং ফিলিপ সায়েবকে নমস্কার জানানো যাক। এবার পরিচয় হোক মিসেস ডরোথি ওয়াটের সংগে।

থ্যাকারে ম্যানসনে আমার এক দুঃখময় মুহূর্তেই এই ভদ্রমহিলার সংগে আলাপ হয়েছিল।

তখন সবে এসেছি এই নতুন বাড়িতে। কয়েকদিন বসবাসের পরে মনঃসংযোগের প্রাণপণ চেষ্টা করেও থ্যাকারে ম্যানসনের বর্ণসংকর জীবন-ধারার সংগে তখন নিজেকে সম্পূর্ণ মানিয়ে নিতে পারছি না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অবাধ্য মন আমাকে যেন বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তুমি এখানকার লোক নয়।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে বিদ্রোহী মনকে তীব্র ভর্ৎসনা জানিয়েছি। স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, যে কর্মক্ষেত্র আসলে একটি রণক্ষেত্র, অভিজ্ঞ জীবনসংগ্রামীরা যেনতেনপ্রকারে জয়মাল্য সংগ্রহ ছাড়া অন্য কিছুই কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু বারওয়েল সায়েব, স্যাটাদা এবং গণপতিবাবুরা বারবার আমার অসহায় জীবনে আবির্ভূত হয়ে আমাকে অন্তহীন লোভী করে তুলেছেন, কর্মক্ষেত্র থেকে তাই আমার প্রত্যাশার অন্ত নেই।

এবং প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা যে অত্যন্ত সীমিত তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারায় মাঝে মাঝে কর্মক্লান্ত দিনের অবসানে দেহ অবসন্ন ও মন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল।

কখনও কখনও এই বিষণ্ণতার রেশ ভোরবেলাতেও জড়িয়ে ধরে। এই সময় আমি আর ঈশ্বরকে স্মরণ করি না। আমি তখন এক কবির শ্রীচরণে আশ্রয় নিই। জীবনের অন্ধকার মুহূর্তে তাঁর বাণী স্মরণ করে অবিশ্বাস্য ফল লাভ করেছি—তাঁর অদৃশ্য ইংগিতে আমার হৃদয়ের সহস্র প্রদীপ অকস্মাৎ জ্বলে উঠে অনেক নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, পথভ্রষ্ট আমাকে মাঝে মাঝে তিনি পথের প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। সম্মানে অপমানে, বিজয়ে পরাজয়ে, সুখে দুঃখে, বিরহে তিনি আমার সংগে অবস্থান করে, নৈরাশ্যের গভীর অমাবস্যা থেকে তিনি আমাকে সোনালী সূর্যালোকে পৌঁছে দিয়েছেন। সহায় সম্বলহীন হয়ে পথে বেরোলেও আমার স্যুটকেসের যথাসর্বস্বের মাঝে তাঁর সৃষ্টিকেও তাই কখনও ত্যাগ করিনি—মহামূল্যবান সম্পদের মতো সবসময় তাঁকে নিত্যসাথী করে রেখেছি।

সেদিন ভোরেও আর কোনো উপায় না দেখে তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করে-ছিলাম। এক ঝলক গিনি সোনার মতো রোদ থ্যাকারে ম্যানসনের জরাজীর্ণ দেহের ওপর স্প্রে করা হচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের খেয়ালে আমি একতলায় নেমে এসেছি। এবং সিমেণ্ট বাঁধানো প্রাইভেট পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের ছোট আপিস ঘরের সামনে এসে পড়েছি। আমাদের এই আপিস ঘরটা ম্যানসন বাড়ি থেকে সামান্য দূরে। এখান থেকে দাঁড়িয়ে-

দাঁড়িয়ে সমস্ত ম্যানসন বাড়িটা এক ঝলকে দেখতে পাওয়া যায়।

'থ্যাকারে ম্যানসন এবং তার ভাড়াটিয়ারা এখনও জেগে ওঠেনি।' আপিস ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে মন চাইছে না। একখানা হাল্কা চেয়ার টেনে এনে আপিস ঘরের বাইরে বট গাছের তলায় বসে পড়েছি। দূরে থ্যাকারে ম্যানসনের মেন গেটের মধ্য দিয়ে শান্ত রাজপথের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে।

সূর্যকে পিছনে রেখে কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ কানে ভেসে এলো এক স্নেহভরা নারী কণ্ঠস্বর, "হোয়াট আর ইউ রিডিং মাই বয় ?"

চমকে উঠে হাতের বইটা বন্ধ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সামনে স্কার্টপরা এক প্রবীণা। বয়সের চাপে তিনি সামান্য ঝুঁকে পড়েছেন কিন্তু চোখের তারাগুলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। প্রবীণার গায়ের রং যে যৌবনকালে কাঁচা হলুদের মতো উজ্জ্বল ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। দীর্ঘাঙ্গিনী প্রবীণা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "সীট ডাউন মাই বয়।"

প্রবীণা নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, "আমি ডরোথি ওয়াট। এ-বাড়িতে অনেকদিন ভাড়া আছি। ফ্ল্যাট নম্বর এগারো।"

আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন হলো না। ডরোথি ওয়াট নিজেই বললেন, "যদি আমি প্রচন্ড ভুল করে না থাকি, তাহলে তুমিই মিস্টার শংকর—আমাদের এই বাড়ির নতুন ম্যানেজার।"

আমি হাত জোড় করে বিনীতভাবে এই বৃদ্ধাকে নমস্কার করলাম। তিনি বললেন, "থ্যাংক গড, মালিকরা এ-বাড়িটা সম্বন্ধে কিছুটা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। এবার যখন ম্যানেজার এসেছে তখন নিশ্চয় অনেক কিছু উন্নতি হবে।"

আমি সময়োচিত কী উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পারছি না। ডরোথি ওয়াট মৃদু হেসে বললেন, "কোথায় যেন পড়েছিলাম, প্রত্যেকটি বাড়ি হলো রমণীর মতো—নিয়মিত প্রসাধন না-করলে অকালে বুড়িয়ে যায়!"

বৃদ্ধা মহিলার রসবোধে আকৃষ্ট হলাম। ডরোথি কিন্তু এবার আমাকে আরও অবাক করলেন। ওঁর কথাবার্তায় এমন এক স্নেহের জাদু রয়েছে মনে হয় যেন কতদিনের চেনা, কত আপনজন তিনি।

ডরোথি এবার জিজ্ঞেস করলেন, "সকালবেলাটা তো সব সম্প্রদায়ের প্রার্থনার সময়। তুমি এই সময় এখানে বসে কী পড়ছিলে ?"

আমি এই মুহূর্তে যা পড়ছিলাম তা কী বুঝবেন এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা ? কিন্তু ডরোথি ওয়াট ছাড়লেন না। বইটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, "আমি বুঝেছি, তুমি বাংলা বই পড়ছো। কিন্তু তুমি এগজ্যাক্টলি কী পড়ছো, তা জানবার খুব ইচ্ছে আমার।"

অগত্যা রবীন্দ্রনাথের লাইন ক'টা শুনিয়ে দিতে হলো ঃ

"দিন হয়ে গেল গত।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয়দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত।"

খুব মন দিয়ে শুনলেন ডরোথি ওয়াট। "আর একবার তুমি পড়তে পারো ?"

আবার পড়লাম। তারপর কোনোরকমে দুর্বল ইংরিজীতে অনুবাদ করবার চেষ্টা করতেই ডরোথির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও—তোমাকে অনুবাদ করতে হবে না। শোনো ঃ" আমাকে বিস্ময়মুগ্ধ করে ডরোথি হঠাৎ ইংরিজীতে আবৃত্তি করলেন ঃ

"Through the silent night
I hear the knowings at my heart
Of the morning's vogrant hopes
Sadly coming back."

"আপনি টেগোর পড়েছেন ?" আমার বিস্ময় কাটতে চাইছে না। থ্যাকারে ম্যানসনের ফিরিঙ্গি পরিবেশে কোনো রবীন্দ্রভক্ত পাঠিকাকে আবিষ্কারের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশাও আমার ছিল না।

মৃদু হেসে ডরোথি রসিকতা করলেন, "হোয়াট ডু ইউ থিংক ? রবীন্দ্রনাথ কি একমাত্র বাঙালীদের প্রপার্টি ?"

এরপর ডরোথি বললেন, "দেখি তুমি কেমন রবীন্দ্রনাথকে ভালবাস ? আমার প্রিয় একটা কবিতা বলছি শোনো !

In the shady depth of life
Are the lonely nests
Of unutterable pains.

ইয়ংম্যান, এর বাংলা শোনাতে পারো আমায় ?"

ভাগ্যক্রমে লাইন ক'টা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম ঃ

"নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায়
নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যথা
একা একা বাস করে।"

সন্তুষ্ট হলেন ডরোথি ওয়াট। বললেন, "আমি বাংলা পড়তে পারি না কিন্তু কিছুটা বুঝতে পারি। আমার মনে হচ্ছে তুমি ফুল মার্ক পেয়েছো।"

ডরোথি ওয়াট সেই সকালে খুব খুশী মনে ছিলেন। বললেন, "এই ভোর বেলাটা ছাড়া দিন-রাতের কোনো অংশ আমার ভাল লাগে না। ইট ইজ এ ওয়ান্ডারফুল টাইম।"

ডরোথি এরপর ছাড়লেন না। বললেন, "চলো আমার ফ্ল্যাটে—তোমাকে এক কাপ পিওর দার্জিলিং চা খাওয়াবো, আমার এক ছাত্রী পাঠিয়েছে। ম্যারেড টু এ দার্জিলিং টি প্লানটার।"

অপরিচিত ভাড়াটের সঙ্গে এই ধরনের অন্তরঙ্গতা উচিত কি অনুচিত তা ভাববার সময় পেলাম না। আমি ডরোথি ওয়াটের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

সকালবেলায় আমার প্রিয় পানীয় চা না কফি তা জানতে চাইলেন ডরোথি। আমি চায়ের পক্ষে ভোট দেওয়ায় আশ্বস্ত হলেন তিনি। বললেন, "চায়ের স্বাদ অবহেলা করে যারা কফির নেশায় ডুব দিয়েছে তাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। ওরা জানে না কী জিনিস হারাচ্ছে !"

হাঁটতে হাঁটতে ডরোথি ওয়াট বললেন, "আমার ফ্ল্যাটটা সাইজে এখানকার অন্য ফ্ল্যাটের থেকে ছোটো। কিন্তু আমার যা আছে তা অনেকের নেই। পূর্বদিকটা একেবারে খোলা। জানালা খুলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি গ্লোরিয়াস সানরাইজ দেখতে পাই। এই সানরাইজ দেখলে মনে হয় এর থেকে ভাল ফ্ল্যাট পৃথিবীর কোথাও নেই!"

আমরা দুজনে ডরোথির ফ্ল্যাটের সামনে এসে পড়েছি। দরজার গোড়ায় এগারো নম্বরটা পিতলের অক্ষরে সোনার মতো ঝলমল করছে। নম্বরটা যে নিয়মিত ব্রাশোর সাহায্যে ঘসা-মাজা হয় তা বুঝতে দেরি হলো না।

ডরোথি ওয়াট বললেন, "এই এগারো নম্বরটা আমার জীবনে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। আমি বাবা মায়ের এগারো নম্বর সন্তান। আমার বাবা রেলে কাজ করতেন—জামালপুর, ফেমাস রেলওয়ে সেণ্টার। আমার জন্ম তারিখ ১১ই, মাসটাও ১১ নম্বর—নভেম্বর। পাকেচক্রে এই এগারো নম্বর ফ্ল্যাটেই জীবন কাটাচ্ছি।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করতে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগেই ডরোথি ওয়াট বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও—এখনই বিস্ময় প্রকাশের সময় আসেনি। আমার বিয়ে হয়েছিল ১১ তারিখে এবং বিয়ের পরে আমরা যেখানে হনিমুন করতে গিয়েছিলাম সেখানকার হোটেলে আমাদের ১১ নম্বর ঘরে থাকতে দিয়েছিল।"

দরজা খুলে এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকতেই প্রথমে নজর পড়ে অনেকগুলো পাখির খাঁচা। এতোগুলো খাঁচা একই সঙ্গে কোনো বাড়িতে ঝুলতে বড় একটা দেখা যায় না।

ডরোথি ওয়াটের ঘরে আসবাবপত্রের বালাই নেই বললেই চলে। একটা সোফা সেটও নজরে পড়লো না। গোটা কয়েক পুরনো হাতলভাঙা চেয়ার এবং একটা ছোট্ট টেবিল।

আমাকে চেয়ারে বসিয়ে ডরোথি ওয়াট বললেন, "আমার খাঁচাগুলো গুনে দেখবে নাকি?"

এক দুই করে এগারোতে গোনা শেষ হলো। ডরোথি ওয়াট ততক্ষণ উনুনে গরম জল চাপিয়ে দিয়েছেন। বললেন, "এগারোখানা খাঁচায় আমার ছেলেমেয়েরা এগারো রকম পাখি পুষতো। এখন খাঁচাগুলোই আছে—পাখি একটাও নেই। প্রাণ ধরে খাঁচাগুলো ফেলতে পারিনি। এদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার সময় কেটে যায়।"

আমি চুপ করে ওঁর কথা শুনছি। ডরোথি চায়ের কাপ সাজাতে-সাজাতে বললেন, "তুমি বিশ্বাস করবে না, মাঝে মাঝে মজার কাণ্ড হয়। ভোরবেলায় ঘুমের ঘোরে এইসব খাঁচা থেকে আমি পাখির শব্দ শুনতে পাই।

"আমার মেড সারভেণ্ট হেসে বলেছিল, আমি মাথার রোগে ভুগছি। কিন্তু বিলিভ মী, আজ ভোরবেলাতেও আমি মন দিয়ে শুনেছি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এগারো রকম পাখির ডাক আমি শুনেছি আর গুনেছি।"

"আপনার পাখি ভাল লাগে? আমাদের ছাদে অনেক সময় নাম-না-জানা সুন্দর পাখি হাজির হয়। আমাদের সুইপারের ছেলে মদনা সেদিনও ঝুড়ি চাপা দিয়ে একটা টুকটুকে টিয়া ধরেছে। আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

ডরোথি ওয়াট আমার প্রস্তাবে মোটেই উৎসাহ দেখালেন না। বললেন,

"তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ—কিন্তু খাঁচার পাখিতে আমার কোনো আগ্রহ নেই আর। আমি ক্রমশ হাল্কা হবার চেষ্টা করছি, আমি এখন পাখি নিয়ে কী করবো?"

ডরোথি ওয়াট এবার চায়ের পাত্র নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। বুঝলাম এ-বাড়িতে ডাইনিং টেবিল বলে বাড়তি কিছু নেই।

চা ঢালতে-ঢালতে ডরোথি বললেন, "তোমাকে একটা ভ্যালুয়েবল ছবি দেখাই। আমার স্বামী যে ইস্কুলে মাস্টারি করতেন সেখানে পোয়েট টেগোর একবার এসেছিলেন। ইস্কুলের এরিয়ার মধ্যেই তখন আমাদের কোয়ার্টার ছিল। সেদিনকার ফাংশনের খবর পেয়ে আমরাও গিয়েছিলাম।"

ডরোথি ওয়াট এবার ভিতরে চলে গেলেন এবং একখানা পুরনো অ্যালবাম উদ্ধার করে আনলেন।

বিবর্ণ অ্যালবামের পাতা উল্টোতেই ইংলিশ স্কুলের গ্রুপ ছবিটা বেরিয়ে এলো। মধ্যিখানে কবিগুরুকে চিনতে কোনো কষ্ট হলো না। তাঁরই পাশে যে সুন্দরী মহিলাটি গম্ভীর মুখে বসে আছেন তিনিই যে আজকের ডরোথি ওয়াট তা ভাবতে কিন্তু একটু কষ্ট হলো। নিষ্ঠুর সময়, সুন্দর জিনিসের ওপর তুমি বড়ই কুপিত। ফুল এবং নারীর সৌন্দর্য এতো অল্পসময়ের মধ্যে লণ্ডভণ্ড করে তুমি কী বিশেষ আনন্দ পাও?

ডরোথি ওয়াট আমার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী ভাবছো?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে বললাম: "কই কিছুই না তো!"

ডরোথি বললেন, "চা খাও। তোমাকে আর একটা মহামূল্যবান জিনিস দেখাবো। জিনিসটা যে আমার কাছে আছে তা কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না।"

কী এমন মহামূল্যবান জিনিস মিসেস ওয়াট এখানে আমাকে দেখাতে পারেন আন্দাজ করতে পারছি না।

মৃদু হেসে ডরোথি ওয়াট এবার ভিতরে চলে গেলেন। টয়লেটের লাগোয়া একটা বক্সরুম আছে এই ফ্ল্যাটে। সেখান থেকে ফিরে এলেন কয়েক মিনিটের মধ্যে, হাতে সেই 'মহামূল্যবান' সম্পত্তি!

দুর্লভ সম্পদই বটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত এক কপি ইংরিজী গীতাঞ্জলি। কাপড়ে বাঁধানো ম্যাকমিলান সংস্করণের প্রথম পাতায় চাইনীজ কালো কালিতে সেই বিখ্যাত হস্তাক্ষর: 'ফর ডরোথি অ্যাণ্ড আর্নল্ড ওয়াট'।

বইটা নেড়ে চেড়ে দেখলাম আমি। এর আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত কোনো বই আমার হাতে আসেনি। আমার চোখমুখ দেখেই ডরোথি আমার মনোভাব আন্দাজ করলেন। আনন্দে বললেন, "আমি গ্ল্যাড যে শেষ পর্যন্ত ঠিক লোককেই আমার এই মূল্যবান সম্পত্তি দেখিয়েছি। এর আগে মিসেস ভাবনানিকে আমি একবার বইটা দেখিয়েছিলাম। তিনি কোনো উৎসাহই দেখালেন না—বরং জিজ্ঞেস করলেন, স্বয়ং লেখক সই করলে কী হয়? বইয়ের দাম বেড়ে যায়?"

সাবিত্রী ভাবনানিকে চেনে না এমন লোক এই থ্যাকারে ম্যানসনে একজনও নেই। শুধু থ্যাকারে ম্যানসন কেন? চৌরঙ্গীর পূর্ব সীমানা পেরিয়ে সদর স্ট্রীটে পদার্পণ করলেই সাবিত্রী ভাবনানিকে না-চিনে থাকা শক্ত। উত্তরে

লিণ্ডসে স্ট্রীট, দক্ষিণে পার্ক স্ট্রীট, এদিকে চৌরঙ্গী ওদিকে ওয়েলেসলি স্ট্রীট—এই বিরাট বিস্ময়কর অঞ্চলে সাবিত্রী ভাবনানিকে এক ডাকে চেনা যায়। সান্ধ্যস্মরণীয়া এই মহিলার কথায় একদিন আসতেই হবে আমাদের।

কিন্তু এখন ডরোথি ওয়াটের সময়। সাবিত্রীর সঙ্গে ডরোথি ওয়াটের যে বিশেষ পরিচয় আছে তা জানবার সুযোগ তখনও পাইনি। কিন্তু বুঝলাম, গীতাঞ্জলির ব্যাপারে সাবিত্রী ভাবনানি আমাদের মিসেস ওয়াটকে দুঃখ দিয়েছেন। চাপা গলায় ডরোথি বললেন, "আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি যখন সাবিত্রী জিজ্ঞেস করলেন, টেগোর কি এখনও বেঁচে আছেন?"

ডরোথি জানালেন, "আমার স্বামী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। ওঁর ইচ্ছে ছিল, ভাল করে বাংলা শিখে টেগোরের লেখা একের-পর-এক ইংরিজীতে অনুবাদ করে যাবেন। প্রয়োজন হলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই কাজে ডুবে থাকবেন তিনি।"

ডরোথি এবার আমার শূন্য কাপে আরও একটু চা ঢেলে দিলেন। বললেন, "ভাল করে খেয়ে চা সম্বন্ধে মতামত দাও। কারণ চা বাগানে আমার ছাত্রীকে লিখতে হবে চা কেমন লাগলো।"

দ্বিতীয় কাপ নিঃশেষিত হবার আগেই আমাদের পরিচয় আরও নিবিড় হলো। রবীন্দ্র অনুবাদের কাজে হাত দেবার পরেই যে আর্নল্ড ও ডরোথি ওয়াটের জীবনে কোনো অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটেছিল তা আন্দাজ করতে পারলাম।

প্রথম দিন এই পর্যন্ত। ডরোথি ওয়াটের সঙ্গে আমার পরিচয়ের খবরাখবর পেয়ে তেলকালিবাবু কৌতুক করেছিলেন এবং হাল্কা মেজাজে বলেছিলেন, "ওই বুড়ীর খপ্পরে পড়লেন আপনি!"

খপ্পর কথাটা মোটেই ভাল নয়। তাই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। এই পাড়াটা এমনই যে নিজের মানইজ্জত বাঁচিয়ে বসবাসের জন্যে সারাক্ষণ চেষ্টা করে যেতে হবে।

একটু হেসে তেলকালি বললেন, "না, সেরকম ভয় পাবার নয়। তবে মেমসায়েব বকে বকে আপনার কান ঝালাপালা করে দেবেন। জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কবিতা পড়ো কিনা। ভাবতে পারেন! বুড়ী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবি ঠাকুরের কত কবিতা পড়েছো তুমি? বুঝুন, আমি থাকারে ম্যানসনের কর্মচারি। ভাড়াটে সামলাতে-সামলাতে আমার সময় কেটে যায়। কোন্ দুঃখে আমি ঘরের খেয়ে বনের কবিতা মুখস্থ করতে যাবো? রবি ঠাকুর পড়ে আমার কী দশ-বিশ টাকা রোজগার বাড়বে বলুন তো?"

এ-বাড়ির লোকেরা যাই বলুন, ডরোথি ওয়াটের প্রতি আমি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছি। সাডার স্ট্রীট এবং সাডার লেনের এই দমবন্ধ হয়ে আসা পরিবেশে কোনো অবাঙালিনী গভীর আগ্রহে এখনও নিয়মিত রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন ভাবতে আমি আনন্দিত বোধ করেছি।

দু-একদিনের মধ্যেই ডরোথি ওয়াটের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। এই বিরাট বাড়ির খোপে খোপে অসংখ্য নরনারীর বসবাস। কিন্তু তাঁরা অধিকাংশই তখনও আমার অপরিচিত। নিজে থেকে দরজার বেল টিপে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে আলাপ করতে গিয়েও রহস্যময়ী সুন্দরীর হাতে

বিড়ম্বিত হয়েছি। মাত্র মিসেস ওয়াটের এগারো নম্বর ফ্ল্যাটেই আমি নির্ভয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপতে পারি।

শব্দ শুনেই ডরোথি ওয়াট বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে বললেন, "ও তুমি!"

"আপনি অন্য কাউকে এক্সপেক্ট করছেন?" আমি বিনা নোটিশে হাজির হবার জন্যে অস্বস্তি বোধ করছি। এইভাবে হঠাৎ আসার জন্যে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি। কিন্তু ডরোথি ওয়াট আমার কোনো কথা শুনলেন না। বললেন, "আগে ভিতরে এসো তারপর সব শুনবো।"

ভিতরে ঢুকে আমি অস্বস্তি বোধ করছি না। কারণ এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার সস্নেহ ব্যবহারে এমন আন্তরিকতা আছে যা মানুষকে খুব কাছে টেনে আনে।

ডরোথি হেসে বললেন, "আমি আশা করছি অচেনা কেউ আজ এখানে আসবেন। তাই ঘর ছেড়ে বাইরে বের হচ্ছি না।"

অচেনা কে আসবেন, কেন আসবেন আমার জানবার কথা নয়। ডরোথি যদি নিজেই এ-বিষয়ে আলোকপাত করেন তাহলে আলাদা কথা. না হলে আমার দিক থেকে কৌতূহল দেখানো শোভন হবে না।

ডরোথি বললেন, "টেগোরের বইটা যে কতবার পড়েছি—অন্তত এ ফিউ থাউজেন্ড টাইমস। আজও মাঝে মাঝে বইখানা আমার বালিশের তলায় রেখে দিই। কখন প্রয়োজন হবে ঠিক নেই।"

কবিতার বই কী এমন জরুরি প্রয়োজন হতে পারে বুঝি না। কবিতার বই তো টেলিফোন ডিরেকটরির মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। সেখানে তো ফায়ার ব্রিগেড, পুলিস বা হাসপাতালের এমার্জেন্সি নম্বর লেখা নেই।

ডরোথি বললেন, "কখনও কখনও ফায়ার ব্রিগেড ডাকার চেয়েও এমার্জেন্সি অবস্থা হয় মনের। তখন লাইটনিং কল-এ টেগোরকে স্মরণ করি। মনের অবস্থা মতো কবিতা খুঁজে বের করে তখনই পড়তে শুরু করি। পড়ি। কখনও দুঃখের, কখনও বিশ্বাসের. কখনও বিস্ময়ের, কখনও টোটাল সারেন্ডারের, কখনও প্রদীপ জ্বালবার, কখনও আগুন নেভাবার ডাক পড়ে।"

ডরোথি আজও চায়ের ব্যবস্থা করলেন। বললেন, "তোমার কাছে আজও একটা অরিজিন্যাল বাংলা কবিতা শুনতে চাই।"

ইংরিজী গীতাঞ্জলি বইটা না খুলেই ডরোথি মুখস্থ বলতে লাগলেন:

"When the heart is hard and parched up
Come upon me with a shower of mercy,
When grace is lost from life,
Come with a burst of song."

সৌভাগ্যক্রমে মূল কবিতাটা সনাক্ত করতে পারলাম এবং অস্পষ্ট স্মৃতি থেকে ডরোথিকে শুনিয়ে দিলাম:

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন ডরোথি। মনে হলো ভাষা সম্পূর্ণ না বুঝেও প্রতিটা শব্দ তিনি মন্ত্রের মতো গ্রহণ করছেন।

ডরোথি এরপর বললেন. "যখন এই বইটা পেয়েছিলাম—তখন এর অর্থ বুঝিনি। হোয়াট এ ফুল আই ওয়াজ। পোয়েটের সঙ্গে যখন ইস্কুলে দেখা

হলো তখনও বুঝিনি হাউ গ্রেট হি ওয়াজ। বইটা পাবার পরেও তো কতদিন অনাদরে অবহেলায় পড়েছিল। তারপর ঈশ্বর যখন দুঃখ দিলেন 'হোয়েন মাই হার্ট ওয়াজ হার্ড অ্যান্ড পার্চড্ আপ' তখন 'হি কেম উইথ এ শাওয়ার অফ মার্সি'।"

ডরোথি এবার স্মৃতির অরণ্য ঠেলে অতীতে ফিরে চলেছেন। বললেন, "সে অনেকদিন আগেকার কথা। জানো, এই এগারো নম্বর ঘরেই তখন আমি উঠে এসেছি। আমার অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভয়ংকর সেই রাত্রে আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমি পুরো এক শিশি ঘুমের বড়িও যোগাড় করে এনেছিলাম। জীবন সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে আমার কোনো মমতাই ছিল না।"

ডরোথি স্নেহভরে ও সযত্নে একটা কাপে চা ঢেলে দিলেন। বললেন, "আমার সমস্ত কথা তোমাকে বলবো একদিন। তুমি বিশ্বাস করবে না। অপমান ও যন্ত্রণা চিরতরে এড়াবার জন্যে আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম। আমার বোন বারবারাকে একখানা চিঠিও লিখে ফেলেছিলাম। ঠিক সেই সময়, হঠাৎ ঈশ্বরের কী ইচ্ছায় গীতাঞ্জলি খুলে বসেছিলাম। তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার হঠাৎ মনে হলো, স্বয়ং ঈশ্বর কানে কানে আমার সঙ্গে কথা বলছেন।"

আমি ডরোথির মুখের দিকে তাকিয়ে বহুদিন আগের সেই বর্ষামুখর মৃত্যুমুখী সন্ধ্যার দৃশ্য মনের মধ্যে আঁকবার চেষ্টা করছি।

ডরোথি বললেন, "সেদিন জুলাই মাসের তেরো তারিখ। বাইরে প্রবল ঝড় উঠেছে। ছেলে ও মেয়ে হোস্টেলে চলে গিয়েছে; বারবারাই ওদের খরচা বহন করছে। বারবারা নিজেও হাসপাতালের ডিউটিতে পি-জিতে বেরিয়ে গিয়েছে। বুঝতেই পারছো আমার বোন ট্রেইনড নার্স ছিল। কোথাও পাকা-পাকি চাকরি করতো না সে। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের প্যানেলে ছিল। টেলিফোন অথবা কল বুক আসতো—অমুক হাসপাতাল বা অমুক নার্সিং হোমে প্রাইভেট নার্স দরকার। সেখানেই চলে যেতো সে।

"বারবারা তখনও জানে না আমার মনে কী বাসনা রয়েছে। আমি দরজা বন্ধ করে, বারবারাকে চিঠি লিখেছি। তারপর এই টেবিলেই স্লিপিং পিলের শিশিটা ও এক গ্লাস জল নিয়ে বসেছি। অদৃশ্য কারও ইঙ্গিতে কোন্ খেয়ালে হাতের গোড়ায় গীতাঞ্জলি টেনে নিয়েছি।"

ডরোথি ওয়াট বললেন, "হঠাৎ মনে হলো, পোয়েট টেগোর নিজেই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার কানে-কানে ভোরবেলার সূর্য ওঠার গান গাইছেন তিনি।

"আমার তখন অভিমানের শেষ নেই। যিনি তাঁর ভক্ত ছিলেন, আমার স্বামী সেই আর্নল্ডই আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ইস্কুলের প্রাইমারী সেকশনে একজন বাঙালী টিচার এসেছিলেন সোনালী বাসু। সেই সোনালী বাসুর সঙ্গে আমার স্বামী রবীন্দ্রচর্চা শুরু করলেন। সোনালী আমাদের বাড়িতে আসতেন, আর্নল্ডের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেগোরের সাহিত্য আলোচনা হতো। সাহিত্য আলোচনা বলে, আমি কখনও অন্য চিন্তা করিনি। আমার মনের মধ্যে কোনো সন্দেহও হয়নি।"

এই সোনালীর সঙ্গে বসে-বসে টেগোরের একটা গল্পও আর্নল্ড

অনুবাদ করেছিল। সোনালী বাংলা পড়ে যেতেন, আর্নল্ড বুঝে নিতো, তারপর বিভিন্ন শব্দ সম্বন্ধে দুজনের মধ্যে আলোচনা হতো, এবং শেষে ইংরিজী লাইন কটা লেখা হতো। "সোনালীকে সামনে বসিয়েই আমার স্বামী পুরো গল্পটা আমাকে শুনিয়েছিল: 'দি রিটার্ন অফ খোকাবাবু'। ভারি মিষ্টি গল্প—গল্পের মধ্যে কোথায় একটা রহস্যময় ভাবও আছে আমার মনে হয়েছিল।

"তখন আমার মতো বোকা পৃথিবীতে বোধ হয় কমই ছিল। না-হলে এক ছেলে এবং এক মেয়ের মা হয়েও সহজ ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকলো না কেন? একদিন সকালে ইস্কুলের হেডমাস্টার আর্নল্ড এবং শিক্ষিকা সোনালী বাসু উধাও হলেন।"

একটু থামলেন ডরোথি। কতোদিন আগেকার কথা। কিন্তু অপমান আঘাতের ক্ষতটা এখনও শুকিয়ে যায়নি। ডরোথির মুখেই শুনলাম, সে এক মহা বিপদ। ইস্কুল এরিয়ার মধ্যে একই ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এরকম গুপ্ত প্রণয় করে তাঁর পক্ষে চাকরি রাখা যে সম্ভব হবে না তা বোধ হয় আর্নল্ড ওয়াট বুঝতে পেরেছিলেন। গোপনে গোপনে কখন যে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তাও কেউ জানতে পারেনি।

একদিন সকালে সোনালী বাসু হঠাৎ স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিলেন। ডরোথি ওয়াট বোকার মতো সোনালীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী হলো? হঠাৎ চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?" না জেনে-শুনে ডরোথি একথাও বলেছিলেন, "আমার স্বামীর খুব অসুবিধে হবে। আপনার সংগে ওর খুব ইনটেলেকচুয়াল মিল হয়েছিল।"

সোনালী বাসু তখন চুপচাপ ছিলেন, একটা কথারও উত্তর দেননি।" ওঁর মুখ দেখেও সরলমনা ডরোথি কিছু বুঝতেও পারেননি। বুঝতে পারলে, ডরোথি কেন স্বামীকে বকবেন, বলবেন, "সোনালী বাসু যাতে ইস্কুল ছেড়ে না চলে যান তার জন্যে তোমার চেষ্টা করা উচিত ছিল।"

স্বামী আর্নল্ড তখন নিরপরাধ শিশুর মতো এমন মুখ-চোখের ভাব করেছিলেন যে কার সাধ্য বোঝে ভিতরে-ভিতরে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

এরপর বজ্রপাত হয়েছিল। একদিন সকালে আর্নল্ড ওয়াটও অকস্মাৎ উধাও হয়েছিলেন। যাবার আগে স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস হয়নি আর্নল্ডের। লম্বা চিঠি লিখে রেখেছিলেন। বউকে জানিয়েছিলেন, সোনালীকে তিনি পাগলের মতো, অবুঝের মতো ভালবেসে ফেলেছেন। ব্যাপারটা জানাজানি হলে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের এবং ইস্কুলের ক্ষতি হতে পারে, তাই তিনি কর্মসন্ধানে হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছেন। ডরোথি যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।

"ক্ষমা!" ডরোথি বললেন, "এমন বিপদে জীবনে যেন কেউ না পড়ে। রাতারাতি শুধু স্বামী নয়, মাথা গুঁজবার আশ্রয়টুকুও হারাতে হলো।"

সেই বিপদের সময় বোন বারবারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ডরোথির। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন ইস্কুলে। সেখান থেকে মালপত্তর ট্রেনের ওয়াগনে বোঝাই করে ডরোথি ও তাঁর ছেলেমেয়েকে এনে তুলেছিলেন এই থ্যাকারে ম্যানসনে।

আর সোনালী বাসুকে নিয়ে আর্নল্ড ওয়াট চলে গিয়েছিলেন হয়তো

দূরদেশের কোনো এক অখ্যাত ইস্কুলে।

মনের এই অবস্থায় অবহেলা-অপমানে জর্জরিত ডরোথি আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওপরেও তীব্র বিরক্তি জমেছিল ডরোথির মনে। তাঁকে কেন্দ্র করেই ওয়াট পরিবারের আঙিনায় বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল। ইস্কুলের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার থ্যাকারে ম্যানসনে এসে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত গীতাঞ্জলির দিকে তাকিয়েও দেখেননি ডরোথি। একবার ইচ্ছে হয়েছিল যাবার আগে বইটাকে তিনি নিজের হাতে আগুনে পুড়িয়ে যাবেন।

কিন্তু কী ছিল বিধাতার মনে, পুড়োবার আগে বইটা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই দুঃখ-শোকের ঊর্ধ্বলোকে নবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন ডরোথি।

এইভাবে অনেকদিন ডরোথি নিশ্চয় কারও কাছে নিজেকে খুলে ধরেন নি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেদিন রাত্রে বাড়িতে বিজলী বাতি নেই। কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে কোনোরকমে বর্ষার রাতকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি। এমন সময় মনে হলো, স্বয়ং টেগোরই অস্পষ্ট ছায়ার মতো আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি প্রথমে অভিমানে মুখ সরিয়ে নিয়েছিলাম, জীবনে আমার কোনও আকর্ষণ নেই। অপমানের জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

ডরোথি এবার টেবিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুদূর অতীতের সেই অস্পষ্ট ঘটনাটি আবার স্মরণ করবার চেষ্টা করছেন। "তোমরা কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে না ; কিন্তু সেই রাতে স্বর্গীয় এক কণ্ঠস্বরে আমি অনির্বচনীয় বাণী শুনেছি। ডরোথি নিজেই এবার ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন,

"In one salutation to Thee, my God, let
All my senses spread out and touch this
World at thy feet.........
Like a flock of homesick cranes flying
Night and day back to their mountain
Nests, let all my life take its voyage to its
Eternal home in one salutation Thee."

এক ভগ্নহৃদয়া বিষণ্ণনয়না রমণীর অন্তরে কোনো ভিন্নভাষী কবির বাণী যে এইভাবে অমর হয়ে থাকতে পারে তা ডরোথি ওয়াটকে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।

ফ্ল্যাটবাড়ির ম্যানেজারি করতে এসে এইভাবে যে আলাপ হবে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। মনে-মনে রবীন্দ্রনাথকেই নমস্কার জানিয়েছি। তাঁর দু' একটা কবিতা মুখস্থ না থাকলে ডরোথি ওয়াট এইভাবে আমাকে আপন করে নিতে পারতেন না। ডরোথির সঙ্গে সেদিন হয়তো আরও কথা হতো। কিন্তু ইতিমধ্যে ১১ নম্বর ফ্ল্যাটের বৈদ্যুতিক বেলটা কর্কশভাবে বেজে উঠলো।

ডরোথি ওয়াট এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই এক অপরিচিত ছোকরা আধা-হিন্দি আধা ইংরিজীতে ডরোথিকে সুপ্রভাত জানালো।

ছোকরা এবার জিজ্ঞেস করলো, "এইটাই এগারো নম্বর ফ্ল্যাট ?"

"অবশ্যই এগারো নম্বর ফ্ল্যাট। সব জেনেই তো বেল টিপেছো বাছা," ডরোথি সস্নেহে উত্তর দিলেন।

ছোকরা এখনও একটু অস্বস্তি বোধ করছে। ওরই মধ্যে গৃহকর্ত্রীর অনুমতি না নিয়েই ভিতরের দিকটা অনুসন্ধানী নজরে দেখে নিচ্ছে।

ছোকরা এবার জিজ্ঞেস করলো, "ইংরিজি কথাবার্তা শেখানোর জন্যে লেডি-টিচারের বিজ্ঞাপন এখান থেকেই দেওয়া হয়েছিল ?"

ডরোথি ওয়াট নিজের বিজ্ঞাপনে কাজ হয়েছে বুঝে সানন্দে বললেন, "ইয়েস মাই বয়, এখান থেকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।"

ছোকরা এখনও আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেনি। একটা কাপড়ের পর্দার আড়ালে আমি এখনও চায়ের শেষ চুমুকটা উপভোগ করছি।

ছোকরা এবার জিজ্ঞেস করলো, "প্রাইভেট লেস্নের ব্যবস্থা আছে কি না ?"

ডরোথি ওয়াট একগাল হেসে বললেন, "যদি তুমি দলের মধ্যে না বসে একলা লেস্ন নিতে চাও অবশ্যই তার ব্যবস্থা হবে।"

কীরকম রেট জানতে চাইছে ছোকরা। "রেট খুব রিজনেবল। না-হলে এ দেশের ইয়ংম্যানরা কেমন করে ইংরিজি বলার ট্রেনিং পাবে ?" ডরোথি তাকে আশ্বস্ত করলেন।

এর পর ছোকরাটির কী হলো কে জানে।

দরজা বন্ধ করে শুকনো মুখে ডরোথি ওয়াট ভিতরে ফিরে এলেন।

ডরোথি মুখ গম্ভীর করে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ। ছেলেটির শেষ প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারলাম না। ছোকরা জিজ্ঞেস করলো, যিনি লেস্ন দেবেন তিনি কোথায় ?" বললাম, "কোথায় আবার তিনি ? তোমার সামনেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।"

"কী যে হলো জানি না। আমার কথা শুনেই ছোকরা অ্যাবাউট টার্ন করে ফিরে গেলো। যাবার সময় সামান্য ধন্যবাদের সৌজন্যও দেখালো না।"

ব্যাপারটা আমার কাছেও খারাপ লাগলো। বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে এতখানি এসে সকালবেলায় বিজ্ঞাপনদাত্রীর মনে এইভাবে আঘাত দিয়ে চলে যাবার কোনো মানে হয় না।

ডরোথি ওয়াটের ইংরিজী উচ্চারণও সুন্দর। টিপিক্যাল টোটি লেন উচ্চারণ বলতে যে-ইংরিজী কানে ধাক্কা দেয় তার সঙ্গে ডরোথি ওয়াটের বাচনভঙ্গীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ডরোথির মুখেই শুনেছি, তাঁর বাবা যথাসম্ভব ভাল ইস্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেই ইস্কুলে কয়েকজন বিদুষী বিদেশিনী ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষিকা ছিলেন।

এগারো নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখেই মদনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। এ-বাড়ির সুইপারের ছেলে। থ্যাকারে ম্যানসনেই সুইপারপুত্র মদনার জন্ম এবং এখানেই সে বড় হয়ে উঠেছে। পুরোপুরি থ্যাকারে প্রোডাক্ট বলতে মদনাকেই বোঝায়। হিন্দিতে মদনার দখল কতখানি জানি না ; কিন্তু বাংলাটা সে চমৎকার আয়ত্ত করেছে। কোনো প্রকার ট্যুইশন

না-পেয়েও স্পোকন ইংলিশটাও যে অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছে তার মগজ যে বেশ সরেস তাও স্বীকার করতে হবে।

মদনার অন্যান্য গুণাবলির পরিচয় যথাসময়ে পেশ করা যাবে। মদনা নিজের জামাকাপড় সম্বন্ধে সব সময় সজাগ। সারাক্ষণ ফিটফাট থাকতে সে ভালবাসে। ছোকরার মাথায় এক ঝাঁক কোঁকড়া চুল—কিন্তু অবাধ্য চুলকে সে সম্পূর্ণ সামলে রেখেছে বিশেষ কোনো ক্রিমের সাহায্যে। ওর চুলের জেল্লাই অন্যরকম। যে-যুগের কথা বলছি, তখন চামড়ার কটিবন্ধনের বড় দুর্দিন। সুবিশাল ভুঁড়ির মালিক এবং ট্রাফিক কনস্টেবল ছাড়া অন্য কেউ তখন কটিদেশে বন্ধনী ব্যবহার করতেন না। (ফ্যাশনের প্রবক্তারা কোমরবন্ধনী নিয়ে পর্যায়ক্রমে এমন গ্রহণ ও ত্যাগের লীলাখেলায় মত্ত হন কেন জানি না!) অনাগত ফ্যাশনের আগাম হাওয়া বোধ হয় মদনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তার সুশাসিত কোমরে একটি চকচকে চামড়ার বেল্ট শোভিত থাকতো, দূর থেকে যা দেখলে মনে হতো একটি কালো সাপ। মদনা নিজেই বলেছিল, "একেবারে ফোরেন জিনিস, স্যার।" ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে উইলিয়াম মেকপিস্ থ্যাকারের পবিত্র জন্মস্থানের সামনে এক ফূর্তিবাজ মার্কিন যুবক মদনার দালালি-সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে এই বেল্টটি নিজের কোমর থেকে খুলে তাকে উপহার দিয়েছিল।

মদনা আমাকে দেখেই বিনীত নমস্কার জানালো।

মদনার সঙ্গে এই মুহূর্তে আর একটি ঝকঝকে বুশ শার্ট পরিহিত যুবক। এই ছোকরার হাতেও আজকের সকালের ইংরিজী কাগজ। মদনা তাকেও ডরোথি ওয়াটের ১১নং ফ্ল্যাটের নির্দেশ দিয়ে দিলো।

একটু আগেই যে-যুবকটি অজ্ঞাত কারণে কোনো প্রকার উৎসাহ না দেখিয়ে ফিরে গিয়েছে, মদনা তাকেও লক্ষ্য করেছে।

মদনাকে অনুরোধ করলাম, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে। মনে হচ্ছে, ডরোথি ওয়াটের বিজ্ঞাপন দেখে কিছু ইংরিজী শিক্ষার্থী আজ হাজির হবেন।

মদনা এক কথায় রাজী হয়ে গেলো। তার সহানুভূতি উদ্রেকের জন্যে বললাম, "এগারো নম্বরের মেমসায়েবের যদি একটু উপকার হয়।"

এবার আমার অবাক হবার পালা। মদনা বললো, "আপনি যখন হুকুম করেছেন, তখন সমস্ত দিন এখানে ডিউটি দেবো। তবে মেমসায়েবের কিছু লাভ হবে না, স্যর। ফালতু লোক এসে আলটু-ফালটু খোঁজ করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কেটে পড়বে।"

মদনার কথা আমার ভাল লাগছে না। কলকাতা শহরে কত লোকই তো স্পোকন ইংলিশ শেখবার জন্যে উৎসাহী। জাপানে তো শুনেছি, মিলিয়নেয়ার হবার সহজ উপায় হলো হাউ টু স্পিক ইংলিশ নামে বই লেখা। আমাদের দেশের অবস্থাও ক্রমশ তাই হয়ে উঠছে। ইংরিজীতে যারা দু'কথা গুছিয়ে বলতে পারে না চাকরিবাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যে তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। এমন কি ইংলিশ স্পিকিং আয়া এবং গৃহভৃত্যও নির্ধারিত বাজার দরের ডবল রোজগার করে।

কিন্তু মদনার নৈরাশ্য কমবার লক্ষণ নেই। আর একজন মধ্যবয়সীকে সে ইতিমধ্যেই ১১ নম্বর ফ্ল্যাটের পথ নির্দেশ করলো। তারপরেই বললো,

"দেখুন স্যর। ইনিও যদি এখনই ফিরে না আসেন তা হলে ওই নেড়ি কুত্তাটাকে মদনা বলে ডাকবেন।"

আমার কৌতূহল বেড়ে উঠছিল। ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষার জন্যে মদনার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পাঁচ মিনিটও সময় লাগলো না, মুখ বেজার করে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

মদনার চোখ চনমন করে উঠলো। "দেখলেন তো স্যর। পার্টি দেখলেই বুঝতে পারি, কে পাঠশালা খুঁজছে আর কে কালীবাড়ি খুঁজছে।"

পবিত্র কালীবাড়ি শব্দটা জীবনে এই প্রথম আমার কাছে রহস্যময় ঠেকছে। এ পাড়ায় কালীবাড়ি কোথা থেকে আসবে? মদনা আমার হাব-ভাব দেখে নিজেই ভুল ভাঙিয়ে দিলো। সলজ্জভাবে, বেশ দ্বিধার সঙ্গে বললো, "কিছু মনে করবেন না স্যর। আপনি গুরুজন। কোডে বলে ফেলেছি। আমাদের এ-পাড়ায় কালীবাড়ি মানে প্রাইভেট আননদোবাজার।"

এরপর তার নিজস্ব সংলাপে মদনা আমাকে যা বললো, তার অর্থ, মিসেস ডরোথি ওয়াটের বিজ্ঞাপনে লেডি টিচার শব্দটি থাকায় এবং ঠিকানাটি সদর লেনের থ্যাকারে ম্যানসন হওয়ায়, স্থানমাহাত্ম্যে কিছু বিপথগামী পুরুষের কাছে বিজ্ঞাপনটি অন্য ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। বড় বড় শহরে শ্রেণীবদ্ধ কলামে কোন্ বিজ্ঞাপনের কী গোপন অর্থ হয় তা জানতে হলে দীর্ঘদিনের গবেষণা প্রয়োজন। পাকেচক্রে এবং অজ্ঞানতা-বশত শিক্ষিকার বিজ্ঞপ্তি তাই দেহ-সন্ধানী ব্যক্তিদের টেনে আনে। ডরোথি ওয়াটের উচিত ছিল বক্স নম্বরে বিজ্ঞাপন দেওয়া, তা হলে দিন দুপুরে এইভাবে হাঙ্গামায় পড়তে হতো না তাঁকে।

মদনা তার বক্তব্য আমার কাছে নিবেদনের সময় বেশ কয়েকটি অভি-নব শব্দ প্রয়োগ করেছিল। প্রচলিত বাংলায় এইসব শব্দের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই।

মদনার দ্রুত কথোপকথনের মধ্যে যে শব্দমালাটি আমার কাছে রহস্য-ময় মনে হয়েছিল সেটি হলোঃ 'সাইনবোর্ডওয়ালা খাপচু টমাটো।' টমাটো অর্থে মোটাসোটা, খাপচু অর্থে সুন্দরী এবং সাইনবোর্ড অর্থে যে বিবাহিতা রমণী তা জানবার পরে দিনদুপুরে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো!

ডরোথি ওয়াট যে এর আগে কোনোদিন প্রাইভেট ট্যুশানির বিজ্ঞাপন দেননি তা বুঝতে পারলাম এবং খাপচু টমাটো সন্ধানী নাগরিকদের বারংবার আবির্ভাবে তাঁর মানসিক অবস্থা কী হবে তা ভেবে বেদনা বোধ করলাম। এই অবস্থায় মদনা সাহস ভরে প্রস্তাব করলো, "আপনি কাজে যান, স্যর। কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমি এখানেই প্রত্যেকটি পার্টিকে ছাঁকনি করে ফেলবো। খেলার খোঁজে বেরিয়েছে বুঝলে এখান থেকে নগদ বিদায় করে দেবো, বুড়ী মাকে আর কষ্ট পেতে হবে না।"

যে কোনো কারণেই হোক বরদাপ্রসন্ন ডরোথি ওয়াট সম্পর্কে বিশেষ সন্তুষ্ট নন। তিনি সোজাসুজি বললেন, "দেখবেন স্যর! দু একখানা পদ্য শুনে যেন গলে যাবেন না। এসব বুড়ী কখনই সুবিধের লোক হয় না। এদের মনে যে কী থাকে তা ডুবুরি নামিয়েও জানতে পারবেন না।"

বরদাপ্রসন্ন শুনিয়ে দিলেন, “বড় ডিফিকাল্ট কেস মশায়। ফ্যামিলিটাও যেন কেমন। এই ফ্ল্যাট রয়েছে বারবারা উড-এর নামে। উড তো উড! এমন কেঠো মেমসায়েব বড় একটা নজরে পড়ে না। এই উড মেমসায়েবেরও এখানে ফ্ল্যাট প্যাবার কথা নয়। কিন্তু সেবারে আমাদের মালিকের শ্বাস রোগ হলো। বুকে বালিশ দিয়ে সারারাত শ্যামবাজারের বাড়িতে জেগে থাকতেন। সেই সময় এই উড মেমসায়েব প্রাইভেট নার্সিং-এ যেতেন। কী করে এই মেমসায়েবকে মালিক সহ্য করতেন ভগবান জানেন, ওই মূর্তি দেখলে তো রোগ বেড়ে যাবার কথা। যাই হোক মেমসায়েব তাল বুঝে ভালই ম্যানেজ করলেন—এবং নামমাত্র ভাড়ায় এসে উঠলেন এই এগারো নম্বর ফ্ল্যাটে।”

গলার সর্দিটা পরিষ্কার করে নিয়ে বরদাপ্রসন্ন বললেন, “ঐটুকু ফ্ল্যাট —জাস্ট একজনের জন্যে তৈরি। তা মশায়, আগে থেকে নিশ্চয় মতলব ভাঁজা ছিল। বারবারা উড একদিন গাই বাছুর সমেত এই ওয়াট মেম-সায়েবকে এনে তুললেন। আমাদের বললেন, নিজের বোন। কিন্তু আমরা কি আর মানুষ চিনি না! একই গাছে কি আম আর আমড়া একই সঙ্গে হতে পারে? দেখলেন তো ওয়াট মেমসায়েবকে। বয়সকালে আরও সুন্দরী দেখতে ছিলেন। উড মেমসায়েবের কথা কী বলবো আপনাকে, ঠিক যেন অমাবস্যার কালী। তবে উড মেমসায়েবের একটা গুণ ছিল—কর্মচারিদের কলেরা টাইফয়েডের ইনজেকশন বিনা পয়সায় দিয়ে দিতেন।”

বরদাপ্রসন্ন আরও যা খবর দিলেন তার সারাংশ হলোঃ এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের কেসটা বেশ গোলমেলে হয়ে আছে। বারবারা উডকে এখন আর দেখা যায় না। যতদূর মনে হয় তিনি ভাল কাজকর্মের সন্ধান পেয়ে কানাডা না অস্ট্রেলিয়ায় চলে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বোনের ভাড়াটে থাকবার কোনো অধিকার জন্মায় না। কিন্তু ডরোথি ওয়াট তো গ্যাঁট হয়ে ১১ নম্বর অকুপাই করে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, সঙ্গে সঙ্গে উকিলের শেখানো বুলি কপচাবেনঃ “হ্যাঁ, বারবারা উড এখন কলকাতায় নেই তা ঠিক। কিন্তু সে মাত্র কিছুদিনের জন্যে। আমি এখন তাঁর ঘরদোর দেখাশোনা করছি—বারবারা উড নিজেই আপনাদের ভাড়া গুনছেন এবং তিনি ফিরে এলেন বলে!”

“কোত্থেকে ভাড়া আসছে, কে টাকা গুনছে, তা কী আর আমাদের জানবার উপায় আছে? এখন যা-দিনকাল পড়েছে, দয়া করে মাসের ভাড়াটা পেলেই বাড়িওলার সাতগুষ্টি ধন্য হয়ে যান।”

বরদাপ্রসন্ন আরও বলেছিলেন, “ফাইলটা এক সময় মন দিয়ে দেখে রাখবেন স্যর। অনেক পাপ করেছিলেন গত জন্মে। না-হলে এই থ্যাকারে ম্যানসনে ম্যানেজার হয়ে আসবেন কেন? কাগজগুলো পড়তে-পড়তে এবং ব্যাটাছেলে-মেয়েমানুষের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে এক সময় মনে হবে সমস্ত কলকাতা শহরে নর্মাল ফ্যামিলি একটাও নেই।”

তেলকালিবাবু আমাদের সামনে বসে একখানা পাখায় তেল দিচ্ছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করলেন, “এসব কি বলছেন হালদারমশাই? মানুষ মাত্তরই ভাল—থ্যাকারে ম্যানসনে মাথা গুঁজলেই কি তারা খারাপ হয়ে যায়?”

“...নে আর ভাগবত শুনিও না!” মুখের উপর উত্তর দিয়েছিলেন

বরদাপ্রসন্ন। "দুখানা পুরোনো পাখা অয়েলিং-এর প্রাইভেট কাজ দিলেই লোক ভাল হয়ে যায় তোমার কাছে।"

তেলকালি জিভ কেটে বললেন, "১১ নম্বরের পাখা সেরেছি বটে, কিন্তু মাতা মেরীর দিব্যি কখনও একটা পয়সা চার্জ করিনি। নেবো কী করে? সেবার ওই উড মেমসায়েবই তো মাঝ রাতে আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে বাঁচালেন—অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় মনে হচ্ছিল যাবার সময় এসেছে। উনিই তো যত্ন করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন—ফ্রি বেডে ভর্তি করিয়ে দিলেন।"

তেলকালি এবার দুঃখ করলেন, "বিপদে-আপদে উড মেমসায়েব মস্ত ভরসা ছিলেন, কিন্তু কপালে টিকলেন না। ফরেনে চলে গেলেন।"

বরদাপ্রসন্ন দুঃখ করলেন, "সায়েব মেমসায়েব বলে কোনো জিনিস আর এদেশে থাকবে না তেলকালি। যখন এ-পাড়ায় এসেছিলুম তখন সায়েব মেমে ছয়লাপ—রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটলে মেমসায়েবের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতো।"

তেলকালি একই সুরে মন্তব্য করলেন, "যা বলেছেন দাদা। প্রথমে খাঁটি সায়েবগুলো তল্পিতল্পা গুটোলো, তারপর আধুলি সিকি সায়েব-মেমদের মধ্যে দেশ ছেড়ে পালাবার হিড়িক পড়ে গেল। যে-রেটে এস্টক ক্লিয়ার হচ্ছে তাতে ফিরিঙ্গিপাড়াতেও লাল বাতি জ্বলতে আর দেরি নেই।"

তেলকালি আন্দাজ করতে পারছেন না কেন এঁরা দেশ ছেড়ে চলে যান। মুখ বেঁকিয়ে তিনি বললেন, "কীপিং সায়েবের বউ তো সেদিন বললেন এখানকার ক্লাইমেট সহ্য হচ্ছে না, অস্ট্রেলিয়া নাকি অনেক ভাল।"

বরদাপ্রসন্ন বিরক্ত হয়ে বললেন, "হা কপাল! নজর আলি লেনে যার জন্ম, রিপন লেনে লেখাপড়া, এলিয়ট রোডে বিয়ে-থা—তারও কিনা কলকাতার জল-হাওয়া সহ্য হচ্ছে না!"

তেলকালি বললেন, "বিলেত এবং অস্ট্রেলিয়ায় অনেক পয়সা, অঢেল সুখ।"

সুখ নিশ্চয় আছে, না-হলে, ওয়াট মেমসায়েবের ছেলে ও মেয়ে দুজনেই কেন ফরেনে কেটে পড়লো? কিন্তু যে-প্রশ্নটা এঁরা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তা হলো বোন এবং ছেলেমেয়েকে বিদেশে চালান করে বুড়ী ডরোথি ওয়াট কেন এখনও এই থ্যাকারে ম্যানসনের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন?

তেলকালি জিজ্ঞেস করলেন, "অস্ট্রেলিয়ায় কি ক্যানেস্তারা বলে একটা জায়গা আছে?"

মুখটিপে হেসে বললাম, "বোধ হয় ক্যানবারা—অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলি ক্যানেস্তারা তো বাংলা কথা, সায়েবরা তার মহত্ব বুঝবে কী করে! ওখানেই বারবারা উড মেমসায়েব রয়েছেন। বাড়ি কিনেছেন, গাড়ি হয়েছে। কী সুন্দর রঙীন ছবি পাঠিয়েছেন দিদির কাছে, দেখলে মনে হয় ঠিক যেন রূপকথার রাজবাড়ি। বুড়ী মেমসায়েব নিজেই ডেকে আমাকে ছবি দেখিয়েছেন।"

সবাইকে ছেড়ে বুড়ী ডরোথি ওয়াট কেন এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। ডরোথি ওয়া[illegible]সটার সম্পর্কেও এ অঞ্চলে কারুর তেমন ধারণা নেই। তেলকালি[illegible]।" [illegible]রই

নিয়েছেন ডরোথি বিধবা।

নিজের সুবিধের জন্যেই বরদাপ্রসন্ন বলেছিলেন, "নিজের বোন, নিজের ছেলে পড়ে রইলো বিদেশে, আর তুই বিধবা কীসের লোভে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে আছিস?"

ডরোথি ওয়াট মাঝে মাঝে আমার কাছে নিজেই চলে আসতেন। আমাকে দিয়ে দু একখানা চিঠি টাইপ করিয়ে নিতেন। ডরোথির চোখের অবস্থা মোটেই ভাল নয়—ছানির অস্বচ্ছ পর্দা ক্রমশ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে। ডরোথি বললেন, "এক সময় আমার নিজের টাইপরাইটার ছিল। এখন তোমাকে জ্বালাতন করতে খুবই লজ্জা হয়। কিন্তু বারবারা আমার সংবাদ প্রত্যাশা করে। চিঠির উত্তর না দিলে আমার ঘুম আসে না। আমার স্বামী আর্নল্ডও ওইরকম। প্রতিটা চিঠির উত্তর তিনি দেবেনই। ওই যে সোনালী বাসু—যে আমার সংসার ভাঙলো—সি ওয়াজ এ টোটাল স্ট্রেঞ্জার। হঠাৎ আমার স্বামীকে বাড়ির ঠিকানায় পার্সোনাল চিঠি দিয়েছিল—লেখাপড়া শিখে বসে আছি, ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসি, মাস্টারি করবার খুব ইচ্ছে। আর্নল্ডের মনটা এত নরম ছিল যে লোকের কষ্ট দেখতে পারতো না। তখনই চিঠি দিয়েছিল সোনালী বাসুকে, দেখা করবার জন্যে। সেই দেখাটাই কাল হলো।"

এসব কথার কী উত্তর দেবো? এতোদিনেও ডরোথি ওয়াট দাম্পত্য বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলতে পারেননি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই অফিসে একটা আদ্যিকালের টাইপ মেশিন আছে। মেশিনটা মোটেই ব্যবহার হয় না। বরদাপ্রসন্ন হাত থাকতে যন্তর দিয়ে লেখালিখিতে বিশ্বাস করেন না। তেলকালি দয়াপরবশ হয়ে যন্ত্রটা একদিন ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দরকার হলে ডাকবেন—বুড়ীকে আবার একটু তেলকালি খাইয়ে যাবো।"

এই মেশিনেই আমি ডরোথি ওয়াটের চিঠিপত্র টাইপ করে দিয়েছি। ডরোথির উত্তর টাইপ করবার সময় বিদেশ থেকে আসা বারবারা উড এবং জন ওয়াটের চিঠিগুলো আমার নজরে পড়েছে। মেয়ে মার্থাও এখন স্বামীর সঙ্গে ভেনেজুয়েলা না কোথায় রয়েছে।

মেয়েকে ডরোথি লেখেন, "তোমার চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। আমি এখানে ভাল আছি। কলকাতার আবহাওয়া এখন অতি চমৎকার। আমার কোনোরকম কষ্ট নেই।"

চিঠি টাইপ করতে করতেই আমার মনে পড়ে ডরোথি ওয়াটের অঙ্গে মাত্র দু'খানা ফ্রক দেখেছি। ওঁর গায়ে জড়ানো স্কার্ফখানাও বহুব্যবহারে বিবর্ণ হয়ে এসেছে। ওই স্কার্ফের দিকে আমাকে তাকাতে দেখে ডরোথি হেসে বলেন, "আমার স্বামী উপহার দিয়েছিলেন—যে বছর টেগোর আমাদের ইস্কুলে এলেন, সেইবার।"

কথার খেই হারিয়ে ডরোথি বলেন, "টেগোরকে কী উপহার দেওয়া হয়েছিল জানো? একখানা ছোট্ট কার্পেটের আসনে আমার স্বামীর কথা মতো পোয়েটের কবিতা নিজের হাতে এমব্রডারি করেছিলাম। লাইনগুলো আর্নল্ড কোথা্য় পেয়েছিলেন জানি নাঃ

"From the solemn gloom of the temple
Children run out to sit in the dust.
God watches them play and forgets the priest."

হস্তলিপির এই সুশোভন সূচীকর্ম পেয়েই যে কবিগুরু ইংরিজী গীতাঞ্জলির একটি কপি উপহার দিয়েছিলেন তাও শুনিয়ে দিলেন ডরোথি।

আমি ততক্ষণ অন্য একটা ফরেন এরোগ্রাম ফর্ম টাইপ মেশিনে চাপিয়ে ফেলেছি। বারবারা লিখেছেন, "জন এবং আমার দু'জনেরই ইচ্ছে ইণ্ডিয়ার পাট চুকিয়ে তুমি যথাশীঘ্র সম্ভব এখানে চলে এসো।"

ডরোথি লিখলেন, "আমার আদরের বোন বারবারা, তোমার পাঠানো টাকা পেয়েছি। এখানে আমার কয়েকজন ছাত্রী হয়েছে—তাদের আমি ইংরিজী শেখাচ্ছি। কলকাতার বড়লোক ইণ্ডিয়ান গৃহিণীদের একমাত্র মুশকিল তারা আমার ফ্ল্যাটে আসতে চায় না—সবাই বাড়ি বসে ইংরিজী শিখতে চায়। এখানে এখন চমৎকার সময়। পূর্বদিকের ব্যালকনিতে টবগুলোতে প্রতিদিন ফুল ফুটছে। আর এখানকার গ্লোরিয়াস সানরাইজ—তার কথা তোমাকে আর কী বলবো!"

ফেরার কোনো কথাই লিখলেন না ডরোথি। চিঠি টাইপ করা আমার কাজ, কিন্তু কোনো প্রশ্ন তোলা শোভন নয়। নিজের চোখের কথাও লিখলেন না ডরোথি অথচ এখন ওঁর যা অবস্থা তাতে প্রিয়জনের কাছে ফিরে গেলেই বোধ হয় ভাল করতেন। এ-দেশের প্রতি বিচিত্র এক মায়া রয়েছে ডরোথি ওয়াটের, দলে দলে লোক কেন দেশত্যাগী হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ডরোথির চোখের দৃষ্টি ক্রমশ বিপজ্জনক সীমায় এসে পৌঁছচ্ছে। এরই মধ্যে বড়লোকদের বউদের ইংরিজী শেখানোর জন্যে তাঁকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। অগতির গতি মদনা না-থাকলে আমার দুশ্চিন্তা আরও বাড়তো। মদনা ছেলেটি আমার কথার অবাধ্য হয় না। মেমসায়েবকে সে প্রতিদিন চৌরঙ্গীর ট্রামে তুলে দিয়ে আসে। ডরোথি অবশ্য বলেন "এসব দরকার নেই। আমি চমৎকার ফিট রয়েছি।"

মদনা নিজেও মজা পায়। আমার কাছে একদিন বলেই ফেললো, "বুড়ী যে অ্যাণ্ডা ব্যাণ্ডা কী সব বলেন, বুড়ীর বোধ হয় মাথার ঠিক নেই। বলেন কিনা. আমার এই শার্ট, আমার এই ফুচুকল (সিগারেট লাইটার) সুন্দর নয়। সুন্দর নাকি আমার মাথার চুল, সুন্দর আকাশের নীল রং, সুন্দর গড়ের মাঠের সবুজ ঘাস, সুন্দর সূর্যের আলো। শলা আকাশের রঙে, মাঠের ঘাসে কী সুন্দর আছে আমি বুঝতে পারি না!"

একদিন শুনলাম, ডরোথি ওয়াট ট্রাম থেকে নেমে ফেরবার পথে পড়ে গিয়েছেন। হাত পা ছড়েছে। রিকশওয়ালা ঈশ্বরপ্রসাদ দেখতে পেয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে এসেছে।

অন্য সময় হলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতাম। এ বাড়ির এই মানুষটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।

কিন্তু আমি নিজে এখন বেশ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছি। তীর্থযাত্রার আগে বরদাপ্রসন্ন এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের ফাইলখানা আমার দিকে এগিয়ে

দিয়েছিলেন। নামমাত্র ভাড়া, তাও চার মাস বাকি পড়েছে।

"চার মাস! আর আপনারা হাত-পা গ‍ুটিয়ে বসে আছেন?"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আপনার সঙ্গে এতো জানাশোনা। আমরা জানি নিশ্চয় আপনি একটা কিছ‍ু ব্যবস্থা করছেন।"

এই অপ্রিয় কাজ নিয়ে আমাকেই ১১ নম্বরে যেতে হবে। গীতাঞ্জলির আব‍ৃত্তি বন্ধ করে সঙ্গীতহীনা বৃদ্ধাকে মনে করিয়ে দিতে হবে, এ সংসারে ভাড়া বলে একটা অপ্রিয় দায় আছে। নিজ গ‍ৃহে যারা বসবাস করে না তাদের ভাড়া দিতে হয়।

তাগাদা জিনিসটা চিরদিনই অপ্রিয়। প‍ুরনো এক কর্মক্ষেত্রে তাগাদা-কারী এক দারোয়ানের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো—তার ম‍ুখ দেখলেই আমার মনের আলো ফিউজ হয়ে যেতো।

ডরোথি ওয়াট, আপনাকে বাকি ভাড়া সম্বন্ধে তাগাদা না দিয়েও আমি চালাতে পারি। কিন্তু তাতে আপনারই বিপদ এগিয়ে আসবে। আইনে অভিজ্ঞ বাড়িওয়ালা চাইবে আপনি স্বভাব-ডিফলটার হোন, যাতে আদালতের শরণ নিয়ে সহজেই আপনাকে উৎখাত করা যায়।

বাকি ভাড়ার কথা তুলতে গিয়ে আমার জিভ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু কর্তব্য এড়িয়ে যাবারই বা উপায় কী? এই থ্যাকারে ম্যানসন তো আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়—এখানকার কাউকে একদিনও বিনা ভাড়ায় রাখবার অধি-কার তো আমাকে দেওয়া হয়নি। এবার নিজেকেই নিঃশব্দ ভর্ৎসনা করলাম, "ভাঙা বাড়ির মাস-মাইনের অস্থায়ী ম্যানেজার, ওঠো, নিজের কাজ করো। শ‍ুধ‍ু প্রিয় কর্মে প্রিয় ভাষণের জন্য তোমাকে এখানে নিয়োগ করা হয়নি।"

এগারো নম্বরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে কিন্তু সঙ্কোচে ম‍ুখ খ‍ুলতে পারলাম না। টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে ডরোথি ওয়াট বসে বসে তখনও টেগোর পড়ছিলেনঃ

> Day after day, O lord of my life, shall
> I stand before thee face to face. With
> Folded hands, O lord of all worlds, shall
> I stand before thee face to face.

ডরোথির ছাত্রী সংখ্যা আরও কমেছে। চোখের অবস্থা কবে ভাল হবে তারও ঠিক নেই। ডরোথি প্রতিদিনই ডাকপিওনের দিকে তাকিয়ে থাকেন কবে বিদেশ থেকে কিছ‍ু টাকা আসবে।

বৃদ্ধার ম‍ুখে কিন্তু এখনও উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। বললেন, "আজ আমার ব্যালকনিতে একটা রঙীন পাখি এসে বসেছিল।"

ডরোথির ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হেঁটে থমকে দাঁড়ালাম। যে কাজের জন্যে এসেছিলাম সে প্রসঙ্গ তোলাই হয়নি। ফিরে যাবো কিনা ভাবছিলাম, এমন সময় মদনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। একগাল হেসে মদনা আমাকে স্যাল‍ুট করলো। "আপনি হ‍ুকুম দিয়েছেন স্যর, সেই জন্যে এগারো নম্বরের মেমসায়েবকে ঠিক দেখে যাচ্ছি।"

"বিদেশ থেকে কোনো টাকাকড়ি আসেনি মেমসায়েবের?" মদনা নিশ্চয় খবর রাখবে।

"কোথায় টাকা! ফরেন চিঠির জন্যে মেমসায়েব তো আমাকে আর ডাকপিওনকে জ্বালিয়ে মারছেন।"

মদনা এবার দাঁত বের করে বললো, "মেমসায়েবকে কিছু বলে আসতে হবে স্যর?"

এবার আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। যে কথা মুখে বলতে পারিনি তাই চিঠিতে লিখে দিলাম। যথাসময়ে ভাড়া আদায় না করতে পারলে আমারও যে বিপদ তাও সবিনয়ে জানিয়ে দিলাম ভদ্রমহিলাকে।

মদনার হাতে চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে খুবই দুঃখ পেলাম। আমার নিজের সঙ্গতি থাকলে পকেট থেকেই কিছু ভাড়া দিয়ে দিতাম।

চিঠিও পাঠিয়েও দুশ্চিন্তার অবধি নেই। বৃদ্ধা ডরোথির কী অবস্থা হলো জানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলাম।

পরের দিন মদনার সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভেবেছিলাম ভদ্রমহিলা হয়তো মদনার মাধ্যমে একটুকরো উত্তর পাঠাবেন। ব্যাপারটা মদনার জানার কথা নয়। কিন্তু দেখলাম, সে অনেক খবর রাখে।

মদনা বেশ নির্লিপ্তভাবে বললো, "কিছু ভাববেন না, স্যর। বাকি ভাড়ার একটা ব্যবস্থা শিগরি হবে।"

মদনার কথাবার্তায় আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি। শুধু ভেবেছি, ডরোথি ওয়াট কেন এইভাবে অভাব ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা একই সঙ্গে সহ্য করছেন?

আশ্চর্য ব্যাপার, তিন দিনের মধ্যেই ফল ফললো। মদনার হাতেই ডরোথি ওয়াট এক মাসের ভাড়া নগদ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তেলকালি বিশ্বাস একগাল হেসে সুর করে বললেন, "না চাহিতে কিছু যায় না পাওয়া এই দুনিয়ায়! নিশ্চয় কলকাঠি টিপেছেন, তাই সুড়-সুড় করে ভাড়া এসে গেলো।"

দুপুরের কাজকর্ম সেরে স্নানের জন্য নিজের ঘরে ফিরছি। টোটি লেনের এক মাদ্রাজি রেস্তোরাঁর সঙ্গে মাসিক ব্যবস্থা করেছি তারা দুপুরের খাবারটা টিফিন কেরিয়ারে দিয়ে যায়। নিজের হাত পুড়িয়ে রাঁধবার বিদ্যা আয়ত্তে না থাকায় দুঃখ হয়। বন্ধুবর সহদেব নিয়মিত সুখাদ্য সরবরাহের লোভ দেখিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করিনি—কখন কে কী বদনাম ছড়িয়ে দেয় তার ঠিক নেই।

যাবার পথে ডরোথি ওয়াটকে দেখতে পেলাম। নীল আকাশের নিচে, দুপুর রোদে তিনি একটা বেতের মোড়ার ওপর ফয়ারের ছায়ায় বসে আছেন। মুখোমুখি হতে বেশ লজ্জা লাগলো আমার।

ডরোথি আমাকে দেখে হাসলেন, ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরিয়ে যাওয়ায় শুভ অপরাহ্ন জানালেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, "আমি স্যরি, তোমাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছি। বাকি ভাড়াটা খুব তাড়াতাড়ি আমি শোধ করে দিতে পারবো।"

বললাম, "এই রৌদ্রে এখানে বসে আছেন?"

ডরোথি মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলেন, তারপর হেসে বললেন, "গ্লোরিয়াস ইণ্ডিয়ান সানসাইন—আমার খুব ভাল লাগছে।"

পরের দিন, বিকেলের পড়ন্ত বেলায় ডরোথি ওয়াটকে আবার বাড়ির

বাইরে দেখলাম। আমাদের আপিস ঘরের পাশে যেখানে একটু গাছের ছায়া আছে সেখানে বেতের টুলে চুপচাপ বসে আছেন। অনেকক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়ে ডরোথি তাঁর মুখখানি তামাটে করে ফেলেছেন।

ডরোথি আমার দিকে তাকিয়ে সেই পুরনো হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। এই সময় আমার হাতে তেমন কাজ থাকে না। কখনও কখনও এই সময় ডরোথি ওয়াটের ঘরে বসে কিছুক্ষণ গল্প করেছি। ওঁকে বললাম, "আজ হাতে তেমন কাজ নেই।"

কিন্তু ডরোথি ওয়াট কোনো উৎসাহ দেখালেন না। অন্যবারের মতো বললেন না, "চলো ইয়ংম্যান, আমার ফ্ল্যাটে বসে এক কাপ চা খাবে।"

এমনই হয়ে থাকে সংসারে। ভাড়ার তাগাদা করলেই বোধ হয় সম্পর্ক পাল্টে যায়।

আজকাল বেলা এগারোটা নাগাদ প্রায়ই ডরোথি মেমসায়েবকে একটা লেডিজ ছাতা হাতে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বেরিয়ে পড়তে দেখা যায়। চোখের যা অবস্থা তাতে বেশী দূরে যাওয়া উচিত নয়।—তবু মাঝে মাঝে তিনি গড়ের মাঠে গাছের তলায় বসে সময় কাটান। তারপর ফিরে এসে হয় থ্যাকারে ম্যানসনের ফয়ারের ছায়ায় না হয় আপিসের পাশে বটতলায় চোখে কালো চশমা লাগিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আরও এক মাসের বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দিতে এলেন ডরোথি নিজে। লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে রইল। এমনি-ভাবে খুব শীঘ্রই তিনি সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দেবেন—শুধু শুধু আমি অপ্রিয় চিঠি লিখে বসলাম।

আজ আমি কিছুটা অপরাধের স্খালন করতে চাই। দুপুরের কর্মহীন অফিস ঘরে একটাও লোক ছিল না। কোনো কথা না শুনে আমি দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। অনেক চা খেয়েছি ডরোথির ঘরে, আজ না হয় এক কাপ শোধ করা গেলো।

ডরোথি বললেন, "বাকি ভাড়ার জন্যে চিন্তা কোরো না।"

আমাকে লজ্জা দেবার জন্যেই কী ডরোথি ওয়াট এই প্রসঙ্গ তুলছেন?

অপমান গায়ে না-মেখে বললাম, "একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আপনার ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করবো।"

গম্ভীর হয়ে ডরোথি বললেন, "আগে থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না করে এসো না, আমি দুপুরে আজকাল বেরিয়ে যাই।"

"আজকাল চিঠি টাইপ করাতে আসেন না তো? আমার ওপর রাগ করেছেন আপনি?"

রাগ স্বীকার করলেন না ডরোথি। বরং বললেন, "বারবারার চিঠির উত্তর দিতে ইচ্ছে হয় না। সেই এক প্রশ্ন—কেন তুমি কলকাতায় পড়ে রয়েছো? এখানে চলে এসো।"

আমার সঙ্গে ডরোথির আজ আর সেই আন্তরিক সম্পর্ক নেই, থাকলে হয়তো বলতাম, "ওঁরা যা বলছেন তা শুনতে বাধা কী?"

ডরোথি ওয়াটের মুখের দিকে তাকালাম আমি। রোদে পুড়ে এবং ঘেমে নেয়ে ডরোথির তেল চকচকে মুখখানা বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ডরোথি এবার যেন কেমন হয়ে গেলেন। বললেন, "কলকাতা ছেড়ে

যাওয়ার কথাই ওঠে না। যখন সময় হবে তখন অবশ্যই যাবো।”

চায়ের আগে ঢক ঢক করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করলেন ডরোথি। “মে আই হ্যাভ অ্যানাদার গ্লাস অব ওয়াটার?”

আপিস ঘরের কুঁজো থেকে আমি আবার জল গড়িয়ে দিলাম। শ্রান্তিতে চোখ বুজলেন ডরোথি। “বারবারার ওপর আমার রাগ হয় সবচেয়ে বেশী। সে জানে আমি আর্নল্ডকে ডাইভোর্স দিইনি। সোনালী বাসু আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছিল, টাকার লোভও দেখিয়েছিল—কিন্তু আমি রাজী হইনি। কারণ, আমি জানি আর্নল্ডকে একদিন ফিরে আসতে হবে।”

কিসের বিশ্বাসে এতদিনের বিচ্ছেদের পর ডরোথি এ সব কথা বলছেন আমি জানি না। সংসারের জটিল নারীপুরুষ সম্পর্কের কতটুকুই বা বুঝি আমি?

ডরোথি বললেন, “চ্যাটার্জি দি অ্যাসট্রলজার আমাকে এই কথা বলে গিয়েছে। চ্যাটার্জি আমাদের ইস্কুলের কেশিয়ার ছিল। সোনালী বাসু আসবার আগেই সে লিখিতভাবে ফোরকাসট করেছিল আর্নল্ডের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ এবং মিলন হবে আবার।”

ডরোথির কণ্ঠস্বরে এবার অন্য এক ডরোথিকে আবিষ্কার করলাম—যার ছবি দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, এতোদিন এবং এতো দুঃখের পরেও যে স্বামীর অপেক্ষা করে আছে ‘তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে বলে।’

চায়ের কাপ শেষ করেই ডরোথি আপিস ঘর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজের সময় তিনি আমাকে আর ডিস্টার্ব করতে চান না। আপিসের জানলা দিয়ে দেখলাম, ফয়ারের তলায় লিফটের কাছে ছাতা খুলে তিনি তখনও নিশ্চল পাথরের মতো বসে আছেন।

দুপুরের কাজ শেষ করে ওপরে নিজের ঘরে ফিরবার পথে আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হলো! জিজ্ঞেস করলাম, “ঘরে যাবেন না?”

হেসে বললেন, “আরও একটু পরে।”

কয়েকদিন পরে দুপুর তিনটের সময়ে দেখলাম ডরোথি ওয়াট সেই একই ভাবে উঠোনের এক কোণে গাছের ছায়ায় বসে আছেন। সমস্ত পৃথিবীর দিনশেষের বিষণ্ণতা ওর চোখে জমে রয়েছে। কাছে গিয়ে জ্বালাতন করতে সঙ্কোচ হলো। হে যোগেন্দ্রাণী যোগাসনে বসি ঢুলু ঢুলু নয়নে কাহারে ধেয়াও?

সবে আপিস ঘরে এসে বসেছি, এমন সময় টি-বয় ছুটতে ছুটতে এসে বললো, “বাবু আসুন, মেমসায়েব পড়ে গিয়েছেন।”

ছুটে গিয়ে দেখি অপরাহ্নের অসহ্য সূর্যতাপে ডরোথি ওয়াট সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। ওই হাল্কা শরীরটা পাঁজাকোল করে আপিস ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম। তেলকালিবাবুও কাছাকাছি কোথাও ছিলেন, তিনিও ছুটে এসেছেন।

মুখে চোখে দু'একবার জলের ঝাপটা দিতেই ডরোথি ওয়াট নড়ে উঠলেন। বললেন, “আই অ্যাম অল রাইট।”

ওঁকে ওঁর ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু শরীরের এই

অবস্থাতেও ডরোথি কাতরভাবে বললেন, "এখন নয়—চারটের সময়।"

পাগল নাকি ভদ্রমহিলা! আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না। ১১ নম্বরের চাবি কোথায় ?

চাবি মেমসায়েবের কাছে পাওয়া গেলো না। ক্ষীণকণ্ঠে ডরোথি বললেন. "চাবি মদনের কাছে।"

কোথায় মদন ? চাবির সন্ধানে আমি বেরিয়ে গেলাম। এ-করিডর, ও-করিডর, এমন কি থ্যাকারে ম্যানসনের ছাদেও মদনাকে খুঁজে পেলাম না। মদনা হতভাগা হয়তো মেমসায়েবের ফ্ল্যাটেই বিশ্রাম করছে। এই আশঙ্কায় ছুটে গেলাম ১১ নম্বরে।

যা আন্দাজ করেছি, তাই! ১১ নম্বর ফ্ল্যাটে কোনো তালা ঝুলছে না। জোরে বেল বাজালাম। কোনো সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে এবং তিনগুণ জোরে অনেকক্ষণ বেল বাজালাম। এবারে ভিতরে মানুষের উপস্থিতির আওয়াজ পেলাম। কিন্তু দরজা খোলার কোনো লক্ষণই নেই।

মদনা কি ডরোথি মেমসায়েবকে বের করে দিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লো ?

দরজায় লাথি মারতে যাচ্ছি এমন সময়, একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের মুখ গেঞ্জিপরা অবস্থায় উঁকি মারলো। এক ঝলকে আরও একটি শিথিলবসনা বিভ্রান্ত বাঙালী বালিকাকেও দেখলাম মনে হলো।

দূরে ম্যানসন করিডরের এক কোণে একটা সতরঞ্চিতে মদনাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। তার সামনে একটা এলার্ম ঘড়ি।

হৈ হৈ-তে মদনাও উঠে এলো। আমি তখন সেই যুবককে জিজ্ঞেস করছি, "আপনারা কারা? এখানে আপনারা এলেন কী ভাবে ?"

মদনা ততক্ষণে অবস্থা আয়ত্তে এনে ফেলেছে। আমাকে দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। আমার পায়ে হাত দিয়ে সে বলছে. "পাঁচ মিনিটে আমি সমস্ত ঝুটঝামেলা বিদেয় করে দিচ্ছি—আপনি মেমসায়েবকে নিয়ে আসুন।"

তেলকালিবাবু ততক্ষণে ধরাধরি করে মেমসায়েবকে ওপরে তুলেছেন। এগারো নম্বরের পুরুষ ও মহিলা আগন্তুক মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তেলকালিবাবুর অভিজ্ঞ চোখে পুরো রহস্য ততক্ষণে ধরা পড়ে গিয়েছে। অর্ধচৈতন্য মেমসায়েবকে বিছানায় শুইয়ে, ফিস ফিস করে তিনি আমাকে বললেন, "এঁরা স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে না গেলে কিছুই করতে পারতেন না, স্যার।"

"কিছু বুঝলেন?" আবার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তেলকালি।

"আমি অন্য কিছু এখন ভাবতে পারছি না তেলকালিবাবু। এখন একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।"

তেলকালি বললেন, "সিম্পল ব্যাপার। এগারোটা থেকে চারটে এই পাঁচঘণ্টার জন্য খুব মোটা টাকায় এ-পাড়ায় ঘর ভাড়া দেওয়া যায়। ভীষণ ডিমান্ড। বুঝতেই পারছেন কেন! রাতের কলকাতা এখন যে দিনের কলকাতার কাছে হার মেনেছে! অন্ধকারের ব্যাপারগুলো এখন আলো থাকতে-থাকতেই সেরে নেবার রেওয়াজ এসেছে! টাকার অভাবে মেমসায়েব নিশ্চয়

মদনার খপ্পরে পড়েছেন—মাসিক পেমেন্টের বদলে মদনা দুপুরবেলায় এই ফ্ল্যাটের চাবির মালিক হয়ে যায়।”

ক'দিন ধরে দুপুরবেলায় মিসেস ওয়াটের একলা-একলা ঘুরে বেড়ানোর রহস্যটা এমনভাবে সমাধান হবে ভাবতে বুকের কাছটা মুচড়ে উঠলো। কিন্তু এই তো সংসারের নিয়ম।

মদনা ততক্ষণে ১১ নম্বর ঘরের সামনে থেকে কেটে পড়েছে।

নির্বাক নিস্তব্ধ আমি নতমস্তকে ডরোথি ওয়াটের বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ডরোথি ওয়াট এবারে চোখ খুললেন। আমার দিকে নিস্পলকভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডরোথির ঠোঁট নড়ে উঠলো। কাতর কণ্ঠে এবার ডরোথি বললেন, “তোমরা আরও দু' মাস আমাকে সময় দাও। তারপর আমি চলে যাবো। এসট্রলজার মিস্টার চ্যাটার্জি আমাকে লিখে দিয়েছিলেন, সামনের মাসের মধ্যেই আর্নল্ড তার ভুল বুঝতে পারবে—সে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে—আর ক'টা দিন তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।”

ডরোথি ওয়াটের ফ্ল্যাটের ঘটনা মধ্যরাতের দুঃস্বপ্নের মতো আমাকে ঘিরে ধরেছিল। যে ডরোথি ওয়াটকে এতোখানি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম তিনিও যে এমনভাবে উচ্চাসন থেকে নেমে আসতে পারেন তা হয়তো আমার কল্পনা করা উচিত ছিল। কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসনের এই জীবনধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে, তার প্রতিটি তরঙ্গের গোপন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে আমার এখনও সময় লাগবে।

ডরোথির ভাবমূর্তিকে আমি কীভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি তার পথ খুঁজছি পাগলের মতো। মনের মধ্যে কে যেন চুপি চুপি বললো, দ্বিপ্রহরের যে নেপথ্যনাটক এগারো নম্বর ফ্ল্যাটে অভিনীত হয়েছে ডরোথি তার খবরই রাখতেন না। হাজার হোক ইস্কুল মাস্টারের স্ত্রী, তাঁর পক্ষে মদনার কাজকর্ম সব জানা সম্ভব নয়।

সমস্ত রাগ ক্রমশ মদনার ওপর গিয়ে পড়েছে। তেলকালি বিশ্বাস আমাকে শান্ত করবার জন্যে বলেছেন, “মদনা কী করবে স্যর? দোষটা সময়ের। পাপের বোঝা যত বাড়ছে, তত এই শহরে দুপুরের ঘর ভাড়া চড়চড় করে উঠে যাচ্ছে। দু'তিন ঘণ্টা ফ্ল্যাটের চাবি অন্য কাউকে দিয়ে যদি মাসিক ভাড়ার ডবল টাকা পকেটে এসে যায় তাহলে ক'টা লোকের মাথা ঠিক থাকতে পারে?”

মদনা সেই যে উধাও হয়েছে, সে আমার কাছে আর আসছে না। আমার মুখোমুখি যাতে পড়তে না-হয় তার জন্যে সে নাকি পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মদনার বাবা ধুলোর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নাকের ওপর একটা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে আপন মনে থ্যাকারে ম্যানসনের প্রাইভেট প্যাসেজ ঝাঁট দিচ্ছিল। ভাবলাম, একবার ওকে ডাকি। কিন্তু তেলকালি বিশ্বাস বারণ করলেন। বললেন, “ছেলের কথা ওকে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যর। বেচারার এমনিই দুঃখের শেষ নেই। আমার কাছে এসে কতবার কান্নাকাটি করেছে। আসলে ছেলের গায়ে ক্যালকাটার হাওয়া লেগেছে। সে এখন ফিটফাট সায়েব সাজতে চায়। বংশের পেশায় তার কোনো উৎসাহ নেই।”

তেলকালিবাবুকে বিদায় দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ আপিস ঘরে বসে-

ছিলাম। ডরোথি ওয়াটের মুখটা এখনও বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কোন্ ইস্কুলের কোন্ অখ্যাত অ্যাসট্রলজারের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর ভরসা করে ডরোথি কেন এমনভাবে এতদিন বসে আছেন? ডরোথির স্বামী আর্নল্ড কি সত্যিই একদিন ফিরবেন?

ডরোথি চিন্তায় বোধ হয় বেশ অনেকক্ষণ বিভোর হয়ে ছিলাম, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে সংবিৎ ফিরে এল। শ্রীযুক্ত বাবু আর সি ঘোষ সশরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"কী স্যর? চিনতেই পারছেন না! ঝাড়া পাঁচটা মিনিট আপনার সামনে মিউজিয়মের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছি, আপনার খেয়ালই নেই! কী সব আকাশ পাতাল ভাবছেন?"

বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। সামনের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের অফিসিয়াল টেনাণ্ট আর সি ঘোষ মহাশয়কে বসতে বললাম।

"বসবার কি আর সময় আছে, স্যর। ছোটখাট কোম্পানিতে তো কাজ করেননি—প্রতিটা মিনিট নিংড়ে নিংড়ে বার করে নেয়!" দুঃখ করলেন শ্রীযুক্ত বাবু আর সি ঘোষ।

আর সি ঘোষ এবার সরাসরি অভিযোগ করলেন, "নিজের কাজকর্ম নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তার ওপর আপনি আবার কাজ বাড়ালেন।"

কাজ সত্যিই আমি একটু বাড়িয়েছি। রামসিংহাসনকে নির্দেশ দিয়েছি. চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়া ক্যাশে দিতে এলেও যেন জেঠমালানি কোম্পানির মুনিমজীর কাছ থেকে নেওয়া না হয়। রামসিংহাসন একটু গুঁইগাঁই করায় বলে দিয়েছি, এখন থেকে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া সরাসরি আমার কাছে জমা দিতে হবে।

আর সি ঘোষ বললেন, "অ্যাদ্দিন একভাবে চলে এল, এখন আপনি নিয়মকানুন পাল্টাচ্ছেন?"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, "কোনো জিনিসই চিরকাল একভাবে চলে না। তাছাড়া আমার অবস্থাটাও একটু বুঝুন। যাঁর নামে ফ্ল্যাট ভাড়া তাঁর কাছ থেকেই টাকাটা নেওয়া উচিত নয় কী?"

"আমাদের গুষ্টিতে সাতজন্মে একজনও উকিল ছিলেন না. মশাই। এসব কোশ্চেনের উত্তর আমি কী করে দেবো? শুধু বুঝেছি. আমার কাজ বাড়লো। রেগুলার আপনার সঙ্গে দেখা করে এই ভাড়ার টাকাটি জমা দিয়ে যেতে হবে।"

আর সি ঘোষকে বিব্রত করা বা কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এ-ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া হয়নি। শুধু গণপতিবাবু বলেছিলেন, "আইনে যা হয় হবে. এখন পার্টিকে একটু ল্যাজে খেলাও"। সেই পরামর্শ অনুযায়ী চৌত্রিশ নম্বরের লেনদেন থেকে রামসিংহাসনকে আমি দূরে রাখতে চাই।

ঘোষ মশায়কে প্রশ্ন করলাম, "আপনি বলুন. এই বাড়িটা আপনার নিজের হলে, রামের ভাড়া আপনি শ্যামের কাছ থেকে নিতেন?"

"এ-বাড়ি আমার হলে কী আর বাঁচতাম, স্যার! ভাড়াটের নম্বর গুণে এবং মাসিক ভাড়ার অঙ্ক কষে আনন্দেই হার্ট ফেল করতাম।"

একটু থামলেন আর সি ঘোষ। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা দশ টাকার নোট বার করতে করতে বললেন. "আমরা শুনেছি. যত গণ্ডগোল চেক থেকে। চেক দেখেশুনে নিতে হয়। কিন্তু ক্যাশ টাকা গ্যাঞ্জেস ওয়াটার.

ওতে কোনো পাপ থাকে না—যার কাছ থেকে যত ইচ্ছে নেওয়া যায়।"

রমেশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কথা বাড়াতে চাই না। একদিন এই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের জন্যে তাঁর সঙ্গে আমাকে মামলা-মকদ্দমায় নামতে হতে পারে। তবু ভদ্রলোককে দেখলে মায়া হয়।

ভদ্রলোক দুঃখ করলেন, "কাজ কাজ আর কাজ। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড আর ভাল লাগে না, স্যর। এখন ছুটতে হবে কর্পোরেশন আপিসে, সেখান থেকে বেলেঘাটা সেলসট্যাক্স আপিসে। খুব জোর বেঁচে গিয়েছেন, বাড়ি ভাড়ার ওপর সেলসট্যাক্স নেই। থাকলে বুঝতে পারতেন বেলেঘাটা কী জিনিস! এখান থেকে ফিরবো হাওড়া হাজার হাত কালীতলা ভায়া ওলাবিবিতলা। থাকেন সায়েব পাড়ায়, হাওড়া যে কী জিনিস যদি জানতেন।"

হাওড়া ওলাবিবিতলা লেন যে আমার বিশেষ পরিচিত এবং হাওড়ার জলহাওয়ায় আমি যে মানুষ হয়েছি শুনে আর সি ঘোষ খুব খুশী হলেন। "বললেন তো মশাই, আপনি হাওড়া-বয়! আমি ভেবেছি আপনি মালিক-সাইডের কোনো আপনজন।"

"আমাকে দেখে কী তাই মনে হয়, মিস্টার ঘোষ?" আমিও পরিচয়ের সূত্র পেয়ে একটু হাল্কা বোধ করছি।

"দেখলে তো মনে হয় না নিশ্চয়। বিলডিং প্রপার্টি থাকলে কখনও এমন রোগা চেহারা হয়! কিন্তু কাজকর্মে আপনি সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যেভাবে আপনি সমস্ত খবরাখবর নিচ্ছেন, তাতে আমাদের মালিকও সেদিন বলছিলেন, নিশ্চয় আপনি মালিকদের আত্মীয়। পরেব সম্পত্তি নিয়ে কোনো কর্মচারী আজকাল বেশী মাথা ঘামায় না। নিজের পকেটে কীভাবে টু পাইস আসবে তাই ভাবতেই সবাই ব্যস্ত।"

কথাটা শুনতে বেশ ভালই লাগছে। আর সি ঘোষ বললেন, "সত্যি কথা স্বীকার করছি স্যর, আমি রামসিংহাসনকে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছি। মালিকদের সঙ্গে আপনার কী ধরনের সম্পর্ক। তা সে ঠিক বলতে পারলো না—তবে ও-ও ওই রকম সন্দেহ করছে।"

নতুন ধরনের অভিজ্ঞতায় শরীরটা শিরশির করে উঠলো। ঝাঁটার কাঠির মাথায় আলুরদম মার্কা আমার এই চেহারা দেখেও কেউ কেউ তাহলে ভাবছে আমি মালিকদের আত্মীয় হতে পারি।

বাবু রমেশচন্দ্র ঘোষ এবার একগাল হেসে বললেন, "যে-যা ভাবতে চায় তাকে তা ভাবতে দেবেন। এতে আপনার কখনও লোকসান হবে না। মনে মনে শুধু মা হাজার-হাত-কালীকে ডেকে যাবেন, তিনি সব দুঃখু নিজের বাক্সে জমা নিয়ে নেবেন।"

হাজার-হাত-কালীতলা আমি নিজেও দেখেছি, কিন্তু সেখানে কোনো প্যাণ্ডোরার প্যাঁটরা আছে বলে স্মরণ করতে পারছি না।

রমেশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিভরে বললেন, "আমাদের মা, ওই প্যাণ্ডোরা মেম-সায়েবের ঠিক উল্টো। যখনই আর দুঃখু সহ্য করতে পারি না তখনই মায়ের 'লেফট-লগেজে' সব 'যন্তন্না' জমা দিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে যাই।"

এ-বাড়ির ভাড়ার রসিদ বইটা আমার কাছে নেই। রামসিংহাসনের কাছ থেকে বইখানা আনবার জন্যে লোক পাঠিয়েছি। রমেশচন্দ্র ঘোষ বললেন, "ভাড়াটা নিয়ে নিন, মশাই। পরের টাকা পকেটে নিয়ে কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়ানো যে কী কাজ! আমার মেয়ে চন্দ্রা তো আমার জন্যে ভেবে ভেবে

অস্থির। বলে, বাবা তুমি এতো টাকা নিয়ে পথে-ঘাটে ঘোরাঘুরি করো কেন ?”

পকেট থেকে টাকা বার করে গুনতে গুনতে ঘোষ মশায় বললেন, “এদের কী করে বোঝাই, শখ করে কেউ চিনির বলদ হয় না।”

হাওড়ার লোক হিসেবে আর সি ঘোষ আমাকে আপন করে নিলেন এবং ঘর সংসারের অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, “তা পাঁচজনের আশীর্বাদে ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই আমার সব দুঃখু ঘুচিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি আমার বিজয় ভটচায্যির দয়ায় ফ্রিতে পড়ে বি-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে। তারপর এম-এতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম মায়ের নাম করে।”

আর সি ঘোষ এরপর দ্রুত জানিয়ে দিতে ভুললেন না যে তাঁর মেয়ে একটি হীরের টুকরো পাত্রের হাতে পড়েছে। মস্ত চাকরি করে তাঁর জামাই। সরকারের এক নম্বর সার্ভিসে সুপ্রতিষ্ঠিত এই জামাইয়ের বর্ণনা করতে করতে আর সি ঘোষ বললেন, “এই জামাই কি আমার মতো লোকের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হতো! মা হাজার-হাত-কালীর দয়ায় ওই ইউনিভার্সিটিতেই আমার মেয়ে ও-বাড়ির নজরে পড়লো। সুখবরটি পেয়ে আমি এক মুহূর্ত দেরি করিনি। মায়ের নাম জপতে-জপতে আপিস থেকে ধারধোর করে ঝুলে পড়লাম—আমার কপালে এমন জামাই—ভাবাই যায় না।”

রামসিংহাসনের কাছ থেকে বই আনিয়ে রসিদ কাটবার মধ্যবর্তী সময়ে ঘোষ পরিবারের প্রায় সমস্ত খবরাখবর আমার কানে এসে গিয়েছে। আর সি ঘোষ ছেলেকেও আসানসোলের কোনো লোহা কারখানায় অ্যাপ্রেনটিস ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তবে সেও ওই মেয়ের চেষ্টায়—“জামায়ের এক কথায় চাকরি হয়ে গিয়েছে।”

আর সি ঘোষ সরল মনে জানালেন, “চন্দ্রা এক এক জায়গায় বদলি হয় আর আমার মাথা ঘুরে যায়। সেখানকার কিসব কোয়ার্টার! আমার তো ঢুকতে ভয় করে। আমার খুব ইচ্ছে, জামাই একবার হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসুক। তাহলে আমার আর কোনো দুঃখু থাকে না।”

সই করা ভাড়ার রসিদ আর সি ঘোষ মশায়ের হাতে দিয়েছি, কিন্তু এখনও তিনি পারিবারিক কথা শেষ করেন নি। আমারও এসব কথা শুনতে মন্দ লাগছে না। থ্যাকারে ম্যানসনের এই সাংসারিক মরুভূমিতে থাকতে থাকতে নদীর ওপারে আমার পরিচিত হাওড়ার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। রমেশচন্দ্র ঘোষ যে-জীবনের কথা বলছেন, আমি সেখানকারই লোক—মনে মনে বলি, সদর স্ট্রীট, সদর লেন থেকে আমাকে ওই জীবনেই ফিরিয়ে নিয়ে যাও, হে ঈশ্বর।

ওঠবার আগেও রমেশচন্দ্র ঘোষ মেয়ে-জামায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বললেন, “মায়ের কাছে প্রার্থনা, আমাদের জানাশোনা সব মেয়েরই যেন চন্দ্রার মতো বিয়ে হয়।”

আর সি ঘোষ মশাই বিদায় নেবার পরেই খেয়াল হলো, গল্পের ঝোঁকে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট সম্বন্ধে কোনো কথা বলতেই ভুলে গিয়েছি। অপ্রিয় কিছু আলোচনা সেরে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে অস্বস্তিকর দ্বিতীয় অঙ্ক যেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেলো।

ঘোষ মশাই চলে যাবার মিনিট কয়েক পরেই একখানা হলদে রঙের ট্যাক্সি এসে থামলো আমাদের আপিসের সামনে।

ঝলমলে ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িপরা এক সুন্দরী মহিলা গাড়ি থেকে নেমে সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "চিনতে পারছেন ?"

অবশ্যই চিনতে পারছি। থ্যাকারে ম্যানসনে যখন চাকরি নিয়েছি তখন এঁদের না মেনে রেখে আমার উপায় আছে ?

স্বয়ং সুলেখা সেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—যাঁর সিঁথিতে অনেক সিঁদুর ছিল, যাঁকে আমি মিসেস সেন বলে জানতাম। দিনের উজ্জ্বল আলোয় আজ দেখলাম সুলেখা সেনের সিঁথিতে একটুও সিঁদুরের চিহ্ন নেই। তবে তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে সুমধুর সেণ্টের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে।

সুলেখার অভিবাদনের উত্তর দিতে বোধ হয় একটু দেরি করে ফেলেছি। ভদ্রমহিলা বেশ অভিমান করে বসলেন। "আপনি এখনও রেগে আছেন, আমার কথার উত্তরও দিলেন না।"

অপরাধ হয়ে গিয়েছে। মুখে হাসি ফুটিয়ে যথাসম্ভব বিনীতভাবে বললাম, "কেমন আছেন? আপনার না ধানবাদে থাকবার কথা?" ধানবাদ, মিস্টার চট্টরাজ—অনেকগুলো নাম একই সঙ্গে মনের মধ্যে জ্বলে উঠলো।

সুলেখা সেন বললেন, "সে সব অনেক কথা। শোনবার ইচ্ছে হলে শুনিয়ে দেবো'খন আপনাকে। এখন ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

সুলেখা এবার জিজ্ঞেস করলেন, "চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের চাবিটা আমার জন্যে কেউ রেখে গেছে ?"

"চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মালিকই তো একটু আগে এসেছিলেন।"

সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কখনই নয় ! মিস্টার জেঠমালানির তো পাটনায় থাকবার কথা। গত রাত্রে আমার সঙ্গে ট্রাঙ্কে কথা বলেছেন।"

আমাদের খাতাপত্রে জেঠমালানির যে কোনো অস্তিত্ব নেই তা আর সুলেখাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম না।

সুলেখা সেন ধরেই নিলেন জেঠমালানির কোনো কর্মচারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "ফ্ল্যাটের চাবিটা রেখে যায়নি? সেই রকমই তো কথা ছিল, আমি সোজা ট্যাক্সি করে চলে আসবো, ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে ওদের লোক এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

এসব ব্যাপারে আমার কী বলবার থাকতে পারে? মণিবন্ধে আঁটা ছোট্ট লেডিজ ঘড়ির দিকে তাকালেন সুলেখা সেন। তারপর বললেন, "শুধু শুধু মিটার বাড়ছে—ভাড়াটা মিটিয়ে দিই। কী বলেন ?"

এ ব্যাপারেও আমাকে পরামর্শ করবার কোনো মানে হয় না। তোমার ট্যাক্সি তুমিই ঠিক করবে—রাখবে কি ছাড়বে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সুলেখা সেন ট্যাক্সি বিদায় করলেন। তারপর একটা মাঝারি সাইজের চামড়ার স্যুটকেশ এবং একখানা চৌকো লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ গাড়ি থেকে বার করে এনে আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। মালবহন করতে গিয়ে সুলেখার সুস্পষ্ট ঊর্ধ্বাঙ্গের আঁচল অনেকখানি সরে গিয়েছে।

এবার সুলেখার কণ্ঠস্বরে বাঙালী মেয়ের অভিমান ঝরে পড়লো। "আপনি তো কিছুই বলছেন না। আপনার এখানে আমার এই ব্যাগ দুটো একটু রাখবো ?"

বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। সুলেখা সেনের উপস্থিতি আমার পক্ষে যতই অস্বস্তিকর হোক, তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভদ্র ব্যবহার না করবার কোনো যুক্তি নেই।

আমি বললাম, "দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। জিনিসপত্র যতক্ষণ ইচ্ছে রাখুন।"

সুলেখা আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। এবং বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য দেখুন। আমাকে বলে দিলো সোজা হাওড়া স্টেশন থেকে থ্যাকারে ম্যানসনে চলে আসতে। চাবি নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে থাকবে।"

"চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে খোঁজ করেছেন ? লোকটা হয়তো ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।" আমি সহানুভূতি দেখাই।

সুলেখা বললেন, "সে খোঁজ না করে কি এখানে এসেছি ? আপনি যে রকম মুখ গম্ভীর করে বসে থাকেন, আমার ঢুকতে ভয় হয়।"

মুখটা আমার গোল। শরীর শীর্ণ হলেও মুখখানা হাঁড়ির মতো দেখায়। সুতরাং, সুলেখা যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য হতে পারে।

সুলেখা বললেন, "রামসিংহাসনও কোথায় বেরুচ্ছে। ও বললো কাউকে দেখেনি। তবে ম্যানেজার সায়েবের ঘরে জেঠমালানি কোম্পানির লোক এসেছে।"

পাছে সুলেখা আবার ভুল বোঝেন তাই বললাম, "লোক এসেছিলেন, কিন্তু অন্য কাজে।"

সুলেখা এবার কপালের চুল সরিয়ে এবং আঁচল পুনরায় সামলে নিয়ে বললেন, "খুব টায়ার্ড লাগছে—লম্বা ট্রেন জার্নি করলে শরীরের কিছু থাকে না।"

সুলেখা যদি ভেবে থাকেন আমার কাছে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আছে, তা হলে অবশ্যই ভুল করেছেন। কেননা চাবি থাকলেও তা সুলেখা সেনের হাতে তুলে দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

তবু এই মুহূর্তে সুলেখা সেনকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। বললাম, "এখানকার চাবি থাকলেও আপনাকে দিতে পারতাম না সুলেখা দেবী। তবে আপনার জিনিসপত্র এখানে রেখে আমার ঘরে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসতে পারেন।"

আমার কথা শুনে সুলেখার মুখ মুহূর্তের জন্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"আপনার ঘরে?" সুলেখা একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করলো। সুলেখার বোধ হয় ধারণা আমি তাঁকে পছন্দ করি না।

বহু মানুষের এই বিচিত্র মেলায় বেশ মুশকিলে পড়েছি আমি। এখানে এমনই পরিস্থিতি যে এগোলেও বিপদ, পিছলেও বিপদ। সুলেখা সেনকে পছন্দ করবার মতো কোনো কারণ এখনও পর্যন্ত আমার জীবনে ঘটেনি। কিন্তু তাঁকে অপছন্দ করবারই বা আমি কে? এই বিশাল পৃথিবীতে কত মানুষ কতভাবে বেঁচে রয়েছে—ভাল-মন্দর রবার স্ট্যাম্প বসিয়ে তাঁদের চিহ্নিত করবার অপ্রিয় দায়িত্ব বিধাতাপুরুষ তো আমার ওপর অর্পণ করেননি।

সুলেখা সেনকে এই মুহূর্তে সত্যিই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকালাম। সুলেখা সেন আমার সমবয়সীই হবেন। একটা সহজ অন্তরঙ্গতার স্নিগ্ধ ভাব ওঁর মুখচোখে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমারই এই বয়সে, সুলেখা সেনের চোখে-মুখে যেন সায়াহ্নের ক্লান্ত ছায়া নেমে এসেছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সৃষ্টিকর্তা বিধাতা যে পুরুষ সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি পদক্ষেপে নারীর প্রতি অবহেলা ও অবিচারের প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। নইলে, আমার সমবয়সিনী হয়েও সুলেখা সেনের চোখ দুটো কেন দলিত মর্দিত ফুলের মতো এমন রিক্ত হয়ে উঠবে?

সুলেখার ইচ্ছা এখনই সে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে চলে গিয়ে আমাকে অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু আমি অপারগ। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই আমার পক্ষে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। যথা-সময়ে জেঠমালানি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্মুখসমরে নামবার জন্যেও সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করছি।

সুলেখা সেন এই মুহূর্তে সত্যিই ক্লান্ত। না-হলে কিছুতেই তিনি আমার ঘরে যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না।

আকাশপাতাল ভেবে খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে সুলেখা শেষ পর্যন্ত বললেন, "দিন আপনার চাবিটা।"

পকেট থেকে গম্ভীরমুখে চাবিটা বার করে ওঁর হাতে দিতে গিয়ে মনে হলো সুলেখার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে। আমি যে নিতান্ত করুণাবশত একজন অসহায়া রমণীর প্রতি মানবিক দায়িত্ববোধে নিজের চাবিটা এগিয়ে দিচ্ছি তা যেন সুলেখার কাছে বড়ই প্রকট হয়ে উঠেছে।

চোখের জল কোনরকমে চেপে রেখে সুলেখা বললেন, "কলকাতা শহরের কোথাও কয়েক ঘণ্টা মাথা গুঁজবার মতো জায়গাও এখন নেই আমার।"

সুলেখা সেনকে এইভাবে নিজের ঘরের চাবিটা দেওয়া বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হলো না। থ্যাকারে ম্যানসনে কোনো ঘটনাই আধডজন অনুসন্ধিৎসু কর্মচারির অগোচরে থাকে না। হয়তো এই অকারণ দাক্ষিণ্যের জন্য আমাকেও

কিছু মূল্য দিতে হবে। কিন্তু সুলেখা সেনের শ্রাবণমেঘের মতো সজল চোখ দুটো আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দুর্বল করে তুলেছে। চার্নক সায়েবের এই অভিশপ্ত শহরে নিরাশ্রয় হবার যে কি বিড়ম্বনা তা আমার অজানা নয়। সুলেখাকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় করে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। মন যা চেয়েছে তাই করেছি—এই মুহূর্তে আমি বদনামের ভয় করি না।

সুলেখা সেন চলে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর লগেজ এখনও আমার সামনে পড়ে রয়েছে। সুলেখা না-ফেরা পর্যন্ত আমাকেই এগুলো পাহারা দিতে হবে।

একটু পরেই সুলেখা ফিরে এলেন। এখন তাঁকে বেশ ফ্রেশ মনে হচ্ছে। মুখে-চোখে জল এবং প্রসাধনের সামান্য স্পর্শে মেয়েদের বাইরেটা কত সহজেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুলেখা আমার হাতে চাবিটা ফিরিয়ে দিলেন। মুখ ফুটে কিছু বললেন না তিনি, কিন্তু তাঁর চোখে যে গভীর কৃতজ্ঞতাব স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে তাতেই আমার মন নতুন এক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

সুলেখা সেন এরপর কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। আপিস ঘরের এককোণে যে পাবলিক টেলিফোন আছে কয়েকটা পয়সা ফেলে সেখান থেকে একটা টেলিফোন করলেন। নিচু গলায় কী কথা বললেন তা আমার কানে পৌঁছল না। পরের টেলিফোনে আড়িপাতার কুরুচি ঈশ্বর আমাকে দেন নি।

সুলেখা আমার টেবিলে ফিরে এসে বললেন, “আরও পনেরো মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আপনার খুব অসুবিধে হবে?”

অসুবিধে অবশ্যই! কিন্তু সেকথা তো মুখের ওপর বলা যায় না। সুতরাং সুলেখাকে বসতে বললাম। টেলিফোনে সুলেখা সেন কী ব্যবস্থা করলেন বুঝতে পারছি না। মিনিট পনেরো পরেই এই নাটকের শেষ হবে। সুলেখা সেন কি অন্য কোথাও চলে যাবার ব্যবস্থা করলেন? এই মুহূর্তে সেই চট্টরাজমশায়ের কথা আমার মনে পড়ছে যাঁর সঙ্গে সুলেখা সেন ধানবাদে রওনা হয়েছিলেন। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের সেই অস্বস্তিকর প্রথম অভিজ্ঞতার কথা এখনও ভুলতে পারিনি।

যতদূর মনে পড়ছে, ধানবাদে সুলেখার বেশ কিছুদিন থাকবার কথা ছিল। হঠাৎ এইভাবে ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন কেন তাও মাথায় ঢুকছে না।

পনেরো মিনিটের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দ না থেকে সুলেখা নিজেই এবার মুখ খুললেন। জেঠমালানিদের ওপর একটু রেগে আছে বলেই হয়তো কথাগুলো হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো।

“নাক কান মলেছি, কলকাতার বাইরে আর যাবো না।” সুলেখার কথাগুলো স্বগতোক্তির মতো শোনালো। কারণ তিনি কী করবেন, কোথায় থাকবেন, সে-বিষয়ে আলোচনা করার মতো সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা তাঁর সঙ্গে আমার নেই।

আন্দাজ করছি, সৌম্যদর্শন ও সুপুরুষ চট্টরাজমশায়, যাঁকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় দেখেছিলাম, তাঁর সঙ্গেই সুলেখার কিছু অপ্রত্যাশিত মনোমালিন্য হয়েছে।

সুলেখা এবার কেমন উদাসীন হয়ে উঠলেন। বললেন, “কিছুদিন আগে এই কলকাতা শহর আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠেছিল। কলকাতা

বলতেই আমার চোখের সামনে কেবল আপনাদের এই রাক্ষুসে বাড়িটা ভেসে উঠতো। পুরনো ইঁটকাঠের এই জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আমার মন ছটফট করতো। তাই যখন মিস্টার জেঠমালানি ধানবাদের কথা তুললেন তখন আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।”

নিজের মনেই হেসে উঠলেন সুলেখা সেন। বললেন, “মিস্টার জেঠমালানির ভয় ছিল আমি হয়তো কলকাতা শহর ছেড়ে মফস্বলে যেতে রাজীই হবো না। আমাদের লাইনের অনেক মেয়েই বাইরে যেতে চায় না। কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা তারা ভাবতেই পারে না।”

আমি একটু অবাক হয়েই সুলেখা সেনের কথা শুনছি। সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, “কিছু বুঝতে পারছেন?”

সত্যি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। শুধু, সুলেখা সেনকে কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে পাঠাবার জন্যে জেঠমালানি যে বেশি টাকার লোভ দেখিয়েছেন তা জানতে পেরেছি।

সুলেখা বললেন, “আপনার কাছে কিছুই চেপে রাখবো না। এতো বড় বাড়ির ম্যানেজারি করছেন, আপনার তো কোনো কিছুই অজানা থাকবার কথা নয়।”

সুলেখা বললেন, “এমন এক সময় ছিল যখন কলকাতা শহরই সব। তখন ব্যাবসা-বাণিজ্যের জায়গা বলতে শুধু কলকাতাকেই বোঝাতো। দুনিয়ার সব লোককেই তখন পয়সার ধান্ধায় কলকাতাতেই ছুটে আসতে হতো। জেঠমালানিরা সেই সময়েই আপনাদের এই ম্যানসনের ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ক্রমশ অবস্থা পাল্টাচ্ছে। এখন কলকাতার বাইরে কত জায়গায় কলকারখানা তৈরি হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ছে। বিহার, ওড়িশা, আসাম, মধ্যপ্রদেশে রাতারাতি কত ছোটখাট শহর গজিয়ে উঠছে।”

সুলেখার ব্যাবসাসংক্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি এবার বিস্মিত হচ্ছি। আমার ধারণা ছিল, সুলেখার মতো মেয়েদের মাথায় বাড়তি কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি অথবা কৌতূহল থাকে না। সুলেখা বললেন, “এই সব ছোটখাট শহরের কর্তাব্যক্তিরা এখনও কাজের টানে এবং নিজের টানে কলকাতায় চলে আসেন। সুযোগ পেলেই তাঁরা একবার কলকাতা ঘুরে যেতে আগ্রহী —কিন্তু আজকাল সবসময় সুযোগ আসে না। এঁদের সঙ্গে কাজকারবার সামলাবার জন্যে জেঠমালানিদেরও আজকাল তাই আসানসোল, অণ্ডাল, পাটনা, গয়া, রাঁচি, ভুবনেশ্বর, ভাইজাগ ছুটতে হচ্ছে। কলকাতা শহর তার পুরনো ইজ্জত হারিয়ে ফেলেছে, বুঝলেন শংকরবাবু।”

“ইজ্জত থাকলো আর না-থাকলো! আমাদের কী এসে যায় বলুন?” আমি এবার উত্তর না-দিয়ে পারলাম না। এই শহরের মান-ইজ্জত সুখ-সুবিধে সবই তো চিরদিন কয়েক হাজার ভাগ্যবানদের জন্যে সংরক্ষিত আছে—সাধারণ মানুষের তাতে কোনো অধিকার নেই।

সুলেখা গম্ভীর হয়ে বললেন, “অনেকের এসে যায়, শংকরবাবু। কলকাতা ছেড়ে আমাদের অনেককে এখন ছড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। অণিমা হাজরা গিয়েছে রায়পুর, লীলা যোসেফ রয়েছে ভাইজাগে।”

সুলেখা বললেন, “আমি নিজেও অতশত কলকাতার ব্যাপার জানতাম না। আমি শুধু এখানকার জীবন সম্বন্ধে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কোনো

সময়ে মিস্টার চট্টরাজকেও হয়তো এসব কথা বলেছিলাম। ধানবাদের কথা উঠতেই, আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেলো। ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা রেল স্টেশনের ধারে আমাদের ছোটবেলা কেটেছে। বাবা পোস্টাপিসে কাজ করতেন—কাছাকাছি অনেকগুলো আপিসে বদলি হয়েছেন পরের পর। হাওয়ায় যে এতো ধোঁয়া থাকে, সূর্যের আলো যে এতো দুর্মূল্য তা কলকাতায় আসবার আগে আমি জানতামই না।"

"আমার অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো, সুলেখা দেবী। হাওড়ার এক অন্ধকার কানাগলিতে সেই ছোটবেলায় এসে উঠেছিলাম। ঘরের মধ্যেও যে বাতাস বইতে পারে, ভোরবেলায় সূর্য যে বিছানায় এসে কারও ঘুম ভাঙাতে পারে, রাতের জানালা দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে চাঁদ দেখা যায় এসব আমার অজ্ঞাত ছিল। বৃষ্টির ওপর আমার খুব রাগ ছিল, সুলেখা দেবী—বর্ষাকে বোধ হয় আজও আমি পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারিনি।" হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, সুলেখার সংগে কথা বলতে বলতে আমি বোধ হয় একটু বেশিদূর এগিয়ে এসেছি।

কিন্তু এই মুহূর্তেই নিরাপদ সীমানার মধ্যে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। বিহারের পল্লীপ্রকৃতিতে প্রতিপালিতা সুলেখা আমার কথায় কৌতুক বোধ করছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "বর্ষার ওপর রাগ? ওমা! আমি তো এমন লোক দেখিনি! বর্ষার ওপর বিরক্তি কেন?"

সুলেখার কৌতূহল নিবৃত্তি না করে পারলাম না। বললাম, "বৃষ্টি মানেই তো কাঁচা নর্দমা ছাপিয়ে হাওড়ার সরু সরু রাস্তাগুলো নরককুণ্ড হয়ে উঠবে। বর্ষা মানেই বাড়ির ফুটো ছাদ থেকে টপটপ করে মরচে পড়া 'টি আয়রন' ধোওয়া জল বিছানা ভিজিয়ে দেবে। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঘটি, বাটি, বালতি বসিয়ে দিতে হবে—টপটপ করে জল পড়বে। বৃষ্টি থেমে যাবার পরেও তো অনেকক্ষণ ধরে এই জল পড়তে থাকবে এবং মনে করিয়ে দেবে যে এক সময় বৃষ্টি এসেছিল।"

সুলেখা চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, "আপনি তাহলে রবি ঠাকুরের ওপরেও চটা! কলকাতার লোক হয়েও তো উনি বর্ষার কত গুণগান করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের প্রসংগ আমি সযত্নে এড়িয়ে গেলাম। ডরোথি ওয়াটের মুখখানা আমার চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। এই পৃথিবীতে তো রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আর কত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। চিৎপুর রোডের হে মহামানব, আপনি কেন বারবার থ্যাকারে ম্যানসনের সামান্য কর্মচারির জীবনে সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে এইভাবে উপস্থিত হবার চেষ্টা করছেন?

সুলেখা সেন কিন্তু থামলেন না। কত সহজে রবীন্দ্রনাথ, জেঠমালানি ও ধানবাদের সেই চট্টরাজমশায়কে একাকার করে ফেললেন। কৈশোরস্মৃতি মন্থন করে ডাকগাড়িতে চড়ে রবীন্দ্রসংগীত শেখবার জন্যে ধানবাদের গণেশ মাস্টারের কাছে আসবার গল্প বললেন। পরের মিনিটেই সুলেখা কেমন অবলীলাক্রমে নির্মল চট্টরাজ ও মিস্টার জেঠমালানির ব্যাবসায়িক সম্পর্ক বর্ণনা শুরু করলেন।

সুলেখা বলছিলেন, "আমাদের পোস্টাপিসের সামনে একবার দলবেঁধে আমরা বর্ষার গান গেয়েছিলাম। আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি

রবীন্দ্রসংগীতের বড় শিল্পী হই।"

পরমুহূর্তেই সুলেখা বললেন, "জানেন শংকরবাবু, সেবার যে মুহূর্তে মিস্টার জেঠমালানি বললেন, সুলেখা, মিস্টার চট্টরাজ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, তখনই আমার মনের মধ্যে কী রকম করে উঠলো।"

এরপর কোনোরকম দ্বিধা না-করে অনেক কথা বলে গেলেন সুলেখা। জেঠমালানি এবং চট্টরাজ—এ'দের দু'জনের কী সম্পর্ক, কী কাজকারবার, কিছুই জানতেন না সুলেখা সেন।

"নামটাও আসলে চট্টরাজ কিনা, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল শংকরবাবু। খুব কম লোকেই আসল নাম নিয়ে আমাদের কাছে আসে। আমাদের পাশে বসে মিত্তির হয়ে যায় মুখুজ্যে, মুখুজ্যে হয়ে যায় গুহ। তা আমি তাতে কিছু মনে করি না। এই যে আমি, সবার কাছে সুলেখা সেন বলে পরিচয় দিই—তাতে কী সীমা চ্যাটার্জির কিছু ক্ষতি হয়েছে? কত আশা করে বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন সীমা। সে-নামটাকে কেন অপরিষ্কার হতে দিই? সুলেখা সেনকে লোকে যত ইচ্ছে নোংরা করুক, সীমা চ্যাটার্জিকে ওরা স্পর্শ করতে পারবে না।"

বিস্মিত আমি সুলেখার মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু সুলেখা তা নজর করলো না। সুলেখা সোজা বললো, "যারাই এখানে আসে, তাদের বাবা-মা জন্মের পরে কত আশা করে, কত স্বপ্ন দেখে ভাল ভাল নাম দিয়েছিলেন। সেসব নামকে অকারণে এই থ্যাকারে ম্যানসনে ময়লা করার তো কোনো দরকার নেই, শংকরবাবু। আসল নাম না-বললে, কোনো কোনো মেয়ে এ-লাইনে ভীষণ রেগে যায়—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কখনও বিরক্ত হই না। বরং আমি বুঝি, লোকটার পৈতৃক নামের এখনও কিছু দাম আছে—লোকটা এখনও পুরোপুরি দেউলে হয়ে যায়নি।"

"চট্টরাজ নামটা কী রকম অদ্ভুত না?" বড় বড় চোখ তুলে সীমা ওরফে সুলেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

না, আমিও বা শুধু-শুধু কেন কিষাণপুর পোস্টাপিসের পোস্ট-মাস্টারের সাধের কন্যা সীমাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনের অস্বস্তিকর পরিবেশে টেনে আনছি? সুলেখা সেনকে আমি এ-বাড়িতেই আবিষ্কার করেছি, তার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ থাক। সীমা, তুমি এখানে এসো না—আমি কলগার্ল সুলেখা সেনের সঙ্গেই এখন কথা বলতে চাই।

সুতরাং আমি সুলেখাকে বললাম, "চট্টরাজ উপাধিটা বোস ঘোষ মিত্তির মুখুজ্যেদের মতো সাধারণ নয়। তবে কয়েকজন চট্টরাজকে আমি চিনি।—তাঁরা প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক।" কথাটা শুনে সুলেখা কেমন ভাবে যেন আমার দিকে তাকালো। পুরুষমানুষ যে ভদ্রলোক হয় এ-কথাটা সে যেন এই প্রথম শুনছে।

মনের এই ভাব সুলেখা অবশ্য মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিলো। তারপর নিজের কাহিনীতে ফিরে গেলো।

সুলেখা বললো, "প্রথম দিনেই চট্টরাজমশাই যখন মানিব্যাগ বার করে নিজের ভিজিটিং কার্ড আমাকে দিলেন, তখনই জানলাম ছদ্মনাম নয়। ছদ্মনামের ভিজিটিং কার্ড পুলিস ছাড়া আর কেউ ছাপিয়ে রাখে না।"

"চট্টরাজ লোকটি সভ্য। আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় লোকটা এখনও পুরোপুরি উচ্ছন্নে যায়নি, বুঝলেন শংকরবাবু।"

উচ্ছন্ন জায়গাটি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও এ-ব্যাপারে আমার বিস্তারিত জ্ঞান নেই। সুতরাং চট্টরাজ সত্যিই ওই বিশিষ্ট স্থানে গিয়েছেন কিনা তা আমার পক্ষে বোঝা শক্ত।

জেঠমালানি যে এর পরেই সুলেখার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন তাও শুনলাম। তিনি বলেছিলেন, "তোমার কাজকর্মে আমি খুব সন্তুষ্ট, সুলেখা। মিস্টার চট্টরাজ খুব কড়া অফিসার বলে বিখ্যাত। বিজনেসের কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের লাইফ উনি মিজারেবল করে তুলেছিলেন। আমি তো ধানবাদের গভরমেণ্ট বিজনেসের আশা ছেড়ে দিচ্ছিলাম—তখন কানহাইয়াবাবু বললেন, লাস্ট অ্যাটেম্পট নিয়ে দেখো—চট্টরাজ কী একটা সেমিনারে তিন-চার দিনের জন্য কলকাতায় আসছেন।"

বহু সাধ্যসাধনায় জেঠমালানির ভাগ্য সেদিন সুপ্রসন্ন হয়েছিল এবং কানাহাইয়াবাবুর নির্দেশিত পথে চট্টরাজকে তিনি চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে কিছুক্ষণের জন্যে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুলেখাকে তিনি আগে থাকতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "একেবারে ভি-ভি-আই-পি। যেন কোনোরকম আদরযত্নের ত্রুটি না হয়।"

এই ভি-ভি-আই-পি শুনলেই সুলেখাদের বুক ভয়ে ধুকপুক করে। কিছুতেই তারা সহজ হতে পারে না—অথচ সহজ না হতে পারলে ভি-ভি-আই-পিদের মন জয় করা সম্ভব হয় না। চট্টরাজ যে সকালেই চৌত্রিশ নম্বরে প্রথম এসেছিলেন তা আমার অজানা নয়।

জেঠমালানি দুপুরবেলাতেই সুলেখাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই অপ্রত্যাশিত ফল হয়েছে, মিস্টার চট্টরাজ রীতিমত নরম হয়েছেন। অপরাহ্নের সেমিনারে সেদিন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলোচনা ছিল। কিন্তু লাঞ্চের আসরে চট্টরাজ জেঠমালানিকে বলেছেন, তিনি ক্লান্ত বোধ করছেন।

জেঠমালানি সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, "আপনাদের মতো ব্রেনি লোক কেন স্যর এইসব মিটিংয়ে বসে থেকে সময় নষ্ট করছেন? এই সব লেকচারে আপনাদের কী শেখবার আছে? এই সব সাবজেক্টে আপনি যা ভুলে গেছেন তা শিখতেই এখানকার লোকদের হোল লাইফ কেটে যাবে।"

দুর্ধর্ষ অফিসার চট্টরাজ অন্য সময়ে আপিসে জেঠমালানির সঙ্গে কথাই বলতেন না। কিন্তু চৌত্রিশ নম্বর ঘরে প্রভাতী পদক্ষেপের পরে তিনি যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছেন। তিনি রহস্যময়ভাবে হেসেছিলেন, যার অর্থ 'হাঁ' অথবা 'না' দুই হতে পারে।

সকালেই অতিথি আপ্যায়নের কাজ শেষ হওয়ায় সুলেখা সেদিন অন্যরকম প্রোগ্রাম করে ফেলেছিল। মদনাকে পাঠিয়ে সুলেখা সিনেমার টিকিট কাটিয়ে এনেছিল। জামাকাপড় পরে টিকিটখানা ব্যাগে পুরে সুলেখা দরজায় চাবি লাগাতে যাচ্ছে এমন সময় ফোনটা তারস্বরে বেজে উঠলো। আর এক মিনিট দেরি হলেই কেলেংকারি হতো। মিস্টার জেঠমালানি ব্যস্ত হয়ে সুলেখাকে ডাকছেন।

"হ্যালো, হ্যালো, সুলেখা—ঘরে ছিলে না? টেলিফোন ধরতে এতো দেরি হলো কেন?" জগদীশ জেঠমালানির গলা শুনতে পাচ্ছে সুলেখা।

"সিনেমায় যাচ্ছি", সুলেখা উত্তর দিলো।

গলা শুনেই সুলেখা বুঝতে পেরেছিল, টেলিফোনের অপর প্রান্তে জগদীশবাবু আঁতকে উঠলেন। "সিনেমা! বি এ গুড্ গার্ল, সুলেখা। সিনেমা দেখবার অনেক সময় পাবে, প্লিজ আজকে যেও না।"

"অনেক কষ্টে সিনেমার টিকিট কাটিয়েছি—টিকিট পাওয়া যায় না," সুলেখা এই মুহূর্তে সিনেমায় যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

কিন্তু জগদীশ জেঠমালানি ওস্তাদ লোক। মিষ্টি করে তিনি বললেন, "সুলেখা তোমার মতো মেয়ে হয় না। তুমি অন্য যে কোনোদিন যেতে চাইবে, আমি বেস্ট সীটের টিকিট কিনে দেবো। তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আজ কিন্তু একটু জরুরি কাজ পড়ে গেছে।"

সুলেখা আমাকে বললো, "আমি ভাবলাম, বুঝি নতুন কোনো হাঙ্গামা। কোথায় ঠাকুর-দেবতার ছবিটা দেখে মনটা একটু হাল্কা করবো, তা না ভর-দুপুরবেলায় আবার ঝুটঝামেলা।"

কিন্তু জেঠমালানির পরের কথায় সুলেখা নিজেও একটু অবাক হলো। "মিস্টার চট্টরাজ তোমার ওখানে যেতে পারেন।"

"উনি তো সকালে এসেছিলেন! এই তো ঘণ্টাকয়েক আগে", সুলেখা অবাক হয়ে যায়। ভাবে জগদীশ জেঠমালানি বোধহয় ভুল করছেন।

জগদীশ জেঠমালানি জীবনে এই প্রথম সুলেখার সঙ্গে রসিকতা করলেন। বললেন, "ভাল সিনেমা হলে কেউ কেউ ডবল শো দেখে!"

রসিকতা বন্ধ করে জেঠমালানি অভিনন্দন জানালেন সুলেখাকে। "অতি কঠিন লোক এই চট্টরাজ। ওঁকে যে সন্তুষ্ট করতে পেরেছো, এতে আমরা খুব খুশী হয়েছি, সুলেখা। এই লোকটার ওপর আমাদের ফিউচার অনেকখানি নির্ভর করছে।"

সুলেখা শান্তভাবে উত্তর দিলো, "বলুন।"

জগদীশ ওদিক থেকে জানালেন, "শোনো, সুলেখা, খুব মানী লোক এই মিঃ চট্টরাজ। প্রথমে রাজীই হচ্ছিলেন না। কিন্তু ওঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে আমিই ওঁকে এনকারেজ করেছি চৌত্রিশ নম্বরে রিটার্ন ভিজিট দিতে।"

সুলেখা ফোন রাখতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিক থেকে আওয়াজ এলো, "হ্যালো, হ্যালো। সুলেখা, শোনো। মিস্টার চট্টরাজ খুব টায়ার্ড ফিল করছেন। একটু মাথাও ধরেছে। তুমি দু'একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট আনিয়ে রেখো।"

"ওসব ট্যাবলেট আমার ব্যাগে সারাক্ষণ থাকে, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না," সুলেখা জানিয়ে দিলো।

"ভেরি গুড, সুলেখা। সাধে কি আর তোমার কাছে মিস্টার চট্টরাজকে পাঠাচ্ছি।"

জেঠমালানি এখনও কথা শেষ করছেন না। সামান্য কেশে গলা সাফ করে নিয়ে তিনি বললেন, "খুব ইমপর্ট্যান্ট পার্টি, মনে রেখো সুলেখা। কোনো-রকম আদরযত্নের ত্রুটি না হয় যেন। দরকার হলে চৌত্রিশ নম্বরেই ডিনারের ব্যবস্থা করবে। কাউকে পাঠিয়ে মোকাম্বো অথবা ব্লু ফক্স থেকে পছন্দমতো খাবার আনিয়ে নিও। তোমার কাছে টাকা আছে তো?"

স্পেশাল খাবারের টাকা নেই জেনে জগদীশ এবার নিজের ভাগ্নের ওপর বিরক্ত হলেন। বললেন, "কেন? রাজু তোমার কাছে কিছু টাকা রেখে দেয়নি? কতবার বলেছি ওকে, ফ্ল্যাটে সবসময় কিছু কাঁচা টাকা রাখা দরকার।"

জেঠমালানি বললেন, "ফিকর্ মাত্ কীজিয়ে! আমি এখনই ড্রাইভারের হাতে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি শুধু ব্লু ফক্স-এর রসিদগুলো রেখে দিও—ওগুলো কোম্পানির খরচ দেখিয়ে দেওয়া যাবে।"

"সব রেখে দেবো, আপনি চিন্তা করবেন না।" সুলেখা জানতো না এইসব খরচখরচা আবার হিসেবের খাতায় দেখানো যায়। সুলেখার মনে পড়ছে বটে, জগদীশবাবুর আদুরে ভাগ্নে সুলেখাকে দিয়েও মাঝে-মাঝে ভাউচার সই করিয়ে নেয়।

জেঠমালানি বললেন, "তা হলে ছাড়ছি। আমি মতিবাবুর বাড়িতে গীতা ক্লাসে থাকবো। কোনো অসুবিধে হলে ওখানেই ফোন করে দিও," এই বলে শ্রদ্ধেয় মতিবাবুর টেলিফোন নম্বর দিলেন জগদীশ জেঠমালানি।

টেলিফোন নামাবার আগে আবার সুলেখাকে সাবধান করে দিলেন, "কোনোরকমে অসুবিধে যেন না হয়। কোনো বিজনেসের কথা তোমাকে ওঁর পেট থেকে টেনে বার করতে হবে না। স্রেফ, মিস্টার চট্টরাজ যেন আমাদের ওপর একটু সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলেই হবে।"

মিস্টার চট্টরাজ যথাসময়ে পদধূলি দিয়েছিলেন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে। সুলেখার সেবাযত্নে বিশিষ্ট অতিথির ক্লান্তি কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল।

সিনেমা না-যাওয়ার ব্যাপারে সুলেখা নিজে থেকে কিছুই বলেনি। কিন্তু তার অসাবধানতায় ব্যাপারটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিস্টার চট্টরাজের কাছে ধরা পড়ে গেলো। সোফার একধারে টেবলটপের ওপরেই ম্যাটিনী শোয়ের গোলাপী রংয়ের অব্যবহৃত টিকিটখানা পড়েছিল। সুলেখা তখন ভিতরে প্যানট্রিতে মিস্টার চট্টরাজের জন্যে একটু চা তৈরি করছিল। প্যানট্রিতে ঢালাও ব্যবস্থা। গ্যাস ছাড়াও ইলেকট্রিক স্টোভ আছে ওখানে। ছোট্ট একটা ফ্রিজে নানাবিধ সুখাদ্য ঠাসা। রান্নার জিনিসপত্রেরও অভাব নেই। সুলেখা নিজেও সুগৃহিণী। রান্নাটা ভালই জানে। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোটখাট পদ রান্না করে অতিথিদের মনোহরণ করেছে।

কেউ কেউ পরে জগদীশ জেঠমালানির কাছে অজস্র প্রশংসা করেছে। বলেছেন, "আপনার ফ্ল্যাটে গেলে মনটা অন্যরকম হয়ে যায় মিস্টার জেঠ-

মালানি। মনেই হয় না বাইরে এসেছি। বাড়িতে বসে-বসেই যেন উপভোগ করছি সেইসব আনন্দ যা বাড়িতে পাওয়া যায় না।"

বিশিষ্ট অতিথির চা ও জলখাবার নিয়ে সুলেখা যখন টেবিলে ফিরে এলো, তখন মিস্টার চট্টরাজ বললেন, "আপনার যে সিনেমা যাওয়ার কথা ছিল তা মিস্টার জেঠমালানি আমাকে বললেন না কেন?"

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলো সুলেখা, কিন্তু ফল হলো না। টিকিট-খানা তুলে দেখালেন চট্টরাজ।

আমতা-আমতা করতে লাগলো সুলেখা। চট্টরাজ যে এই ধরনের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে সত্যিই দুঃখিত তা ওঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারছে সুলেখা।

কিন্তু রাগটা যেন শেষপর্যন্ত জেঠমালানির ওপর গিয়ে না পড়ে। সুলেখা এবার তাই শান্ত স্নিগ্ধভাবে বললো, "সিনেমা তো রোজই আছে—আপনি তো কলকাতায় রোজ রোজ আসবেন না, মিস্টার চট্টরাজ। একদিন না-হয় সিনেমা দেখা হলো না।"

মিস্টার চট্টরাজ এই পরিবেশে যেন কেমন হয়ে গেলেন। নিজের সব কথা বলতে আরম্ভ করলেন। নির্মল চট্টরাজের স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ। অনেকদিন তিনি যে রাঁচিতে আছেন—সংসারে যে চট্টরাজের তেমন টান নেই—আপিসের কাজের মধ্যেই যে তিনি মুক্তি খুঁজছেন, এসব কথা চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে এসে সহজে কেউ প্রকাশ করে না। এসব শুনতেও সুলেখার তেমন ভাল লাগে না—কারণ বিশিষ্ট অতিথি বিদায়ের পর জগদীশবাবু নিজে এসে অনেক সময় বহুক্ষণ ধরে সুলেখাকে জেরা করেন। অতিথির সঙ্গে আলো-চনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চান। এসব খবর এইভাবে সংগ্রহ করে ওঁদের নিশ্চয় কিছু লাভ হয়, কিন্তু কী লাভ হয় সুলেখা তা বুঝতে পারে না।

চট্টরাজ লোকটি যে এখনও পুরোপুরি অমানুষ হননি তার প্রমাণ সুলেখা একটু পরেই পেয়েছিল। সুলেখার দেওয়া মাথাধরার ট্যাবলেট খেয়ে একটু সুস্থ হবার পরেই চট্টরাজ ঘড়ির দিকে তাকালেন। সুলেখা ভাবলো, অতিথি এবার এখানে একঘেঁয়ে বোধ করছেন ; অথবা অন্য কোথাও জরুরি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। এতোসব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হাতে নিয়ে লোকগুলো কীভাবে তারই মধ্যে টুক করে আনন্দবাজারে চলে আসেন সুলেখা বুঝতে পারে না।

কিন্তু সুলেখা ভুল বুঝেছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়েই মিস্টার চট্টরাজ বললেন, "আজই ক্ষতিপূরণ করতে চাই।" চট্টরাজের ইচ্ছে পরের শো অথবা নাইটশোতে সুলেখাকে সিনেমা দেখিয়ে আনবেন।

চট্টরাজের মাথায় কিছু চাপলে রক্ষে নেই। তা না করে তিনি ছাড়বেন না—বড় বড় অফিসাররা এরকমই হয়ে থাকেন, সুলেখা শুনেছে।

সুলেখা বলেছে, "আজ আপনার মাথা ধরেছে—বদ্ধ হল্-এ বসে সিনেমা দেখার কোনো দরকার নেই। ছবিটা তো পালিয়ে যাচ্ছে না।"

চট্টরাজ কিন্তু অনড়। তিনি আজই সুলেখাকে ছবি দেখাবেন।

সুলেখা তখন বাধ্য হয়ে সত্যি কথা বললো। টিকিট পাওয়া সহজ হবে না। খুব ভিড় হচ্ছে। চট্টরাজ তাতেও দমলেন না। বললেন, "টিকিটের জন্যে চিন্তা করবেন না, সুলেখা। ওই ব্যাটা জগদীশ জেঠমালানি কোথায়?"

মতি কৃপালনির বাড়িতে ধর্ম আলোচনায় সাময়িক বাধা পড়লো। ধর্ম মাথায় রেখে বিজনেসের জন্যে জগদীশ জেঠমালানি এসে টেলিফোন ধরলেন। চট্টরাজের গলা শুনে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। "হ্যালো স্যর—আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাকি? আমি তাহলে এখনই চলে যাচ্ছি। পার্টনার চেঞ্জ করবার দরকার হলেও বলবেন, স্যর। আমাদের প্যানেলে মিসেস সায়গল আছেন, কালকে পর্যন্ত ওঁর কিছু অসুবিধে ছিল—আজ থেকে অ্যাভেলেব্‌ল।"

চট্টরাজ বললেন, "না, ওসব কিছু দরকার নেই। আজকের নাইটশোতে আমার দুখানা টিকিট চাই। অ্যাট এনি কস্ট্‌।"

জেঠমালানি বেশ অবাক হয়ে গেলেন। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে যাঁরা আসেন তাঁরা তো কখনও বাইরে বেরুতে চান না। তাই সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল। সুলেখা সেন হয়তো তেমন সন্তুষ্ট করতে পারছে না এই বিশিষ্ট অতিথিকে। জগদীশ জেঠমালানি তাই আবার বললেন, "আপনি একটুও অস্বস্তি বোধ করবেন না, স্যার। সুলেখা সেনকে চেঞ্জ করে দিতে একটুও অসুবিধে হবে না। দরকার হলে মিসেস সায়গলকে আমি নিজে গাড়ি নিয়ে কলেক্‌ট করে আনবো। সুলেখাও কিছু মনে করবে না—ওরা জিনিসটা স্পোর্টিংলি নেয়।"

চট্টরাজ বেশ লজ্জা পেয়ে গেলেন। জানিয়ে দিলেন, দু'খানা সিনেমার টিকিট হলেই চলবে। আর কিছুই চাই না। টিকিটের কথাও বলতাম না, কিন্তু শুনছি, ভীষণ ভিড় হচ্ছে।

"তার জন্যে একটুও চিন্তা করবেন না। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে সব জায়গায় 'জান-পয়ছান' আদমী আছে—দরকার হলে নতুন টিকিট ছাপিয়ে আপনার হাতে দিয়ে যাবে।"

জেঠমালানি এর পর নিজেই ছুটেছিলেন টিকিটের সন্ধানে এবং পাকা এক ঘণ্টা পরে ড্রাইভার এসে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে দু'খানা সিনেমার টিকিট মিস্টার চট্টরাজের হাতে দিয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার অবশ্য কিছুই বুঝতে পারেনি, কারণ টিকিট দুটো এসেছিল সীলকরা খামে—যার এককোণে লেখা ছিল 'পার্সোনাল', অন্যকোণে মিস্টার নির্মল চট্টরাজের নাম।

দূরদর্শী জেঠমালানি ছোট্ট একটা চিরকুটে আরও জানিয়েছিলেন, পত্র-বাহক ড্রাইভার চট্টরাজের সেবার জন্যে প্রস্তুত। যেখানে খুশি যতক্ষণ ইচ্ছে এই বাহনটিকে তিনি রাখতে পারেন।

বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সুলেখা। জগদীশবাবু যদি সন্দেহ করেন, সিনেমা দেখার মতলবটা সুলেখাই দিয়েছে। নিজের প্রাইভেট কাজকর্ম মাথায় উঠিয়ে ভদ্রলোককে ছুটতে হয়েছে টিকিটের সন্ধানে এবং এই ছবির টিকিট যোগাড় করতে তাঁকে যে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাও সে আন্দাজ করতে পারছে।

পরেরদিন জগদীশবাবু নিজেই খোঁজখবর করতে এসেছিলেন। নির্মল চট্টরাজ তখন সরকারী গেস্টহাউসে ফিরে গিয়েছেন। চট্টরাজমশায় স্বয়ং সুলেখাকে নিয়ে সিনেমা গিয়েছেন জেনে জগদীশ জেঠমালানি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। প্রচুর প্রশংসা করলেন সুলেখার ; বললেন, "এই একটা কেসের ওপর আমার অনেক কাজকর্ম নির্ভর করছে। মিস্টার চট্টরাজ আরও কয়েক-দিন কলকাতায় আছেন। ঐ ক'দিনে তুমি কী করতে পারো, দেখিয়ে দাও সুলেখা।"

চট্টরাজের টেলিফোন নম্বরটাও লিখে এনেছিলেন জগদীশ জেঠমালানি। ওঁর ইচ্ছে, সুলেখা নিজেই ওঁকে ফোন করে এখানে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানাক।

সুলেখা নিজে কিন্তু বেশ অস্বস্তি বোধ করেছিল। কাউকে এইভাবে ডাকাডাকি করতে তার রুচিতে বাধে। সুলেখার ধারণা চট্টরাজ নিজেই আবার তার খোঁজখবর করবেন।

সুলেখার আন্দাজ মিথ্যে হয়নি। চট্টরাজ নিজেই এক সময় গেস্টহাউস থেকে জেঠমালানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং সুলেখার ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন। বিনয়ে বিগলিত জগদীশ জেঠমালানি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "বাড়ি ঘরের ঠিকানা কিছুই দরকার নেই, স্যার। আমার চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট ও সুলেখা রিজার্ভ থাকবে ওনলি ফর ইউ—আপনি যতদিন চাইবেন ততদিন। কোনো অসুবিধে নেই।" মিঃ চট্টরাজের মতো 'ফিরেন্ডদের' যাতে ক্যালকাটায় এসে কোনোরকম 'ট্রাব্‌ল' না হয় তার জন্যেই তো সামান্য একটু ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি ওই থ্যাকারে ম্যানসানে।

কয়েকবারের পদধূলিতে চট্টরাজ অনেক বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন সুলেখার। ধানবাদের যে বিখ্যাত সরকারী প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন কেষ্ট-বিষ্টু তারও অনেক কথা সুলেখাকে তিনি বলেছেন। এক সময় চট্টরাজ দুঃখও করেছেন, কলকাতায় তাঁর থাকবার দিন ফুরিয়ে এলো।

যাবার দিন অবশেষে উপস্থিত হলো। সুলেখার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছিলেন সরকারী প্রকল্পের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসার এন সি চট্টরাজ। নিতান্ত অভ্যাসের বশেই সুলেখা মিষ্টিভাবে বলেছিল, "আবার আসবেন।" তারপর মনে-মনে সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ক্ষণিকের অতিথিকে আবার আসতে বলার সে কে ? চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট তো তার নিজের বাড়ি নয়। এখানকার আসা যাওয়া কোনোটাই তো সুলেখার ইচ্ছা অথবা মত অনুযায়ী ঠিক হয় না। এখানে যাঁরাই আসেন তাঁরা কেউ তো সুলেখার অনুমতি নিয়ে আসেন না।

চট্টরাজেরও বোঝা উচিত ছিল, পুনরাগমনের যে নিমন্ত্রণ সুলেখার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে তা নিতান্তই সৌজন্যবশত। কিন্তু চট্টরাজও কয়েক মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেলেন—যেন কলকাতার এই সব সাময়িক ব্যবসায়িক সান্নিধ্যের মধ্যেও বিয়োগব্যথার সম্ভাবনা রয়েছে।

চট্টরাজ বলেছিলেন, এই মাস শেষ হবার আগেই নির্ধারিত একটি দিনে তিনি এই থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে আসবেন। সুলেখা বিশ্বাস করেনি। বলেছিল, "আপনার কত কাজ। ধানবাদে গিয়ে চেয়ারে বসলে আপনি সব ভুলে যাবেন!"

জগদীশ জেঠমালানি ও তাঁর ভাগ্নে রাজু তো আহ্লাদে আটখানা। চট্টরাজ যে আবার আসবেন এ-কথা নিজে থেকে বলেছেন তা তাঁরা ভাবতেই পারছেন না। খুশীর ধাক্কায় জগদীশবাবু পারমিশান দিয়েছেন সুলেখাকে কয়েকখানা শাড়ি কিনে ফেলতে, নিজের পছন্দ অনুযায়ী। ওঁদের হাবভাব দেখে মন হচ্ছে যেন এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ তাঁদের কাছে নত হতে চলেছে।

পুরোপুরি কিছুই বলেন না জগদীশবাবু, অথবা তাঁর ভাগ্নে। তবে

দুজনকার সঙ্গে আলাদা-আলাদা কথাবার্তায় কিছু কিছু খবর আন্দাজ করেছে সুলেখা। কোনো একটা বড় অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যাপারে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। বোধহয় নির্ধারিত মানের অনেক নিচু যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছেন জেঠমালানি কোম্পানি। এইসব যন্ত্রপাতি সরকারী প্রকল্প থেকে রিজেক্‌টেড হয়ে ফিরে আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সব ব্যাপারে মিস্টার চট্টরাজের বোধ হয় বিশেষ কিছু করবার ক্ষমতা আছে।

সুলেখা একবার ভেবেছে, রাজুবাবুকে জিজ্ঞেস করে, বড় বড় কল-কারখানায় ভাল জিনিস পাঠালেই হয়—তাহলে তো এইসব হাঙ্গামা থাকে না। রাজু ছেলেটি এখনও মামার মতো সেণ্ট-পার-সেণ্ট সেয়ানা হয়ে ওঠেনি : মাঝে-মাঝে সে সত্যি কথা বলে ফেলে। রাজুর সেদিন মুড ভাল ছিল. বিজনেসের অনেক কিছু সে নতুন শিখছে। সেণ্ট জেভিয়ারের ফাদারদের পদতলে জীবনের প্রথম শিক্ষালাভ করে, মামার কাছে রাজুর শিক্ষার চরম পর্ব চলেছে। রাজু বলেছে, “বিজনেস ইজ বিজনেস, সুলেখা। কম দামে গরমেণ্টকে সবচেয়ে ভাল জিনিস সাপ্লাই করলে প্রফিট আসবে কোত্থেকে ?” সুলেখার মাথায় কথাগুলো ঠিক ঢুকছে না। অন্য কোনো মালিক হলে. এতোক্ষণে সুলেখার সাহস দেখে অবাক হয়ে যেতেন, হয়তো কথার উত্তরই দিতেন না। কিন্তু রাজু সুলেখাকে সন্তুষ্ট রাখতে উৎসুক। নিজের এক বন্ধুকে নিয়ে সে একদিন নিঃশব্দে এই চৌত্রিশ নম্বরে আসতে চায়—কিন্তু মামা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারেন।

রাজু বলেছে, “আপনি এসব প্রফিট-লসের অঙ্ক বুঝতে পারবেন না, মিস সেন। অনেক টাকা খরচ করে, অনেক পরিশ্রমে এম-কম, সি-এ, এম-বি-এ পড়ে অনেক মাথা খাটিয়ে এসব আমাদের শিখতে হয়।” কথাবার্তায় রাজু-বাবু যে সার সত্যটি বুঝিয়ে দিলেন, তা হলো, ন্যায্যদামে সরকারকে ভাল মাল সাপ্লাই করলে, লালবাতি জ্বালাতে জেঠমালানি কোম্পানির মাত্র কয়েক মাস লাগবে।

ভাগ্যে সুলেখা বড় বড় পরীক্ষায় বসেনি। রাজুবাবুর কথাগুলোর ভিতরে ঢুকবার সে কোনো চেষ্টা করলো না।

যথাসময়ে জগদীশ জেঠমালানি নিজে এসেছেন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে। মিস্টার চট্টরাজের আসন্ন আবির্ভাব দিবসে যাতে কোনোরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় তার ব্যবস্থা পাকা করতে চান তিনি। সুলেখাকে পার্ক স্ট্রীট পাড়ার বিখ্যাত রেস্তোরাঁর কয়েকখানা ব্ল্যাংক স্লিপ দিয়েছেন তিনি। ওই স্লিপে কারুর হাতে লিখে পাঠালেই খাবার আসবে—কোনো ক্যাশ টাকা দেবার দরকার হবে না। স্লিপের ব্যাপারটা সুলেখার জানা ছিল না—জগদীশ জেঠমালানি ইচ্ছে করেই যেন এতোদিন ব্যাপারটা তার কাছে চেপে রেখেছিলেন।

নির্ধারিত দিনে চট্টরাজ কিন্তু এলেন না। সেই বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত সুলেখা অপেক্ষা করেছে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে। দশটার সময় জগদীশ-বাবু নিজে ফোন করেছিলেন। অতিথি তখনও এসে পৌঁছননি শুনে তিনি নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সুলেখা একটু বিরক্ত হলেও, নিজেকে শান্ত করে নিয়েছে। চট্টরাজ যদি আসবেন বলে না আসেন তো কী করা যাবে? আসা না আসাটা তাঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। ভোরবেলায় জগদীশবাবু আবার ফোন করেছিলেন। "সুলেখা, কাল তোমার নিশ্চয় দুশ্চিন্তায় কেটেছে।" সুলেখা সংগে সংগে শুনিয়ে দিয়েছে, "মোটেই না। উনি তো আমার স্বামী নন, যে বাড়ি না ফিরলে পা-ছড়িয়ে কাঁদতে বসবো!"

সুলেখা সাধারণত এই ধরনের কথা বলে না, কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। জগদীশবাবু কিন্তু চিন্তা ত্যাগ করতে পারছেন না। তাঁর হিসেবের খাতায় চট্টরাজ এই মুহূর্তে স্বামীর চেয়েও বড়!

সেই সকালেই জগদীশ জেঠমলানি যে অনুপস্থিত অতিথির খবরাখবর নিতে ধানবাদে ছুটবেন তা সুলেখা কল্পনা করেনি। কাজ হাসিল করবার জন্যে এঁরা পারেন না এমন কিছু কাজ নেই। অন্য সময় হলে হয়তো সোজা-সুজি চট্টরাজের কাছে টেলিফোন বুক করতেন। কিন্তু এ-বাপারে টেলিফোনে কথা বলাটা বোধ হয় সমীচীন মনে করলেন না জগদীশবাবু।

এতোক্ষণ হুড় হুড় করে নিজের জীবনের সব কথা অকপটে বলে যাচ্ছিল সুলেখা সেন। আমিও অবাক হয়ে তার প্রতিটা শব্দ গিলে খাচ্ছি-লাম। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের অজানা রহস্যের পর্দা যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে আমার চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছে। আমি যেন সব কিছু জানবার দৈবশক্তি অর্জন করেছি।

সুলেখা সেন একটু চুপ করলেন। ওঁর সামনে চায়ের কাপ প্রায় বোঝাই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিজের কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ চায়ে চুমুক দেবার সময় পায়নি সুলেখা—ম্যানেজারবাবুর জন্যে পাঠানো স্পেশাল চা ঠান্ডা হতে হতে পুরু সরের আচ্ছাদনে বন্দী হয়েছে। হাত দিয়ে কাপের উষ্ণতা অনুভব করলো সুলেখা। আমি বললাম, "কোনো অসুবিধে নেই. আর এককাপ চায়ের অর্ডার দিচ্ছি।"

সুলেখা নিজের মণিবন্ধে আঁটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে কেউ খোঁজ করতে আসেনি?"

বললাম, "দাঁড়ান আমি দেখে আসছি।"

সুলেখা বললো, "নতুন একটা গাড়ি আসবে।"

সুলেখা যে চঞ্চল হয়ে উঠছে তা বেশ বুঝতে পারছি।

সুলেখা চঞ্চল, কিন্তু আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। বললাম, "এই তো ফোন করলেন। সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি।"

বাইরে একবার নজরও দিয়ে এলাম। থ্যাকারে ম্যানসনের কমপাউণ্ডে কোনো গাড়িই অপেক্ষা করছে না।

সুলেখা কার জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে। আমার সান্ত্বনা-বাক্যে তেমন ফল হলো না, কারও আসন্ন আগমনের প্রতীক্ষায় সে সত্যিই অধীর হয়ে উঠেছে।

এসব ক্ষেত্রে আরও বেশী আশা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হেসে বললাম, "আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার মন বলছে, মিনিট পনেরোর মধ্যেই আপনি যার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি সশরীরে হাজির হবেন।"

আমার আকাশবাণীতে সুলেখার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আরও নিশ্চিত হবার জন্যে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "সত্যি? আপনার মন বলছে?"

মনে মনে আমি তখন অন্তত প্রার্থনা করছি, সুলেখার মনস্কামনা পূর্ণ হোক—সুতরাং 'আমার মন বলছে', কথাটা দ্বিতীয়বার শুনিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করলাম না।

দ্বিতীয় কাপ চায়ে সুলেখা এতোক্ষণে নিশ্চিন্তে চুমুক দিলো এবং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো, "কার মুখ দেখে উঠেছিলেন আজ? আপনার অনেক সময় নষ্ট হলো।"

কার মুখ প্রথম দেখেছিলাম, মনে করতে পারছি না। তবে সুলেখার সৌজন্য আমাকে হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা আবার মনে করিয়ে দিলো। সুলেখা আমার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "একখানা ভাঙা বাড়ির টেমপোরারি ম্যানেজারের জীবনে সময়ের মূল্য কতটুকু বলুন?"

"আপনি টেমপোরারি?" সুলেখা একটু অবাক হলো।

সুলেখাকে কী করে বোঝাই, আমি মুখের কথায় চাকরির অ্যাপয়েনটমেনট পেয়েছি। আমার পকেটে কোনো অ্যাপয়েনটমেনট লেটার নেই—আর মাইনে, তার পরিমাণ বলে ভদ্রসমাজে নিজের লজ্জার বোঝা কেন আরও বাড়িয়ে তুলি।

সুলেখাকে বললাম, "চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু না-পেয়ে আমাকে এখানেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। চাকরির দেবতা আমাকে নিয়ে বারবার খেয়ালী খেলায় মত্ত হচ্ছেন, এবং অসহায় আমি এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া অসহায়ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছি।"

সুলেখা তবু আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলো না। তার ধারণা আমি থ্যাকারে ম্যানসনেব মালিকদের আপনজন। আমাকে হঠাৎ এই ম্যানসনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠাবার পিছনেও গভীর কোনো অভিসন্ধি আছে।

সুলেখার কথা শুনে আমি অবাক। সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এসব

কী বলছেন, আপনি?"

সুলেখা হেসে উত্তর দিলো, "চোখ আর কান দুই সজাগ রেখেছি। এখন মুখ খুলবো না, তবে যথাসময়ে আপনার কানে কিছু খবর পৌঁছে দেবো। সেই প্রথম দিনের আচমকা ঘটনা থেকে আমি আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি।"

সুলেখা এবার পুরনো কথায় ফিরে গেলো। চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সুলেখা বললো, "আপনি চাইনীজ জেসমিন গ্রীন টি পছন্দ করেন?"

চায়ের রং কালো বলেই জানি—সবুজ চায়ের বিলাসিতা এখনও আমার অজ্ঞাত। সুলেখা বললো, "আমার ব্যাগে অনেকখানি জেসমিন চা আছে—একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই, আপনাকে খাওয়াবো। মিস্টার চট্টরাজ খুব পছন্দ করতেন, তাই মিস্টার জেঠমালানি হংকং থেকে স্পেশালি আনিয়েছিলেন।"

ভি-আই-পিদের জন্যে বিশেষভাবে আনানো উপহার আমাদের সহ্য হবে কিনা ভাবছি। ঠিক সেই সময় সুলেখা আবার শুরু করলো চট্টরাজের গল্প। এর আগে শুনেছিলাম, নির্দিষ্ট দিনে মিস্টার চট্টরাজ আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে না আসায় খোঁজখবর নেবার জন্যে জগদীশ জেঠমালানি স্বয়ং ছুটেছিলেন ধানবাদে।

ধানবাদ থেকেই জগদীশবাবু ট্রাংক টেলিফোনে সুলেখার সংগে যোগাযোগ করেছিলেন এবং এন সি চট্টরাজের খবরাখবর দিয়েছিলেন। যেন ভদ্রলোকের খবর না-পাওয়া পর্যন্ত সুলেখার ঘুম হচ্ছে না। জগদীশবাবু বলছিলেন, "সুলেখা, কোনো চিন্তার কারণ নেই—মিস্টার চট্টরাজ ভালই আছেন। আপিসের কাজের প্রেসারে ওঁর পক্ষে সেদিন কলকাতায় যাওয়া সম্ভব হয়নি।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখবার আগে জগদীশবাবু বলেছিলেন, "সুলেখা, তোমার সামনে মস্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কাল আপিসে ফিরে তোমাকে সব কথা বলবো।"

'চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ আবার কী?' ওসব কথা শুনলে সুলেখার চিন্তা বেড়ে যায়। জগদীশবাবু হেসে বললেন, "সমস্তই সুখবর, সুলেখা।" তারপর সেই বিখ্যাত জেঠমালানির মন্তব্য ঃ 'ফিকর্ মত্ কীজিয়ে।'

পরের দিন জেঠমালানি নির্দিষ্ট সময়ে চৌত্রিশ নম্বরে সুলেখার কাছে চলে এসেছিলেন। চট্টরাজের পাঠানো একটা উপহারের প্যাকেট জগদীশবাবু নিজের হাতে বয়ে এনেছেন। জগদীশবাবুর অতিথিরা সাধারণত এখানে এসেই ধন্য করে দিয়ে থাকেন। এঁদের কেউ যে সুলেখার জন্যে কিছু উপহার পাঠাতে পারেন, তা সুলেখা নিজেও কোনোদিন ভাবেনি।

বিজয় উল্লাসে মুখ উজ্জ্বল করে জগদীশবাবু জানালেন, "মিস্টার চট্টরাজ নিজেই এই উপহার নিয়ে তোমার কাছে আসছিলেন। কিন্তু আপিসের নতুন বড় সায়েব বাদ সাধলেন, তিনি লাস্ট মোমেণ্টে ওঁর কলকাতায় আসা ক্যানসেল করে দিলেন।"

প্যাকেটের মধ্যে কী আছে তা জগদীশবাবুর জানবার কথা নয়। কিন্তু চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করে নিজের হোটেলে ফিরে এসেই তিনি সুলেখার

প্যাকেটটা খুলে ফেলেছিলেন। কাজটা যতই অশোভন হোক জগদীশবাবু দায়িত্ব অস্বীকার করলেন না। সুলেখাকে বললেন, "আপনজন ছাড়া আর কারুর প্যাকেট ক্যারি করা আমার চাচার বারণ। এইভাবে অনেক সময় বেআইনী মাল চালান হয়।"

সুলেখা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে জগদীশবাবুর ওপর। কিন্তু জগদীশবাবু সোজাসুজি বললেন, "গোরমেণ্ট অফিসারই বলুন, আর বিজনেস আদমী বলুন—কাউকে 'পুরা বিশোয়াস' করা ঠিক নয়। যদি এই প্যাকেটে সোনা বা ফরেন কারেন্সি থাকতো, এবং রাস্তায় পুলিস আমাকে সার্চ করতো, তাহলে কী হতো?"

জগদীশবাবু অবশ্য খুলে দেখেছেন প্যাকেটের মধ্যে একটা সুন্দর শাড়ি আছে। সেই সঙ্গে একটা কার্ড, যার ওপর মিস্টার চট্টরাজের নিজের হাতে নাম লেখা। জগদীশবাবু ভেবেছিলেন, সঙ্গে হয়তো কোনো চিঠিও থাকবে।

চিঠি না থাকায় সুলেখা আশ্বস্ত হলো। কিছু লেখা থাকলে এখনই তা জগদীশবাবুকে পড়ে শোনাতে হতো। মেয়েদের লাজ-লজ্জার কোনো মূল্য এদের কাছে নেই।

জগদীশবাবু এবার কাজের কথা তুললেন। গলার স্বর একটু নিচু করে তিনি বললেন, "মিস্টার চট্টরাজের এখন কাজকর্মের যা অবস্থা তাতে ওঁর পক্ষে ধানবাদের বাইরে আসা-যাওয়া করা খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে উঠলো। সপ্তাহে একদিন ছুটি আছে, কিন্তু ভদ্রলোকের যা স্বভাব বেশী ছুটোছুটি পছন্দ করেন না। ছুটির দিনে, কষ্ট করে উনি যে কলকাতায় এসে হাজির হবেন, তা মনেই হয় না। অথচ ওঁর সঙ্গে আমাদের যে রিলেশন গড়ে উঠছে তা নষ্ট হতে দেওয়া চলে না।"

জগদীশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল সুলেখা। ভদ্রলোক জানালেন, "খারাপ মাল সাপ্লাই করার কেসটা এখনও কিছুদিন ঝুলে থাকবে মনে হয়।"

এর পরেই প্রস্তাবটা করলেন জগদীশবাবু। বললেন, "মিস সেন, আমরা কলকাতায় ক্রমশ সেকেলে হয়ে যাচ্ছি—সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চেষ্টা করছি না আমরা। অথচ বম্বে, দিল্লী, ম্যাড্রাস আমাদের পিছনে ফেলে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।"

জগদীশবাবুর কথা কোন্ দিক থেকে মোড় নিচ্ছে সুলেখা তা বুঝতে পারছে না। জগদীশ জেঠমালানি এবার সোজাসুজি বললেন, "আমার বম্বে কাজিন সুন্দর জুড়েমালানি রায়পুরে রোরিং বিজনেস করছে। বোম্বাই থেকে দু'জন স্পেশালি চার্টার্ড লেডি পাঠিয়েছে রায়পুরে। আমরা কলকাতার বিজনেসমেনরা এসব বোম্বাই ট্রিকস জানিই না। নো ওয়াণ্ডার, আমরা ক্রমশ বম্বের কাছে হেরে যাচ্ছি।"

জগদীশবাবু বললেন, "তোমাকে এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করতে হবে সুলেখা। আমি ধানবাদে একটা ছোট্ট বাড়ির ব্যবস্থা করে এসেছি। ওখানেই তুমি উঠতে পারবে—কোনো অসুবিধা হবে না। স্পেশাল টাকা দিয়ে ওখানে ফোনও আনিয়ে দেবো—যাতে মিস্টার চট্টরাজের সঙ্গে যোগাযোগের তোমার কোনো অসুবিধে না হয়।"

জগদীশ জেঠমালানি বললেন, "বাড়িটা সবদিক থেকে আইডিয়াল। মিস্টার চট্টরাজের অফিসের স্টাফ কোয়ার্টারগুলো যেদিকে এই বাড়িটা তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে।"

ওইখানে গিয়ে বসবাসের হুকুম পেয়ে গেলো সুলেখা। "যতদিন খুশী ওখানে গিয়ে থাকো সুলেখা। একটা কাজের পুরো দায়িত্ব তোমার ওপর চাপিয়ে আমি নিশ্চিত থাকতে চাই।"

সুলেখা বুঝতে পারছিল না, ওখানে নিজের পরিচয় কী দেবে। ছোট জায়গায় লোকের কৌতূহল অনেক বেশী। হাঁড়ির খবর না-জানা পর্যন্ত তাদের তৃপ্তি হয় না।

জগদীশ জেঠমালানি সগর্বে বললেন, "সেইজন্যেই তো স্পেশাল বাড়ির ব্যবস্থা করলাম সুলেখা। বাড়ির চারদিকে পাঁচিল, গেট খুলেই সামনে বাগান এবং বাড়ির পিছনেও বাগান। বাইরে থেকে তাকিয়ে ভিতরে কী হচ্ছে বোঝা অসম্ভব।"

সুলেখার চোখের সামনে ততক্ষণে ছোটবেলার স্মৃতি ভেসে উঠছে। সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

জগদীশবাবু বললেন, "কোনো চিন্তা নেই সুলেখা। তোমার যখন খুশী কলকাতায় বেড়াতে চলে আসবে। মাঝে মাঝে যাতে কয়েকটা ক্যাজুয়াল লীভ পাও, তার জন্যে আমি চট্টরাজকে বলে দেবো।"

ক্যাজুয়াল লীভ কথাটা ব্যবহার করে নিজের রসিকতায় নিজেই আনন্দ উপভোগ করলেন জগদীশ জেঠমালানি। মুখ টিপে হেসে তিনি বললেন, "বাড়িটা দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে, সুলেখা। ওখানে এখন কিচেন গার্ডেন আছে—জাঁকিয়ে বসে, তুমি ইচ্ছে করলে ফুলের বাগান কোরো, আমি অ্যাজ এ স্পেশাল কেস পুরো খরচ দেবো। শুধু মিস্টার চট্টরাজকে জিজ্ঞেস করে নিও উনি কী ফুলগাছ পছন্দ করেন।"

কলকাতার এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে দূরে ছোটবেলার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ধানবাদের একটা আস্ত বাড়ির শান্ত জীবন সুলেখাকে হাতছানি দিচ্ছে। জগদীশবাবু নির্লজ্জের মতো বলছেন, "তুমি ওখানে খুব সুখে থাকবে। একজন মাত্র মনিব তোমার।"

কিন্তু কী পরিচয় দেবে সুলেখা? সেই কথাটা জগদীশবাবু খুলে বলছেন না।

সুলেখার প্রশ্নে জগদীশবাবু এবার মাথা চুলকোলেন। বললেন, "জেঠ-মালানি কোম্পানির নাম যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে।"

সুলেখা সেন এবার আমার সামনে হেসে ফেললো। বললো, "ধানবাদে আমার পরিচয় কী জানেন? থ্যাকারে অ্যান্ড কোম্পানির অফিসার। আমাদের হেড আপিসের ঠিকানা ঃ ৩৪ নম্বর থ্যাকারে ম্যানসন! জগদীশবাবুই বুদ্ধিটা বাতলে দিলেন, কিছু প্যাডও ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

জগদীশবাবু বলেছিলেন, "থ্যাকারে অ্যান্ড কোম্পানির পরিচয় দিয়ে তুমি যেখানে খুশী যেতে পারবে। তেমন দরকার হলে, মাঝে মাঝে দু'একটা বিজনেস কোটেশন পাঠাবে—আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর চড়াবার বুদ্ধিটাও জগদীশবাবুর। জোর করে সেদিনই আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। যাবার আগে আমার কী রকম ভয় ভয় করতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্টার চট্টরাজ আমাকে এক্সপেক্ট করছেন তো?"

জগদীশবাবু হা-হা করে হাসলেন। "উনি এখনও কিছু জানেন না।

আমি চাই তুমি ওঁকে একটা প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ দেবে।"

এ লাইনে কাজকর্ম করেও সুলেখা যে এখনও পাকাপোক্ত হয়নি তা তার কথাবার্তায় বোঝা যায়।

সে বললো—"আমি জগদীশবাবুকে বললাম, আমি যাচ্ছি বটে। কিন্তু মিস্টার চট্টরাজের সঙ্গে যেচে দেখা করতে পারবো না।"

সুলেখা বললো, "কাজ হয়েছিল আমার কথায়। জগদীশবাবু আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েই বোধ হয় ট্র্যাঙ্কে কথা বলেছিলেন। স্টেশনে নেমেই প্ল্যাট-ফরমে খোদ মিস্টার চট্টরাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।"

লোকলজ্জার ভয় উপেক্ষা করে মিস্টার চট্টরাজ যে সুলেখাকে অজানা জায়গায় নিতে এসেছেন, এতেই সুলেখার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। সুলেখা বললো, "আমার সিঁথির সিঁদুরটা যে ওঁকে অনেক অস্বস্তি থেকে রক্ষে করছে তা বুঝতে পারলাম। দু-একজন পরিচিত লোকের সঙ্গেও ওঁর দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে। আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললাম। আমি যেন ওঁর কোনো আত্মীয়া। বিদেশে চাকরির ব্যাপারে এসেছি—তাই 'নির্মলদা' নিজে স্টেশনে এসেছেন আমাকে রিসিভ করতে।"

অবস্থার চাপে পড়ে দুজনে চুপি-চুপি নিজেদের ভূমিকা স্থির করে ফেললাম। আমি মিসেস সুলেখা সেন। আমার 'স্বামী' শুভ্র সেন এখনও ফরেনে ট্রেনিং-এ রয়েছেন—কিছুদিন পরেই বম্বেতে পোস্টিং পাবেন। তখন হয়তো থ্যাকারে অ্যাণ্ড কোম্পানির চাকরি ছেড়ে আমি বোম্বেতে চলে যাবো। এ যুগের মডার্ন মেয়ে—বিয়ের পরেও কিছুদিন চাকরি-বাকরি করে নিচ্ছেন।

সুলেখা বললো, "আমার স্বামীর নামকরণটা মিস্টার চট্টরাজই করে দিয়েছিলেন। আমার খুব-উ-ব ভালো লেগে গিয়েছিল, শংকরবাবু। আপনার কী রকম মনে হয়, নামটা?"

আমি সুলেখার সরল মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ওর ভাবভঙ্গীর আড়ালে যে নিষ্পাপ বালিকাটি লুকিয়ে রয়েছে তাকে ঘৃণা করবার মতো শক্তি আমার নেই।

"সুলেখা ও শুভ্র। রাজযোটক বলা যায়। খুব সুন্দর মিল হয়েছে।" আমি উত্তর দিতে প্রায় বাধ্য হই।

সুলেখা বললো, "সে-রাত্রে হঠাৎ যেন ব্যাপারটা আমার কাছে সত্যি-সত্যি মনে হয়েছিল, শংকরবাবু।"

আমি সুলেখার থমথমে মুখের দিকে তাকালাম। সুলেখা বললো, "অনেক রাত্রে ধানবাদের সেই বাড়িটার বিছানায় একা-একা শুয়ে মনে হলো, সত্যিই আমি মিসেস সুলেখা সেন। আমার স্বামী শুভ্রর ফ্রেমে-বাঁধানো ছবিটা যেন আমার মাথার কাছে টেবিলে সাজানো রয়েছে। শুভ্র মিথ্যে নয়—সে যেন সত্যিই ট্রেনিং-এ গিয়েছে, ট্রেনিং থেকে সে আমায় গতকালও চিঠি লিখেছে। শুভ্র, আমার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী, ফিরলো বলে। বম্বে দিল্লী কলকাতা নয়—এই ধানবাদেই সে ফিরে আসবে, এখানেই তার পোস্টিং হবে—এবং সেই জন্যই আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করছি।"

সুলেখা সম্বন্ধে আমার মনে যত ঘৃণা ও বিরক্তি জমা হয়েছিল, তা হঠাৎ কেটে যাচ্ছে। সন্দেহের কুয়াশা কাটিয়ে সুলেখাকে আমি আরও স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছি। ওর ধানবাদের জীবন সম্বন্ধেও এক বিচিত্র কৌতূহল আমাকে গ্রাস করছে। আমি জানতে চাই, ছোটবেলার সেই পরিবেশে সুলেখা অবশেষে সুখী হলো কিনা। আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর, ঐ চট্টরাজের সঙ্গেই সুলেখার কিছু একটা স্থিতি করিয়ে দাও। নির্মল ও শুভ্র—এর মধ্যে তো তফাৎ নেই বললেই হয়।

'হে ঈশ্বর', আমি তখন প্রার্থনা করছি, 'সুলেখার চঞ্চল নিরাশ্রয় জীবনে এবার তুমি স্থিতির আশীর্বাদ এঁকে দাও।' সুলেখা যদি চট্টরাজের সঙ্গে মিলনের জন্যেই, জেঠমালানির সঙ্গে সম্পর্ক চুকোতে কলকাতায় ফিরে এসে থাকে, তাহলে আমি তাকে কোনো সাহায্য দিতে কার্পণ্য করবো না। প্রয়োজন হলে সুলেখা আজ আমার ঘরেও রাত্রি যাপন করতে পারে। আমাদের এই আপিসঘরটা মন্দ নয়। এখানকার টেবিলে অনায়াসে একটা-দুটো রাত্রি আমি কাটিয়ে দিতে পারবো।

সুলেখা ততক্ষণে বলতে শুরু করেছে, "কী আশ্চর্য! যে-বাড়িটা আমার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা আমার খুবই চেনা। ছোটবেলায়, ওখানে দিনের পর দিন খেলা করেছি। যে পেয়ারা গাছটায় উঠে পেয়ারা পেড়েছি সেটাও ঠিক একই রকম রয়েছে। বাবার অফিসার ওই বাড়িতে থাকতেন। আমার সমবয়সী একটি মেয়ে থাকতো ওই বাড়িতে—শ্যামলী। শ্যামলীর খুব ভাল বিয়ে হয়েছে। ওর স্বামী বার্কলেতে থাকে। মস্ত কী এক রিসার্চ করে। শুনেছি, শ্যামলীও ওখানে চলে গিয়েছে—ওরা সুখে-শান্তিতে ঘর করছে।"

সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। নীরব ভাষায় জিজ্ঞেস করছি, 'সুলেখা তুমি এবার শেষের কথা কিছু বলো। তুমি বলো, সীমা অবশেষে তার শান্তি খুঁজে পেয়েছে। মিলনান্ত নাটকের প্রারম্ভিক দুঃখ-পর্ব অতিক্রম করে সীমা অবশেষে সুখী হতে চলেছে, এবং অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে তুমি শেষবারের মতো জগদীশ জেঠমালানির চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে বিনা নোটিশে হাজির হয়েছ।'

সুলেখাকে প্রশ্ন করা হলো না। হঠাৎ থ্যাকারে ম্যানসনের কম্পাউণ্ডে একটা নতুন অ্যামবাসাডর গাড়ির অস্থির হর্ন বিরক্তিকরভাবে বেজে উঠলো।

হর্ন শুনেই সুলেখা চমকে উঠলো। এই সুর যেন তার চেনা। সুলেখা মুহূর্ত সময় নষ্ট না-করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এবং আমি আবার সুলেখার মালপত্তরের জিম্মাদার হয়ে অধীর প্রতীক্ষায় চেয়ারে বসে রইলাম।

এই অ্যামবাসাডর গাড়ি চড়ে সুলেখা এখনই অন্য কোথাও অদৃশ্য হবে নাকি? এই গাড়িতে কে এলেন? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে উঠছে। আমি নিজের অজ্ঞাতেই ক্রমশ সুলেখার সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি।

একটু পরেই সুলেখা ফিরে এলো। এখন তার মুখে-চোখে ভরসার ভাব ফুটে উঠেছে। সুলেখার মুখ উজ্জ্বল করে বললো, "সমস্যা মিটেছে—এতোক্ষণে জগদীশবাবুর আপিস থেকে ফ্ল্যাটের চাবি এলো। যা ভেবেছি তাই। আপিসের লোকদের কোনো দোষ নেই। মিস্টার জেঠমালানি যথা-সময়ে ভাগ্নে রাজুবাবুকে টেলিফোনে ইনসট্রাকশন দিয়েছেন চাবি পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু রাজুবাবু সেসব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের কাজে

বেরিয়ে গিয়েছিলেন।”

হাতের চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে সুলেখা বললো, “মাঝখান থেকে আমার পোড়া কপালের জন্যে আপনার এই ভোগান্তি হলো।”

সুলেখা আরও জানিয়ে দিলো, ব্যাপারটা সে অত সহজে ছাড়বে না। জগদীশবাবু কলকাতায় ফেরা মাত্র এর একটা বিহিত করবে। “রাজুবাবু যদি আপিস থেকে ফিরতে আরও দেরি করতেন, তা হলে কী হতো বলুন তো?”

যেসব মেয়েদের কোনো ঠিকানা নেই, তারা কলকাতার এই জনজঙ্গলে কী অবস্থায় পড়তে পারে তাই ভেবে ভুক্তভোগী আমি সমব্যথায় আঁতকে উঠলাম।

সুলেখা আর কথা বাড়ালো না। বললো, “ড্রাইভারটা যখন রয়েছে তখন ওকে দিয়ে একটু কাজ করিয়ে নিই।” এই বলে সারথীর স্কন্ধে সর্বস্ব চাপিয়ে সুলেখা যেন দ্রুতবেগে থ্যাকারে ম্যানসনের মূল ভবনে দ্রুত পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সুলেখার বিলীয়মান সুশাসিত তনুদেহের দিকে তাকিয়ে আমি তখনও আকাশ-পাতাল ভাবছি।

যে-প্রশ্নটা জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছি, তা হলো কী জন্য সুলেখা আবার এই থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে এলো? সুলেখার সঙ্গে জেঠমালানিদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের পালা কি চুকতে বসেছে? সুলেখা না-থাকলে, অন্য কোনো তপতী অথবা কমলার সঙ্গে জেঠমালানিরা ব্যবসার জাল পেতে বসবেন—জেঠমালানিদের ব্যবসায়িক জীবনের ধারাবাহিকতায় ছেদ টানবার মতো ক্ষমতা কোনো সুলেখা, তপতী অথবা কমলা আজও আয়ত্ত করতে পারেনি। তবু এই মুহূর্তে আমি সুলেখার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের কথাই ভাবছি। হাত জোড় করে কাতরভাবে অদৃশ্যলোকের সেই খেয়ালী পুরুষটিকে বললাম, হে সর্বশক্তিমান, সুলেখাকে এবার মুক্তি দাও। চট্টরাজের নিঃসঙ্গ জীবনে কামনার ক্লেদ মুছে দিয়ে তুমি ভালবাসার অভিষেক-উৎসবের আদেশ দাও।

তেলকালিবাবু ঠিক সেই অবস্থায় আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। আমাকে করজোড়ে প্রার্থনারত দেখে তিনি বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। “এ কি করলেন স্যর!” তেলকালিবাবুর গলায় রীতিমত বিস্ময়। “আমি ভেবেছিলুম, আপনি একটু আলাদা হবেন। কিন্তু, হা কপাল! আপনিও সরকার মশায়ের মতো এই কর্তাভজা পার্টিতে জয়েন করেছেন!”

তেলকালিবাবুর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম।

তেলকালিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, “হাঁটুগেড়ে, হাতজোড় করে, মাথা ঠুকে, আবেদন-নিবেদন জানিয়ে মানুষ কেন সময় নষ্ট করে?”

আমি স্বীকার করছি আমার বয়সের তুলনায় আমি একটু সেকেলে। তার

ওপর পড়াশোনা করেছি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে—সময়ে-অসময়ে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করাটাই সঙ্গত বলে জেনে এসেছি শৈশব থেকে।

তেলকালিবাবু বললেন, "ওসবের চূড়ান্ত করে দেখেছি, স্যার। আমার ছেলেটা যখন টাইফয়েডে পড়লো, তখন তিনদিন তিনরাত আমি ঈশ্বরের চরণে মাথা ঠুকেছি। কিন্তু পরে বুঝেছি, এসবের কোনো মানে হয় না। ঈশ্বর থাকলেও, তাঁর যে চোখ নেই, কান নেই, হাত নেই তা আমি লিখে দিতে পারি। ভদ্রলোক বধির বোবা কালা এবং অন্ধ না হলে সেদিন আমার ছেলেটাকে অমনভাবে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতেন না।"

তেলকালিবাবুকে এমনভাবে এ ক'দিনে আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। আজকের এই স্বল্পালোকিত সন্ধ্যায় উনি হঠাৎ আমার অনেক কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়ালেন।

তেলকালিবাবুর মুখের দিকে শান্তভাবে তাকালেও আমি কোনো প্রতিবাদ জানাই নি। সংসারের এই কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথে ঈশ্বরকে আমি সময়ে-অসময়ে স্মরণ করে চলেছি, কিন্তু আজও তিনি আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি, আমার কোনো প্রার্থনা গ্রহণ করেন নি।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলাম। ভোর-বেলায় এই সময় কত চিন্তার মেঘ রঙীন চলচ্চিত্রের মতো মনের আকাশে ভেসে যায়। আমার কিছুই করবার মতো শক্তি নেই, তবু দর্শকের আসনে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সহদেব সেই সময় ঘরে দু'বার হাল্কা টোকা দিয়ে ঢুকে পড়লো।

আমাকে সেলাম করে সহদেব বললো, "আপনি এখন চায়ের ব্যবস্থা করবেন না। চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণি আপনার জন্যে কেটলিতে চা ঢেলে দিয়েছেন। আমাকে বললেন, তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে আনতে, না-হলে চা কড়া হয়ে যাবে।"

বেশ বিপদে পড়া গেলো। না যাবার স্বাধীনতাটুকুও এখানে মনে হচ্ছে নেই। ভেবে-চিন্তে দেখবারও সময় নেই, যে এই সময়ে চৌত্রিশ নম্বর ঘরে আমার একাকী যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত কি না। চতুর চূড়ামণি সহদেব ছটফট করছে, আমাকে সে মনে করিয়ে দিলো, আর এক মিনিট দেরি করলেই চা কড়া হয়ে যাবে, এবং চৌত্রিশ নম্বরের এই দিদিমণি কড়া চা মুখে তুলতে পারেন না।

গেঞ্জির ওপর শার্টখানা চড়িয়ে এবং পায়ে চটি গলিয়ে অগত্যা সহ-দেবের পিছন-পিছন চৌত্রিশ নম্বরে ছুটতে হলো। "দাদাবাবুকে হাতে-হাতে নিয়ে এসেছি।" এই বলে সহদেব চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণির কাছে স্পেশাল ক্রেডিট নিলো এবং একটা হাল্কা সেলাম জানিয়ে গরম সিঙাড়া আনবার জন্যে অদৃশ্য হলো।

সুলেখাকে এখন অনেক শান্ত ও শ্রীময়ী দেখাচ্ছে। রাতের বিশ্রাম তার শরীর ও মনকে যে স্নিগ্ধ করে তুলেছে তা বোঝা যাচ্ছে। সুলেখা এখন একটা হাল্কা রংয়ের মিলের ছাপানো শাড়ি পরেছে। এই সকালেই যে স্নান সারা হয়েছে, তার প্রমাণ দেহের সর্বত্র জড়িয়ে রয়েছে।

যখন চৌত্রিশ নম্বরে এসেই পড়েছি, তখন পরিস্থিতি একটু হাল্কা করে ফেলা যাক। হেসে বললাম, "কই? চা ঢালুন। আপনি তো আবার কড়া চা

পছন্দ করেন না।”

সুলেখা এতোক্ষণ চায়ের পাতা ভেজায়নি—আমার সামনে সে টী-পটে চায়ের পাতা ফেললো। তারপর বললো, “সহদেবকে বলেছিলুম বটে, আমি চায়ের পাতা ফেলছি, তুই দাদাবাবুকে ডেকে আন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢালিনি—কেমন ভয় হলো, আমি ডাকলেও আপনি চৌত্রিশ নম্বরে যদি না আসেন।”

সুলেখার কথার মধ্যে এমন এক দুঃখের সুর জড়িয়ে ছিল যে আমার মনটা অকারণে বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, “আপনার যখন প্রয়োজন হবে তখন ডেকে পাঠাবেন। আমি ঠিক আসবো।”

সুলেখা কৃতজ্ঞ চোখে আমার দিকে একবার তাকালো। তারপর চায়ের কাপডিশ সাজাতে সাজাতে বললো, “কালকে কোথায় গিয়েছিলেন?”

“বললাম, কবরখানায়।”

“ওমা, সন্ধ্যেবেলায় কেউ কবরখানায় যায়?” ভূত-পেত্নী না থাক, পোকা-মাকড়, বিছে, সাপ এসব তো আছে।”

আমি বললাম, “ছেলের কবরটা দেখতে তেলকালিবাবু একা-একা যাচ্ছিলেন। তাই ওঁকে সঙ্গ দিলাম। ভদ্রলোক বছরে ওই একটি দিনই সিমেট্রিতে যান।”

“ফিরলেন কখন?” সুলেখা জিজ্ঞেস করলো।

ব্যাপারটা ওকে বললাম। তেলকালিবাবুর খুব ইচ্ছে ছিল, কবরের জমিটা কিনে নিয়ে ওখানে একটা স্মৃতিফলক তৈরি করে দেন। কিন্তু এখনও টাকা পয়সার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। কর্তাদের হাতে-পায়ে ধরে জায়গাটা এখনও রিজার্ভ রেখেছেন। কিন্তু সেটা নিয়ম নয়। টাকা দিয়ে জমি না কিনলে ওখানেই মাটি খুঁড়ে অন্য কবর হবে। এবারে তেলকালিবাবুকে সোজাসুজি সে কথা বলে দিলো। কর্তাদের সামলে আরও কিছু টাইম নিতে দেরি হয়ে গেলো। তার পরেও তেলকালিবাবু অনেকক্ষণ ছেলের কবরের কাছে চুপচাপ বসে রইলেন। বললেন, “একটু বসে নিই, স্যার। সামনের বার হয়তো ছেলের কবরটুকুও থাকবে না।”

ভোরবেলায় এইসব দুঃখের কথা বাড়িয়ে কী লাভ? আমি বললাম, “দুঃখের কথা আর ভাল লাগছে না, মিস সেন। ঠিকানা হারিয়ে যাওয়া যত দুঃখ রিডাইরেকটেড হয়ে যেন আমার জীবনেই হাজির হয়।”

সুলেখা হাসলো, বোধ হয় নিজের দুঃখকে চাপা দেবার জন্যেই। বললো, “এই মুহূর্তে আপনার জন্যে কেবল মিষ্টি মিষ্টি আর মিষ্টি। ধানবাদ থেকে পয়লা নম্বর পেঁড়া এনেছি। এবং চায়ে ক'চামচ চিনি দেবো বলুন।”

চিনির পরিমাণ শুনে সন্তুষ্ট হলো না সুলেখা। বললো, “আপনি এখনও বেশ রোগা আছেন। মোটা হবার সহজতম উপায় হলো প্রতি কাপ চায়ে অন্তত দু'চামচ চিনি খাওয়া।”

তখন সত্যিই বেশ রোগা ছিলাম। ঝাঁটা-কাঠির মাথায় আলুর দম চেহারা উন্নয়নের আশায় সুলেখার পরামর্শ গ্রহণের লোভ হলো। যতক্ষণ আমি এ-বাড়ির ম্যানেজার আছি ততক্ষণ স্থানীয় চা-ওয়ালা বাড়তি চিনি ঢালতে দ্বিধা করবে না।

সযত্নে চায়ের কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুলেখা বললো, “গত রাত্রেই আপনার খোঁজ করেছিলাম। যাঁর সঙ্গে আমার আর্জেণ্ট কাজ তিনি

তো শেষ পর্যন্ত এলেন না।"

কার জন্যে সুলেখার এই ব্যস্ততা তা আমি তখনও আন্দাজ করতে পারিনি। আমার মনে তখনও চট্টরাজের মুখটাই গেঁথে বসে আছে। আমি তখনও ভাবছি, চট্টরাজ নিজেও হয়তো কলকাতায় হাজির হয়েছেন, সুলেখা-নাটকের শেষ পর্বে।

সুলেখা নিজেও আমার ভুল ভাঙাবার তেমন চেষ্টা করলো না। সে প্রথমে প্রসঙ্গান্তরে সরে গেল। সুলেখার তৈরি চা ভাল লেগেছে শুনে মৃদু হেসে বললো, "একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিন না—ছোট্ট চায়ের দোকান করে বসি।"

মেয়ে পরিচালিত চায়ের দোকান কখনও আমার নজরে পড়েনি, যদিও দু-একটি দোকান লক্ষ্য করেছি যেখানে মেয়েরা ওয়েট্রেসের কাজ করে। সেসব দোকানের যে সব সময় সুনাম নেই সসঙ্কোচে এই কথাটা সুলেখাকে বলতে হলো।

"আমাদের দেশের মেয়েদের পোড়া কপাল," দুঃখ করলো সুলেখা। "দোকানে চা বিক্রি করতে গেলেও তাদের বদনাম হয়।"

কথাটা আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে রইলো। আমাদের এই শহরের কর্মজীবনে পুরুষ ও নারী দু'জনেরই দুঃখ-কষ্ট অনেক, বদনামের ভাগটা মেয়েদের বাড়তি।

পরিস্থিতি হাল্কা করবার জন্যে সুলেখা বললো, "চায়ের দোকান খুললে খুব তাড়াতাড়ি নাম করে ফেলবো। কারণ আমি আট বছর বয়স থেকে চা তৈরি করছি। আমার বাবা খুব ভোরবেলায় উঠতেন এবং তাঁকে চা তৈরি করে দেবার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি চা না করলে বাবার ভালই লাগতো না।"

বাবা এখন কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই সুলেখা গম্ভীর হয়ে গেলো। তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আমি বেশ বিপদে পড়ে গেলাম—হয়তো সুলেখার বাবা আর ইহজগতে নেই। অজ্ঞাতে হৃদয়ের কোমল জায়গায় আমি হাত দিয়ে ফেলেছি।

সুলেখা প্রথমে আমাকে কী যেন বলতে গেল। তারপর থেমে গিয়ে বললো, "বাবা! বাবার জন্যেই তো বসে আছি। বাবার কথা একদিন বলবো আপনাকে।"

বাবার প্রসঙ্গটা সুলেখাকে বেশ কাতর করে তুলেছে। এখনই সে আমাকে সব কথা বলবে কিনা ভাবছে। কিন্তু আমি ওকে শান্ত করলাম। "সমস্ত কথা একদিনে শুনলে সবটাই তো ফুরিয়ে গেলো।"

আমি অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বললাম, "ধানবাদ কী রকম লাগলো শেষ পর্যন্ত?"

সুলেখা বললো, "কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রথম যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মিস্টার চট্টরাজের স্পেশাল চেষ্টায় কদিনের মধ্যে টেলিফোনও পেয়ে গেলাম। টেলিফোনটা না-থাকলে খুবই অসুবিধা। উনি আসবেন কি না-আসবেন কিছুই জানি না, শুধু হাঁ-করে বাড়ির মধ্যে বসে থাকা। দু'একবার চুপচাপ বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে ওঁর কাছে স্লিপ পাঠিয়েছি। স্লিপ পেয়ে উনি কিছুক্ষণের জন্যে হাজির হয়েছেন—কিন্তু সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন, এই বুঝি ব্যাপারটা জানাজানি হয়। আমাকে

বললেন, স্লিপ পাঠানো নিরাপদ নয়। মিস্টার চট্টরাজ হয়তো অফিসে থাকবেন না, আমার পাঠানো চিরকুট হয়তো অফিসের অন্য কারুর হাতে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল গবেষণা শুরু হয়ে যাবে।"

টেলিফোনটা আসায় মিস্টার চট্টরাজকেও আর লেখালিখির হাঙ্গামায় যেতে হয় না। মিস্টার জেঠমালানিও কলকাতা থেকে ফোন করে খবরাখবর নিয়েছেন। হেসে জিজ্ঞেস করেছেন থ্যাকারে কোম্পানির বিজনেস কী রকম চলছে?

মিস্টার জেঠমালানিই বলেছিলেন, বাড়িতে বসে বসে শুধু বিজনেস হয় না। একদিন চট্টরাজের আপিসটাও কাজের ছুতো করে দেখে এসো।

কপালে সিঁদুরের রেখা স্পষ্ট করে সুলেখা সেন সত্যিই একদিন মিস্টার চট্টরাজের আপিস ঘুরে এসেছিল। সুলেখার বুকের ভিতরটা সেদিন অপরিচিত উত্তেজনায় বিব্রত হয়ে উঠেছিল। শুভ্র সেনের ওয়াইফ ও থ্যাকারে অ্যান্ড কোম্পানির ধানবাদ রিপ্রেজেনটেটিভ মিসেস সেনের দিকে সেদিন অনেকেই আড়চোখে তাকিয়েছিল। সুলেখা সেদিন একটু পরেই দ্বিগুণ উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। সুলেখার কেমন ভয় করছিল, হয়তো সে ধরা পড়ে যাবে।

সেই রাত্রে নির্মল চট্টরাজ কিছুক্ষণের জন্যে এসেছিলেন। সুলেখা সেনকে নিয়ে সেদিন অফিসার মহলে কিছু চাঞ্চল্য, কিছু রসালো আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চট্টরাজের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কারুর মাথায় আসেনি।

সুলেখার মনে পড়লো কিছুদিন আগে বাবার ব্যাপারেই সে পাটনাতে হেড অফিসে গিয়েছিল। ডেপুটি পি-এম-জি বাগচী সায়েবের কাছে স্লিপ দিয়ে সাক্ষাতের আশায় সুলেখা চুপচাপ বসেছিল। বাগচী সায়েব দেখা করবেন কিনা তাও ঠিক নেই। বেয়ারাটা সুলেখাকে চিনতো, পোস্টমাস্টার সেনবাবুর মেয়েকে ছোটবেলায় সে দেখেছে। কিন্তু সেও সায়েবের কাছে স্লিপ দিয়ে এসে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। মস্ত কি এক মিটিং চলেছে, সেখানে ঢুকবার হুকুম তার নাকি নেই। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে, সুলেখা ডিপার্টমেন্টের বড়বাবুর কাছে গিয়েছিল। এই বড়বাবু একদিন বাবার সহকর্মী ছিলেন। তিনিও সুলেখার কথা শুনলেন, ডেপুটি পি-এম-জির ঘরে ঢুকতে সাহস করলেন না। বরং বললেন, "আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এলে পারতে মা।"

সুলেখা যখন সবে বুঝতে আরম্ভ করেছে যে বাগচী সায়েব স্পেশাল মিটিং-এ ভীষণ ব্যস্ত এবং তাঁর ঘরে কারুর ঢোকবার হুকুম নেই, ঠিক সেই সময় ডিপার্টমেন্টে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেলো। মাথায় চওড়া সিঁদুর দেওয়া ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক মহিলাকে দেখে বড়বাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বেয়ারাটা তড়াং করে সেলাম দিলো। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "সায়েব আছেন?" বিনয়ে বিগলিত বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গে বললো, "ঘরেই আছেন, আপনি চলে যান।"

কোনো স্লিপের হাঙ্গামা নেই, সায়েব ব্যস্ত আছেন কিনা তা জানবার প্রশ্ন নেই, ভদ্রমহিলা সোজা সায়েবের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সায়েবের ঘরে মিটিংয়ের আগুনে জল পড়তে দু'সেকেন্ড লাগলো—খাতাপত্তর হাতে দু'জন জুনিয়র অফিসার বিনয়ে বিগলিত অবস্থায় বাগচী সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে আসতে পেরেই তারা যেন ধন্য হয়েছে।

আরও একজন মেয়ে যে স্লিপ পাঠিয়ে দু'ঘণ্টা চুপচাপ বসে আছে সে কথা কেউ খেয়াল করলো না। বেয়ারা তাড়াতাড়ি কেটাল হাতে স্পেশাল চা আনতে ছুটলো। যাবার আগে ফিসফিস করে বললো, "মেমসায়েব—মিসেস বাগচী!"

সুলেখা সেদিনই বুঝেছিল, আপিসে আদালতে সায়েবের বউদের অন্য প্রতিপত্তি। আপিসের কোনো আইনকানুনই তাদের জন্যে খাটে না। সায়েবের বউ হওয়ার ওইটাই মস্ত সুবিধা।

অনেকদিন পরে, চট্টরাজের অফিস থেকে ফিরে এসে সুলেখা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল। ধানবাদের এই নতুন আপিসে ঢোকবার সময় সবরকম অস্বাস্থ্যকর কৌতূহলের অবসান ঘটেছে। আপিসের দ্বারপাল এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে না তাকিয়ে একটা বিনম্র সেলাম ঠুকে দিলো। বেয়ারা এবার স্লিপের কথাই তুললো না। আপিসের বড়বাবু এবং বেয়ারা দুজনেই লাল আলোর নিষেধ অমান্য করে চট্টরাজ সায়েবের ঘরে ঢুকে গিয়ে ঘোষণা করলো, মেমসায়েব। চট্টরাজও এক গাল হেসে বলছেন "তুমি এসেছো, কী ব্যাপার?" তারপর ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্য অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "মিট মাই ওয়াইফ।" তরুণ অফিসাররা করজোড়ে সিনিয়র অফিসারের গৃহিণীকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

এই স্বপ্নের কথাটা আমাকে বলে ফেলে সুলেখা একটু লজ্জা পেয়ে গেলো! হঠাৎ আমার চোখ থেকে ও দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।

সুলেখার স্বপ্ন আমার কাছে মোটেই অবাস্তব মনে হচ্ছে না। সুলেখা কিছু ঘর ভাঙছে না। চট্টরাজের প্রথমা স্ত্রী এক যুগের বেশী দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে বন্দী। চট্টরাজকে যদি সুলেখার ভাল লেগে থাকে তা হলে জীবিকা অর্জনের এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করে বিবাহের নিরাপত্তা গ্রহণ করাটাই তো বুদ্ধিমতীর কাজ।

আমি আর বিলম্ব না করে বলে ফেলাম, "কবে সেই শুভদিন আসছে? যেদিন সুলেখা সেন সীমা চট্টরাজে চেঞ্জড্ হবেন?"

সুলেখা যেমনি আমার দিকে সলজ্জভাবে তাকিয়েছে, আমি তেমনি আরও একটু এগিয়ে গিয়েছি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "ঘটনার খুঁটিনাটি দেখে মনে হচ্ছে সেই শুভদিন সুদূরে নয়।"

সুলেখার মুখে কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিলো। ওর মুখের অবস্থা দেখে প্রথমে মনে হলো, সুলেখা আমার ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছে। সামান্য-পরিচিতা সুন্দরীর সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে এই ভোরবেলায় তারই ঘরে বসে আমি তাকে অযথা অপমান করেছি। তারপর হঠাৎ মনে হলো, সুলেখা তার এই নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে অপরের কৌতূহলী অনুসন্ধান অপছন্দ করছে। মিস্টার চট্টরাজের সঙ্গে সে কী করবে সে নিজেই ঠিক করবে।

সুলেখার মুখের ভাব এবার কঠিন হয়ে উঠছে। মনে মনে আমি আফসোস করছি। নতুন চাকরিতে এসে এই সব সন্দেহজনক সুন্দরীর সান্নিধ্যে এমনভাবে কথাবার্তা বলা যুক্তিযুক্ত হয়নি।

সুলেখার কাছে ক্ষমা চাইবো কিনা ভাবছি। কিন্তু আমি মুখ খুলবার আগেই সুলেখা বললো, "সব জেনে-শুনেও আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?"

ওঁর কথা শুনে আমার ভয় হলো, হয়তো আঘাতটা মিস্টার চট্টরাজের দিক থেকেই এসেছে। হয়তো শেষ মুহূর্তে তিনি সুলেখাকে নিজের কক্ষপথ

থেকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু যাই হোক আমি আর এই সব গণ্ডগোলের ব্যাপারে নাক গলাবো না, এই সব মেয়ের জীবন-নাটকে কোনো ছোটখাট ভূমিকাতেও অংশ গ্রহণ করবো না। আমি গম্ভীর হয়ে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, "মিস সেন, আমার গণ্ডী ছাড়িয়ে কোনো প্রশ্ন করে আপনাকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে ক্ষমা করবেন।"

এর উত্তরে সুলেখার চোখ দিয়ে যে জল গড়াতে শুরু করবে তা আমার প্রত্যাশিত ছিল না। সুলেখা কোনো কথা বলছে না—ছবির মতো স্তব্ধ হয়ে সে আমার দিকে অভিমানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সুলেখা এবার কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছলো। তারপর বললো, "এ লাইনে আমি চিরদিন থাকবো না, শংকরবাবু। কলকাতা শহরে যদি একটা মাথা গোঁজার জায়গা থাকতো তা হলে আজই আমি পালিয়ে যেতাম।"

এই মাথা গোঁজবার প্রসঙ্গটা আমাকে বড় বিব্রত করে। প্রাসাদপুরীর এই শহরে যার মাথা গুঁজবার স্থান নেই তার থেকে অভাগা কে?

সুলেখার চোখ দুটো একটু লাল হয়ে উঠেছে। নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে বললো, "কেন যে আমি ধানবাদে যেতে রাজী হলাম। শুধু শুধু একটা লোকের জীবনে বিপদ ডেকে নিয়ে এলাম আমি।"

আমি এখন নীরব শ্রোতা। শুনলাম, সুলেখা কেমনভাবে নির্মল চট্টরাজের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিল। চট্টরাজও কেমনভাবে ক্রমশ সুলেখার সেবা ও স্নেহে মুগ্ধ হয়ে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। সুলেখার সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন এবার যেন সত্য হতে চলেছে। কিন্তু ততক্ষণে অন্য এক জায়গায় দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

জগদীশ জেঠমালানির কেসটার কোনো গতি হয়নি। ওই ব্যাপারে চট্টরাজ পাহাড়ের মতো অটল হয়ে আছেন। জেঠমালানি নিজেও অবাক। সুলেখাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "আদর যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না তো? মিস্টার চট্টরাজ রেগুলার যাতায়াত করছেন তো?" সুলেখার উত্তর পেয়ে জেঠমালানি মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এরকম ডিফিকাল্ট পার্টি তিনি বেশী দেখেননি। সুলেখার সঙ্গে সম্পর্কটা পুরোপুরি রেখে যাচ্ছেন, অথচ জেঠমালানির বিরুদ্ধে সেই বাজে মেশিন সাপ্লাই দেবার কেসটা সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মিস্টার চট্টরাজ। জেঠমালানি প্রথমে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন, চট্টরাজ যখন একবার সন্তুষ্ট হয়েছেন তখন নিশ্চয় যথাসময়ে কেসটা সামলে নেবেন। হয়তো ফাইলপত্তর পরিষ্কার রাখবার জন্যেই কেসটাও একটু পাকিয়ে নিচ্ছেন।

কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় না। কেসটা এবার বিপজ্জনক অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে এবং জগদীশ জেঠমালানি অন্য সোর্স থেকে খবর নিয়ে জেনেছেন যে এই ব্যাপারে সমস্ত কলকাঠি নাড়ছেন নির্মল চট্টরাজ নিজেই।

চিন্তিত জগদীশ জেঠমালানি সুলেখার ধানবাদের বাড়িতে এসেছিলেন। দুঃখ করে সুলেখাকে বলেছেন, "অনেস্টির যুগ আর নেই। ইংরেজ আমলে honesty in dishonesty ছিল। যে লোক ঘুষ নিতো, ফেভার নিতো, সে কাজটাও করে দিতো।" কিন্তু এখন এই চট্টরাজকে বোঝা দায়।

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি, সুলেখা। আর চুপচাপ থাকলে এই কেসটায় আমার সর্বনাশ হবে।" কয়েক

লাখ টাকার ব্যাপার—এবং অত সহজে টাকা হারাবার পাত্র জগদীশ জেঠমালানি নন।

জগদীশবাবু এর পর অন্য কিছুর সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আমরা বিজনেসম্যান—আমরা নরমে নরম, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা। কিন্তু বিজনেসের আরও অনেক পথ আছে।"

সুলেখা এই সব ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। ওর শুধু মনে হয়েছে, 'কেন তোমরা সরকারী কারখানাতে বাজে যন্ত্রপাতি দাও? তখন ভাল জিনিস দিলে তো এসব হাঙ্গামায় পড়তে হয় না।' কিন্তু এসব প্রশ্ন জগদীশবাবুর সামনে তোলবার মতো সাহস তার হয়নি।

নাটকের নতুন অঙ্কে জগদীশ জেঠমালানি গোপনে গোপনে কয়েকদিন ছোটাছুটি করেছেন। নেপথ্যে কোথায় কি কলকাঠি টিপছেন তাও সুলেখা জানে না। তবে জগদীশবাবু সেদিন রাত্রে টেলিফোনে সুলেখাকে বলেছিলেন, কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকতে। তারপর জগদীশবাবু হঠাৎ বলেছিলেন, "সুলেখা, হঠাৎ যদি স্পেশাল কিছু ঘটে যায়। ফিকর্ মত্ কীজিয়ে।"

সুলেখা তখনও কিছু আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে বোমা ফাটলো। আগের দিন সন্ধ্যেবেলাতেও চট্টরাজ এসেছিলেন সুলেখার কাছে। বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন, "সুলেখা, মনের মধ্যে কিছু কথা জমে উঠছে। একদিন তোমার সঙ্গে সেসব আলোচনা করে নেবো ভাবছি।" এই লুকোচুরি খেলা যে মিস্টার চট্টরাজকে সুলেখার মতোই অস্থির করে তুলছে তা আন্দাজ করে সুলেখার সর্বশরীর শিহরিত হয়েছিল। সুলেখা উত্তর দিয়েছিল, "আমি সব সময় আছি, আপনি যখন খুশী চলে আসবেন।" পরের দিন বিকেলে আবার আসবেন জানিয়ে চট্টরাজ বলেছিলেন, "আশা করি তুমি আমার অবাধ্য হবে না, সুলেখা।"

সুলেখা লজ্জা পেয়েছিল, সেই মুহূর্তে কোনো উত্তর দিতে পারেনি। চট্টরাজের সঙ্গে সুলেখার সেই শেষ দেখা। পরের দিন নির্ধারিত সময়ে চট্টরাজ আসেন নি। ততক্ষণে বোমা ফেটেছে। সুলেখা খবর পেয়েছে, নির্মল চট্টরাজের সমূহ বিপদ। সরকারী হুকুমে আচমকা তাঁর বাড়ি ও আপিস সার্চ হয়েছে। নির্মল চট্টরাজ যে হঠাৎ চাকরি থেকে সাসপেনডেড হয়েছেন সে-কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুলেখা এ সময় কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। টেলিফোনে চট্টরাজের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাড়িতে কেউ ফোন ধরলো না।

এরপর রাত্রে সুলেখার টেলিফোন বেজে উঠেছিল। চট্টরাজ নন, পাটনা থেকে জগদীশ জেঠমালানি ফোন করছেন। চট্টরাজের সমস্ত খবরাখবর যে জগদীশবাবুর জানা তা সুলেখার বুঝতে অসুবিধা হলো না। জেঠমালানি শান্তভাবে নির্দেশ দিলেন, একটুও সময় নষ্ট না করে সুলেখা যেন ভোরবেলাতেই ধানবাদ ছেড়ে চলে আসে। ধানবাদে থাকলে সুলেখার বাড়ি সার্চ হওয়াও আশ্চর্য নয়। উনি রাজুকে বলে দিচ্ছেন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের চাবি পাঠিয়ে দিতে। কলকাতায় সুলেখার 'আর্জেণ্ট কাজ' আছে।

চট্টরাজের কী হবে জানতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল সুলেখা। টেলিফোন নামিয়ে রাখবার আগে জগদীশবাবু হেসে বলেছিলেন, ওঁর যা হবার তাই হবে! "ফিকর্ মত্ কীজিয়ে!"

ধানবাদ থেকে কলকাতা তো অনেক দূর। কিন্তু সুলেখা এখনও চট্টরাজের জন্য দুশ্চিন্তা করছে। কর্মক্ষেত্রে যে-মানুষকে খ্যাতি ও শক্তির তুঙ্গে দেখেছে তিনিই আজ চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন ভাবতে সুলেখা কেমন মুষড়ে পড়ছে।

গত রাত্রে রাজুবাবু এসেছিলেন। যে-চট্টরাজের কথা তুলতে এঁরা বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠতেন, আজকে তাঁর সম্বন্ধে রাজুবাবুর তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কিছুই নেই। চট্টরাজের পতনে উল্লসিত রাজুবাবু বললেন, "চট্টরাজ খুব বাজে লোক ছিলেন। আপনার ওপরেও নানা অত্যাচার করেছেন, নিশ্চয়।"

সুলেখা চুপ করে রইলো। এই অবস্থায় চট্টরাজ সম্পর্কে কোনোরকম সহানুভূতি দেখালে জেঠমালানি এবং তাঁর গুণধর ভাগ্নে ভুল বুঝে বসবেন এবং সুলেখাকেও কোনো একটা গোলমালে জড়িয়ে ফেলতে দ্বিধা করবেন না।

রাজুবাবু উল্লাস প্রকাশ করে বলেছিলেন, "লাস্ট মোমেণ্টে ভগবান আমাদের ওপর সদয় হলেন। আর দু'দিন সাসপেণ্ড হতে দেরি হলে, মেশিন সাপ্লায়ের কেসটা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যেতো।"

সুলেখা নীরবে তাকিয়েছিল রাজুবাবুর দিকে। রাজুবাবু বললেন, "মামা যখন পাটনা থেকে ট্র্যাংক কল করলেন যে চট্টরাজের উইকেট পড়ে গিয়েছে এবং আপনি এখানে ফিরে আসছেন তখন তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করলে এমনিই হয়।" সগর্বে ঘোষণা করলেন রাজুবাবু। তারপর আরও বললেন, "সুখবরটা পেয়ে এমন আনন্দ হলো যে তখনই সেলিব্রেট করতে বেরিয়ে গিয়েছি এবং মনের আনন্দে আপনার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।"

রাজুবাবু আরও রিকোয়েস্ট করেছিলেন, "মামাকে বলবেন না যেন আপনাকে চাবির জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। তা হলে আমার ওপর খুব চটে যাবেন—একে মামা আমার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারেন না। ওঁর ধারণা, বিজনেসে আমার মন নেই।"

চট্টরাজের আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয় সম্বন্ধে সুলেখার মনে যতখানি সন্দেহ ছিল রাজুবাবুর কথায় একেবারে দূর হলো—চট্টরাজের পতনের সমস্ত কলকাঠি তাহলে জগদীশবাবুই নেড়েছেন। রাজুবাবু ভারিক্কী চালে সুলেখাকে শুনিয়ে দিলেন, "সাসপেনশন তো সামান্য কথা, মামা আশা করছেন দু-একদিনের মধ্যে চট্টরাজ অ্যারেসটেড হতে পারেন।"

এই অ্যারেস্ট হবার কথা আমাকে বলতে গিয়ে সুলেখা যেন কেমন হয়ে গেলো। কোথাকার কোন বাবু নিজের কৃতকর্মের জন্যে হাজতে যেতে পারেন, তার জন্যে সুন্দরী কলগার্লের বিচলিত হবার কী আছে? আমি নিজেও এ ব্যাপারে বেশী মাথা ঘামাতে উৎসাহী নই।

কিন্তু সুলেখার ভেঙে পড়বার মতো অবস্থা। উত্তেজনায় নরম হাত দুটো দিয়ে নিজের চোখজোড়া ঢেকে ফেললো সুলেখা। সুলেখা হাঁপাচ্ছে। "অ্যারেস্টের কথা আমি ভাবতে পারছি না, শংকরবাবু।" মিস্টার চট্টরাজ

কেন শুধু-শুধু অ্যারেস্ট হতে যাবেন ?"

এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিস্পৃহ। নির্মল চট্টরাজের জন্য আমি কোনোরকম উদ্বেগ অনুভব করতে পারছি না।

সুলেখা এই ভোরবেলায় শান্ত সমাহিত পরিবেশে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে দিলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "কিছু বলুন।"

আমি নির্দ্বিধায় বলে ফেললাম, "কোথাকার কে অ্যারেস্টেড হলো তাতে আপনার বা আমার কী এসে যায়, সুলেখা দেবী ?"

সুলেখা এবার ভেঙে পড়লো। চোখের জল চাপতে চাপতে বললো, "মিস্টার চট্টরাজ অ্যারেস্টেড হতে পারেন জানলে আমি কিছুতেই ধানবাদ ছেড়ে আসতাম না।"

আমি নিরুত্তর। কী উত্তর আমি দিতে পারি ?

সুলেখা সজল চোখে এবার যা বললো, তাতে আমার দিব্যচক্ষু হঠাৎ যেন উন্মীলিত হলো। আমি বুঝতে পারলাম সুলেখা এই অ্যারেস্ট হবার কথাটা শুনে কেন এমন মুষড়ে পড়লো।

"অ্যারেস্ট কথাটা শুনলেই আমার শরীরের ভিতরটা কেমন করতে শুরু করে, শংকরবাবু। তিন বছর আগের কথা মনে পড়ে যায়। বাবার কাছে কেমন সুখে, নিশ্চিন্তে দিন কাটতো। ছোট্ট পোস্টাপিসের মাস্টার-মশায়ের ছোট্ট সংসার। আমি এবং বাবা। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। বাবার সংসার আমিই দেখি। বাবা আমার বিয়ের জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। ভাল পাত্রের হাতে আমাকে সম্প্রদান করবার জন্যে বাবা উঠেপড়ে লেগেছেন।"

সুলেখা এবার ঢোক গিললো। তারপর আবার শুরু করলো : "বাবার সাধ, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার অথবা সি-এ পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়। আমারও ব্যাপারটা মন্দ লাগতো না। বাবা বলতেন, মা আমার বাপের ঘরে কষ্ট পেয়েছে, স্বামীর ঘরে যাতে লক্ষ্মীর মতো বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করবোই।"

"কিন্তু সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো। বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাবা হঠাৎ একদিন সকালে অ্যারেস্টেড হলেন।" বলতে বলতে সুলেখার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। "পোস্টমাস্টারের জীবন জানেন তো—ছোট্ট চাকরি হলেও এতো দায়িত্ব খুব কম লোকের কাঁধে থাকে। টাকাকড়ি, হিসেব-পত্তর, মানি অর্ডার, রেজিস্ট্রি, ইনসিওর, সেভিংস ব্যাঙ্ক, এন এস সি, সি টি ডি, পি এল আই—অজস্র গোলকধাঁধা যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে।"

সেদিনই শুরু হলো সুলেখার সর্বনাশের ইতিহাস। নিজের হাতের চুড়ি এবং হার বিসর্জন দিয়ে সেদিন কোনক্রমে বাবাকে জামিনে খালাস করে নিয়ে এসেছিল সুলেখা। তারপর একটানা দশ মাস লড়াই করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আদালতের বিচারে বাবার যখন জেল হলো, তখন সুলেখা সর্বস্বান্ত। অর্থ, আশ্রয় আর অভিভাবক হারিয়ে নিষ্ঠুর এই বিশ্বে একলা এসে দাঁড়াল সুলেখা। বাবার আদুরে দুলালী সীমা চ্যাটার্জিকে গোগ্রাসে গিলে ফেললো প্লেজার গার্ল সুলেখা সেন। পিতার আদরিণী কেমনভাবে জনতার বিনোদিনীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো তা মানসনেত্রে কল্পনা করে আমি নিজেও শিউরে উঠলাম।

সুলেখা সেন, তুমি আমায় ক্ষমা করো। 'অ্যারেস্ট' কথাটা আজও তোমার সমস্ত সত্তাকে কেন নাড়া দিয়ে ওঠে, কেন তুমি মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হও, তা এবার আমি আন্দাজ করতে পারছি।

সুলেখা সেন হয়তো আমার চোখে সহানুভূতির ছায়া আবিষ্কার করে দু'দণ্ডের শান্তি প্রার্থনা করলো। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো, "কেন এমন হয় বলুন তো? যাঁরা আমাকে ভালবাসতে এগিয়ে আসেন তাঁরাই বিপদে পড়ে যান?"

"বিপদ আপদের কি কোনো নিয়মকানুন আছে?" আমি সুলেখাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

কিন্তু সুলেখা যে বুঝছে না, তা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওর মনের ভাবনা মুখের মুকুরে আমারই মতো প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়।

রাগের চাপা আগুনে জ্বলছে সুলেখা। চট্টরাজের ভাগ্যবিপর্যয় নাটকে জেঠমালানিরাই যে সমস্ত কলকাঠি নেড়েছে তা সুলেখা আন্দাজ করে নিয়েছে। জগদীশবাবুর সঙ্গে ট্রাংক কলে কথা বলবার পরেও যেটুকু সন্দেহ ছিল তা রাজুবাবুর সঙ্গ গত রাত্রে আলাপ-আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। জগদীশবাবু ঝানু বিজনেসম্যান—মাস মাইনের বিনোদিনীর সঙ্গেও একটা অদৃশ্য দূরত্ব রক্ষা করে চলেন, কুকাজের নির্দেশগুলো ব্যক্তিগতভাবে দিলেও, ওঁকে সব কথা খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞেস করবার সাহস থাকে না সুলেখার। রাজুবাবুর কথা আলাদা, সে অনেক ফ্রি—তা ছাড়া মামার অজান্তে মাঝে মাঝে সে সুলেখার অনুগ্রহপ্রার্থীও। সুযোগ পেলেই সে কলেজের এক সহপাঠী বন্ধুকে এক একদিন সুলেখা সান্নিধ্যে উপস্থিত করতে চায়—কিন্তু খবুই গোপনে। মামাজী ঘুণাক্ষরে জানতে পারলেও রাজুবাবুর বিপদ।

রাজাবাবুকে তাই প্রাণখুলে প্রশ্ন করতে সংকোচ হয় না সুলেখার। রাজুবাবুই বললেন. "চট্টরাজকে চ্যাপ্টা করতে মামার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেলো। এর জন্যে দিল্লী পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে হয়েছে মামাজীকে।"

রাজুবাবুই একগাল হেসে বললেন, "কোনো খুঁত নেই, এমন মানুষ ইণ্ডিয়াতে এখনও জন্মায়নি। মামা বলেন, ফুটো ছাড়া ফাউনটেন পেন হয় না। এই খুঁতগুলো সময় থাকতে খোঁজ করে রাখো—পার্টি যদি সোজা আঙুলে উঠে না-আসে, তা হলে এই ফুটোগুলোই বাঁকা আঙুলকে হেল্প করবে।"

সুলেখা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল রাজুবাবুর দিকে। "বিজনেস চালাবার জন্যে আপনারা এতো চিন্তা করেন?" সে অবাক হয়ে যায়।

রাজুবাবু হেসে বললেন, "আরও কত কি কাণ্ড আছে। মাথা না ঘামালে চলবে কী করে? মামার এক-একটা কাণ্ডকারখানা দেখে নিজেই তাজ্জব বনে যাই। অথচ রোজগারের পরে ভোগে কোনো আগ্রহ নেই মামাজীর। নিজেও এনজয় করেন না, অপরকেও ভোগ করতে দিতে চান না তিনি।" রাজুর ওপর অ্যালসেসিয়ানের মতো কড়া নজর রেখেছেন মামাজী। তিনি কলকাতায় নেই বলেই রাজুবাবু এতোক্ষণ ধরে এমন খোসমেজাজে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে বসে সুলেখা সেনের সান্নিধ্য উপভোগের দুঃসাহস দেখাচ্ছেন।

রাজুবাবুর প্রসঙ্গ থেকে সুলেখা এবার নিজের কথায় ফিরে এলো।

চট্টরাজের সান্নিধ্য থেকে এইভাবে আচমকা সরে আসতে তার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি। সুলেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ধানবাদে আপনার কেউ জানাশোনা আছেন? আমার একটু উপকার করবেন? মিস্টার চট্টরাজকে সত্যিই অ্যারেস্ট করলো কিনা আমায় জানাবেন? জগদীশবাবুরা যা লোক মিস্টার চট্টরাজ সম্বন্ধে বেশী জিজ্ঞাসা করবার সাহস নেই আমার —এখনই কিছু সন্দেহ করে বসবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দূর করে দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন আপনাদের এই চৌত্রিশ নম্বরে।"

ধানবাদে আমার কোনো পরিচিতজনকে স্মরণ করতে পারলাম না। চেনা-শোনা কেউ থাকলেও বিপদে পড়ে যেতাম—কারণ সুলেখা সেনের এই রহস্যময় ও বিপজ্জনক জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জড়িয়ে পড়ার কোনো প্রকার যৌক্তিকতা নেই। খবর পেলে বরদাপ্রসন্ন ও গণপতিবাবুও নিশ্চয় একই মত পোষণ করতেন এবং এই সন্দেহজনক সান্নিধ্য থেকে আমাকে শত হস্ত দূরে থাকবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সব বুঝেও এই মুহূর্তে সুলেখার জন্য আমি কাতর হয়ে উঠেছি, বিপদের সময় ওর সাহায্যে আসবার জন্যে আমার মনটাও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সুলেখাকে চিন্তা করতে বারণ করলাম। বিষণ্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললো সুলেখা।

আমার কাপেও আরও একটু চা ঢালতে ঢালতে সুলেখা বললো, "আমা-দের এই জীবনে চিন্তা করবার মতো অবসর কোথায়?"

সুলেখার প্রতিটা কথার মধ্যে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা জড়িয়ে আছে তা আমি সহজে বুঝতে পারছি।

সুলেখা এবার এঁটো চায়ের কাপ দুটো টেবিল থেকে সরাতে সরাতে পরম দুঃখে ও অভিমানে বললো, "পিছনের দিকে তাকানোর বিলাসিতা তো আমাদের মতো মেয়েদের জন্যে নয়, শংকরবাবু। আজকের মাথাব্যথায় যারা পাগল গতকালের স্মৃতি তাদের কাছে নিরর্থক।"

আমি পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে সুলেখার বিনম্র করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে আছি।

অকস্মাৎ কোনো ইন্দ্রজালে সুলেখা সেনের মুখমণ্ডলে বৈপ্লবিক পরি-বর্তন হলো। কল গার্ল সুলেখা সেন এবার আসরে উপস্থিত হলেন। রহস্য-ময়ীর নিপুণ লাস্যে সুলেখা সেন অকস্মাৎ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ভ্রূধনু ভঙ্গ করে, মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করে সুলেখা বললো, "আমার সময় কই? জেঠমালানিরা যে 'আর্জেণ্ট' কাজ দিয়েছেন আমাকে। ভীষণ 'আর্জেণ্ট' কাজ। আপনি শুনলে বুঝতে পারবেন! কিন্তু এখন বলবো না", এই বলে হা-হা করে হাসতে লাগলো চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের রহস্যময়ী রমণী সুলেখা সেন।

জেঠমালানি সম্পর্কে বিচিত্র এক ঘৃণা নিয়ে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছি। সাধুতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যেসব দুষ্কৃতকারী সমাজের অলিতে গলিতে তাদের নির্লজ্জ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, হে ঈশ্বর তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভাল?

ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে কোনোদিন এ-প্রশ্নের উত্তর ফিরে আসে না। তবু অসহায় মানুষ বারবার ঊর্ধ্বলোকেই তার কাতর প্রশ্নমালা ছুঁড়ে দেয়।

ঘৃণায় বিরক্তিতে আমার সর্বশরীর জ্বলছে—ক্ষমতা থাকলে এই মুহূর্তে আমি ওদের এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিতাড়িত করতাম।

আপিস ঘরে এসে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে জগদীশবাবুদের মুখগুলো ভুলে থাকার চেষ্টা করছি, সেই সময় রামসিংহাসন একখানা সীলকরা খাম আমার সামনে রেখে গেলো। কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষর চিনতে আমার এক মুহূর্ত সময় লাগলো না।

সেদিনের সেই ঘটনার পরে ডরোথি ওয়াটের সঙ্গে আমি একবারও দেখা করিনি। চক্ষুলজ্জার হাত থেকে ডরোথি ওয়াটকে মুক্তি দিতে চেয়েছি আমি।

ডরোথি আমাদের এক মাসের নোটিশ দিয়েছেন। নিষ্প্রাণ ওকালতি ইংরিজীতে ডরোথি আগাম খবর দিয়েছেন : 'ডিয়ার স্যার, আগামী মাসের পয়লা তারিখ থেকে আমি থ্যাকারে ম্যানসনের ১১ নম্বর ফ্ল্যাট ত্যাগ করতে চাই। এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া এবং আমার বোন কুমারী বারবারা উড বিদেশে থাকায় তিনি নিজে এই চিঠি লিখতে পারলেন না—তবে আমি তাঁর পক্ষ থেকেই আপনাকে এই আগাম নোটিশ দিচ্ছি। ইতি আপনাদের বিশ্বস্ত ডরোথি ওয়াট।'

অফিসিয়াল চিঠির সঙ্গে ছোট্ট একটা ব্যক্তিগত চিরকুটও রয়েছে আমার নামে। "প্রিয় শংকর, তোমাকে ডেকে পাঠাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চিঠি লিখতে মনস্থ করলাম। আর্নল্ডের জন্যে আমার প্রতীক্ষার অবসান হলো—সে আর ফিরবে না এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বিদেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক প্রকারের স্বেচ্ছা-নির্বাসন বলতে পারো। মনের এই অবস্থা সম্পর্কে টোগোরের কয়েকটা লাইন খুঁজে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি, এখনও সফল হইনি। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি দয়া করেন তবে যাবার আগে তোমাকে লাইন কয়েকটা লিখে পাঠাবো। যা-কিছু ঘটেছে তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমার বৃহত্তর জীবন কামনা করি. ইতি ডরোথি ওয়াট।"

ক'দিনেরই বা পরিচয়? কিন্তু ডরোথি ওয়াট এই থ্যাকারে ম্যানসনে থাকছেন না ভাবতেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। ঠাণ্ডা নিরুৎসাহের বরফ যেন আমার সমস্ত শরীরটা ক্রমশ ঘিরে ধরছে, আমি বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

রামসিংহাসন আজকে আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করছে। অকারণে আর একখানা সেলাম ঠুকে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তামিল করবার মতো কোনো হুকুম আছে কিনা। রামসিংহাসন বিনয়ে বিগলিত হলেই আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়—সন্দেহ হয়, কোনো মতলব আঁটছে। তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম, এই মুহূর্তে আমার কোনো অনুরোধ নেই। তবে একটা প্রশ্ন আছে।

গভীর রাত্রে সেদিন উঠে দেখি থ্যাকারে ম্যানসনের প্রাইভেট প্যাসেজে কয়েকটা রিকশা সারি সারি দাঁড় করানো রয়েছে।

ম্যানসনের মধ্যে এমন রিকশ স্ট্যান্ড কেমনভাবে গজিয়ে উঠলো? তেলকালিবাবু বলেছিলেন, "ওসবের মধ্যে নাক গলাতে যাবেন না স্যার—ওটা রামসিংহাসনের জমিদারী।"

তেলকালিবাবুর উপদেশে কান না দিয়েই রামসিংহাসনের কাছে প্রশ্নটি ফেঁদে বসলাম। রামসিংহাসন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। "তাই নাকি?

রাত্রে ওখানে লাইন দিচ্ছে বুঝি? গরীব আদমি সব। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ওপর রিকশয় ঘুমোতে সাহস পায় না। সেদিন একটা মাতাল লরি এসে দুটোকে সাবাড় করে দিয়ে চলে গিয়েছে। তাছাড়া চোর-পকেটমারও আছে। ওই যে ব্যাটা মদনা, ওরই ল্যাঙগোটিয়া কিষ্টো—এ শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। রামসিংহাসনই ব্যাখ্যা করলো ছোটবেলার ফিরেন্ড।

"কিষ্টো এতদিন 'ব্যাক লাইট চোর' ছিল। এখন সে লাইন পাল্টেছে। পুলিশের কোঁতকা খেয়ে কিষ্টো আর গাড়ির ব্যাক লাইট চুরি করছে না। তার বদলে ঘুমন্ত রিকশওয়ালাদের গাঁট কাটে। রাত্রে কেউ সাহস করে সদর স্ট্রীটে রিকশর ওপর ঘুমোতে পারে না।"

গড় গড় করে রামসিংহাসন বলে যাচ্ছে। দারোয়ান না হয়ে হাইকোর্টের উকিল হলে রামসিংহাসন অনেক টাকা কামাতে পারতো।

রামসিংহাসন এবার গম্ভীরভাবে বললো, "আপনি যদি চান, তাহলে আজই ওদের থ্যাকারে ম্যানসনে রাত কাটানো বন্ধ করে দেবো।" মেনজার সায়েব যা পছন্দ না করেন তা এ-বাড়িতে রামসিংহাসন যে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না তা সে আর একবার জানিয়ে দিয়ে আমার পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা না করেই সুড় সুড় করে কেটে পড়লো।

ভাগ্যচক্রে একটু পরেই মদনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। মদনা সাত সকালেই সিনেমা আর্টিস্টদের মতো ড্রেস করেছে। মাথায় একটা সুদৃশ্য কাউবয় টুপি চড়িয়েছে সে, আর শ্রীঅঙ্গে একটি নীল রংএর স্পেশাল কলার-ওয়ালা গেঞ্জি। এই গেঞ্জির বুকের কাছে একটি তীরবিদ্ধ হৃদয়ের ছবি। রক্তেরাঙা এই হৃদয়টির দিকে পথচারীদের নজর পড়তে বাধ্য।

আমাকে সেলাম করে মদনা থ্যাকারে ম্যানসনের প্রাইভেট প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি যে আড়চোখে তার গেঞ্জির দিকে তাকিয়ে আছি তা মদনা সগর্বে লক্ষ্য করলো। এবং দ্বিতীয়বার সেলাম জানিয়ে বললো, "আম্রিকান জামা। আপনার দরকার হলে বলবেন, স্যর। হরবকত আম্রিকান পার্টি আসছে—আপনাকে জলের দামে কিনিয়ে দেবো।"

আম্রিকান জামা কাপড়ে আমার কণামাত্র আগ্রহ নেই শুনে একটু অস্বস্তিতে পড়ে মদনা বললো, "বাবার মতো আপনিও হয়তো ভাবছেন স্যর যে আমি টাকা ওড়াচ্ছি। কিন্তু মা কালীর দিব্যি বলছি গাঁটের কড়ি খরচা করে আমি এই টুপি এবং জামা কিনিনি। কালকে স্যর ডানলপের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন কিছু রাতও হয়নি—এই সাড়ে আটটা। একজন সায়েব ও-পাড়ায় এলেন। আমি স্রেফ একটা ছেঁড়া গেঞ্জি আর নোংরা চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সায়েবের সঙ্গে বিজনেস নয়, স্রেফ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গপ্পো হতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সায়েবের মাথায় কী ভূত চাপলো, বললো, "আমাব সঙ্গে জামাকাপড় পাল্টাপাল্টি করবে?" তারপর ঝটপট সায়েব নিজের টুপি আর এই গেঞ্জি খুলে দিলো। আর আমি তো তাজ্জব, আমার ওই ছেঁড়া গেঞ্জি আর চাদর জড়িয়ে সায়েবের কী আনন্দ।"

আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "খুব ব্যস্ত নাকি, কোথায় চলেছো?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মদনা উত্তর দিলো "আপনাকে মিথ্যে কথা বলবো না, স্যর। মহাপাপ হবে। এই একটু।"

"একটু কী?" আমি গম্ভীরভাবেই জানতে চাই।

"সিনেমা লাইনে একটু কাজ পেয়ে গিয়েছি, আপনাদের আশীর্বাদে।"

মদনার কথায় আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। এতদিনে মদনার তা হলে সুমতি হয়েছে। মদনার বাপ এবার তা হলে একটু শান্তি পাবে।

"যাক্ ভালই করেছ। কোন্ সিনেমা?" মদনাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েই ভুল ভাঙলো। বেশ লজ্জা পেয়ে সে বললো, "সিনেমাতে চাকরি নয়, স্যর। টিকিট ব্ল্যাকের কাজ। কোন্ সিনেমাতে কখন দরকার হয় ঠিক নেই। এখন চলেছি ধর্মতলায়।"

কিন্তু আমার ওপর অকারণে মদনার প্রবল ভক্তি। মদনা বললো, "আপনি ডাকলে আমি একটুও ব্যস্ত নই।"

"তা হলে দু'মিনিটের জন্যে এসো," আমি মদনাকে আপিস ঘরের দিকে ডেকে নিয়ে চললাম।

আপিস ঘরে ঢুকেই বললাম, "তাহলে শ্রীমান মদন—"

মদনার বোধ হয় পুরনো পর্বটি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো। মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললো, "মা কালীর দিব্যি বলছি, দুপুরবেলায় ঘর ভাড়া দেবার বিজনেস আমি বন্ধ করে দিয়েছি। বাবা সেদিন আমাকে ধরে আড়ং ধোলাই দিয়েছিল। আমি বাপের নামে দিব্যি করেছি, এই থ্যাকারে ম্যানসনে কখনও আর ঘর ভাড়ার ব্যবসা করবো না। বাবা সেদিন তো আমাকে মেরেই ফেলছিল—যার অন্ন খেয়ে বড় হয়েছি তার সঙ্গে নেমকহারামি বাবা সহ্য করবে না।"

'সেদিন' বলতে মদনা যে এগারো নম্বর ঘরে ডরোথি ওয়াটের মূর্চ্ছা-দিবসে অপরিচিত অতিথি আবিষ্কারের ঘটনা উল্লেখ করছে তা আন্দাজ করা আমার পক্ষে শক্ত হলো না।

মদনা আমার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। "আপনি আমার ওপর খুব রেগে গিয়েছেন স্যর?" মদনার করুণ প্রশ্ন।

আমি গম্ভীর ও নিরুত্তর। নোংরা ওই ব্যাপারে আমি যে রীতিমত বিরক্ত তা মদনা ভালভাবেই বুঝতে পারছে।

মদনা এবার মাথা নিচু করে বললো, "মেমসায়েবের কোনো দোষ নেই, স্যর। আপনি আমাকে যত পারেন শাস্তি দিন, দরকার হলে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিন।"

"শ্বশুরবাড়িটা আবার কোথায়?"

"হাজতে"—শ্বশুরবাড়ি শব্দের টেকনিক্যাল অর্থ ব্যাখ্যা করলো মদনা।

একটু থেমে মদনা বললো, "পয়সার অভাবে মেমসায়েব বড় কষ্ট পাচ্ছেন চোখের সামনে দেখছিলাম। ভাড়া দিতে না পারায় ওঁর মনের অবস্থা খুব খারাপ। দেখে মায়া হলো। আমিই তখন মেমসায়েবকে দুপুরবেলায় ঘর ভাড়া দেবার মতলব দিয়েছিলাম। মেমসায়েব কিছুই জানতেন না। আমিও বুড়ীর মুখের ওপর সব কথা খুলে বলিনি, বলেছিলুম, দুপুরের দিকে আমার জানাশোনা পার্টি টেমপোরারি আপিস ঘরের মতো ব্যবহার করবে। বাইরের পার্টি—কলকাতায় তাদের বসবার জায়গা নেই।"

মদনার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। মদনা বললো, "মেমসায়েব আপনাকে খুব ভালবাসেন। আপনি ওঁকে কীসব পেসট্রি শুনিয়েছেন।"

"পেসট্রি ?"

জিভকেটে মদনা বললো, "ভুল হয়ে গিয়েছে, স্যর। পোলট্রি।"

"পোলট্রি নয়, পোয়েট্রি", আমি মদনাকে সংশোধন করে দিলাম।

মদনা গম্ভীর হয়ে বললো, "মেমসায়েব আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার কথা শুনে চলতে। একদিন আপনি নাকি মস্ত আদমী হবেন। তামাম ক্যালকাটার লোক হয়তো আপনার নাম জানবে।"

অকারণে ডরোথি ওয়াটের ওপর অবিচার করবার জন্যে বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো। গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠলো। মস্ত আদমী হবার কোনো সম্ভাবনা আমার সামনে নেই, কিন্তু ডরোথি ওয়াট, তোমাকে আমি চিরদিন মনে রাখবো।

মদনা আমার অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ বোধ হয় চুপচাপ ছিল। তারপর বললো, "আমায় কিছু বলবেন, স্যর ?"

ডরোথির চিন্তা কাটিয়ে উঠে বললাম, "তোমার সঙ্গে কথা আছে, মদন। কিষ্টো বলে তোমার এক পাজী বন্ধু আছে ?"

মদনা বেশ লজ্জা পেয়ে পেয়ে গেলো। ঠোঁট কামড়ে সে পুনরাবৃত্তি করলো, "কিষটো ?" মদনা বুঝতে পারছে না কেন আমি এই প্রশ্ন করছি।

মদনা এবার বললো, "কিষটো খুব ভাল ছেলে ছিল, স্যর। কর্পোরেশন ইস্কুল থেকে পেরাইজ পেয়েছিল, লেখাপড়ার জন্যে।"

এই পর্যন্ত খবর পেয়ে আমি যে সন্তুষ্ট নই তা মদনা আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আন্দাজ করে নিলো। তারপর বন্ধুর সম্পর্কে ওকালতি করতে গিয়ে খুব দুঃখের সঙ্গে বললো, "পেরাইজ পাওয়া ছেলেও স্যর শেষ পর্যন্ত দুনম্বরী মাল হয়ে গেলো।"

দু'নম্বরী বলতে মদনা হয়তো দাগী মাল বোঝাচ্ছে। মদনা এবার বললো, "কিষটো, স্যর ভাল ছেলেই হতো যদি না বাপের বে দেখতো।"

মদনার মুখে কোনো ব্রেক নেই—ওর কথা শুনে আমার কান লাল হয়ে উঠলো। মদনা তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামলাবার জন্যে বললো, "মা কালীর দিব্যি বলছি, স্যর—কিষটোর বাপ হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের বোনকে বে করে বসলো। কিষটোর মায়ের শ্বাসের রোগ ছিল, প্রায়ই ভুগতো—তাই একদিন বিম্বাধর রেগে গিয়ে বউকে দেশে পাঠিয়ে দিলে। বাপের বে দেখে কিষটোর সে কি কান্না !"

আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই থ্যাকারে ম্যানসনের প্রতিটা মানুষের পিছনেই উপন্যাসের উপকরণ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে নাকি ? কিষটোর বাবা বিম্বাধরকে আমি চিনি—আমাদের বাড়ির ছাদেই সে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করে। তার যে আবার বৈবাহিক জটিলতা আছে তা এতোদিন আমার জানা ছিল না।

বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যেই বোধ হয় মদনা গভীর দুঃখের সঙ্গে বললো, "মনের দুঃখেই কিষটোটা স্যর গ্যাঁড়াকলের লাইনে চলে গেলো।"

চুরি জোচ্চুরিও যে একটা লাইন তা মদনার কথা থেকেই আমার প্রথম হৃদয়ঙ্গম হলো।

মদনা বললো, "কিষটো প্রথমে কাটি-চোর হয়েছিল।" ফিক করে হেসে ফেললো মদনা। আমি যে তার টেকনিক্যাল টার্মগুলো বুঝতে পারছি না তা তার হঠাৎ খেয়াল হলো।

"সিঁদ কাঠি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না না, সিঁদ কাঠি নয়। কলকব্জার লাইন—কাটি চোররা স্রেফ মোটর গাড়ির ওয়াইপার চুরি করে।"

আমি গম্ভীর মুখে মদনার দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টি হানলাম।

মদনা থতমত খেয়ে বললো, "কিন্তু কাটি-চোরদের বাজার খুব খারাপ হয়ে গেলো। দু'খানা কাটি বেচে এক বাণ্ডিল বিড়ির খরচ উঠতো না মাধ্যিখানে। শালা মল্লিক বাজারের দোকানিগুলো সাপের পাঁচ পা দেখেছিল।"

"তখন তোমার বন্ধু গাড়ির ব্যাকলাইট চুরি শুরু করলো!" আমি যে কিষটো সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল তা মদনাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই বললাম।

মদনা আমার জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গেলো। দাঁতে নখ কেটে সে বললো, "ঠিক শুনেছেন স্যর। খুব ভাল লাইন—দু'সপ্তাহের মধ্যে দুখানা প্যাণ্ট, করে ফেলেছিল কিষটো। আমাকে একদিন 'সিনেমা' দেখিয়েছিল।"

মদনা একটু থামলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, "কিন্তু অত সুখ কপালে সহ্য হলো না, স্যর। এলিট সিনেমার সামনে কিষটো একদিন ধর্মের ষাঁড়ের খপ্পরে পড়ে গেলো।"

"ষাড়? কর্পোরেশন আপিসের সামনে?"

জিভ কেটে মদনা আমার ভুল ভাঙালো। "রাস্তার ষাঁড় নয় স্যর। ধরমের ষাঁড়—পুলিশ!"

পুলিসের এই বিশেষ নামটিও এতোদিন আমার অজ্ঞাত ছিল।

মদনা দুঃখ করলো, "কিষটো বেচারার কপালটাই খারাপ। পড়বি তো পড় একেবারে কাঁচাকলার হাতে পড়লো—সায়েবের হাতে কিছু ধরিয়ে দিতে গিয়ে আরো উত্তম মধ্যম খেলো।"

মদনার কথাগুলোর গভীর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করছি। মদনা বুঝতে পেরে বললো, "ধর্মের ষাঁড় দু'রকম হয়, স্যর—কাঁচাকলা আর কালোমামা। কাঁচাকলা ভীষণ কড়া—একটি পয়সা ঘুষ খাবে না। আর কালোমামা ক্যাশ পেলেই সন্তুষ্ট—আপনার কাজে নাক গলাবে না। দিনে দেড়শ ব্যাক লাইট চুরি করে মল্লিক বাজারে ঝেড়ে দিয়ে এলেও মামার মাথাব্যথা নেই!"

কারনানি ম্যানসনের সামনে এক কালোমামা গতকাল আমাকেই পাকড়াও করেছিল, স্যর। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি—ভেবেছি এ-পাড়ার প্যাসেঞ্জার। বাজিয়ে দেখবার জন্যে যেমনি কাছে গিয়েছি, ওমনি ক্যাঁক করে পাকড়াও করে নিলো আমাকে। ভাগ্যে পকেটে একটা বিলিতী ফুচুকল ছিল।

"সেটা আবার কী জিনিস?" আমাকে জিজ্ঞেস করতে হলো।

"সিগ্রেট লাইটার," এক গাল হেসে উত্তর দিলো মদনা। "ওই ফুচুকলটি পেন্নামি দিয়েই তো মামার হাত থেকে হড়কে বেরিয়ে এলাম।"

কিষটোর কথায় আবার ফিরে এলাম। "ব্যাক চোর কিষটো জেল থেকে ফিরে এসে আমাদের ওপর নজর দিয়েছেন কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার কথা শুনে মদনা বেশ অবাক হয়ে গেলো। “কার কথা বলছেন আপনি? কিষটো তো লাইন পাল্টে ফেলেছে। সে এখন ডকে কাজ নিয়েছে।”

“নিজেকে ডকে তুলেছে?” একটু বিরক্ত হয়েই মন্তব্য করি। কারণ মদনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

মদনা ফিক করে হেসে বললো, “কলকার কাজ নিয়েছে বেদানা মিঞার আণ্ডারে। আণ্ডা সাফাই করে রাধাবাজারে পেঁছে দিয়ে আসে। খুব ভাল লাইন।”

“রাধাবাজারে আবার কবে ডিমের পাইকারী মার্কেট হলো?” আমি চিন্তা করি।

জিভ কেটে মদনা বললো, “ডিম নয়! আণ্ডা বাচ্চা—ওই যে আপনার হাতে বাঁধা রয়েছে,” বলে আমার রিস্টওয়াচটা মদনা দেখিয়ে দিলো।

এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি হতে চলেছে। বেশ বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম, “তাহলে কার অত্যাচারে এ পাড়ার রিকশওয়ালারা তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে? রাত্রে ওদের গাঁট কাটছে কে?”

মদনা এবার আকাশ থেকে পড়লো। “বহুদিন আগে মাত্র একটা ওই রকম কেস হয়েছিল স্যর। আপনাকে মা কালীর দিব্যি বলছি। কিষটো পাড়ার লোকদের সঙ্গে মামদোবাজী করে না।”

মদনা বুঝতে পারছে আমার কানে কে অভিযোগ তুলেছে। বেশ রেগে গিয়ে সে বললো, “সত্যি কথা বলবো, স্যর?”

“কেন বলবে না? নিশ্চয় বলবে।” আমি সাহস জোগাই।

মদনা এবার বোম ফাটালো। “রিকশওয়ালাদের কাছে পয়সা আদায় করে রামসিংহাসন। এ-বাড়ির মধ্যে রিকশ রেখে রাত্রে ঘুমুতে হলে রামসিংহাসনের রেট হলো চার আনা।

গরীব রিকশওয়ালাকে রাত্রে থ্যাকারে ম্যানসনে ঢুকতে দিয়ে রামসিংহাসন পয়সা আদায় করে। কথাটা ভাবতেও আমার গা রি রি করে উঠলো।

মদনা বললো, “আগে দু'আনা করে রেট ছিল। আপনি চার্জ নেবার পরে ডবল হলো। সবাই তো জানে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই রামসিংহাসন রেট বাড়িয়েছে।”

রামসিংহাসন নাকি এমনও বলেছে, 'আগে একা রামসিংহাসন ছিল—এখন নতুন ম্যানেজার এসেছেন বুঝতেই পারছো।'

রামসিংহাসনের ওপর আমার রাগটা ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। গরীব রিকশওয়ালাদের কাছ থেকে পয়সা নিঙড়োনোর ব্যাপারেও আমার নাম জড়িয়েছে ভাবতে মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো।

মদনা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বললো, “স্লিপিং চার্জটা আপনি ফ্রি করে দিন, স্যার—গরীব রিকশওয়ালারা আপনাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।”

মদনার দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওকে ছেড়ে দিলাম। যাবার আগে মদনা একটা মিলিটারি স্যালুট ঠুকে বললো, “মদনা, সব সময় আপনার পাশে-পাশে আছে, স্যর। কোনো দরকার হলে একবার তু করে ডেকে পাঠাবেন।”

মদনা থাকতে থাকতেই দূর থেকে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে আর সি ঘোষকে দেখা গেলো। আড়চোখে মদনা দেখলো, ঘোষমশাই দূর থেকে আমাকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেন।

মদনা ফিসফিস করে বললো, “খুব কায়দা করে হ্যাণ্ডেল করবেন এঁদের। গোখরো সাপের পার্টি এই জেঠমালানিরা।”

আমি মদনার কথায় কোনো মন্তব্য করছি না।

মদনা ফিস ফিস করে বললো, “এদের বিজনেস হলো—কাতলা ছেড়ে মাতলা ধরা!”

শেষোক্ত বাক্যের গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা না করেই মদনা কেটে পড়লো।

“নমস্কার। আছেন কেমন?” চৌত্রিশ নম্বরের অফিসিয়াল ভাড়াটে আর সি ঘোষ আমাকে দেখে সৌজন্য বিতরণ করলেন।

প্রতিনমস্কার জানালাম। কিন্তু কেমন আছি? চার্ণক সায়েবের শহরের এক কোণে কালের অবহেলায় জীর্ণ একখানা অখ্যাত ফ্ল্যাট বাড়ির ততোধিক অখ্যাত ম্যানেজার কেমনই বা থাকতে পারে? গত কয়েক দিনে সুলেখার অসহায় জীবনের কিছুটা পরিচয় পেয়ে ভাল আছি একথা বলাটা সত্যের অপলাপ হবে।

আর সি ঘোষ আমার প্রিয় হাওড়ার লোক। তাই হেসে বললাম, “আমরা ভাল থাকলাম আর না থাকলাম তাতে পৃথিবীর কী এসে যায়, মিস্টার ঘোষ?”

মিস্টার ঘোষ দমলেন না। এক গাল হেসে বললেন, “ঠাকুরের আশীর্বাদে আমি কিন্তু খুব ভাল আছি। মেয়ে চিঠি লিখেছে, জামায়ের আরও প্রমোশন হতে পারে। জামাই আর পুত্রের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, বুঝলেন শংকর-বাবু। ছেলেপুলেদের আনন্দেই আমাদের আনন্দ, ওদের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি।”

মেয়ে সম্বন্ধে আরও কত কি সব বলে গেলেন মিস্টার আর সি ঘোষ। মেয়ের সাজানো ঘরসংসার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। চাকরবাকর বাবুর্চি বেয়ারা সিপাই আর্দালি ড্রাইভার সব আছে মেয়ের। মেয়ের ওখানে গিয়ে কয়েকদিন থাকবার প্ল্যান করছিলেন মিস্টার ঘোষ, কিন্তু সেই সময় জামা-য়ের বদলির হুকুম হয়েছে। জামাই কলকাতায় চলে এসেছেন, সরকারী গেস্ট হাউসে আছেন—এখানকার বাংলোটা না-পাওয়া পর্যন্ত মেয়ে আসতে পারছে না।

মেয়ের প্রতিটি ব্যাপারের খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে পড়েছেন মিস্টার ঘোষ। কবে কোন্ তারিখে বাংলো খালি পাওয়া যেতে পারে তাও তাঁর কণ্ঠস্থ। একটু বিরক্তভাবেই তিনি বললেন, “আগেকার অফিসারের এটা অন্যায় নয়? আপনি বলুন। বদলির অর্ডার যখন পেয়ে গেছিস তখন বাংলো ছেড়ে দে। কিন্তু নানা কায়দা-কানুন দেখিয়ে এখনও বাড়িটা আটকে রেখেছে। কলকাতা শহর তো! এখানে অনেক মধু। যে একবার এখানে আসে সে আর নড়তে চায় না।”

আর সি ঘোষ অনর্গল বলে চলেছেন। “এই মেয়ের জন্যেই আপনার কাছে চলে আসতে হলো।”

“মেয়ের জন্যে?” আমি একটু অবাক হয়ে যাই।

আর সি ঘোষ বললেন, “মেয়েটা একলা থাকবে ওখানে। তাই ভাবছিলুম, দরকার হলে ওখানে কয়েকদিন ঘুরে আসি। মেয়েটার আমার একলা থাকার অভ্যেসই নেই।”

"একলা থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে যাবে", আমি ভরসা দিই মেয়ের বাবাকে। মনে মনে ভাবলাম, একলা থাকার অভ্যাসটা সবারই প্রয়োজন। না হলে ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোনোদিন আমার মতো জীবন যাপন করতে হলে শুধু শুধু কষ্ট পাবে।

মিস্টার ঘোষ আমার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। মুখের ওপরেই বললেন, "কোন্ দুঃখে আমার মেয়ে একলা থাকতে যাবে বলুন? একলা থাকার কপাল করে মা তো আসেনি।"

কাজের কথায় ফিরে এলেন মিস্টার আর সি ঘোষ। বললেন, "আমরা কর্তা-গিন্নী তো মেয়ের কাছে যাওয়ার জন্যে রেডি। ঠিকও করে ফেলেছিলাম, এবার দরকার হলে কিছুদিন থাকবো। কিন্তু বাদ সাধলেন আপনি!"

"আমি?" আর সি ঘোষের মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে আমি বাধা দেবার কে?

"আপনার মুখটাই লাস্ট মোমেণ্টে আমার মনে পড়ে গেলো।" আর সি ঘোষের কথাবার্তায় কোনো রসিকতার ইঙ্গিত নেই।

ঘোষ বললেন, "এসব গোলমাল তো আগে ছিল না, আপনিই বাধিয়েছেন। হঠাৎ খেয়াল হলো, মেয়ের কাছে থাকতে থাকতেই মাস কাবার হয়ে যাবে—অথচ আপনি অন্য কারুর হাত থেকে ভাড়া নেবেন না।"

জেঠমালানিদের সম্পর্কে মনে মনে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে। তাঁরা যখন খাতায় কলমে চৌত্রিশ নম্বরের কেউ নন, তখন আমি কেন তাঁদের স্বীকার করতে যাবো?

আমি বললাম, "তাড়াতাড়ির কী আছে! ফিরে এসেই ভাড়াটা দিতে পারেন।"

আমতা-আমতা করে ঘোষমশাই বললেন, "সত্যি কথা বলবো, স্যর? আপনার সম্বন্ধে কর্তারা এখনও তেমন ভরসা পাচ্ছেন না।"

"আমি অতি সামান্য লোক। আমার ভরসায় আপনার কর্তাদের মতো মান্যগণ্য লোকের কী এসে যায়?" অসতর্ক মুহূর্তে কথাগুলো হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

আর সি ঘোষ প্রথমে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "নিশ্চয় এসে যায়, না হলে বাবুরা কেন আপনার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন?"

আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর? একটু অবাক হবারই কথা।

আর সি ঘোষ বললেন, "আমাদের বাবুর সঙ্গে আপনার তো আলাপ হয়নি। মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি—কলকাতার হাই-সোসাইটিতে ওঁর খুব নাম শুনবেন। এতো হাই-সোসাইটিতে ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু ছোটখাট ব্যাপারেও সমান নজর। কোনো ব্যাপার ভোলেন না, সব ঘটনা মাথার মধ্যে জমা করা থাকে।"

প্রমাণ স্বরূপ মিস্টার ঘোষ বললেন, "এই যে আমি, অতি সামান্য কর্মচারি। যেমনি আমি ছুটি চাইতে যাবো, উনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন মাসের গোড়ায় থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়া দেওয়ার কী হবে? আমি যদি বলি, ফিরে এসে দেবো, উনি আপত্তি করবেন। বলবেন, বাড়িওলার সঙ্গে যদি সম্পর্ক খারাপ থাকে, তাহলে ভাড়াটি কখনও ফেলে রাখবে না। ডিফল্টার হওয়া মানেই তো আউট হয়ে যাবার চান্স দেওয়া।"

ঘোষমশায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় মনে হচ্ছে জগদীশ জেঠমালানি আমার

সম্বন্ধেও সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে রাখছেন। এসব খবর যোগাড়ের সহজতম উপায় হলো রামসিংহাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এ পক্ষের এমন কোনো খবর নেই যা সামান্য বকশিসের বদলে জেঠমালানির কানে হাজির হবে না।

এবার আমার জন্যেও টোপ ফেলা হলো। ঘোষমশাই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালেন। "বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই অফার করলাম না। খাওয়ার অভ্যেস থাকলে নিজেই একটা তুলে নিন।" এই বলে বিড়ির কৌটোটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

বিড়ির ব্যাপারেও মেয়ের প্রসঙ্গ তুললেন আর সি ঘোষ। "এই বিড়ি নিয়ে আমার মেয়ের কাছে খুব বকুনি খাই। বুঝি এতো বড় যার জামাই তার মুখে বিড়ি শোভা পায় না। কিন্তু অভ্যেসটা এমন হয়ে গেছে। বিড়ি ছাড়া অন্য কিছুতে সুখ পাই না।"

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বিড়িটা দাঁতে চেপে আর সি ঘোষ বললেন, "ওই যে বলছিলুম না, আমাদের মালিকের সব দিকে নজর। আপনার কথাও ভেবে ফেলেছেন জগদীশবাবু। আপনি তো শাজাহান হোটেলে টাইপ-ফাইপ করতেন। এখানে আর ক'টাকা পাচ্ছেন। ভগবানের ইচ্ছেয় ইয়ং বয়স, পরিশ্রমের 'ক্ষ্যামতা' যখন রয়েছে ; তখন বাবুদের আপিসে, সন্ধ্যাবেলায় পার্টটাইম টাইপিস্টের কাজ করুন। তেমন কিসসু কাজ থাকে না সন্ধ্যে-বেলায়। স্রেফ বসে বসে কিছু কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে যাবেন।"

আমার দিকে তাকালেন মিস্টার আর সি ঘোষ। তারপর আরও পরিষ্কার করে বললেন, "অন্য টাইপিস্টদের যাই দিক, আপনাকে পেলে বাবু নিশ্চয় শতখানেক টাকা মান্থলি দিয়ে দেবেন।"

শতখানেক বাড়তি টাকা আমার বর্তমান আর্থিক অবস্থায় অনেক। কিন্তু সুলেখার কাছ থেকে জেঠমালানিদের সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা হয়ে গেছে। এড়িয়ে যাবার জন্য বললাম, "সন্ধ্যেবেলায় এখানে কাজ থাকে।"

"তেমন আর্জেণ্ট কাজ যেদিন পড়বে সেদিন যাবেন না। এই তো ক'হাত দূরে পার্ক স্ট্রীটে আমাদের আপিস।"

আমি নিরুত্তর।

আর সি ঘোষ এবার শেষ চেষ্টা করলেন "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না, মশায়। এমন চান্স রোজ আসবে না।"

পার্ট টাইম চাকরির প্রলোভনটা আমার নাকের কাছে নিষিদ্ধ ফলের মতো মোহজাল বিস্তার করছে। অতি সামান্য পরিশ্রম, দু'একদিন কামাই হলেও কিছু এসে যাবে না—তার ওপর আমার টাকার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কৈশোর থেকে ভাগ্য সন্ধানে দিনরাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে সাধ্যমতো পরিশ্রম করে চলেছি—কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত উপার্জন আজও করতে পারিনি। বিপদ-আপদ এবং চাকরির অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সামান্য সঞ্চয়ও নেই। জেঠমালানি ট্রেডিং কোম্পানির সান্ধ্যকালীন চাকরিটা এই মুহূর্তে আমার সামনে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কিন্তু এটা চাকরি না টোপ? সাদামাটা এই প্রশ্নটি সোজাসুজি আর সি ঘোষের কাছে তুলে ধরবার মতো সাহসও এই অবস্থায় খুঁজে পাচ্ছি না।

বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিলেন আর সি ঘোষ। "কী এতো ভাবছেন মশায়? রাণীর মন্ত্রী হবার আগেও তো ইংলণ্ডের সায়েবরা এতো ভাবেন না।"

আর সি ঘোষের পলিটিক্যাল সায়েন্সে জ্ঞান দেখে আমি একটু অবাক হলাম। মনে মনে বললাম, "বড়লোকরা সব সময় বড় চাকরি পায়—ছোটখাট ব্যাপারে তাদের মাথা ঘামাতে হয় না। আমাদের মতো ছোটমানুষের যাত্রাপথে ছোটখাট বিপদগুলোই বিরাট পাথরের মতো পথ বন্ধ করে বসে থাকে।"

আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা তোলপাড় করছে। ঘোষমশায়ের কৃতী এবং প্রবল শক্তিমান জামাতার কাল্পনিক মুখখানা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। হাওড়াবাসী হিসেবে হাওড়ার জামায়ের ওপর আমার স্বাভাবিক দাবিও একটা রয়েছে।

"কী ভাবছেন এতো?" আর সি ঘোষ এবার প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না।

"আপনার জামায়ের কথা।"

একটু অস্বস্তি বোধ করলেন ঘোষ মশাই। ওঁর জামায়ের কথা অন্য লোক কেন ভাববে, এই রকম কোনো প্রশ্ন হয়তো ওঁর মনের মধ্যে উঁকি মারছে।

একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়তো হলো। আর সি ঘোষ গম্ভীরভাবে বললেন, "অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে, অনেক সাধনা করে, নিজের প্রতিভায় ওরা আই এ এস হয়েছে মশাই। ওদের সঙ্গে কী আর অর্ডিনারি লোকের তুলনা করে চলে?"

আর সি ঘোষ অন্যায় কিছু বলছেন না। ওঁর সঙ্গে দ্বিমত হবার কোনো কারণ নেই।

আর সি ঘোষ সগর্বে বললেন, "বালি ধুয়ে ধুয়ে সোনার দানা ক'টি গভরমেণ্ট বছরের পর বছর তুলে নেয়। লাখে একটা আই এ এস হয় না, মশাই।"

লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, ঘোষ মশাইয়ের জামাই যদি আমাকে একটা সরকারী চাকরি যোগাড় করে দেন।

এই অনিশ্চিত ত্রিভুবনে সরকারী চাকরির মতো নিরাপত্তা আর কোথাও যে নেই তা আমি বিভিন্ন মহল থেকে শুনে ফেলেছি। বেসরকারী উদ্যমের গোলকধাঁধায় সেই কৈশোর থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমি এবার সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু নিয়মকানুনের দুর্লঙ্ঘ্য গোপন ব্যূহভেদ করে কীভাবে সরকারী চাকরি যোগাড় করতে হয় তা আজও কেউ আমাকে বলে দেয়নি।

অন্য সময় হলে ঘোষমশাই বোধ হয় রেগে উঠতেন। বলতেন, 'হাতের লক্ষ্মী আপনি পায়ে ঠেলছেন, অথচ চাকরির জন্যে হা-পিত্যেশ করছেন।' কিন্তু জামাইয়ের প্রসঙ্গ তোলায় ঘোষমশায় রাগতে পারলেন না। বললেন, "ঠিকই ধরেছেন। ওদের মুখ থেকে কথা বেরোলেই ডজনখানেক লোকের চাকরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওদের সব সময় জজেদের মতো নিরপেক্ষ থাকতে হয়—খুকীকে পর্যন্ত এমন ট্রেনিং দিয়েছে যে, কাউকে কোনো ব্যাপারে সেও রেকমেণ্ড করে না। শুনতে খুব ভাল—আই এ এস-এর বউ;

কিন্তু আসলে হাজার অসুবিধে।”

আমার আবেদনের উত্তরটা মিস্টার ঘোষ নিজেই এড়িয়ে যাচ্ছেন নাকি? কিছুক্ষণ কী ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, “ঠিক আছে, তেমন চান্স পেলে একবার বুড়ী ছুঁইয়ে রাখবো। তবে কোনো গ্যারাণ্টি দিতে পারবো না—ওই চাকরির আশায় হাতগুটিয়ে বসে থাকবেন না যেন।”

হাত তো দিনরাতই চলছে—চলতে চলতে ক্লান্তিতে কখনও কখনও দেহমন অবশ হয়ে ওঠে। সুতরাং, হাত গুটিয়ে রাখবার অবকাশ কোথায়?

আর সি ঘোষ আমার মনোভাব বোধ হয় এবার বুঝতে পারছেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, “বাবুকে তা হলে কী বলবো?”

অপ্রিয় সত্যটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দেবার সৎসাহস সঞ্চয় করতে পারলাম না। কোনো রকমে বললাম, “জগদীশবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। মালিকের অনুমতি না নিয়ে দু'নম্বর চাকরি করতে গিয়ে একূল-ওকূল দুকূল যেতে পারে। সুতরাং, ওপর মহলে ম্যানেজ না-করা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না।”

আর সি ঘোষ এখনও বোধ হয় তাঁর পুরনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। জগদীশ জেঠমালানি সম্পর্কে আমার যতই ঘৃণা থাক, তার জন্য আর সি ঘোষের কন্যাগৃহ গমনে আমি বাদ সাধতে চাই না। আমি বললাম, “ভাড়ার জন্যে চিন্তা করবেন না। মেয়ের বাড়ি ঘুরে আসবার জন্যে আপনাকে কোনো বিপদে ফেলবো না। আপনার মালিক জিজ্ঞেস করলে সোজা বলে দেবেন আমার সঙ্গে আপনি ব্যবস্থা করে ফেলেছেন—আপনাকে নিশ্চিন্তে ছুটি দিতে পারেন তিনি।”

আর সি ঘোষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সামান্য ওকালতি সমস্যার জন্যে মেয়ের কাছে যাওয়াটা তাঁর বন্ধ হয়ে যাবে এটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন মিস্টার ঘোষ, তারপর দুঃখ করে বললেন, “চিরকাল এই চিনির বলদ হয়েই রয়ে গেলাম, শংকর-বাবু। সন্তানভাগ্য ভাল না হলে এতোদিনে আমার হিসেবের খাতায় চোখের জল ছাড়া কিছুই জমা থাকতো না।”

ঘোষের পরবর্তী কথায় জেঠমালানিদের অন্য একটা রূপও প্রকাশ পেলো। মুখে কাটা সুপুরির কুচি পুরতে পুরতে তিনি বললেন, “আপনি আমার হাওড়া কাসুন্দের লোক—আপনার কাছে কিছু চেপে রাখাটা ঠিক হবে না। আমার মালিকদের এতো টাকা—সোনা রূপোয় ছাতা পড়ছে বললেও বাড়ানো হবে না। তবু জগদীশবাবু এ বাড়ির ভাড়াটা একবারের জন্যেও আগাম দেবেন না। ক'দিন আগে টাকাটা ছাড়লেই তো আমাকে এতো হাঙগামা পোয়াতে হত না—গট গট করে এসে আপনার হাতে আগাম ভাড়াটা ফেলে দিয়ে আমি গট গট করে রসিদখানি নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু যেমন মালিক তেমন মুনিমজী। আমাকে বলে কি জানেন?”

মুনিমজী নামক দিশী প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা বিধাতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আগ্রহ। তাই তাঁর সুবচন শ্রবণের জন্যে ঘোষমশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। ঘোষ মশায় চোখ বড় বড় করে বললেন, “পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি। মুনিমজী আমার মুখের ওপর বললেন, আগাম ভাড়া দিয়ে গোলমাল মিটিয়ে মেয়ের বাড়ি যেতে হলে, নিজের পকেট থেকে টাকাটা অ্যাডভান্স করতে হবে।”

"বুঝুন মশাই, এই সব দিশী কোম্পানিতে আমাদের ওপর কী বিচার। বেনামা ভাড়ার টাকাও আমাকে পকেট থেকে আগাম দিতে হবে।"

সুপুরিগুলো মুখের মধ্যে যথাসাধ্য জোরে নিষ্পেষণ করতে করতে ঘোষ বললেন, "এক এক সময় কী ইচ্ছে করে জানেন? গিন্নীকে সেদিন শুয়ে শুয়ে বলেছিলাম, জামাইবাবাজীকে রিপোর্ট করে দিয়ে ওই মুনিমজীকে একবার শ্রীঘর দেখিয়ে আনি। কিন্তু এমনই কপাল, গিন্নী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন,—"কথায় কথায় জামাই দেখানোটা তোমার বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। যে আপিসে অ্যাদ্দিন চাকরি করছো, যারা তোমার অন্নদাতা তাদের মুনিমজীকে বিপদে ফেলবার কথা তুমি ভাবছো কী করে?"

দুপুরের একটু পরেই সুলেখা সেনকে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো।

সুলেখা যে অনেকক্ষণ ধরে সযত্নে প্রসাধন করেছে তার প্রমাণ ওর মুখে চোখে ছড়িয়ে রয়েছে। হাতে একটা কালো নরম চামড়ার দম্ভথলিকা। প্রচণ্ড দামী নয়নমোহন কোনো শাড়ি দেহে জড়ায়নি। একটা হালকা বাদামী রংয়ের পোল্কাডট ইজিপসিয়ান কটনের মিলশাড়ি পরেছে সুলেখা। সঙ্গে মানানসই কাপড়ের ব্লাউজ—একেবারে সাদা। রোদকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে চোখে একটা রঙীন চশমা পরে নিয়েছে সুলেখা।

মুখ চোখ ভাব ভঙ্গী ও বিনম্র চলন দেখে এই মুহূর্তে কে তার প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারবে? তার নিঃসঙ্গ গাম্ভীর্য তাকে রীতিমত ব্যক্তিত্ব-শালিনী করে তুলেছে। যেন পার্ক স্ট্রীট পাড়ার কোনো ইংলিশ মিডিয়াম কলেজের অধ্যাপিকা সময় সংক্ষেপের জন্য এই থ্যাকারে ম্যানসনের মধ্য দিয়ে শর্টকাট করছেন। অথবা ফেনার আপিসের কোনো আধুনিকা মহিলা-কর্মী নির্ধারিত সময়ের আগেই আপিস থেকে বেরিয়ে পদব্রজে নিউ মার্কেটে চলেছেন।

হাতে ক্যামেরা থাকলে শ্রীময়ী সুলেখার এই চলমান শোভন রূপটি ধরে রাখতাম। কিন্তু কোথায় ক্যামেরা? তাই মনের পটেই একটা অস্পষ্ট ছবি এঁকে রাখতে হলো।

আপিস ঘরের গেটের কাছেই সুলেখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। কালো ব্যাগটা ছাড়াও সুলেখার হাতে দু'একখানা বই রয়েছে মনে হলো। সুলেখা তা হলে কী এই দ্বিপ্রহরে কোথাও চাকরির সন্ধানে চলেছে? সিনেমা যাবারও সময় এটা। কিন্তু সাজগোজের প্রকৃতি দেখে সিনেমার কথাটা আমার মাথা-তেই আসছে না। চাকরির ইণ্টারভিউ-এর ব্যাপারটাই সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। সুলেখার দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম। ওর সুষম তনুদেহে কোথাও মেদের বাহুল্য নেই। এ পাড়ার বড় বড় আপিসের রিসেপশনে যে সব রমণী-দের কর্মরত দেখি তাদের কেউ সুলেখার মতো ব্যক্তিত্বশালিনী নন। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে রিসেপশনে কাজ পাওয়া উচিত সুলেখার।

সুলেখাকে একটু অবাক করে দেবার জন্যেই বলে বসলাম, "কোথায় চললেন? ইণ্টারভিউতে?"

আশ্চর্য! সুলেখা প্রতিবাদ করলো না। গাম্ভীর্য যথাসম্ভব বজায় রেখেই ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলো আমার আন্দাজে ভুল হয়নি।

অন্য যে কোনো সময়ে সুলেখা হয়তো আমার সামনে এসে দাঁড়াতো

—কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের কথা বলতো। কিন্তু আজ সে রঙীন কাঁচের আড়াল থেকে মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে নজর দিলো, তারপর ওর মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন ফুটে উঠলো। বললো, "আর্জেণ্ট।"

এই আমাদের মুশকিল। পৃথিবীর কিছু অভাগা ও অভাগিনীকে সব সময় সময়ের সঙ্গে লড়াই করে টিঁকে থাকতে হয়—তাদের দৈনন্দিন কর্ম-ধারায় সব সময় 'আর্জেণ্ট'-এর রবার স্ট্যাম্প পড়ছে। নিজের ইচ্ছে মতো, সময়মতো খেয়ালখুশির খাতা ভরানোর সময় তাদের জীবনে কখনও আসে না।

হয়তো শেষ মুহূর্তে আর্জেণ্ট কোনো চাকরির খবর এসেছে। এই সব শুভ কাজে আর্জেণ্ট স্ট্যাম্প থাকলে আমার আপত্তি নেই।

সুলেখাকে উৎসাহিত করা এবং ভরসা দেওয়া আমার কর্তব্য। মৃদু হেসে তাই বললাম, "ইণ্টারভিউয়ের সুখবরটা যেন সন্ধ্যেবেলাতেই পাই।"

রঙীন কাঁচের নিরাপদ আড়ালে ওর চোখগুলোর কী পরিবর্তন হলো তা বোঝা গেলো না। কিন্তু এবার তেমন সহজভাবে হাসলো না সুলেখা। একটু থতমত খেলো সে, তারপর ঘাড় নেড়ে সে যেন যথাসময়ে আমাকে সমস্ত খবরাখবর সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলো।

মুহূর্তের ওই থতমত ভাবটা আমার চোখ এড়ায়নি। প্রতিশ্রুতি দেবার ওই সামান্য বিলম্বে আমার মনের মধ্যে সাময়িক ছন্দপতন ঘটিয়ে গেলো। কর্মহীন অলস অপরাহ্নে আমার মানসলোক সেণ্টিমেণ্টের বন্যায় প্লাবিত

সুলেখা আমার কেউ নয়। সামান্য কয়েকদিনের পরিচয়। তবু এমনভাবে তার জীবনের সপ্তসুরের সঙ্গে কেন আমি জড়িয়ে পড়ছি?

সুলেখার জন্য আমি প্রার্থনা করছি—ইণ্টারভিউটা যেন ওর সফল হয়, ওর সব সমস্যার এবার যেন সমাধান হয়।

কিন্তু এবারেও গোলমাল করে ফেলেছি। সন্ধ্যার আগেই সুলেখাকে ফিরে আসতে দেখা গেলো। একটু ক্লান্ত বলে মনে হলো ওকে।

ওকে দেখেই ফলাফল জানবার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু কাছে ডেকে প্রশ্নটা করা গেলো না—আমার আপিসঘরে তখন অনেক লোক। কর্পোরেশন আপিসের একটা বেয়াড়া লোক এসে নানা রকম কোশ্চেন করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। ইচ্ছে হয়েছিল লোকটাকে সোজা বিদায় করে দিই, কিন্তু তেলকালিবাবুর উপদেশ মনে পড়ে গেলো—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া এবং কলকাতায় বাড়ি করে কর্পোরেশনের লোকদের সঙ্গে মনোমালিন্য একই জিনিস। ওঁরা যতই অন্যায় আবদার করুন, কিছুতেই আমাদের মেজাজ খারাপ করা চলবে না। তেলকালিবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, "প্রপার্টি থাকলেই ক্যালকাটার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে রেগুলার পেন্নাম ঠুকতেই হবে। এই তিনজন দেবতা হলেন: কর্পোরেশন, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং ক্যালকাটা টেলিফোন!"

যাবার পথে সুলেখা আড়চোখে একবার আপিসঘরের দিকে তাকিয়েছিল মনে হল। কিন্তু কাজের চাপে সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারিনি।

কাজের পালা চুকিয়ে ঘরে ফিরে স্নান পর্ব সমাধান করার পর আবার সুলেখার কথা স্মরণ হলো। এই সময় এক বিচিত্র স্যাঁতসেঁতে নিঃসঙ্গতা মাঝে মাঝে এপাড়ার মশক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে আমাকে আক্রমণ করে। কবে কোথায় কোন্ স্বপ্ন নিয়ে জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলাম এবং

ভাগ্যের প্রবাহে অবশেষে কোথায় এসে পড়লাম?

ছোটবেলার সেই রঙীন দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ইস্কুলের মাস্টারমশায় ছাত্রদের জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কী হতে চাও?" আমি বলতাম, 'আমি খুব বড় হতে চাই। এতো বড়, যাতে সবাই আমাকে চিনতে পারে'। মাস্টারমশায় বিশ্বাস করতেন আমাদের স্বপ্ন সফল হবে, সত্যিই একদিন মস্ত লোক হবো আমরা। তারপর বাবার হাত ধরে যখন মাঝে মাঝে হাওড়া কোর্টে যেতাম তখন মত পাল্টে ফেলতাম। স্পেশাল ড্রেসপরা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত জজসায়েবদের দেখে ওই রকম হতে ইচ্ছে করতো আমার! মানসনেত্রে দেখতাম আমি জজ হয়েছি—আমি আদালতে প্রবেশ করা মাত্রই পিন-ড্রপ নীরবতা। উকিল মোক্তার পেশকার থেকে আরম্ভ করে পুলিস ও আসামী পর্যন্ত সকলে সসম্ভ্রমে আমার দিকে অর্থাৎ ধর্মাবতারের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু সেই সব স্বপ্ন ঠিকানাবিহীন কোন অরণ্যে হারিয়ে যায়, সংসার সমরাঙ্গণে রেখে গেলো সহায়সম্বলহীন, প্রায়-কর্মহীন এক ব্যারিস্টারের বাবুকে। জীবনতীর্থের ঘাটে ঘাটে নিরন্তর পরিক্রমা করেও তার যন্ত্রণার অবসান হলো না। পাকেচক্রে অন্ধকার অধঃপতনের আরও কোনো গভীর বিবরে হয়তো আমি বিলুপ্ত হতাম যদি না গণপতিবাবু করুণাভরে আমাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনের আশ্রয় খুঁজে দিতেন।

নিজের দুঃখ ভুলবার জন্যেই এই মুহূর্তে আমি চৌত্রিশ নম্বরের সেই অসহায়া সুলেখার কথা স্মরণে আনলাম। সুলেখার কী হলো শেষ পর্যন্ত? একবার খোঁজ করলে মন্দ হতো না। কিন্তু সময় সন্ধ্যা—বিনা নোটিশে এই সময় চৌত্রিশ নম্বরে পদার্পণ অবর্ণনীয় বিপত্তির কারণ হতে পারে।

কিন্তু আমার আশঙ্কা ভুল। সহদেব একটু পরেই একটুকরো চিঠি এনে হাজির করলো, সুলেখা এখনই আমার দর্শনপ্রার্থী।

চৌত্রিশ নম্বরের নরম সোফায় সুলেখা সেন সান্ধ্যস্নানের পর প্রস্ফুটিত হয়ে বসে আছে। কিন্তু মুখের ক্লান্তি দূর হয়নি।

সুলেখা বললো, "আজ আপনার জন্যে ঢাকার বাখরখানি কিনে এনেছি। চায়ের সঙ্গে খাবেন।"

এই বিশেষ খাবারটি যে আমার প্রিয় তা কথাপ্রসঙ্গে কবে যেন সুলেখাকে বলেছিলাম। কিন্তু খাবারটা যে সব জায়গায় পাওয়া যায় না তাও সুলেখাকে বলেছিলাম।

সুলেখা বললো, "আপিসপাড়ার সামনেই এক বুড়ো বাক্স নিয়ে বসেছিল। দেখে মনে হয় সদ্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।"

চায়ের সঙ্গে বাখরখানির আস্বাদ নিতে নিতে ইণ্টারভিউয়ের কথা তুললাম। জানতে চাইলাম, ফলাফল কী হলো?

বুকের কাছে হারের লকেটটা অন্যমনস্কভাবে নাড়তে নাড়তে সুলেখা বললো, "ইণ্টারভিউ দিলেই কি সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল জানা যায়?"

এর পরেই আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ইন্টারভিউতে ক'জন ছিলেন?"

এবার সুলেখা বেশ দুঃখ পেলো। লকেটখানা ছেড়ে দিয়ে, চোখ দুটো

বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো, "রসিকতা করছেন? এসব ইণ্টারভিউতে ক'জন থাকেন? একজন—সব সময় একজন। এবং তিনি একাই একশ।"

হিসেবে কোনো একটা বড় ভুল করে ফেলেছি বুঝতে পারছি। বেশ অস্বস্তি অনুভব করছি। চায়ের কাপটা প্রায় পুরো না থাকলে কোনো একটা ছুতো করে সংগে সংগে বেরিয়ে পড়তাম অবশ্যই।

মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে সুলেখা আমার দিকে তাকালো। সেও বোধ হয় আন্দাজ করছে আমি ভুল বুঝে বসে আছি।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, "ইণ্টারভিউ বলতে আপনি কী বুঝেছেন?"

"কেন, চাকরি?"

সুলেখা বেশ বিরক্ত হলো। "চাকরি! আপনার ধারণা বিশ্বসুদ্ধ লোক আমার মতো মেয়েকে চাকরি দেবার জন্যে আপিস খুলে বসে আছে?"

সুলেখা এবার নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "খুলে দেখুন।"

মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ নিজের হাতে খোলা! ওর থেকে চারশ চল্লিশ ভোল্ট এসি মেন সুইচে হাত দেওয়া অনেক সহজ। ছোটবেলায় আমার দিদি একবার আমাকে খুব বকুনি লাগিয়েছিলেন, ঠাকুরের সামনে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিলেন, মরে গেলেও কখনও মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগে হাত দেবে না। মেয়েদের ব্যাগে হাত দিতে নেই।

আমি হাত গুটিয়েই বসে রইলাম দেখে সুলেখা ব্যাগটা নিজের দিকেই টেনে নিলো এবং পট করে বোতাম টেপার শব্দ হলো।

ব্যাগ খুলে ফেলে সুলেখার হাতে বেরিয়ে এলো দু'একখানা ছোট বই যা লাইফ ইনসিওর এজেণ্টদের হাতে দেখা যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে আরও জটিল হয়ে উঠছে। সুলেখা তা হলে কি কোনো বীমা আপিসে চাকরির চেষ্টা করছে?

সুলেখা এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। "আমি এখন লাইফ ইন-সিওরের এজেণ্ট। করবেন নাকি লাখ টাকার ইনসিওর?"

লাখ টাকা কেন হাজার টাকার বীমা করবার মতো চাকরি-নিরাপত্তা আমার নেই একথা সুলেখা জানে। সুলেখা বললো, "ভ্যালুয়েবল লাইফের পিছনেই আমাদের মতো মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়।"

বই দুটো ব্যাগে আবার পুরতে পুরতে সুলেখা বললো, "লাইফ ইন-সিওরের ই পর্যন্ত আমি জানি না। বুদ্ধিটা মিস্টার জগদীশ জেঠমালানির। উনিই আমার নামে এই এজেন্সিটা করিয়ে দিয়েছেন। কোথা থেকে দু'একটা কেসও আমার নামে কোম্পানির খাতায় পাঠিয়ে দেন মাঝে মাঝে। এতে আমার এবং ওঁর দুজনেরই খুব কাজের সুবিধে।"

আমি এখন জীবন বীমার নিগূঢ় রহস্যটা হৃদয়ংগম করতে পারছি না। সুলেখা বললো, "আমার সুবিধা, আমার একটা পরিচয় রইলো। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলা যাবে, আমিও কেরিয়ার উয়োম্যান—আমারও একটা ভদ্র পেশা আছে। কিন্তু ওঁর লাভ আরও অনেক বেশী। প্রথমে আমিও ভেবে-ছিলাম, এতো কাজ থাকতে ইনসিওরের এজেন্সি কেন? কেন এতো তড়ি-ঘড়ি তিনি আমার নামটা ইনসিওর কোম্পানির খাতায় লিখিয়ে এলেন?"

"বিজনেস, বুঝলেন মশায়, বিজনেস!" সুলেখার গলা থেকে বিদ্বেষের তীব্র বিষ ঝরে পড়লো।

"এতো বিজনেস করছেন, তবুও মন ভরছে না। আপনার নামে একটা বেনামা ইনসিওরের এজেন্সি রেখে টাকা কামাতে চান ভদ্রলোক?"

মাথা নেড়ে সুলেখা জানিয়ে দিলো ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারি নি।

সুলেখা বললো, "মিস্টার চট্টরাজকে ওই যে এঁটো ভাঁড়ের মতো ধানবাদে ফেলে রেখে আর্জেণ্ট কাজের জন্যে কলকাতায় চলে এলাম। হুকুম মতো আসর সাজিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছি। কিন্তু আর্জেণ্ট কাজ তার আসে না। নাম, ধাম, পরিচয় কিছুই জানি না—রোজ রেডি হয়ে থাকি। রাজুবাবুকে টেলিফোন করি, আর্জেণ্ট কাজের কী হলো? রাজুবাবু সব খুলে বললেন না। শুধু জানালেন, মিস্টার আর্জেণ্ট মস্ত লোক, মস্ত চাকরি তাঁর, খুব আর্জেণ্টলি তাঁকে দরকার।"

একবার ঢোক গিললো সুলেখা। তারপর বলে চললো, "বুঝলাম, জগদীশবাবু নিজেই কাউকে আমার এখানে নিয়ে আসবার সুযোগ খুঁজছেন। কিন্তু ঠিকমতো ব্যবস্থা হয়ে উঠছে না। গতরাত্রে জগদীশবাবু অন্য খবর পাঠালেন। টেলিফোনে বললেন, "সুলেখা, তোমাকে খুব আর্জেণ্ট কাজটা এবার দিতে চাই। তোমার ইনসিওরের এজেন্সিটা এবার একটু কাজে লাগাও।"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসারটির নাম ঠিকানা ও পরিচয় দিয়েছেন জগদীশ জেঠমালানি। পর্বত যখন মহম্মদের কাছে আসবার আগ্রহ দেখাচ্ছে না, তখন মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে! ইনসিওরের এজেণ্টের সর্বত্র গমনাগমনের অধিকার আছে, সকলের সঙ্গেই তার দেখা করবার সম্ভাবনা।

জগদীশবাবু টেলিফোনে বলেছেন, "সুলেখা, ব্যাপারটা খুব ইমপর্টাণ্ট এবং খুব আর্জেণ্ট। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ওই অফিসারকে আমাদের এই ফ্ল্যাটে আনতেই হবে, এবং এই সপ্তাহেই। সামনের সোমবার উনি কতকগুলো পারমিট ইস্যু করবেন। মোটা টাকা ইনভলভড।"

সুলেখা বললো, "ইনসিওরেন্স এজেন্সির ব্যাপারটা এবার বুঝেছেন?"

আমি কোনো উত্তর উত্তর দিতে পারছি না। মদনার মুখেই আজ সকালে যে-কথাটা শুনেছিলাম, সেটাই আবার মনে পড়ে গেল ঃ কাতলা ছেড়ে মাতলা করা।

কাতলা ছেড়ে মাতলা করার গূঢ় অর্থও মদনা আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিল। সুন্দরী মেয়ে লেলিয়ে দিয়ে কোনো বড়লোককে কব্জা করা।

হাইকোর্ট পাড়ায় চাকরির সময় সেকালের এমন এক-আধটা কাহিনী শুনেছি বটে, কিন্তু তখন এ-ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। সেকালে কাতলা ছেড়ে মাতলা করার ব্যাপারটা মোটামুটি এক ছকে বাঁধা ছিল। লক্ষ্য একটাই—আলালের ঘরের দুলালকে কেনো সুন্দরীর মোহে মুগ্ধ করে ক্রমশ তাঁকে বশে আনা এবং যথাসময়ে তাঁকে ঋণজালে আবদ্ধ করা অথবা সুন্দরীর মোহ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় এমন সব আর্থিক

প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেওয়া যাতে যথাসময়ে তাঁর মূল্যবান বিষয়সম্পত্তি জলের দামে কিনে নেওয়া সম্ভব হয়।

কাতলার প্রভাবে মাতলা হওয়া এক ধনীর দুলালকে হাইকোর্টের করিডরেও দেখেছিলাম। আমাদের জানা-শোনা এক বাবুর সায়েব তাঁর মামলা করছিলেন। এই দুলালটি সাবালক হওয়া মাত্রই তাঁর পিছনে কাতলা ছাড়া হয়েছিল ; এবং ভবিষ্যতের খেয়াল না-রেখে এই কাতলার মান ভঞ্জনের জন্য যুবকটি সাদা কাগজপত্রে বেপরোয়া সই দিয়ে টাকা ধার করেছিলেন। উদ্দেশ্য ঃ বাড়ির শুভানুধ্যায়ীদের কাছে গোপন রেখে সুন্দরী সান্নিধ্য উপভোগ করা এবং কাতলাকে তাকলাগানো একটি বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার দেওয়া। কাউকে যখন কিছু দেবার জন্যে মন আনচান করে তখন এইসব ধনীপুত্রদের নিজেদের হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হয় এবং সেই অবস্থায় ধার পাবার জন্য যে কোনো কাগজে দস্তখত দিতে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

এই দুলালটি যথাসময়ে যে জটিল মামলা-জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাতে তাঁর সমস্ত মূল্যবান শহুরে সম্পত্তি অকস্মাৎ হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। কাতলা ততদিনে নিজের কার্য সিদ্ধি করে অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়েছেন—অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হচ্ছিল না। অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ছে, সংসার-অনভিজ্ঞ চপলমতি সেই যুবকটি প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের প্রবল প্রচেষ্টায় সেবারে কোনোক্রমে রক্ষা পেয়েছিলেন। আইনের কোনো এক সরু গলিতে বিপক্ষকে পাক খাইয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য উপায়ে ব্যারিস্টার মিস্টার ব্যানার্জি সেবার হাটখোলার দুষ্ট এক তেজারতি কারবারীর সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্র বানচাল করেছিলেন।

বিরাট বিষ সম্পত্তি কলমের এক আঁচড়ে বেচে দিতে বা বন্ধক রাখতে পারেন এমন অপরিণতবুদ্ধি অভিভাবকহীন যুবকের সংখ্যা এ যুগে গির অরণ্যের সিংহের মতোই ক্রমশ বিরল হয়ে উঠছে—পরিস্থিতি এমন থাকলে তাঁদের নিশ্চিহ্ন হতে যে আর সময় লাগবে না তাও সহজে ভবিষ্যতবাণী করা যায়। কাতলা ছাড়ার কাজে বিশেষজ্ঞরা তাই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য নিজেদের কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করেছেন। এখন তরুণ জমিদার জীবনধন মল্লিক না থাকলেও মহা-পরাক্রমশালী অর্জুন চৌধুরী রয়েছেন।

এই অর্জুন চৌধুরী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারি—তাঁর কলমের এক খোঁচায় কতকগুলো পারমিট যথাস্থানে স্বর্গীয় আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়তে পারে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ যুগে তেজারতি ব্যবসায়ে বড় হবার চেষ্টা করেন না—ওই ব্যবসায় হাঙ্গামার তুলনায় আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নেই। দূরদর্শীরা এখন যে সোনার হরিণটি ধরবার জন্যে উৎসুক তার নাম পারমিট। এ যুগে সরকারী শীলমোহরে মন্ত্রপূত বাদামী রঙের এক টুকরো পারমিটের অপার মাহাত্ম্য। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো পারমিট-ধারীর ইচ্ছা-নির্দেশে এই চিরকুট দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের বিরাট ঐশ্বর্য মালিকের সামনে হাজির করবে। কখনও সিমেন্ট, কখনও লোহা, কখনও চিনি, কখনও আটা, কখনও ভূষি—যে কোনো একটি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যই নিমেষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা হয়ে পারমিটধারীর তহবিলে স্বেচ্ছায় গচ্ছিত হবে।

দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র ছাড়াও পারমিটের অষ্টোত্তরী শতনাম আছে। এই পারমিট বলে কখনও রাজপথে বাস, ট্যাক্সি অথবা লরি চালনার অনুমতি

পাওয়া যায় এবং নিজে এইসব ব্যবসায়ে লিপ্ত না হয়েও কেবল এই অনুমতি পত্রের বকলমে প্রভূত সুখার্জিত অর্থের মালিক হওয়া যায়।

জগদীশ জেঠমালানি এই মুহূর্তে সুলেখার মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে কী ধরনের পারমিট শিকারের আয়োজন করছেন তা এখনও আমার জানা হয় নি। শুধু নায়কের নামটি আমার কানে কয়েকবার বেজেছে। অর্জুন চৌধুরী—অর্জুন চৌধুরী। সুলেখা সেনের এখন একমাত্র ধ্যান ওই লক্ষ্যটি ভেদ করা। অর্জুন চৌধুরীকে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত সুলেখা কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না।

সুলেখার উদ্বিগ্ন হবার কারণও আছে। নির্মল চট্টরাজের ব্যাপারে জগদীশ জেঠমালানি যথেষ্ট সময় ও অর্থব্যয় করেছেন। সেই নাটকে সুলেখার অভিনয়ে কোনো ত্রুটি ছিল না—তার নির্দিষ্ট ভূমিকায় সে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। উদ্ধত নির্মল চট্টরাজ নরম হয়ে সুলেখার আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছেন ; জগদীশের আতিথ্য গ্রহণে প্রাথমিক দ্বিধা আর সন্দেহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তা সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এর পিছনে অবশ্যই সুলেখার অবদান রয়েছে। কিন্তু সুলেখার ভোলা উচিত নয় যে, অপারেশন চট্টরাজ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। যে-উদ্দেশ্যে জেঠমালানি এতো ব্যবস্থা করেছেন এবং ঝুঁকি নিয়েছেন তা সার্থক হয় নি।

জগদীশ জেঠমালানি মুখ ফুটে এ-ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করেন নি। কিন্তু রাজুবাবুর কাছে সুলেখা ওঁর ভাবনা-চিন্তার কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছেন। রাজুবাবু দুঃখ করেছেন, নির্মলবাবুকে আমরা সামলাতে পারলাম না। অথচ আমাদের জাপানী প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার ইয়াসিকা হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে কত সহজে আর একটা কেস ম্যানেজ করে ফেললেন। ওটাও খারাপ যন্ত্রপাতি সাপ্লায়ের প্রবলেম। ধানবাদের কোম্পানি চোখ রাঙাচ্ছিল ক্ষতিপূরণ চাইবে, মাল ফিরিয়ে নিতে বলবে। এসব ব্যাপারেই সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে মিস্টার চট্টরাজের বড়কর্তা মিস্টার এস কে পণ্ডিত টোকিও গেলেন। এবং এয়ারপোর্টে নামার দেড় ঘণ্টা পরেই মিস্টার ইয়াসিকা কেসটা একজন জাপানী মহিলা এক্সপার্টের হাতে তুলে দিলেন।

সেই মহিলাই মিস্টার পণ্ডিতকে এমন ম্যানেজ করলেন যে সমস্ত গণ্ডগোল খুব সহজে মিটে গেলো। শুধু মিস্টার পণ্ডিত আর কয়েকদিন মিসেস ইয়ামাদার সান্নিধ্যসুখ উপভোগের লোভে মিস্টার ইয়াসিকাকে রিকোয়েস্ট করলেন আরও কয়েকদিন আলোচনা চালিয়ে যেতে। সেই সুযোগে মিস্টার পণ্ডিত স্বদেশে টেলিগ্রাম করলেন, 'আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় এসেছে, সমস্যার পাকাপাকি সমাধানের জন্যে আরও তিনদিন টোকিও অবস্থিতি বাড়িয়ে নিচ্ছি।'

হাসতে হাসতে রাজুবাবু খবর দিয়েছেন সুলেখাকে, সে সময় মিস্টার পণ্ডিত টোকিওতে অবস্থানই করেন নি। মিস্টার ইয়াসিকার এয়ার-কণ্ডিশন গাড়িতে চড়ে মিসেস ইয়ামাদাকে নিয়ে তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কেসের ব্যাপারে মিস্টার ইয়াসিকাকে মাথা ঘামাতে হয়নি বললেই হয়—সব আলোচনা মিসেস ইয়ামাদা নিজেই নিভৃতে সেরে নিয়েছিলেন। পাছে কোনো রকম অস্বস্তি হয় বলে জাপানী মহিলাটিকে কোম্পানির সহকারী ম্যানেজারের পদ দেওয়া হয়েছিল—ভিজিটিং কার্ডে সে রকম ছাপাও ছিল।

রাজুবাবু সুলেখাকে বলেছেন, "ওয়ান্ডারফুল সমাধান। সাপও মরলো অথচ লাঠিও ভাঙলো না। জাপানীরা ওই বিকল মেশিনে আরও কি বাড়তি যন্ত্রপাতি লাগবে তা দেখবার জন্যে বিনাপয়সায় লোক পাঠাতে রাজী হলেন এবং মিস্টার পন্ডিতের মুখ রক্ষের জন্যে দু তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতেও সম্মত হলেন।"

সুলেখা তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। রাজুবাবু বললেন, "খুব সিম্পল। জাপানীদের সাতাশ লাখ টাকা জলে যেতে বসেছিল। সেটা বেঁচে গেলো—পার্টিও হাতছাড়া হলো না। আর বিনা পয়সায় মেশিন দেখতে এসে যেসব নতুন স্পেয়ার পার্টস ওরা বেচে যাবে তার দামও দশ লাখ টাকা।"

সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "জানেন, মিস্টার পন্ডিতের এই ভাল কাজের জন্যে প্রমোশন হয়ে গেলো! কলা বেচার সংগে রথ দেখাও হলো, অথচ কেউ কোনো সন্দেহ করলো না।"

এ দেশে সবই সম্ভব। আমি কী বলবো?

সুলেখা গম্ভীর হয়ে আমাকে বললো, "মিস্টার জেঠমালানিদের ধারণা --অল ক্রেডিট গোজ টু জাপানীজ উইমেন! মিসেস ইয়ামাদার মতো চৌকশ রমণীরা এদেশে অ্যাভেলেব্‌ল হলে মিস্টার জেঠমালানিদের ঝামেলা নাকি অর্ধেক কমে যেতো!"

জাপানী উদাহরণে অনুপ্রাণিত জেঠমালানি কোম্পানির আশ্রয়ে সুলেখার যে চিন্তিত হবার কারণ হয়েছে তা সহজেই বলা যায়। এবারের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার জন্যে সুলেখা তাই এতো উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

অর্জুন চৌধুরীর সন্ধানে সুলেখা আজ তাই যথাসম্ভব কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে। ফলাফল এখন পর্যন্ত কী হলো তা একমাত্র সেই জানে। সুলেখা এসব খবর নিজের কাছেই একান্তে রাখুক, তাই আমি চাই।

কিন্তু এই নিঃসঙ্গ জীবনে কারুর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে সুলেখা বিপন্ন বোধ করে। থ্যাকারে ম্যানসনের অপরিচিত পরিবেশে আমি ছাড়া আর কার সংগেই বা সে কথা বলবে?

সুলেখা বললো, "রাজুবাবুও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে দিয়েছেন। "ইনসিওরেন্স এজেন্ট" মিসেস সুলেখা সেনের কার্ডখানা আমার দিকে সে এগিয়ে দিলো। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর সেখানে জ্বলজ্বল করছে।

সুলেখা বললো, "ওই 'মিসেস' কথাটায় আমার আপত্তি ছিল। ছাঁদনাতলায় যখন যাইনি তখন কথায় কথায় ওই জায়গাকে নোংরা করতে আমার ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কর্তাদের অন্য ধারণা। ওঁরা ধরে বসে আছেন, কপাল ফাটা না হলে অভিজ্ঞ হাঙরেরা নাকি এগোতে দ্বিধা করে। মিসদের নিয়ে অনেক বিপদ—মিসেসরা সেদিক দিয়ে ডবল রিফাইনড অয়েলের মতোই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

ওই কার্ডের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সুলেখা আজ অর্জুন চৌধুরীর সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাজুবাবু যতখানি সম্ভব সাহায্য করেছেন। টেলিফোনে অর্জুন চৌধুরীর কাছে ইনট্রোডাকশন দিয়েছেন। বলেছেন, "যদি দু মিনিট সময় দেন মিসেস সেনকে। খুবই ডিজার্ভিং বেঙ্গলী।"

সুলেখা বললো, "এই একটা পিক্যুলিয়র ব্যাপার জেঠমালানিদের। এমন ভাবে কথা বলবে যেন বাঙালীদের থেকেও কট্টর বাঙালী এঁরা।

কলকাতার সুখ-দুঃখ ছাড়া এঁরা যেন কিছুই জানেন না—কলকাতার দুঃখ দেখলে এঁদের যেন রাত্রে ঘুম হয় না। একজন ডিজার্ভিং বাঙালী মহিলাকে সাহায্য করবার জন্যেই যেন আমাকে ওঁরা মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর কাছে পাঠাচ্ছেন।”

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, নানা ছোটখাট বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সুলেখা কীভাবে শেষ পর্যন্ত অর্জুন চৌধুরীর স্পেশাল ঘরে হাজির হয়েছিল তা সুলেখা আমার কাছে প্রকাশ করে নি। অর্জুন চৌধুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কী বিশেষ অভিনয় সে করেছে এবং কী অব্যক্ত ইঙ্গিত নিঃশব্দে অর্জুন চৌধুরীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে তাও আমার জানবার অবকাশ হয়নি।

শুধু এইটুকু বুঝলাম, সাক্ষাতের ফলাফল এখনও অজ্ঞাত। নাম-ঠিকানা ও দূরভাষণের নম্বর দিয়ে এসে চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া সুলেখার গত্যন্তর নেই। অর্জুন চৌধুরী সেদিন বেশ ব্যস্ত ছিলেন—বেশীক্ষণ সময় সুলেখাকে দেন নি এবং সুলেখাও আপিসের ওই পরিবেশে এমন অস্বস্তি বোধ করেছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

এখন এই মুহূর্তে আর কী করবার আছে? টেলিফোনের নম্বর যখন তাঁর জানা, তখন ওই টেলিফোন কখন বাজবে তার প্রত্যাশায় বসে থাকা ছাড়া বোধ হয় দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

আমি বসে থাকতে থাকতেই সুলেখার ফোনটা একটু অস্বাভাবিক সুরেই যেন বেজে উঠলো। টেলিফোনটার সুর অন্য টেলিফোনের মতো নয়। রিসিভারের রংটাও কালো নয়। সুলেখা বললো, “তেলকালিবাবুকে দিয়ে ইচ্ছে করেই আমি টেলিফোনের আওয়াজটা ওরকম করিয়ে নিয়েছি। উনি স্বর এমন বেঁধে দিয়েছেন যে হৈ-চৈ করে বাজবার উপায় নেই—একটা ক্যার-ক্যারে শব্দ হয়, তাতেই আমি বুঝতে পারি। ক্রিং ক্রিং করে গলা ফাটিয়ে টেলিফোন বাজলে আমার কেমন অস্বস্তি লাগে আজকাল।”

ঘরের এক কোণে টেলিফোন-ধরা সুলেখার মুখ দূর থেকে দেখে বুঝতে পারলাম না, তার প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে কিনা। টেলিফোনের অপর প্রান্তে অর্জুন চৌধুরী না অন্য কে?

চাপা গলায় টেলিফোনে কথা বলার এমন শোভন কৌশল সুলেখা আয়ত্ত করেছে যে, ঘরের অপর কোণে সোফায় বসে তার আলাপ আলোচনার কোনো ভগ্নাংশও আমার কানে ভেসে এলো না। অথচ সুলেখার ভাবভঙ্গী সম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক—আমার উপস্থিতিতে সে মোটেই সংকোচ বোধ করছে না। আমি একবার উঠবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু টেলিফোনের কাছ থেকেই ইঙ্গিতে সে আমাকে চলে না-যেতে অনুরোধ করলো।

বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সুলেখা একটু গম্ভীর মুখেই ফিরে এলো। অর্জুন চৌধুরী নয়। স্বয়ং মিস্টার জেঠমালানি কলকাতায় ফিরে এসেই সুলেখার সঙ্গে সত্বর যোগাযোগ করেছেন। অর্জুন চৌধুরীকে আয়ত্তে আনবার সময় বেশী নেই। কাতলা ছেড়েই মাতলা সংবাদের জন্যে ছটফট করছেন জগদীশ জেঠমালানি।

সুলেখা নিজেও এই কয়েক মিনিটে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তার

মুখ চোখের চঞ্চলতার কারণ সে নিজেই জানিয়ে দিলো। জগদীশ জেঠমালানি তাকে বলেছেন, এই একই কেসে তিনি মিসেস পাপি বিশোয়াসকে ব্রীফ দেবেন ঠিক করেছেন। "আমার কোনো পার্সোনাল প্রেফারেন্স নেই, সুলেখা," জগদীশ জেঠমালানি টেলিফোনেই জানিয়ে দিয়েছেন। "কাজটা যেহেতু আর্জেন্ট, সেহেতু আমার পক্ষে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। তুমি অথবা পাপি যে এই কাজটা আগে করিয়ে দিতে পারবে আমি তারই দলে।"

"পাপি বিশোয়াস", নামটা সুলেখা নিজের মনেই পুনরাবৃত্তি করলো।

কে এই পাপি বিশোয়াস? কী তাঁর পরিচয়, তা আমার মতো ক্ষুদ্রজনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

সুলেখা কিন্তু নিজের লাইনের খোঁজ-খবর রাখে। বললো, "ডেনজারাস মহিলা এই পাপি বিশোয়াস। একদা জাঁদরেল এক রাজপুরুষকে বিবাহ করে কলকাতার হাই-সোসাইটিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাজপুরুষের রহস্যজনক অকালমৃত্যুর পরে পাপি বিশোয়াস কিছুদিন বিখ্যাত শিল্পপতি মিস্টার তরফদারের চতুর্থী স্ত্রী হয়েছিলেন।" মিস্টার তরফদারের পঞ্চমাভার্যা গ্রহণের সময় আসন্ন হলে পাপি কিছুদিনের জন্য কুমারী পর্যায়ে ফিরে গিয়ে অবসর যাপন করেন। এর পর পাপি রায় যাঁর সান্নিধ্যে পাপি বিশোয়াস হলেন তিনি এমন কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তি নন। তাঁর সম্বন্ধে নাকি বিশেষ কিছু শোনাও যায় না। কিছুকাল আগে গবেষণার কাজে অথবা মনের দুঃখে মিস্টার বিশ্বাস বিদেশবাসী হয়েছেন ; কিন্তু পাপি এই পরিচিত নগর কলকাতার মায়াবন্ধন কাটাতে পারেন নি। পাপি বিশোয়াস এখন কলকাতার আর্ট কালচার জগতের সঙ্গেও কিছুটা জড়িয়ে আছেন।

সুলেখা এবার খিল খিল করে হেসে ফেললো। এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ইন্সিওর এজেন্ট এবং ট্র্যাভেল এজেন্ট-এর টাগ-অফ-ওয়ারে কে জিতবে বলুন তো? অর্জুন চৌধুরী শেষ পর্যন্ত ইনসিওর করবেন, না রাউন্ড দ্য ওয়ার্লড টিকিট কিনবেন?" পাপি বিশোয়াস যে কোনো অখ্যাত ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছেন সে কথাটাও সুলেখা আমাকে জানিয়ে দিলো। "আমি যেরকম ইনসিওর এজেন্ট উনি সেরকমই ট্র্যাভেল এজেন্ট!" খিল খিল করে হেসে ফেললো সুলেখা।

ট্র্যাভেল ও ইনসিওর—দুই এজেন্টের রাজকীয় লড়াই যে অচিরেই জমে উঠবে এই আশঙ্কা নিয়েই সেদিন নিঃশব্দে স্বস্থানে ফিরে এসেছিলাম। সুলেখাও তখন এক মনে কোনো এক চিন্তায় এমন বুঁদ হয়েছিল যে আমার নিঃশব্দ প্রস্থানে সে বাধা দেয় নি।

পরের দিন বিকেলে সুলেখা হাসিমুখে আমার আপিস ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সুলেখার হাতে কয়েকখানা সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা লক্ষ্য করে আমি একটু বিস্মিত। ভাগ্যে ঘরে কেউ ছিল না। সুলেখা প্রায় হুকুমের সঙ্গে বললো, "এখনই আসুন আমার ঘরে। কাজ আছে।"

দুই এজেন্টের লড়াইয়ে সাময়িক বিরতি ঘটলো নাকি? সুলেখার ঘরে ঢুকতেই সে বললো, "আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি, তার বদলে আমাকে কয়েকটা কবিতা বোঝান!"

এই রকম বিনিময় বাণিজ্যের কথা অনেকদিন শুনিনি। সুলেখা বললো, "আমি খবর রাখি না ভাবছেন? মদনা আমাকে বলেছে, আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা পড়েন। ১১ নম্বরের মেমসায়েব তো আপনার কবিতার

অন্ধ ভক্ত ছিলেন।”

“আমার নয়—উনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভক্ত। জীবনের সংশয় ও সংকট মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওই বৃদ্ধাকে সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান দিয়েছে।”

“এবার আপনি আধুনিক কবিতার কথা কিছু বলে যান আমাকে। আপনি ফাল্গুনী চৌধুরীর কবিতা পড়েছেন?”

সুলেখার এই আকস্মিক কাব্যপ্রীতির উৎসটি আমার কাছে রহস্যাবৃত হয়ে আছে এখনও। সুলেখা বললো, “এবারের কাব্য পত্রিকায় ফাল্গুনী চৌধুরীর কবিতা রয়েছে—মাথামুণ্ডু কী লিখেছে বুঝতে পারছি না, একটু মাস্টারি করুন।”

সুলেখা আমার হাতে ম্যাগাজিনের পাতাখানা খুলে দিয়ে বললে, “আপনি পড়ে যান, মানে করুন আমি ততক্ষণ চা বানাই।”

ফাল্গুনী চৌধুরীর কবিতা এমন কিছু অসাধারণ নয়—এতো কৃতী কবি থাকতে এই কবির ওপর সুলেখার সুনজর কেন?

সুলেখা নিজেই এবার জানিয়ে দিলো, “অর্জুন চৌধুরীই, ফাল্গুনী চৌধুরী ছদ্মনামে কবিতা লেখেন!”

অর্জুনেরই অপর নাম যে ফাল্গুনী তা শুনে চমকিত হলো সুলেখা। চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, “আমার নিজেরই তা হলে আন্দাজ করা উচিত ছিল।”

শুনলাম, রাজুবাবুর সঙ্গে সুলেখা গোপনে যোগাযোগ করেছিল। তিনিই আপিসে খোঁজ খবর নিয়ে অর্জুন চৌধুরীর এই বাড়তি পরিচয়টুকু সুলেখার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সুলেখা তাই কয়েকখানা পত্র-পত্রিকা জোগাড় করে বাড়ি ফিরেছে।

সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, “ঐ পপি বিশোয়াসের কাছে আমি কিছুতেই হারতে রাজী নই। রাজুবাবুর কাছেই শুনলাম, পপি নিজেও আরও খোঁজখবর নেবার জন্যে ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে একটা মেয়েকে মিস্টার চৌধুরীর আপিসে পাঠিয়েছিল।”

সুলেখা বললো, “রাজুবাবুকে আজ খুব শুনিয়ে দিয়েছি। আমার কাজের মধ্যে পপিকে আমদানী করাটা যে মোটেই ঠিক হয় নি, তা জগদীশবাবুর কানে তোলা উচিত।”

রাজুবাবু অবশ্য বলেছেন, “অন্য কেস হলে, মামা তোমার ওপর নির্ভর করেই থাকতেন, সুলেখা। কিন্তু এখানে সময় খুব অল্প। বাহাত্তর ঘণ্টা পরেই মিস্টার চৌধুরীকে পারমিটের ফাইলটা সই করতে হবে।”

কাব্যপাঠে সুলেখা কী অদৃশ্যশক্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন তা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু পরের দিন সকালেই সুলেখা আমাকে সুখবরটা জানিয়ে গিয়েছিল। পপি বিশোয়াসকে সে হারিয়ে দিয়েছে। আজ বিকেলে আপিস থেকে বেরিয়েই অর্জুন চৌধুরী স্বয়ং চৌত্রিশ নম্বরে সুলেখার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

জয়ের আনন্দে ছটফট করছে সুলেখা। খবরটা সে জগদীশবাবুকে জানিয়েও দিয়েছে। জগদীশবাবু তো প্রথম বিশ্বাসই করেন নি। অর্জুন চৌধুরী খুব কড়া চরিত্রের লোক বলে তিনি রিপোর্ট পেয়েছিলেন। সুলেখাকে তিনি কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছেন এবং তাঁর কেসটার সমস্ত

বিবরণ সুলেখাকে শুনিয়ে দিয়েছেন। অন্য ব্যবসায়ে আজকাল নানা অসুবিধা হচ্ছে, তাই জগদীশবাবু এই পারমিট লাইনে আসবার জন্যে এতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

সুলেখা বললো, "এখন একবার চলেছি মার্কেটে।"

মেয়েরা অবশ্যই ইচ্ছামতো নিউ মার্কেটে যেতে পারে। কিন্তু সুলেখা আমার কৌতূহলের অভাব দেখে তেমন খুশী হলো না।

বললো, "বাড়ি ভাড়ার তাগাদা দিয়ে দিয়ে আপনার মাথায় আজকাল কিছুই ঢুকছে না।"

আমি নিরুত্তর।

সুলেখা এবার বিজয়গর্বে বললো, "আজ মনের সুখে মার্কেটিং করবো, মিস্টার জেঠমালানির খরচে। মিস্টার চৌধুরী আসছেন শুনে মিস্টার জেঠমালানি বললেন, 'কোনো রকম আতিথেয়তার ত্রুটি হয় না যেন। সুলেখা, ইউ মাস্ট ড্রেস টু কিল! এমনভাবে সাজগোজ করবে যাতে পাখি নিজে এসে ধরা দেয়।' আমিও এই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিশোধ নিলাম পপি বিশোয়াসকে লেলিয়ে দেবার। বললাম, 'তেমনভাবে ড্রেস করতে আজকাল অনেক খরচ হয়, মিস্টার জেঠমালানি।' জগদীশবাবুর তখন আর উপায় কী? সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি ভোজমালানির দোকানে ফোন করে দিচ্ছি। তোমার পছন্দ মতো শাড়ি এবং জামাকাপড় নিয়ে চলে এসো।'

"আর কসমেটিকস? ওসব তো ভোজমালানির দোকানে পাওয়া যায় না", তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল সুলেখা।

জগদীশবাবু প্রসন্ন হাসিতে টেলিফোন ভরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ভোজমালানিই ক্যাশের ব্যবস্থা করে দেবে, আমি বলে দিচ্ছি। ফিকর্ মত্ কীজিয়ে!"

জগদীশবাবুর কথার প্রতিধ্বনি তুলে নিউ মার্কেটের দিকে চলতে চলতে সুলেখা বললো, "আমি একটু পরেই ফিরে আসবো। ফিকর্ মত্ কীজিয়ে!"

নিউ মার্কেট থেকে ফেরার পথেই আমার সঙ্গে সুলেখার আবার দেখা হয়েছিল। ওর হাতে মাঝারি সাইজের একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। তারই মধ্যে যে পছন্দ মতো শাড়ি এবং জামা রয়েছে তা আন্দাজ করতে পারছি।

সুলেখা সমস্ত সময়টুকু অবশ্যই শপিং-এ ব্যয় করেনি। তার ঘন কালো চুলগুলো যে একটু আগেই কোনো হেয়ার ড্রেশারের সুনিপুণ হাতে পড়েছিল তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। আঁটো করে খোঁপা বেঁধেছে সুলেখা—বেশ আধুনিক স্টাইলে। অভিনব এই কবরী বন্ধনে সুলেখার মুখের ভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তাকে রীতিমত সুন্দরী মনে হচ্ছে। অনেক দিন আগে আমার এক দূর সম্পর্কের মাসীর বিবাহদিনের কথা মনে পড়লো। বিবাহের অপরাহ্নে গাড়ি চড়ে তাঁকে কলকাতার এক বিখ্যাত চুলের দোকানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। বিয়ের দিনে

এইভাবে পাত্রীর সাময়িক গৃহত্যাগের ব্যাপারটা আমার কাছে একটু আশ্চর্য লেগেছিল। সমবয়সিনী এই মাসীর সঙ্গে রসিকতা করেছিলাম, "বিয়ের দিনে চুল নিয়ে এতো মাথা না ঘামালেই নয়?"

সুরসিকা মাসী চটপট জবাব দিয়েছিলেন, "বাঃ! যে বিয়ে করে সে চুল বাঁধে না, কোথায় লেখা আছে?"

ক্লাশিক স্টাইলের স্পেশাল কবরীবন্ধন সুলেখাকে অবশ্যই আরও ব্যক্তিত্বশালিনী করে তুলেছে। সুলেখার এই নবলব্ধ শ্রী আমি হয়তো একটু বেশী আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করেছি। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়েও সুলেখা সহজ হতে পারলো না। কোনো চাপা দুঃখের আগুন যে এই মুহূর্তে তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তা তার কথাবার্তায় প্রকাশ পেলো।

সুলেখা গম্ভীরমুখেই আমার দিকে তাকালো। তারপর বললো, "আপনি কী ভাবছেন তা আমার বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।"

সুলেখার মুখ বন্ধ করবার জন্যে বলতে গেলাম, "এই ধরনের খোঁপায় আপনাকে সুন্দর মানিয়েছে।"

সুলেখা বললো, "রাখুন, ওসব কথা। আমাদের সাজগোজ দেখলে ভদ্রলোকদের মনে যে ঘেন্না হয়, তা আমি ঠিক বুঝতে পারি।"

সুলেখার কথায় আমি বেশ লজ্জা পেলাম। বললাম, "বিশ্বাস করুন, এইভাবে আপনাকে দেখলে মনে নানা দ্বিধা এবং প্রশ্নের উদ্রেক হয়, কিন্তু কখনও ঘেন্না হয় না। বিশ্বসংসারে কাউকে ঘেন্না করবার ফরমান তো আমাকে দেওয়া হয়নি।"

সুলেখার চটপট জবাব, "প্রশ্নটা কী বলে দেবো?"

"বলুন," সুলেখাকে অনুমতি দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সুলেখার ধারালো মুখ একটু কঠিন হয়ে উঠলো। তারপর বেপরোয়া-ভাবে বললো, "গোধূলি লগ্নে যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সে এখন থেকে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে নিচ্ছে কেন?"

লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মতো অবস্থা। বিকেলে অর্জুন চৌধুরীর আসন্ন আগমনের কথা আমার খেয়ালই ছিল না।

সুলেখা বললো, "আপনার কাছে আমি কিছু ঢেকে রাখবো না, শংকরবাবু। আমার এখন অনেক টাকা চাই। তাই অন্য এনগেজমেণ্টও নিয়েছি। রাজুবাবু এখনই আসবেন চুপি চুপি—মামাকে না জানিয়ে। সঙ্গে ওঁর একজন ফ্রেন্ডও থাকবেন। অনেকদিন ঘ্যান ঘ্যান করছেন, এতোদিন জগদীশবাবুর কথা ভেবে পাত্তা দিইনি। এখন যখন জগদীশবাবু পাপি বিশোয়াসের সঙ্গে আমাকে লড়িয়ে দিয়েছেন, তখন আমিও যা-ইচ্ছে তাই করবো।"

ঘড়ির দিকে তাকালো সুলেখা। বললো, "আজকের সমস্ত দিনটা খুব ব্যস্ত যাবে। লাঞ্চের আগেই রাজুবাবুকে বিদেয় করবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর একটু কবিতা পড়ে নিতে হবে। আপনি তো আমার মাস্টারি করলেন না!"

অদ্ভুত এবং অসম্ভব কথাগুলো কেমন সহজে সুলেখা বলে যাচ্ছে। কোথাও কোনো জড়তা নেই। এইসব কথা কোনো বাঙালী বিনোদিনীর মুখে এইভাবে শুনতে হবে তা কোনোদিন আমি কল্পনাও করিনি।

সুলেখা বললো, "চুল বেঁধেছি রাজুবাবুর গেস্টের জন্য। আজ আমাকে

বেশ কিছু টাকা আদায় করতেই হবে। জগদীশবাবুর মাস মাইনেতে আমার চলবে না। তাছাড়া আমাকে কয়েকদিন ছুটিও নিতে হতে পারে।"

সুলেখা এবার জামাকাপড় ও প্রসাধনের প্যাকেট হাতে করে গম্ভীরমুখে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে চললো।

কর্পোরেশন আপিসে কিছু কাজকর্ম ছিল। কলকাতায় ফ্ল্যাটবাড়ি আছে অথচ কর্পোরেশন আপিসে কোনো কাজ নেই এমন লোক আজও এই বিচিত্র নগরীতে জন্মগ্রহণ করেননি।

কর্পোরেশন আপিসের বনবিহারী হাজরা আমাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারলেন না। ঠোঁট উল্টে জিজ্ঞেস করলেন, "থ্যাকারে ম্যানসন তো! বরদাবাবু কী দেহ রেখেছেন? আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন—আমাদের পাওনা-গণ্ডা দিতে বড্ড খিটখিট করতেন, কিন্তু মানুষটা একেবারে সাচ্চা ছিলেন।"

"বালাই ষাট! বরদাবাবু কোন্ দুঃখে মরতে যাবেন। তিনি তীর্থে-ধর্মে বেরিয়েছেন।" আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, "তা যে-বাড়িতে কাজ কর্ম, সেখানে তীর্থধর্ম মাঝে মাঝে দরকার বটে! বরদাবাবুর মতো সাত্ত্বিক লোক কীভাবে ওখানে ব্যাটিং করছেন তাই বুঝতে পারি না।"

বনবিহারীবাবু অভিজ্ঞ লোক। এই কর্পোরেশনের চাকরিতে বহু বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, "কালে-কালে কলকাতার যে কী দশা হবে তা ভাবতে আমার গা শিউরে ওঠে। সদর স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট এসব তো এককালে ভদ্দরলোকদের আস্তানা ছিল। স্বয়ং রবি ঠাকুর ওখানে বসে পদ্য লিখেছেন। আর কালে কালে কী হতে চলেছে।"

বনবিহারীবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন ওঁর কথাবার্তায় আমি খুব খুশী হচ্ছি না। উনি কানে উড পেন্সিল গুঁজে বললেন, 'ওসব জায়গায় ভদ্দরলোকেরা এখন থাকে না, শেষ পর্যন্ত ওখানে আপনারা কেউ টিকতে পারবেন না।'

বনবিহারীবাবু আমার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। বরদাপ্রসন্ন একবার টোটকার জোরে তাঁর কোমর-ব্যথা সারিয়েছিলেন। সেই সুবাদে থ্যাকারে ম্যানসনের কাজটা আজও তিনি তাড়াতাড়ি সেরে দিলেন। বললেন, "বরদা-বাবু ফিরলেই আমাকে একটু খবর দেবেন। আমার বেয়ানের কোমরের ব্যথাটাও ইদানীং খুব বেড়েছে—ওঁকে দিয়ে একটা ওষুধ করিয়ে নেবো।"

রেকর্ড টাইমে কর্পোরেশনের কাজ সেরে থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরতেই শুনলাম টেলিগ্রাম পিওন আমার খোঁজ করে গিয়েছে।

টেলিগ্রাম! তাও আমার নামে। বেশ চিন্তিত হবারই কথা। সাধারণ মানুষের জীবনে টেলিগ্রাম সাধারণত দুঃসংবাদ বহন করে আনে। মদনা বললো, "পিওনটা মোটেই সুবিধের নয়, স্যর। এতো করে বললাম, আমার হাতে কাগজটা দাও—সায়েব আসা মাত্রই সটাসট পৌঁছে যাবে। তা আমাকে বিশ্বাসই হলো না কর্তার।"

আমার ব্যস্ততা দেখে মদনা আশ্বাস দিলো, "ভাববেন না স্যর। অন্য টেলিগ্রাম বিলি করে এখনই ফিরে আসবে বলেছে। আসতেই হবে চাঁদকে—না হলে এপাড়ায় আর করে খেতে হবে না।"

মদনাদের বিশ্বাস নেই—হয়তো সরকারী কর্মচারিকেই মারধোর করে

বসবে।

মদনা বললো, "গায়ে হাত তোলা আমরা কোন্ কালে ছেড়ে দিয়েছি। আমরা শুধু পিওনের সাইকেলের হাওয়া খুলে দিই। পাংচার সাইকেল কাঁধে নিয়ে যতখুশি টেলিগ্রাম বিলি করে বেড়াও!"

মদনার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপই হয়তো টেলিগ্রাম পিওন আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলো এবং গোলাপী রংয়ের টেলিগ্রামটা হাতে পেয়ে আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম।

টেলিগ্রামটা আমার জন্যে নয়। আমার কেয়ারে পাঠানো হয়েছে এই জরুরী বার্তা।

সই করে টেলিগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছি—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। সীমা চ্যাটার্জি কেয়ার অফ...। পরবর্তী নাম ঠিকানা সব নির্ভুল। কিন্তু কে আমার ঠিকানায় এই অপরিচিতা সীমাকে তারবার্তা পাঠালেন?

সীমা চ্যাটার্জি। আমি নামটা স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনো সীমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলে স্মরণ করতে পারছি না।

সীমা চ্যাটার্জিকে মদনাও চিনতে পারলো না। এ-পাড়ার সব দিদিমণির পরিচয় তার মুখস্থ। মদনা নিজেও একবার তেলকালি এবং কলকালির কাছে খবর করে এলো। কিন্তু সীমাকে এখানে কেউ চেনে না। একটু রাগও হচ্ছিল—এতো লোক থাকতে আমার ঠিকানাতেই বা সীমার খবর পাঠানোর কী অর্থ হয়?

কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেই সব পাপ চুকে যায়। কিন্তু টেলিগ্রাম বলে কথা। ভিতরে কী খবর আছে তা কে জানে।

মদনা আমার অবস্থা দেখে বললো, "টেলিগ্রামটা খুলে ফেলুন স্যর। খত পড়লে হয়তো সব বুঝতে পারবেন।"

কিন্তু টেলিগ্রামটা ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে না, কে জানে হয়তো আরও কোনো ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে হবে।

খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ আমার চৈতন্যোদয় হলো। সীমা...সীমা তো আমার অপরিচিতা নয়! সুলেখা সেন আমার এতো চেনা, অথচ সীমাকে কত সহজে ভুলে বসে আছি। ধানবাদের সীমাই তো আমাদের এই ঘরের মধ্যে ঘরে এসে সুলেখা হয়েছে।

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে সুলেখার ফ্ল্যাটের দিকে এগোতে নিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। রাজুবাবুদের তো এই সময়েই চৌত্রিশ নম্বরে থাকবার কথা।

কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করলাম। তারপর আপিসঘরে চলে এলাম সুলেখার ফ্ল্যাটে একটা টেলিফোন করবার জন্যে।

টেলিফোনটা ব্যস্ত নাকি? এতোক্ষণ ধরে কী কথাবার্তা হচ্ছে? পনেরো মিনিটের মধ্যে দু'তিনবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা গেলো না।

আপিস থেকে নিজের ঘরে ফেরবার পথে সিমেন্ট বাঁধানো উঠোনে একখানা ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মদনা বললো, "আরও একখানা গাড়ি এসেছিল। রাজুবাবু সেই গাড়িতে কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছেন।"

এই গাড়িটা চলে গেলেই আমাকে একটু খবর দেবার অনুরোধ করে এলাম মদনাকে। এসব ব্যাপারে রামসিংহাসন থেকে মদনাকেই আমার বেশী বিশ্বাস হয়।

টেলিগ্রামখানা বালিশের তলায় রেখে দিবানিদ্রার উদ্দেশ্যে চোখের

পাতাটা সবে বুজিয়েছি, এমন সময় মদনার পুনরাবির্ভাব। ফিয়াট গাড়ির মালিক নিজেই ড্রাইভ করে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। মদনা তার কাছ থেকে বকশিস হিসেবে একটা টাকাও আদায় করে নিয়েছে। বলেছে, "হুজুর, আমি দাঁড়িয়ে না থাকলে আপনার গাড়ির হাব ক্যাপগুলো এতোক্ষণ মল্লিকবাজারের দোকানে টাঙানো থাকতো। চাকাতে হাওয়াও থাকতো না।"

এই অসময়ে ঘরে ঢোকা পড়তে পারে তার জন্য সুলেখা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছে, হয়তো সুইপার এসেছে ঘর পরিস্কারের জন্যে।

দরজা খুলেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখে সুলেখা বেশ লজ্জা পেয়ে গেলো। সুলেখার অমন সুন্দর কবরীবন্ধন ইতিমধ্যেই অবিন্যস্ত। ঘরের ভিতরটা সুলেখার শরীরের মতোই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। কয়েকটা গেলাস এঁটো অবস্থায় ছড়ানো রয়েছে। ফ্লুরি থেকে আনানো খাবারের দুটো শূন্য প্যাকেট আধ খোলা অবস্থায় সোফার ওপরেই পড়ে আছে।

দৌড়ে গিয়ে সুলেখা একটা লুজ জোব্বার মতো গাউন পরে নিজের দেহটা ঢেকে ফেললো। সুলেখা এই মুহূর্তে আমাকে এখানে মোটেই প্রত্যাশা করে নি।

এই অবস্থায় ওকে দেখে আমার নিজেরও লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি ক্ষমা চাইলাম সুলেখার কাছে। বললাম, "এই সময় আপনাকে কিছুতেই আমি ডিসটার্ব করতাম না। টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু আপনি কি কারও সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলছিলেন?"

"টেলিফোন! ওমা!" লজ্জায় জিভ কাটলো সুলেখা। দেখলাম বিছানার অদূরে রিসিভারটা ক্রেডল থেকে নামানো রয়েছে।

ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে সুলেখা বললো, "একদম ভুলে গিয়েছি। মিস্টার অরোরার জন্যে ফোনটা নামিয়ে রাখতে হলো। এক একজন গেস্ট আছেন টেলিফোন যেন তাঁদের সতীন। তাঁরা যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ টেলিফোন বাজলেই রাগ। টেলিফোনে ওঁদের নাকি প্রাইভেসি নষ্ট হয়। তাই বাধ্য হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখতে হলো। তারপর একদম ভুলে গিয়েছি।"

"সুলেখা খাওনি এখনো?" সুলেখার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে এই একটা প্রশ্নই করতে ইচ্ছে হলো আমার।

বিধ্বস্ত বিছানার চাদরটা ঠিক করতে করতে সুলেখা বললো, "ওঁরা সঙ্গে করে কিছু স্যান্ডউইচ এনেছিলেন, তার থেকে দু-একটা দাঁতে দিয়েছি। এখন আর খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। খাওয়া তো দূরের কথা, একবার গিয়ে শাওয়ারের তলায় দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই। আপনি না এলে এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তাম। উঠতাম চারটের সময়—ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া আছে।"

সুলেখাকে এই অবস্থায় না-দেখলেই আমার মঙ্গল হতো। একটা অব্যক্ত রাগে আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। জেঠমালানির ওই চ্যাংড়া ভাগ্নে অথবা তাঁর ইয়ার মিস্টার অরোরাকে পেলে হয়তো নাকে একটা ঘুষিই বসিয়ে দিতাম।

সুলেখা বোধহয় আন্দাজ করছে, আমি মোটেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। আমাকে শান্ত করবার জন্যেই সে বললো, "আজ আমি অনেক টাকা হাতে পেয়েছি, শংকরবাবু। আমার এখন অনেক টাকা দরকার হবে। আপনার কাছে আমি কিছুই চেপে রাখি না।"

এসব খবর আমার কাছ থেকে চেপে রাখলেই তুমি আমার ওপর সুবিচার করতে সুলেখা। ওর মুখের ওপর উত্তর দিতে গিয়েও কথা বলতে পারলাম না। সুলেখাকে বড় অসহায় ও ক্লান্ত মনে হচ্ছে আমার।

টেলিগ্রামের কথাটা তুলতেই ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলো সুলেখা।

সুলেখা ক্ষমা চাইলো আমার কাছে। বললো, "আপনাকে বলাই হয়নি। অথচ আপনার কেয়ারেই সীমা চ্যাটার্জিকে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

সুলেখার কথা কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু টেলিগ্রামটা ওর হাতে দিয়ে আমি কোনোরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে আপিস ঘরে ফিরে এলাম। ঘর থেকে বেরুবার আগে সুলেখাকে মৃদু ভর্ৎসনাও করেছি। "আর একটু হলে টেলিগ্রামটা আপনার হাতে পৌঁছতই না।"

আপিস ঘরে ফিরে এসে কাজকর্ম শুরু করেছি। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো। সুলেখা জানতে চাইছে আপিস ঘরে আমি একা কিনা।

আমার সামনে দু'তিনজন লোক বসে আছে, জানিয়ে দিলাম সুলেখাকে।

সুলেখা জানতে চাইলো আমার শোবার ঘরে সে সোজা চলে আসবে কিনা। ভদ্রতার খাতিরে সুলেখার ঘরেই আমার দেখা করা উচিত হয়তো। কিন্তু সুলেখার বিশৃঙ্খল ঘরের দৃশ্যটা আমাকে কেমন বিমুখ করে তুললো। ঐ ঘরে পা দেওয়া মাত্রই আমার শরীরে জ্বালা শুরু হয়, অথচ জ্বালা নিবৃত্তির জন্য যেসব কাজ করতে ইচ্ছে হয় তা নিজের চাকরি রক্ষা ও গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে মোটেই সহায়ক হবে না।

টেলিগ্রামটা হাতে করেই সুলেখা আমার ঘরে চলে এসেছে। ওর বিশৃঙ্খল চুলগুলো ইতিমধ্যে আবার আয়ত্তে এসেছে। এরই মধ্যে একপ্রস্থ কাপড় পালটে ফেলেছে সে। সুলেখা এতো সহজে কী করে তার স্নিগ্ধতা ফিরে পেলো তা ভগবানই জানেন। আবার বেশ স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে ওকে।

আমার ঘরের তক্তপোশের ওপরেই বসে পড়লো সুলেখা। ওর মুখে এবার উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

টেলিগ্রামের কাগজে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুলেখা বললো, "বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছি। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না শংকর-বাবু।"

'সুলেখা, জেনেশুনে যে জীবনের মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছো, তাতে তোমার বিপদ ক্রমশ বাড়বেই।' কথাগুলো জিভের ডগায় এসেও আটকে গেলো। অনাত্মীয় এক মহিলার এমন চরম লাঞ্ছনা নিজের চোখে দেখে সুলেখার ওপর মমতা ছাড়া আমার আর কিছুই হওয়া উচিত নয়।'

সুলেখা এবার বললো, "আমার বাবার কথা বলেছিলাম আপনাকে? কিষাণপুর সাব পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার বীরেন চাটুজ্যে।"

"সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার গোলমাল নিয়ে কী একটা মামলার কথা বলেছিলেন বটে", আমি স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম।

"অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে সেদিন রক্ষে করতে পারিনি। আমার যথাসর্বস্ব দিয়েও বাবার জেল সেদিন আটকাতে পারিনি, শংকরবাবু।"

এই জেলে যাওয়ার ব্যাপারটা সুলেখা কোনোদিন আমাকে বলেছে কিনা এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারলাম না।

সীমা চ্যাটার্জির নামে পাঠানো টেলিগ্রামটা সুলেখার জন্যে নতুন খবর বয়ে এনেছে। তার বাবাকে আজই জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

মাঝে মাঝে গোপনে বেরিয়ে গিয়ে সুলেখা জেলে বাবার খবরাখবর নিয়ে এসেছে। জেলের কোনো সহৃদয় কর্মীর কাছে সুলেখা পয়সা দিয়ে এসেছিল, মুক্তির তারিখটা যেন তাকে টেলিগ্রামে করে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই একটি ব্যাপারে সুলেখা চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ঠিকানা ব্যবহার করতে সাহস পায়নি। আমার ঠিকানা রেখে এসেছে—তেমনি কোনো খবর থাকলে আমি যে সুলেখার সঙ্গে যেভাবেই হোক যোগাযোগ করবো সে সম্বন্ধে সুলেখা নিশ্চিত ছিল হয়তো।

সুলেখা ভেবেছিল বাবার মুক্তি পেতে আরও কয়েকদিন বাকি আছে। সেই মতো সে তৈরিও হচ্ছিল। কিন্তু টেলিগ্রামে লেখা আজই বাবাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

টেলিগ্রামটা পথে দেরি করেছে। সামান্য এইটুকু দূরত্ব পার হতে চিঠির থেকেও বেশী সময় নিয়েছে।

কিন্তু আসন্ন মুক্তির সংবাদ সুলেখার প্রচণ্ড উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

সুলেখা অকপটে বললো, "আমি ভেবেছিলাম আরও তিন চারদিন পরে বাবা রিলিজ হবে। আমি তৈরিও হচ্ছিলাম। আজই তো ভোজমালানির দোকান থেকে আমার শাড়ির সঙ্গে বাবার পাঞ্জাবির কাপড় কিনে এনেছি। ধানবাদে থাকতে থাকতে দু'খানা ধুতিও কিনে রেখেছি।"

আমি বললাম, "জেলের রিলিজ ব্যাপারে ঠিক সব সময় হিসেব করা যায় না। দু'তিনদিন আগু-পিছু হয়ে যায়।"

সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "এ-ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা আছে?"

"তা একটু-আধটু আছে বৈকি। কিছুদিন ব্যারিস্টার সাহেবের বাবুগিরি করেছি তো।"

সুলেখার সামনে এখন সমূহ বিপদ। একটু পরেই বহু সাধ্যসাধনার ফলশ্রুতি অর্জুন চৌধুরীর নির্ধারিত আগমন। আবার ঐ সময়েই দীর্ঘ দু'বছর পরে বাবা জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।

"কী বিপদেই যে পড়লাম", সুলেখার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

সুলেখার ইচ্ছা সব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বাবার কাছে ছুটে যায়। তার বাবার জন্যে জেলখানার দরজায় অন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। অথচ জগদীশবাবুর বিজনেস প্ল্যান অনুযায়ী অর্জুন চৌধুরীর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা আজ ভীষণ জরুরি।

সুলেখা ভাবছিল কাউকে কিছু না বলে সে সোজা জেলখানায় চলে যাবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে অর্জুন চৌধুরী গোপন অভিসারে এসে ফ্ল্যাটের দরজা তালাবন্ধ দেখলে কী রকম চটবেন তা সুলেখা সহজেই আন্দাজ করতে পারছে। এ খবর জেঠমালানির কানে পৌঁছবেই। এবং তার ফলাফল

যে ভয়াবহ হবে তা সুলেখার অজানা নয়।

সুলেখার চোখ দুটো কান্নায় ভরে আসছে। কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে সুলেখা বললো, "জগদীশবাবুকেও দোষ দিতে পারিনা। এতো খরচ করে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছেন, আমাদের মতো মেয়ে রেখেছেন, প্রয়োজনের সময় সার্ভিস না পেলে তিনি ছাড়বেন কেন?"

"অথচ আমার কথা কে বুঝবে বলুন তো? বাবাকে জেল থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি একথা সবাইকে বলা যায় না। একটু আগে জানলেও মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা অন্য সময়ে সরিয়ে নিতাম!

"এক্ষেত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বদলে নেবার চেষ্টা করাটাই যুক্তিযুক্ত। শেষ মুহূর্তে যে কোনো মানুষেরই জরুরি কাজ পড়তে পারে।" আমি নিজের মতামত জানালাম।

সুলেখা ম্লান মুখে বললো, "কত সাধ্য-সাধনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুঝতেই পারছেন তো। তাছাড়া প্রোগ্রামে চেঞ্জ করবার কথা তুললেই তিনি অন্য কিছু সন্দেহ করে বসতে পারেন।"

সুলেখা ছুটলো আবার নিজের ফ্ল্যাটে। বললো, "আপনি কিন্তু চলে যাবেন না, শংকরবাবু। আমি এখনই আসছি।"

একটু পরেই সুলেখা ফিরলো। ব্যাড লাক। অর্জুন চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। চৌধুরী আজ আপিসে আসেননি। বাড়িতেও ফোন করেছিল সুলেখা। সেখানেও নেই। তবে একটু পরে ফিরতে পারেন, বেয়ারা বলেছে। সুলেখা নিজের নম্বরটা দিয়ে রেখেছে, অর্জুন চৌধুরী ফেরামাত্রই যাতে ফোন করেন।

"অর্জুন চৌধুরী কি ফোন ব্যাক করবেন?" সুলেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত। হয়তো উনি বাড়িতেই ফিরবেন না। সোজা এখানে চলে আসবেন।" আমি সুলেখাকে অহেতুক আশার আলো দেখাতে চাই না।

সুলেখা বললো, "অর্জুন চৌধুরী এখানে এলেন অথচ কেউ নেই—তাহলে আমার এই চাকরি শেষ। আর জেঠমালানির চাকরি না থাকলে বাবাকে খাওয়াবো কী? বাবা তো আর মেয়েকে নিয়ে কিষাণপুর পোস্টাপিসের স্টাফ কোয়ার্টারে ফিরে যাবেন না।"

সুলেখা আবার উঠে পড়লো। বললো, "দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে।"

"কী চেষ্টা?" সুলেখার জন্যে আমিও বেশ চিন্তিত হয়ে উঠছি।

"ফিরে এসে সব জানাবো", এই বলে সুলেখা দ্রুতবেগে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সুলেখার 'শেষ চেষ্টার' ফলাফলও একটু পরেই জানতে পারলাম।

সুলেখা গেলো আর এলো। এতো তাড়াতাড়ি সে যে আমার ঘরে আবার ফিরে আসবে তা আমার প্রত্যাশিত ছিল না।

এই কমিনিটেই সে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ওর মুখের সেই সহজ

আলগা-চটক-বিদায় নিয়েছে—স্বাভাবিক হাসি অদৃশ্য হওয়ায় একটু কালো ভাব নেমে এসেছে চোখের চাহনিতে।

সুলেখা কী শেষ চেষ্টা করতে গিয়েছিল তাও আমার জানা নেই। কিন্তু সুলেখা নিজেই এবার সব খুলে বললো।

রাগে দুঃখে অপমানে জ্বলছে সুলেখা। সে মাথা নিচু করে বললো, "পাপি বিশোয়াসও আমার দুঃখ বুঝলো না।"

আমি সমস্ত ব্যাপারটা না-জেনে কোনোরকম মন্তব্য করতে উৎসাহী নই। সুলেখা গভীর বেদনার সঙ্গে বললো, "মেয়েমানুষরাই অভাগী মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু।"

বারবেলার এই বিষণ্ণ অপরাহ্নে সুলেখার মুখে মেয়েদের সম্বন্ধে এমন নিষ্করুণ মন্তব্য শোনবার মতো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না আমার। মেয়েদের সর্বনাশের পিছনে পুরুষরাই সর্বদা ইন্ধন যোগাচ্ছে এমন একটা ধারণা দীর্ঘদিন ধরে আমার মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। আদালতে এবং হোটেলে প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে পুরুষের এই নির্লজ্জ শোষণকে ক্ষমাহীন অপরাধের মতো মনে হয়েছে বারংবার। সুলেখার মতো অসহায় মেয়েদের জন্য আমার দুর্বলতার অন্যতম কারণ, অতি কাছে দাঁড়িয়েও চরম সর্বনাশের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করে আনতে পারিনি আমি।

কিন্তু আজ সুলেখার মুখে কী শুনছি? সুলেখা বললো, "মেয়েদের সর্বনাশ হলে মেয়েরাই সবচেয়ে খুশী হয় শংকরবাবু।"

যে গভীর বেদনায় সুলেখার মুখ থেকে এইসব কথা বেরিয়ে আসছে তাকে আমি সমীহ করি। এই অবস্থায় আমার কোনো মন্তব্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

সুলেখা বললো, "এই যে আমার বাবা জেলে গেলেন, কেন? আমার হবু শাশুড়ী অনেক টাকার জন্যে চাপ দিয়েছিলেন বলেই তো। যে-বাড়িতে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল সে-বাড়ির কর্তা আগেই গত হয়েছিলেন। বাড়ির গিন্নীই কর্ত্রী। তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, নগদ, গয়না এবং দানসামগ্রীর ব্যাপারে তিনি একচুলও পিছোতে পারবেন না। বাবা খবর পেলেন ওদের হাতে অনেক পাত্রী ঝুলছে। বাবা না পারলেও অন্য কেউ এখনই টাকা, গয়না, দানের বাসন এবং নমস্কারী কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

সুলেখা সজলচোখে বললো, "বাবা ওই মহিলার কাছে অনুনয় করেছিলেন, সামান্য পোস্টমাস্টার আমি—একটু বিবেচনা করুন। কিন্তু গিন্নী উত্তরই দিলেন না। বাবা বলেছিলেন, বিয়ে হয়ে যাক, আস্তে আস্তে সব দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু গিন্নী ঝানু মুদির থেকেও হুঁশিয়ার—নগদ নারায়ণ ছাড়া আর কিছুতেই তাঁর ভরসা নেই। সুতরাং বাবার অনুরোধ এক কথায় নাকচ হয়ে গিয়েছিল।"

হাঁপাচ্ছে সুলেখা। "বাবা যদি তখন আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতেন! দিনের পর দিন পাত্রের মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কী সব কথা বলে আসতেন আমি জানতেও পারতাম না।"

এর পরবর্তী ঘটনাও এবার আমার জানতে বাকি রইলো না। পাছে পাত্র হাতছাড়া হয়ে যায় এই ভয়ে সুলেখার পোস্টমাস্টার বাবা পোস্টাপিসের সামান্য কিছু টাকা কয়েকদিনের জন্যে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, অন্য এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার পাবেন এবং চার-পাঁচদিনের মধ্যে পোস্টা-

পিসের টাকার হিসেবটা চুকিয়ে ফেলতে পারবেন।

কিন্তু ভাগ্যে অন্য রকম লেখা ছিল এবং দুর্ভাগ্যের সেই ইতিহাস তো অন্য কথা। সুলেখা এই মুহূর্তে এইসব অপ্রিয় স্মৃতির গভীরে প্রবেশ করতে চায় না। সে শুধু ভাবছে মেয়েরা কেমনভাবে মেয়েদেরই সর্বনাশ করতে ভালবাসে। কীভাবে সেই ভাবী শাশুড়ীর অন্যায় দাবী-দাওয়া কিষাণপুর পি-ওর পোস্টমাস্টারের জীবনে সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করে আনলো। বিয়ে তো হলোই না, বরং বাবা হাজতে গেলেন এবং বাবাকে জেলের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ব্যর্থ ও সর্বস্বান্ত সীমা চ্যাটার্জি কলগার্ল সুলেখা সেনের কাছে নিজেকে বেচে দিয়ে পরিচিতজনদের মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

শুধু সেই হবুপাত্রের জননী নয়, আরও একটি রমণী এই মুহূর্তে সুলেখার রোষানলে দগ্ধ হচ্ছে। তার নাম পপি বিশোয়াস।

আহত বাঘিনীর মতো সুলেখা দুঃখ করলো, "আমার এই বিপদের সময় কোনো মেয়ে আমাকে সাহায্য করলো না। তারা আমাকে সর্বনাশের দিকে আরও ঠেলে দিতে পারলেই খুশী হয়।"

টেলিফোনে পপি বিশোয়াসের স্মরণাপন্ন হয়েছিল সুলেখা। "বাবার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথাটা বলিনি ওঁকে। তবে জানিয়েছিলাম, খুব জরুরী একটা কাজ পড়ে গেছে, পপি বিশোয়াস যদি অনুগ্রহ করে আজ বিকেলে অর্জুন চৌধুরীর দায়িত্বটা নেন। থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বরে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা থাকবে, পপি বিশোয়াসকে কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না, শুধু তাঁর সশরীর উপস্থিতিটুকু প্রয়োজন।"

'সশরীর উপস্থিতি!' কথাটা আমার কানে কীরকম আশ্চর্য লাগলো—নারীদেহের এমন বিচিত্র প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার কানে কখনও আসেনি।

অভিমানাহতা সুলেখার তখন কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই। গভীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ওর বুকটা কয়েকবার অসহায়ভাবে ওঠানামা করলো। চোখের জলও শুকিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিহিংসার চাপা আগুন ধিকধিক করে জ্বলছে।

সুলেখা বললো, "আমার এই বিপদে পপি বিশোয়াসই একমাত্র উদ্ধার করতে পারতো। কিন্তু উদ্ধার তো দূরের কথা, যেভাবে কথা বললো—"

বিনা দ্বিধায় সেইসব সংলাপ এবার হুড়মুড় করে সুলেখার শ্রীমুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

সুলেখার প্রস্তাব শুনে টেলিফোনেই একপ্রস্থ হেসে নিয়েছে পপি বিশোয়াস। সেই হাসি শুনে সুলেখার দেহে জ্বালা শুরু হয়েছে, কিন্তু কোনোরকমে মুখ বুজে সে তা সহ্য করেছে।

পপি বিশোয়াস—"ওমা! কী এমন জরুরী কাজের খপ্পরে পড়লে ভাই?"

সুলেখা—"বিশ্বাস করুন, মিসেস বিশোয়াস, খুব জরুরী কাজ। না হলে এমনভাবে আপনার সাহায্য চাইতাম না।"

পপি বিশোয়াস অনেকক্ষণ যান্ত্রিকভাবে টেলিফোন যন্ত্রের মাধ্যমে হাসলেন। এটা অনেকটা মুদ্রাদোষের মতো।—"ওমা! দুটো কাজ এক সঙ্গে পড়ে গিয়েছে বুঝি? এখন কাকে ছেড়ে কাকে সন্তুষ্ট করবে জানতে চাইছ!"

সুলেখা—"পপিদি, আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি সত্যিই বিপদে

পড়ে গিয়েছি। যা ভাবছেন ওসব কিছু নয়, বিশ্বাস করুন।"

পপি বিশোয়াস বিশ্বাসও করলেন না, গরমও হলেন না। আবার যান্ত্রিক হাসিতে টেলিফোন ভরিয়ে ফেললেন। "মিসেস সেন, সামান্য ব্যাপারে এতো উত্তেজনা কেন ? উঠতি সময়ে কখনও কখনও ওরকম ডুপ্লিকেট হয়েই যায়। একজনের টাইমটা একটু পিছিয়ে দাও। তুমি আধো-আধো গলায় মিষ্টি করে যা আব্দার করবে, পার্টি তাই শুনবে। জলে ঝাঁপ দিতে বললে তাই দেবে, সময়ের হেরফের তো সামান্য কথা।"

সুলেখা কাতরভাবে ঃ "আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না, মিসেস বিশোয়াস। আমাকে এখনই বেরুতে হবে।"

পপি বিশোয়াসের আবার হাসি। "ও মাগো! খুব বড় আউটডোর পার্টি বুঝি? তাহলে তো সত্যিই মুশকিল। আউটডোর কাজ নিও না, সুলেখা—খুব রিস্ক আজকাল। কোনদিন বিপদে পড়ে যাবে।"

সুলেখা এর পরেও তার বিশেষ অতিথির সাময়িক দায়িত্ব নেবার জন্যে পপি বিশোয়াসের কাছে কাতর অনুরোধ জানিয়েছে।

পপি বিশোয়াসের মিনমিন হাসিতে সুলেখার টেলিফোন আবার মুখর হয়ে উঠলো। "ও মাগো! ওসব কথা মুখে এনো না ভাই, মিসেস সেন। হোমরা চোমরা পার্টি তো প্লেনের টিকিটের মতো।"

পপি বিশোয়াসের রসিকতা সুলেখার ঠিক হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। সুলেখা ঃ "কী বলছেন ভাই? আমি বুঝতে পারছি না।"

পপি বিশোয়াস ঃ "প্লেনের টিকিট গো—নট ট্রান্সফারেবল। হুট করে একজনের বদলে আর একজন যেতে পারে না!"

এইসব কটূক্তি সহ্য করেও সুলেখা বারবার পপি বিশোয়াসের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু পপি বিশোয়াস এমন ভাব দেখালেন যেন অর্জুন চৌধুরীর নামই শোনেননি তিনি।

আকাশ থেকে পড়লেন যেন পপি বিশোয়াস। "অর্জুন চৌধুরী? সে আবার কে? না ভাই, মাফ করো। টম ডিক হ্যারির সঙ্গে কাজকর্ম আমি করি না।"

সুলেখা ঃ "মিস্টার চৌধুরী অর্ডিনারি লোক নন। হাই গভরমেণ্ট অফিসার।"

আজকাল সকলেই হাই অফিসার! ইণ্ডিয়াতে আজকাল লো অফিসার একজনও নেই!" পপি বিশোয়াসের চাপা বিদ্রূপ।

সুলেখা বললো, "আমি বলছি। অতি চমৎকার লোক। কোনো অসুবিধা হবে না। আমাকে বিশ্বাস করুন।"

পপি বিশোয়াস এবার প্রফেশনাল গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। "আমাকে ওসব কথা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, মিসেস সেন। স্পেশাল ইনট্রোডাকশন ছাড়া কোনো কাজ হাতে নিই না আমি।"

এরপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। "তোমার সঙ্গে আর কথা বাড়ালে চলবে না, মিসেস সেন। আমার একটু পরেই কাজ আছে। এখনও রেডি হতে পারিনি। ও-কে। বা...য়।"

কপালে হাত দিয়ে সুলেখা গভীর চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ছে! এদিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব না বুঝেই অবুঝ টাইমপিস ঘড়িটা কাউকে তোয়াক্কা না করেই আপন মনেই ছুটে চলেছে।

"এখন আমি কী করি বলুন তো?" নিজের কী করা উচিত সুলেখা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটতে-কাটতে সুলেখা একটু পরেই বললো, "জেলখানার গেটে বাবাকে নেওয়াটাই আমার একমাত্র কাজ, শংকরবাবু!"

আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে বললো, "আমার জন্যে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে শংকরবাবু। অর্জুনবাবু এলে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে—আমার ঘণ্টাখানেক দেরি হবে, অনিবার্য কারণে।"

"অর্জুন চৌধুরীকে আমি চিনবো কী করে?"

"তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ওঁদের অফিসের একটা ম্যাগাজিন রয়েছে আমার কাছে। সেখানেই মিস্টার চৌধুরীর ছবি ছাপানো রয়েছে। আপনাকে দেখিয়ে দেবো!

এমন বিশ্রী কাজ আমি জীবনে কখনও করিনি। কিন্তু জেলের গেটের কাছে এক বিমর্ষ পিতা-পুত্রীর সম্ভাব্য মিলনদৃশ্য মানসপটে ফুটে উঠতেই ওইটুকু অপ্রীতিকর কাজের দায়িত্ব নিতে রাজী হয়ে গেলাম।

"অর্জুন চৌধুরীকে আপনি কী বলবেন?" সুলেখা এবার আমাকে রিহার্সাল দিয়ে নিতে চায়।

"বলবো, মিসেস সেন হঠাৎ একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আপনার কাছে বার বার ক্ষমা চেয়েছেন। এবং কয়েক ঘণ্টা পরে আপনি ঘুরে এলে খুব খুশী হবেন সুলেখা দেবী।"

হাতের ব্যাগ খুলে আমার হাতে মিস্টার চৌধুরীর জন্যে ছোট্ট এক টুকরো চিঠি দেবার প্রস্তাব করলো সুলেখা। কিন্তু চিঠি লেখা হলো না। হঠাৎ কপালে হাত দিলো সুলেখা। তার মুখ শুকনো হয়ে গেলো।

সুলেখা এবার বললো, "মিস্টার চৌধুরীকে একটুও জানি না। কত সাধ্য-সাধনা করে ওঁর পায়ের ধুলো পাওয়া যাচ্ছে। আমি নেই শুনে উনি ভীষণ অপমানিত বোধ করবেন। উনি কিছুতেই ফিরে আসবেন না। আগামীকালই মিস্টার জেঠমালানির ওই পারমিট সম্পর্কে ফাইনাল ডিসিশন হবে। আজ রাত্রে মিস্টার জেঠমালানি নিশ্চয় আমাকে ফোন করবেন।"

সুলেখার মুখ এবার ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে। তার ভয়, ব্যাপারটা জানা মাত্রই চৌত্রিশ নম্বরে সুলেখার দিন শেষ হবে। কলকাতায় সামান্য একটু আশ্রয় এবং মাস-মাইনের ব্যবস্থা না থাকলে বাবাকে কী খাওয়াবে সে?

সংসারের বিচিত্র পথ অতিক্রম করে এসেও আমি কখনও এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। দ্বিধাগ্রস্থ সুলেখা আমার মুখের দিকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আমি তাকে কী উপদেশ দেবো বুঝতে পারছি না।

উপদেশ দেবার আদৌ কিছু আছে কি না, সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান হয়ে উঠছি। মনে মনে অদৃশ্যলোকের সেই পরম শক্তিমান পুরুষোত্তমকে আবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হচ্ছে। হে দেবতা, এই কি তোমার লীলা? সাধারণ ঘরের সামান্য মেয়েদের জন্যে এমন শাস্তি পূর্বজন্মের কোন্ অপরাধের জন্য তুমি রেখে দিয়েছো?

ঈশ্বর নিরুত্তর। এদিকে সময় দ্রুত বয়ে চলেছে। সুলেখা অমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন? তার চাহনির গভীর অর্থ আমার কাছে ধরা পড়ছে না, কিন্তু সে যেন কিছু বলবার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয়

করতে পারছে না।

"কিছু বলবেন?" সুলেখাকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করলাম।

সুলেখা এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। আঁচলে মুখ ঢেকে সে ফুঁপোতে লাগলো।

কী আশ্চর্য! পরের মুহূর্তে কোনো অদ্ভুত উপায়ে সে কান্না থামিয়ে ফেললো। চোখের জল মুছে ফেলে সুলেখা বললো, "আমাদের মতো অভাগিনীর কাঁদবারও উপায় নেই। কাঁদতে গিয়ে মনে পড়লো একটু পরেই মিস্টার চৌধুরী হাজির হবেন। কাঁদলেই আমার চোখ দুটো ফুলে ওঠে, আমার বিউটি নষ্ট হয়ে যায়—মিস্টার জেঠমালানি নিজেই একবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।"

সুলেখা দ্রুত একবার আমার ঘরের ছোট্ট আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিলো। দেহ ভাঙিয়ে যাদের খেতে হয়, তাদের এ ছাড়া উপায় কী?

সুলেখা এবার করুণভাবে আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, "এই বিপদে আপনিই একমাত্র আমাকে উদ্ধার করতে পারেন, শংকরবাবু। জানি, অকারণে আপনি আমার এই সর্বনাশা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে বার বার আপনার ওপর অন্যায় করছি—কিন্তু আমি অন্য কোনো পথ তো দেখতে পাচ্ছি না।"

সুলেখা হঠাৎ আমার হাতখানা ধরে কাতরভাবে বললো, "গত জন্মে কত পাপ করেছিলাম। তাই এ-জন্মে ভগবান আমাকে এতো শাস্তি দিচ্ছেন। আমাকে কোনোরকমে এ-যাত্রা উদ্ধার করে দিন, শংকরবাবু।"

সুলেখা কী চায় তা আমি এবার আন্দাজ করতে পারছি। সুলেখার ইচ্ছা আমি জেলখানায় গিয়ে তার বাবাকে খালাস করে আনি। তা হলে অর্জুন চৌধুরীর নাটকটা নির্বিঘ্নে পূর্বঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত শিল্পীর উপস্থিতিতে অভিনীত হতে পারে।

এ অবস্থায় রাজী হওয়া ছাড়া আর কী পথ থাকতে পারে? বহুদিন আগে জেলখানার দরজায় আর একবার গিয়েছিলাম। সেবার সায়েব ব্যারিস্টারের কাজে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তিনি ছিলেন ফাঁসির আসামী। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কথাও হয়েছিল অনেক। মৃত্যুর হাতছানি এড়াবার জন্যে সে লোকটির কি আকুল প্রচেষ্টা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এবং আমাদের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। জেলের নিঃসঙ্গ সেলে যাঁকে দেখেছিলাম তিনি আর কখনও উদার উন্মুক্ত নীল আকাশের তলায় এসে দাঁড়াননি—জেলেই তাঁর ফাঁসি হয়েছিল।

এতোদিন পরে থ্যাকারে ম্যানসনের এই ছোট্ট ঘরখানায় বসে জেলের সেই দৃশ্য আমার আবার মনে পড়ছে।

আমি রাজী হয়েছি জেনে সুলেখার মুখে যেন হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠলো। সে বললো, "আর একটুও সময় নেই। এখনও অনেক কাজ আছে। আমি বাবার জামাকাপড়গুলো তৎক্ষণ গুছিয়ে ফেলিগে যাই। আপনি দয়া করে একবার আমার ঘরে আসুন।"

সুলেখা এবার দ্রুত পায়ে বিদায় নিলো। আমিও টাইমপিস ঘড়ির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে, মুখে চোখে একটু জল দিয়ে নেবার মনস্থ করলাম।

বেসিনের কল ঘোরালাম। সোঁ সোঁ করে একটু আওয়াজ হ'লা—কিন্তু জলের কোনো পাত্তা নেই। দোষটা কোন্ কালীর কলকালি না তেলকালির

তা অনুসন্ধানের এখন সময় নেই। হয় কলকালিবাবু প্লাম্বিং-এর কাজ অনেক দিন অবহেলা করেছেন, না-হয় তেলকালিবাবুর পাম্পে গোলমাল থাকায় ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল ওঠেনি। কল ঘুরিয়ে প্রয়োজনের সময় জল না পেলে ভাড়াটিয়াদের মেজাজ কেন সপ্তমে চড়ে ওঠে তার কিছুটা ইঙ্গিত পেলাম।

জামাকাপড় পাল্টে তৈরি হয়ে নিয়ে সোজা চৌত্রিশ নম্বরে চলে এলাম। সুলেখা আমার জন্যেই হয়তো ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করেনি।

ঘরে ঢুকেই দেখলাম, সুলেখা টেলিফোন ধরে কথা বলায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। ভাবলাম, হয়তো মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর সঙ্গেই কথা হচ্ছে। গভরমেণ্ট গেস্ট হাউসে রাখা সুলেখার আর্জেণ্ট মেসেজ পেয়েই ভদ্রলোক হয়তো রিং ব্যাক করেছেন। তা হলে খুবই ভাল হয়—আমাকে আর জেলে যেতে হয় না। তা ছাড়া অচেনা অজানা লোককে নিজের মেয়ের বদলে দেখলে ভদ্রলোকের মনের অবস্থাই বা কী হবে?

টেলিফোনে কথা হচ্ছে—সুলেখা মিষ্টি হেসে মিষ্টি মিষ্টি কিছু বলছে বলে আন্দাজ করছি। কারণ তার কোনো কথা আমার সীট পর্যন্ত ভেসে আসছে না। সুলেখার এই ভঙ্গী দেখে কে বলবে একটু আগেই সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল এবং জেল থেকে বাবাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তার মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

অর্জুন চৌধুরী ফোন করেননি। টেলিফোন নামিয়ে সুলেখা আমার সামনে এসে বসতেই ভুল বুঝতে পারলাম।

সুলেখা বললো, "কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে নিলাম। মিস্টার জেঠমালানি এসে গিয়েছেন। ওকে বললাম, মিস্টার চৌধুরীর কাজটা তো আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাল থেকে আমি কয়েক দিন উধাও হয়ে যেতে চাই।"

মিস্টার জেঠমালানি প্রথমে রাজী হচ্ছিলেন না। বললেন, "মিস্টার চৌধুরীর কেসটা তো একদিনে শেষ নাও হতে পারে।"

"আমিও তো এক দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছি না। আবার তো ফিরে আসছি", মিস্টার জেঠমালানিকে ভরসা দিয়েছিল সুলেখা।

"না, মানে, এই ক্রিটিক্যাল সময়ে ছুটি—", জগদীশ জেঠমালানি তখনও সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি।

তখন সুলেখা বিরক্ত হয়ে চরম অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। "আমরা তো মেশিন নই, মিস্টার জেঠমালানি। মেয়েদের মাঝে মাঝে তিন চার দিন ছুটি দরকার হয়।"

"ভদ্রলোক এর পরে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। শুধু বললেন, মিস্টার চৌধুরীকে বশ করা চাই-ই। চান্স পেলে আমাদের কথাও একটু বলে দিও। আর বোলো, তোমার ফ্ল্যাটটা যেন উনি নিজের মনে করে ব্যবহার করেন। যখন ইচ্ছে চলে আসেন যেন, উইদাউট এনি অব্লিগেশন।"

খিলখিল করে হেসে উঠলো সুলেখা। "এই উইদাউট অব্লিগেশন কথাটা উনি বেশ মাথা খাটিয়ে বার করেছেন। চান্স পেলেই লাগিয়ে দেন।"

জগদীশ জেঠমালানি আরও বলেছেন, "মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্কটা যেন একদিনেই শেষ না হয়ে যায়, সুলেখা। উনি যদি ডেট চান, তোমার সুবিধে মতো ডেট দিয়ে দিও। তবে খুব বেশী দেরি কোরো না ফিরতে। কলকাতায় এই সময় তোমাদের কাজকর্মের চাপটা বেশী থাকে, জানোই তো।"

সুলেখা আমাকে বললো, "পাকাপাকি কিছুই কথা দিইনি মিস্টার জেঠমালানিকে। তবে চার পাঁচ দিনের আগে অবশ্যই ফিরছি না। কাল ভোরবেলায় বাবাকে নিয়ে সোজা কলকাতা ছেড়ে পিসিমার গ্রামে চলে যাবো। ভাবছি বাবাকে ওখানেই রেখে আসবো। পিসীমা বিধবা মানুষ—ছেলেপুলেও নেই। একা একা গ্রামের বাড়িতে থাকেন।"

মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকালো সুলেখা। সময় আমাদের কারও জন্য অপেক্ষা না করে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ছুটছে।

সুলেখা বললো, "আপনাকেও এখনই ছুটতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে জরুরী কিছু কথা আছে। আর দু মিনিট প্লিজ।"

এই বলে সুলেখা ভিতরের ঘর থেকে কিছু আনতে গেলো।

টেবিলের ওপর মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর আপিসের সেই ম্যাগাজিনটা পড়ে রয়েছে। পাতা উল্টোতে গিয়েই অফিস ক্লাবের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মিস্টার চৌধুরীর ছবিটা নজরে পড়লো এবং ছবিটা দেখা মাত্রই আমি দারুণভাবে চমকে উঠলাম।

অফিস ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠানে ছাপা প্রোগ্রামে মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর ছবিটা দেখেই মনে হলো লোকটি যেন আমার চেনা। এই প্রথম নিশ্চয়ই আমি অর্জুন চৌধুরীর ছবি দেখছি না।

বড়াই করবার মতো প্রখর স্মৃতিশক্তি আমার নেই। অনেক ঘটনা, অনেক মুখ আমার স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকে, আবার অনেকের কথা একেবারেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়, প্রয়োজনের সময় তাদের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে পারি না।

অর্জুন চৌধুরীর ছবিটার দিকে আমি আবার তাকালাম। মুখটা কিছুতেই অপরিচিত মনে হচ্ছে না। কিন্তু অর্জুন চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমি কোথায় দেখতে পারি? স্মৃতির গভীরে মনঃসংযোগের আলোক নিক্ষেপ করেও আমার সন্দেহ নিরসন হলো না। কিন্তু কীভাবে কোথায় আমাদের পরিচয়ের সূত্র থাকতে পারে তা সেই নাটকীয় অপরাহ্নে স্মরণ করতে সক্ষম হলাম না।

সুলেখা ইতিমধ্যে ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এই ঘরের বিভিন্ন কোণে অনেকগুলি মানুষ-সমান আয়না সযত্নে সাজানো রয়েছে। ডানলপিলো-মোড়া বেডের কাছে দাঁড়িয়ে সেই সব মুকুরে একই সঙ্গে সুলেখার নানা প্রতিফলন দেখতে লাগলাম। সোফা সেটের গণ্ডী পেরিয়ে সুলেখার শয্যা-কক্ষের এই বৈচিত্র্যটি এর আগে কখনও এমনভাবে আমার নজরে পড়েনি।

আয়নার মধ্য দিয়ে মনে হলো, অনেকগুলো সুলেখার দিকে একই সঙ্গে আমি তাকিয়ে আছি। প্রতিটি সুলেখাই যেন আলাদা। এদের নানা অঙ্গে নানা রূপ।

রক্তমাংসের সুলেখা এবার কথা বলে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবছেন?"

"কিছুই না", আমি হেসে উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার প্রচেষ্টা তেমন সফল হলো না। এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন সব কিছু হেসে উড়িয়ে দিলেও হাল্কা হওয়া যায় না।

অন্য সময় হলে সুলেখা হয়তো আমার এই মানসিক অস্থিরতার উৎস সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু এখন সে প্রাণপণে সময়ের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করছে—কোনো দিকে বিশেষ নজর দেবার মতো সময় তার নেই।

সুলেখা বললো, এই প্যাকেটে বাবার জন্যে একটা গেঞ্জি, একটা পাঞ্জাবি, আর একটা ধুতি আছে।"

জেল থেকে বেরোবার সময়ে কয়েদীর পোশাক কেড়ে নিয়ে সদাশয় সরকার কোনো বেসরকারী জামাকাপড় দেন কিনা আমার জানা নেই। সুলেখা বললো, "আপনার হয়তো অসুবিধে হবে, শংকরবাবু। কিন্তু এই প্যাকেটটা সঙ্গে রাখুন। পরে আসবার মতো পরিষ্কার জামাকাপড় বাবার সঙ্গে থাকবে বলে মনে হয় না আমার।"

নিউ মার্কেটের বিখ্যাত দোকানের নাম-ছাপানো ঠোঙায় মোড়া ধুতি-পাঞ্জাবির দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। সুলেখা এবার কিছু কথা বলতে চায়।

কথাটা যে অস্বস্তিকর তা ওর মুখ দেখেই আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু সুলেখা বোধ হয় মনে মনে রিহার্সাল দিচ্ছে। মূল বক্তব্য সম্বন্ধে এখনও কিছুটা সন্দেহ থাকায় সে অন্য কাজের কথা তুললো।

ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সুলেখা বললো, "আপনি ট্যাক্সি করেই চলে যান। বাসের ভরসায় থাকলে দেরি হয়ে যেতে পারে।"

নিজের হাতব্যাগ থেকে কয়েকখানা নোট বার করতে করতে সুলেখা বললো, "ফেরবার সময়ও ট্যাক্সিতে চলে আসবেন। ট্রাম-বাসের ভিড়ে বাবা অভ্যস্ত নন—ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসে।"

গাড়িভাড়ার টাকাটা নিজের হাতে নিতে সংকোচ হচ্ছিল। অবস্থা যতই খারাপ হোক, কতকগুলো ব্যাপারে পারিবারিক ঐতিহ্যের ছায়া এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। সামান্য কাজে বন্ধুর কাছে বন্ধু রাহাখরচ নেয় না। কিন্তু সুলেখা জোর করে আমার বুক পকেটে টাকা গুঁজতে গুঁজতে বললো, "আমার এই ব্যাগে অনেক টাকা আছে, শংকরবাবু। ট্যাক্সি ভাড়া ছাড়াও আপনার টাকা দরকার হবে। বাবার জুতোর অবস্থা কেমন জানি না। কাছাকাছি কোনো দোকান থেকে এক জোড়া জুতো অথবা চটিও কিনতে হতে পারে।"

সুলেখা হঠাৎ একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। হাসবার চেষ্টা করছে সে। কান্না ঢাকবার জন্যে এক অদ্ভুত হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বললো, "এখন আমার ব্যাগে যত টাকা আছে, সেদিন তার অর্ধেক থাকলেও বাবাকে জেলে যেতে হতো না। মাত্র পাঁচশ টাকার হিসেব মেলাতে পারলেন না, বাবা। তাই টেমপোরারি ডিফলকেশনের মামলা শুরু হয়ে গেল।"

সুলেখার মুখের দিকে আমি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। সুলেখা ওইভাবে হাসতে হাসতেই বললো, "বাবার ইচ্ছে ছিল আমার খুব ভাল বিয়ে দেবেন। বিয়ের চেষ্টা না করলে বাবাকে কিষাণপুর পোস্টাপিসের টাকা ভাঙতে হতো না।"

সুলেখা ওই হাসি অব্যাহত রেখেই বললো, "যার যা কপালে আছে তাই

তো হবে? আমার কপালে এই থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বর ঘর লেখা আছে, বাবা তা খণ্ডাবার চেষ্টা করলে কী হবে? চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই জেলে গেলেন।"

এবার হাসি বন্ধ হয়ে আসছে সুলেখার। সে বললো, "বাবাকে আমার সম্বন্ধে কী বলবেন আপনি? মনে রাখবেন, আমার নাম সীমা—সুলেখা নয়।"

সুলেখা এবার হাঁপাচ্ছে। "দোহাই, শংকরবাবু, বাবা যেন সুলেখার কাজকর্মের কিছুই খবর না পান। জেলে যাওয়ার থেকেও বেশী কষ্ট পাবেন যদি জানতে পারেন সীমা এখন কোথায় নেমে এসেছে।"

প্রথমে আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে অনর্গল মিথ্যা ভাষণে অনভ্যস্ত আমি—সব কিছু গোলমাল পাকিয়ে সুলেখার বিপদ ডেকে আনবো না তো?

সুলেখা আমার অবস্থা বুঝেছে। গোলমেলে পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে সে বললো, "শুধু মনে রাখবেন সীমা এবং সুলেখা দু'জন আলাদা মানুষ। তাহলেই আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। সুলেখাকে বাবা চেনেন না—তার সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই। আর সীমা খুব কষ্টে কলকাতা শহরে বেঁচে আছে, সে অপেক্ষা করছে কবে বাবা জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।"

বৃহস্পতিবারের সেই অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। কলকাতার এক অখ্যাত ফ্ল্যাট বাড়ির কনিষ্ঠতম কর্মচারির জীবনেও যে এমন নাটকীয় মুহূর্ত আসতে পারে তা কে কোথায় কবে কল্পনা করেছে? সীমা ও সুলেখার আলোছায়ায় এমনভাবে যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবো তাও কোনোদিন ভাবিনি।

সীমা ও সুলেখা, তোমাদের দুজনের কাছেই আমি গভীর কৃতজ্ঞ, তোমরা আমার চোখ খুলে দিয়েছো। সংসারের এক বিচিত্র সত্যকে তোমরা আমার সামনে মেলে ধরেছো। তোমাদের না-দেখলে সংসারতীর্থে আমার সুদীর্ঘ পরিক্রমা অপূর্ণ থেকে যেতো।

অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে প্রাক্তন পোস্টমাস্টার বীরেন চ্যাটার্জিকে জেলের দরজা থেকে উদ্ধার করে থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে এসেছি।

বীরেন চ্যাটার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকারটাই এক নাটক। এমন নাটকেও এর আগে আমি কখনও অংশ গ্রহণ করিনি।

জেল থেকে বেরিয়েই কারাভারে শীর্ণ ও ঈষৎ ন্যুব্জদেহ বীরেন চ্যাটার্জি তাঁর হাই-পাওয়ারের চশমার মধ্য দিয়ে নিজের মেয়ে সীমার খোঁজ করছিলেন। কাছাকাছি কোথাও কোনো মেয়েকে না-দেখে বীরেন চ্যাটার্জি যখন অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন, তখন আমিই এগিয়ে এসে নমস্কার করলাম।

"সীমা? সীমা কোথায়?" বীরেন চ্যাটার্জি বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করলেন।

এই মুহূর্তে তিনি আর কারও সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।

বললাম, "সীমা আসতে পারেনি। হঠাৎ তার কাজ পড়ে গিয়েছে।"

"কীসের কাজ?" বীরেন চাটুজ্যে বেশ অধৈর্য হয়ে উঠলেন। যত কাজই থাক, বাবার মুক্তি দিনে সীমা কাজে জড়িয়ে থাকবে তা বীরেনবাবু এই মুহূর্তে ভাবতে পারছেন না।

বললাম, "আপনার খবরটা আসতে দেরি হয়েছে। টেলিগ্রামটা ঠিক সময় পৌঁছয়নি।"

নিজের পুরনো আপিসের কথা বোধ হয় বীরেন চাটুজ্যের মনে পড়লো। "আর্জেণ্ট টেলিগ্রামও এখানকার পিওনরা ঠিক সময় ডেলিভারি দেয় না? আমাদের পোস্টাপিসে তো কখনও এমন হতো না।"

"সীমা কি এখনও খবর পায়নি?" বীরেন চ্যাটার্জি এবার আরও অস্থির হয়ে উঠলেন।

ওঁকে আশ্বাস দিলাম, "চিন্তার কিছু নেই, সীমা খবর পেয়েছে। খবর না পেলে এইসব জামাকাপড় আমাকে কে দিলো?"

আমাকে খুব সহজভাবে নিতে পারছেন না বীরেন চ্যাটার্জি। তাঁর আদরের মেয়ে সীমার সঙ্গে আমার মতো একজন অচেনা লোকের কী যোগা-যোগ থাকতে পারে তাও তিনি ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

কী উত্তর দিই এখন? একবার ভাবলাম বলি, "আমি সীমার বন্ধু।" কিন্তু বন্ধু কথাটা এই বৃদ্ধের মনে আরও কীসব সন্দেহের সৃষ্টি করবে তা ঈশ্বর জানেন।

হঠাৎ মুখ দিয়ে উত্তর বেরিয়ে এলো। বললাম, "আমার বোনের বন্ধু সীমা।"

এরপরেই যে আমার বোনের নাম জানতে চাওয়া হবে তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। প্রশ্নের চাপে হঠাৎ বলে ফেললাম, "সুলেখা। ওর সঙ্গে খুব ভাব সীমার।"

খুব সুখী হলেন বীরেন চ্যাটার্জি। "সীমা ও সুলেখা—ভারি চমৎকার মিল হয়েছে তো। সীমা তাহলে খুব একলা নেই। আমার শুধু দুশ্চিন্তা হতো সীমা নিশ্চয় খুব নিঃসঙ্গ। এতো বড় এই শহরে বাবার অপরাধে সে একলা জ্বলে পুড়ে মরছে—তাকে দেখবার কেউ নেই।"

"সুলেখা ওকে যতখানি সম্ভব দেখছে" আমি কোনোরকমে উত্তর দিলাম।

এরপর কথাবার্তা চালাতে গেলে হয়তো ঠিকমতো বানাতে পারবো না—হঠাৎ কী বেফাঁস বলে ফেলবো, এই ভয়। তাই এবার জামাকাপড়ের কথা তুললাম। "আপনি কি জামাকাপড় পাল্টাতে চান?"

নিজের জামা কাপড়ের দিকে তাকালেন বীরেন চাটুজ্যে। কয়েকদিন না-কামানো মুখের দাড়িতেও হাত বুলোলেন তিনি। তারপর বললেন, "সীমা কী পাঠিয়েছে, দেখি?"

জেলের গেটের কাছেই প্যাকেটটা খুলে ফেললেন বীরেন চ্যাটার্জি। এবং ওইখানেই বেশ পরিবর্তন করলেন।

ছাড়া জামাকাপড়গুলো প্যাকেটে পুরে নেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু বীরেন চ্যাটার্জি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "ওগুলো এখানেই পড়ে থাক। জেলের জামাকাপড় নিয়ে সীমার বাড়িতে ঢুকতে চাই না আমি। ওসব

আমি সীমাকে আর মনে করিয়ে দিতে চাই না, শংকরবাবু।"

ট্যাক্সির খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে দূরে একটা চুল কাটার সেলুন নজরে পড়লো। বললাম, "আমার কাছে টাকা আছে, যদি দাড়ি কামিয়ে নিতে চান তো নিতে পারেন।"

"আপনার পয়সায় দাড়ি কামাবো? না ওটা ঠিক হবে না।"

"আমার পয়সা মোটেই নয়—আপনার মেয়েরই রোজগার-করা পয়সা, আপনি যেমন খুশি খরচ করতে পারেন।" আমি আশ্বস্ত করি সীমার বাবাকে।

"তা হলে চলুন। এই দাড়ি গোঁফ দেখে সীমা বেচারা ভয় পাবে, কষ্ট পাবে। সীমা জানে, এই দাড়ি কামানোর ব্যাপারে আমি খুব পার্টিকুলার ছিলাম। সকাল সাড়ে ছটার সময় দাড়ি না-কামালে আমার অস্বস্তি হতো—মনে হতো দাঁত মাজা হয়নি। দাঁত না মেজে খাওয়া আর দাড়ি না-কামিয়ে আপিসে যাওয়া আমার কাছে একই কথা ছিল।"

খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়াল থেকে সেলুনের আয়নায় অন্য এক বীরেন চ্যাটার্জি এবার প্রতিফলিত হলেন।

আমার হাত থেকে পয়সা নিয়ে সেলুনের মালিককে প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন বীরেন চ্যাটার্জি।

রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে হাঁটতে বীরেনবাবু বললেন, "সীমা আপনাকে কত পয়সা দিয়েছে?"

"কোনো চিন্তা নেই আপনার। যা প্রয়োজন সব মিটে যাবে" আমি আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করি তাঁকে।

সীমার বাবা হাসলেন। প্রয়োজন আমার অনেক। মেয়ের বিয়েটা না দেওয়া পর্যন্ত আমি মরেও শান্তি পাবো না। কথাগুলো নিষ্ঠুর রসিকতার মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু আমি এর কী উত্তর দেবো? আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আর কত অভিনয় করতে পারে?

বললাম, "একটু চা খেয়ে নিন।"

"সীমার ওখানে গিয়েই খাওয়া যাবে।"

বীরেনবাবুর কথা শুনে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সীমার সঙ্গে কখন দেখা হবে তা আমি জানি না। সীমা নিজেও জানে না। তার মুক্তিটা নির্ভর করবে অর্জুন চৌধুরীর মর্জির ওপর।

জোর করেই সীমার বাবাকে একটা খাবারের দোকানে ঢুকিয়ে ফেললাম। "আসুন আসুন। সীমার ওখানে আরও একবার খেতে তো বারণ নেই। সীমা কখন আসবে তাও তো ঠিক নেই।"

শেষ কথাটা বোকার মতো বলে ফেলেছি। মুক্তির পর প্রথম চায়ের চুমুকটাও সীমার বাবা সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারলেন না। বললেন, "সীমা কখন আসবে ঠিক নেই কেন?"

বিপদ এড়াবার জন্যে মুখে যা আসছে তাই বলে যাচ্ছি। "সীমাকে রোজগার করতে হয়, মিস্টার চ্যাটার্জি। গেরস্ত ঘরের লোকদের কলকাতা শহরে বাড়তি টাকা রোজগার করাটা খুব শক্ত। তার জন্যে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।"

সীমার বাবার মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেলো। আপন মনেই বিড়বিড়

করলেন, "আমার বাবা বলতেন মহাপাপ না করলে মেয়ের রোজগারে খেতে হয় না। মহাপাপ, কিন্তু আমি এ জন্মে কী এমন পাপ করেছি? মেয়ের বিয়ের জন্যে আটঘাট বাঁধতে গেলাম—কিন্তু মাত্র পাঁচশ টাকার জন্যে সব গোলমাল হয়ে গেলো।"

ট্যাক্সিতে চড়ে বসেছি আমরা। বীরেন চাটুজ্যে এক মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে কী সব ভাবছেন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মেয়ে কেমন আছে শংকরবাবু?"

জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। তবু উত্তর দিলাম, "ভালই তো আছে। অনেক মেয়ে তো এর থেকেও কষ্টে থাকে।"

"আমার সম্বন্ধে সীমা কিছু বলে আপনাকে?" সীমার বাবা আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না।

"আপনাকে খুব ভালবাসে, সীমা। বাবা সম্বন্ধে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা।" আমি এখন বোধ হয় খুব মিথ্যে কথা বলছি না।

"ভালবাসতে পারে। বাপ তো। কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা কেমন করে করবে!" এবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো সীমার বাবার চোখ দিয়ে।

"ভক্তি শ্রদ্ধার নিয়মকানুন তো কোর্টকাছারিতে ঠিক হয় না বীরেন-বাবু" আমি ওঁকে অন্তর থেকেই সত্য কথা বলবার চেষ্টা করলাম।

"সীমা আপনার কথা বিশ্বাস করে?" আকুলভাবে জানতে চাইলেন বীরেন চাটুজ্যে। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে অসহায়ভাবে নিবেদন করলেন, "বিশ্বাস করুন আমি চোর নই। পাঁচশ টাকা আমি চুরি করিনি। মাত্র ক'দিনের জন্যে সরিয়ে রেখেছিলাম—দু'দিন পরে বন্ধুর কাছ থেকে ধার পাওয়া মাত্রই শোধ করে দিতাম। কিন্তু পাঁচটা চুরির অভিযোগে আমি দু'বছর জেল খেটে এলাম।"

"পাঁচটা চুরি?" আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

"কোনো টাকাই একদিনের বেশী রাখতে পারছি না। এর টাকা দিয়ে ওর টাকা শোধ করছি। পরের দিন আর একজনের টাকা দিয়ে আগের টাকা শোধ করছি। টেমপোরারি ডিফলকেশন পাঁচটা সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশ বইতে। চুরি করবার ইচ্ছে থাকলে তো একটা খাতা থেকে টাকা সরিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম।"

এসব কথায় আমি তেমন মনঃসংযোগ করতে পারছি না। কারণ প্রতি মুহূর্তেই আমাদের ট্যাক্সি দ্রুতবেগে থ্যাকারে ম্যানসনের কাছে এগিয়ে আসছে। সেখানে পেঁাছে সীমার বাবাকে নিয়ে কী করবো তা এখনও ঠিক করিনি।

•

অর্জুন চৌধুরী আমার বিপদ আরও বাড়ালেন। নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছু পরেই তিনি বোধ হয় থ্যাকারে ম্যানসনে সুলেখা সান্নিধ্যে আসছেন। আমাদের ট্যাক্সির সামনেই একটা সরকারী গাড়িকে থ্যাকারে ম্যানসনে প্রবেশ করতে দেখলাম। পিছনের সীটে অল্প বয়সী রাজপুরুষ সু-গম্ভীর স্টাইলে শান্তভাবে বসে আছেন। যেন সোফার চালিত হয়ে কোনো জরুরী কনফারেন্সে চলেছেন তরুণ পদস্থ অফিসার।

গেটের গোড়াতেই সরকারী গাড়িকে বিদায় করলেন যিনি তিনিই যে অর্জুন চৌধুরী সে-সম্বন্ধে আমার প্রায় কোনো সন্দেহই নেই। সুলেখার

ঘরে যে ছবিটা দেখেছি তার সঙ্গে কোনো অমিল নেই রক্ত মাংসের এই নায়কের। বিশিষ্ট এই অতিথিকে কেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হচ্ছে না, তা এই মুহূর্তে নিজেই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এ বিষয়ে গভীর ভাবনার সময় এখন নেই। আমার পাশেই আরও অনেক বড় সমস্যা সশরীরে উপস্থিত রয়েছে। তাঁকে নিয়ে এই মুহূর্তে কী করবো তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারছি না।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বীরেন চ্যাটার্জি অস্থিরভাবে চারদিকে তাকাচ্ছেন। তিনি যে এই মুহূর্তে নিজের মেয়েকে খুঁজছেন তা বুঝতে পারছি আমি।

সীমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এ কোথায় নিয়ে এলে বাবা?" ওঁর কণ্ঠস্বরে অসহায় ভাব ফুটে উঠছে।

"কোনো চিন্তা নেই আপনার। আমার সঙ্গে আসুন।" এই বলে আমি থ্যাকারে ম্যানসনের লিফটের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। লিফটের কোলাপসিবল গেট বন্ধ করে বোতাম টিপে দিলাম। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে, হাই তুলে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধ লিফটটা এবার মন্থর গতিতে ঊর্ধ্বযাত্রা শুরু করলো। বীরেন চ্যাটার্জি নিজের মনেই বললেন, "ঠিক যেন জেলখানার খাঁচা!"

আমি কোনো কথা বলছি না। সীমার বাবার সঙ্গে এবার কী সব বানানো কথা বলবো মনে মনে তারই মহড়া দিচ্ছি।

বীরেনবাবুকে নিয়ে আমার ঘরে চলে এসেছি। বললাম, "এই ঘরটাই এখন আপনার। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।"

"সীমা এখানে থাকে?" বীরেনবাবু শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক এখানে নয়", আমি আমতা আমতা করি।

"তা হলে!" একটু বিরক্তই হলেন সীমার বাবা। "সীমা যেখানে আছে সেখানেই আমাকে সোজা নিয়ে গেলে না কেন?"

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "কলকাতায় এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মেয়েদের ছাড়া কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না। আপনি চিন্তা করবেন না, সীমা একটু পরেই এখানে আসবে।"

সীমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "লেডিজ হোস্টেল বুঝি? সেখানে অচেনা পুরুষমানুষ ঢুকতে দেয় না বটে। কিন্তু আমি তো সীমার বাবা। বাবা-মায়েদের তো কোনো লেডিজ হোস্টেলে আটকানো উচিত নয়।"

"সব জায়গায় তো সমান নিয়ম নয়", আমি এবার মিথ্যেকথা বলতে অস্বস্তিবোধ করি। এবার আশ্বাস দিলাম, "সীমা এলো বলে। আপনি ততক্ষণ স্নান সেরে নিন। আপনার মুখ চোখ এখনও বেশ শুকনো রয়েছে। আপনাকে এই অবস্থায় দেখলে সীমা খুব কষ্ট পাবে।"

আমার কথায় কাজ হলো। বীরেনবাবু বললেন, "মা আমার অনেক কষ্ট পেয়েছে। ওকে আমি আর কষ্ট দিতে চাই না। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি যতটা পারি চকচকে হয়ে নিই। জেলেতে খুব কষ্ট শংকরবাবু। কিতু আমার মাকে ওসব কখনও জানতে দিইনি।"

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সহদেবের নজরে পড়ে গেলাম। সহদেব বললো, "আপনি এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন, স্যার? সেই কখন থেকে আপনাকে খুঁজছি আমি।"

"কেন কী হলো! আমাকে খুঁজে তোমার কী লাভ হবে, সহদেব?" আমি হেসে জানতে চাই।

"ইচ্ছে করে কী খুঁজছি আমি!" সহদেব ঝটপট উত্তর দেয়। "চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণির স্পেশাল হুকুম।"

"কী হুকুম, সহদেব?" আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাই।

সহদেব ফিস ফিস করে বললো, "আপনার সঙ্গে কথা আছে, হুজুর। কথা বলবো বলেই তো সেই কখন থেকে আপনাকে ধরবার জন্যে বসে আছি।"

সহদেবের কথার ধরণ দেখে মনে হয়েছিল কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা অত নাটকীয় নয়।

সহদেব বললো, "কী ব্যাপার বুঝলাম না, সায়েব। দিদিমণি নিজে ডেকে বলে গেলেন, আপনার খোঁজ করতে এবং আপনার ঘরে দুজনের জলখাবার পাঠিয়ে দিতে।"

সহদেব অনর্গল কথা বলে যায়। সে বললো, "আমি ভেবেছিলুম দিদিমণি নিজেও আপনার ঘরে এসে জলখাবার খাবেন। কিন্তু পরে শুনলাম, আপনার কোন্ আত্মীয় আসবেন—তাকে আনতেই আপনি বেরিয়েছেন।"

আমি উত্তর দিলাম, "তুমি দুজনের মতোই খাবারের ব্যবস্থা করো। কিন্তু কী খাওয়াবে তুমি, সহদেব?"

একগাল হেসে সহদেব জানিয়ে দিলো, "আপনার কোনো চয়েস নেই সাহেব। দিদিমণি নিজেই অর্ডার দিয়েছেন। এক প্লেট আলু-চচ্চড়ি তো দিদিমণি নিজেই ঘরে রান্না করে আমার হাতে দিয়ে দিলেন।"

ভাবলাম একবার সহদেবকে দিয়ে সুলেখার কাছেই খবর পাঠাই, আমরা নিরাপদে এখানে পৌঁচেছি। বাবার খবরের জন্যে বেচারা এতক্ষণ নিশ্চয় খুবই চিন্তিত হয়ে রয়েছে। সহদেবকে অনুরোধ করলে সে নিশ্চয় রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পিক-আপ ভ্যান থেকে অর্জুন চৌধুরীর নামবার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এই মুহূর্তে সীমা নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছে। তাকে জ্বালাতন করাটা এখন কোনোক্রমেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

সহদেব জিজ্ঞেস করলো, "আপনার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি আপনার কে হন?" বিলিতী ভব্যতা অনুযায়ী যাই হোক, এই ধরনের কৌতূহল দিশী মতে মোটেই অশোভন নয়।

কী উত্তর দেবো ভাবছি, এমন সময় সহদেব একগাল হেসে নিজেই ঘোষণা করলো, "দিদিমণি বলছিলেন আপনার মেসোমশায়!"

মেসোমশায়! সম্পর্কটা মন্দ নয়। ধীরেন চ্যাটার্জি অবশ্যই আমার মেসোমশাই হতে পারেন। সুতরাং আমি আর প্রতিবাদ করলাম না।

সহদেব এবার জিজ্ঞেস করলো, "দিদিমণির সঙ্গে ওঁরও চেনা আছে নাকি?"

এবার উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু এমনভাবে হাসলাম যার অর্থ হাঁ অথবা না দুইই হতে পারে। সহদেব বুঝলো, আমি এখন একটু দূরত্ব রেখে চলতে আগ্রহী। সে আমাকে আর প্রশ্নবাণে বিরক্ত করলো না।

বীরেন চাটুজ্যে এখানে আসা পর্যন্ত ছটফট করছেন। তিনি জানতে চাইলেন, "সীমা কখন আসবে?"

সীমা যতটুকু প্রয়োজন তার এক মুহূর্ত বেশী দেরি করবে না এ কথা জানালাম বীরেন চ্যাটার্জিকে। কিন্তু তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "সীমার হোস্টেল এখান থেকে কত দূর? ওখানে ঢুকতে না দিলেও, আমরা তো গেটের কাছ থেকে দারোয়ানের থ্রু দিয়ে সীমাকে ডেকে পাঠাতে পারি।"

ছোট ছেলেকে যেভাবে ভোলায় সেইভাবে আমি একের পর এক মিথ্যা কথার জাল বুনে যেতে বাধ্য হলাম। বললাম, "একটুও চিন্তা করবেন না, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সীমার সঙ্গে দেখা যাবে আপনার।"

সহদেব ইতিমধ্যে আমাদের দুজনের জন্যে খাবার এনে হাজির করেছে। আমার ঘরে একখানা বাড়তি প্লেট অথবা জলের গেলাস নেই। শুধু খাবার এনে হাজির করলে আমাকে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যেতে হত। কিন্তু সহদেব আমাকে সে অবস্থায় ফেলেনি। নিজে থেকেই সে কাঁচের প্লেট ও ডিশে লুচি, বেগুন ভাজা, তরকারি, মিষ্টি ইত্যাদি সাজিয়ে এনেছে। সঙ্গে সুন্দর হালকা গোলাপী রঙের কাপ-ডিশ। ধূমায়িত চা টি পটের মধ্যে অপেক্ষা করছে।

সহদেবকে ধন্যবাদ জানাবো ভাবছিলাম। কিন্তু সহদেব এই অবস্থায় আমাকে বিপদে ফেলে দিল। একগাল হেসে বীরেনবাবুর সামনেই সে বলে ফেললো, সুলেখা দিদিমণি নিজে এই সব কাঁচের বাসন সহদেবের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আমি তো এবার শিউরে উঠেছি। বীরেন চাটুজ্যের কানে এই সব কথা প্রবেশ করলে যেকোনো বিপত্তির সৃষ্টি হতে পারে।

বিপদ আরও পাকিয়ে ওঠবার আগে আমি সহদেবকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলাম। বাসনপত্তর একটু পরে ফেরত নিয়ে যাবার অনুরোধ জানালাম তাকে।

যা আশঙ্কা করেছি তাই। খাবার মুখে পুরবার আগে সুলেখার নামটা নিজের মনেই উচ্চারণ করলেন সীমার বাবা। তারপর বললেন, "সুলেখাই সব গুছিয়ে দিয়েছে তাহলে। সীমা আসতে পারেনি।"

আমি একটা যোগ্য উত্তর বানাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই বীরেন চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, "সুলেখা তোমার আপন বোন?"

"মায়ের পেটের নয়—তবে আপন বোনই বলতে পারেন", বীরেন চ্যাটার্জিকে আমি উত্তর জুগিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

বীরেন চ্যাটার্জি বললেন, "সুলেখা নিশ্চয় তোমার কাছেই থাকে।"

কোনো রকমে উত্তর দিলাম, "এই তো ঘরের অবস্থা দেখছেন। এখানে দুজনের থাকা।"

"বুঝেছি, বুঝেছি", আমার মুখের কথা কেড়ে নিলেন বীরেন চ্যাটার্জি। "সুলেখা কাছাকাছি কোথাও থাকে।"

এবার সীমার বাবার দিকে খাবারের থালাটা এগিয়ে দিলাম। মুখে লুচি ও বেগুন ভাজা পুরতে পুরতে সীমার বাবা বললেন, "তোমার বোনই বুঝি খাবারের ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছে?"

আমি হাঁ না কিছুই না বলে উত্তর এড়াবার জন্যে লুচি বেগুন ভাজা

চিবিয়ে যাচ্ছি। বীরেনবাবু এবার আলু চচ্চড়ি মুখে পুরেই কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "এই আলু চচ্চড়ি কে রেঁধেছে? সুলেখা? না সীমা?"

আমার সামনে যেন ছোটখাট একটি বোমা ফাটলো। বীরেনবাবুর মুখে হঠাৎ এমন আশ্চর্য প্রশ্ন কেন? তিনি কী আমার বানানো সব গল্প ধরে ফেলবেন?

বীরেনবাবুর বন্ধ মুখ ইতিমধ্যেই আবার চলতে শুরু করেছে। আরও একটু আলু-চচ্চড়ি মুখে পুরতে পুরতে বললেন, "ঠিক যেন সীমার হাতে রাঁধা। কতদিন খাইনি, কিন্তু মুখে পুরতেই পুরনো স্মৃতি মনে পড়লো।"

সামান্য একটা মন্তব্যে আমাকে এতো বিচলিত দেখবেন প্রত্যাশা করেন নি বীরেনবাবু। আমি কিছুতেই উত্তর ঠিক করে উঠতে পারছি না।

বীরেনবাবু নিজেই শেষ পর্যন্ত বললেন, "তুমি বাবা চিন্তা কোরো না। আমারই হয়তো মনের ভুল। অনেক দিন জেলের গারদে থাকলে বোধ হয় মাথার ঠিক থাকে না। বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে আবার খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগে।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়ে কিছুক্ষণ মুক্তি পাওয়ার জন্যে সীমার বাবাকে বললাম, "আপনি এবার একটু বিশ্রাম নিন। ইচ্ছে করলে একটু মুখ হাত পা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন।" আমার ঘরের বাইরেই একখানা তোয়ালে ও একটা নতুন সাবান কিছুক্ষণ আগেই নজরে পড়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে সুলেখাই যে এগুলো রেখে গিয়েছে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীরেন চ্যাটার্জি রাজী হলেন। বললেন, "ঠিকই বলেছ। মেয়ে আমাকে যত ফ্রেশ দেখে ততই ভাল।"

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় বীরেন চ্যাটার্জি বললেন, "সীমার যদি দেরি হয়, তা হলে সুলেখার সঙ্গে দেখা করা যায় না? সীমার সব খবর নিশ্চয় ওর কাছে পাওয়া যেত।"

"আপনি তৈরি হয়ে নিন, সব খবর নিয়ে আমি এখনই আসছি", এই বলে কোনোক্রমে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাময়িক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

ঘড়ির কাঁটা দ্রুতবেগে কোন্ অজানা উদ্দেশে ছুটে চলেছে। আমি থ্যাকারে ম্যানসনের আপিস ঘরে বসে ছটফট করছি। এমন বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে কখনও এর আগে জড়িয়ে পড়িনি।

সীমার বাবার কথা স্মরণ হলেই আমার হাত-পা ঘেমে উঠছে। এই পরিস্থিতি থেকে শেষ পর্যন্ত মানসম্মান নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবো কিনা সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে রীতিমত সন্দেহ শুরু হয়েছে।

সুলেখার সঙ্গে আমার একান্তে দেখা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এতোক্ষণ ধরে সীমা ও সুলেখা সম্বন্ধে যত কথা বীরেনবাবুকে বলেছি তা তাকে বলতেই হবে। ওর কথাবার্তা একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ অনিবার্য।

আপিস ঘরে বসেও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার অজান্তে সুলেখার অতিথি যদি বিদায় নেন এবং বাবাকে দেখার উত্তেজনায় সুলেখা যদি সোজা আমার ঘরে চলে যায় তা হলে বিপদের অন্ত থাকবে না।

চৌত্রিশ নম্বরে যখন সশরীরে হাজিরা দেবার উপায় নেই, তখন সুলেখাকে একটা টেলিফোন করলে কী হয়? হাজার হোক মিস্টার চৌধুরী তো অনেকক্ষণ এসেছেন। আর কতক্ষণ তিনি এইভাবে সুলেখাকে ধরে রেখে তার বাবাকে অসহ্য যন্ত্রণা দেবেন? বোধ হয় সুলেখাকে একটা টেলিফোন করাই যুক্তিযুক্ত। কোনো রকমে ডিসটার্বড না হলে মিস্টার চৌধুরী যে কখন বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত নেবেন তা কেউ জানে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করছে।

টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করতে গিয়েও মনটা অকস্মাৎ ঘৃণায় ভরে উঠলো। মনে হলো, পতিতালয়ের নিকৃষ্টতম কর্মচারী হিসেবে কেমন সহজে আমি কাজ করে চলেছি। জেঠমালানি, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট, মিস্টার অর্জুন চৌধুরী, সুলেখা সেন সব মিলিয়ে যে কদর্য পরিস্থিতি এই সুসভ্য নগরীতে গড়ে উঠেছে, তার কোনো প্রতিকার নেই—প্রতিবাদও নেই। ঐশ্বর্যময়ী এই নগরীতে প্রতিকারহীন অন্যায়ের স্রোত কেমন অনায়াসে দিবা-রাত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে। দিনে দিনে এই অন্যায় বিপুল কৃতি লাভ করেছে, কিন্তু কোথাও কোনো প্রশ্ন নেই, নেই কোনো প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি।

অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থ্যাকারে ম্যানসনের সিমেন্ট বাঁধানো দীর্ঘ ড্রাইভওয়েতে কিছুক্ষণ পায়চারি করে নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে শত শত ওয়াটের আলো জ্বলতে শুরু করেছে। দূর থেকে এই আলো-আঁধারি এমন এক রহস্য সৃষ্টি করছে যার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই।

"সেলাম সাব", কে যেন এই অন্ধকারে আমাকে সেলাম ঠুকলো।

মুখ তুলে দেখলাম মদনা, তার ঝকঝকে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"কী এতো ভাবছেন, হুজুর?" মদনা এবার আমায় জিজ্ঞেস করলো। "দুবার আপনাকে সেলাম করলাম আপনি দেখতেই পেলেন না।"

মদনাকে শত দোষ সত্ত্বেও আমি ঠিক অপছন্দ করতে পারি না। ওর মধ্যে কোথায় একটা উষ্ণ আন্তরিকতা আছে যা কিছুতেই অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না।

মদনা বললো, "আমি জানি স্যর আপনি পোয়েট্রি লেখেন। পোয়েট্রি লিখতে হলে খুব ব্রেন খাটাতে হয়, আমি নিজের কানে শুনেছি। কিন্তু অত ভাববেন না, স্যর।"

"কেন? বলো তো?" মদনার উদ্বেগের কারণটা আমি বুঝতে পারি না।

"অত মাথা ঘামালে শরীর খারাপ হয়, হুজুর।" মদনা উত্তর দিলো। তারপর জানালো, "পোয়েট্রি লেখায় সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তবে যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে তা জানালেই সে ঝটাঝট তার সমাধান করে দেবে।" "এ বাড়ির কেউ যদি আপনার পিছনে লাগে আমাকে একটিবার তু' করে ডেকে পাঠাবেন—তারপর সে ব্যাটার টেংরি কিমা করে ছাড়বো!"

হাতের গোড়ায় আর কাউকে না পেয়ে মদনাকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মদনা তার আগেই আবার শুনিয়ে দিলো, "আমি যতক্ষণ এ বাড়িতে আছি ততক্ষণ আপনি একটুও ভাববেন না, স্যর।

"এখানে সব কিছু ঠিক মতো চলে না কেন বলো তো?" প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরোবার পরেই মনে হলো মদনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করাটা আমার উচিত হয়নি।

মদনা নিজেও কিছু বুঝতে পারছে না। "কী বলছেন হুজুর? ঠিক মতো তেল না দিলে কোনো কিছুই ঠিক মতো চলে না—কলকব্জার ব্যাপার তো।"

মদনাকে আর বোকার মতো প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করবো না। "মদনা, তুমি চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট চেনো?"

"সবই চিনি স্যার। তবে ওখানে ইস্পেশাল ব্যাপার। মাকালীর দিব্যি বলছি, ওখানে আমি কখনও নাক গলাইনি।"

একটু থেমে মদনা জানতে চাইলো, "কিছু দরকার আছে স্যার?"

কথাটা কীভাবে পাড়বো ভাবছি। মদনা নিজেই এবার আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "ওখানে হাউসফুল স্যার। বড় কোনো পার্টি এসেছে—আমি নিজের চোখে দেখেছি, কিছুক্ষণ আগে।"

বললাম, "মদনা, তোমাকে এখন ডিসটার্ব করতে হবে না। কিন্তু একটু নজর রাখবে? চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণির ঘর থেকে গেস্ট বেরোলেই আমি খবরটা চাই।"

মদনা সঙ্গে সঙ্গে বললো, "টেলিগ্রামের মতো খবর পেয়ে যাবেন স্যার। আমি এখনই সিঁড়িতে গিয়ে বসছি। দিদিমণির সায়েব ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় নামতে নামতে আপনার কাছে টেলিগ্রাম চলে আসবে।"

মদনা এবার দ্রুতবেগে ফয়ারের দিকে এগিয়ে গেলো এবং আমি আবার অফিস ঘরে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করলাম। কাজকর্ম সব মাথায় উঠেছে। সীমার বাবাকে মেয়ের হাতে নিরাপদে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত থ্যাকারে ম্যানসনের জমা-খরচের হিসেব আমার মাথায় ঢুকবে না।

সীমা তার বাবাকে নিয়ে আজ রাত্রে কী ব্যবস্থা করবে তাও জানি না। আমি নিজেই খাওয়ার যোগাড় করে রাখবো কিনা ভাবছি। পরের মুহূর্তে সহদেবের কথা মনে পড়লো। সে যখন জলখাবারের অমন ব্যবস্থা করলো, তখন রাত্রেও নিশ্চয় কোনো স্পেশাল আয়োজন হচ্ছে।

ঘড়ির দিকে আবার নজর পড়ে গেলো। এতোক্ষণেও মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর বিদায় নেবার সময় হলো না? হঠাৎ সন্দেহ হলো, মদনা এখনও সিঁড়িতে বসে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে ঠিক মতো নজর রেখেছে তো?

মদনার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। সুতরাং অগতির গতি টেলিফোনটাই এবার ব্যবহার করবো কিনা ভাবছি।

টেলিফোনের রিসিভারটা সবে হাতে তুলে নিচ্ছি এমন সময় পুরনো কণ্ঠস্বর। ফোন করা হলো না। ঘাড় ফিরিয়ে যাঁকে দেখলাম আজ তাঁকে এই সময় আমি মোটেই আমার অফিস ঘরে প্রত্যাশা করিনি।

"নমস্কার। কেমন আছেন?" মিস্টার আর সি ঘোষ তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময় করলেন।

"আরে! আপনি! এমন সময়?" ঘোষ মশায়কে দেখে সত্যিই আমি একটু অবাক হয়ে গেছি।

আর সি ঘোষ আজ তাঁর মার্কামারা ময়লা পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরেন নি। চকচকে সাজসজ্জায় তাঁকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে।

"আপনার না ছুটিতে কলকাতার বাইরে থাকবার কথা" আমি জিজ্ঞেস করি আর সি ঘোষকে। হাজার হোক হাওড়া হাজার হাত কালীতলার লোক তিনি—ওঁর সঙ্গে অন্য পাঁচজন ভাড়টের মতো কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না।

আর সি ঘোষ বললেন, "টেলিফোনটা সেরে নিন, তারপর কথাবার্তা হবে।"

কিন্তু পৃথিবীর অন্য কারও উপস্থিতিতে সুলেখাকে টেলিফোন করা যায় না। মনে মনে বললাম, 'তোমার নামে ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটেই যত রকম গোলমাল হচ্ছে। তোমার মালিকদের সর্বনাশা লোভের জালেই কিছুটা জড়িয়ে পড়েছি আমি এবং কষ্ট পাচ্ছি।'

আর সি ঘোষকে চটপট বিদায় করে দেওয়া যাক—না হলে টেলিফোনে সুলেখার সঙ্গে যোগাযোগে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

"কলকাতার বাইরে যান নি আপনি?" আবার জিজ্ঞেস করি আর সি ঘোষকে।

উত্তরে তিনি যা বললেন, তার সার মর্মঃ তিনি গিয়েছিলেন এবং আজ কিছুক্ষণ আগে ফিরেও এসেছেন।

ধবধবে জামাকাপড় পরলেও আর সি ঘোষের মুখে চিন্তার ছায়া পড়েছে। আমি বললাম, "কী? মেয়ের কাছে গিয়েও আপিসের কাজকর্মের কথা ভাবছিলেন নিশ্চয়!"

"দিশী আপিসের চাকরি, মশাই। দুশ্চিন্তা ত্যাগ করবো বললেই কি ত্যাগ করা যায়?"

এই পর্যন্ত সহজভাবেই বললেন আর সি ঘোষ। তারপর ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললেন, "আপনার ভাড়াটা নিয়ে নিন, মশায়। মাসের শেষ তারিখ, আজই দেনাটা শোধ করে দিই।"

এই ভাড়াটা ঠিক দিনে দেবার জন্যে ভদ্রলোক ছুটির মধ্যে অত দূর থেকে চলে এসেছেন, ভাবতে আমার খুব কষ্ট হলো। বললাম, "আপনাকে তো বলেইছিলাম, কোনো চিন্তা নেই—ছুটি থেকে ফিরে এসে আমাকে ভাড়া দেবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আমাকে আপনার মালিকরা বিশ্বাস করতে পারলেন না বুঝি?" আমার গলায় বোধ হয় একটু অভিমান ফুটে উঠলো।

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আর সি ঘোষ। "না না, ব্যাপারটা মোটেই ওরকম নয়। আসলে গত রাতে খুকু কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখলো। একে ভোরবেলার স্বপ্ন, তার ওপর জামাই সম্পর্কে। দুশ্চিন্তা হবারই কথা। তা আমি বললাম, অত চিন্তা করবার কী আছে? দুজনে হুট করে একবার কলকাতা ঘুরেই আসা যাক। তোমার মা এখানে বাড়ি ঘর পাহারা দিক। মেয়ে প্রথমে রাজী হচ্ছিল না—সামান্য একটা স্বপ্নের জন্যে এতো কাণ্ড। তা আমি তখন নিজের কাজের ছুতো তুললাম। বললাম, একবার ঘুরে এলে ভালই হয়। আপিসের একটা জরুরী কাজ আমি সেরে ফেলতে পারি।"

টাকাগুলো গুনে গুনে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন আর সি ঘোষ এবং আমি গুনে গুনে তা ড্রয়ারে পুরে ফেললাম।

এই পর্যন্ত ভালই চললো। ভাবলাম রসিদখানা হাতে নিয়ে আর সি ঘোষ এবার ঝটপট বিদায় নেবেন। কিন্তু অকস্মাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো। আর সি ঘোষ এমন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসলেন যার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আর সি ঘোষ কথায় কথায় জানতে চাইলেন, আমি কতক্ষণ অফিস ঘরে বসে আছি? তা বেশ কিছুক্ষণ এখানে আছি শুনে এবার তিনি সোজা-সুজি জিজ্ঞেস করলেন, চৌত্রিশ নম্বরে কাউকে আসতে দেখেছি কিনা আমি।

প্রশ্নটা শোনামাত্রই হঠাৎ আমার গা শিরশির করে উঠলো। অর্জুন চৌধুরীকে চেনা-চেনা মনে হওয়ার যে রহস্য কিছুতেই স্মরণ হচ্ছিল না তা মুহূর্তের মধ্যে মনের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠলো। অর্জুন চৌধুরীর ছবি আমি এই আপিস ঘরে বসেই যে আর সি ঘোষের কাছে দেখেছি তা মনে পড়তেই কনকনে ঠাণ্ডা অস্বস্তিতে শরীর ভরে উঠলো। অর্জুন চৌধুরীকে আমি কীভাবে ভুলতে পারি? তিনি যে আমাদের হাওড়ার জামাই।

মনে পড়লো, আর সি ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনে জামাইগর্বে গরবী আর সি ঘোষ পকেট থেকে মেয়ে-জামাইয়ের যুগল ছবি বার করে আমাকে দেখিয়েছিলেন। বিয়ের কয়েক দিন পরেই তোলা সেই ছবি দেখে আমি জামাইয়ের তারিফ করেছিলাম। আনন্দে ডগমগ আর সি ঘোষ খুশী হয়ে বলেছিলেন, "রূপে, গুণে, বিনয়ে সব দিক থেকেই সেরা আমার জামাই। আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন সুখে থাকে ওরা।"

সেই অর্জুন চৌধুরী এই ক'বছরে অবশ্যই একটু পালটেছেন, একটু মোটাও হয়েছেন, কিন্তু মুখের আদল মোটেই পালটায়নি।

পাকেচক্রে আর সি ঘোষের জামাই নিজেই চৌত্রিশ নম্বরে পদধূলি দিয়েছেন, ভাবতেই আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। আজ সকাল থেকে পরের পর এতো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যার সঙ্গে তাল রেখে চলা আমার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

"কী হলো মশাই? অমন মুখ কালো করে ফেললেন কেন?" আর সি ঘোষের প্রশ্ন এবার যেন আমাকে চাবুক মারছে। তিনি কী ব্যাপারটা আমার মুখ দেখেই ধরে ফেললেন?

আমার ইচ্ছে করছে কোনো কথা না বলে এখান থেকে পালিয়ে যাই। আর সি ঘোষ এখানে হঠাৎ এসে পড়েছেন, না কোনো কিছু সন্দেহ করে ছুটে এসেছেন তাও বুঝতে পারছি না।

আর সি ঘোষ একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললেন। বললেন, "কী ব্যাপার? আপনার মুখ আরও কালো হয়ে উঠছে কেন?"

আমার মুখের আয়নায় মনের সব গোপন কথা ফুটে উঠছে নাকি! আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই।

এবার অবস্থার পরিবর্তন হলো। আর সি ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি রাগ করলেন?"

"না, রাগ করবো কেন?" বিমর্ষভাবে উত্তর দিই।

ঘোষ বললেন, "রাগ করবার অধিকার আছে আপনার। আপনি লোকটা কেমন তা আমি অ্যাদ্দিনে চিনে গেছি। কোন ফ্ল্যাটে কে কখন আসছে আপনার কাছে তার খোঁজ করলে স্বাভাবিক কারণেই রাগ হতে পারে।"

আমি সত্যিই বেচারা আর সি ঘোষের ওপর রাগ করতে পারছি না।

মেয়েজামাইয়ের স্বপ্নে যিনি বিভোর হয়ে আছেন, তাঁর জামাইকে চৌত্রিশ নম্বরের দরজার সামনে দেখার পরে আমি কেমন করে তাঁর ওপর রাগ করতে পারি ?

ভাগ্যের যে পরিহাস এই মুহূর্তে আমাকে জ্বালা দিচ্ছে, তা হলো, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের খোদ ভাড়াটে নিজেই তাঁর ঘরের অতিথি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন অপরের কাছে।

আমার মুখ ইতিমধ্যে নিশ্চয় আরও কালো হয়ে উঠেছে—কারণ, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কী বলবো, কতটুকু বলবো, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

একবার মনে হচ্ছে যতটুকু জানি সবই বলে দিই। আবার মনে হচ্ছে বলি "আপনিই তো ঘরের মালিক। যা-কিছু জানবার সে তো আপনি নিজে গিয়ে এই মুহূর্তেই জানতে পারেন।"

এমনই এক নাটকীয় মুহূর্তে শ্রীমান মদনা হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সমস্ত কিছু আরও গোলমেলে করে তুললো।

মদনা বললো, "চৌত্রিশ নম্বর থেকে সায়েব বেরিয়েছেন। আপনার কার সঙ্গে দরকার ? সায়েবের সঙ্গে দরকার হলে, এখনই চলুন। সায়েব ট্যাক্সির জন্যে দু নম্বর গেটের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন।"

মদনাকে সামলাবার কোনো সুযোগই পেলাম না আমি। এবং ইতিমধ্যে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আর সি ঘোষ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। এবং আমি অজানা আশঙ্কায় এই অন্ধকার রাত্রে শিউরে উঠলাম।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলো। মদনার কথা শুনতে শুনতে পুরো নজরটা ওর দিকেই চলে গিয়েছিল। সুলেখার ঘর থেকে অর্জুন চৌধুরী কখন বেরিয়ে আসেন জানাটাই আমার সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মদনার সংবাদ যে আর সি ঘোষকেও অমন বিদ্যুৎবেগে ঘর থেকে বার করে দেবে তা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

আর সি ঘোষের নিষ্ক্রমণ বেগ আমার মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করছে। এই মুহূর্তে আমার কর্তব্য কী? বোধ হয় ছুটে গিয়ে ঘোষমশায়কে পাকড়াও করাটাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সুলেখার কথাও আমাকে ভাবতে হচ্ছে। সুলেখার মনের অবস্থা কী হয়ে আছে, তাও আমার অজ্ঞাত নয়। মুহূর্তের দেরিতে ওখানেও বৃহত্তর বিপদের সমূহ সম্ভাবনা খাঁড়ার মতো ঝুলছে। সুলেখা যদি নিজের উত্তেজনায় ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে আসে এবং আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমার অনুপস্থিতিতে পিতা-পুত্রীর যদি মিলন হয় ; তাহলে সীমাকে আমি অম্লান রাখতে পারবো না।

এইসব ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ দেরি করে ফেলেছি। তারপর যখন অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম তখন কোথায় আর সি ঘোষ? সিমেন্ট-বাঁধানো বিশাল করিডরের ক্লান্ত আলোগুলোও আমার সঙ্গে অসহযোগিতা করছে—ইচ্ছে করেই যেন তারা গো-স্লো চালাচ্ছে। মাটির প্রদীপের মতো

টিমটিমে ওই আলোতে কয়েক হাত দূরেও তেমন নজর যাচ্ছে না এবং এই অস্পষ্ট আলো আঁধারির মধ্যে আমার পাড়ার লোক হাওড়া হাজরা-হাত কালীতলার আর সি ঘোষ কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক তাঁর ভাড়ার রসিদখানাও সঙ্গে নিতে পারেননি।

কোন্ দিকে যাবো ভাবছি। আর সি ঘোষ মশায় কি দুনম্বর গেটের দিকেই ট্যাক্সি জন্যে অপেক্ষমান অর্জুন চৌধুরীকে নিজের চোখে দেখবার জন্যে ছুটলেন ? না, অন্য কোথাও ? আরও একটা বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা মুহূর্তের জন্য মাথার মধ্যে খেলে গেলো। মনের এই অবস্থায় আর সি ঘোষের মতো মানুষের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব না হতে পারে।

মদনাও আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। সে জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো হুজুর? দিদিমণির ঘর থেকে যে-লোকটা বেরিয়ে এলো, সে খুব পাজী নাকি ? হুকুম করুন, এখনই আটকে দিচ্ছি ওঁকে!"

বিরক্ত কণ্ঠে মদনাকে চুপ করতে বললাম। আমি কি করবো নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। ইতিমধ্যে আরও বিপদ। দেখলাম, অন্ধকারের মধ্য থেকে সীমার বাবা হঠাৎ আমার সামনে হাজির হলেন।

"আপনি ? এখানে ?" আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম সীমার বাবাকে। তিনি যে হঠাৎ এইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তা আমি ভাবিনি।

সীমার বাবা কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। তিনি শুধু গম্ভীরভাবে আমার এবং আমার সঙ্গী শ্রীমান মদনার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সীমার বাবা হঠাৎ বলে ফেললেন, "এ কোথায় আমাকে এনে ফেললেন ? সীমা কোথায় ?"

সীমা এখনই আসছে এমন আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলাম সীমার বাবাকে। কিন্তু তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না আমার কথায়। তিনি আমার সঙ্গীটির দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকালেন।

এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই লোকটিকে আপনি চেনেন ?"

"তা আমার একটু-আধটু জানাশোনা আছে, মেসোমশাই।" এই বলে প্রসঙ্গটা কোনোরকমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

মদনা এবার আঁতকে উঠলো। "অ্যাঁ ইনি আপনার আত্মীয় ? খুব ভুল হয়ে গেছে স্যর। মা কালীর দিব্যি, আর কখনও এমন হবে না। এবারের মতো মাপ করে দিন, দাদু," এই বলে মদনা সোজা গিয়ে বীরেনবাবুর পা জড়িয়ে ধরলো।

"ছাড়, ছাড়" বিরক্তভাবে বীরেনবাবু তাঁর পা সরিয়ে নিলেন।

মদনা আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদ-কাঁদ ভাবে বললো, "আমি স্যর খবরই পাইনি যে আপনার মেসো এখানে এসেছেন। একটু আগেই ওঁকে একা একা ঘুরতে দেখলাম। কিছু কথা বলছেন না, কিন্তু মনে হলো কাউকে খুঁজছেন।"

"মদনা!" রাগে আমার দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠলো।

মদনা আরও ভয় পেয়ে ফিস ফিস করে বললো, "আপনি সব শুনে তারপর আমাকে জুতো মারুন। আমি স্যর অচেনা পার্টিকে সন্ধ্যের পর ঘুর-ঘুর করতে দেখে দু-বার সিগন্যাল দিলাম। উনি তখনও 'না' বললেন না, বরং আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি স্যর ততক্ষণে ভুল বুঝে বসে আছি। আমার মাথায় তো অত বুদ্ধি নেই, স্যর।"

"দূর হও এখান থেকে", চীৎকার করে উঠলাম আমি। মদনা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো, কিন্তু যাবার আগে আমাদের দুজনকেই দুখানা দ্রুত সেলাম ঠুকে দিলো।

বীরেন চাটুজ্যে জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটি কে ?"

আমি আমতা-আমতা করছি। "ওর বাবা এখানকার সুইপার। এখানেই থাকে। পাঁচ রকম লোক নিয়েই তো এই ম্যানসনের কাজকারবার।"

বীরেন চাটুজ্যে বললেন, "কি জানি বাবা! জায়গাটা আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। আমার কাছে এসে ছোকরা জিজ্ঞেস করলো, 'প্রাইভেট' চাই কিনা। আমি প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ভাবছি, প্রাইভেট ট্যাক্সি বুঝি। অনেক সময় আসানসোলে ওরকম গাড়ি পাওয়া যায়।"

লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

বীরেন চাটুজ্যে এবার গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, "তোমার বোন সুলেখাকে এখানে রেখেছো কী করে? জায়গাটা আমার তেমন সুবিধে মনে হচ্ছে না।"

আমি এবারও নিরুত্তর। বীরেন চাটুজ্যেকে কোনোরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে ফেরত পাঠানোই এখন আমার প্রথম কাজ।

কিন্তু সীমার বাবা আমার অফিস ঘরের দিকেই এগিয়ে চলেছেন। যেতে যেতে বলছেন, "কলকাতা শহরটা এতো খারাপ হয়ে গিয়েছে আমার ধারণা ছিল না। ছোটবেলায় আমিও তো কতবার এই শহরে এসেছি। তখন তো একটা দুগ্ধপোষ্য বালক এসে এইভাবে একজন বুড়োলোককে জিজ্ঞেস করতে পারতো না, প্রাইভেট লাগবে কিনা।"

সীমার বাবা বললেন, "আমি একটু আগেই একবার তোমার অফিসে উঁকি মেরেছি। কিন্তু তখন তোমার সামনে কে যেন বসে ছিলেন।"

আর সি ঘোষের পরিচয় দিলাম না ওঁকে। বললাম, "ম্যানেজারের কাজ। কত লোক আসে আর যায়।"

সীমার বাবা বললেন, "তোমরা বাইরে একটু আলো বাড়াও। ভদ্রলোক বাইরে এসে যেভাবে হোঁচট খেলেন! অত তাড়াতাড়ি কিসের? যেভাবে ছুটছিলেন ভদ্রলোক—আমি এসে ধরে তুলে দিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে মৌখিক ধন্যবাদটুকুও জানালেন না—আবার ছুটতে শুরু করলেন। কলকাতার লোকদের হাতে বুঝি একটুও সময় থাকে না?"

সীমার বাবাকে বললাম, "আর একটুও দেরি করবেন না। হয়তো সীমা এতোক্ষণে আমার ঘরে এসে গিয়েছে। আপনাকে না দেখলে সে ভয় পেয়ে যাবে।"

বীরেন চ্যাটার্জি সীমার নাম শুনে আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। আমাকে একলা ফেলে রেখে ছুটলেন তাঁর অস্থায়ী ডেরায়।

সুলেখার কথা এবার আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি। যন্ত্রের মতো আমার পা দুটো ক্রমশ চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকেই এগিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে কেন আমাকে পাঠাচ্ছ, ঈশ্বর? সব জেনে শুনে একটা অসহায় অপমানিত মেয়ের মুখোমুখি আমি দাঁড়াবো কী করে? কিন্তু আমাদের মতো ছোটখাটো মানুষের কোনো প্রশ্ন ঈশ্বরের কানে পৌঁছয় বলে মনে হয় না। নেশার ঘোরেই যেন আমি সুলেখার ফ্ল্যাটের দিকে ক্রমশ

এগিয়ে চলেছি।

দরজায় সামান্য টোকা দিয়েছি। বেল-বাজানোর প্রয়োজন হয়নি—কারণ ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসে বুঝিয়ে দিচ্ছে, দরজা খোলাই রয়েছে।

"সুলেখা", আমি এবার চাপা গলায় ডাক দিলাম।

একটা ক্লান্ত অবশ কণ্ঠ এবার কোনোক্রমে সাড়া দিলো, "আসুন।"

সুলেখা এখনও কেমনভাবে বিধ্বস্ত শয্যার ওপর ততোধিক বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বুঝলাম, বিশিষ্ট অতিথি বিদায় নেবার পরে সুলেখা এখনও উঠে বসেনি। চৌত্রিশ নম্বরের দরজা তাই এখনও এমনভাবে খোলা পড়ে রয়েছে।

থ্যাকারে ম্যানসনের এখন যা নামডাক তাতে রাতের অন্ধকারে এইভাবে দরজা খুলে রাখা নিরাপদও নয়।

আমার সাবধানবাণী শুনে সুলেখা কোনো উত্তর দিলো না, কিন্তু এমন-ভাবে হাসলো যে মনে হলো এতোক্ষণ ধরে আমি তার সঙ্গে রসিকতা করছি।

আমাকে দেখে সুলেখা তার বিশৃঙ্খল বেশবাসের ওপর একটা পাতলা চাদর টেনে নিল। দেখলাম মেঝের ওপর কবিতার বইখানা গড়াগড়ি যাচ্ছে। নিচু হয়ে বইখানা মেঝে থেকে তুলে নিতে গেলাম। সুলেখা বললো, "আপনি কেন কষ্ট করছেন? আমি এখনই সব ঠিক করে ফেলবো।"

সুলেখা এবার চাদরটাকে দেহ থেকে না সরিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসবার চেষ্টা করলো। ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছি কী জানতে চাইছে ও।

আমি সস্নেহে বললাম, "কোনো চিন্তা নেই। বাবা এসে গিয়েছেন। তিনি আমারই ঘরে আপনার রান্না খেয়ে চুপচাপ বিশ্রাম নিচ্ছেন।"

সুলেখা এবার হঠাৎ অব্যক্ত যন্ত্রণা অথবা লজ্জায় বাঁ হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো কিছুক্ষণ ঢেকে রইলো। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বললো, "গত জন্মে আপনি আমার কে ছিলেন বলুন তো?

চোখ দিয়ে কান্না বেরিয়ে আসছে আমার। বহু যুগের ওপার হতে কে যেন আমাকে একই প্রশ্ন করছে, গত জন্মে আমি কি তোমার কেউ ছিলাম?

কিন্তু এখন ভাবালুতার সময় নয়। চোখের জলের উৎসমুখে নিস্পৃহতার ভারি লকগেটখানা মুহূর্তের মধ্যে নেমে এলো। এখন যে অনেক কাজ বাকি।

দ্রুতবেগে আমি সব বলতে আরম্ভ করেছি। তারই মধ্যে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি সুলেখার কাছে। "আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে কিছুক্ষণও একলা থাকতে দিইনি—আপনার অতিথি বেরনোর খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে এসেছি।"

"ক্ষমা! ক্ষমাই বটে!" সুলেখা ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়ে হাসতে গিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিকে অকস্মাৎ আরও বিষণ্ণ করে তুললো।

সুলেখাকে এবার আমি বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করেছি। জেল-খানার গেট থেকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আমার ঘরে বীরেনবাবুর আসা পর্যন্ত কোনো বিবরণই বাদ দিলাম না। সুলেখার সব কিছু জেনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কিন্তু সুলেখা ওই সব বিবরণ জানবার আগেই প্রশ্ন করলো, "ওসব পরে

শুনবো। আগে বাবা কেমন আছে বলুন।”

“মেসোমশাই বেশ ভালই আছেন”, আমি শান্তভাবে উত্তর দিই।

গায়ের চাদরটা ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে সুলেখা জানতে চাইলো, “বাবা ভেঙে পড়েননি তো? বাবা যা অভিমানী মানুষ!”

“আঘাত দেবার সময় ভগবান আঘাত সহ্য করবার শক্তিও অলক্ষ্যে যুগিয়ে যান সুলেখা।” নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যাপারটা কয়েকবার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

“হবেও বা!” সুলেখা এমন উদাসীনভাবে আমার কথাগুলো মেনে নিলো যে, আমার মনের মধ্যে সন্দেহের নিরসন হলো না। দেহ মনে এই-ভাবে বিধ্বস্ত না-থাকলে সে বোধ হয় প্রতিবাদ জানাতো কিন্তু এখন তার সেই সামর্থ্য নেই। সুলেখার সঙ্গে তর্ক করার মতো মানসিক অবস্থা আমারও নেই। তাকে একের পর এক সব বলে যাচ্ছি। সীমা ও সুলেখা যে এখন থেকে আলাদা সেকথা এবার বলতে যাচ্ছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

এখন আবার কে টেলিফোন করছে? সমস্ত দিনটা আজ সুলেখা কীভাবে ধকল সয়েছে তা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এর পরেও বেচারার দুদণ্ডের শান্তি নেই।

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে এবং সুলেখা আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। মনে হলো বেচারা বড় ক্লান্ত। ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনটা আমিই ধরি।

আমাকে এগোতে দেখে সুলেখা বারণ করলো। ”আপনি ধরবেন না। আমার ফোন থেকে অচেনা পুরুষমানুষের গলা শুনলে আবার কি বিপত্তি হবে ঠিক নেই!”

সুলেখা এবার বিছানা থেকে নামবার আগে শাড়িটা ঠিক করে নিতে লাগলো।

“এতো রাত্রে এখন আবার কে?” আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন করি।

সুলেখা টেলিফোনের দিকে এগোতে এগোতে বললো, “হয়তো মিস্টার অর্জুন চৌধুরী। কোনো কোনো অতিথি বাড়িতে ফিরেই এইভাবে ফোন করেন। সামনাসামনি মুখ গম্ভীর করে বসে থাকবেন, যত কথা দূর থেকে। টেলিফোনে সব কথা নিরাপদ নয়, কিন্তু সেসব কথা কারও কানে ঢোকে না। চোখের আড়াল থেকে নিজের খেয়ালখুশি মতো বক বক করে যান।”

আমি সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি সুলেখার দিকে। সুলেখা বললো, “আমাদের সব দুঃখের কথা শুনলে পাথরের চোখেও জল এসে যাবে। রাজুবাবুর গেস্টও আজ বিকেলে ফোন করেছিলেন—কিছুতেই লাইন কাটেন না। এদিকে ক্রসকানেকশন হয়ে গিয়েছে। আমাদের কথাবার্তায় আড়ি পেতে অচেনা লোকটার কী হাসি। রাজুবাবুর গেস্টকেও যত বলি কথা কমাতে, তাঁর খেয়ালই হয় না—কথা বলছেন তো বলেই চলেছেন।”

যে-সুলেখা এবার এগিয়ে এসে টেলিফোন ধরলো সে যেন অন্য কোনো রমণী। তাঁর ক্লান্তি ও তিক্ততা মুহূর্তে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেলো—যেন এই টেলিফোনে কথা বলবার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল।

টেলিফোনের অপর পারে কিন্তু মিস্টার অর্জুন চৌধুরী নয়। স্বয়ং মিস্টার জেঠমালানি নিজেই ফোন করে সদ্যসমাপ্ত নাটকের খবরাখবর নিচ্ছেন।

সুলেখা বলছে, "না না, কোনো অসুবিধাই নয়। আপনার ভি আই পিকে বিদায় দিয়ে চুপচাপ বসে আছি।"

মিস্টার জেঠমালানি বোধ হয় এবার অতিথি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

সুলেখা বললেন, "আপনি কিছু চিন্তা করবেন না—আপনার কোন্ অতিথি এখানে 'অ্যাট হোম' ফিল করেন না?"

এর পরেও কিছু কথাবার্তা হলো। তারপর ফোন নামিয়ে সুলেখা আবার বিছানায় এসে বসলো।

সুলেখা বললো, "মিস্টার জেঠমালানির ওটা মুদ্রাদোষের মতো। গেস্ট পাঠিয়েই জিজ্ঞেস করবেন উনি 'অ্যাট হোম' ফিল করেছেন কিনা। ওঁকে কতবার বলেছি, আপনার এই ফ্ল্যাটটা কি হোম, যে ওঁরা অ্যাট হোম ফিল করবেন? হোম কমফর্টের জন্যে এখানে যে কেউ আসে না এই সাধারণ কথাটা বৃদ্ধ বিজনেসম্যানের মাথায় ঢোকে না।"

মিস্টার জেঠমালানি এরপর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বিশিষ্ট অতিথি কখন এলেন, কতক্ষণ ছিলেন, মুড কী রকম ছিল।

এরপর আসল প্রশ্নটি। ইয়ংবেঙ্গল বিজনেস এনটারপ্রাইজের পারমিট সম্বন্ধে কী মনে হলো?

সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে বললো, "ফিকর্ মাত্ কীজিয়ে—পারমিট নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।"

জেঠমালানি এই কোম্পানিটি বেনামাতে চালিয়ে থাকেন। তিনি সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ঘুণাক্ষরে জেঠমালানি ট্রেডিং-এর নাম করোনি তো? খাতায় কলমে ইয়ং বেঙ্গল কোম্পানির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।"

"আপনার কোনো চিন্তা নেই, মিস্টার জেঠমালানি। মিস্টার চৌধুরী ভেবে নিয়েছেন, এটা একটা লোকাল প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে আমার কোনো ভাই-টাই আছে, তাই আমার এতো আগ্রহ।"

"ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল", খুব খুশী হয়েছেন মিস্টার জেঠমালানি। "সেই জন্যে বলি, তোমার কোনো তুলনাই হয় না, সুলেখা।"

এর পরেই টেলিফোন নামিয়ে দিয়েছে সুলেখা। "মিস্টার চৌধুরীকে পিকচারে রাখবার জন্যে আমার তো ঘুম ধরছে না।" তিক্ত মন্তব্য করলো সুলেখা। সে এখন বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছটফট করছে।

সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। পিতা-পুত্রীর সেই মিলন দৃশ্য আমার বহুবর্ণ স্মৃতির মণিকোঠায় বহু দিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সুলেখাকে চৌত্রিশ নম্বর ঘরে আবদ্ধ রেখে সীমা আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলো। সেই সীমা যার বিয়ের জন্যে বাবা আজও চিন্তা করছেন।

দু'জনে জড়াজড়ি করে ওরা অনেকক্ষণ চোখের জল ফেললো। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এতো দেরি করলি?"

সীমা কী একটা উত্তর দিতে গিয়েও পারলো না। বাবার কাঁধে মাথা রেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বাবা বললেন, "শুনলাম, তুই কাজকর্ম করছিস। খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়। তোকে মা, আমি কাজ করতে দেবো না। আমি একটা কিছু জুটিয়ে নিই। গাঁয়ের ইস্কুলে একটা মাস্টারি নিশ্চয় পাবো। তারপর দেশে যতটুকু জমিজমা আছে সব বেচে দিয়ে তোর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করবো।"

সীমা কিছুই উত্তর দিচ্ছে না। সে আরও ভেঙে পড়ছে কান্নায়।

সেই রাত্রে আমি আবার সাময়িক গৃহহারা হয়েছিলাম। সীমার ইচ্ছা নয় বাবাকে সে তার ঘরে ঢোকায়। সীমার সঙ্গে আমিও এক মত হয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম, "আপনারা আমার ঘরটাই আজ রাত্রে দুজনে ব্যবহার করুন।

সীমা জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি?"

"থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজারের একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে", আমি হেসে আশ্বস্ত করেছিলাম সুলেখাকে।

সুলেখার ইচ্ছা আমি চৌত্রিশ নম্বরে গিয়ে ফোম রবারের শয্যায় রাত্রি যাপন করি। কিন্তু কেন জানি না, ব্যাপারটা আমার তেমন ভাল লাগলো না। তার পরিবর্তে আপিস ঘরটা মন্দ নয়।

কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে এসে তাঁর কাজলকালো চোখ দুটো বড় বড় করে সীমা আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়েছিল। সে বলেছিল, "আমাদের সঙ্গে আজ খাওয়া-দাওয়াটা করুন আপনি।"

আমি রাজী হইনি। আজ রাত্রে ওদের দুজনকে আমি যতটা সম্ভব প্রাইভেসী দিতে চাই।

সীমার পাঠানো খাবার অফিস ঘরের টেবিলে বসে পরম আনন্দে উপভোগ করেছি। বাবার জন্যে সীমা আজ অনেক আয়োজন করেছে। এমন খাওয়া অনেকদিন আমার কপালেও জোটেনি। তারপর টেলিফোন ডিরেক-টরিকে মাথার বালিশ করে আলো নিভিয়ে টেবিলের ওপর নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েছি। বিনিদ্র রজনীতে চোখের সামনে আমার ঘরের সেই ছোট্ট তক্ত-পোষখানা ভেসে উঠেছে যেখানে সীমা ও তার বাবা কোনোক্রমে শুয়ে আছেন এবং দুজনের চোখের জল বাধা মানতে চাইছে না।

খুব ভোরবেলায় অফিস ঘরে লঘু পদক্ষেপে প্রবেশ করে যে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো তার নাম সীমা। আলতোভাবে ডানহাতের আঙুল দিয়ে সে আমাকে নাড়া দিয়েছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসেছি। মনে পড়লো শোবার আগে অফিস ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ করতেও ভুলে গিয়েছি।

সীমা স্নিগ্ধভাবে বললো, "রাত্রে ঘুম হয়নি তো? খুব কষ্ট পেলেন আমার জন্যে।"

আমি বললাম, "ক্যালকাটা টেলিফোন ডিরেকটরি মাথায় দিলে যে এমন চমৎকার ঘুম হয় জানতাম না। ওতে বোধ হয় ঘুমের ওষুধ মাখানো থাকে।"

সীমা সস্নেহে বললো, "আপনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। ভাবলাম, আমার ঘর থেকে আপনাকে বালিশ পাঠিয়ে দিই। কিন্তু পরে মনে হলো, ওসব জিনিস আপনাকে দেওয়া যায় না।"

সীমা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ বললো, "আজ এখনই বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। আমাদের গ্রামে বিধবা পিসিমা আছেন, ওখানেই ওঁকে রেখে আসবো।"

একটু থামলো সীমা। "আপনার বোন সুলেখাকে বাবা দেখতে চান। আমি বলেছি সে এখন খুব ব্যস্ত। তাছাড়া মেয়েটা যেন কেমন! সে কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় না।"

ট্যাক্সির শব্দে আমার সংবিৎ ফিরে এলো। আমার অফিসের সামনে সুলেখা ট্যাক্সি থামিয়ে দিয়েছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে সকৃতজ্ঞ সুলেখা শান্তভাবে আমার দিকে তাকালো। তারপর মুহূর্তের জন্যে বেরিয়ে এসে ফিস ফিস করে আমাকে বললো "ফ্ল্যাটের চাবিটা সহদেবের কাছে রইলো। জেঠমালানিদের কেউ খোঁজ করলে বলে দেবেন।"

সুদূর কোনো গ্রামে সুলেখার সামান্য আশ্রয় মিলতে পারে জেনে একটু ভরসা পেলাম। বললাম, "পিসিমার ওখানে কোনো অসুবিধা হবে না বলছেন?"

গম্ভীরভাবে সুলেখা উত্তর দিলো, "একবার অন্তত নিজের চোখে গিয়ে দেখি।"

এক গভীর প্রশান্তিতে আমার মন হঠাৎ ভরে উঠলো। প্রার্থনা করলাম, থ্যাকারে ম্যানসনে এই যেন সীমার শেষ পদার্পণ হয়। কোনো এক অভিশাপে সীমা যেন কিছুদিন নরকে নির্বাসিতা হয়েছিল। নরক যন্ত্রণা সহ্য করবার পর এবার তার মুক্তি আসন্ন।

হে করুণাময়, শেষের দৃশ্যটি সুন্দর করে দাও। বাবাকে পাশে বসিয়ে, থ্যাকারে ম্যানসনকে পিছনে ফেলে রেখে সীমা বিরাট বিশ্বে মিলিয়ে গেলো —এই অভিশপ্ত পুরী ছাড়া আর কোথাও তার অন্ধকার জীবনের কোনো প্রমাণ রইলো না।

আমি দেখলাম, সীমার বাবা মেয়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ভোরের কলকাতার দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে রইলো। সীমার নির্দেশে ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো।

সীমা, এই যে তুমি গেলে, যদি আর এখানে না ফেরো, তাহলে কেমন হয়? 'সীমা, তুমি এখানে আর ফিরো না'—আমার মনটা অবুঝের মতো চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু সংসারে কে কোথায় ফিরবে তার অংক তো আমি কষি না? আমার কথা কে শুনবে?

ভোরবেলায় এমন অবসন্নভাব অনেকদিন অনুভব করিনি। এই একদিনে আমার অভিজ্ঞতার পরিধি যেন অনেক বিস্তৃত হল।—পৃথিবী সম্বন্ধে এতো না-জানলেই যেন ভাল হতো আমার।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে এসেছি। ওখানে কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজেছি এমন সময় একটা সুইপার এসে বললো, "জেঠমালানি কোম্পানি থেকে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

বুঝলাম, চৌত্রিশ নম্বরের চাবির খোঁজে। চোখ না খুলেই উত্তর দিলাম, "বলে দাও ফ্ল্যাটের চাবি সহদেবের কাছে আছে, ওখান থেকে নিতে।"

লোকটা তখনকার মতো চলে গেলো। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এলো। নাটকের আর এক পর্বের তখন সবে শুরু।

বিনিদ্র রজনীর শেষে ভোরবেলায় কিছুক্ষণ বাড়তি শয্যাবিশ্রাম আমার কপালে নেই। যাকে চাবির খবর দেওয়া হয়েছে সে জেঠমালানি কোং-এর লোক।

ঘরে যে ঢোকা দিল সে সুইপার, জেঠমালানির লোককে সেই চাবির খবর দিয়ে এসেছে।

কালীচরণ বললো, "সেই লোকটা, যাকে আপনি বলতে বললেন, চৌত্রিশ নম্বরের চাবি সহদেবের কাছে আছে।"

"জেঠমালানি কোম্পানির লোকটা, একটু আগে যার কথা তুমি আমাকে বললে ?"

কথায়-কথায় ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ রাখা আমার অভ্যাস নয়, কারণ বারবার উঠে খিল খুলতে আমার ভাল লাগে না। এখনও আমার দরজা ভেজানো ছিল। আমার সম্মতিসূচক কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই দরজা ঠেলে সুইপার আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

আমাকে এই রকম সময়ে শয্যাশায়ী দেখতে অনভ্যস্ত কালীচরণ জিজ্ঞেস করলো, আমার শরীর খারাপ কিনা ?

গরীবের গতর ছাড়া আর কোনো মূলধন নেই, সুতরাং কথায়-কথায় শরীর খারাপ করলে চলবে কেন ? কালীচরণ কিন্তু আমার রসিকতায় আশ্বস্ত হলো না। বললো, "শরীর খারাপ থাকলে লোকটাকে এখনই বিদায় করে দিচ্ছি। বলে দিচ্ছি সামনের সপ্তাহে আসতে।"

"কোন্ লোক, কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ? এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমি কিছুই জানি না, কালীচরণ।"

কালীচরণ বললে, "সেই লোকটা, যাকে আপনি বলতে বললেন চৌত্রিশ নম্বরের চাবি সহদেবের কাছে আছে।"

"জেঠমালানি কোম্পানীর লোকটা, একটু আগে যার কথা তুমি আমাকে বললে ?"

"হ্যা, হুজুর। তবে, কোন্ কোম্পানির লোক বলতে পারবো না।" এর জন্যে সে দুঃখও করলো। কলকাতায় নাকি এতো কোম্পানি যে বেচারা কালীচরণ নাম মনে রাখতে পারে না।

"কেন ? সহদেবের কাছে যান নি ভদ্রলোক? চাবি পান নি?" আমি বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করি। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের চাবি কার কাছে আছে, মিস্টার জেঠমালানির কর্মচারীকে সে সম্বন্ধে খবরাখবর দেওয়া মোটেই আমার কাজ নয়। সুলেখা শেষ মুহূর্তে খবরটা যথাস্থানে দেবার অনুরোধ না করলে, লোকটার কোনো প্রশ্নের উত্তরই দিতাম না আমি।

মনে পড়লো চাবির দায়িত্বটা আমার ঘাড়েও চাপতে পারতো। কিন্তু সুলেখা আমাকে ও ব্যাপারে জড়িয়ে যায় নি। কিছু দিন আগে সুলেখা কোথায় যাবার আগে আমার কাছে কিছুক্ষণের জন্যে ফ্ল্যাটের চাবিটা রেখে যেতে চেয়েছিল। আমি সুলেখাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, এ বাড়ির ম্যানেজার হিসেবে কোনো ভাড়া-দেওয়া ঘরের চাবির জিম্মাদারি করাটা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। "আপনার অনুপস্থিতিতে ফ্ল্যাটে কিছু ঘটলে

তার দায়িত্বটা আমার ওপর এসে পড়বে—অথচ এই ম্যানসনের মালিক আমাকে সে রকম দায়িত্ব নিজের মাথার ওপর নেবার মতো ক্ষমতা দেননি।”

কথাগুলো সুলেখা নানা কাজের মধ্যেও ভুলে যায় নি। তাই শেষ মুহূর্তে আমাকে বিব্রত না করে চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা সহদেবের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। সহদেবের খবরটা যদি সকলে না জানতে পারে, অথবা তাকে যদি যথাসময়ে খুঁজে না পাওয়া যায় এই আশঙ্কায় সংবাদটা আমাকেও সে বলে গিয়েছে। সুলেখা জানে, জেঠমালানি কোম্পানির ড্রাইভার বা বেয়ারা কেউ এলে আমার অফিস ঘরে একবার খোঁজ করবেই।

“হুজুর!” কালীচরণ আবার নীরবতা ভঙ্গ করলো। “লোকটাকে আমি বলেই দিয়েছিলাম, সহদেবের কাছে চৌত্রিশ নম্বরের চাবি আছে। সেই না শুনে লোকটা খুব খুশী হলো। আপনাকে মিথ্যে বলবো না, ভদ্দরলোক আমাকে দু'টাকা বকশিস দিয়ে দিলেন।”

আচ্ছা! কালীচরণ এই স্পেশাল উৎসাহের কারণটা এতোক্ষণে তা হলে বোঝা যাচ্ছে। বিনা অনুপ্রেরণায় সে বারবার আমাকে এই সকালবেলায় বিরক্ত করবার ঝুঁকি গ্রহণ করছে না!

“তারপর?” আমি নিজেই এবার কালীচরণকে প্রশ্ন করি।

কালীচরণ বললো, “ভদ্রলোক তখন আর কোনো কথা না বলে হন্তদন্ত হয়ে সহদেবের খোঁজে চলে গেলেন। কিন্তু এখন দেখি আবার ফিরে এসেছেন। আমাদের আপিস ঘরের কাছে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায়? আপনার সঙ্গে দেখা না করে উনি বোধ হয় যাবেন না। আমাকে বললেন, আপনার সঙ্গে ওঁর খুব দরকার।”

জেঠমালানির মুনিমজীস্থানীয় কোনো লোক হবেন নিশ্চয়। জেঠমালানিদের কোনো লোকের সঙ্গে সাতসকালে দেখা করবার জন্যে ঘুম বিসর্জন দেবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিলাম, “আমি এখন বিশ্রাম নিচ্ছি কালীচরণ।”

কালীচরণ সঙ্গে সঙ্গে বললো, “আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে আরাম করুন, হুজুর। আমি লোকটাকে বলে দিয়েছি, মেনজার সায়েব এখন আরাম করছেন, কখন দেখা হবে কিছুই ঠিক নেই।”

কালীচরণ উপস্থিতবুদ্ধিতে বেশ খুশী হলাম। বললাম, “ঠিক উত্তর হয়েছে, কালীচরণ। এই তো চাই।”

আমাকে খুশী করতে পেরে কালীচরণ নিজেও বেশ খুশী। অকারণে আর একটি সেলাম ভেট দিয়ে কালীচরণ জানালো, আমার ঘর সাফাই করবার জন্যেই সে এখানে এসেছিল। কিন্তু এখন সে আমাকে কিছুতেই ডিসটার্ব করবে না। পরে আবার আসবে। এখন যেন আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

কৃতজ্ঞ আমি কালীচরণকে ধন্যবাদ জানালাম। একটু সাহস পেয়ে যাবার আগে কালীচরণ জিজ্ঞেস করলো, “হুজুর, আপনার কি তবিয়ৎ খারাপ?”

ওকে বিদায় করবার জন্যে বললাম, “জ্বরটর নেই—তবে শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করছে।”

কালীচরণ আমাকে খুবই খাতির করলো। বললো, “কোনো ‘টেবলেটের’ দরকার হলে, তার কাজ ফেলে রেখে সে এখনই ও এন মুখার্জির দোকানে যেতে পারে। তবে যদি আমার কথা শোনেন স্যর...” এই বলে সে থেমে গেলো!

"তোমাদের কথা শুনবো না তো কাদের কথা শুনবো? তোমরাই তো এই বিদেশে আমার বন্ধু," সাহস যোগাবার জন্যে আমি বললাম।

কালীচরণ এবার চাঙ্গা হয়ে উঠে উপদেশ দিলো, "ঐ টেবলেটগুলো খাবেন না, স্যর। তার বদলে মধুমোড়া নিন, হাতে-হাতে ফল পাবেন।"

মধু সহকারে তৈরি কোনো আয়ুর্বেদিক ওষুধের কথা বলছে কালীচরণ, আন্দাজ করলাম, "মধু এখানে পাবে কোথায়? কতগুলো মোড়া খেতে হবে?"

আমার অনভিজ্ঞতায় কালীচরণ আর হাসি চাপতে পারলো না। বললো, "মধুমোড়ার মালিককে পাঠিয়ে দিচ্ছি, স্যর—সেই আপনার সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

আমি না বলবার আগেই কালীচরণ অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে শ্রীমান সহদেব সশরীরে আবির্ভূত হলো।

একগাল হেসে, ঘাড়টা ঈষৎ ডান দিকে হেলিয়ে সহদেব বললো, "স্যর, আপনার নাকি শরীরে ব্যথা?"

"সহদেব, তুমিও এসে পড়েছো?" শরীরের অবসাদ চেপে রেখে আমি হাসবার চেষ্টা করলাম।

সহদেব বললো, "বডি পেন-কে পাঁচ মিনিটের থ্যাকারে-ম্যানসন ছাড়া করে দিচ্ছি।"

"নিজের কাজকর্ম ছেড়ে তুমি আবার সময় নষ্ট করতে এলে কেন?" এই সকালে সহদেবের যে কাজকর্ম আছে, তা আমার অজানা নয়।

সহদেব চটপট জবাব দিলো, "আপনার খবরাখবর না-নিলে, আমার কপালে দুঃখু আছে, স্যার। সুলেখা দিদিমণি নিজে বলে গিয়েছেন, আপনার শরীরের খোঁজ রাখতে, আপনার যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করতে।"

বহুদিন পরে এমন নীরব স্নেহের পরিচয় পেয়ে গভীর কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরে উঠলো। শত-সহস্র লাঞ্ছনার মধ্যেও সুলেখা যে আমার দৈনন্দিন সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে চিন্তা করতে পেরেছে এর থেকে বেশী স্নেহের কী পরিচয় পাওয়া যেতে পারে?

মধুমোড়া জিনিসটা যে কোনো মোড়কে পাওয়া যায় না তা সহদেব এবার আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে অবাক করলো। আমার হাতখানা বিচিত্র ভঙ্গীতে মুড়তে-মুড়তে সহদেব বললো, "আপনার খুব ভাল লাগবে স্যর। মোড়া নিতে নিতে চোখে আপনার ঘুমও এসে যেতে পারে।"

সহদেবের হাত দুটো অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসকের মতো কাজ করছে। দুটি নিপুণ হস্তের সরস নিপীড়নে আমার দক্ষিণাঙ্গে মৃদু শিহরণ খেলে যাচ্ছে। সহদেব জিজ্ঞেস করলো, "কেমন লাগছে, স্যর?"

"এ-বিদ্যা কোথা থেকে আমদানী করলে সহদেব?" আমার ক্লান্ত শরীর তখন পুরোপুরি সহদেবের বশবর্তী হয়ে পড়েছে।

সহদেব বললো, "আপনাদের দেশেরই জিনিস তো। আমি তো এখানেই এসে শিখেছি—যশোরের মধুমোড়া।"

এরপর সহদেব কিছুই চেপে রাখেনি। এখানে এসে সহদেব এক বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে ফেলেছিল। "মেয়েটা, হুজুর, ভবানীপুরে বাসন মাজতো—আসল দেশ যশোরে।"

তার কাছ থেকেই সহদেব এই বিখ্যাত মধুমোড়া শিখেছে। "দশ মিনিট মধুমোড়া খেলে ঘুম আসতে বাধ্য, স্যর।"

আমার আঙুলগুলো বিচিত্র পদ্ধতিতে মোচড় দিতে দিতে দিতে সহদেব জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা আমি পাত্র খারাপ, স্যর?"

মোটেই না। তোমার অতি বড় শত্রুও সে-কথা বলতে পারবে না।" আমি সহদেবের পক্ষেই মতামত প্রকাশ করি।

সহদেব আরও তথ্যের যোগান দিলো ঃ "সায়েবপাড়ার কোয়ার্টার, মাসে সাড়ে-তিন চারশ রোজগার। কোনো কোনো মাসে আরও হয়ে যায়। খাওয়া ফ্রি।"

সহদেবের ফিরিস্তি শুনে আমি নিজেও একটু অবাক হচ্ছি। সহদেব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করলে, "এমন সোয়ামীকে কেউ ছাড়ে, হুজুর?"

বিচ্ছেদের করুণ সুর এই ভোরবেলাতেই সহদেবের গলায় বাজছে। সহদেব দুঃখ করলো, "বিয়েটা টিকলো না। যেমনি শুনলো, আমি এক সময় সুইপার ছিলাম অমনি বিগড়ে বসলো। আবার পরের বাড়ি বাসন মেজে খাবার জন্যে ছুঁড়ী বেরিয়ে পড়লো, সুইপারের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে নাকি কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরা ভাল।"

সহদেবকে সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। সে বললো, "আমাদের দুঃখু কেউ বুঝবে না, স্যর। কোনো দোষ করি নি, মদ খাই নি, কখনও মারধোর করি নি, তবু স্রেফ জাতের জন্যে অমন মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেলো স্যর।" সহদেবের দুঃখের যেন শেষ নেই।

সহদেবের সচল হাতের সংবাহনে শরীরটা সত্যিই এবার অবশ হয়ে আসছে—এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়াটাও আশ্চর্য নয়। সহদেব এবার নিজেই বললো, "আমার দুঃখের কথা সারারাত কাঁদলেও শেষ হবে না, স্যর। আমাব কথা ছেড়ে দিন। আমি যে ক্যালকাটা সিটিতে কমোড সাফ না করে হাতা-খুন্তি নেড়ে পেট চালাতে পারছি, এই যথেষ্ট। আপনি বলুন, শরীরের ব্যথা কমছে কিনা। আমার মনে হচ্ছে, আপনার ঠান্ডা লেগে গিয়েছে।"

ঘুমের ঘোরে পড়বার আগেই যথাসাধ্য মনোবল যোগাড় করে বিছানার ওপর তড়াং করে উঠে বসলাম। আমাদের মতো অভাগাদের এই ভোরবেলা এতোখানি শারীরিক সুখভোগ কখনোই উচিত নয়। মনকে একটু বকুনিও দিলাম—"ক'দিন আগেও সামান্য একটু মাথা গোঁজবার জায়গার সন্ধানে পথে-পথে ঘুরছিলে, এখন কেমন অবহেলায় ডজনখানেক কর্মচারির হুজুর সম্ভাষণ সহজেই হজম করছো।"

তাছাড়া; এই মুহূর্তে আমার জেঠমালানি কোম্পানির প্রতিনিধির কথা মনে পড়ছে। বেচারা হয়তো ম্যানেজারবাবুর সাক্ষাৎ পাবার আশায় এখনও আপিস ঘরের সামনে বসে আছে।

আমাকে স্প্রিং-এর মতো উঠে দাঁড়াতে দেখে সহদেব একটু অবাক হয়ে গেলো। সহদেব ভাবলো, মধুমোড়া আমার পছন্দ হলো না। বললো, "আপনার ভালো লাগলো না, স্যর? আমি স্যর গিরিবালার মতো পারি না—কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু ওর মোড়া এখনও আমার গায়ে মধুর মতো লেগে আছে।"

সহদেবকে বিদায় করে, জামাকাপড় পরে নিচে নেমে এলাম। সিমেন্ট

বাঁধানো ড্রাইভ-ওয়ে ধরে অফিস ঘরে যাবার পথে দূর থেকে যাঁকে দেখলাম, তিনিই যে এতোক্ষণ ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন তা কল্পনাও করিনি।

মিস্টার আর সি ঘোষ না? আপিস ঘরের ঠিক পাশেই যেখানে একটা বাড়ন্ত বটগাছের তলায় রামসিংহাসন অ্যান্ড কোম্পানি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছে তারই সামনে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হাজার হাত কালীতলার আর সি ঘোষ।

আমাকে দেখতে পেয়েই স্ট্যাচুতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো। আর সি ঘোষ সোজা আমার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

অফিস ঘরের দরজার অনতিদূরে আমাদের দুজনের দেখা হয়ে গেল। আর সি ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তাজ্জব।

ভদ্রলোককে চেনাই যাচ্ছে না। সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন হতে পারে, ঘোষমশায়কে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

আর সি ঘোষের মুখের দাড়িগুলো এক রাত্রেই যেন সজারুর কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে।

গতকাল সন্ধ্যাতেও তো ভদ্রলোককে দেখেছি। তারপর মাত্র তের-চোদ্দ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়েছে। এইটুকু সময়ের ব্যবধানে দাড়িগুলো কেমন করে অমন ছন্নছাড়া হয়ে উঠতে পারে তা এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না।

আর সি ঘোষ আমার দিকে চোখ দুটো গোল গোল করে তাকালেন। গাঁজাখোরের চোখের মতো লাল চোখ। অথচ আর সি ঘোষ অতি সাত্ত্বিক মানুষ—বিড়ি ছাড়া আর কোনো নেশা যে ওঁর নেই তা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি।

নিয়মমাফিক ভদ্রতা অনুযায়ী জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছেন?"

সৌজন্য বিনিময় না-করে আর সি ঘোষ প্রত্যুত্তরে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, "এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি নিজেই যে এসেছেন তা আমি বুঝতে পারিনি।" আমি ঘোষমশায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

কিন্তু এইসব সূক্ষ্ম ভদ্রতা নজর করবার মতো মানসিক অবস্থা এখন বোধ হয় ভদ্রলোকের নেই। বেশ গম্ভীর হয়ে এবং ঈষৎ সন্দিগ্ধ সুরে আর সি ঘোষ বললেন, "জানলে হয়তো দেখাই করতেন না। কোথায় কী কলকাঠি টেপা আছে, তা এই আর সি ঘোষ তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লা, গড, ভগবান কেউ জানেন না।"

"ধরা পড়ে গিয়েছেন তো?" এই বলে আর সি ঘোষ নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

আর সি ঘোষকে আগেও হাসতে দেখেছি। কিন্তু এখনকার হাসিটা কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে, সুস্থ লোক এইভাবে হাসে কি না আমার ঘোরতর সন্দেহ।

আমার হাতটা ধ'রে ফেললেন আর সি ঘোষ—তারপর প্রায় টানতে-টানতেই আমাকে আপিস ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

একটা চেয়ারে বসতে দিলাম ঘোষ মশায়কে। আজকে ওঁকে আর জিজ্ঞেস করলাম না—ওঁর মুখচোখ দেখেই মনে হচ্ছে একটু গরম কিছু পেটে পড়া দরকার। সামনের দোকানকে স্পেশাল গ্লাসে চা পাঠাতে বললাম।

চা এলো। কিন্তু আর সি ঘোষ একবার চুমুক দিয়ে অবহেলাভরে চায়ের গেলাসটা সরিয়ে রাখলেন।

"চা খাবেন না?" হাজার হোক নিজের দেশের লোক, তাই আর একবার জিজ্ঞেস করলাম।

"তেতো লাগছে," মুখ বিকৃত করে উত্তর দিলেন আর সি ঘোষ।

"একটু দুধ দেবে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

আর সি ঘোষ এবার নিজের মুখটা আমার খুব কাছে এগিয়ে নিয়ে এলেন। কাল রাত্রে আমার ছেলে একটা ডিশে করে মোহন ঘোষের রাজভোগ এগিয়ে দিলো। তেতো লাগলো, খেতে পারলাম না—মনে হলো নিমপাতার রসে চুবিয়ে রেখেছিল!

আমাকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দেখলেন আর সি ঘোষ। অনেকক্ষণ ছোট ছেলের মতো বিস্ময়ে তিনি আমার চা-খাওয়া লক্ষ্য করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "কেমন বুঝছেন? তেতো লাগছে না?"

এরপর মাথা চুলকোতে লাগলেন আর সি ঘোষ। অসহায় কণ্ঠে বললেন, "আমাকে কে এইভাবে নিমপাতার রসের মধ্যে ফেলে সেদ্ধ করছে বলুন তো?"

আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আর সি ঘোষের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ওঁকে কী বলে সান্ত্বনা দেবো, কী আশার কথা শোনাবো, তা একটুও বুঝতে পারছি না।

"গতকাল রাত্রে হঠাৎ ঐভাবে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন?" আমি চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে আর সি ঘোষকে জিজ্ঞেস করলাম।

আর সি ঘোষ আবার হা-হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়! না-হলে ঠিক সন্ধ্যেবেলায় কেন আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনে হাজির হলাম?"

"আপনি ভাড়া মেটাতে আসেননি?" আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করি।

"দূর মশাই! ওটা তো ছুতো।" রক্তচক্ষু গোল গোল করে ঘোষণা করলেন আর সি ঘোষ।

এরপর কিছুই চেপে রাখলেন না আর সি ঘোষ। গতকাল বলেছিলেন, ভোরবেলায় জামাই সম্পর্কে দুঃস্বপ্ন দেখায় মেয়েকে নিয়ে মফস্বল থেকে সোজা কলকাতায় চলে এসেছিলেন। জামাই তখন বেরিয়েছেন, কিন্তু গভরমেণ্ট গেস্ট হাউসের বেয়ারা সাদরে সায়েবের বউ ও শ্বশুরকে সায়েবের ঘরে বসতে দিয়েছে। গেস্ট হাউসে ঢালাও ব্যবস্থা—ডবল-বেডেড রুমে অনেকে সপরিবারে সংসার পাতেন।

খুকু যখন বাথরুমে ঢুকেছে, আর সি ঘোষ তখন টেবিলের কাছে কাগজ পত্তর নাড়ছিলেন। বিখ্যাত জামাইয়ের সব কিছু দেখেই তিনি গর্ববোধ করেন। হঠাৎ টেলিফোনের তলায় এক টুকরো কাগজের দিকে নজর পড়লো ঘোষমশায়ের। মেয়ে তখনও বাথরুমে। অপরের জিনিস হলেও, পুরো কাগজটা পড়ে ফেললেন আর সি ঘোষ। মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর জন্যে মেসেজ। একটি মেয়ে আর্জেণ্ট টেলিফোন করেছে। মিস্টার চৌধুরীকে আসামাত্রই ফোন করতে অনুরোধ জানিয়েছে। ফোনের নম্বরটা দেখেই ঘোষমশাই চমকে উঠলেন। এই নম্বরটা তো জেঠমালানিদের গেস্ট ফ্ল্যাটের।

সুলেখা! মেয়েটির নামটাও তো জেঠমালানি কোম্পানিতে অজানা নয়।

সন্দেহ নিরসনের জন্যে মিস্টার ঘোষ টেলিফোন ডিরেকটরি খুলে নম্বরটা মিলিয়ে নিলেন। নম্বরটা দেখামাত্রই মিস্টার ঘোষের শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে। খুকু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বাবাকে হঠাৎ ওই রকম মুখ কালো করে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "বাবা, কী হলো তোমার?"

মেয়েকে কিছুই বলতে পারলেন না আর সি ঘোষ।

টেলিফোন বইয়ের পাতা খোলা দেখ খুকু জিজ্ঞেস করলো, "বাবা, কাউকে তুমি ফোন করবে?"

খুকু সামনে না-থাকলে আর সি ঘোষ তৎক্ষণাৎ ওই নম্বর ডায়াল করে সন্দেহ নিরসন করতেন এবং সুলেখাকে জিজ্ঞেস করতেন কোন্ সাহসে সে তার জামায়ের সঙ্গে ভাব করে?

খুকুর জন্যে কিছুই হলো না। কিন্তু মনটা ছটফট করছে আর সি ঘোষের। বেয়ারাদের জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার চৌধুরী কখন ফিরবেন।" বেয়ারা বললো, "একটু দেরি হতেও পারে।"

বেচারা খকু বললো, "কিছুই এসে যায় না, বাবা। ফিরে এসে আমাদের দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে। একটা প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।"

প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ? মিস্টার ঘোষ নিঃসন্দেহ হতে পারছেন না। কিন্তু মেয়ের কচি মুখটার দিকে তাকিয়ে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না।

অসহ্য দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে করতে আর সি ঘোষ বললেন, "আমি তাহলে আপিসের কাজটা সেরে আসি?"

থ্যাকারে ম্যানসনের নাম শুনে খুকুও সঙ্গে যেতে চাইলো। মাঝে-মাঝে সে ছোট মেয়ের মতো আব্দার করে। কিন্তু আর সি ঘোষ কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, "তুমি মা এখানেই বসে থাকো। অর্জুন এসে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে।"

নিচে নেমে আসতেই গেস্ট হাউসের গেটের সামনে অর্জুনের ড্রাইভারের সঙ্গে মিস্টার ঘোষের দেখা হয়ে গিয়েছে। সায়েবের শ্বশুরকে লম্বা সেলাম দিয়েছে ড্রাইভার। শ্বশুর জিজ্ঞেস করেছেন, "সায়েব কোথায়?" ড্রাইভার বলেছে, ওঁকে সাডার স্ট্রীটের ওখানে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন। আমি গাড়ি গ্যারেজ করে দিচ্ছি। উনি ওখান থেকে অন্য কারু গাড়িতে একটু পরেই চলে আসবেন।"

সাডার স্ট্রীটের নাম শুনে আর সি ঘোষের শরীরটা আরও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, থ্যাকারে ম্যানসনের কাছে কিনা। কিন্তু ড্রাইভারকে ওই ধরনের প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না আর সি ঘোষ।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো, কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দিতে হবে কিনা। আর সি ঘোষ সে প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

এরপর একমুহূর্ত বিলম্ব না করে আর সি ঘোষ ছুটেছেন থ্যাকারে ম্যানসনের দিকে। সারা রাস্তা তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, জামায়ের টেলিফোনের তলায় যে চিরকুট দেখেছেন তা যেন ভুল হয়। বাসে চড়ে আসতে আসতেই আর সি ঘোষ ঠিক করে ফেলেছেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি এবং জানতে চাইবেন জামাইকে কখনও এ-পাড়ায় দেখেছি কিনা।

তার পরের ঘটনা আমাদের জানা। টাকা জমা দিয়ে, ভাড়ার রসিদ না নিয়ে, মদনার কথা শেষ হওয়া মাত্রই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

সে-রাত্রে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে সাহস পাননি আর সি ঘোষ। ফোন করে দিয়েছিলেন গভরমেণ্ট গেস্ট হাউসে—তিনি হাওড়ার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন।

সমস্ত রাত আর সি ঘোষ একবারও চোখ বোজেননি তা ওঁর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এক রাতেই তাঁর দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে।

এখন এই ভোরবেলায় তাঁর মনিব জেঠমালানির ওপর রাগে দাঁত কিড়-মিড় করছেন আর সি ঘোষ।

"কী হলো আপনার?" আমি ওঁকে শান্ত করবার জন্যে এমনভাবে হাসছি যেন কিছুই ঘটেনি।

আর সি ঘোষ হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। "আমার সাজানো বাগান ছারখার হয়ে গেলো। মেয়েটার কাছে আমি কেমন করে মুখ দেখাবো?"

আমি পাথরের মতো চুপচাপ বসে আছি। ভগ্নহৃদয় পিতার এই প্রশ্নের কী উত্তর দিতে পারি আমি?

আর সি ঘোষ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "সমস্ত রাত ঘুমোতে পারিনি। ভাবলাম, একবার মাঝরাতে ফিরে এসে ঐ সুলেখা মেয়েমানুষটার সঙ্গে দেখা করি।"

অত রাত্রে আর হলো না। এই ভোরবেলাতেই ছুটে এসেছি। সুলেখাকে আমি গলা টিপে খুন করবো। তার আগে জিজ্ঞেস করবো, আমার মেয়েটার সর্বনাশ করে তার কী লাভ হচ্ছে? পৃথিবীতে অর্জুন চৌধুরী ছাড়া আর কোনো ব্যাটাছেলে নেই?"

হাঁপাচ্ছেন আর সি ঘোষ। "এতোদূর এসে দেখলাম পাখী পালিয়েছে। পাখী কী করে জানতে পারলো তাকে গলা টিপে মারবার জন্যে আমি এখানে ভোরবেলাতেই আসছি?"

আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। ভাগ্যে সুলেখা নেই। এখানে থাকলে আজ কী অবস্থা হতো।

"আঃ! আপনি শান্ত হোন, মিস্টার ঘোষ," আমি এবার আর সি ঘোষের হাতটা সস্নেহে জড়িয়ে ধরলাম।

কিন্তু কোনো ফল হলো না। আর সি ঘোষ বললেন, "আমি প্রথমেই আপনার খোঁজ করেছি। ভেবেছিলুম, জানাশোনা লোক সাক্ষী রেখেই আমি ওই ছুঁড়ীকে ভোরবেলায় খুন করবো। তার আগে মুখে অ্যাসিড ছড়িয়ে দেবো—যাতে ওই পোড়ামুখ দেখে আর কারুর সংসার নষ্ট না হয়।"

একটু থেমে আর সি ঘোষ বললেন, "কিন্তু অত সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হলো না। চাকরটা বলে গেলো, চৌত্রিশ নম্বরের চাবি সহদেবের কাছে আছে।"

আর সি ঘোষের চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নিশ্চয় বলতে পারেন, যত নষ্টের গোড়া মেয়েটা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে?"

এমন অদ্ভূত অবস্থায় কখনও পড়তে হবে জীবনে ভাবিনি। কী বলবো বুঝে উঠতে পারছি না। আর সি ঘোষের শেষ কথাটা আমার গায়েও জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। আর মুখ বুজে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।

বললাম, "মিস্টার ঘোষ, মেয়েটা নষ্ট, কিন্তু যত নষ্টের গোড়া কিনা জানি না।"

ভেবেছিলাম আর সি ঘোষ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিন্তু কিছুই হলো না। বরং শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন বলুন তো?"

আমি বললাম, "সুলেখা তো চাকরি করে।"

একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছেন আর সি ঘোষ। নিজের মনেই বললেন, "আমাদের জেঠমালানি কোম্পানিই তো মাইনে দিয়ে রেখেছে ওকে।"

সাহস পেয়ে এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্টার অর্জুন চৌধুরী আই-এ-এস যে আপনার জামাই তা আপনার বাবু জানেন না?"

"ওঁরা মস্ত লোক। বিয়েতে পাঁচ টাকা নোটের একখানা বাণ্ডিল আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মতো সামান্য কর্মচারির মেয়ের কোথায় বিয়ে হলো তা ওঁর জানবার কথা নয়।"

আর সি ঘোষ হঠাৎ বিড় বিড় করতে আরম্ভ করলেন। জেঠমালানি. জেঠমালানি—কথাটা আমার কানে কয়েকবার ঢুকলো। হয়তো, তাঁর জামায়ের অধঃপতনের পিছনে তাঁর মালিকদের অবদানের ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অর্ধোন্মাদের মতো আর সি ঘোষ বললেন, "ইঞ্জিনটা ভীষণ গরম হয়ে উঠছে। একটু হাওয়া খেয়ে আসবো, স্যর?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আপনার যা-ইচ্ছে তাই করুন।" মেয়ের ব্যাপারে জামাইকে হাতে-নাতে ধরে এইভাবে ভেঙে পড়তে আর কাউকে দেখিনি।

"দেখবেন স্যর, সুলেখা সেনের মতো দরজায় তালা লাগিয়ে আপনিও যেন কেটে পড়বেন না। আমি এখনই আসছি।" এই বলে আর সি ঘোষ তখনকার মতো বিদায় হলেন। জেঠমালানিদের ওপর রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলছে, কিন্তু ঐসব সর্বশক্তিমানদের গায়ে একটা পিন ফোটাবার মতো ক্ষমতাও আমাদের নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর সি ঘোষ ফিরে এলেন। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে তাঁর কোনো উন্নতি হয়নি, বরং পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। চোখ দুটো আরও লাল হয়েছে। একটা চাবির রিং হাতে ঘন ঘন ঘোরাচ্ছেন তিনি।

চেয়ারে বসতে বসতে আর সি ঘোষ বললেন, "যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া—দ্যাট ওণ্ট ডু! ওটি বাছাধন চলবে না। আমি ঘোষের বাচ্চা—সবকিছু একটু দেরিতে বুঝি, কিন্তু একবার বুঝলে তোমা-দের আর নিষ্কৃতি নেই।"

এসব কথা কাকে উদ্দেশ্য করে মিস্টার ঘোষ বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না।

আর সি ঘোষ এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন। "আপনি মশাই কে?"

আমি কী উত্তর দেবো বুঝতে পারছি না। ওঁকে শান্ত করবার জন্যে বললাম, "আমি আপনার দেশের লোক। আপনার প্রতিবেশী।"

মাথা নাড়লেন আর সি ঘোষ। "চোখের সামনে আমার জামাইকে

গোল্লায় যেতে দেখলেন, অথচ বাধা দিলেন না? না মশাই, আপনি আমার প্রতিবেশী নন। আপনি অন্য কী বলুন?"

আর সি ঘোষ কি উন্মাদ হয়ে যাবেন? একটা কিছু উত্তর না পেলে তিনি আমাকে ছাড়বেন না। তাই বললাম, "আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজার।"

"দ্যাটস রাইট—আপনি এই ম্যানসনের ম্যানেজার। টাকা গুণে ঘরভাড়া দেওয়াই আপনার কাজ—তারপর ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে কে কী করলো সে নিয়ে মাথা ঘামানো আপনার ডিউটি নয়।"

আবার আমার দিকে তাকালেন আর সি ঘোষ। বললেন, "ফ্যালো ভাড়া, টেক্ চাবি, খাও মাল, গো টু উচ্ছন্ন—আই ডোণ্ট কেয়ার। এই তো?" হা-হা করে হাসছেন আর সি ঘোষ। হাওড়ার শান্তশিষ্ট মানুষটা মদ না-খেয়েও যে এমন হয়ে যেতে পারেন, তা আমার কল্পনাতীত।

আর সি ঘোষ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কে?"

উত্তর দিতেই হবে। তাই বললাম, "আপনি আমাদের ভাড়াটে। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের বর্তমান কর্তা আপনি।"

"একখানা সাদা কাগজ দিতে পারেন, স্যর!" করুণভাবে অনুরোধ করলেন আর সি ঘোষ।

ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

"একটা পেন, স্যর।"

পকেট থেকে পেনটাও বার করে ওঁর হাতে দিলাম।

পেনটা খুলতে খুলতে আর সি ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, "এই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন কে?"

"আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী আপনি। খাতায় কলমে আমরা জেঠমালানি কোম্পানিকে চিনি না—সে কথা অনেক দিন আগেই তো বলেছি।"

তারপর আর সি ঘোষ অবাক কাণ্ড করেছিলেন। এমন আশ্চর্য প্রতিশোধ নিতে কাউকে কখনও দেখি নি।

চোখের হেডলাইট দুটো আবার রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। তারপর ঘষ ঘষ করে চিঠিটা লিখে ফেললেন আর সি ঘোষ।

চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে ঘোষ বললেন, "দোষটা আমারই স্যর। কতদিন আগে আপনি বলেছিলেন, বেনামের শিখণ্ডি হবেন না। তখন আপনার কথা শুনিনি। এখন দাম দিতে হলো আমাকে।"

একটু হাসলেন আর সি ঘোষ—তারপর বললেন, "গোড়ায় গলদ আর রাখবো না। তুমি জেঠমালানি—আমিও হাজার হাত কালীতলার আর সি ঘোষ। এই নিন স্যর", বলে চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

জেঠমালানিদের অত প্রিয় এবং মূল্যবান ফ্ল্যাটখানা এক কথায় ছেড়ে দিলেন তাঁদের বেনামদার আর সি ঘোষ। চিঠিতে লেখা : 'মহাশয়, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলাম। ফ্ল্যাটের চাবি এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলাম। ইতি আর সি ঘোষ।"

"পাপ বিদেয় হোক। পাপ বিদেয় হোক।" বিড়বিড় করছেন আর সি ঘোষ।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে মাথা তুলবার আগেই আর সি ঘোষ তীরের মতো ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চাবি ও চিঠি নিয়ে আমি যেন অকূল-পাথারে পড়লাম। চৌত্রিশ নম্বরের এই আকস্মিক রাহুমুক্তিতে আনন্দিত হবো, না দুঃখিত হবো তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারছি না।

প্রথমে প্রচণ্ড আনন্দের শিহরণে বুঁদ হয়ে রইলাম। যে টাকায় চৌত্রিশ নম্বর এতোদিন ভাড়া দেওয়া ছিল আজকের যুগে তার পরিমাণ হাস্যকর। সায়েবপাড়ায় ফ্ল্যাট তো দূরের কথা ঐ টাকায় হাওড়ার বস্তিতে দুখানা ঘরও পাওয়া যায় না।

কোন্ গভীর রহস্যে ভাড়ার পরিমাণ ঐ রকম হাস্যকর পর্যায়ে পড়ে আছে তা আমি নিজে বুঝে উঠতে পারিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাড়ি-ওয়ালার অনীহা। কীভাবে প্রতিটি ঘর থেকে কিছু বাড়তি রোজগার হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ তাঁরা হয়তো প্রকাশ করেননি। কিন্তু কয়েকদিন আগে তেলকালিবাবু এ-বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছিলেন।

আজও তেলকালিবাবু হঠাৎ কী কাজে দুম করে আমার অফিস ঘরে ঢুকে পড়লেন। হেঁকো-ডেকো মানুষ এই তেলকালিবাবু। আমাকে দেখেই বললেন, "কী হলো স্যর ? সাত-সকালে এমন বাংলা পাঁচের মতো মুখ করে বসে আছেন ?"

ইঙ্গিতে ওঁকে চাবি ও চিঠিখানা দেখিয়ে দিলাম। চিঠি পড়ে আনন্দে তিনি চাবিটাকে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, "ওইভাবে বসে আছেন কি ? হাতখানা এগিয়ে দিন, স্যর!"

"হাত এগিয়ে দেবার মতো কী হলো ?"

"হাতখানায় কী আছে একবার দেখি", হুঙ্কার ছাড়লেন তেলকালিবাবু।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই ভদ্রলোক আমার ডানহাতখানা নিজের দিকে টেনে নিলেন। বললেন, "ব্যারিস্টারের বাবা আপনি।"

"ব্যারিস্টারের বাবু ছিলাম আমি কোনো এক সময়ে", তেলকালিবাবুর ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক আমার কথা কানেই তুললেন না। বললেন, "যা মুখ থেকে বেরিয়েছে তা আর উইথড্র করছি না—ব্যারিস্টারের বাবাই আপনি।"

তেলকালিবাবু বললেন, "বাঘা বাঘা উকিল ব্যারিস্টাররা বছরের পর বছর চেষ্টা করলেও এই সব ঘর খালি করতে পারতেন না। আর আপনি তো মশাই টপাটপ স্কোর করে যাচ্ছেন!"

স্কোরের ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক আমার মাথায় ঢোকেনি। একগাল হেসে তেলকালিবাবু বললেন, "আর লজ্জা দেবেন না স্যর। বল পাওয়া মাত্রই তো আপনি গোলে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন।"

"আজ্ঞে ?" আমি তেলকালিবাবুকে এবার সামলাবার চেষ্টা করি। কিন্তু তেলকালিবাবুর ব্রেক কষবার কোনো আগ্রহই নেই।

তিনি বললেন, "আমার মশাই যা মুখে আসবে, তাই বলে যাবো। আমি কি রামসিংহাসন ?"

একটু হাসলেন তেলকালিবাবু। তারপর সানন্দে বললেন, " বাড়ির

হিসট্রিতে কখনও হয়নি স্যর। এতোগুলো ঘর আপনি টপাটপ খালি করে ফেললেন।"

তেলকালিবাবু যা খুশি বলে যান—ওঁকে বাধা দিতে গিয়ে আমি ওঁর বক্তৃতার তোড় বৃদ্ধি করতে সাহস পাচ্ছি না।

তেলকালিবাবু বললেন, "বাড়ির মালিকের যদি চোখ খোলা থাকতো তা হলে আপনাকে এতোক্ষণে মাথায় তুলে নাচতেন। একখানা নয়, দুখানা নয়, পর পর তিনখানা ঘরের ভাড়াটে তাড়িয়ে আপনি হ্যাটট্রিক করলেন।"

"আমি তো কাউকে তাড়াইনি, তেলকালিবাবু। ওঁরা নিজেরাই তো চলে গেলেন—ডরোথি ওয়াট, মিস্টার আর সি ঘোষ। আর উনিশ নম্বরের ফিলিপ সায়েব তো নিজেই ফ্ল্যাট তালাবন্ধ করে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তো কেবল বন্ধ তালা খুলিয়ে ঘরখানা খাসে এনেছি।"

আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন তেলকালিবাবু। বললেন,, "ওই জন্যেই তো বলি—আপনি নিশ্চয় ম্যাজিক জানেন। কাউকে ঘাড় ধরে তাড়াবার চেষ্টা করলেন না, কারুর পাইপ চেক করলেন না, ইলেকট্রিকের তার কাটলেন না, থানা পুলিসে কারও নামে ডাইরি করলেন না, অথচ সট সট তিনখানা ফ্ল্যাট আপনার খালি হয়ে গেলো।"

তেলকালিবাবুর কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা কাকতালীয়, এর পিছনে আমার কোনো হাত নেই। যদিও তেলকালিবাবু আবার বললেন, "কুমার জগদীশ মল্লিক আপনার খোঁজ পেলে ধন্য হয়ে যেতেন। আঙুরের মতো যত্ন করে তুলোর বাক্সে আপনাকে রেখে দিতেন।"

কে এই কুমার জগদীশ?

তেলকালিবাবু বললেন, "রিয়েল প্রপার্টির মালিক, মশাই। কলকাতায় ডজনখানেক বাড়ির ওনার। বড়বাজার, চিৎপুর, হ্যারিসন রোড, সদর স্ট্রীট, ভবানীপুর যেখানেই যাবেন সেখানেই কুমার জগদীশের প্রপার্টি দেখবেন। কিন্তু লোকটিকে দেখলে চিনতেই পারবেন না। মনে হবে, কুমার জগদীশ মল্লিক এস্টেটের কোনো কর্মচারী! একটি চীনে কোট এবং নহাতি ধুতি পরে ঠুকঠুক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

জগদীশ মল্লিক সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ছে। এখানকার এই অনিশ্চিত চাকরি কতদিন আছে ঠিক নেই—সুতরাং, দু'চারজন সম্ভাব্য চাকুরিদাতার খোঁজখবর রাখা অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুমার শব্দটি আমাকে বিপথে পরিচালিত করেছে। ভেবেছি, কুমার যখন, তখন নিশ্চয় বেশী বয়সী নন। কিন্তু তেলকালিবাবু আমার ভুল ভাঙলেন। বললেন, "ধৈর্য বটে বুড়োর। এই বয়সেও যেভাবে খেলা দেখাচ্ছেন। সেদিন আমার কাছেও চলে এসেছিলেন।"

"কুমার কী করে বৃদ্ধ হন?"

তেলকালিবাবু বললেন, "টাইটেলে সব কিছু বোঝায় না, মশাই। কুইন ভিক্টোরিয়ার ছেলে তো টেকো প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন।"

এবার আন্দাজ করে বললাম, "ও, বুঝেছি। কুমার জগদীশ মল্লিকের বাবা হয়তো এখনও বেঁচে আছেন।"

"কিসসু বোঝেননি, স্যর", মৃদু বকুনি লাগালেন তেলকালিবাবু। "ওঁর বাবা রাজা হরিদাস মল্লিক অফ উলুবেড়িয়া অনেকদিন গত হয়েছেন।

তবু কুমার জগদীশ কুমারই রয়ে গেলেন।”

রহস্যটা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। “ইংরেজ আমলে রাজকুমার কী কোনো স্বদেশী ব্যাপারে জড়িয়ে সরকারী রোষে পতিত হয়েছিলেন?”

“না স্যর, ওসব কিছুই নয়”, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন তেলকালিবাবু। “স্রেফ পয়সাকড়ির ব্যাপার। রাজা হতে গেলে সে যুগে কিছু টাকা খরচ করতে হতো। কুমার জগদীশ কৃপণ মানুষ—ওসব হাঙ্গামার মধ্যে যাননি, তাই ‘চিরকুমার’ রয়ে গেলেন!”

চিরকুমার শব্দটি এবার আমার কাছে বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে উঠলো। তেলকালিবাবু বললেন, “কুমার জগদীশ, একভাবে মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। মামলা ছাড়া আজকাল বাড়িওয়ালার কথা ভাবাই যায় না। শতখানেক মামলা সব সময় বিভিন্ন আদালতে ওঁর ঝুলছে। মামলার খরচ বাঁচাবার জন্যেই তো ছেলেকে ওকালতি পাশ করিয়ে এনেছেন। নিজেদের মামলাগুলো দেখা-শোনা করতে পারলেই অনেক টাকা বেঁচে যাবে।”

তেলকালিবাবু যে কুমার জগদীশ মল্লিকের এতো খবরাখবর রাখেন তা আমার জানা ছিল না। তেলকালিবাবু ফিসফিস করে বললেন, “আপনাকে মিথ্যে বলবো না। আমার ওই ছাদের ঘরেও কুমারের পায়ের ধুলো পড়ে। উনি তো হোল টাইম লোক রাখতে চান না। কলকব্জা তেমন বিগড়ে গেলে এই অধমের ডাক পড়ে—ফুরোনে কাজ করে টু পাইস আমিও কামাই করি। তবে সৎ পথের টাকা, স্যর—ঘুষের নয়। মাথার ঘাম পায়ে এবং নিজের তেল মেশিনে ফেলে তবে রোজগার করতে হয়।”

বাড়তি রোজগারের এই গোপন খবরটা তেলকালিবাবু আমাকে না দিলেও পারতেন। কিন্তু আমার ওপর ভদ্রলোকের বিশ্বাস জন্মেছে—আজকাল কিছুই তেমন চেপে রাখেন না।

“যা বলছিলাম”, তেলকালিবাবু আবার শুরু করলেন। “দিনরাত টো টো করে আটদশটা কোর্ট ঘুরেও, কালোমামাদের সঙ্গে অত ভাবসাব রেখে এবং কথায় কথায় দালদা চালিয়েও কুমারসায়েব ঘর খালি করতে পারছেন না।”

তেলকালিবাবুও আজকাল মদনার মতো মাঝে মাঝে টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার শুরু করেছেন দেখছি। কালোমামা ও দালদা শব্দ দুটি রহস্যজনক হওয়ায় মানে জানতে চাইলাম। তেলকালিবাবু বললেন, “আর লজ্জা দেবেন না, স্যার। অ্যাদ্দিন কোর্ট-কাছারি করছেন আর ওই দুটো কথার মানে জানেন না?”

কোর্টকাছারিতে সব সময় আমরা গোপন কোড্ ব্যবহার করি না, এ কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে হলো। তেলকালিবাবু তখন উত্তর দিলেন, “কালোমামা মানে যে পুলিস ঘুষ খায়—আর দালদা ‘মিন্‌স’ ঘুষ। কোর্টের খোকাবাবুরাও এ সব কথার মানে জানে, স্যর।”

আবার বিপদে ফেলছেন তেলকালিবাবু। “খোকাবাবু আবার কারা?” আমাকে আবার জিজ্ঞেস করতে হলো।

“ওটা খুব সোজা”, তেলকালিবাবু উত্তর দিলেন। “খোকাবাবু মানে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। এ-পাড়ায় যারাই এক আধবার ফৌজদারী কোর্ট ঘুরে এসেছে তারাই তো ম্যাজিস্ট্রেটদের খোকাবাবু বলে, বিশ্বাস না হলে মদনাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।”

হাইকোর্টের ভিতরে কাজ করবার সময় যা জানতে পারিনি, বাইরে এসে এতোদিন পরে তা শিখছি। আদালতের উচ্চাসনে বসা মাননীয় বিচার-পতিকে দেখে কোন্ অপরাধীর মনে প্রথম 'খোকাবাবু' শব্দটি উদিত হয়েছিল কে জানে!

পাকেচক্রে থ্যাকারে ম্যানসনের তিনখানা ফ্ল্যাট পরের পর খালি হয়েছে এটা সত্যিই ভাগ্যের কথা। কিন্তু এই ভোরবেলায়, আর সি ঘোষের ফেলে-যাওয়া ভাড়ার রসিদখানা দেখে আমার মনে অন্য প্রশ্ন উদয় হচ্ছে।

তেলকালিবাবু বললেন, "বিশ্ব বিজয় করে অমন গম্ভীর মুখে এখন কী ভাবছেন?"

ওঁর কথা বলার ভঙ্গীতে এমন হালকা রসিকতা আছে যে, আমার মুখেও হাসি ফুটে উঠলো। বললাম, "জেঠমালানিদের তো অঢেল টাকা। এ-পাড়ায় ফ্ল্যাটের ভাড়াও তো অনেক। তবু এতো সস্তায় কী করে এখানে ভাড়া পেয়েছিলেন? আমি নিজে এখানে চাকরি না করলে, কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না, এত কম টাকায় এতোখানি জায়গা কলকাতা শহরে ভোগদখল করা যায়!"

আমার কথা শুনে তেলকালিবাবু হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন, "আচমকা অমন করে হাসাবেন না, স্যর। বুকের ব্যামো হয়ে যাবে। কম ভাড়ার রহস্যটা আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। আমি মশাই সামান্য কলের মিস্ত্রী—সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বুড়ী বুড়ী মেশিনগুলোকে দানাপানি দিয়ে নিজের পেট চালাই। এতো খাটি, তবু দুটো বাড়তি পয়সার মুখ দেখতে পেলাম না—মাসের শেষ দিনগুলোতে মেরীমাতা ভরসা। এ সব প্রশ্নের উত্তর যদি আপনাকে জানতে হয়, তা হলে ডাকতে হবে রাম-সিংহাসনকে। এ বাড়ির সিংহাসনে উনিই তো বসে আছেন, ইচ্ছে করলেই গড়গড় করে সব বলে দিতে পারেন!"

রামসিংহাসনকে ডেকে এ সব প্রশ্নের উত্তর চাওয়া যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা তেলকালিবাবু নিজেও জানেন।

আপিস ঘরের পুরনো টাইপ মেশিনকে দু'ফোঁটা তেল খাওয়াতে খাওয়াতে তেলকালিবাবু বললেন, "উপোসী পাষাণ হয়ে আছে, বেচারা। ক'দিন যে তেল খায়নি। দেওয়ামাত্র কীভাবে তেল টেনে নিচ্ছে দেখুন।"

তেলকালিবাবুর দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। মনে হলো, মায়ের মতো আদর করে ঝিনুকে কাউকে দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনি। আপন মনেই তেলকালিবাবু বললেন, "যন্তর হলেও এরা সব বুঝতে পারে, শংকর-বাবু। প্রত্যেক যন্তরের প্রাণ আছে—শুধু মুখ ফুটে ওরা কিছু বলতে পারে না, তাই আমরা যা খুশি অত্যাচার করে যাই ওদের ওপর।"

আমার মনে হলো তেলকালিবাবুর সমস্ত অঙ্গ থেকে মাতৃস্নেহ ঝরে পড়ছে।

মোছামুছি ও তেল খাওয়ানো শেষ করে তেলকালিবাবু বললেন, "মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করিয়ে দেবেন। মাসে একবার অন্তত বুড়ীকে একটু মালিশ করে যাবো। অনেক দিন যত্নআত্তি হয়নি বলে খুব অভিমান হয়েছে—মেশিনে হাত দিয়েই আমি বুঝতে পারছি, মনুষ্যজন্ম পেলে এখান থেকে ছুটে পালাত, আমি গায়ে হাতই দিতে পারতাম না।"

মেশিনের কাজকর্ম শেষ করে তেলকালিবাবু আবার মুখ তুলে আমার

দিকে তাকালেন। তারপর আরম্ভ করলেন, "কী যেন জানতে চাইছিলেন? এখানকার বড় বড় ঘরের এমন কম কম ভাড়া কেন?"

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

তেলকালিবাবু জুট-এ হাত মুছতে মুছতে বললেন, "ব্যাপারটা আগে খুবই সোজা ছিল। রামসিংহাসনজীই ছিলেন এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নতুন ভাড়াটেরাও জানতেন রামচরিতটি ঠিক মতো বুঝতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

রামসিংহাসনজীও ঝোপ বুঝে কোপ মারতেন। তবু ভাড়াটেকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আন্দাজ করে নিতেন ঝোপটি কী ধরনের—কতখানি কোপ সইবে। তারপর খেলানো শুরু হতো।

"ফিলাট? হাঁ, ফিলাট একটা খালি হচ্ছে বটে। কিন্তু এখন আবার ভাড়া দেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।"

দায়টা হবু ভাড়াটের। সুতরাং, তিনি বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলবেন, ফ্ল্যাটটা আমার বিশেষ দরকার। দারোয়ানজী, একটু হেল্‌প করতেই হবে।

দারোয়ানজী তখন প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলবেন, মানুষকে সেবা করাই তাঁর ধর্ম। বাবুজী যখন আশ্রয় খুঁজছেন, তখন অবশ্যই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু বাড়িটা তো দারোয়ানজীর নয়—বাড়িটা মালিকের। এবং এখন পুরনো সেই দিনকাল নেই যখন মালিকরা দারোয়ানের ওপরই সব ছেড়ে দিতেন। এখন মালিকরা সমস্ত ব্যাপারে মাথা ঘামান।

হবু ভাড়াটে তখন হয়তো জানতে চাইবেন, তা হলে মালিকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন কিনা?

রামসিংহাসনজী তখন চটপট শুনিয়ে দেবেন, ইচ্ছে হলে অবশ্যই তিনি মালিকের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। "তবে মালিক এখন বেনারসে, ফিরতে দেড় মাস। এবং ফেরবার পরেও দেখা হলেও ভাড়া দশগুণ বেড়ে যাবে।"

হবু ভাড়াটে এর পর অবশ্যই নরম হয়ে পড়েন। তখন পণ্ডিতজী বলবেন, "ফিকর্ মাত্ কীজিয়ে। আপনি দু'একদিন পরে আসুন।" দারোয়ানজী এর মধ্যে খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কীভাবে কী করা যায়।

যথা সময়ে দারোয়ানজী নিজেই এবার হবু ভাড়াটের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

একগাল হেসে হবু ভাড়াটেকে দারোয়ানজী জিজ্ঞেস করবেন, "তিন চার মাস অপেক্ষা করতে তাঁর কোনো অসুবিধা আছে কি না?"

হবু ভাড়াটে হাঁ হাঁ করে উঠবেন। এত দিন কী করে অপেক্ষা করবেন? তাঁর তো এখনই ফ্ল্যাট দরকার।

দারায়ানজী মৃদু হাসবেন, তাঁর মধ্যে ব্যস্ততার কোনো চিহ্ন ফুটে উঠবে না। তিনি বলবেন, "বাবুজীর কষ্ট দেখে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু হাত-পা বাঁধা।"

এর পরেও উদ্বেগ দেখালে হবু ভাড়াটে অকস্মাৎ আশার আলো দেখতে পাবেন। দারোয়ানজী বলবেন, "মালিকের কাছ থেকে সোজা পথে ঘর নিতে হলে ভাড়ার পরিমাণ অন্তত দশ গুণ বাড়বে। তার থেকে সহজ পথ হলো, এখানকার যে ভাড়াটে আছেন তার কাছ থেকে সোজাসুজি ফ্ল্যাট নেওয়া। ভাড়া এক পয়সা বাড়বে না। হাতে হাতে দখল, দারোয়ানজী নিজেই সব

ব্যবস্থা করে দেবেন। পরিবর্তে বর্তমান ভাড়াটেকে কয়েক হাজার টাকা ক্যাশ দিতে হবে।"

হবু ভাড়াটে তখন হয়তো মাথা চুলকোচ্ছেন। দারোয়ানজী বলবেন, আখেরে এতে আপনারই সস্তা হয়ে গেলো। প্রায় 'মুফতসে' এই বাড়ির ভাড়াটে হয়ে থাকবেন।

এর পর হবু ভাড়াটে এক সময় ফ্ল্যাটের দখল পেয়ে যান। তারপর দারোয়ানজী আবার কিছু রোজগার করেন। মাঝে মাঝে বলেন, "নিজের নামে রসিদ পেতে হলে আরও কিছু খরচাপাতি করতে হবে।"

আরও কয়েক হাজার টাকা হজম করে নিয়ে এক সময় নতুন নামে রসিদ কাটা শুরু হয়ে যায়। কোন্ ফ্ল্যাটে কে আছে, মালিকদের কে তার খোঁজখবর রাখে? দারোয়ানজীকে জিজ্ঞেস করলেই বলবেন, "না হুজুর, এই পার্টি বহু বছর এখানে আছেন। এবং খুব ভাল পার্টি, রেগুলার ভাড়া দিয়ে যান।"

"বুঝলেন কিছু?" জিজ্ঞেস করলেন তেলকালিবাবু।

ব্যাপারটা এখন বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছি।

"এইভাবেই চলছে এবং যাতে চলে যায় তার চেষ্টাও হবে! এই বলে আমাকে একটু ভাবিত করে তেলকালিবাবু নিজের কাজে বিদায় হলেন।

একটু পরেই আমি অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসেছি।

রামসিংহাসনের চরিত্রটা আমি মনে মনে খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। তারপর ভাবলাম, এই সব বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যখন যে সমস্যা আসবে সাধ্যমত তার মুলাকাত করা যাবে। আগে থেকে অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

এরপর কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসেছে, তাও লক্ষ্য করিনি।

শুয়ে শুয়ে আপন মনে নিজের ভূত-ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিলাম। নাটকীয়ভাবে চৌত্রিশ নম্বরের দখল পেয়ে মনে মনে বোধ হয় একটু আত্ম-তুষ্টি অনুভব করছিলাম।

ঠিক সেই সময় পটভূমি আবার কম্পমান হয়ে উঠলো। সহদেব আমার কাছে এসে ডাকলো, "সায়েব, সায়েব। এখনও ঘুমোচ্ছেন নাকি?"

"না ঘুমোচ্ছি না।" আমি বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

সহদেব বললো, "এক মেমসায়েব আপনার ঘরে আসতে চাইছেন?"

"আমার ঘরে? মেম সায়েব?" আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছি।

"নিয়ে আসি?" সহদেব জিজ্ঞেস করলো।

"আঃ, সহদেব! দেখছো, আমি ধুতিখানা লুঙ্গির মতো জড়িয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে শুয়ে আছি। কোন্ মেমসায়েব?"

জিভ কেটে সহদেব বললো, "আমি তো কিছুই জানি না।" ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ ছাড়ছে।"

"আঃ, সহদেব! নাম কী মেমসায়েবের?" আমি জিজ্ঞেস করি।

জিভ কেটে সহদেব বললো, "আমি তো কিছুই জানি না।" ভুর ভুরে গন্ধ শুঁকেই বিনাবাক্যব্যয়ে সহদেব আমার কাছে চলে এসেছে।

নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে সহদেব। বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের জন্যে সহদেব এবার দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলো।

সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে শ্রীমান সহদেবকে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরতে দেখে বেশ আশ্বস্ত হচ্ছিলাম। সুখশয্যা প্রলম্বিত করবার কিছু ফন্দিও মাথায় আসছিল। কিন্তু কপালে সুখ নেই। সহদেবকে ঠাণ্ডা করে তার প্রতিবেদন শোনবার আগেই মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ আমার এবং সহদেবের নাকে এসে পৌঁছুল।

সজাগ সারমেয়র মতো সুহদেব তার নাসিকার তাৎক্ষণিক ব্যবহারে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলো অপরিচিত বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সে কোনোরকম মন্তব্য না করে দেওয়ালে ব্রাকেটে টাঙানো আধময়লা পাঞ্জাবিখানা দ্রুত নামিয়ে এনে আমার হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে ওটি যথাসম্ভব দ্রুত পরে ফেলতে সিগন্যাল দিলো।

ফায়ার ব্রিগেডের সজাগ কর্মীরা বিপদ-সংকেত পেলে যত দ্রুত প্রস্তুত হতে পারেন আমি তার আগেও আজানুলম্বিত পাঞ্জাবিতে লজ্জা নিবারণের আপৎকালীন ব্যবস্থা করে ফেলেছি। লুঙ্গির আকারে জড়ানো ধুতিটাকে নিয়ে কী করবো ভাবছি, কিন্তু পরিস্থিতি আর আয়ত্তে রাখা সম্ভব হলো না। ঘরের ভুরভুরি গন্ধ এবার এমনই তীব্র হয়ে উঠলো যে সুঘ্রাণের উৎস যে অতি নিকটেই উপস্থিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না!

সহদেব কোনোরকমে ঘোষণা করলো, "মেম সাব।" এবং তার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যিনি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হলেন তাঁকে এর আগে কোনোদিন স্বচক্ষে দেখেছি বলে স্মরণ করতে সক্ষম হলাম না।

কিন্তু সুঘ্রাণের উৎসমতী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন তাঁর সঙ্গে আমার কতদিনের চেনা। তাঁর সখীভাবাপন্ন হাস্য যেন নিঃশব্দে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "এতোদিন কোথায় ছিলেন?"

অপরিচিতা অবশ্যই সুন্দরী। যদি ইনি বঙ্গললনা হন, তাহলে অবশ্যই বাঙালিনীদের তুলনায় তিনি দীর্ঘাঙ্গিনী। অপরিচিতা অবশ্যই মধুর-হাসিনী—তিনি, গৌরাঙ্গী বলেই আন্দাজ করছি, কিন্তু শরীরের অনাবৃত অংশে অত্যন্ত উদারভাবে মেকআপ ফাউন্ডেশন ব্যবহারের লক্ষণ রয়েছে। শুধু মুখমন্ডল বা গ্রীবা নয়, অনাচ্ছাদিত বাহুলতা উৎসমুখ থেকে সযত্নে ফাউন্ডেশন-ক্রিমে চর্চিত। ব্লাউজের শেষ সীমানা থেকে নাভিদেশে শাড়ির উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত অংশটিও নিখুঁত প্রলেপন থেকে বঞ্চিত হয়নি।

আমার অনভ্যস্ত দৃষ্টি বাহুমূল থেকে হড়কে এই বহুপ্রচারিত কটি-দেশে আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। অতি দ্রুত নজর উঁচু করে মহিলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করামাত্র তিনি ফিক করে হেসে ফেললেন।

সুন্দরী এবার ভ্রূধনু ভঙ্গ করলেন এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করলাম ভ্রূর প্রতিটি কেশ সযত্নে উৎপাটিত এবং সেখানে যে কালিমার নিপুণ টান আছে তাকে পটে আঁকা ছবিটি বলা কোনোক্রমেই অন্যায় হবে না।

পটেশ্বরী এবার কোনোরকম উপক্রমণিকা না-করে অভিযোগ করলেন

"উঃ কোন্ পাহাড়ের চূড়োয় থাকেন আপনি! কৈলাশের শংকর-এর সঙ্গে দেখা করতে হলেও এতো সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।"

সুন্দরী এবার সহদেবের দিকে মুখ ফেরালেন এবং নিচু গলায় বললেন, "একটু জল!"

আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমার ঘরে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। সহদেব আমার অবস্থা বুঝে মুখের দিকে তাকালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলাম, "সহদেব পানি।"

সহদেব আমার চাকর নয়—আমার ঘরের অতিথিকে পানীয় সরবরাহের হুকুম তামিল করবার কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই। তবু সহদেব আমাকে বাইরের লোকের চোখে হেয় করলো না। "এখনই আসছি হুজুর", বলে সে ক্ষিপ্রগতি হরিণের মতো প্রায় লাফ দিয়ে অদৃশ্য হলো।

অপরিচিতা সুন্দরীকে দেখে খুবই তৃষ্ণার্ত মনে হয়েছিল। তাঁর মুখে-চোখে একটা করুণ ভাবও ফুটে উঠেছিল—হয়তো লিফট বন্ধ, এতোখানি এক নাগাড়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসতে গিয়ে মহিলার গলা শুকিয়ে উঠেছে।

"জল এখনই আসছে", এই আশ্বাস দিতে গেলাম।

কিন্তু সুন্দরীর মুখভঙ্গী এবার বিদ্যুৎগতিতে পরিবর্তিত হলো। তৃষ্ণায় কাতর মুখশ্রীতে এবার রহস্যময়ী অথচ অন্তরঙ্গ হাসি ফুটে উঠলো। উত্তেজনাহীন অনুচ্চকণ্ঠে সুন্দরী বললেন, "জল না এলেও কিছু এসে যায় না। এই মাত্র আমি আইসকোল্ড কোকাকোলা খেয়ে এসেছি।"

তা হলে? আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম।

অপরিচিতা শান্তভাবে বললেন, "আসলে লোকটিকে আমিই বিদায় করতে চাইছিলাম। আমাদের দুজনের কথাবার্তার মধ্যে আর একটা থার্ড পারসন সিংগুলার নাম্বার ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে থাকুক এটা আমি চাই না।"

আমি একটু নার্ভাস হয়ে উঠছি। কী উত্তর দেবো ভাবছি। কারণ থার্ড পারসন সিংগুলার নাম্বার যে এখনই জলের গেলাস হাতে ফিরে আসবে তা এই মহিলার আন্দাজ করা উচিত ছিল।

মহিলা এবার তাঁর পরিচয় ঘোষণা করলেন। বললেন, "আপনি আমাকে চিনবেন না—আমি মিসেস পপি বিশোয়াস।"

পপি বিশোয়াস! প্রাতঃস্মরণীয় নাম—সুলেখার স্মৃতিবিজড়িত এ-নাম এরই মধ্যে আমি কেমন করে ভুলতে পারি?

পপি বিশোয়াস বললেন, আমাকে সোশ্যাল ওয়ার্কার, ট্রাভেল এজেণ্ট, বুটিক ওনার যা-খুশি বা থ্রি-ইন-ওয়ান বলতে পারেন।"

বাটিক কথাটা আগে কানে গেলেও বুটিক শব্দটি আগে কখনও শুনিনি। ভাবলাম বাটিক শব্দটিই মেমসায়েবী উচ্চারণে বুটিক হয়েছে।

বোকার মতো আমি জিজ্ঞেস করে বসেছি, "বাটিক ছবি আঁকেন?

"ও মাই 'গাড'! কোন্ দুঃখে আমি বাটিকের বিজনেস করতে যাবো? ওসব লোয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড মেয়েরা করে। আমি বুটিক-ওনার। বুটিক কথাটা শোনেননি?" বকুনি লাগালেন পপি বিশোয়াস।

পপি বিশোয়াস এবার ব্যাখ্যা করলেন, "ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। মানে লেটেস্ট ফ্যাশনের জামাকাপড়, হ্যাণ্ডব্যাগ, পারফিউমস, এটসেট্রার ছোট্ট দোকান।

আপনি পপি ফ্লাওয়ারের নাম শোনেননি ? হোয়াট এ পিটি ! ইন্টারন্যাশনাল-ফেমাস বুটিক—আর আপনারা কলকাতায় বসেও নাম জানেন না !"

নিজের ওপরেই রাগ হলো। আমি যে সত্যিই একটা হাঁদাগঙ্গারাম তার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া গেলো। মনে মনে স্মৃতির সর্বত্র টানাটানি করেও 'পপি ফ্লাওয়ার'-এর খোঁজ পেলাম না।

কথায় একটু বাধা পড়লো। কারণ শ্রীমান সহদেব ইতিমধ্যে দুগ্লাস জল হাতে ফিরে এসেছে। মণিপুরী নৃত্যের স্টাইলে মিসেস বিশোয়াস যেভাবে ঠোঁটের লিপস্টিক বাঁচিয়ে সামান্য একটু জল কণ্ঠনালিতে চালান করে দিলেন তা একটি দ্রষ্টব্য দৃশ্য। আমি ঠিক সেই সময়ে ঢক-ঢক করে পুরো গেলাস জল নিঃশেষ করে দিচ্ছি।

"গুড হেভেনস! আপনি তো দেখছি আমার থেকে থারসটি!" দাঁতে চিবিয়ে-চিবিয়ে পপি বিশোয়াস আমার জল খাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে দ্বিধা করলেন না। "এ জানলে এতোখানি জল নষ্ট করতাম না আমি". পপি বিশোয়াস তার প্রবল ব্যক্তিত্বের রোশনাই ইতিমধ্যেই আমার ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

খালি গেলাস হাতে সহদেব আবার অদৃশ্য হতে পপি বিশোয়াস একটু স্বস্তি পেলেন। কিন্তু সেই অনুপাতে আমার অস্বস্তি বাড়লো—সহদেব এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই যেন আমার ভাল হতো।

পপি বিশোয়াস এবার দম্ভ-থলিকা থেকে সিগারেট বার করে লিপিস্টিক-রঞ্জিত দুই ঠোঁটের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরলেন যেন বেচারার সিগারেট জন্ম সার্থক হলো। লাইটারে আগুন জ্বালাতে গিয়ে পপি বিশোয়াসের খেয়াল হলো সৌজন্যের ত্রুটি হয়ে গিয়েছে। "ও আই অ্যাম স্যরি", বলে পপি বিশোয়াস ব্যাগ থেকে সিগারেটের ঝকঝকে প্যাকটটা বার করে আমার মুখের কাছে ধরলেন।

"নিন, এই সিগারেট এখানে পাবেন না।" মৃদু মন্তব্য করলেন পপি বিশোয়াস। "আমার আবার ইমপোর্টেড ছাড়া চলে না। সিগারেট দুদিন না খাবো তাও ভাল, তবু ঐ দিশী ঘাসপাতাগুলো স্মোক করতে পারি না !" মন্তব্য করলেন সুন্দরী।

সুন্দরীর সস্নেহ প্রস্তাব আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করায় পপি বিশোয়াস একটু অবাক হলেন। "ও মাই লর্ড আপনি স্মোক করেন না ? সিগ্রেট না-খেলে ম্যানলি হওয়া যায় না, মিস্টার শংকর !"

নিজের ঘরেই আমি সিঁটকে যাচ্ছি। কোনোরকম উত্তর না-দিয়ে অপ-রাধীর মতো দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলাম।

পপি বিশোয়াস এবার সৌজন্যের আলোক বিকীরণ করে জানতে চাইলেন, "ডু ইউ মাইন্ড, ইফ আই স্মোক ?"

"কিছু মনে করবো না—আপনি একশবার স্মোক করুন", আমি সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করলাম।

কিন্তু তবু পপি বিশোয়াসকে সন্তুষ্ট করা গেলো না। অভিযোগ, কৌতুক ও উপদেশের বিচিত্র ককটেল মুখভঙ্গীতে মিশ্রিত করে পপি বিশোয়াস বললেন, "ইয়ংম্যান, এখনও সমস্ত ম্যানারস শেখা হয়নি। অন্য কোনো মহিলা হলে খুউব রাগ করতো।"

আমি তো ওঁর কথা শুনে বেশ অপ্রস্তুত। পপি বিশোয়াস ঠোঁটের

সাঁড়াশি থেকে সিগারেটটা কিছুক্ষণের জন্যে মুক্ত করে আমাকে ট্রেনিং দিলেন, "আমার আপত্তি নেই, আপনি স্মোক করুন বললেই পুরুষ মানুষের দায়িত্ব চুকলো না। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেশলাই অথবা আগুন জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে সাহায্য করতে হয়।"

শাজাহান হোটেলের রিসেপশনে কাজকর্ম করলেও কখনও মেয়েদের মুখাগ্নি করিনি। আজ সৌজন্যের ব্যাকরণ অনুসরণ করতে গিয়ে বেশ বিরক্ত হলাম।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে পপি বিশোয়াসের সিগারেট প্রজ্জ্বলিত করতে হলো।

অনেকখানি ধূসর ধোঁয়া এক সঙ্গে ছেড়ে ফরাসী ফ্যাশন ম্যাগাজিনের সুন্দরীদের স্টাইলে আপনাতে-আপনি-পরিপূর্ণ পপি বিশোয়াস জ্বলন্ত সিগারেটটা দুটি নরম আঙুলের মধ্যে অবহেলাভরে ধরে রইলেন।

পপি বিশোয়াস তাঁর পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্বের স্রোতে ইতিমধ্যেই আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন। কারণ, কী জন্য এসেছেন, কী কাজ, এসব কোনো প্রসংগ না-তুলেই তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল দেখাতে দ্বিধা করলেন না।

আরও একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ত্যাগ করে তিনি বললেন, "আপনার মতো ইয়ং ম্যানেজার তো কলকাতার কোনো ম্যানসনেই দেখি না। সব জায়গায় ওল্ড ম্যান। কম বয়সে যখন রক্ত টগবগ করে ফোটে, তখন এসব কাজ ভাল লাগে? বোরিং মনে হয় না?"

"ভিক্ষের চাল, কাঁড়া আর আঁকাড়া! আমি উত্তর দিই। "চাকরিই পাওয়া যায় না।"

"ওমা! চাকরির আবার অসুবিধে কী? কত লোক আসেন আমার কাছে। আমাকে অবলাইজ করবার জন্যে ছটফট করেন—চাকরি দিতে পারলে ধন্য হয়ে যাবেন!"

লোভ লাগলেও পপি বিশোয়াসের কথাগুলো আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাছাড়া একেবারে নতুন লোক, প্রথমেই এতো ভাল ভাল কথা ঠিক নয়।

পপি বিশোয়াস খানিকটা ধোঁয়া হজম করে বললেন, "আপনাদের এসব লাইনে মাইনে খুব কম, আমি জানি। সুবিধের মধ্যে দুটো একসট্রা পয়সা রোজগারের সুযোগ আছে। দু'তিনটে বাড়ির ম্যানেজারদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। রেগুলার ডিলিংসও রয়েছে বলতে পারেন।"

পপি বিশোয়াসকে এই মুহূর্তে খুব দয়াবতী মনে হলো। ছটফটে পপি এবার যে-মুদ্রায় স্থির হয়ে রইলেন তাতে তার মসৃণ বাম বাহুমূলের গভীরতম অঞ্চলগুলিও সম্পূর্ণ দৃশ্যগোচর হলো।

পপি বললেন, "যেখানে আমার বুটিক—পপি ফ্লাওয়ার, ওখানকার ম্যানেজার মহম্মদ হানিফ। বেস্ট অফ রিলেশনস্ আমার সঙ্গে। আমার পলিসি হলো, এই বিজনেসে যখন রয়েছি তখন যার যা ন্যায্য পাওনা-গন্ডা তার থেকে তাকে বঞ্চিত করবো না। হানিফ সায়েবকে জিজ্ঞেস করবেন, না চাইতে ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা দিয়ে দিই ওঁকে।"

একটু হাসলেন পপি বিশোয়াস। "আপনাদের লাইনে নিজেদের মধ্যে তো ভিতরে ভিতরে জানাশোনা থাকে। জিজ্ঞেস করে দেখবেন হানিফ সায়েবকে। ও-বাড়ির মালিক আচমকা সব ফেলে রেখে পাকিস্তানে পালি-

য়েছে। হানিফ সায়েবই বলতে গেলে অল-ইন-অল।"

আমি এই মহম্মদ হানিফকে চিনি না—চেনবার তেমন আগ্রহও নেই। কিন্তু পপি বিশোয়াস নিজের খেয়ালেই হুড় হুড় করে বললেন, "ম্যানেজারের সঙ্গে ভাল সম্পর্কের হাতে হাতে ফল। হানিফ সায়েব যেভাবে আমাদের হেল্প করেন, বুটিকের মেয়েগুলোর ওপর নজর রাখেন—আপনাকে কী বলবো!"

একটু হাসলেন পপি বিশোয়াস। "আপনি যখন এ-বাড়ির ম্যানেজার তখন সবই তো বোঝেন। যে পুজোর যে মন্তর। বুটিকটা আমার পক্ষে খুব ইমপর্টান্ট। কারুর ওখানে পায়ের ধুলো ফেলতে সংকোচ হয় না। তবু কখন কী হয় বলা যায় না। কিন্তু হানিফ সায়েব সব সময় এমন কড়া নজর রেখেছেন যে আমার কোনো চিন্তাই হয় না!"

বুটিকের ব্যাপারটাও এবার একটু গোলমেলে ঠেকছে আমার কাছে। ম্যানেজার হানিফ কী ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকেন তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

পপি বিশোয়াসের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। হাতের গোড়ায় ছাইদানি দেখতে না পেয়ে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে দিলেন পপি বিশোয়াস। তারপর বেমালুম আমাকে বললেন, "চটি দিয়ে আগুনটা একটু চেপে দিন তো, মিস্টার শংকর।"

বিপাকে পড়ে অগ্নি-নির্বাপণও আমাকে করতে হলো। পপি বিশোয়াস ততক্ষণে আবার কথা বলতে শুরু করেছেন। বললেন, "আমার সঙ্গে কাজ-কারবারে কারুও অসুবিধে হয় না, মিস্টার শংকর।"

এবার পপি জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কী রকম পেয়ে থাকেন আপনারা!"

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি বললাম, "মাইনে নামমাত্র।"

"দূর মশায়!" বকুনি লাগালেন পপি বিশোয়াস, "মাইনের কথা কে জিজ্ঞেস করছে? আর সব?"

আমার তো আকাশ থেকে পড়বার অবস্থা। "আমাকে? উপরি?"

পপি বিশোয়াস মোটেই দমলেন না। প্রত্যুত্তরে উনিও আকাশ থেকে পড়লেন। "ওমা! চৌত্রিশ নম্বরের সুলেখা সেন। ও আপনাদের কিছু দেয় না?"

আমাকে নির্বাক দেখে পপি বিশোয়াসের কী আফসোস। "ওমা! ছি ছি। এতো 'মীন্'—একটা পয়সাও হাতছাড়া করে না। আমি তো ভাবতেও পারি না, মিস্টার শংকর। হানিফ সায়েবের সঙ্গে আমার মান্থলি ব্যবস্থা তো আছেই—তাছাড়া টুকটাক, এটা সেটা মাঝে-মধ্যে পেয়েই যাচ্ছেন। না হলে চলবে কেন—সবারই তো ঘর-সংসার আছে, খরচাপাতি আছে।"

পরবর্তী প্রস্তাব আলোচনার জমি তৈরি হয়েছে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পপি বিশোয়াস আবার ব্যাগ খুলে ফেললেন এবং ভিতর থেকে একটি বিদেশী ফয়েলে মোড়া প্যাকেট বার করে নরম হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। এবার একটি ট্যাবলেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আর একটি নিজের মুখে পুরে ফেললেন পপি বিশোয়াস।

বললেন, "এখানে পাওয়াই যায় না। মেড ইন জাপান। স্মোকিং-এর পর মুখে রাখলে গলাটা ঠান্ডা হয়ে যায়।"

আমার দিকে এগিয়ে দেওয়া ট্যাবলেটের মোড়কটা খুলতে খুলতে পপি

বললেন, মুখে পুরে দিন, খুব ভাল লাগবে। গলাটা আপনার এয়ার কন্ডিশন হয়ে যাবে। আমার পুরনো কাস্টমাররা জানে, ওরাই নিয়ে আসে। না হলে, কলকাতায় এসব জিনিস আমি কোত্থেকে পাবো?”

আমার দ্বিধা তখনও কাটছে না। এবার খিল খিল করে হাসলেন পপি বিশোয়াস। “ভয় নেই, আপনাকে বিষ খাওয়াচ্ছি না। মিষ্টি-মিষ্টি টক-টক ঠান্ডা-ঠান্ডা ঝালঝাল পিক্যুলিয়র টেস্ট—কখনও খাননি।”

অগত্যা মুখে পুরতে হলো। জিনিসটার স্বাদ আমার তেমন ভাল লাগছে না। কিন্তু উপরোধে অনেকে ঢেঁকিও গেলেন।

পপি বিশোয়াস এবার আসল প্রসঙ্গে এলেন। জাপানী ট্যাবলেট গালের এক পাশে চালান করে পপি বললেন, “যে জন্যে আপনাকে ডিসটার্ব করতে এলাম মিস্টার শংকর। চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা আমি চাই।”

চৌত্রিশ নম্বর! চাবি? আমি কি উত্তর দেবো ঠিক করে উঠতে পারছি না।

পপি বিশোয়াস একগাল হেসে বললেন, “ভাবছেন, চৌত্রিশ নম্বরের চাবি চাইবার ইনি আবার কে? সুলেখাকেই তো একমাত্র চিনতেন। কিন্তু জানবেন, আমিই সব! মিস্টার জেঠমালানি আমার বহুদিনর ফ্রেন্ড। বহু ব্যবসা-বাণিজ্য করেছি এক সঙ্গে। আমি সব জানি! সুলেখা সেন যে আজ সকালে বিদায় হয়েছে তাও জানি। এখন লক্ষ্মীটি, মিস্টার শংকর, চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা আমাকে দিন।”

পপি বিশোয়াসের কথাগুলো বরফঠান্ডা হাওয়ার মতো আমার কানের মধ্যে ঢুকেছে। এমন কিছু চাঞ্চল্যকর কথাবার্তা এখনও পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু অজানা আশংকায় আমার সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠলো।

পপি বিশোয়াসের সুদীর্ঘ তনুর দিকে আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে আছি। পপির শেষ কথাগুলো আমার কানে বাজছেঃ “সুলেখা সেন যে আজ সকালে বিদায় হয়েছে তা জানি। এখন লক্ষ্মীটি, মিস্টার শংকর, চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা আমাকে দিন।”

মনে মনে আমি ডায়ালগ তৈরি করছি। নিঃশব্দে পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি রিহার্সাল দিচ্ছিঃ “পপি বিশোয়াস, তুমি কে হে? তোমাকে তো আমি চিনি না জানি না। কোন্ অধিকারে সোজা আমার ঘরে ঢুকে এসে তুমি এই ভাবে চৌত্রিশ নম্বর ঘরের চাবি চাইবার সাহস দেখাচ্ছ?”

পপি বিশোয়াস আমার নীরবতার অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না। সর্বত্র বিজয়িনী হওয়াটা বোধ হয় তাঁর এমনই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে পপি অল্পক্ষণেই অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

পপি ভাবছেন আমি বোধ হয় স্রেফ কুঁড়েমি করেই চুপচাপ বসে আছি। ছটফটে পপি একটু আদুরেভাবেই অভিযোগ করলেন, “এখনও শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করছে বুঝি? দুপুর বেলায় কী করে ঘুমোন, মিস্টার শংকর?”

বোধ হয় পপি বিশোয়াসের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো আমি পুরুষমানুষ। ঠোঁট উল্টে বললেন, "আপনারা পুরুষমানুষ! আপনাদের দুপুরে ঘুমানোও মাপ। মেয়েদের কথা বলবেন না। চোখে ঘুম জড়িয়ে এলেও জলের ঝাপটা দিয়ে দুপুরে জেগে থাকতে হয়। দিবানিদ্রা মেয়েদের ফিগারের বারোটা বাজায়। ওই যে সুলেখা সেন। আমি শুনেছি, দুপুরেও চান্স পেলে ঘুমিয়ে নেয়। কয়েকটা মাস যাক—তারপর কী হয় দেখবেন! ফিগারের যদি টুয়েলভ-ও-ক্লক না বাজে তো কী বলেছি!"

আমি এখনও নিরুত্তর।

কিন্তু পপি বিশোয়াসের নিদ্রাভাষ্য সহজে বন্ধ হলো না। তিনি বলে চললেন, "আপনারা পুরুষমানুষরা বেশ আছেন। দুপুর বেলায় ঘুমুলে আপনাদেরও পেটের কাছে নেয়াপাতি ডাব জমা পড়ে কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। পুরুষমানুষদের একমাত্র ইমপর্টাণ্ট ফিগার হলো ব্যাংকের ফিগার, আর মেয়েদের বডির ফিগার।"

মুখের হাসি চাপা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। পপি বিশোয়াস তা লক্ষ্য করে উল্লসিত হলেন এবং একতরফা কথার বেগ আরও বাড়িয়ে দিলেন।

ঠোঁট আর একবার উল্টে পপি বললেন, "একথা আমি মিস্টার জেঠ-মালানিকেও বলেছি—কিন্তু তিনি হাসেন নি। বরং গম্ভীরভাবে আমাকে তারিফ করেছেন সত্যি কথা বলবার জন্যে।"

আমাকে এখনও চৌত্রিশ নম্বরের চাবি সম্বন্ধে তৎপর না হয়ে উঠতে দেখে পপি বিশোয়াস একটু অবাক হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, "কী হাঙ্গামা বলুন তো। এসব আমার মোটেই ভাল লাগে না। জেঠমালানিদের ওখান থেকে খবর দিলো, কোনো অসুবিধে হবে না। সব টিপ টপ থাকবে। থ্যাকারে ম্যানসনেই চাবি রয়েছে। চাইলেই পাওয়া যাবে।"

আমি মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ছক কাটতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এই সময় নীরবতাই সবচেয়ে নিরাপদ।

পপি বিশোয়াস বলে চললেন, "এখানে এসে কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঐ সুলেখা মেয়েটা যেন কেমন! কাকে কী দিয়ে গেছে ঠিক-ঠিকানা নেই।"

আমি এবার গম্ভীরভাবে উত্তর দিই, "এ-ব্যাপারে ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারের কী করবার থাকতে পারে? সুলেখা সেনের কাজ-কর্মের জবাব-দিহি করার দায়িত্ব নিশ্চয় আমার নয়।

আমার কথাগুলো কিন্তু মিসেস বিশোয়াসের কানে ঢুকলোই না। তিনি আপন মনে বলে চললেন, "কোথাও গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা আমার অভ্যেস নয়। মিস্টার জেঠমালানির ব্যাপারটাও বুঝি না। এতো বড়ো ফ্ল্যাট রেখেছেন, অথচ একটা সব-সময়ের চাকর রাখেননি। সব কাজ কী আর পার্ট-টাইম লোক দিয়ে হয়? ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার করে লাভ কী তোদের? কিছু মনে করবেন না, ভাই..."

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিবেদনের আগে কুশলী পপি বিশোয়াস আমার কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। কী এমন ব্যাপার, যাতে আমার মনে করবার থাকতে পারে? আমার সম্পূর্ণ দৃষ্টি স্বভাবতই পপি বিশোয়াসের মুখের ওপর সংহত হলো।

আরো একটা সিগারেট পপি বিশোয়াসের সুন্দর মুখে প্রজ্বলিত হলো।

কুমারী সিগারেটের প্রথম টানটি যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত করলেন পপি। তারপর বললেন, "এই ইন্ডিয়ানদের কথা বলছি। যত বড়লোকই হোক, নজর বড্ড নিচু হয়। মানুষের দাম, কাজের দাম, প্রাণখুলে দিতে চায় না। বাড়ির ঝি-চাকরের রেটে সবাইকে মাইনে দিতে পারলেই খুশী হয়। সায়েবদের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। যত ছোট প্রতিষ্ঠানের সায়েব হোক, আমি তো দেখছি, ওরা মানুষের দাম কমাতে ব্যস্ত নয়। এই তো গতকালই এক ইংরেজ ছোকরা এসেছিল আমাদের বুটিকে গার্ল ফ্রেন্ডের সন্ধানে।"

দ্বিতীয় কিস্তি সিগারেটের ধোঁয়া উপভোগ করলেন পপি বিশোয়াস। তারপর বলে চললেন, "আমাদের লোলিতা, এদিকে এতো স্মার্ট, কিন্তু পার্টি দেখে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, দাম অনেক কমিয়ে বলেছে। ইন্ডিয়ান হলে, এর পরেও দরদস্তুর করতো এবং যাবার সময় বড় জোর ঐটুকু পয়সা ফেলে কেটে পড়তো। কিন্তু সায়েবের কথা শুনুন..."

পপি বিশোয়াস তৃতীয়বার সিগারেটের ধুম্রপান করলেন. এবং শান্তভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রশস্তি গাইলেন, "সায়েবদের কথাই আলাদা, সাধে কি আর আমরা ওদের টপ প্রেফারেন্স দিই।"

আমি ওঁর মুখের দিকে আবার তাকালাম। পপি পুনরাবৃত্তি করলেন, "ঠিকই বলেছি। চাকরি-বাকরি থেকে আরম্ভ করে আমাদের লাইনের কাজে-কম্মে সব জায়গায় ফরেন কোম্পানি এবং ফরেন পার্টির ফার্স্ট প্রেফারেন্স। এই আপনি। এখন যদি ফরেন কোনো কোম্পানিতে কাজ পান, তাহলে কী এখানে বসে থাকবেন?"

চাকরির ব্যাপারটা আমাকে অকারণে সুড়সুড়ি দেয়। এ-ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমি হারিয়ে ফেলি। মনে হয়, এই বুঝি সত্যিই কোনো দশটা-পাঁচটার নির্ঝঞ্ঝাট চাকরি জুটে গেলো।

পপি বিশোয়াস আবার আরম্ভ করলেন, "যা বলছিলাম, আমাদের সায়েব গেস্টের কথা। লোলিতার কাজে-কম্মে সন্তুষ্ট হয়ে সায়েব তো চার-গুণ টাকা বার করে ফেললেন। লোলিতা প্রথমে ভাবলে সায়েব হিসেবে ভুল করছেন। নতুন ফরেনারদের ওরকম হয়ে থাকে, টাকার সঙ্গে পাউন্ড বা ডলারের অঙ্ক ঠিক মেলাতে পারে না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমার টিমের মেয়েরা খুব অনেস্ট।"

একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে নিলেন পপি বিশোয়াস। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, "লোলিতা বোকার মতো সায়েবকে বলে ফেলেছে, 'তুমি ঠিকভাবে গুনছো তো?' সায়েব সঙ্গে-সঙ্গে বলেছেন, 'আমি অঙ্কে খুবই স্ট্রং। কিন্তু তোমাকে আমি নির্লজ্জভাবে কম দিতে চাই না।' লোলিতা মেয়েটা তো এখনও কচি আছে—এতো কম সার্ভিসের জন্যে এতো টাকা সে কখনও দেখেনি। তাই একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল সে। একটু বোধ হয় ভয়ও পেয়েছিল—বেশী টাকার লেনদেন ঘটিয়ে অন্য কোনো গোলমালে ফেলবে কিনা।"

"অন্য কী গোলমাল?" আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হই।

একটু হেসে পপি বিশোয়াস বললেন, "কত রকমের গোলমাল। আমাদের লাইনে কি গোলমালের শেষ আছে! এই ধরুন চোরা চালান, কিংবা প্রাইভেট খবরাখবর যোগাড় করা। তাছাড়াও পার্সোনাল অনেক গোলমেলে ব্যাপার থাকে...সেসব বিবরণ মুখ ফুটে পুরুষ মানুষকে বলা যায় না। তবে আমার

মেয়েদের এসব ব্যাপারে পই-পই করে ট্রেনিং দেওয়া থাকে। বেশী পয়সার লোভে গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে বিপদ ডেকে আনবে না বা শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট কোরো না। আমার পলিসি হলো, সোজা পথে থেকে অনেস্টলি আর পাঁচজনের মতো যতটা পারো রোজগার করো।"

আমি অবাক হয়ে পপি বিশোয়াসের কথা শুনে যাচ্ছি। প্রায় অপরিচিতা কোনো মহিলা যে এইভাবে কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেতে পারেন তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

সিগারেটের শেষ ধোঁয়া ছাড়লেন পপি বিশোয়াস। তারপর সগর্বে নিবেদন করলেন, "আমার পলিসির কথা আমার আন্ডারের মেয়েরা জানে। কত মেয়ে তো এই একটি কারণেই অন্য জায়গায় মোটা রোজগার ছেড়ে দুদণ্ডের শান্তির জন্যে আমার কাছে আসতে চায়, মিস্টার শংকর।"

পপি বিশোয়াস যে নিজের বিজনেস-পলিসি সম্বন্ধে খুবই গর্বিত। সে বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ পোষণের সুযোগ নেই।

বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি লোলিতা প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা চালাতে লাগলেন। "লোলিতা হাজার হোক আমার নিজের হাতে গড়েপিটে তৈরি করা মেয়ে। সে অতগুলো নোট দেখে স্বভাবতই একটু সন্দেহ করেছে। কিন্তু সায়েব ছোকরা সোজাসুজি আদর করে বলেছেন, তোমাকে আমি কিছুই দিচ্ছি না, মিস্ ইণ্ডিয়া। আমার নিজের দেশে ডবল পয়সা দিয়েও এর হাফ সার্ভিস পাওয়া যাবে না।"

প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন পপি বিশোয়াস। "এসব কথা শুনে এক এক সময় ইচ্ছে হয় এক্সপোর্ট লাইনেই চলে যাই। তা হলে, আপনাদেরও আর এইভাবে জ্বালাতন করতে হয় না।"

পপি বিশোয়াস হয়তো ভেবেছিলেন, এবার আমি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এবং ওঁর মূল্য বুঝে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনস্কামনা সফল করতে সহযোগিতার হাত এগিয়ে দেবো।

কিন্তু আমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারি নি। মনে মনে বিভিন্ন কাল্পনিক পরিস্থিতি নিয়ে রিহার্সাল দিয়ে চলেছি।

পপি বিশোয়াস এখনও অধৈর্য হয়ে উঠলেন না। আমাকে এখনও কোনো প্রত্যুত্তর দিতে না-দেখে, পুরনো গল্পটার রেশ টেনে চললেন—"তা হলে সায়েবদের গুণ দেখুন। দুটো পয়সা বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলতে পারতো। কিন্তু ওদের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের মতো জিলিপির প্যাঁচ নেই। আমার ফার্স্ট হাজবেন্ড বলতেন, জিলিপির মতো প্যাঁচালো খাবার ইণ্ডিয়া ছাড়া ওয়ার্লডের আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর জিলিপিই একমাত্র খাবার যার সর্বভারতীয় ক্যারাকটার আছে—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা যেখানেই যাবেন সেখানেই জিলিপি পাবেন।"

পপি বিশোয়াস এবার আড়চোখে নিজের মনিবন্ধে বন্দী ঘড়িটার দিকে তাকালেন। তাঁর সময়সূচী যে আমার অকারণ নিষ্কর্মে বিলম্বিত হচ্ছে তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি।

পপি বিশোয়াস এবার সোজাসুজি বিজনেস টক আরম্ভ করলেন। পপি চেয়ারের ওপর একটু হেলে পড়ে বললেন, "মিস্টার শংকর, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। আস্তে আস্তে সব হবে। কিন্তু এখন চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটার একটা গতি করুন, প্লিজ!" শেষ শব্দটা জিভের ওপর এমনভাবে

গড়িয়ে দিলেন তিনি যে, অনেকক্ষণ কানে বাজতে লাগলো।

পপি বিশোয়াসকে এইভাবে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এবার আমার কঠিন হবার পালা. কিন্তু নিজের এই ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো অপরিচিতা রমণীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে হলো না।

সুতরাং পপি বিশোয়াসকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে বাক্‌যুদ্ধে নামতে হলো। সময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে পপি বিশোয়াস থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করলাম। বললাম, "একটু পরে আমার সঙ্গে নিচের আপিসঘরে দেখা করলে ভাল হয়।"

আমার অপ্রত্যাশিত উত্তরে পপি বিশোয়াস বোধ হয় একটু বেশী আশ্চর্য হলেন। তিনি ভ্রূ কাঁপিয়ে আধো-আধো সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো, মিঃ শংকর?"

আমি এবার আরও গম্ভীর হয়ে বললাম, "এটা প্রাইভেট ঘর। এখানে মেয়েদের আসাটা ঠিক শোভন নয়।"

এবার লজ্জায় জিভ কাটলেন পপি বিশোয়াস। "ওমা! মেয়েদের এখানে 'নো অ্যাডমিশন' বুঝি! বলবেন তো এতোক্ষণ! আপনার এই বেয়ারাটাও কী রকম? একটা টাকা বকশিস পেয়ে মাথা ঘুরে গেলো—সমস্ত আইন-কানুন ভঙ্গ করে সোজা আমাকে এখানকার পথ দেখিয়ে দিলো।"

আমি কোনোরকম প্রতিবাদ করছি না। পপি বিশোয়াসদের মোটেই বিশ্বাস নেই। এ'রা চটলে অনেক রকম অপকর্ম করতে পারেন। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি তিনি এখান থেকে সরে অফিস ঘরে চলে যান ততই মঙ্গল।

পপি বিশোয়াস বোধ হয় ভেবেছিলেন এবার আমি একটু নরম হবো। কিন্তু আমাকে অটল দেখে মনে মনে তাঁর রাগ বাড়ছে।

গলার সুরে চাপা ব্যঙ্গ মিশিয়ে পপি মন্তব্য করলেন, "কী করে জানবো, মিস্টার শংকর, যে এখানে মেয়েদের পা পড়ে না? জানলে, কে আর সেধে অপমান হতো বলুন?"

এবার পপি বিশোয়াস হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর দৃষ্টি যে পেশাদার ডিটেকটিভ থেকেও প্রখর তার প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হলাম। আমার ঘরের এক কোণে পেরেকের গায়ে পপি বিশোয়াস কী যেন আবিষ্কার করে সবিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেওয়ালের কোণে আমার চোখ যেখানে গিয়ে পড়লো সেখানে মেয়েদের একটি লাল সিল্কের রিবন শোভা পাচ্ছে। আমার ঘরে চুলের এই রিবন শোভা পাবার কোনো যুক্তি নেই। অকস্মাৎ মনে পড়লো সে-রাত্রে সুলেখার বেণীতে সুদৃশ্য লাল ফিতে শোভা পাচ্ছিল। সেদিন বাবার সঙ্গে রাত কাটাবার সময় সুলেখা নিশ্চয় ফিতেটা খুলে পেরেকের গায়ে টাঙিয়ে রেখেছিল। তারপর সকালে তাড়াতাড়িতে ওটা নিয়ে যাবার কথা সে ভুলেই গিয়েছে।

লাল সিল্কের ওই ফিতেটুকু কোনো রমণীর দৈহিক উপস্থিতির অস্বস্তিকর সাক্ষ্যরূপে ওখানে এই মুহূর্তে হাওয়ায় দুলছে। ফিতেটা এতোক্ষণেও আমার নজরে পড়েনি, অথচ কত সহজে পপি বিশোয়াসের সন্ধানী রাডারে ওটির অস্তিত্ব ধরা পড়লো।

পপি বিশোয়াস মুচকি হেসে এমনভাবে তাকালেন যেন আমার ভিতরটা

এক্স-রে আলোয় দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। পপির চোখের তারাগুলো উজ্জ্বল রঙীন বিজলী বাতির মতো কয়েকবার আমার দিকে তাকিয়ে জ্বললো আর নিভলো। তারপর পপি বিশোয়াস এমনভাবে চোখের ইঙ্গিত করলেন। যার অর্থঃ "আমার কিছুই বুঝতে বাকী নেই।"

বেশ অস্বস্তি বোধ করছি। পপি বিশোয়াস কী বুঝতে পারছেন ওই সিঁদুরে লাল রংয়ের ফিতেটা কার কবরীতে এতোদিন শোভা পেয়েছে?

পপি বিশোয়াস নিজেই এবার ফিতের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং ওটিকে ওখান থেকে নামিয়ে এনে আমার সামনে রেখে ফিক করে হেসে বললেন, "হয়তো ঝড়ে উড়ে এসেছে বাইরে থেকে!"

কোনোরকম উত্তর দেবার ক্ষমতা এই মুহূর্তে আমার নেই। ইতিমধ্যে পপি বিশোয়াস আবার মিষ্টি হাসলেন এবং আমাকে বেশ একটু প্রশ্রয় দিয়ে বললেন, "আমি আপিসেই যাচ্ছি। ওখানেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

লাল ফিতেটা পিতা-পুত্রীর পুনর্মিলন দৃশ্যকে আর একবার আমার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরলো। আরও কিছুক্ষণ ওই দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কিন্তু চেষ্টা করেও অসাবধানী সীমার ওপর রাগ করতে পারলাম না। ভাবছি ওটা আজই সীমার পিসির ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়ে দেবো। কেউ যদি ভুলে কিছু ফেলে যায় সেটা ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব তো গৃহ-স্বামীরই।

কিন্তু এসব ভাববার সময় এখন নয়। নিচে আপিস ঘরে পপি বিশোয়াস তো আমার জন্যে সময় গুনছেন।

পপি বিশোয়াস আপিস ঘরে একা বসে নেই। দূর থেকে দেখলাম, রাম-সিংহাসনের সঙ্গে তিনি বেশ আলাপ জমিয়েছেন। দুজনে বেশ আলোচনা চলেছে। আমাকে দেখেই রামসিংহাসনের হাসিমুখে গল্প-করা বন্ধ হলো। আমার হাতেই পপি বিশোয়াসের দায়িত্ব দিয়ে সে নিজের কাজে বেরিয়ে গেলো।

এই সব লোকের সঙ্গে বিরোধীপক্ষকে অন্তরঙ্গ হতে দেখলেই আজকাল আমার চিন্তা হয়। ভিতরের খবর কতখানি বাইরে চলে গিয়েছে তা আন্দাজ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

পপি বিশোয়াস কী এরই মধ্যে দেহের ওপর আরও এক প্রস্থ সুগন্ধি স্প্রে করেছেন? কারণ সেন্টের মিষ্টি গন্ধ যেন হঠাৎ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। একগাল হেসে পপি বললেন, "আমি আবার মুখে চাবি লাগিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। ইস্কুলে এর জন্যে ক্লাস টিচার আমার নামে রিট্‌ন কমপ্লেন পর্যন্ত করেছেন। সামনে যাকে পাই তার সঙ্গে কথা বলতে হয় আমাকে—হাতের গোড়ায় কাউকে না পেয়ে আপনাদের রামসিংহাসনকে পাকড়েছিলাম। ভারি ভাল লোক। বললে, "আপনি বসুন। ম্যানেজার সায়েব এলেন বলে।"

এবার আর বিশেষ বাড়তি কথাবার্তা নয়। পপি বিশোয়াস আমার দিকে তাকিয়েই বিজনেস টক শুরু করলেন। পপি বললেন, "দেখুন, মিস্টার শংকর, টেলিফোনে জেঠমালানি হাউস থেকে আমাকে যা-বলা হয়েছিল, এখানে এলেই চাবি পাওয়া যাবে। বুঝতেই পারছেন, দরজায় দরজায় চাবি ভিক্ষে করাটা আমার বিজনেস নয়। কত পার্টি গাড়ি পাঠিয়ে সাজানো গেস্ট

হাউসের সমস্ত ফেসিলিটি দেখিয়ে, সাধ্যসাধনা করে—তবু আমাকে পায় না।"

আত্মপ্রচার পর্ব শেষ করে পপি অভিযোগ করলেন, "এখানে এসে চাকরের কাছে খোঁজ করে জানলাম, চাবি আপনার জিম্মায় চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন আমার সময় বেশী নেই। স্পেশাল গেস্টের জন্যে ব্যবস্থা আমাকে পাকা করতে হবে। তাই নিজেই ছুটে এসেছি। আজকাল নিজে আমি আর কাজকর্ম বড় একটা করি না—সবই অন্য অন্য মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। ওদের দু'একজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছি। তবে মাঝে-মাঝে দু'-একটা কাজ নিতে হয়—মেয়েদের দেখাবার জন্যে যে আমি এখনও অচল আধুলি হইনি। তাছাড়া খুব ইমপর্টাণ্ট পার্টি হলে নিজের ঘাড়ে বোঝা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।"

বিনা দ্বিধায় পপি বিশোয়াস তাঁর 'কাজ'-এর কথাগুলো কেমন হুড়হুড় করে বলে চলেছেন।

পপি বললেন, "মিস্টার জেঠমালানি আজকের ব্যাপারে সব জানেন। ওঁর নিজেরও একটু ইণ্টারেস্ট আছে। বিশ্বাস না-হলে ওঁকে ফোন করে দেখুন। আমার প্রবলেম শুরু হলো দুপুরের দিকে। কিন্তু আমার স্পেশাল গেস্টকে আমার নিজের ফ্ল্যাট বা বুটিকের এয়ারকণ্ডিশন স্টোর রুমে আনতে চাই না। বড় জানাজানি হয়ে যায় আমার ওখানে। বহুলোকের নজর ওদিকে—কে আসছে, কে যাচ্ছে, সে নিয়ে রিসার্চ শুরু হয়ে যায়। আমার এই স্পেশাল গেস্টকে আমি রিসার্চের বাইরে রাখতে চাই। সেই সময় মিস্টার জেঠমালানির কথা মনে পড়লো। উনিও পার্টির পরিচয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, সুলেখার আজই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবার কথা। সুতরাং আপনার কোনো অসুবিধে নেই।"

পপি আরও বললেন, "আমার গেস্টের কথা সব শুনলে আপনিও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝবেন। সেসব আপনাকে পরে একসময় বলবোখন। এখন চাবিটা দন, ফ্ল্যাটটা একবার নিজের চোখে দেখে নিই। এইসব সুলেখা-টুলেখার ওপর আমার তেমন ফেথ নেই—হয়তো গেস্ট হাউসকে ওয়ার-হাউসের মতো অগোছাল করে রেখেছে।"

আমার মাথাটা একটু ঝিম-ঝিম করছে। পপি বিশোয়াস ভাবলেন, আমি বোধ হয় সন্দেহ করছি উনি জেঠমালানিদের লোক নন। উনি বললেন, "আর সময় নেবেন না, মিস্টার শংকর। আমাদের সময়ের দাম খুব—টাইম ইজ মানি। লজ্জার কিছু নেই। আপনি আমার সামনেই জেঠ-মালানিকে ফোন করে দেখুন।"

অবশেষে আমাকে মুখ খুলতে হলো। তার আগে বারবার চেষ্টা করে আমি নিজেকে শান্ত ও সংযত করে নিয়েছি। আমি বললাম, "মিসেস বিশ্বাস, আমি দুঃখিত। চৌত্রিশ নম্বরের চাবি এখন পাবার সম্ভাবনা আর নেই। যিনি ভাড়াটে তিনি এই ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।"

"কী বললেন?" বোমা ফাটলেও পপি বিশোয়াস এতোটা আশ্চর্য হতেন না।

ওঁর ভাব-সাব দেখে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে আমি মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আমার কথা শুনে পপি বিশোয়াস আকাশ থেকে পড়লেন। "কী

বললেন? জেঠমালানিরা আপনাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে?"

পপি বিশোয়াস অবশ্যই আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। ভাবছেন, আমি জেঠমালানির সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা করে তাঁর সঙ্গে রসিকতায় নেমেছি।

আমি পপি বিশোয়াসের কাছে সব কথা ব্যাখ্যা করতে উৎসাহী নই। কে এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ছিলেন, জেঠমালানিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী, এসব খবর এই মহিলাকে জানাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না।

আমি এবার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, "মিসেস বিশোয়াস, আপনাকে তো বলেইছি, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে আমাদের ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।"

আমি ভেবেছিলাম পপি বিশোয়াস এবার খুব রেগে উঠবেন, আমাকে গরম-গরম কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। পপি বিশোয়াস আদুরে গলায় বললেন, "ঘরখানা খুব দরকার ছিল আমার। ওঁরা কী-সব গোলমাল বাঁধিয়েছেন বুঝতে পারছি না। জেঠমালানিদের ওপর খুব রেগে গেলাম আমি। অনেক দিন এইভাবে হেনস্তা হই নি।"

পপি বিশোয়াসের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলাম। পপি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "অন্য সময় হলে মোটেই রাগ করতাম না। কিন্তু আজ বেশ বিপদে পড়া গেলো। আমার পার্টি এই কন্ডিশনে আসতে রাজী হয়েছেন যে ওঁকে আমার ওখানে বা আমার এয়ার-কন্ডিশন বুটিকে তোলা হবে না।"

পপি বিশোয়াস বোধ হয় শেষ আশা ত্যাগ করেন নি। তাই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন কীরকম লোক রে, বাবা! কলকাতা শহরে এতো সব হোটেল রয়েছে কেন? ভাত ছড়ালে বিছানার অভাব তো হয় না এই শহরে।"

আমি কোনো মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি এই ধরনের কথাবার্তায় এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে আসছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

কিন্তু পপি বিশোয়াস এই মুহূর্তে লজ্জা-শরম নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি বললেন, "হোটেলে একদিকে যেমন ঝাড়া হাত-পা হয়ে ঢোকা যায়, অন্যদিকে তেমনি হাজার হাঙ্গামা।"

মিসেস বিশোয়াসের কথাবার্তার ভঙ্গীই আলাদা। তিনি সগর্বে আমাকে শুনিয়ে দিলেন, "হোটেলের বিজনেসে আমি নেই, মিস্টার শংকর। হাজার হোক আমার একটা পোজিসন আছে—আমি তো আর বাজারে নামি নি।"

দ্রুত সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "লাস্ট মোমেন্টে যখন বিপদে পড়েছি, তখন না-হয় মান সম্মান নিজের ব্যাগে পুরে কোনো হোটেলেই যেতাম। কিন্তু আমার গেস্ট বোধ হয় রাজী হবেন না। হোটেলে ওই যে নাম লেখালেখির ব্যাপার আছে না। আর আমি নিজে মশাই, ওই মিথ্যে নামটাম ভাঁড়িয়ে হোটেলের খাতায় সই-পত্তর রাখতে চাই না।"

বেনামে ঘর নেওয়া তো হোটেলে প্রায়ই হয়ে থাকে। এ-ব্যাপারে মিসেস বিশোয়াসের মতো অভিজ্ঞ মহিলার কী আপত্তি থাকতে পারে বুঝছি না।

মিসেস বিশোয়াস এবার সে-রহস্যও ব্যাখ্যা করলেন। "আপনি হয়তো বলবেন, যে-ব্যাপার আকচার হচ্ছে, তা করতে আমার লজ্জা কী?"

একটু থামলেন পপি। তারপর বললেন, "লজ্জা নয়, মিস্টার শংকর, হাঙ্গামা। আমি নাক মুলে দিব্যি করেছি, স্বনামে বেনামে হোটেলের খাতায়

কখনও সই করবো না। কিছুদিন আগে মিস্টার রাজনের স্পেশাল রিকোয়েস্টে নিজের নাম পাল্টে হোটেলে ঘর নিলাম—তারপর কী ফ্যাসাদ। সায়েবটা যে ফরেন এক্সচেঞ্জ টেক্সচেঞ্জে গোলমাল করেছে আমি জানবো কী করে? খোঁজ করতে করতে পুলিশ একদিন ক্যাঁক করে এসে আমাকে ধরলো। বললো, তুমিও নাম ভাঁড়িয়ে ওই সায়েবকে মদত দিচ্ছো।"

"বুঝুন, মিস্টার শংকর! আমি নিজের কাজকর্ম সামলাতে পাগল হয়ে যাচ্ছি—আমি কোন্ দুঃখে জাল-জোচ্চুরির ব্যবসায় ঢুকতে যাবো? হোটেলের ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ মশাই কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঠিক আমার কাছে হাজির হয়েছে। হোটেলের কে বলে দিয়েছে ভগবান জানেন। লোকটা এসে সোজা বললো, তুমি অমুক দিন অমুক ঘরে নাম ভাঁড়িয়ে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ছিলে এবং সেখানে অমুককে লুকিয়ে রেখেছিলে। হোটেলের খাতায় তোমার জাল সইও রয়েছে।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "আমি তো অবাক। দিনক্ষণ সব মিলে গেলো। শুধু আমার গেস্টের নামটা ছাড়া। তাও হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। সায়েবটাকে কালো গাড়িতে সঙ্গে করে এনেছিল পুলিস। আমি ওই কালো গাড়ির মধ্যে একবার উঁকি দিয়েই চিনতে পেরেছি।—আমারই গেস্ট দু'হাতে লোহার বালা পরে বসে আছেন।"

"তারপর?" আমি বেশ চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করি। পপি বিশোয়াসরা যে এই ধরনের বিপদে পড়ে যান তা আমার ধারণা ছিল না।

পপি বিশোয়াস বললেন, "ভাগ্যে ওই অফিসারের সঙ্গে আমার অনেক-দিনের জানা-শোনা। আগে দু-একটা কেসে সিক্রেটলি ওঁকে হেল্পও করে-ছিলাম। এবারেও আমার খুব রাগ হলো সায়েবটার ওপর। ওখানেই চিৎকার করে বললাম, লজ্জা করে না? নিজের দেশ ছেড়ে আমার দেশে এসে চুরি জোচ্চুরি করছো। অফিসারকে বললাম, আমার কোনো দোষ নেই, ভাই। আমি সরল বিশ্বাসে অতিথি সেবা করেছি, চোর জোচ্চোর কথাটা তো কারও পাশপোর্টে লেখা থাকে না। পুলিস আমার কিচ্ছু করতে পারেতা না কিন্তু হোটেলে মিথ্যে নাম লিখিয়ে ওদের জালে জড়িয়েছি।"

"তারপর?" আমি নিজের কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না।

পপি বিশোয়াস বললেন, "তারপর আর কি! অফিসারকে বললাম, আমাকে রক্ষে করুন ভাই, আমি যা জানি সব বলে দিচ্ছি। আমি নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে লোকটাকে যিনি ইনট্রোডিউস করে দিয়েছিলেন সেই মিস্টার রাজনের নাম পর্যন্ত বলে দিলাম। রাজনের খবর পেয়ে অফিসার খুব খুশী। আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বোধ হয় কোর্টে পুলিশের হয়ে সাক্ষী দিতে হবে।"

"সাক্ষী দেওয়া আর এমন কী শক্ত?" আমি নিজের আদালতী অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করলাম।

কিন্তু পপি বিশোয়াস আমার কথা শুনে আঁতকে উঠলেন। "কী বলছেন, মিস্টার শংকর! পুলিশের সাক্ষী দেওয়ার থেকে খারাপ কাজ পৃথিবীতে নেই। সময়ের কোনো হিসেব-পত্তর থাকে না, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজারের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তীর্থকাকের বসে থাকা। এক এক সময় গা ঘুলিয়ে ওঠে। সময়ও নষ্ট, সম্মানও নষ্ট। লোকে আমাদের দিকে এমন

ভাবে তাকায়, দুষ্টু উকিলগুলো মক্কেলের উস্কানিতে এমন সব কোশ্চেন করে যে মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হও!

"কিন্তু কোনো উপায় নেই", মুখ বেঁকালেন পপি বিশোয়াস। "এই কেসে আমাকে পুলিশের সাক্ষী দিতেই হবে। যদিও আমরা যে-লাইনে আছি সেখানে গেস্টকে কোনে রকমেই বিপদে না-ফেলবার একটা অলিখিত নিয়ম আছে। নিজের ক্ষতি হোক, কিন্তু খরিদ্দারের যেন ক্ষতি না হয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে খদ্দের তো নিজের ক্ষতি করে বসে আছেন—সুতরাং শুধু শুধু আর নিজের ক্ষতি করি কেন?"

পপি বিশোয়াস জানালেন, "পুলিস অফিসারকে কথা দিয়েছি এবং নিজেও নাক কান মলা খেয়েছি, আর কখনও বেনামে হোটেলের ঘর বুক করে নিজের বিপদ ডেকে আনবো না।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন পপি বিশোয়াস। ভদ্রমহিলাকে আগে যতটা জাঁদরেল মনে হয়েছিল, এখন ততটা মনে হচ্ছে না। ওঁর ওপর আমার বিরক্তিও ক্রমশ কমে আসছে। এতো বাহার ও উচ্ছলতার মধ্যেও পপি বিশোয়াসের কথাবার্তায় কোথায় যেন অসহায়তার সুর বাজছে।

পপি বিশোয়াস সংসারের অনেক ব্যাপারে এতো অভিজ্ঞ হয়েও কেন যে এইভাবে আমার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, জানি না।

তিনি বললেন, "এখন বুঝছেন তো কেন আমি হোটেলের ধারে কাছে ঘেঁষতে চাই না। মাথায় থাকুন আমার লম্বা-চওড়া প্র্যাকটিস—আমি নিজের ফ্ল্যাটে এবং আমার বুটিকে যতটুকু পারি কাজকর্ম চালিয়ে যেতে চাই। শুধু আজকে আমি পুরনো বন্ধুত্ব রাখতে গিয়ে ফেঁসে গেলুম—অথচ আপনি সব জেনেশুনেও আমাকে একটুও সাহায্য করছেন না।"

আমি করজোড়ে পপি বিশোয়াসের কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, "আমার সামান্য চাকরি—এখনও পোস্ট পাকা হয়নি। মালিকদের বিনা অনুমতিতে আমি কীভাবে ঘর ছেড়ে দিই আপনাকে?"

পপি বিশোয়াস আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কী বলছেন, মিস্টার শংকর? বাড়ির মালিকের সঙ্গে বাড়ির কী সম্পর্ক?"

এবার আমার অবাক হবার পালা। "আপনি কি বলছেন, মিসেস বিশোয়াস? মালিকই তো সব!"

পপি বিশোয়াস পালটা প্রশ্ন করলেন, "কতদিন এখানে চাকরি করছেন?"

"এই মাস কয়েক।" আমি উত্তর দিলাম।

গালে হাত দিলেন পপি বিশোয়াস। "ওমা! ক-মাস কাজ করেও আপনি এখনও বলছেন, বাড়ি হচ্ছে মালিকের।"

মাথা নাড়লেন পপি বিশোয়স। "কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। কয়েকখানা বাড়ির সঙ্গে আমার কাজ-কারবার রয়েছে। এখানে তবু আপনি একজন টেমপোরারি ম্যানেজার রয়েছেন। জেনে রাখুন বড়লোকরা কখনও ভাড়াটে বাড়ি নিয়ে মাথা ঘামায় না। কলকাতায় বাড়ি মাত্রই দারোয়ানের। আমি যে বাড়িতে থাকি, যেখানে আমাদের বুটিক—সর্বত্র দারোয়ানই সর্বে-সর্বা। খোদ ম্যানেজার হিসেবে আপনি যখন রয়েছেন, তখন সামান্য একটা ব্যাপারে মালিকের কথা তুললে কে বিশ্বাস করবে বলুন?"

পপি বিশোয়াস আমাকে নরম করে তুলছেন। ক্রমশ ওঁর সম্পর্কে মনের

মধ্যে একটু মায়াও জন্মাচ্ছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে পপি আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন কিনা কে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আমার ওপর রাগ দেখালেন না। অনেক সময় নষ্ট করেও তিনি যে আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারেন নি, তার জন্যে কোনো অভিযোগও নেই তাঁর। বরং আরও সহজ হয়ে যাচ্ছেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

নিজের মনেই বললেন, "কী ফ্যাসাদে পড়লুম বলুন তো। আমার অনেকদিনের জানা-শোনা মিস্টার আচারিয়া নিজে ফোনে রিকোয়েস্ট করলেন, তাঁরই স্পেশাল নমিনি। নিজে এসে তিনি গেস্টকে ইনট্রোডিউস করে দিয়ে যাবেন। তবে আমার ওখানে নয়। অন্য কোথাও। আমিই তখন বললাম, 'আধ ঘণ্টা পরে ফোন করুন—আমি দেখি কোথায় ব্যবস্থা করা যায়।' আমি তখন মিস্টার জেঠমালানির সঙ্গে ফোনে পাকা কথা বলে নিলাম—উনি বললেন, 'কোনো অসুবিধে হবে না।' আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে মিস্টার আচারিয়াকে পাকা কথা দিলাম। বললাম, সোজা এই থ্যাকারে ম্যানসনে চলে আসতে।"

পপি বিশোয়াস আমার দিকে করুণভাবে তাকালেন। "প্লিজ, মিস্টার শংকর, আপনি হাইকোর্টের জজদের মতো গম্ভীর হয়ে থাকবেন না। বাঙালী মেয়েদের একটু সাহায্য করুন। আমার বিপদটা বুঝুন—কথা যখন দিয়েছি তখন কথার খেলাপ করতে চাই না। রাত্রিবেলায় কোথায় অজানা জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়বো। আপনি ঘরখানা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দিন।"

অসহায় বাঙালী মেয়েদের কথা ভুলে পপি বিশোয়াস আমার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করলেন।

পপি বললেন, "আপনার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ফ্ল্যাট যদি খালি হয়েও থাকে, তাহলে আজ রাত্রেই তো ভাড়া দিচ্ছেন না আপনি। আর আজ তো মাসের শেষ তারিখ—আপনি নিশ্চয় আজকের ভাড়া আদায় না-করে ভাড়াটেকে মুক্তি দেন নি।"

পপি বিশোয়াসের মুখটা এবার করুণ হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে ওঁকে আমি কিছুতেই অনাত্মীয়া বলে ভাবতে পারছি না। এই বিরাট নগরীর হাজার হাজার ফ্ল্যাটে যে-সব অনাচার আজ রাত্রে আরম্ভ হবে, তা বন্ধ করবার কোনো শক্তিই যখন আমার নেই, তখন পপি বিশোয়াসকে বিব্রত করেই বা আমার কী লাভ?

রাজী হতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি, মিসেস বিশোয়াস। আপনাকে সাহায্য করবার ইচ্ছেও হচ্ছে আমার কিন্তু, আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিন—যদি পারমিশনটা করিয়ে আনতে পারি।"

সানন্দে পপি বিশোয়াস আমাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। "আপনার টপাটপ উন্নতি হোক। দেখবেন, আপনার খুব ভাল হবে। একদিন আপনি ভরত সিং-এর মতো হবেন।"

"তিনি আবার কে?"

"ওমা! আপনি ভরত সিং-কে জানেন না। ভাবনানি ম্যানসনের ম্যানেজার ছিলেন। এখন বরুণা প্রপার্টিজের ডিরেকটর হয়েছেন। নাগরচাঁদ সুরজলাম নাম শুনেছেন তো। ওঁদেরই তো বরুণা প্রপার্টিজ।"

ভরত সিং-এর অপরিচিত মুখটা আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠছে। ফুলচন্দন পড়ুক পপি বিশোয়াসের মুখে—আমি যেন সত্যিই একদিন ভরত সিং-এর মতো কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে পপি বিশোয়াসকে সামান্য একটু সাহায্য করা ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু ওঁকে সাবধান করে দেওয়াও প্রয়োজন। বললাম, "এক ঘণ্টা পরেই খবর পাবেন। তবে ফলাফল আপনাকে জোর করে বলতে পারছি না। যদিও আমি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আপনিও ইতিমধ্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখুন।"

পপি বিশোয়াসকে বিদায় করে আমার দুশ্চিন্তা বাড়লো। পপি হয়তো ভাবলেন, আমি কায়দা করে মালিকদের বুড়ী ছুঁয়ে রাখবার জন্যেই সময়টা চেয়ে নিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে মালিকদের কথা আমি ভাবতেও পারছি না। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট যে খালি হয়েছে, সে খবরও তাঁরা এখনও জানেন না। এ-সব ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহ আছে বলেও মনে হয় না।

এই অবস্থায় কী কর্তব্য? কাকে পরামর্শ করা যায়? অগতির গতি একটি নামই আবার মনে পড়লো এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাইকোর্ট পাড়ায় ছুটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গণপতিবাবু এখনও ওপাড়ায় রয়েছেন নিশ্চয়। অ্যাটর্নি আপিসের আসল কাজকর্ম তো হাইকোর্ট বন্ধ হবার পরে বিকেলেই শুরু হয়।

একবার মনে হলো সামান্য ব্যাপারে আমি বেশী মাথা ঘামাচ্ছি। কয়েক ঘণ্টার জন্যে পপি বিশোয়াসকে চাবি দেওয়ার জন্যে পৃথিবীর কাউকে পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই আমার। হাজার হোক থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজার আমি। যে কাজ এ-বাড়ির দারোয়ানরা দিনের পর দিন নিঃশব্দে করে এসেছে তার জন্যে আমি এই মুহূর্তে গণপতিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে চলেছি কেন?

কিন্তু মনের মধ্যে একটা অতি সাবধানী মন এই মুহূর্তে জেগে বসে রয়েছে। সে বললো, "একবার না-হয় গণপতিবাবুর সঙ্গে কথা বললে। অনেকদিন তো তাঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি। তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—পিতৃবন্ধুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা-সাক্ষাত করতে বাধা কী?"

চৌরঙ্গীর মোড় থেকে ডালহৌসির ট্রামে উঠে বসেছি। অফিস পাড়ার ভিড় এখনও শেষ হয় নি—কিন্তু আমি উল্টো মুখে চলেছি, যেদিকের ট্রামে একদম ভিড় নেই।

দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে এই মনোহারিণী কলকাতাকে কয়েক মাস দেখিনি। অনেকদিন পরে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে এসপ্লানেডে বেরিয়ে মনটা নানা বিচিত্র চিন্তায় ভরে উঠলো। ঘরমুখো অফিসের লোকদের দিকে তাকিয়ে আজ সেই পুরোনো দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছি না—যতই সামান্য হোক, আমারও এখন একটা চাকরি আছে। আমারও একটা আশ্রয় আছে। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে কেউ কেউ আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষার মিনতি করছে।

রাজভবনের উত্তর দিকে ট্রাম থেকে নেমে আমি দ্রুতবেগে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। গভরমেণ্ট প্লেসের অফিস-পাড়া এখনও জনশূন্য হয় নি। চাকুরে লোকদের ভিড়ে আজ আমি অতি

মধ্যে একটু মায়াও জন্মাচ্ছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে পপি আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন কিনা কে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আমার ওপর রাগ দেখালেন না। অনেক সময় নষ্ট করেও তিনি যে আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারেন নি, তার জন্যে কোনো অভিযোগও নেই তাঁর। বরং আরও সহজ হয়ে যাচ্ছেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

নিজের মনেই বললেন, "কী ফ্যাসাদে পড়লুম বলুন তো। আমার অনেকদিনের জানা-শোনা মিস্টার আচারিয়া নিজে ফোনে রিকোয়েস্ট করলেন, তাঁরই স্পেশাল নমিনি। নিজে এসে তিনি গেস্টকে ইনট্রোডিউস করে দিয়ে যাবেন। তবে আমার ওখানে নয়। অন্য কোথাও। আমিই তখন বললাম, 'আধ ঘণ্টা পরে ফোন করুন—আমি দেখি কোথায় ব্যবস্থা করা যায়।' আমি তখন মিস্টার জেঠমালানির সঙ্গে ফোনে পাকা কথা বলে নিলাম—উনি বললেন, 'কোনো অসুবিধে হবে না।' আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তবে মিস্টার আচারিয়াকে পাকা কথা দিলাম। বললাম, সোজা এই থ্যাকারে ম্যানসনে চলে আসতে।"

পপি বিশোয়াস আমার দিকে করুণভাবে তাকালেন। "প্লিজ, মিস্টার শংকর, আপনি হাইকোর্টের জজদের মতো গম্ভীর হয়ে থাকবেন না। বাঙালী মেয়েদের একটু সাহায্য করুন। আমার বিপদটা বুঝুন—কথা যখন দিয়েছি তখন কথার খেলাপ করতে চাই না। রাত্রিবেলায় কোথায় অজানা জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়বো। আপনি ঘরখানা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দিন।"

অসহায় বাঙালী মেয়েদের কথা ভুলে পপি বিশোয়াস আমার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করলেন।

পপি বললেন, "আপনার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ফ্ল্যাট যদি খালি হয়েও থাকে, তাহলে আজ রাত্রেই তো ভাড়া দিচ্ছেন না আপনি। আর আজ তো মাসের শেষ তারিখ—আপনি নিশ্চয় আজকের ভাড়া আদায় না-করে ভাড়াটেকে মুক্তি দেন নি।"

পপি বিশোয়াসের মুখটা এবার করুণ হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে ওঁকে আমি কিছুতেই অনাত্মীয়া বলে ভাবতে পারছি না। এই বিরাট নগরীর হাজার হাজার ফ্ল্যাটে যে-সব অনাচার আজ রাত্রে আরম্ভ হবে, তা বন্ধ করবার কোনো শক্তিই যখন আমার নেই, তখন পপি বিশোয়াসকে বিব্রত করেই বা আমার কী লাভ?

রাজী হতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি, মিসেস বিশোয়াস। আপনাকে সাহায্য করবার ইচ্ছেও হচ্ছে আমার কিন্তু, আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিন—যদি পারমিশনটা করিয়ে আনতে পারি।"

সানন্দে পপি বিশোয়াস আমাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। "আপনার টপাটপ উন্নতি হোক। দেখবেন, আপনার খুব ভাল হবে। একদিন আপনি ভরত সিং-এর মতো হবেন।"

"তিনি আবার কে?"

"ওমা! আপনি ভরত সিং-কে জানেন না। ভাবনানি ম্যানসনের ম্যানেজার ছিলেন। এখন বরুণা প্রপার্টিজের ডিরেকটর হয়েছেন। নাগরচাঁদ সুরজলাম নাম শুনেছেন তো। ওঁদেরই তো বরুণা প্রপার্টিজ।"

ভরত সিং-এর অপরিচিত মুখটা আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠছে। ফুলচন্দন পড়ুক পর্পি বিশোয়াসের মুখে—আমি যেন সত্যিই একদিন ভরত সিং-এর মতো কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে পর্পি বিশোয়াসকে সামান্য একটু সাহায্য করা ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু ওঁকে সাবধান করে দেওয়াও প্রয়োজন। বললাম, "এক ঘণ্টা পরেই খবর পাবেন। তবে ফলাফল আপনাকে জোর করে বলতে পারছি না। যদিও আমি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আপনিও ইতিমধ্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখুন।"

পর্পি বিশোয়াসকে বিদায় করে আমার দুশ্চিন্তা বাড়লো। পর্পি হয়তো ভাবলেন, আমি কায়দা করে মাল্লিকদের বুড়ী ছুঁয়ে রাখবার জন্যেই সময়টা চেয়ে নিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে মালিকদের কথা আমি ভাবতেও পারছি না। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট যে খালি হয়েছে, সে খবরও তাঁরা এখনও জানেন না। এ-সব ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহ আছে বলেও মনে হয় না।

এই অবস্থায় কী কর্তব্য? কাকে পরামর্শ করা যায়? অগতির গতি একটি নামই আবার মনে পড়লো এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাইকোর্ট পাড়ায় ছুটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গণপতিবাবু এখনও ওপাড়ায় রয়েছেন নিশ্চয়। অ্যাটর্নি আপিসের আসল কাজকর্ম তো হাইকোর্ট বন্ধ হবার পরে বিকেলেই শুরু হয়।

একবার মনে হলো সামান্য ব্যাপারে আমি বেশী মাথা ঘামাচ্ছি। কয়েক ঘণ্টার জন্যে পর্পি বিশোয়াসকে চাবি দেওয়ার জন্যে পৃথিবীর কাউকে পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই আমার। হাজার হোক থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজার আমি। যে কাজ এ-বাড়ির দারোয়ানরা দিনের পর দিন নিঃশব্দে করে এসেছে তার জন্যে আমি এই মুহূর্তে গণপতিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে চলেছি কেন?

কিন্তু মনের মধ্যে একটা অতি সাবধানী মন এই মুহূর্তে জেগে বসে রয়েছে। সে বললো, "একবার না-হয় গণপতিবাবুর সঙ্গে কথা বললে। অনেকদিন তো তাঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি। তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—পিতৃবন্ধুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা-সাক্ষাত করতে বাধা কী?"

চৌরঙ্গীর মোড় থেকে ডালহৌসির ট্রামে উঠে বসেছি। অফিস পাড়ার ভিড় এখনও শেষ হয় নি—কিন্তু আমি উল্টো মুখে চলেছি, যেদিকের ট্রামে একদম ভিড় নেই।

দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে এই মনোহারিণী কলকাতাকে কয়েক মাস দেখিনি। অনেকদিন পরে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে এসপ্লানেডে বেরিয়ে মনটা নানা বিচিত্র চিন্তায় ভরে উঠলো। ঘরমুখো অফিসের লোকদের দিকে তাকিয়ে আজ সেই পুরোনো দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছি না—যতই সামান্য হোক, আমারও এখন একটা চাকরি আছে। আমারও একটা আশ্রয় আছে। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে কেউ কেউ আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষার মিনতি করছে।

রাজভবনের উত্তর দিকে ট্রাম থেকে নেমে আমি দ্রুতবেগে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। গভরমেণ্ট প্লেসের অফিস-পাড়া এখনও জনশূন্য হয় নি। চাকুরে লোকদের ভিড়ে আজ আমি অতি

সহজে মিশে যেতে পারলাম। মনে মনে বললাম, আমি তোমাদেরই লোক—যতই ছোট হোক আজ আমারও একটা চাকরি আছে। সেই চাকরিসূত্রেই শলা-পরামর্শের জন্যে আমি এখন অ্যাটর্নি-পাড়ায় চলেছি।

বৃদ্ধ ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের ম্রিয়মান আলোগুলো অনেক আগেই জ্বলে উঠেছে। দিশী আপিসের সদা-অবহেলিত স্বল্প বেতনের বয়োবৃদ্ধ কর্মচারির মতো ল্যাম্প পোস্টগুলোর যেন কিছুতেই কাজে মন বসছে না। অথচ চাকরিতে ইস্তফা দেবারও উপায় নেই।

সিন্‌হা অ্যাণ্ড লায়ন, অ্যাটর্নি আপিসে এখনও পুরোদস্তুর কাজ চলছে। ভিতরের ঘরে অ্যাটর্নি শিখীন্দ্র সিন্‌হা কোনো ক্লায়েণ্টের সঙ্গে কনসাল্টেশন চালাচ্ছেন। তাঁর ভারি ও চড়া গলা আপিসের দরজা পেরোবার আগেই কানে ভেসে আসছে।

গণপতিবাবু চোখে চশমা লাগিয়ে কী একটা দলিল মেলাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই গণপতিবাবু সানন্দে বললেন, "ঠিক টাইমে এসে গিয়েছো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। তুমি না এলে হয়তো আমি নিজেই ছুটতাম।"

আমার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন গণপতিবাবু। তারপর যথাসম্ভব গলা নামিয়ে ফিস-ফিস করে বললেন, "এ-সব কী শুনছি?"

গণপতিবাবু প্রশ্ন করার ধরনটা আমাকে একটু চিন্তিত করে তুললো। আমার সম্বন্ধে তিনি এতোদূর থেকে কী-ই বা শুনতে পারেন?

থ্যাকারে ম্যানসনের কাজকর্মে এখনও পর্যন্ত সাধ্যমতো সৎ পথে থাকবার চেষ্টা করেছি। সহকর্মী কারও সঙ্গে দুর্বলতাও করিনি। কারও প্রতি বিশেষ দুর্বলতাও দেখাই নি। সুতরাং আমার চিন্তা করবার কী থাকতে পারে, যদি-না আমার সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা গুজব স্বার্থপর মহল থেকে ইচ্ছে করেই বিশেষ কয়েকটি জায়গায় রটনা করা হয়ে থাকে।

নিজের মনোবল যখন ফিরে পাচ্ছি ঠিক সেই সময় সীমার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। নিজের দায়িত্বের বাইরে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে কারও সুখ-দুঃখের সঙ্গে যদি সামান্য একটু জড়িয়ে থাকি তার নাম সীমা। সুলেখা সেন যে গোপনে একদিন আমার ঘরে রাত্রিবাস করেছে সে-খবর শেষ পর্যন্ত পাঁচ কান হয়েছে নাকি? যত দূর জানি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপনে হয়েছে, কিন্তু রামসিংহাসন চৌরাশিয়া এবং তাঁর সাগরেদদের সদাসতর্ক দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত আমরা এড়াতে পেরেছি, এমন গ্যারাণ্টি দেওয়া সম্ভব নয়।

সুলেখার দুঃখময় জীবনে কিছুক্ষণের শান্তি আনবার জন্যে যা করেছি তার জন্যে আমি মোটেই লজ্জিত নই। এই সম্পর্কে যতই কুৎসা রটুক আমি ভয় পাই না। আত্মরক্ষার জন্য মোটামুটি বক্তব্য মনে মনে সাজিয়ে ফেললাম—গণপতিবাবু ঐ প্রসঙ্গ তোলা মাত্রই আমি আসল ব্যাপারটা ওঁকে শুনিয়ে দেবো।

কিন্তু আমার আশঙ্কা সত্য নয়। গণপতিবাবু সুলেখা অথবা সীমা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই তুললেন না।

বরং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সগর্বে বললেন, "সাবাস, শংকর। এই তো চাই।"

গণপতিবাবু কী কারণে আমাকে এইভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তা

আন্দাজ করতে পারছি না।

কিন্তু কোনোরকম ব্যাখ্যা না করেই গণপতিবাবু বললেন, "বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়—তুমি যে হরি উকিলের ছেলে এ-কথা ভুললে চলবে কেন?"

সুযোগ পেলেই গণপতিবাবু আমার স্বর্গত পিতৃদেবের কথা তোলেন। কিন্তু আজ তাঁর এই বিশেষ আনন্দের কারণ কী তা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না।

গণপতিবাবু আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "যদি আমার কিছু বাড়তি পয়সা-কড়ি থাকতো তা হলে তোমাকে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে রেখে আইন পড়াতাম।"

আইন পড়তে গেলে বি-এ পাস করতে হয়। আমি কোনোক্রমে আই-এ পাসের সার্টিফিকেট পকেটস্থ করে মা-সরস্বতীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে চুকিয়ে এসেছি। সে-কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গণপতিবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। যা বললাম না—লেখাপড়া করবার এতো ইচ্ছা ছিল আমার, কিন্তু ঈশ্বর আমার ওপর দয়াপরবশ হলেন না কেন?

গণপতিবাবু আমার কথাতে নিরুৎসাহ হলেন না বললেন, "আই-এ পাস তো কী হয়েছে? দেখি, দুটো পয়সা একস্ট্রা রোজগারের চান্স এখনও রয়েছে। ভগবান যদি দয়া করেন তাহলে তোমাকে বি-এ এবং বি-এল দুটোই পাস করিয়ে এনে গুরু-ঋণ শোধ করবো।"

গণপতিবাবুর মহৎ হৃদয়ের আরও একটা পরিচয় পেয়ে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে এই মুহূর্তে। সারাজীবন সেবা করেও এইসব মানুষের ঋণ আমি শোধ করে যেতে পারবো না।

গণপতিবাবু আমার চোখের কোণে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখে নিজেও অভিভূত হলেন। বললেন, "গাউন না-চাপিয়েই তুমি তো বড় বড় উকিলকে লজ্জা দেবার মতো বিদ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছো।"

গণপতিবাবুর কথা মোটে সত্যি নয়, আমাকে সংসার পথে উৎসাহিত করবার জন্যেই যে তিনি এইসব কথা বললেন তা বুঝবার মতো সামান্য বুদ্ধি এখনও আমার ঘটে রয়েছে।

গণপতিবাবু বললেন, "সাধে কি আর তোমার তারিফ করছি। এই ক'মাসে তুমি হ্যাটট্রিক করলে। একখানা নয় দুখানা নয়, তিনখানা ফ্ল্যাট খালি করেছো—এটা কী সোজা ব্যাপার। যারা এ-লাইনে আছে একমাত্র তারাই বুঝবে রেসের মাঠে জ্যাকপট পাওয়াও এর থেকে সহজ।"

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু গণপতিবাবু হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করলেন।

ব্যাপারটা আমার কাছে একটু রহস্যাবৃত মনে হলো। আমার মুখ বন্ধ করে নিজে কেবল কথা বলে যাবার অধিকার গণপতিবাবু কখনও নেন নি।

গণপতিবাবু এবার চিৎকার করে বললেন, "আমি একটু ফক্স-মণ্ডল-এর আপিসটা ঘুরে আসছি। আপনি এখনও আছেন তো শিখীনবাবু?"

কাঠের পার্টিশানের অপর দিকে ভারী গলায় অ্যাটর্নি শিখীন্দ্রবাবু জানিয়ে দিলেন তিনি এখন অনেকক্ষণ থাকবেন।

গণপতিবাবু বললেন, "থাকুন স্যর, দু'তিনটে ম্যাটার আজকেই আপনার সঙ্গে ডিসকাশ করে চুকিয়ে ফেলতে চাই।"

ফক্স মণ্ডলের আপিসের সামনে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু

ওখানে ঢোকবার কোনো আগ্রহ দেখালেন না গণপতিবাবু।

সোজা বললেন, "এখন ফক্স-মণ্ডলের আপিসে যাবার জন্যে আমার ঘুম হচ্ছে না! এখন তোমার সঙ্গে জরুরি কথাবার্তা রয়েছে।"

হেস্টিংস স্ট্রীট ও ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের মোড়ে রিলায়েন্সের বিশ্ব-বিদিত খাবারের দোকানে ঢুকে পড়লেন গণপতিবাবু। তারপর দেখে-দেখে এমন একটা কোণ নির্বাচন করলেন যেখানে চুপি-চুপি কিছু কথাবার্তা বলা যায়।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে গণপতিবাবু বললেন, "বেঁচে থাক আমার রিলায়েন্স—কনফিডেনশিয়াল কথাবার্তা বলার এমন চমৎকার জায়গা খুব কম আছে।"

লায়ন অ্যান্ড সিনহার অফিস ঘর ছেড়ে গোপন কথা বলবার জন্যে কেন এই বাজারে চলে এলেন গণপতিবাবু তা এখনও আমার কাছে দুর্বোধ্য।

গণপতিবাবু ইতিমধ্যে পরিচিত বেয়ারাকে দু'খানা করে গরম সিঙাড়া এবং চায়ের অর্ডার দিলেন।

চা খেতে-খেতে গণপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ফক্স-মণ্ডলে আপনার কাজ সারলেন না?"

নিস্পৃহভাবে গণপতি উত্তর দিলেন, "কাজ থাকলে তো সারবো! আমি স্রেফ তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলবার জন্যে লায়ন অ্যান্ড সিন্‌হা থেকে বেরিয়ে এলাম।"

গণপতিবাবু এবার আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা ওই মিস্টার আর সি ঘোষকে কীভাবে ম্যানেজ করলে? আজকাল তো বশীকরণ করলেও ভাড়াটে নরম হয় না—মন্তরের চোটে লোকে পরিবার ছাড়বে কিন্তু ভাড়া-করা ঘর ছাড়বে না!" এই বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন গণপতিবাবু।

পর মুহূর্তেই গণপতিবাবুর খেয়াল হলো রসিকতাটা একটু উগ্র হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, "রাগ করলে না তো? তা তুমিও আর ছোটটি নেই—চাকরি-বাকরি করছো। এবং শাস্ত্রেও বলছে, প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রেঃ বন্ধুবদাচরেৎ।"

পরিবার সংক্রান্ত রসিকতা নিয়ে আমি ব্যস্ত হচ্ছি না, আমি ভাবছি ৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটের খবর এর মধ্যে কী করে গণপতিবাবুর কানে এসে হাজির হলো?

গণপতিবাবু সে-বিষয়ে কোনো আলোকপাত করলেন না। বরং আর সি ঘোষ সম্পর্কে বাড়তি কৌতূহল প্রকাশ করলেন। জানতে চাইলেন, "কী হয়েছিল? ঘোষের সঙ্গে মালিকদের খিটিমিটি লাগলো কেন? নিশ্চয় টাকা-কড়ি নিয়ে গোলমাল বেধেছিল, কিংবা ঘোষকে চাকরি থেকে রিটায়ার করতে বলেছিল।"

আমি বললুম, "এসবের কিছুই হয়নি। বেচারা আর সি ঘোষ খুব কষ্ট পেয়ে প্রতিশোধ নিলেন।"

"প্রতিশোধ?" চমকে উঠলেন গণপতিবাবু।

"প্রতিশোধ ছাড়া আর কী বলা যায়। জেঠমালানিরা ওঁর জামাইকে প্রলোভন দেখিয়ে একটা সুখের সংসারকে তছনছ করে দিলেন। মিস্টার ঘোষের পক্ষে তা সহ্য করা আর সম্ভব হলো না। তিনি কী আর প্রতিশোধ নিতে পারেন? উত্তেজনার মাথায় যত-নষ্টের-গোড়া ফ্ল্যাটখানাই ছেড়ে

দিলেন।”

গণপতিবাবু মন দিয়ে শুনে যাচ্ছেন আমার কথা। তিনি বললেন, “হুঁ।”

আমি বললাম, “প্রতিশোধ ছাড়াও আর একটা জিনিস থাকতে পারে। তার নাম অনুশোচনা। পাকে-চক্রে তিনিও মেয়ের সর্বনাশের ভাগীদার হয়েছেন—তাঁরই নাম-লেখা ফ্ল্যাটে অধঃপতিত হচ্ছেন তাঁর জামাই, এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর নাটকীয়তা আছে যা কোনো লোকের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।”

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গণপতিবাবু বললেন, “তা তোমার পক্ষে ভালই হয়েছে। বিষে বিষক্ষয় একেই বলে। তুমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছো।”

আমাকে আবার প্রতিবাদ করতে হলো। “আমি কিছুই করি নি। কাঁটা আপনি-আপনি উঠে আমার টেবিলে জমা হয়ে গেলো। খোদ আর সি ঘোষ আমার ঘরে ঢুকে বললেন, “এই নিন আপনার চিঠি—আমি এই ফ্ল্যাট রাখতে চাই না।”

“আর চাবি?” চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন গণপতিবাবু।

“চাবিটাও সুলেখা তো সহদেবের কাছে রেখে গিয়েছিল। সহদেব অতশত না-বুঝে সেটা আর সি ঘোষকে দিয়েছিল এবং তিনি সোজা সেটি আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেলেন।”

গণপতিবাবু বললেন, “ভালই হয়েছে। চাবিটা না-পেলে কোনো লাভই হতো না তোমার। কেউ যদি বললো, তোমার ঘর ছেড়ে দিচ্ছি তাহলেই ছাড়া হলো না। সেই সঙ্গে ঘরের দখল ফেরত দেওয়া দরকার।”

আমার মনে পড়লো যাবার আগে সুলেখা এই চৌত্রিশ নম্বরের চাবি আমার জিম্মায় রেখে যেতে চেয়েছিল।

গণপতিবাবু বললেন, “ওর মধ্যে জড়িয়ে না-পড়ে খুব ভাল করেছ। কেন তা পরে বুঝবে।”

আইনের জটিল মারপ্যাঁচ অভিজ্ঞ গণপতিবাবু বললেন, “বুঝেছি তোমার কেসটা। তুমি নিশ্চয় ভাবছো, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মালপত্রগুলোর কী গতি হবে?”

চোখ বন্ধ করে দু মিনিট ভাবলেন গণপতিবাবু। তারপর চোখ খুলে বললেন, “কুছ পরোয়া নেই। খোদ ভাড়াটে যদি স্বেচ্ছায় ভাড়া ছেড়ে চলে যায় এবং যাবার সময় কিছু মালপত্তর ভুলে ফেলে রেখে যায় তাহলে আমরা কী করতে পারি? তুমি পুলিসে খবর দিয়ে দাও—ওরা এসে লিস্ট তৈরি করে মাল নিয়ে চলে যাক।”

পুলিস! তার মানেই তো আবার চিন্তা। গণপতিবাবু এবারেও উদ্ধার করলেন। বললেন, “আমি যখন আছি তখন তোমার কোনো চিন্তা নেই। সাব-ইনসপেকটর হারানিধি হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমার সঙ্গে অনেকদিন জানাশোনা—অতি অমায়িক ভদ্রলোক। আমি চিঠিও লিখে দিতে পারি, ফোনেও কথা হতে পারে।”

পাপি বিশোয়াসের সামান্য অনুরোধের কথাটা কায়দা করে গণপতিবাবুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। কিন্তু তার আগে মালপত্তর সম্পর্কে মতামতটা জেনে নেওয়া যাক।

গণপতিবাবুকে বললাম, “পুলিসের হাঙ্গামায় না গিয়ে মিস্টার জেঠ-মালানির সঙ্গে যোগাযোগ করলে কী হয়? মালগুলো যখন ওঁদেরই, তখন

ওঁদেরই নিয়ে যেতে বলি।"

"খবরদার নয়", সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন গণপতি সামন্ত। বললেন, "জল অনেক দূর গড়িয়েছে, জেঠমালানিরা অত সহজ লোক নয়। সেই জন্যেই তো বললাম, তোমাকে খুঁজছি। তেমন দরকার হলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম আমি নিজেই।"

হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে গণপতিবাবুর কথাগুলো। উনি কী সবজান্তা নাকি? জেঠমালানিদের হাঁড়ির খবরগুলো উনি যোগাড় করলেন কী করে?

গণপতিবাবু বললেন, "সব সময় কী খবর যোগাড় করতে হয়? কোষ্ঠীর জোর থাকলে, সময় ভালো চললে দরকারি খবর হাওয়ায় ভেসে চলে আসে।"

গণপতিবাবুর কথাগুলো এখনও আমি বুঝতে পারছি না। গণপতিবাবু আমার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন, "হরির উকিলের ছেলে এবং বারওয়েল সায়েবের খাসমুন্সী হলে কী হয়, মনটা এখনও কাঁচা হয়ে আছে তোমার—ঘোড়েলদের মারপ্যাঁচ তোমার মাথায় এখনও ঢোকে না।"

গণপতিবাবু ফিসফিস করে বললেন, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আজ আমার আলিপুরে একটা মামলা ছিল। হাইকোর্ট থেকে কাউনসেল নিয়ে গিয়েছিলাম পঞ্চাশ মোহর ফি দিয়ে। কিন্তু এমনই ব্যাড লাক, অন্য পার্টির উকিল গিরিজা গুহ মশায়ের শাশুড়ী মারা যাওয়ায় কোর্টে এলেন না, কেস অ্যাডজোর্নড্ হয়ে গেলো। মেজাজটা খিঁচড়ে গেলো—পুরো ফি গুনে দিয়ে কাউনসেলকে ফিরিয়ে আনতে হলো।"

আমি গণপতিবাবুর মুখের দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি। গিরিজা গুহ মশায়ের শাশুড়ী বিয়োগের সঙ্গে আমার ঘটনার কী সম্পর্ক তা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

গণপতিবাবু এবার বললেন. "অগত্যা লায়ন অ্যান্ড সিন্‌হার আপিসে চলে এসে নিজের টেবিলে একটু গড়িয়ে নেবো ভাবছিলাম। এমন সময় জেঠমালানি-একটা লোক, বোধহয় মুনিমজী হবেন, শিখীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আর্জেন্ট পরামর্শর জন্যে আপিসে হাজির হলেন।"

"জেঠমালানিদের অ্যাটর্নি বুঝি লায়ন অ্যান্ড সিন্‌হা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গণপতিবাবু বললেন, "বিরাট লোক, ওঁদের বিরাট ব্যাপার। খুব বড় বড় লোকদের একখানা গাড়ি, একখানা বাড়ি, একখানা ফোন, একখানা বউ, একখানা অ্যাটর্নিতে কাজ চলে না! জেঠমালানিদের তিন চারজন অ্যাটর্নি আছে—যখন যার কাছে দরকার তার কাছে চলে যায়। আমাদের শিখীন্দ্রবাবু যে আবার এইসব বাড়িফাড়ি ব্যাপারে একসপার্ট।"

গণপতিবাবু এরপর যা বললেন তা মোটামুটি এইরকমঃ

জেঠমালানিদের কর্মচারি নাগেশ্বর প্রসাদজী সবিনয়ে শিখীন্দ্রবাবুকে জানালেন, তাঁদের এক কর্মচারি রমেশচন্দ্র ঘোষের হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই মাথা খারাপ অবস্থায় সে কোম্পানির বিরুদ্ধে অনেক কান্ড করে বসেছে।

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, "ওকে এখনই বরখাস্ত করুন, যাতে কোম্পানির ক্ষতি না হয়।"

নাগেশ্বরপ্রসাদজী নিবেদন করলেন, আমাদের মালিক তো শিবের মতো লোক। সরল মনে অনেক জিনিস তিনি কর্মচারিদের নামেই লিখিয়ে

রেখেছেন। যেমন এই থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়া-করা ফ্ল্যাট। কোম্পানির গেস্টটেস্ট এলে এখানে তুলতে হয়। এখন আর সি ঘোষ এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবার চিঠি লিখে দিয়ে এসেছেন বাড়ির মালিকের আপিসে।

শিখীন্দ্রবাবু জানতে চাইলেন, মালিকের সঙ্গে কোনো যোগসাজস ছিল কিনা।

নাগেশ্বরজী বললেন, মালিকের সঙ্গে নেই। তবে নয়া এক 'মেনজার' এসেছেন ; এই আদমী সিধা আদমী নয় এবং তার সঙ্গে কিছু যোগসাজস থাকতে পারে।

নাগেশ্বরজীর ইচ্ছা আর সি ঘোষের নামে ইনজাংশন দিয়ে তাকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার কাজ থেকে বিরত করা।

আলাপ আলোচনায় শিখীন্দ্রবাবু আলোর পথ দেখলেন না। তিনি বললেন, "ফ্ল্যাট মিস্টার ঘোষের নামে, তিনি ক্যাশে ভাড়া দিয়ে আসছেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাট যদি ছেড়ে দিয়ে থাকেন তাহলে ইনজাংশন দেবার কথা ওঠে কি করে। ইনজাংশন দেওয়া উচিত ছিল ঘটনা ঘটবার আগে।"

নাগেশ্বরজী বললেন, সেক্ষেত্রে মালিকের ইচ্ছে ওই মেনজারের নামে ইনজাংশন দিতে।

সেখানেও গোলমাল। শিখীন্দ্রবাবু বললেন, "ফ্ল্যাট ছাড়বেন না আপনারা। বাড়িওয়ালাই জোর করে আপনাদের তুলুক।"

নাগেশ্বরজী দুঃখের সঙ্গে জানালেন ফ্ল্যাট ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সেখানে মালিকদের কোনো লোক নেই। চাবিও মালিকের হাতে চলে গিয়েছে, যদিও মালপত্তর কিছু ওই ঘরেই রয়েছে।

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, ওইসব মালপত্তর যে আপনার মালিকের তার কোনো প্রমাণ আছে?

নাগেশ্বরজী জানালেন, মালপত্তর অবশ্যই মালিকের। কিন্তু ওইসব জিনিস কে আর এক নম্বর টাকায় কিনে কোম্পানির খাতায় লিখে রাখে বলেন?

"তার অর্থ আর সি ঘোষ যদি বলেন ওইসব চেয়ার টেবিল খাট বিছানা আমার, তাহলে আপনাদের কিছু করবার নেই?" শিখীন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন।

শিখীন্দ্রবাবু এরপর রাগ করলেন, "আপনাদের সায়েব এতো বুদ্ধিমান লোক, এতো লোককে চরাচ্ছেন তিনি, আর এতো বড়ো একটা ফ্ল্যাটের দখল এইভাবে ছেড়ে দিলেন? ওখানে একটা চাকর বা দারোয়ান তো রাখতে পারতেন?"

নাগেশ্বরজী হাত কামড়াতে লাগলেন। বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টার চাকরের খরচ বাঁচাতে গিয়ে এই ভুল হয়ে গিয়েছে।"

গণপতিবাবু বললেন, "এরপর নাগেশ্বরজী শুকনো মুখে বিদায় হলেন—আমি ভাবলাম তোমার ফাঁড়া কাটলো। কিন্তু ওমা। আধঘণ্টা পরেই স্বয়ং জেঠমালানি নিজেই শিখীন্দ্রবাবুর চেম্বারে গোপন পরামর্শের জন্যে প্রবেশ করলেন।"

জেঠমালানি আফসোস করলেন লোক না রেখে তিনি ভুল করেছেন। সেই সঙ্গে জানালেন, ফ্ল্যাটগুলো এমন বিশ্রীভাবে তৈরি যে [illegible]

থার্ড পার্সন রাখলে প্রাইভেসী থাকে না। লেডি গেস্টরা অনেক সময় অস্বস্তিতে পড়ে যান—বাধ্য হয়ে জেঠমালানিজীকে পার্ট-টাইম শুখা চাকরের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

শুখা ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন বোধগম্য নয়। গণপতিবাবু বললেন, "শুকনো! শুকনো চাকর-বাকর মানে স্রেফ মাইনে পাবে, বাড়িতে তোমার খাবার-দাবারের বালাই থাকবে না। কলকাতার সায়েবরা ওইরকম চাকর-বাকর পছন্দ করেন। ওঁরা টেবিলে-চেয়ারে বসে চপ কাটলেট চিবোবেন, আর বাড়ির ঝি-চাকর শুকনো পেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে।"

গণপতিবাবুর কাছেই শুনলাম, জেঠমালানিজীর সঙ্গে শিখীন্দ্র সিংহের বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। জেঠমালানি বললেন, "ওই ফ্ল্যাটটি আমার পক্ষে এখনই ছাড়া খুব ক্ষতিকর হবে। আমার বিজনেসের জন্য ভদ্রপল্লীতে একখানা গেস্ট হাউস খুব দরকার। যে-করেই হোক একটা পথ বার করতে হবে।"

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, "গোড়াতেই যে গলদ হয়ে বসে আছে। আর সি ঘোষ চিঠি লিখুক কিছু এসে যায় না—কিন্তু ফ্ল্যাটের দখলই যে বেহাত হয়ে বসে আছে।"

জেঠমালানি যাবার আগে বললেন, "তাহলে বলছেন, যে করেই হোক ফ্ল্যাটের মধ্যে তাড়াতাড়ি কাউকে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলেই ব্যাপারটা আমার দিকে ঘুরে যাবে।"

শিখীন্দ্রবাবু বললেন, "ফ্ল্যাট আপনার দখলে থাকলে অবশ্যই আপনি অনেক জোর পাবেন।"

"আমাকে আপনি স্যর, চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিন।" এই বলে জেঠমালানি ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

গণপতিবাবু এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "লোকটার শেষ কথাগুলো আমার মোটেই ভাল লাগলো না, শংকর।"

গণপতিবাবুর মন্তব্য শুনবার অগেই আমার সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠলো।

আমার মুখটা যে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করে গণপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো তোমার?"

গণপতিবাবু অভয় দিয়ে বললেন, "লড়তে নেমে লাঠির ভয় করলে তো চলবে না ভায়া। সাধে কী আর রোজ বাড়ি ফিরে গীতা পড়ি। যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি...গ্লানিতে ভরে গিয়েছে দুনিয়া...আমাদের সামান্য সাধ্যমতো অধর্মের সঙ্গে ফাইট করে যেতে হবে। তোমার বাবার গীতা মুখস্থ ছিল। উনি বলতেন, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ হে পার্থ, "ক্লীবভাব ত্যাগ করো।"

সিঙাড়া ও চা দুই শেষ হয়েছে। রিলায়েন্সের বেয়ারা এসে জিজ্ঞাসা করে গেলো আরও কী দেবে। আবার কিছু অর্ডার দিতে উৎসাহী হলেন গণপতি-বাবু। কিন্তু ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমি এবার বিদায় নিতে উৎসুক।

গণপতিবাবু আমার ব্যস্ততা দেখে মন্তব্য করলেন, "কী জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে তা তো বললে না এখনও।"

কোনো প্রশ্ন না করেই আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে গিয়েছি এবং তাতেই শিউরে উঠেছি আমি। পাপি বিশোয়াস সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটু সন্দেহ

রেখে যথাসময়ে সোজা ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটে চলে না এলে এতোক্ষণে আজ বিপদের অবধি থাকতো না। জেঠমালানি এতোক্ষণে তাঁর প্রিয় ফ্ল্যাটের দখল ফিরে পেতেন এবং ওখান থেকে ওঁদের বিদায় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো।

পপি বিশোয়াসের প্রসঙ্গ আর গণপতিবাবুর কাছে তুলতে ইচ্ছে করলো না। বললাম, "আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনার কথাতেই পেয়ে গিয়েছি।"

গণপতিবাবু সাবধান করে দিলেন, "ওই জেঠমালানি লোকটাকে সুবিধে মনে হলো না—একটা কিছু গোলমাল পাকাবার চেষ্টা উনি করবেন।"

আমি এই মুহূর্তে শুধু পপি বিশোয়াসের কথাই ভাবছি। আমি কত সরল মনে ওঁর সমস্ত কথাগুলো বিশ্বাস করে বসে আছি এবং ওঁকে সাহায্য করবার জন্যে এক কথায় নিজের পয়সা খরচ করে গণপতিবাবুর কাছে ছুটে এসেছি।

পপি বিশোয়াস সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে গণপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "জেঠমালানি কখন এই লায়ন অ্যান্ড সিনহার অফিসে এসেছিলেন?"

গণপতিবাবু বললেন, "টিফিনের একটু আগেই। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তো শিখীন্দ্রবাবুর টিফিন খাওয়ার দেরি হয়ে গেলো।"

গণপতিবাবু আরও খবর দিলেন, "জেঠমালানি আগামীকাল একবার আসবেন বলে গেলেন। ফ্ল্যাটের ব্যাপারে আজকেই এসপার-ওসপার কিছু একটা করবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়।"

গণপতিবাবুর সাবধানবাণী মন দিয়েই শুনলাম, কিন্তু কোনো উত্তর দিলাম না।

আমি চলে আসছি। এমন সময় গণপতিবাবু আবার ডাকলেন। চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলেন, "চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা কোথায়?"

বললাম, "ওটা খুব সাবধানে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি।"

গণপতিবাবু বললেন, "তোমার কাছে বাড়তি চাবি-তালা আছে তো? আজ রাত্তিরটা অন্তত কাউকে কিছু না বলে নিজেই ডবল তালা লাগিয়ে রেখো।"

ডবল তালার বুদ্ধিটা গণপতিবাবুর মাথায় আসছে কেন তা আন্দাজ করতে পারছিলাম না। কিন্তু গণপতিবাবু নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, "চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মাত্র একখানা চাবি ছিল একথা আমার বিশ্বাস হয় না। নিজেদের সুবিধের জন্যে এক-আধটা বাড়তি চাবি কর্তাদের কাছে নেই এটা হতেই পারে না। হয়তো সেই চাবির জোরেই গভীর রাত্রে নিজেদের কোনো লোককে ঘরে ঢুকিয়ে দেবে, তুমি জানতেও পারবে না।

গণপতিবাবুর দূরদৃষ্টির তারিফ না করে পারলাম না। গণপতিবাবু হেসে বললেন, "ওসব কিছুই না। অনেকদিন এই মামলা-মোকদ্দমার লাইনে থাকলে, কপালের কাছে একটা তৃতীয় চোখ গজিয়ে ওঠে! মানুষের কুকীর্তির মতলবটা ওই চোখে সবার আগে ধরা পড়ে যায়।"

গণপতিবাবুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা নিয়ে ট্রামে চড়ে বসেছিলাম। লিন্ডসে স্ট্রীট পেরিয়ে সদর স্ট্রীটের মোড়ে যখন ট্রাম থেকে নামলাম তখন আর একজনের প্রতি বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠেছে। তার নাম অবশ্যই

পাপি বিশোয়াস।

পাপি বিশোয়াস, আপনাকে বিশ্বাস করাটা অবশ্যই আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য, হাবভাব, কথাবার্তা দেখে প্রথম থেকেই তো আমি সাবধানে চলছিলাম। কিন্তু তারপর কী যে হলো, কখন যে আপনি কথাবার্তায় আমার মনের নরম জায়গায় আঘাত দিলেন, আমি আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। যে-লোক আপনার উপকার করতে চায় তার বিরুদ্ধে কেউ এমনিভাবে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে!

পাপি বিশোয়াস জবাব দিচ্ছেন না কেন? কিন্তু কোথায় পাপি বিশোয়াস? কাকে আমি এসব প্রশ্ন করছি? ট্রাম থেকে নেমে এই মুহূর্তে আমি সংধ্যার অস্পষ্ট আলোকে বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী সদর স্ট্রীট ধরে হেঁটে চলেছি।

পিছনে একটা রিকশওয়ালা ফেউ লেগেছে। ফুটপাথের গা ঘেঁষে আমার পিছন-পিছন সে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণী ঘণ্টি বাজিয়ে চলেছে। রিকশওয়ালা বলছে "আইয়ে সাব—ফাস্ট কিলাশ গার্ল—ভাবনানি ম্যানসন।"

প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়েও রিকশওয়ালা এবার প্রলোভনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। দু-তিনবার স্পেশাল ঘণ্টির সিগন্যাল দিয়ে রিকশওয়ালা চাপা গলায় বললো, "ভাবনানি মেনসন ছোড় দিজিয়ে সাব টপ কিলাশ প্রাইভেট সেক্রেটারি"—এই বলে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট পাড়ার এক বিখ্যাত বিলিতী কোম্পানির নামোল্লেখ করলে রিকশাওয়ালা।

আমার চলার গতি বোধ হয় একটু স্লথ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে সাহস পেয়ে রিকশাওয়ালা বললো, "ওয়াই-ডবলু-সি-এ হোস্টেল হুজুর। অফিস গার্ল, কলেজ গার্ল, প্রাইভিট গার্ল।"

এবার বিরক্তি দেখানোর সময় এসেছে ভেবে আমি হঠাৎ রিকশাওয়ালার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। গ্যাসপোস্টের আলোয় রিকশওয়ালা আমাকে দেখেই চমকে উঠলো। রিকশা নামিয়ে রেখে সে দ্রুতবেগে আমার সামনে এসে দুটি হাত জোড় করে বললো, হুজুর কসুর হো গিয়া।

অকস্মাৎ এমন নাটকীয় পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারলাম না। রিকশ-ওয়ালা বললো, হুজুর, আপনি গাড়িতে উঠুন, আপনাকে থ্যাকারে ম্যানসনে পেঁছে দিয়ে আসছি।

আমি এখনও লোকটাকে চিনতে পারছি না। রিকশওয়ালা তখনও বলছে, "হুজুর এ রকম ভুল আর কখনও করবো না। পিছন থেকে আপনাকে আমি একদম চিনতে পারি নি—ভেবেছি, এ পাড়ার নয়া প্যাসিঞ্জার।"

ওদিক থেকে এপাড়ার এক বেসামাল ডেলি প্যাসেঞ্জার আমাকে রিকশ-ওয়ালার সঙ্গে নিবিড় আলোচনারত দেখে ফিক করে হেসে বলে গেলো, "উঠে পড়ো বাছা! লজ্জা কী? কোনো চিন্তা নেই—তোমাকে ঠিক জায়গায় পেঁছে দেবে। খুব ভাল রিকশওয়ালা পেয়েছো তুমি।"

অপরিচিত পথচারীর ওই মন্তব্য শুনে রিকশওয়ালা আরও ঘাবড়ে গেলো। আমার কাছে আবার ক্ষমা চেয়ে বললো, "কিছু মনে করবেন না হুজুর। পুরো মাতাল আছে। কিছুক্ষণ আগে আমার রিকশ চড়ে গিয়ে, সব পয়সা খুইয়ে এখন হেঁটে বাড়ি ফিরছে। রিকশ চড়বার পয়সাও নেই।"

সদর স্ট্রীটের অস্বস্তিকর আলোছায়ায় হঠাৎ আমার মনে হলো আমি আর সেই অতি পরিচিত কলকাতা শহরে নেই। পাকে-চক্রে জীবনের স্রোতে

ভাসতে ভাসতে আমি অন্য কোনো রহস্যময় নগরীর অজানা অন্ধকারে পথ হারিয়ে বসে আছি। মাতালটা তখনও ফুটপাথের ওপরে গিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে আবার বলছে, "উঠে পড়ো বাপধন! পুজো দিতে এসেছো যখন, তখন মন্দিরে ঢুকতে অত দ্বিধা কেন? মিস্টার রিকশড্রাইভার তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।"

অদূরে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত হলদে রংয়ের সেই ঐতিহাসিক বাড়িটা আজকের সন্ধ্যার ঘটনাবলীর নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে যেন এখনও অনেক দেরী—অথবা স্বপ্নভঙ্গের পরে নির্ঝর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

রিকশওয়ালা এবার নিজের পরিচয় দিলো। "আমি বুলাকপ্রসাদ, হুজুর। আমাকে চিনতে পারছেন না? ঠাকরে ম্যানসনেই তো আমি গাড়ি রেখে ঘুমোই। আপনি আমাদের বাপ-মা, হুজুর। আমার রিকশ চড়েই হুজুর সেবার সকালে আপনি ঠাকরে ম্যানসনে এলেন। আমি ভুল করে আপনার কাছে একটাকা নিয়েছিলাম। আজ আবার ভুল হয়ে গেলো।"

আমাকে থ্যাকারে ম্যানসনে পৌঁছে দেবার জন্যে রিকশওয়ালা অনেক সাধাসাধি করলো। কিন্তু বিনা পয়সায় রিকশ চড়বার মতো মনোবৃত্তি এখনও হয়নি আমার। ওকে 'না' বলে আমি সদর স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু রিকশওয়ালা এখনও আমাকে ছাড়ছে না। রিকশর হ্যান্ডেল তুলে নিয়ে সে তখনও আমার পিছন পিছন আসছে।

মুখ ফিরিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হলো?"

রিকশওয়ালা করুণভাবে বললো, "আপনার পায়ে পড়ি হুজুর, আমাকে মাফ করলেন তো? দোহাই রামসিংহাসনজীকে কিছু বললেন না।" এরপর রিকশওয়ালা যা বললো তার অর্থ, এই খবর রামসিংহাসন চৌরাশিয়াজীর কানে গেলে আর রক্ষা নেই। সেবার আমাকে বাড়তি ভাড়া চার্জ করবার জন্যে রামসিংহাসনজীর 'আদালতে' রিকশওয়ালার দশ টাকা ফাইন হয়েছিল। এবার খবর পৌঁছলে তার গুরুতর শাস্তি হতে বাধ্য—অন্তত কুড়ি টাকা ফাইন না করে রামসিংহাসনজী কিছুতেই ছাড়বেন না।

এই ফাইন কী রামসিংহাসনজী নিজেই পকেটস্থ করেন? রিকশওয়ালা বললো, ফাইনের টাকায় ঠাকরে ম্যানসনে শিউ-ভগবানের পুজো হয়।

"ওরে বাবা, কাউকে কিছু বলছি না। তুমি এখান থেকে বিদায় হয়ে নিজের কাজ করে যাও।" এই বলে আমি সদর স্ট্রীটের উত্তর দিকের অপ্রশস্ত ফুটপাথ ধরে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম।

থ্যাকারে ম্যানসনের গেটের কাছে এসে পাপি বিশোয়াসের মুখটা আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

'মিসেস বিশোয়াস, আপনি তাহলে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের নায়িকা হিসেবে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন! ওই যে আপনি বললেন, কোনো বিশিষ্ট অতিথিকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আপ্যায়ন না করলে আপনি অসুবিধায় পড়বেন, এ সবই তাহলে বানানো?'

পাপি বিশোয়াসের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করবো, মিস্টার জেঠমালানি কখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন: এবং যেন-তেন-প্রকারেণ চৌত্রিশ নম্বরে ঢুকবার জন্যে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

আমি এখন থ্যাকারে ম্যানসনের আপিসে ঘরে পৌঁছে গিয়েছি। সেখানে

একটা কম পাওয়ারের পুরনো বাল্ব মিটমিট করে জ্বলছে। একটা বেওয়ারিশ বেড়াল পরম নিশ্চিন্তে ম্যানেজার সায়েবের টেবিলের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে ; কিন্তু আর কোনো লোকের সন্ধান নেই।

পাপি বিশোয়াস যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়বেন এই আশায় আমিও হিংস্র বাঘের মতো ওত পেতে বসে রইলাম।

পাপি বিশোয়াসের জন্যে এই মুহূর্তে হাসি আসছে আমার। 'হে বিচিত্র-রূপিণী মনোমোহিনী, আপনার মধুর হাসিতে আপনি বহু পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ করেছেন এবং তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে সফল হয়েছেন। নগর কলকাতায় এই মুহূর্তে আপনিই হয়তো কলাবতী সর্বোত্তমা ঊর্বশী। কিন্তু আজ আপনার উদ্দেশ্যসাধন হবে না। জেঠমালানির নির্দেশে হাওড়া কাসুন্দের এক অতি সামান্য কর্মচারির বিরুদ্ধে আপনি যে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেছেন তা সফল হলে তার চাকরিটি নষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু এই ধরনের অসহায় অনভিজ্ঞ মানুষদের শেষ মুহূর্তে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে বিপত্তারণ মধুসূদনের মতো গণপতিবাবুরাও কখনও কখনও আবির্ভূত হন। আজ আপনার অভীষ্ট লাভ হবে না, বরং থ্যাকারে ম্যানসনের সামান্য কর্মচারির কাছে এমন সব কথা শুনবেন যা-হয়তো কোনোদিন আপনার কর্ণগোচর হয়নি।'

আমি তো পাপি বিশোয়াসের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে সব দিক থেকে তৈরি হয়ে বসে আছি। কিন্তু কোথায় পাপি বিশোয়াস? এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই।

তাহলে, অবস্থা বুঝে তিনিও কী যথাসময়ে উধাও হলেন? কিন্তু পাপি কী করে আমার শেষ খবরাখবর পাবেন? তবে কী আমাকে প্রতি মুহূর্তে ছায়ায় মতো অনুসরণ করবার জন্যে লোক নিয়োগ করা হয়েছে? অথবা, আইন পাড়ায় লায়ন অ্যান্ড সিন্‌হার অফিসের কাছেই কেউ আমাকে দেখে ফেলে জেঠমালানিদের কাছে খবরাখবর পাঠালেন?

রিলায়েন্সের খাবার দোকানে যাঁরা আমাদের অদূরে টেবিল অধিকার করেছিলেন তাঁদের মুখগুলো স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু তেমন কোনো সন্দেহজনক মুখ স্মরণ করতে পারলাম না। তবে, এতোদিনে আমার জানা উচিত যে সব সন্দেহজনক ব্যক্তির মুখ সন্দেহজনক হয় না। তাহলে পাপি বিশোয়াসকে তো প্রথমেই সন্দেহ করে বিদায় দেওয়া উচিত ছিল আমার।

এখন আমার উচিত সমস্ত দিনের ঘটনাবলী ভুলে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া। চাকরিতে যখন ঢুকেছি তখন কিছু কিছু সমস্যা তো আসবেই। কারও কারও ভাগ্যে পদ ও বেতনের তুলনায় নাটকীয়তার ভাগ অনেক বেশী। আমি হয়তো তাদেরই একজন—না হলে ব্যারিস্টারের বাবু হিসেবে, হোটেলের রিসেপশন টেবিল থেকে এবং এখন এই গলিত নখ-দন্ত ম্যানসন-বাড়ির তদারকির দায়িত্ব নিয়ে বহু মানুষের বিচিত্র মেলায় এইভাবে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার স্রোতে কেন অবগাহন করবো? কিন্তু এইসব চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আমি কিছুক্ষণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাই।

এখানে আসবার সময় একখানা ফোম লেদারে বাঁধানো নোটবই সঙ্গে করে এনেছি। নিজের সঙ্গে কিছু একান্ত সাক্ষাৎকার এই নোট বইয়ের মাধ্যমে হয়েছে। কিন্তু অনেক দিন আবার তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ওই নোট

বইয়ের পাতায় কিছুক্ষণের জন্যে আমার হারানো আমিকে খুঁজে পাই। বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যেও যে-নিঃসঙ্গতার আগুনে আমি দগ্ধ হই, তার থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি মেলে। যাদের আমি ভালবাসি, যাদের স্নিগ্ধ স্নেহ-বর্ষণে আমার রৌদ্রদগ্ধ জীবন কিছুক্ষণের জন্যেও শ্যামল-শোভন হয়ে ওঠে, একমাত্র তাঁদেরই স্মৃতিচারণ করি আমার খাতার পাতায় পাতায়—সেখানে অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। আজ যেন নোটবইটা আমাকে আবার ডাকছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছি, এমন সময় সহদেবের প্রবেশ। সহদেব বললো, "আপনি কোথায় ছিলেন? ওই ঢ্যাঙা মেমসায়েব কয়েকবার ঘুরে গেলেন। তারপর অনেকক্ষণ বসে-বসে একটু আগেই বেরিয়ে গেলেন।"

সহদেব বললো, "এখানে বসে বসে মেমসায়েব দু-তিনটে সিগারেট খেলেন। ঐ দেখুন না।"

সহদেবের কথায় আমার দৃষ্টি ছাইদানিতে এসে পড়লো। সদাসতর্ক দৃষ্টি থাকলে ছাইদানিতে পোড়া সিগারেটের টুকরো দেখেই পাপি বিশোয়াসের উপস্থিতির খবরটা আমি আন্দাজ করতে পারতাম। পাপি বিশোয়াসের অধরে পোড়া সিগারেটের সাইজগুলো একটু বড়ো, পুরো সিগারেট দগ্ধ হবার আগেই তিনি ছাইদানিতে কবরের ব্যবস্থা করেন।

আমাকে উঠতে দেখে সহদেব বললো, "মেমসায়েব হয়তো এখনই এসে পড়বেন।"

এবার আমি এমনভাবে সহদেবের দিকে তাকালাম যে সে বুঝতে পারলো, মেমসায়েব কখন আসবেন অথবা না আসবেন তার জন্যে আমি চুপচাপ বসে থাকতে রাজী নই।

সহদেবকে আরও বিচলিত হবার সুযোগ না দিয়ে আমি বললাম, "আমার নিজের ঘরে যাচ্ছি। এখনই স্নান করা প্রয়োজন।"

সত্যি, আমার দেহ এবং মনে অনেক ময়লা জমেছে। স্নান না-করা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করছি না আজ।

কিন্তু ঘরে ফিরেই চৌত্রিশ নম্বরের কথা মনে পড়ে গেলো। আমার ঘর থেকে একটা স্পেশাল তালা নিয়ে চৌত্রিশ নম্বরের দরজার কাছে চলে গেলাম।

সহদেব ওখানেই ঘোরাঘুরি করছিল। চাবি হাতে আমাকে দেখে সে প্রথমে ভুল বুঝলো। বললে, "হুজুর এখানকার শাওয়ারে স্নান করবেন? বাথ টবও আছে—একটু পরিষ্কার করে দেবো?"

শাওয়ার তো দূরের কথা, আমাকে চাবির পাশে আর একটা তালা লাগাতে দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেলো। সহদেব বললো, "আপনি হুজুর, কষ্ট করতে গেলেন কেন? রামসিংহাসনজীকে খবর পাঠালেই পারতেন।"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে শরীরটা শান্ত করলাম।

ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যে কিছুটা পথ এসেছে। পাপি বিশোয়াস যে এখনও আমার মুখ চেয়ে কোথাও বসে আছেন তা হতেই পারে না। আসলে ওই আর্জেণ্ট অতিথির ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে সে সম্বন্ধে আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই।

হিসেবপত্তরের কাজে আমি মোটেই পোক্ত নই। সারাদিন নানা টুকরো টুকরো হাঙ্গামায় রুটিন কাজকর্মে একটু পিছিয়ে পড়েছি। তাই আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে আপিস ঘরে বসে যতখানি সম্ভব পুরনো হিসেবপত্তর

এগিয়ে নিয়ে যাবার মতলব এ'টেছি।

ঘাড় নিচু করে এক মনে হিসেব মেলাবার শক্ত কাজ করে চলেছি। ঘড়ির কাঁটা সেই অবসরে আরও একটু এগিয়েছে। আমার কাজটাও প্রায় আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে। এমন সময় নারী কণ্ঠের ছুঁচলো হাসির সুর আমার কানের পাতলা চামড়াকে বি'ধে ফেলবার চেষ্টা করলো।

"হ্যালো! হ্যালো! রাতদুপুরে কী এমন রাজকার্যে ডুবে রয়েছেন, মিস্টার শংকর?" রাজকার্যের রসিকতায় নারীকণ্ঠে যে-হাসির হিল্লোল উঠলো তা কয়েক মুহূর্তেও শেষ হতে চায় না।

খাতাপত্তর সরিয়ে আমি এবার মুখ তুলে তাকাতাম।

পপি বিশোয়াস। হ্যাঁ, খোদ পপি বিশোয়াসই সশরীরে আমার সামনে আবার উপস্থিত হয়েছেন।

পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না আমার। উপায় থাকলে আমি হয়তো ওঁর সঙ্গে কথাই বলতাম না, অন্য কোনো কর্মচারিকে আমার কথাগুলো ওঁর কানে পৌঁছে দেবার জন্যে নির্দেশ দিতাম।

কিন্তু যে-কোনো পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে আনবার আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে পপি বিশোয়াসদের। যেন ওঁর দিক থেকে কোনো অপরাধই হয়নি, যত দোষ আমারই, এইভাবে কথা শুরু করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

"আমি আপনার ওপর খু-উ-ব রাগ করেছি। আমার উচিত আপনার সঙ্গে একেবারে আড়ি করে দেওয়া!" অভিযোগ করলেন পপি বিশোয়াস।

মিষ্টি-মিষ্টি বোকা-বোকা এই স্বর শুনে কে কল্পনা করবে, আইন পাড়ায় যে গোপন ষড়যন্ত্রের কথা শুনে এসেছি তার প্রধানা চরিত্র এই সুবেশা, সুন্দরী?

আমাকে এবার পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকাতে হলো। কিছুক্ষণ আগে যে-শাড়ি পরা অবস্থায় তাঁকে দেখেছি এখন তা পাল্টে গিয়েছে। এখন একখানা টকটকে লাল শাড়ি পরেছেন পপি বিশোয়াস। যতদূর মনে হচ্ছে ব্লাউজের রংও শাড়ির সঙ্গে পাল্টেছে।

পপি বিশোয়াস এবার পুরোদস্তুর আক্রমণ করলেন আমাকে। "আপনি তো উধাও হলেন—কিন্তু আমি কোথাও যাইনি। তীর্থকাকের মতো আপনার আশায় বসে আছি—আর ভাবছি। এই আসে, এই আসে।"

হাতে-নাতে মিথ্যে কথা যখন ধরা পড়ে যাচ্ছে, তখন সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিত নয়। গম্ভীরভাবে বললাম, "যতদূর মনে পড়ছে অন্য একটা শাড়ি পরে আপনি তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, মিসেস বিশোয়াস।"

ভেবেছিলাম, এবার লজ্জায় চুপসে যাবেন পপি বিশোয়াস—তিনি যে বাড়ি গিয়ে কাপড় পাল্টে এসেছেন তা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বরং মুক্তোর মতো দাঁতগুলো অনেকখানি বিকশিত করে পপি বিশোয়াস হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "আমাকে আর হাসাবেন না, মিস্টার শংকর। পুরুষমানুষদের যে এতো সহজে ধোঁকা দেওয়া যায় তা আমি জানতাম না।"

হাসির ধাক্কায় আকুলি-বিকুলি করে পপি বললেন, "একদম ভুল। আমি সেই পুরনো শাড়িটাই পরে আছি। এর নাম রিভারসিব্‌ল শাড়ি। ম্যাড্রাসের রাধা সিল্ক এমপোরিয়াম থেকে মিস্টার ভরদারাজন সেবার উপহার এনে

দিয়েছিলেন—সিল্কের কাপড়ে দু'দিকে দু'রকম রং—একবার ঘুরিয়ে পরে নিলেই মনে হবে অন্য কোনো শাড়ি!"

আমার এবার চুপসে যাবার অবস্থা। পর্পি বিশোয়াস বললেন, "আপনি ঠিকই ধরেছেন—তখন শাড়িটার অন্য রঙ ছিল। এই এখনই তো শাড়িটা ঘুরিয়ে নিলাম।"

এ-বিষয়ে আমার আর একটুও জানবার আগ্রহ নেই। কোনো কৌতূহল দেখালেই হয়তো কোথায় শাড়ির রং পাল্টালেন তাও পর্পি বিশোয়াস সগর্বে বর্ণনা শুরু করবেন।

পর্পি বিশোয়াসের সঙ্গে এবার সোজাসুজি ভাবের আদান-প্রদানের সময় এসেছে।

কিন্তু আমি আক্রমণ শুরু করবার আগেই পর্পি বিশোয়াস নিজেই আমাকে আবার আক্রমণ করলেন। বললেন, "আমাকে আশা দেখিয়ে কোথায় চলে গেলেন আপনি? আমি তো তীর্থকাকের মতো ছটফট করছি, আর ওই সারভেন্টকে ডিসটার্ব করছি। বিদেশের বড় বড় গেস্টরাও আমার হোটেলের দোতলায় আসতে দেরি করলে আমি অতো ব্যস্ত হয়ে পড়ি না।

"অধৈর্য হয়ে, শেষ পর্যন্ত আমার পুরনো বন্ধু বরুণা প্রপার্টিজের ডিরেক্টর মিস্টার ভরত সিংকে ফোন করলাম। অনেকদিন পরে আমার গলা শুনে ভরতের খুব আনন্দ। বললো, আমার হোটেলে এখনই চলে এসো, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাদের স্পেশাল ভি-আই-পি রুম সবে রেনোভেটেড হয়েছে, দরকার হলে তাও খুলে দেবো।"

পর্পি বিশোয়াস বললেন, "এই ক'খানা বাড়ির পরেই তো মিস্টার ভরত সিং-এর আপিস। তাই পরামর্শ করবার জন্যে ছুটে চলে গেলাম। মুখে খুব খাতির করলো, অনেক সুখ-দুঃখের কথা বললো—ভি-আই-পিদের জ্বালায় কাজকর্মে কোনো শান্তি নেই। ফালতু বিজনেস লেগেই আছে—মোটা মোটা খরচ, অথচ ওইসব অ্যাকাউন্ট থেকে এক পয়সা রোজগার নেই। এখানে খেয়ে, থেকে, বিশ্রাম করে, আমাদের ধন্য করে দিয়ে বিল পেমেন্ট না-করে দেবতারা বিদায় নেন।"

পর্পি বিশোয়াস সুযোগ বুঝে নিজের কাজের কথা তুলেছিলেন। মিস্টার ভরত সিং ঘুরে-ফিরে সেই একই কথা জানালেনঃ ভি-আই-পি রুম খালি রয়েছে।

"আমি তখন বললুম, আমাকে ওই সব ভি-আই-পি টি-আই-পি দেখিও না। তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে অনেক ভি-আই-পি নাড়াচাড়া করেছি। যদি আমাদের লাইনে অটোগ্রাফ নেবার সিস্টেম থাকতো তাহলে আমার অটোগ্রাফ খাতা কবে বোঝাই হয়ে যেতো।"

পর্পি বিশোয়াসের কথা শুনে মিস্টার ভরত সিং নাকি মিটমিট করে হাসছিলেন। তখন পর্পি বিশোয়াস বললেন, "হেসো না, মিস্টার সিং। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে! অনেক দুঃখে হাড় জ্বালা-জ্বালা হয়ে তবে এই ফরেন লাইনে এসেছি। এদের হাঙ্গামা কম, পেমেন্ট বেশী, এই কেউ-দেখে-ফেললো-ভয়ে মেয়েমানুষের আঁচলের আড়ালে মুখ লুকানোর চেষ্টা নেই।"

মিস্টার ভরত সিং তখন বললেন, "তাহলে, আপনি তো খুবই ভাল আছেন। পুরোপুরি এই এক্সপোর্ট লাইনেই থাকুন।"

"এক্সপোর্ট লাইনে পুরোপুরি থাকবো বললেই কী থাকা যায়? কলকাতা

কী দিল্লী, না বম্বে, যে সবসময় ফরেনের টপ কোয়ালিটি গেস্ট আসছে এবং যাচ্ছে? তাছাড়া যে-ডালে বসে আছি সে-ডালকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা যায় না, মিস্টার সিং। পুরনো জানা-শোনা পার্টি—তাদের সুখ-দুঃখ, সাধ-আহ্লাদ তো সবসময় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"খুব ধড়িবাজ বিজনেসম্যান এই ভরত সিং, বুঝলেন মিস্টার শংকর।" পপি বিশোয়াস এবার সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করলেন। "নাহলে কি আর নাগরচাঁদ সুরজলালের ডান হাত হতে পারতো?"

এবার ব্যাখ্যা শুরু করলেন পপি বিশোয়াস। ভরত সিং-এর হাসি-হাসি মুখ দিয়ে সবসময় মিছরি-মাখন বেরিয়ে আছে ; কিন্তু কাজের ব্যাপারে সেই পুরনো খুঁটি ধরে আছে। আমাকে আবার বললে, "ভি-আই-পি রুম পড়ে রয়েছে।"

একটু থেমে পপি বিশোয়াস বললেন, "আমি যত বলছি, হোটেলের খাতায় নাম লেখানোর ব্যাপারে আমি আর নেই, মিস্টার সিং। তাছাড়া আমার গেস্ট কোনো হোটেলে ঢুকতেও চাইছেন না। তুমি যদি সত্যিই অবলাইজ করতে চাও, তাহলে ভাবনানি ম্যানসনে তোমার পুরনো ফ্ল্যাটটা কিছুক্ষণের জন্যে দাও। কিংবা ছাদের ওপর রেসিডেন্ট ডিরেকটরের ঘরখানা।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন হতাশ মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। একটা মিথ্যে কথা বলে আমাকে বিদায় করলে। বললে, ওর ফ্ল্যাটে নাকি ইলেকট্রিক নেই। মিস্টার ভরত সিং-এর ঘরে দু' সপ্তাহ আলো খারাপ হয়ে আছে, আপনি বিশ্বাস করেন? আপনিও তো একটা ম্যানসনের ম্যানেজার—বলুন তো এটা একটা বিশ্বাস করবার মতো কথা?"

পপি বিশোয়াস আবার শুরু করলেনঃ "কেন মিথ্যে বলবো, এই ভরত সিং-এর থেকে আপনি অনেক ভাল লোক। ল্যাজে না-খেলিয়ে আপনি সোজা বলেছেন, আমার ফ্ল্যাট খালি আছে ; কিন্তু দিতে পারবো কিনা একটু ভেবে দেখতে হবে। আপনার সম্বন্ধে আমার দুঃখু—সেই যে বেরিয়ে গেলেন, আর ফিরলেন না। আমি ভাবলাম, নতুন মানুষ আপনি, হয়তো থ্যাকারে ম্যানসনের রাস্তাই চিনতে পারছেন না!"

ধন্য পপি বিশোয়াস! সব জেনেশুনে আপনি যেভাবে কথা বলে যাচ্ছেন তার তুলনা নেই।

পপি বিশোয়াস কী এখনও আমার হাত থেকে চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটি নেবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছেন?

আমি কিন্তু সহজে মুখ খুলছি না। এই সব অভিজ্ঞ এবং সকল-কলা-বিশারদ মহিলার কাছে মুখ খোলা মানেই কিছু তথ্য ফাঁস করে দেওয়া এবং নিজের বিপদের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া। কোনো কিছু প্রকাশ না-করেও বহুক্ষণ কথা বলে যাওয়ার আর্ট রাষ্ট্রদূত ও আইনজ্ঞ ছাড়া আর কারও আয়ত্তে আছে বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু আমার সুপরিকল্পিত নীরবতায় মোটেই মুষড়ে পড়লেন না পপি বিশোয়াস। তিনি নির্দ্বিধায় নিজের কথা হুড়-হুড় করে বলতে লাগলেন।

একটা ফরেন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন পপি বিশোয়াস। বললেন, "এই সিগারেট নিয়েও দুশ্চিন্তা আরম্ভ হচ্ছে আমার। মাত্র একটি কার্টন ডানহিল ইনটারন্যাশনাল আমার স্টকে রয়েছে—সে আর কতক্ষণ? ফরেন এয়ারলাইনসের একজন পাইলট আমাকে রেগুলার এই ব্র্যান্ডের সিগারেট

উপহার দিয়ে যান। এবার অনেক দিন দেখা নেই। অন্য সব কাস্টমাররা মাঝে মাঝে সিগারেট উপহার আনেন, কিন্তু সেসব হয় রথম্যান্‌স না-হয় বেনসন অ্যান্ড হেজেস। ও দুটো ব্র্যান্ড আমার পছন্দ হয় না। ওই পাইলট ভদ্রলোক আমার ধাতটা বুঝে গিয়েছেন। কিন্তু অনেকদিন দেখা নেই।"

সিগারেটে মিষ্টি একটা টান দিয়ে পপি বললেন, "আপনার জন্যে অপেক্ষা করে-করে আমার শেষ পর্যন্ত অন্য চিন্তা আরম্ভ হলো। পেটের বাক্সে সমস্ত কথা চাবি দিয়ে রাখা আমার অভ্যেস নয়, মিস্টার শংকর! আমি সত্যি কথা বলছি, আমার ভয় হলো—আমাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে আপনি ঠিক সময়ে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে পালালেন। মুখে বলে গেলেন, দেখি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিনা।"

সিগারেটে আরও একটা টান দিলেন সুন্দরী পপি বিশোয়াস। "আপনার সরল মুখখানাও আবার মনে পড়লো। এইরকম মুখ দিয়ে তো লোক ঠকানো মিথ্যে কথা বেরুনো উচিত নয়, আমি ভাবলাম। কিন্তু সময় এগিয়ে আসছে, আমি আর ভরসা করতে পারলাম না।"

নরম হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন পপি বিশোয়াস। "হাজার হোক টপ এরোপ্লেন কোম্পানির পাইলটদের সঙ্গে অনেক কাজকর্ম করেছি। এক-খানা ইঞ্জিনের ওপর ভরসা করে তো আজকাল কোনো কাজই চালানো যায় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মিস্টার আচারিয়াকে যে-টাইম দিয়েছি তার আর বেশী দেরি নেই। তাই দ্বিতীয় ব্যবস্থা করে রাখবার জন্যে গতর নাড়ালাম।"

এবার বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠলো পপি বিশোয়াসের মুখে। বললেন, "পপি বিশোয়াস যে-কাজে হাত দেয় তা না-করে কখনও ছাড়ে না। আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওঁর খুব ফরেনে পোস্টেড হবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কিছুতেই হচ্ছিল না। হবার কোনো চান্সও ছিল না—কিন্তু পপি ইজ পপি। তিন মাসের মধ্যে যখন পোস্টিং-এর চিঠি এসে গেলো, তখন আমার কর্তা নিজেই ট্যারা হয়ে গেলেন।"

আবার হাসলেন পপি বিশোয়াস। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নিজের খেয়ালেই বললেন, "আমারই তদ্বির-করা ট্রান্সফারে ইটালিতে গিয়ে, উনি আমাকেই ঘর ছাড়া করলেন এক ইটালিয়ান ছুঁড়ির পাল্লায় পড়ে। সে দুঃখ রাখার জায়গা এখনও আমার নেই, মিস্টার শংকর। অমন হাজবেন্ডের কথা ভাবলে আমার এখনও মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু থাক সেসব কথা। সেসব কথা বলবার সময় এখন নয়।"

পপি বিশোয়াসের বিবাহিত জীবনের এই দুঃখের কথা আমার জানা ছিল না। বরং অন্য কীসব গুজব শুনেছি—সেসব যে পুরোপুরি সত্য নয়, তা এই এতোদিনে বুঝতে পারছি।

পপি বিশোয়াস বললেন, "বদলি ব্যবস্থা করতে মোটেই অসুবিধা হলো না। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে আমার ওয়েল-উইশারের অভাব নেই। ওদেরই একজন পাঁচমিনিটে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্যবস্থা পাকাপাকি করবার পর বললেন, সামান্য ব্যাপার। এর জন্যে আপনাকে এতো হয়রান হতে হবে কেন?"

অভিমানভরা কণ্ঠে পপি বিশোয়াস নিবেদন করলেন, "তবু তো সব কথা বলিনি ওখানে। সামান্য একখানা ঘর ঘণ্টা-দেড়েকের জন্যে ছেড়ে দেবার

জন্যে আপনি যে মালিকের মত নিতে ছুটেছেন একথা শুনলে আপনারও মুখ থাকবে না, আমারও লজ্জার একশেষ!"

পাঁপ বললেন, "ব্যবস্থা তো একটা করলাম, কিন্তু তখনও আমি আপনার আশা ছাড়িনি। চৌত্রিশ নম্বরে আমি আগে কাজ করে গিয়েছি, জায়গাটা আমার পছন্দ। হাতের গোড়ায় টেলিফোনও আছে—ওরই মধ্যে দু'চারটে ফোন সেরে নেওয়া যায়। নতুন জায়গাটাও হয়তো তেমন খারাপ নয়—কিন্তু কথায় বলে না, 'অচেনা শত্তুরের' চেয়ে চেনা 'শত্তুর' অনেক ভাল। এইজন্যেই তো আমাদের লাইনে যারা একটু নাম করেছে তারা আন-নোন পার্টির সঙ্গে কথাই বলে না। ব্যাংকের মতো আমরা ইনট্রোডাকশন ছাড়া অ্যাকাউন্টই খুলি না!"

সিগারেটের ধোঁয়ার তোড়ে পাঁপ বিশোয়াস নিজের অভিমানকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "আমি আপনার জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতাম। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, সহদেব ছুটতে ছুটতে এসে আপনার এই আপিস ঘরেই আমাকে খবর দিয়ে গেল যে ওঁরা এসে গিয়েছেন।

"ওঁরা মানে মিস্টার আচারিয়া। তাঁর গেস্ট গাড়িতে অপেক্ষা করছেন।"

পাঁপ বিশোয়াস বললেন, "মিস্টার আচারিয়ার দোষ নেই ; আমি ওঁকে সোজা বলে দিয়েছি মিস্টার জেঠমালানির গেস্ট হাউসে চলে আসতে। উনি ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে হাজির হয়েছেন।"

পোড়া সিগারেটের আগুন ছাইপানিতে ঘষে নেবাতে-নেবাতে পাঁপ বললেন, "এইরকম হতে পারে ভেবেই আমি আপনার সহদেবকে একটা টাকা দিয়ে ওখানে বসিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, চৌত্রিশ নম্বরের সামনে কেউ ঘোরাঘুরি করলে জিজ্ঞেস করবে তাঁর নাম মিস্টার আচারিয়া কিনা ; তারপর ছুটে এসে এসে আমাকে খোঁজ দিয়ে যাবে।"

ঠোঁট উল্টোলেন পাঁপ বিশোয়াস। "খবর পেয়েই ছুটলাম মিস্টার আচারিয়ার কাছে। আমাকে না-দেখে উনি ছটফট করছেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলেন। গেস্টকে গাড়িতে বসিয়ে আমি এখানে হন্যে হয়ে খুঁজছি আপনাকে। এটা খুবই ব্যাড্ ম্যানারস্ বুঝতে পারছেন।' আমি বললাম, হন্যে হবার মতো কিছু নেই। আপনার গেস্টকে নিয়ে চলুন।"

এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

"বলবো কেন? সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মৃদু আক্রমণ করলেন পাঁপ বিশোয়াস। "আপনার এই থ্যাকারে ম্যানসনেরই কোথাও! আপনি ঘর দেবেন না বলে, অন্য সবাই কি দরজায় খিল এঁটে বসে থাকবে? একেবারে চমৎকার গেরস্ত ফ্ল্যাট—কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জত নেই।"

থ্যাকারে ম্যানসন শুনে আমি সত্যিই একটু মুষড়ে পড়লাম। এই বিরাট বাড়িটার ঘরের মধ্যে ঘরে কোথায় কী হচ্ছে তার কিছুই আমার এখনও পর্যন্ত জানা হয়নি।

আমি ভাবছি এবার পাঁপ বিশোয়াসকে আক্রমণ করি। বলি, সব জেনে শুনে জেঠমালানির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি কেন আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছেন? এবং এখনও কেন বোকার মতো হাসছেন তিনি?

কিন্তু পাঁপ নিজেই হুড়-হুড় করে বললেন, "কী হাঙ্গামা আপনাকে কী বলবো। চৌত্রিশ নম্বরের ব্যবস্থা হয়নি শুনে মিস্টার আচারিয়া একটু

বিরক্তই হলেন। আমাকে শুনিয়ে দিলেন, আপনি যে চৌত্রিশ নম্বরের সব ব্যবস্থা করে রাখবেন বলেছিলেন?"

পপি বিশোয়াস সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, "তাতে মহাভারতের কী অশুদ্ধি হবে? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। অন্য ঘরে বসলে আম কী টক হয়ে যাবে?"

"তারপর?" আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি।

"তারপর ভদ্রলোক শুধু-শুধু আমার ওপর মেজাজ দেখালেন। চৌত্রিশ নম্বর, চৌত্রিশ নম্বর করে গ্যাজর-গ্যাজর করতে লাগলেন। আমি তখনও বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আপনার গেস্টের ঘর চাই, না পপি বিশোয়াসকে চাই? তাতেও লোকটা সন্তুষ্ট হলো না, মশাই।"

আমার সাগ্রহ ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

পপি বললেন, 'তারপর নতুন আস্তানায় ওঁদের নিয়ে তুললাম। কিন্তু বাঁকা বাঁকা কথা সহ্য করতে পারি না, মিস্টার শংকর। হেড মিস্ট্রেসের বাঁকা কথা হজম করতে না পেরে আমি লেখাপড়া ছেড়ে ছিলাম। মায়ের বাঁকা কথায় রেগে গিয়ে ঘর ছেড়ে এসে প্রথম বিয়ে করেছিলাম। এই বাঁকা কথার জ্বালায় আমার সেকেন্ড হাজবেন্ডকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। এখন আমি কাস্টমারের বাঁকা কথা শুনবো?--কোন্ দুঃখে?"

এই প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস নিলেন পপি বিশোয়াস। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "মেজাজ একটু গরম হলে আমার আবার বিজনেসের কথা খেয়াল থাকে না। এ তো আর জামাকাপড় বেচা নয়– মন না থাকলে, একটু-আধটু পছন্দ না হলে আমাদের কাজ করা যায় না।"

পপি বিশোয়াস বললেন, "মিস্টার আচারিয়ার গেস্টকে দেখলাম। ভি-আই-পি না হাতি! রেসের মাঠের একটা জকিকে ধরে নিয়ে এসেছে, কিছু হাঁড়ির খবর জোগাড়ের জন্যে।"

মুখ বিকৃত করলেন পপি বিশোয়াস। বললেন,"ঐ মিস্টার আচারিয়া তখনও চৌত্রিশ নম্বরের কথা ভুলতে পারেন নি। ঘরে বসে যেমনি আবার ওই কথা তুলেছেন অমনি আমি বেঁকে বসলুম। বললুম, 'থাকলো আপনার বিজনেস। আমি এখন কাউকে বসাতে পারবো না।"

পপি বিশোয়াসের চোখ দুটো এবার জ্বলছে। "বলে যেন বাঁচলুম। মনে হলো বমি হয়ে অম্বলের জ্বালা কমে গেল। ওই জকিটাকে দেখে আমার একটুও ভক্তি হয়নি। আমার বুটিকের মেয়েদেরও আমি বলি, কাজ করতে এসেছো বলে ক্রীতদাসী হওনি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো গেস্ট নেবে না।"

জেঠমালানি রহস্যটা এবার যেন আরও জটিল হয়ে উঠছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

পপি বিশোয়াস বললেন, "তারপর আমি ওদের ঘর থেকে বিদেয় করে কিছুক্ষণ ওখানেই বিশ্রাম নিলাম। মাঝখান থেকে ঘরভাড়াটা আমার পকেট থেকে দিতে হলো। তা যাক! ভগবানের দয়ায় আমার টাকার অভাব নেই। মনের ঘেন্নায় জামাকাপড় পাল্টে ফেলার ইচ্ছে করলো। কিন্তু তাড়াতাড়ির মাথায় সঙ্গে বাড়তি কাপড় আনিনি। তাই ওই কাপড়টাই উল্টে পরে ফেললুম।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, মিসেস বিশোয়াস, মিস্টার আচারিয়ার সঙ্গে মিস্টার জেঠমালানির কোনো জানা-শোনা আছে?"

"খুউব আছে।" উত্তর দিলেন পাপি বিশোয়াস। "দু'জনের বখরায় রেসের মাঠে ঘোড়াও আছে যতদূর শুনেছি।"

এবার সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে আসছে। পাপি বিশোয়াসকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, মিস্টার আচারিয়া এই গেস্টের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে প্রথম কখন যোগাযোগ করেন?"

চোখ বন্ধ করে পাপি হিসাব করতে লাগলেন, "আমি তখন সবে ভাত খেয়ে উঠে একটু বিশ্রামের কথা ভাবছি—এই পোনে দুটো, কিংবা দুটো হবে।"

আমাদের কথার মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়লো। সহদেব এসে ফিসফিস করে বললো, "হুজুর, চৌত্রিশ নম্বর কি মিস্টার জেঠমালানিরা আবার নিয়ে নিয়েছেন?"

"কেন বলোতো!" আমি সহদেবকে প্রশ্ন করলাম।

সহদেব বললো, "জেঠমালানি কোম্পানির নাগেশ্বরজী এইমাত্র দু'জন লোক নিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকারে ফ্ল্যাটের বেল বাজাচ্ছিলেন। আমি বললাম, তালা ঝুলছে, আপনি কোথায় বেল বাজাচ্ছেন? নাগেশ্বরজী বিশ্বাসই করেন না, বললেন, ঘরে তো লোক থাকার কথা।"

সমস্ত ব্যাপারটা এবার দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সহদেবকে বিদায় করে পাপি বিশোয়াসকে আমি অ্যাটর্নি আপিসে জেঠমালানিদের ষড়যন্ত্রের সব কথা খুলে বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যি করে বলুন তো আপনি আমার সর্বনাশের জন্যে এখানে আসেন নি?"

আকাশ থেকে পড়লেন পাপি বিশোয়াস। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। হঠাৎ আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন পাপি বিশোয়াস। বললেন, "বিশ্বাস করো, আমি কিছুই জানতাম না। কিন্তু ওই মিস্টার আচারিয়া এবং জেঠমালানি যে যোগাসাজশ করে আমাকে এর মধ্যে নামিয়েছে সে সম্বন্ধে এখন আমার একটুও সন্দেহ নেই। এখন আমার মনে পড়ছে, ওই আচারিয়াই আমাকে চৌত্রিশ নম্বরের কথা বললো। আমি তখন বলেছিলাম, আপনিই জেঠমালানিকে বলুন, উনি তো আপনার বন্ধু। কিন্তু উনি তখন সাধু সেজে বললেন, 'না আপনিই ব্যবস্থা করুন।' উদ্দেশ্যটা আর কিছুই নয়, আমার যাতে মনে কোনো সন্দেহ না হয়। যাতে সোজাসুজি আমি ওঁদের ফাঁদে পড়ি।"

ভয়ে আঁতকে উঠলেন পাপি বিশোয়াস। বললেন, "আমি না-জেনে তোমার কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম। শুধু ওরা ঘরের দখল নিতো না, হয়তো তোমার নামে ফৌজদারি কেস করে দিতো—বলতো ওদের ফ্ল্যাটের দামী দামী জিনিস চুরি হয়ে গিয়েছে তোমার দোষে। ওই শুটকে গেস্ট হয়তো ঘর ছাড়তোই না—এবং ততক্ষণে জেঠমালানির লোকেরা এসে পড়তো।"

এই মুহূর্তে ভীষণ হাল্কা বোধ করছি। মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতে হলে আমার খুব কষ্ট লাগে। পাপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, তিনি এর কিছুই জানতেন না। নিতান্ত ভাগ্যবলে এবং গণপতি সামন্তের আশীর্বাদে বিরাট বিপদ থেকে কোনোক্রমে এ যাত্রায় উদ্ধার পেয়েছি!

পপি বিশোয়াসের চোখের জল এখনও মুছে যায়নি। তিনি হঠাৎ বললেন, "ভাই, পাকেচক্রে আমি অনেক নিচে নেমেছি, কিন্তু এখনও এমন নামিনি যে জেনেশুনে একটা গোবেচারা ছেলের সর্বনাশ করবো।"

পপি বিশোয়াস এখন আমার সামনে অন্য এক লাবণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। এই পপিকে আমি আর ঘৃণা করতে পারছি না।

"কী ভাই? বিশ্বাস করলে তো?" পপি বিশোয়াস যাবার আগে শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনাকে বিশ্বাস করলাম পপিদি!" আমার মুখ দিয়ে এবার আপনা আপনি উত্তর বেরিয়ে এলো।

"ভগবান তোমার মংগল করুন। কখনও তেমন বিপদে পড়লে তোমার পপিদির খবর কোরো।" এই বলে মিসেস পপি বিশোয়াস থ্যাকারে ম্যানসনের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমার স্বল্পপরিসর এই কর্মজীবনে মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় পেয়ে-পেয়ে ইতিমধ্যেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অস্বস্তিকর এই জীবন থেকে সরে গিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারলেই যেন ভাল হতো। কিন্তু অশান্তি ও অস্বস্তি থেকে মুক্তি—সেও তো আমার মতো অভাজনদের জীবনে এক ধরনের বিলাসিতা। যা অপ্রিয়, যা অপছন্দ তার থেকে দূরে সরে থাকবার সৌভাগ্য তো ঈশ্বর আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট রাখেন নি। জেঠমালানিদের কার্যাবলী আমাকে সত্যিই ক্লান্ত করে তুলেছে। কিন্তু পরাজিত হয়ে পিছিয়ে পড়তেও রাজী নই আমি। মিস্টার জেঠমালানি, আপনি যতই ধনবান হন, আইনপাড়ার ধুরন্ধর বিশেষজ্ঞরা যতই আপনার পিছনে থাকুন, চৌত্রিশ নম্বর ঘরের চাবি অত সহজে আমি হাতছাড়া করছি না। আমার কপালের মধ্যে একটা গোঁয়ার ভোমরা ঘুমিয়ে আছে, সে একবার জেগে উঠলে বড়ই মুশকিল—আপনার ফাঁদে ধরা পড়বার কোনো ইচ্ছাই এই মুহূর্তে আমার নেই।

জেঠমালানি এর পরে দাবার কী নতুন চাল দেবেন দিন, কিন্তু এই মুহূর্তে থ্যাকারে ম্যানসনের বিদেশী পরিবেশে আমি বড়ই ক্লান্ত বোধ করছি। সামান্য কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় আমি যেন আবার মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে বসেছি। মানুষকে আমি ভালবাসতে চাই, তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে চাই—কিন্তু কোথায় তেমন বিশ্বাসের মানুষ? সেই ভোরবেলায় থ্যাকারে ম্যানসনে প্রথম পদার্পণের পর থেকে এতোদিনে একে একে যাঁদের সংগে দেখা হলো তাঁদের অনেকেই আমাকে বিষণ্ণ করে তুলেছেন। বেপরোয়া এবং সৃষ্টিছাড়া এই জীবনযাত্রার সংগে আমার পরিচয় না হলেই যেন ভাল হতো। এই মুহূর্তে আমি হাওড়া শহরে আমার ছোটবেলার কথা ভাবছি।

হাওড়ার সেই সরু-সরু গলিতে অনেক প্রশস্তহৃদয় মানুষের বসবাস ছিল। কোঁড়ারবাগান এবং কাসুন্দের জরাজীর্ণ বাড়িগুলোতে এখানকার

চেয়ে অনেক বেশী আলো ছিল। বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছোট্ট বাড়িটায় হেডমাস্টার মশায় সুধাংশুবাবুর কাছ থেকে আমরা বিরাট বিশ্বের অনেক বিস্ময়কর খবরাখবর পেতাম। কোনো এক মহাত্মার বাণী উদ্ধৃত করে মাস্টারমশায় বলতেন, সতত পরিবর্তনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের চেষ্টার নামই জীবন। খুরুট রোডের ছোট্ট ইস্কুল ঘরের বেঞ্চিতে বসে সেদিন এর অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয়নি ; কিন্তু আজ এই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব থ্যাকারে ম্যানসনের অপরিচিত পরিবেশে হেডমাস্টারমশায়ের কথাগুলো আবার কানের কাছে কোনো অদৃশ্য টেপ রেকর্ড থেকে বেজে উঠে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—প্রতিকূল পরিবেশে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের চেষ্টার নামই জীবন।

চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথাগুলো ভাববার চেষ্টা করছিলাম। নতুন এই পরিবেশে এই ক'দিনে আত্মবিকাশ তো দূরের কথা, আত্মপ্রকাশের কোনো চেষ্টাও করা হয়নি। আত্মরক্ষার আয়োজনেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে।

শক্তিমান শত্রুর সঙ্গে লড়ায়ের প্রথম অধ্যায়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি। সুতরাং আজ আর কোনো অপ্রিয় ঘটনা-স্মৃতিকে প্রাধান্য না দিয়ে সমস্ত দিন কুঁড়েমি করবো এমন একটা পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। আজ যতক্ষণ ইচ্ছে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবো, মাঝে মাঝে চা খাবো এবং স্বপাকে মধ্যাহ্ন ভোজের হাঙ্গামায় যাবো না।

সহদেব এ-ব্যাপারে সর্বদাই আমার সহায় আছে। সে বলেছে, "যখনই আপনার দরকার হবে খবর দেবেন। আপনার রান্নার কাজ আধঘণ্টায় চুকিয়ে দেবো।" সহদেবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এ-বাড়ির কর্মসূত্রে নয়—সেই শাজাহান হোটেলের আমল থেকে তাকে চিনি। সুতরাং তার বন্ধুত্বের সুযোগ আমি অবশ্যই নিতে পারি। কিন্তু আজ আমি সহদেবকেও বিব্রত করবো না। কাউকে দিয়ে ম্যাড্রাসি দোকান থেকে কিছু খাবার আনিয়ে দুপুরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবো।

সহদেবকে কিন্তু এ-কথা বলা চলবে না। আমি মাদ্রাজী হোটেলে টিফিন কেরিয়ার পাঠাচ্ছি শুনলে সে অবশ্যই আপত্তি করবে। সহদেবের ধারণা, মাদ্রাজীরা রান্নাবান্নার কিছুই জানে না—ওইসব খেয়ে শরীর রক্ষা করা কোনো রকমেই সম্ভব নয়। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতায় এদেশের অন্য কোনো খাবারের দোকান ম্যাড্রাস কাফের কাছে আসতে পারে না।

সহদেব একবার খোঁজ করতে এসেছিল। আমার কথাবার্তায় সে ধরে নিয়েছে আজ দুপুরে কোথাও মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ রয়েছে। সে খুশী হয়ে বললো, "তা একটু ঘুরে আসুন। এখানে কাজে লাগা পর্যন্ত আপনি তো কোথাও বেরোন না, দিনরাত্ত এই বাড়ির মধ্যেই বন্দী হয়ে রয়েছেন।"

কাল্পনিক লাঞ্চ তো দূরের কথা, বিনামূল্যে প্রভাতী বিশ্রামটুকুও আমার বেশীক্ষণ সহ্য হলো না।

শ্রীমান মদনা কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মদনা একটু হাঁফাচ্ছে। একটা সেলাম কোনোরকমে ঠুকে দিয়ে মদনা বললো, "আপনি আজ আপিসে বসেন নি স্যর? আমরা ওখানেই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

আপিসঘরটা আমার কাজের সুবিধার জন্যে আছে। ওখানে আমাকে যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন হাজিরা দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মদনাকে একথা শুনিয়ে দিয়েও তেমন কোনো ফল হলো না। মদনা বললো, "আপনার আপিসে তিন-তিনটে বেড়াল ছাড়া আর কিছুই নেই। শেষে ওই চায়ের দোকানের ছোঁড়াটাকে পাকড়াও করলাম। ও বললো, সায়েব চা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন।"

"কী আস্পর্ধা দেখুন, স্যার। আপনি বাড়িতে রয়েছেন, অথচ বলে দিলো কিনা আপনি নেই", মদনা যে চাওয়ালার ওপর বিরক্ত হয়েছে তা ওর কণ্ঠস্বর থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

মদনাকে শান্ত করে বললাম, "চা-ওয়ালার দোষ নেই। ওর দোকান থেকে চা খেয়েই আমি দু'নম্বর গেট দিয়ে সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসেছি এক নম্বর গেট দিয়ে।"

মদনা বললো, "এদিকে আপনাকে ভীষণভাবে খোঁজা হচ্ছে। আমার ওপর হুকুম, মদনা, এনি অ্যামাউন্ট, ম্যানেজারবাবুকে যেখান থেকে পারো খুঁজে নিয়ো এসো।"

"কে আমাকে এতো ব্যস্ত হয়ে খুঁজছেন?" একটু বিরক্ত হয়েই মদনাকে প্রশ্ন করলাম।

কিন্তু তার উত্তরে মদনা যে নামটি উচ্চারণ করলো তাতে আমি একেবারে চুপসে গেলাম।

মদনা গম্ভীরভাবে বললো, "কুইন ভিক্টোরিয়া।"

নামটি শুনে সামলে ওঠবার আগেই মদনা আরও জানালো, "কুইন ভিক্টোরিয়া লেংচে লেংচে আমার আপিস ঘরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

এই ভোরবেলায় কুইন ভিক্টোরিয়া! জেঠমালানি-যুদ্ধে জয়ী আমার দুঃসাহসী হৃদয়েও এবার বেশ ভয়ের সঞ্চার হলো!

মদনা এদিকে তড়বড় করছে। সে বললো, "যাই স্যার, ছুটে গিয়ে খবরটা দিয়ে দুটো টাকা আদায় করে নিই কুইন ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে। অন্য কারুর কাছ থেকে খবর পেয়ে গেলে বুড়ী কিছুতেই আমাকে টাকা দেবে না। অথচ আমার খুব পয়সার দরকার।"

"আঃ মদনা', অধৈর্য মদনাকে একটু বকুনি লাগালাম।

মদনা তখন নিজের ভাবেই বিভোর। "মাকালীর দিব্যি বলছি, হাজতে দু'দিন থেকে সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে স্যার।"

মদনাকে কয়েকদিন দেখিনি বটে। কিন্তু সে যে ওইসময়ে হাজতবাস করে এলো তা জানা ছিল না।

আমি মদনাকে কী নির্দেশ দেবো ভাবছি। ইতিমধ্যে মদনা আমার নীরবতার অন্য অর্থ করে নিলো। সে ভাবলো, আমি বিশ্বাস করছি না যে তার টাকা রোজগারের এতো জরুরী প্রয়োজন রয়েছে।

মদনা বললো, "বিশ্বাস করুন স্যার, হাজতে থাকলে জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যায়—বড় বড় হোটেলে থাকা ওর থেকে সস্তা। এককাপ চায়ের জন্যে দেড়টাকা দিতে হয়েছে আমাকে।"

মদনার কথায় আমার হাসি এসে গেলো। বড় বড় হোটেলের সঙ্গে হাজতের তুলনা আমার জীবনে এই প্রথম শুনলাম।

মদনা বললো, "এবার তাহলে চলি, স্যার।"

আমি বাধ্য হয়ে বললাম, "যাও। কিন্তু মেমসাহেবকে বলবে, আমি এখনও বিশ্রাম করছি।"

সত্যি বলতে কি এই মুহূর্তে কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করবার সামান্যতম আগ্রহও নেই আমার। কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করা মানে এখনই হাজার রকম হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়া।

মিসেস কুসুম সামতানির সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সব সময় মাথায় সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি। স্কার্ফ খোলা অবস্থায় কেউ তাঁকে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। কেউ বলে, রাণী মাইজী, তাই সব সময় এরকম মুকুট পরে থাকেন। কেউ বলে মিসেস সামতানীর মাথাজুড়ে মস্ত টাক, তাই এই বস্ত্রাবরণ ছাড়া তাঁর কোনো উপায় নেই।

তেলকালিবাবু, কলকালিবাবু, এ-বাড়ির প্রত্যেক সুইপার, এমনকি রামসিংহাসন চৌরাশিয়া পর্যন্ত সামতানিকে ভয় পান। তাঁর কাজকর্মে একটু এদিক-ওদিক হলে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনে সামতানি দম্পতি কতদিন আছেন কেউ জানে না। তেলকালিবাবু একবার বলেছিলেন, "আমার তো এক এক সময় মনে হয়, বাড়ি তৈরি হবার আগে থেকেই এই মেমসাহেব এখানে আছে।"

তাঁর চালচলন ও মেজাজের জন্যে মেমসাহেব কবে যে এই কুইন ভিক্টোরিয়া উপাধি লাভ করেছেন তাও ঠিক কারও জানা নেই।

তেলকালিবাবু নমস্কার করে বলেছিলেন, "ঠিক নামই রাখা হয়েছে। স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়াই আমাদের এই ম্যানসনে বসবাস করছেন। ওঁর পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। এখানে এতো ভাড়াটে আছে, কিন্তু আর কেউ আমাকে আর কলকালিকে এতো জ্বালায় না।"

আমার সঙ্গে মিসেস সামতানির প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে। আমার অফিসে এসে বললেন, "ইয়ংম্যান, তোমাকে অনেক কঠোর হতে হবে। তোমার লোকজন ভীষণ ফাঁকিবাজ—তাদের দিয়ে তোমাকে কাজ করিয়ে নিতে হবে। চারদিকে এতো ময়লা কেন? ওয়ার্লডের কোথাও এর থেকে ডার্টি বাড়ি আছে?" কুইন ভিক্টোরিয়া এরপর বললেন, "আমার ঘরের অবস্থাও তোমাকে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে।"

ওঁর ফ্ল্যাটে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি। কিন্তু তেলকালিবাবু বলেছিলেন, "যাবেন না, মশাই। যতদিন পারবেন ততদিন দেরি করবেন। গেলেই বকবক করে আপনার মাথার চুল পাকিয়ে দেবে। ওঁর ধারণা পৃথিবীর সমস্ত লোক ষড়যন্ত্র করে থ্যাকারে ম্যানসনের কমন প্যাসেজ, সিঁড়ি, বারান্দা, ছাদ ময়লা করছে।"

মিসেস কুসুম সামতানি আমাকে যথাসময়ে আবার পাকড়াও করেছিলেন এবং থ্যাকারে ম্যানসন পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে লম্বা লেকচার দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে সেই বক্তৃতা মিস্টার সামতানিও নীরবে হজম করেছিলেন। তেলকালিবাবু পরে আমাকে বলেছিলেন, "আপনি তো একবার বক্তৃতা শুনেই হাঁপিয়ে উঠছেন ; আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে প্রতি ঘণ্টায় একখানা বক্তৃতা শুনতে হয় কুইন ভিক্টোরিয়ার স্বামীকে। কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই, স্যর। ফ্ল্যাটখানা বউয়ের নামে—বিবাগী হয়ে পালিয়ে

যাওয়া ছাড়া ভদ্রলোকের আর কোনও পথ নেই।"

ফ্ল্যাটখানা কুইন ভিক্টোরিয়ার নামে কেন তা আমি জানতাম না। তেলকালিবাবু বলেছিলেন, "দুজনে খিটিমিটি লেগেই আছে, কিন্তু কর্তা বেচারা অসহায়। এতো সস্তায় এমন সুন্দর ফ্ল্যাট কলকাতা শহরের কোথায় পাবে? তাই মুখ বুজে গিন্নির অত্যাচার হজম করতে হয়।"

আমি ভেবেছিলাম, মিস্টার সামতানি ইচ্ছে করেই ফ্ল্যাটখানা গৃহিণীর নামে ভাড়া নিয়েছিলেন। গৃহিণীদের নামে বিষয়-সম্পত্তি করার একটা রেওয়াজ এদেশে দীর্ঘদিন চালু আছে।

তেলকালিবাবু ঠোঁট উল্টে বলেছিলেন, "আপনি কিছুই বোঝেন নি, শংকরবাবু। বিয়ে তো ওঁরা বেশিদিন করেন নি। এই তো আমার চোখের সামনেই ওঁদের বিয়ে হয়েছে। বেশি বয়সের কনে, মাথায় একটু টাক পর্যন্ত ছিল, কিন্তু ভিক্টোরিয়ার স্বামী জোগাড়ের কোনো অসুবিধে হলো না।"

ব্যাপারটা একটু হেঁয়ালি ভরা মনে হচ্ছিল। তেলকালিবাবু ব্যাখ্যা করেছিলেন, "মাথায় যতই টাক পড়ুক 'এয়ারেস'দের কখনও স্বামী জোগাড়ের অসুবিধা হয় না।"

এয়ারেস মানে তো যে মহিলা প্রচুর পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। তাহলে কুসুম সামতানি নিশ্চয় খুব ধনী ঘরের সন্তান। "ওঁর বাবা-মা বুঝি মেয়ের জন্যে অনেক টাকা-বাড়ি রেখে গিয়েছেন?" তেলকালিবাবুর কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম।

একগাল হেসে তেলকালিবাবু ব্যাখ্যা করেছিলেন, "আপনি স্যার এখনও এই সামতানিদের কিছুই বুঝতে পারেন নি। ওদের ব্যাপার-স্যাপারের নাগাল পাওয়া অত সহজও নয়, স্যার। বিষয়সম্পত্তি টাকা, বাড়ি, হীরে-জহরত কিছুই রেখে যান নি কুসুম সামতানির বাবা। কিন্তু এই বাড়িতে পরপর তিনখানা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন জলের দামে সেই আদিকালে। আইনকানুন তখন অনেক সহজ সরল ছিল, ঘরভাড়া দেবার দলিল তৈরি করবার জন্যে কেউ ব্যারিস্টারদের কাছে ছুটতো না। কিন্তু সাহেবপাড়ায় তিনখানা ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়াস্বত্ব, সোজা জিনিস নয়। অমন ভাড়াটিয়ার মেয়ে কুইন ভিক্টোরিয়া হবে না তো কী হবে?"

এর পরের অংকটা তেলকালিবাবু আমাকে সযত্নে বুঝিয়েছিলেন। "কলকাতা শহরে এরকম টেনান্সিরাইট থাকলে আপনাকে আর করে খেতে হবে না, স্যার। সত্তর টাকা হিসেবে আলো-জল-বাড়ি সমেত মিসেস সামতানি ভাড়া দেন মাসে দুশ দশ টাকা। আর এই তিনখানা ফ্ল্যাটে নিজের পছন্দ মতো ভাড়াটিয়া বসিয়ে ভদ্রমহিলা কত টাকা আদায় করেন জানেন?" ফিস ফিস করে তেলকালিবাবু আমার কানে এবার যে টাকার পরমাণ বর্ণনা করলেন তাতে সত্যিই অবাক হবার কথা।

"তাহলে বুঝতেই পারছেন, মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়ে প্রতিমাসে কত টাকা কুইন ভিক্টোরিয়ার ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকছে। বেঁচে থাক এই প্যাকারে ম্যানসন, খেটে খাবার কোনো দরকার নেই।"

ভাড়াটিয়ার ভাড়াটিয়া—আইনপাড়ায় এই জটিল জিনিসটাকে সাবলেটিং বলে। সাবলেটিং আজকাল আর সহজ নয়।

কিন্তু তেলকালিবাবু বললেন, "ওসব আজকালকার আইনকানুনের কথা ভুলে যান! এসব ব্যবস্থা সেই আদ্যিকাল থেকে মিসেস সামতানি চালিয়ে

আসছেন। আপনি কিছুই করতে পারবেন না।"

আমি সমস্ত শুনে বলেছিলাম, "ভাগ্যবতী মহিলা।"

তেলকালিবাবু বলেছিলেন, "ভাগ্যবতী বলে ভাগ্যবতী! কোষ্ঠিটা আমার একবার দেখার লোভ হয়। নিজের বাপের ভাড়া করা ফ্ল্যাটগুলো তো পেলোই ; তার ওপর আবার মাসীর ঘরখানাও কপালে জুটলো। গুষ্টি-সুদ্ধ এরা যখন এই থ্যাকারে ম্যানসনের খোপে খোপে বাসা বেঁধেছিল তখন সবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছে। কলকাতার লোক তখন জাপানী বোমার ভয়ে কাছা খুলে মফঃস্বলে পালাচ্ছে। বাড়ির দাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে। ভাড়াটে পাওয়া তখন ভাগ্যের ব্যাপার—অনেক গেরস্তপাড়ায় বাড়িভাড়া অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। সেই সময় কুসুম সামতানির মাসীও তিনসুকিয়া না কোথা থেকে কলকাতায় এসে এই থ্যাকারে ম্যানসনে ছোট্ট একখানা ফ্ল্যাট অকুপাই করেছিলেন।"

আমি একমনে তেলকালিবাবুর কথা শুনে যাচ্ছি। তেলকালিবাবু দুঃখ করলেন, "আমাদের মা-মাসীদের তখন যদি একটু দূরদৃষ্টি থাকতো। কপাল ঠুকে এইসব সায়েবপাড়ায় এক-আধখানা ফ্ল্যাট যদি নিজের নামে লিখিয়ে রাখতেন, তাহলে আমাকেও এই তেলিয়ে-তেলিয়ে অন্নসংস্থান করতে হতো না, আমি নিজেই কিং ভিক্টোরিয়া হয়ে রাজার স্টাইলে ঘুরে বেড়াতাম এবং আপনাদের জ্বালাতন করতাম চারদিকে এতো ময়লা কেন, সিঁড়িতে দিনে তিনবার করে ঝাঁট পড়ে না কেন, কমন প্যাসেজের মেঝে কেন রেগুলার মোছা হয় না?"

তেলকালিবাবুর শেষ মন্তব্যটি আমার এখনও ভালভাবে মনে আছে। "এ এক আজব জায়গা স্যর। এখানে বাড়ির মধ্যে বাড়ি, ঘরের মধ্যে ঘর, আবার বাড়িওয়ালীর মধ্যে বাড়িওয়ালী! আমিই শুধু স্যর কলের মধ্যে কল বসাতে পারলাম না ; সারাজীবন তেল দিয়ে-দিয়েই চালাতে হবে আমাকে।"

বেচারা তেলকালিবাবুর কথা শুনে আমার একটু মায়া হয়েছিল। তেল-কালিবাবু বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বলেছিলেন, "আপনি শুধু শুধু আমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? আপনি কী আর করবেন? তবে হঠাৎ যদি ওপর থেকে আমার ডাক আসে তাহলে শেষ সময়ে মুখে জল না দিয়ে একটু তেল ঢেলে দেবেন।"

আমি ভাবছিলাম তেলকালিবাবু রসিকতা করছেন। কিন্তু তিনি নিজেই বললেন, "রসিকতা নয় স্যর। আপনি কলকালিকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, ওকেও বলে রেখেছি। কফিনে পোরবার আগে মুখে আমার একটু তেল ঢেলে দিস, যাতে কবরে শুয়ে শুয়েও তেলের গন্ধটা পাই।"

এরপরেই কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে তেলকালিবাবু বিদায় নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "একবার ঘুরে আসি। যা মেয়েমানুষ, এখনই হয়তো নিজেই হাজির হবে!"

কুইন ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে আমি এখনও সম্পূর্ণ খোঁজখবর করতে পারিনি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমি যে খুব শ্রদ্ধাশীল নই তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে আমি মোটেই উৎসুক নই।

কিন্তু মদনাকে বিদায় করেও আমার কোনো লাভ হলো না। শ্রীমান সহদেব

হঠাৎ ঝড়ের বেগে আমার ঘরে ঢুকে পড়লো। সহদেব জিজ্ঞেস করলো, "সামন্তানি মেমসায়েবের সঙ্গে আপনার এখনও দেখা হয়নি স্যর?"

"না, দেখা হয় নি," আমি একটু বিরক্তভাবেই উত্তর দিলাম।

সহদেব বললো, "উনি আপনাকে খুব খুঁজছেন স্যর।"

"কী এমন রাজকার্য, যে এখনই দেখা করতে হবে?" আমি বিরক্তি চাপবার কোনো চেষ্টাই করলাম না।

কিন্তু সহদেব এবার বিস্ফোরণ ঘটালো। বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে সহদেব। আমার দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে বললো, "ডেডবডি, স্যর!" এর পর সহদেবের গলা দিয়ে একটা ঘড়-ঘড় আওয়াজ হলো।

ডেড বডি! সহদেবের মুখে কথাটা শুনেই বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো আমি তিড়িং করে করে উঠে বসলাম।

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ট্রাংক থেকে পাওয়া এক বছরের পুরনো মৃতদেহের কথা আমি এখনও ভুলি নি। বেওয়ারিশ সেই নারীদেহ নিয়ে যে-বিপদে পড়তে হয়েছিল তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

ডেড বডি কোথায় পাওয়া গেলো? এ ব্যাপারের সঙ্গে কুইন ভিক্টোরিয়ার বা কী সম্পর্ক? তিনি কেনই বা আমাকে খুঁজতে আরম্ভ করেছেন?

এবার আমি সহদেবের ওপর অন্যায়ভাবে রেগে উঠলাম। বকুনি লাগিয়ে বললাম, "অঃ, সহদেব, তোমার কি নিজের কোনো কাজকর্ম নেই? কোথায় কে মরলো-বাঁচলো তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?"

সহদেব বলতে গেলো, "মরে গেছে, হুজুর।" কিন্তু আমার বিরক্ত মূর্তি দেখে আর কথা না বাড়িয়ে সে এবার নিঃশব্দে সরে পড়লো।

সহদেব বিদায় হওয়া মাত্রই আমি ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। খিল লাগিয়ে আমি স্বস্তি বোধ করছি। যেন এইভাবে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আমি মৃতদেহর হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকতে পারবো।

মনের সঙ্গে এক শব্দহীন তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি ততক্ষণে। থ্যাকারে ম্যানসনে সমস্ত মৃত্যুর দায়দায়িত্ব নিশ্চয় এই বাড়ির সামান্য ম্যানেজারের নয়, মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলোঃ 'সেটা নির্ভর করবে মৃত্যুর প্রকৃতির ওপর।'

দ্রুত প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বললাম, 'স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক—মৃত্যু যে দু রকমের সে সম্বন্ধে আমি অবশ্যই অবহিত। কিন্তু যে কোনো প্রকারের মৃত্যুর সঙ্গেই আমার জড়িয়ে পড়বার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'

মন যেন সন্তুষ্ট হতে পারছে না আমার উত্তরে। আমি এবার তাকে বোঝালাম, "এই ম্যানসন বাড়ির ঘরে ঘরে কত কী কাণ্ড আমার অলক্ষ্যে ঘটে চলেছে। জন্ম অথবা মৃত্যু 'সৃষ্টিকারী' সেই সব ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো রকম সংশ্রব নেই। সুতরাং অজানা ঘটনাবলীর সঙ্গে আমি শুধু-শুধু কেন জড়িয়ে পড়বো? এইসব ছোট ছোট কুটুরির কোনো মৃত্যু কেন

আমার সুখশয়নে বিঘ্ন ঘটাবে?"

'ধীরে, বৎস, ধীরে। তোমার সওয়ালের একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।' মন এবার একটি কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো। 'তোমার কথাশুনে মনে হচ্ছে, প্রতি মাসে ভাড়া আদায় করা, এবং ভাড়াটেদের জল-কল-আলো ঠিক আছে কিনা এবং ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে কিনা সেটা দেখাই ম্যানেজারের একমাত্র কর্তব্য। তা হলে, সেবার কালোট্রাঙ্ক থেকে চুনের মধ্যে চুবনো সুন্দরীর দেহ আবিষ্কারের পর তোমার অমন বিপর্যয় হলো কেন?'

'সেখানে যে ভাড়াটে নিখোঁজ!' মনের সঙ্গে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছি সদর্পে। 'দখলের ব্যাপার ছিল সেই ঘটনায়। ওই ফ্ল্যাট যে আমরা নিজের দখলে নিয়েছি তখন।'

'তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী?'

মনকে নিজের দলে টানবার জন্যে বললাম, "ব্যাপারটা সহজ। যেসব ফ্ল্যাটে ভাড়াটে রয়েছেন, সেখানে খুন জখম যাই হোক তার মধ্যে আমার নাক গলাবার কোনো প্রয়োজন নেই। আইনের বিচক্ষণ অভিভাবকরা অকুস্থলে আমার উপস্থিতি অবশ্যই প্রত্যাশা করবেন না। কিন্তু যেসব ঘর আমাদের দখলে সেখানে কোনো কিছু ঘটলে তার প্রাথমিক দায়িত্ব এই বেচারা ম্যানেজারকে অবশ্যই পালন করতে হবে!'

নিজের মনের কাছে লম্বা লেকচার দিয়েও শান্তি পাওয়া গেলো না। হঠাৎ একটা খটকা লেগে গেলো। সহদেব এই মাত্র যে ডেড বডির কথা বলে গেলো, সে কার ডেড বডি?

কুইন ভিক্টোরিয়ার নাম যখন উঠেছে এবং তিনি নিজেই যখন আমাকে ধরবার জন্যে আপিস ঘরের সামনে বসে আছেন, তখন এই ডেড বডির সঙ্গে তাঁর অবশ্যই কোনো সম্পর্ক আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ডেড বডি কোথায় পাওয়া গিয়েছে? যদি কুইন ভিক্টোরিয়ার ভাড়া-দেওয়া কোনো ফ্ল্যাটে ব্যাপারটা ঘটে থাকে তা হলে তিনি হয়তো নিজের কাজের সুবিধের জন্যে আমাকে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি অত সহজে এই ফাঁদে পা দিতে রাজী নই। বিনা প্রয়োজনে সাতসকালে আমি থানা-পুলিস করতে চাই না। বিশেষ করে জাঁহাবাজ ওই কুসুম সামতানির জন্যে।

তা ছাড়া, ওঁর সাবলেট-করা ঘরগুলো সম্বন্ধে আমার মনে কিছু কিছু সন্দেহ আছে। ডেড বডি যদি ওই রকম কোনো ঘর থেকে পাওয়া গিয়ে থাকে, তা হলে স্বামীর সাহায্যে উনি নিজেই ওই হাঙ্গামা সামলান। এতো দিন তো এই সব ফ্ল্যাট থেকে ভাড়া আদায় ছাড়া আর কিছুই তিনি করেন নি, এবার না হয় একটু ছোটাছুটি করলেন!

কাল্পনিক সব দায়-দায়িত্ব কুইন ভিক্টোরিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিছানায় পাশ ফিরতে গেলাম। সেই সময় নতুন চিন্তা বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেলো। সত্যিই যদি ডেড বডির হাঙ্গামা থেকে এই সকালে মুক্ত থাকতে চাই তা হলে আমার এই বিছানা কোনোক্রমেই নিরাপদ স্থান নয়।

আমি যে নিজের ঘরেই বিশ্রাম করছি এ খবর মদনা অথবা সহদেব বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারবে না। কুসুম সামতানির জেরার চাপে কেউ এক সময় স্বীকার করে বসবেই যে আমি নিজের ঘরেই শুয়ে আছি। এর পর হাতের লাঠি ভর করে কুসুম সামতানি ঠিক এখানে হাজির হবেন এবং

কোনো মহিলার মুখের উপর বিপদের সময় না বলার স্পর্ধা আমার হবে না।

এমতাবস্থায় গৃহত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। দ্রুত বিছানা ত্যাগ করে, গায়ে একটি জামা চড়িয়ে এবং দরজায় সরকারী তালা ঝুলিয়ে আমি ওপরের তলায় উঠে এলাম। আমার লক্ষ্যস্থল তেলকালিবাবুর ঘর।

তেলকালিবাবুর ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু অ্যাসবেস্টসের চালের ফুটো দিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্যামা সংগীতের সুর ভেসে আসছে। তেলকালি যে খ্রীষ্টান তা আমার অজানা নয়। এই সকালবেলায় তাঁর ঘরে রামপ্রসাদী সুরে কালীনাম জপ চলেছে!

টোকা পড়তেই হাফ-প্যাণ্টপরা অবস্থায় তেলকালিবাবু দরজা খুললেন এবং আমাকে দেখে বেশ অবাক হলেন। "আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য। আসেন না কেন? মাঝে মাঝে ভাবি একা-একা আপনি নিশ্চয় কষ্ট পান, নিয়ে আসবো আপনাকে আমার এই ঘরে। কিন্তু তারপর সহদেবের মুখে শুনলাম, আপনি বাঁধানো খাতায় কী সব লেখাপড়া করেন।"

আমি শুধু হাসলাম।

তেলকালিবাবু এবার নিজের কাজের কথায় চলে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ঘরের পাখাটা ট্রাবল দিচ্ছে বুঝি? বন্ধ হয়ে গেলো নাকি? বন্ধ হবার তো কথা নয়, ওসব বিলিতি ফ্যান, ওরা দিশী ফ্যানের মতো কথায় কথায় ট্রাইক করে বসে না। বড় জোর একটু গ্যাজর-গ্যাজর করবে। আমি খুবই লজ্জিত, শংকরবাবু। আজকেই বুড়িকে আমি তেল মাখিয়ে আসছি—আর কোনো গোলমাল করবে না।"

তেলকালিবাবু বিশ্বাসই করেন না যে, ওই সব কাজের জন্যে আমি এখানে আসি নি। অবশেষে খুশী হয়ে ঘরের একমাত্র চেয়ারটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তেলকালিবাবু নিজের বিছানায় আশ্রয় নিলেন।

রেকর্ডের শ্যামাসংগীত তখনও বেজে চলেছে। তেলকালিবাবু নিজেই বললেন, "এই কালীর গানগুলো আমার খুব ভাল লাগে। খুব সোজা সোজা কথা, আর একেবারে প্রাণ থেকে গায়।"

তেলকালিবাবুর যে কলের গান আছে তা জানতাম না। তেলকালিবাবু বললেন, "একেবারে ভাঙা অবস্থায় কালোয়ারের দোকান থেকে ওজনদরে কিনে এনেছিলাম। তারপর অনেকদিন ধরে তেল খাইয়ে খাইয়ে মানভঞ্জন করেছি।" উনি আবার কথা বললেন, "কালী-কেত্তনের রেকর্ডখানা একজনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম। কিন্তু শুনে এতো ভাল লাগলো যে সেবার কিছু বাড়তি পয়সা পেয়েই দুখানা রেকর্ড কিনে ফেলেছি।"

"কালী কীর্তন?" আমি একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম বোধ হয়। চায়ের ব্যবস্থা করতে করতে একগাল হেসে তেলকালিবাবু বললেন, "খ্রীষ্টান বলে কি মা-কালীর গান শুনবো না? কেন? আপনারা কী চার্চের গান, প্রভু যীশুর ভজন শোনেন না?"

তেলকালিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চায়ের সংগে আর একখানা কালী-কেত্তন শুনবেন নাকি, স্যর? রেকর্ডখানা আমি তেইশ নম্বর ঘরের দিদি-মণির কাছ থেকে ধারে নিয়ে এসেছি। আজই ফেরত দিতে হবে।"

তেইশ নম্বর ঘর শুনেই মিসেস কুসুম সামতানির কথা আবার মনে পড়ে গেলো। আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী এই ঘরের ভাড়াটিয়া মিসেস কুসুম সামতানি।

মিসেস সামতানিকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই যে আমি সাময়িকভাবে গৃহ-ত্যাগী হয়েছি এ কথা তেলকালিবাবুকে জানিয়ে দিলাম। যদিও ওই ডেড বডির কথাটা মুখে আনলাম না। উড়ো একটা কথা শুনেছি বলেই খবরটাকে সঙ্গে-সঙ্গে প্রচার করতে হবে তার কোনো মানে নেই।

তেলকালিবাবু মৃদু হেসে বললেন, "এড়িয়ে চলার মতনই একজন লেডি বটে! আমার স্যর, ছোটবেলা থেকেই সাহসী বলে খুব নামডাক ছিল। কিন্তু ওই কুইন ভিক্টোরিয়া আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন শুনলেই আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে যাই।"

মিসেস সামতানি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও মাঝপথে আমি আটকে গেলাম। কিন্তু তেলকালিবাবু ছাড়লেন না। চায়ের কাপ আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "থামলেন কেন? যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো নির্দ্বিধায় করুন।"

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে এবার জিজ্ঞেস করলাম, "ওই কুইন ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে আপনার যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাতে খুনটুন করাও ওঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়?"

চোখ দুটো বড় বড় করে তেলকালিবাবু বললেন, "এরকম প্রশ্ন আপনি কেন করছেন জানি না। তবে কুইন ভিক্টোরিয়ার যা মেজাজ তাতে উনি পারেন না, এমন কাজ নেই।"

কেন প্রশ্ন তুলেছি সে প্রসঙ্গ এখনকার মতো এড়িয়ে যেতে আমি খুবই ব্যগ্র। তেলকালিবাবু বললেন, "অত করিতকর্মা না হলে থ্যাকারে ম্যানসনের এই রাজত্ব মিসেস সামতানি চালাচ্ছেন কেমন করে?"

নিজের কাপে ছোট চুমুক দিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি, আপনার আমার বাপ-পিতেমহ কলকাতা শহরে ওরকম কয়েক-খানা ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া-স্বত্ব রেখে গেলেও এতো দিনে ওসব আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতো। বড় জোর দু-এক হাজার টাকা সেলামী আদায় করে বাড়িওয়ালাকে ফ্ল্যাট ফিরিয়ে দিয়ে এতো দিনে আমরা ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেজে বসে থাকতাম!"

কাপটা আবার হাতে তুলে নিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "কিন্তু কুইন ভিক্টোরিয়াকে দেখুন! কথায় বলে অবলা নারী! কিন্তু পরের ফ্ল্যাট নিজের নামে রেখে কেমন দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করছেন ভদ্রমহিলা। শুধু দখল রেখেছেন তা নয়, বছরের পর বছর রোজগার বাড়িয়ে চলেছেন। কলকাতার ক'টা বাড়িওয়ালা এই রেকর্ড দেখাতে পারবে বলুন? আমি বাজী রেখে বলতে পারি স্বয়ং অ্যাডভোকেট-জেনারেল বাড়িওয়ালা হলেও ভাড়াটের কাছে চুপসে যাবেন। আর আমাদের এই মেমসায়েব চুপসে যাওয়া তো দূরের কথা, নিজের গ্র্যাণ্ড-ভাড়াটেদের বুড়ো আঙুলের তলায় চেপে রেখেছেন—একটুও ট্যাঁ-ফুঁ করবার উপায় নেই।"

"গ্র্যাণ্ড-ভাড়াটে শব্দটা নতুন নতুন ঠেকছে যেন।"

তেলকালিবাবু বললেন, "ছেলের ছেলে যেমন গ্র্যাণ্ডসন—তেমনি ভাড়া-টস্য ভাড়াটে গ্র্যাণ্ড-ভাড়াটে ছাড়া আর কী হবে, মশাই? আমি আমি অতশত ইংরিজী বুঝি না। ইংলিশ কল আমি মেরামত করতে পারি, কিন্তু ইংরিজী ভাষাটা স্যর আমি কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারি না—বড্ড গোলমেলে কলকব্জা!"

তেলকালিবাবু ক্রমশই আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছেন। যেখানে প্রতি মাসের সামান্য ভাড়া আদায় করতে আমাদের কাল ঘাম ছুটে যাচ্ছে, সেখানে কোন্ রহস্যে কুইন ভিক্টোরিয়া বছরের পর বছর নিজের রোজগার বাড়িয়ে চলেছেন?

চোখ দুটো বড় বড় করে তেলকালিবাবু বললেন, "খুব সহজ উত্তরঃ মাথা খাটিয়ে এবং সেই সঙ্গে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করে!"

"কিছু বুঝলেন?" তেলকালিবাবু এবার প্রশ্ন করলেন।

ব্যাপারটা কি এতোই সহজ যে এক কথায় বুঝে যাবো?

তেলকালিবাবু এবার ব্যাখ্যা করলেন, "এই বাড়ি-ভাড়ার ব্যাপারে দেশের বেস্ট ব্রেনগুলো গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। ভাড়াটের স্বার্থ বাঁচাবার জন্যে যতই আইন পাশ হচ্ছে, আইনের বজ্রআঁটুনিকে ফস্কাগেরো করে দেবার জন্যে ততই নতুন বুদ্ধি বার হচ্ছে। কুইন ভিক্টোরিয়া তো আবার শাঁখের করাত। যেতে এবং আসতে দুটোতেই কাটছেন! ভাড়াটে হিসেবে যতটা সম্ভব আইনের সুবিধে নিচ্ছেন, আবার বাড়িওয়ালী হিসেবে আইনকে মনের সুখে কলা দেখাচ্ছেন!"

তেলকালিবাবুর ব্যাখ্যা এখনও আমার মাথায় তেমন ঢুকছে না। তেল-কালিবাবু বললেন, "বড়ই কঠিন সাবজেক্ট! অত সহজে মাথায় ঢোকবার জিনিস নয়। সবাই যদি ব্যাপারটা বুঝে নেবে তাহলে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব চলবে কী করে?"

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "ভাড়া ইচ্ছে করলেই বাড়ানো যায় না, সেই জন্যে রেণ্ট কনট্রোল আছে। কিন্তু কুসুম সমাতানি ওই ভাড়াটের হাঙ্গামাতেই যাননি! আইনকে এমন এক জুজুৎসু প্যাঁচ দিয়েছেন যে কারও সাধ্য নেই ওঁকে প্রতি বছর ইচ্ছে মতো ভাড়া বাড়াতে বাধা দেয়।"

জুজুৎসুর প্যাঁচটা জানবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে তেলকালিবাবুর দিকে তাকিয়ে আছি। তেলকালিবাবু ফিস-ফিস করে বললেন, "ব্যাপারটা আপনার কাছে ফাঁস করে দিচ্ছি, কিন্তু পাঁচকান করবেন না। কুসুম সামতানি কাউকে লিখিতভাবে ভাড়াটে হিসেবে স্বীকার করেন না! ওঁর ঘরে ঢুকতে হলে লিখতে হয় পেয়িং গেস্ট হিসেবে ঢুকছি—ছ'মাসের বেশী বসবাস করবো না। ছ'মাস পরে আবার লিখতে হয়, দয়া করে আরও পাঁচমাস পি-জি হিসেবে থাকতে দিন। এগারো মাসের শেষে ভাড়া বাড়ে—আপত্তি থাকলে নিজের পথ দেখো! বেশী টাকা দিতে রাজী হলেও এক সপ্তাহের জন্যে ঘর ছাড়তে হয়। তবে তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। পাশের ফ্ল্যাটে কুইন ভিক্টোরিয়া নিজেই থাকবার ব্যবস্থা করে দেন এবং সেই এক সপ্তাহ তিনি নিজের জানা-শোনা কোনো লোকের নাম রসিদ কাটেন, যাতে আইনের চোখে প্রমাণ থাকে যে অন্য কেউ ওই একই ঘরে কিছুদিনের জন্যে পেইং গেস্ট ছিলেন!"

কুসুম সামতানির বুদ্ধির নমুনা পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তেল-কালিবাবু বললেন, "এসব বুদ্ধি কলকাতায় তৈরি হয় না—মতলব এসেছে খোদ বম্বে থেকে। স্মাগলিং এবং লোকঠকানো বুদ্ধিতে আপনাদের কলকাতা এখনও বম্বের কাছে শিশু, বুঝলেন মশাই। সাধে কী আর জিন্না সায়েব বম্বেতে বসে ভারত ভাগের খোয়াব দেখেছিলেন!"

দু'জনের কথাবার্তা আরও চলতো। কিন্তু এমন সময় মদনা ছুটতে

ছুটতে তেলকালিবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই মদনা চীৎকার করে বললো, "তেলকালিবাবু, দয়া করে আপনি নিচে চলুন। সামতানি মেমসায়েব আপনাকে ভীষণভাবে খুঁজছেন।"

"ব্যাপার কী?" তেলকালিবাবু ঘরের মধ্যে থেকেই উঁচু গলায় প্রশ্ন করলেন।

মদনা উত্তেজনার সঙ্গে বললো, "একটা লোক মরে পড়ে আছে। মেমসায়েব আমাকে বললেন, যে-করে হোক তেলকালিবাবুকে ধরে নিয়ে এসো।"

"মড়া! ও মাই লর্ড! কলে তেল দেবার সঙ্গে ডেডবডির কী সম্পর্ক?" তেলকালিবাবু বেশ ঘাবড়েছেন মনে হলো।

"আপনাকে ছাড়া চলবে না, তেলকালিবাবু। ম্যানেজারবাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না", এই বলে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মিসেস সামতানির বিশেষ দূত আচমকা আমাকে সশরীরে আবিষ্কার করে থমকে দাঁড়ালো।

আমাকে যে শেষ পর্যন্ত তেলকালিবাবুর এই ঘরে খুঁজে পাওয়া যাবে তা মদনা কল্পনাও করেনি। লম্বা একটা সেলাম ঠুকে দিয়ে মদনা বললো, "বাঁচালেন, স্যর। আপনার জন্যে কুইন ভিক্টোরিয়া ছটফট করছেন। একবার দয়া করে আসুন, স্যর। আপনাকে না পেয়েই শেষ পর্যন্ত তেলকালিবাবুকে খুঁজতে এসেছিলাম।"

তেলকালিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের তলায় নিজের ঘরে যাবার পথেই কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাতের লাঠিটা নিয়ে একটু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কুসুম সামতানি ওপরে উঠছেন। আমাকে দেখে সামতানি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। হাঁফ ছেড়ে বললেন, "কোথায় ছিলে? আমরা তোমায় জন্যে হেভেন-অ্যান্ড-আর্থ তোলপাড় করছি।" মদনাকে দেখিয়ে সামতানি বললেন, "দিস্ ইয়ংম্যান দুনিয়ার সব জায়গায় তোমাকে খুঁজে এসেছে!"

"ডেড বডি!" কথাটা এবার করুণভাবে উচ্চারণ করলেন কুইন ভিক্টোরিয়া। "আমি শুনলাম, এ ব্যাপারে পুলিসে খবর দিতেই হবে। এবং পুলিসে খবর দেবার দায়িত্ব তোমার।"

'দায়িত্ব' কথাটা শুনেই আমার মেজাজ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। কোন্ ভাড়াটে কী করে বসবে, কোথায় কার ডেড বডি পাওয়া যাবে, তার সব দায়িত্ব অন্য কারুর নয়, এই হতভাগা ম্যানেজারের!

আমি বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলাম, "আপনার কোনো ফ্ল্যাটে যদি ডেডবডি পাওয়া গিয়ে থাকে তার জন্যে ম্যানেজার কেন পুলিসে খবর দিতে যাবে? ঘর যখন আপনার, মড়ার দায়দায়িত্বও তখন আপনার, মিসেস সামতানি!"

এই পর্যন্ত ভালই চলছিল। মনে তেমন কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। কিন্তু এবার কুইন ভিক্টোরিয়া একটি ছোটখাট বোমা নিক্ষেপ করলেন। আমাকে জানালেন, "ফর ইওর ইনফরমেশন, মিস্টার শংকর, বেডবডি আমার ঘরে

পাওয়া যায় নি। পাওয়া গিয়েছে বাড়ির কমন-প্যাসেজে—আমার ঘরের সামনে।"

কমন-প্যাসেজ শুনেই আমি সজাগ হয়ে উঠেছি। এ বাড়ির সমস্ত ঘর আমরা ভাড়া দিয়েছি—কিন্তু সিঁড়ি, সিঁড়ির তলা, বারান্দা ইত্যাদি কমন-প্যাসেজের দায়দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেননি। দীর্ঘ এই নো-ম্যানস ল্যান্ডের রক্ষণাবেক্ষণের অপ্রিয় এবং দুরূহ দায়িত্ব এ বাড়ির ম্যানেজারের স্কন্ধেই রয়েছে।

কমন-প্যাসেজে মৃতদেহের খবরটা যথাস্থানে নিবেদন করতে পেরে মিসেস কুসুম সামতানি যেন কেল্লা ফতে করেছেন। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন উনি এবার খুব হালকা বোধ করছেন। হালকা বোধ করারই কথা! কারণ এখন থেকে মৃতদেহের সব দায়দায়িত্ব আমার।

আমার মনে ইতিমধ্যে অন্য সন্দেহ জাগছে। অন্য ঘরেও কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। তার পর সুযোগ বুঝে সকলের অলক্ষ্যে মৃতদেহটি কমন-প্যাসেজে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারলেই হাঙ্গামা চুকলো।

কিন্তু অত সহজে আমি হাঙ্গামা চুকতে দিতে রাজী নই। রহস্যের গভীরে যদি আমাকে ঢুকতে হয় তা হলে এই অবস্থায় মিসেস সামতানির অন্তরঙ্গ হাওয়াটা কোনোক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়।

আমার আর এক প্রশ্নঃ এ বাড়িতে আরও অনেক ভাড়াটিয়া রয়েছেন, কিন্তু আমাকে ডেডবডির খবর দেবার জন্যে একমাত্র মিসেস সামতানির কেন এতো ব্যাকুলতা?

মিসেস সামতানিকে এবার আমি গম্ভীরভাবে বিদায় করলাম। বললাম, "আপনি তো আমাকে খবর দিয়েছেন; এবার আমার কাজ আমাকে করতে দিন।"

এখন থেকে বাড়তি এক মুশকিল হলো। খবর কানে আসবার পর কার সঙ্গে কী কথা হলো, কোথায় কী দেখলাম, তা বিস্তারিতভাবে মনে রাখতে হবে। পুলিসের ওই এক দোষ, অনুসন্ধানের সময় একই খবর তারা বারবার জানতে চায়। এবং প্রথম বর্ণনার সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ণনার সামান্য তফাত হলেই বিপদ বাড়লো। বহু মানুষই যে থিয়েটারের নায়কদের মতো সমস্ত সংলাপ মনে রাখতে পারে না, তা পুলিস বিশ্বাস করে না।

তেলকালিবাবুও ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। থানাপুলিস সম্বন্ধে তাঁর ভয় আমার থেকেও বেশী।

আমি এখনই অকুস্থলে মৃতদেহ দেখতে যাচ্ছি শুনে তিনি আমাকে আটকালেন। এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন, "আপনি তো মৃত্যু রহস্য সমাধান করবেন না? আপনি নিজে তো ডিটেকটিভ নন?"

"অবশ্যই নই। এটা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন কোথায়?"

"আছে, স্যর, আছে।" ফিসফিস করে তেলকালিবাবু আমাকে পরামর্শ দিলেন, "আপনি প্রথমেই হুড়মুড়-দুড়ুম করে ঘটনাস্থলে হাজির হবেন না। আগে আপনি টেলিফোনের কাছে চলুন।"

তেলকালিবাবু যা বলছেন তার মধ্যে বুদ্ধির ইঙ্গিত আছে। অভিজ্ঞ এই লোকের উপদেশ অমান্য করার কোনো মানে হয় না।

আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তেলকালিবাবু উপস্থিত লোকদের বললেন, "আপনারা যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে যান, ম্যানেজারবাবু একটু পরেই ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন।"

পরিস্থিতি কী হবে তা বুঝতে না-পেরে অনেকে বিনা বাক্যব্যয়ে আমার ঘরের সামনে থেকে সরে পড়লেন।

মিসেস সামতানিও আমাদের ওপর একটু সন্দিহান হয়ে উঠছেন। আমাদের ভাবগতিকে তিনি যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। তিনি আমাদের আস্থা অর্জনের জন্যে বলে উঠলেন, "তোমরা এখনই একবার বডিটা দেখে যাও! তারপর যা-হয় করবে।"

তেলকালিবাবু বললেন, "এই দু' মিনিটের মধ্যে ম্যানেজারবাবু যাচ্ছেন। আপনি এগোন।"

মিসেস সামতানি বিদায় হতে তেলকালিবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "অত সহজে চিঁড়ে ভিজতে দিচ্ছি না। আগে 'যা-হয়' করে, তারপর ডেড-বডির কাছে যেতে দিচ্ছি আপনাকে।"

এরপর আমরা দুজনে সোজা চলে এসেছি আপিস ঘরে। তেলকালিবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, "থানায় ডায়াল করুন। ওখানে, মশাই, ফোন করলেই ওরা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় নোট করে নেবে। আপনি বলুন, এই মাত্র মিসেস কুসুম সামতানির কাছে খবর পেলুম একটা ডেডবডি ওঁর ফ্ল্যাটের সামনে আমাদের কমন প্যাসেজে পড়ে রয়েছে। আপনারা আসুন, আমিও ওদিকে যাচ্ছি।"

বিভিন্ন কলকব্জায় তেল দিতে-দিতে তেলকালিবাবু যে আইনের ব্যাপারেও এমন অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন তা আমার জানা ছিল না। বিজয়গর্বে তেলকালিবাবু বললেন, "আমার কী! আমার কাজ কলে তেল দেওয়া, পুলিসকে অয়েলিং করা তো আমার ডিউটি নয়। নেহাত আপনার কথা ভেবে আমি একটু বাধ্য হচ্ছি।"

তেলকালিবাবু যে আমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন তা ওঁর কথা-বার্তা থেকেই বুঝতে পারছি। কৃতজ্ঞ আমি ওঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

তেলকালিবাবু বললেন, "ওই যে কুসুম সামতানির নামটা প্রথম সুযোগেই পুলিসের কাছে গেয়ে রাখতে বলছি, ওইটাই বুদ্ধির প্যাঁচ। আগে নিজের চোখে বডি দেখে এলে টেলিফোনে ওসব কথা পাড়ার সুযোগ পাবেন না। ওই সব সামতানি-ফামতানিকে মশাই আমার বিশ্বাস হয় না। কী মতলবে আপনাকে ডাকতে এসেছে তার কিছুই ঠিক নেই।"

টেলিফোনে থানাকে খবরটা সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে দেওয়া গেলো। ওঁরা ফোনেই এফ-আই-আর লিখে নিলেন। ওদিক থেকে এবার প্রশ্ন হলোঃ "ডেডবডির সেক্স?"

টেলিফোনের মুখটা চাপা দিয়ে আমি তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। বিরক্তভাবে তেলকালিবাবু মন্তব্য করলেন. "নিজে এসে দেখে যাও না বাবা! কলকাতাব সমস্ত বেওয়ারিশ মড়ার মালিক তো তোমরা।" একটু মাথা চুলকে তেলকালিবাবু পরামর্শ দিলেন, "বলুন, হয় মেল, না-হয় ফিমেল।"

ওদিকের ভদ্রলোক আমার সামান্য পরিচিত। আমার উত্তর শুনে বললেন,

"দুটোর মধ্যে অনেক তফাত, মশায়। হয় মেল, না-হয় ফিমেল বললে আমাদের চলে না।"

ভদ্রলোক এর পর বললেন, "ভবিষ্যতে যখন এরকম ডেডবডির রিপোর্ট দেবেন তখন সেক্সটা প্রথমেই নোট করে নেবেন।"

ওই কথা শুনে আমার তো মাথায় হাত দিয়ে বসবার উপক্রম। ভদ্রলোক কী রকম শান্তভাবে ধরে নিয়েছেন, প্রায়ই আমাকে পুলিসের কাছে খুন-খারাপির রিপোর্ট করতে হবে।

তেলকালিবাবু আমাকে ভরসা দিলেন, "আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। পুলিসের লোক তো—ডেডবডি ওদের কাছে ডালভাত। আপনি যে বাকি জীবনে আর একবারও ডেডবডির পাল্লায় না-পড়তে পারেন তা ওঁদের মাথায় ঢুকছে না। ওঁরা ভাবছেন, মড়া সম্বন্ধে পুলিসকে ফোন করাই আপনার পেশা হয়ে দাঁড়াবে—তাই ট্রেনিং দিয়ে নিচ্ছেন।"

ডেডবডিকে আর এড়িয়ে থাকবার উপায় নেই। তেলকালিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কী ওখানে যাবার কোনো প্রয়োজন আছে?"

বুঝলাম এই সকালে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার উৎসাহ তিনি পাচ্ছেন না। বললাম, "আপনি তা হলে এই আপিস ঘরটায় একটু ডিউটি দিন।"

এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন তেলকালিবাবু। বললেন, "আমি এখানে রইলুম। তেমন দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন। মিসেস সামতানির ব্যাপার তো! সকলের এক সঙ্গে জড়িয়ে না-পড়াই ভাল।"

লম্বা ম্যানসন বাড়িটার অদূরে কয়েকখানা যে-ছোট্ট ঘর আছে তারই একখানায় বসবাস করেন কুসুম সামতানি। নিজের জন্যে সবচেয়ে ছোট্ট ঘরখানা রেখে, ভাল ঘরগুলো ভাড়া দিয়েছেন বুদ্ধিমতী মিসেস সামতানি।

সিঁড়ি এবং ল্যান্ডিং পেরিয়ে প্যাসেজের সামনেই দেখলাম একটি পুরুষের মৃতদেহ কম্বলের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পুরুষের মুখে কিছু দাড়ি। মুখটা সামান্য খোলা। দেহ কঙ্কালসার।

কয়েকজন লোক কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু আমাকে দেখে এবং পুলিস আসছে শুনে তারা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কেবল মিসেস সামতানি উদ্বিগ্নভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "পুলিস এসে কী করবে বলে মনে হয় তোমার!"

"প্রথমেই খোঁজ করবে, মৃত্যুটা কীভাবে হলো। এটা খুন কিনা?" মনে মনে বললাম, "তুমি তো আইনের অনেক খবরাখবর জানো। তোমার মুখে এ-প্রশ্ন শোভা পায় না।"

আড়চোখে আমি আবার মৃতদেহের দিকে তাকালাম। মৃতের মাথার কাছে এক জগ জল রয়েছে। পাশে একটা ডিশে কয়েক পিস রুটি এবং দুটি রসগোল্লা। জগের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ মনে হলো, সামতানি পরিবারের মনোগ্রাম যেন ওখানে আঁকা রয়েছে। মিসেস সামতানির দু' একখানা চিঠিতে ওই মনোগ্রাম দেখেছি আমি।

দারোগা গণেশ সরকার কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির হলেন। গণেশ সরকারকে দেখে তবু খানিকটা ভরসা পেলাম—কারণ সেবারে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মিসেস ফিলিপের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল। ভারি অমায়িক লোক এবং গণপতিবাবুর সঙ্গে অনেক দিনের চেনাশোনা।

গণেশ সরকার রসিকতা করলেন, "কী ব্যাপার মশাই? একটা খুনের

গোলমাল মিটতে না মিটতেই আবার আমাদের ডাক পড়লো কেন? থ্যাকারে ম্যানসনের রেকর্ড তো আগে এমন ছিল না। আপনি আসবার পরেই দু' মাসে দুটো কেস..."এই বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন দারোগা গণেশ সরকার।"

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি এমন প্রাণখোলা হাসতে পারি না। গণেশ সরকার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারলেন এবং দয়া-পরবশ হয়ে বললেন, "আমাদের কথা ছেড়ে দিন, মিস্টার শংকর। পুলিসে বেশী দিন কাজ করলে নজরটাই পাল্টে যায়। জন্ম মানেই আমাদের কাছে বেওয়ারিশ বেবি! এই তো ভাবনানি ম্যানসনের গেটের পাশে একটা বেওয়ারিশ নিউ বর্ন বেবিকে দেখে এলাম। লজ্জার ভয়ে কোনো মাদার ফেলে পালিয়েছে। ফিমেল বেবিকে হসপিটালে পাঠিয়ে থানায় গিয়েছি; এক কাপ চা খাবো ঠিক করছি এমন সময় এই থ্যাকারে ম্যানসনের ডেডবডির খবর গেলো। মৃত্যু মানেই আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মৃত্যু—আনন্যাচারাল ডেথ! স্বাভাবিক জন্ম, স্বাভাবিক মৃত্যু, স্বাভাবিক বিবাহের সময় লোকে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের ডাকে, একবারও খেয়াল হয় না, আহা থানার মেজবাবুকেও একটু খবর দেওয়া যাক।"

মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে এ-ধরনের কথা শুনতে আমি যে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি তা গণেশবাবু বুঝলেন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কিছু ভাববেন না, যদি খুন হয়, তা হলে আসামীকে ঠিক বার করে ফেলবো। গণেশ সরকারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।"

এরপর আজকের ঘটনার যতটুকু শুনেছি তা পুরোপুরি গণেশ সরকারের কাছে বর্ণনা দিলাম। গণেশ সরকার বললেন, "তা হলে ওই কুসুম সামতানির সঙ্গেই আগে কথাবার্তা বলতে হয়। কিন্তু তার আগে আমি বডিটা একবার ভাল করে দেখে নিই।"

মন দিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন গণেশ সরকার। তারপর বললেন, "কোথায় আপনাদের মিসেস সামতানি? আর মদনা বলে ছেলেটিই বা কোথায়?"

"মদনার নাম আমি তো তুলিনি।"

গণেশ সরকার হেসে ফেললেন, "আপনি তোলেন নি, কিন্তু আমি তুলছি। ওকে আমার অবশ্যই চাই। থ্যাকারে ম্যানসনে এসেছি, আর একবার মদনবাবুর সঙ্গে দেখা না-করে যাবো, তা কখনও হয়!"

দু' তিন মিনিটের মধ্যে একজন কনস্টেবল শ্রীমান মদনকে সংগ্রহ করে গণেশবাবুর সামনে নিয়ে এলো।

বেচারা মদনা পুলিস দেখে শুকনো মুখ করে বললো, "আমি কিছু করিনি হুজুর।"

"থ্যাকারে ম্যানসনে একটা লোক মরে পড়ে রইলো আর তুমি কিছু শোনোনি তা কখনও হয় বাবা, মদন!" রসিকতা করলেন গণেশবাবু।

এই অপ্রিয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি ছটফট করছি।

গণেশবাবু আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "আপনি এখন চলে যান। তবে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বেরোবেন না। আমি শ্রীমান মদনার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে, মিসেস কুসুম সামতানির সঙ্গে কথা-বার্তা বলে এবং আরও দু'-একটা কাজ সেরে আপনার কাছে যাচ্ছি।"

এস-আই গণেশ সরকারের জন্যে আপিস ঘরে অপেক্ষা করতে করতে অপরিচিত এই পুরুষ মৃতদেহ সম্বন্ধে চিন্তা করছি। সমস্ত সন্দেহটা যে মিসেস কুসুম সামতানির ওপর পড়ছে তা এখন আর স্বীকার করতে লজ্জা নেই। স্বয়ং তেলকালিবাবুও আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন। তাঁরও সন্দেহ, ঘটনাটা নিজের কোনো ঘরে ঘটিয়ে মিসেস সামতানি মৃতদেহকে কমন-প্যাসেজে সরিয়ে দিয়েছেন।

তেলকালিবাবু মন্তব্য করলেন, "পুলিস যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি সোজা বলবো, এই সব মহিলারা পারেন না, এমন কাজ নেই।"

অনুসন্ধানপর্বের প্রথম অধ্যায় দ্রুত শেষ করে দিয়ে এস-আই গণেশ সরকার আমাদের আপিস ঘরে চলে এলেন। পিছনে কয়েকটি কৌতূহলী বালক ভিড় করে রয়েছে—তারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে তদন্তকারী পুলিসের কাজকর্ম, ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছে। চেয়ারে বসে গণেশ সরকার একবার ঘাড় ফিরিয়ে এই ভিড়ের দিকে নজর দিতেই বালক দল মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো।

গণেশ সরকারের জন্যে চা এলো। চায়ের কাপে দ্রুত চুমুক দিয়ে গণেশ সরকার বললেন, "মানুষের খারাপ দিকটা দেখতেই আমরা পুলিসের লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু আজ আপনাদের এখানে এসে একটু ভরসা হলো।"

গণেশ সরকার বললেন, "যতদূর মনে হচ্ছে মার্ডার-টার্ডার কিছু নয়। আপনাদের ওই মিসেস সামতানি বেশ ইন্টারেস্টিং লোক। এ-দিকে খুব ধড়িবাজ ল্যান্ডলেডি, ভাড়াটেদের কাছ থেকে যতদূর পারেন চুষে নার করে নেন। দু' একবার ওই সব হাঙ্গামা নিয়ে থানাতেও গিয়েছেন। কিন্তু আজকে অন্য মূর্তি দেখলাম ওঁর।"

আমি একটু অবাক হয়েই গণেশ সরকারের মুখের দিকে তাকালাম। গণেশ সরকার জানালেন, ওই যে লোকটি মরে পড়ে রয়েছে, ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। নাম ঈশ্বর, মেদিনীপুরের লোক। পার্ক স্ট্রীটের ম্যাসনিক লজের কাছে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতো। খুবই ড্রামাটিক বলতে হবে—স্বয়ং ঈশ্বর ভিক্ষে করছেন। ওখানেই বোধ হয় অসুখ-বিসুখ করে ফুটপাথের ওপর পড়েছিল—মিসেস সামতানি আপনাকে না-জানিয়ে চুপি চুপি ওকে নিয়ে এসে থ্যাকারে ম্যানসনের সিঁড়ির তলায় তুলেছিলেন। বলেছিলেন, যতদিন না সুস্থ হচ্ছ ততদিন ওখানেই থাকো। আগে থেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে মুখ চেনা ছিল ওঁর—বেড়াতে যাবার পথে মাঝে মাঝে দু' চারটে পয়সা ভিক্ষে দিতেন।"

গণেশ সরকার বললেন, "জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানলাম, ইদানীং আমাদের ঈশ্বরের ভিক্ষে করবার মতো শক্তিও ছিল না। মিসেস সামতানি নিজেই দুবেলা কিছু কিছু খাবার দিয়ে যেতেন। এক-আধটা ওষুধ-পত্তরও দিতেন সামতানি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গণেশবাবু উত্তর দিলেন "অ্যাকর্ডিং টু মিসেস সামতানি, কাল ঈশ্বরের শরীর আরও খারাপ হয়। রাত্রে দেখা-শোনার সুবিধের জন্যে উনি ওই ভিখিরিকে ওপরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। বাড়তি একখানা কম্বল ও বালিশ বার করে দিলেন।"

একটু থেমে গণেশবাবু বললেন, "গিয়ে দেখি ডেডবডির কাছে রসগোল্লার ডিশ। এ-নিয়েও এক কাণ্ড হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় মিসেস সামতানি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন রুটি খাবে ঈশ্বর?' ঈশ্বর বললো, 'খেতে ইচ্ছে করছে না, মেমসায়েব।' মেমসায়েব তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?' ঈশ্বর হঠাৎ ছোটছেলের মতন বলে বসলো, 'রসগোল্লা।' বুঝুন, রাস্তার ভিখিরি রসগোল্লা খেতে চাইছে! কিন্তু ওই জাঁদরেল ল্যান্ডলেডি তখনই ওই খোঁড়া পা-নিয়ে ছুটলেন এসপ্ল্যানেডে রসগোল্লা কিনতে। চার-খানা রসগোল্লা দেখে ঈশ্বরের কী আনন্দ! মেমসায়েব সত্যিই যে রসগোল্লা আনবেন তা সে কল্পনাও করেনি। সে ক্ষমা চেয়ে বললো, 'মেমসায়েব, রোগের যন্ত্রণায় আমি রসগোল্লার কথা বলে ফেলেছি। ছোটবেলায় একবার জমিদার বাড়িতে রসগোল্লা খেয়েছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। আপনি কিছু মনে করবেন না, মেমসায়েব', ঈশ্বর করুণকণ্ঠে অনুনয় করেছিল।"

গণেশবাবু বললেন, "অ্যাকর্ডিং টু মিসেস সামতানি, একটু পরে ফিরে এসে তিনি দেখেন, ঈশ্বর মাত্র একটা রসগোল্লা খেয়েছে। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈশ্বর, কী হলো তোমার? রসগোল্লা খেলে না? কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার?' ঈশ্বর বললো, 'রসগোল্লা খেতে যে এতো ভাল তা মনেই ছিল না। সেই ছোটবেলার কথা তো! এখনই সব খেলে ফুরিয়ে যাবে যে। একটু পরে আর একটা খাবো।' মিসেস সামতানি ভাবলেন, ঈশ্বর ভালই আছে। কয়েক-খানা রুটিও রেখে গেলেন। কিন্তু আজ সকালে ভদ্রমহিলা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছেন। দরজা খুলে করিডরে এসে মিসেস সামতানি দেখেন, ঈশ্বর আরও একটা রসগোল্লা খেয়েছিল, বাকি দুটো বোধ হয় আজকের জন্যে রেখে দিয়েছে। কিন্তু ডাক দিয়ে ঈশ্বরের সাড়া পেলেন না। পাবেন কোথা থেকে? ঈশ্বর তো নেই"

"মশাই, আশ্চর্য জিনিস দেখলাম!" গণেশবাবুর মন্তব্য। "মিসেস সামতানি ওই রাস্তার বাঙালী ভিখিরিটার জন্যে কাঁদছেন। আজ সকালে ডাক্তারও এনেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিতে রাজী হলেন না—রাস্তার ভিখিরি, কে মশায় হাঙ্গামায় যায়? তার থেকে পুলিস ডাকতে বলা ভাল!"

গণেশবাবু বললেন, "পেয়িং-গেস্টদের যতই যন্ত্রণা দিন, নিজের গেস্টকে ভালবাসতে পারেন আপনাদের এই মিসেস সামতানি। কোথাকার কে একটা ভিখিরি, তার অসুস্থ দেহে তিনি হাতও বুলিয়ে দিয়েছেন—অন্য লোকের মুখে শুনলাম।"

গণেশবাবু বললেন, "মিসেস সামতানি যা বলেছেন, তা আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের আইন-কানুন বাঁধা। মর্গে একটা ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।"

পুলিসের গাড়িতে ঈশ্বরের মৃতদেহ চড়িয়ে দেওয়া হলো। অভুক্ত রসগোল্লার ডিশটাও ওর মাথার দিকে এগিয়ে দিলেন মিসেস সামতানি। চলমান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে মিসেস সামতানি এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

অপূর্ব সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আমার চোখও সজল হয়ে উঠলো। মেঘে ঢাকা দিনের আলোতে কুদর্শনা কুসুম সামতানিকে অকস্মাৎ আমার অপরূপা বলে মনে হলো।

গণেশ সরকারের হেফাজতে ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় নি। মিসেস কুসুম সামতানি এক সময় আমাদের আপিস ঘরে এসে নিঃশব্দে একখানা চেয়ার অধিকার করে বসেছিলেন।

তেলকালিবাবু তখনও আপিস ঘর ত্যাগ করে নিজের কাজকর্ম শুরু করেন নি। আজ তাঁরও কাজকর্মে মন নেই। বললেন, "যা-হয় হবে স্যর, আমি আজ আর ডিউটিতে বেরোচ্ছি না। সারা জন্ম তো অনেক ডিউটি দিয়েছি, একদিন না-হয় ফাঁকি দিলুম। কী বলেন?"

এ বিষয়ে আমার কী বলবার থাকতে পারে? যে-লোক দিনের পর দিন কাজ নিয়েই মেতে থাকেন, সে-লোক একদিন ছুটি চাইলে তা অবশ্যই প্রাপ্য। তা ছাড়া, এই মুহূর্তে আমারও একলা থাকতে ইচ্ছে করছে না। মৃত্যু অলক্ষ্যে আমার মনের ওপরেও এক দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেছে।

ইচ্ছে ছিল এবার মৃত্যুকে ভুলে অন্য কথাবার্তায় ডুবে থাকবো। তেল-কালিবাবুর তো অভিজ্ঞতার শেষ নেই। এ-বাড়ির কোনো একটা ব্যাপারে তাঁর জানা গল্প শুনে দুপুরটা কাটিয়ে দেবো; কিন্তু কুসুম সামতানির সশরীর উপস্থিতিতে তা আর সম্ভব হলো না।

মিসেস সামতানি বললেন, "মিস্টার শংকর, তোমাকে একটু থানায় যেতে হবে। মিস্টার গণেশ সরকারের সঙ্গে তোমার খুব আলাপ দেখলাম। পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট কখন পাওয়া যাবে সেটা জানা হলো না।"

অন্য সময় হলে মিসেস সামতানির এই অনুরোধ আমি অবশ্যই রক্ষা করতাম না। সোজা তাকে থানার পথ দেখিয়ে দিতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে কুসুম সামতানির সমস্ত অপরাধ আমার মন থেকে মুছে গিয়েছে; আমি তাঁকে না বলতে পারলাম না।

গণেশ সরকার আমাকে থানায় দেখে একটু অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কী হলো?"

"নতুন কিছু হয় নি; কিন্তু পুরনো ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ এখনও শেষ হয় নি।"

গণেশ সরকার ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করতে চান না। তিনি বললেন, "আপনাদের ব্যাপারটা তো মিটে গিয়েছে! কুকুর-বেড়াল মরলে মেথর এবং ভিখিরি মরলে পুলিসকে খবর দিতে হয়। তাদের ঘাড়ে দায়িত্বটা চাপাতে পারলেই তো হাঙ্গামা চুকে গেলো!"

মিসেস সামতানির কথা বললাম ওঁকে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট কখন পাওয়া যেতে পারে জানতে চাইলাম।

গণেশ সরকার এবার ফোন তুলে নিলেন। আমাকে শুনিয়ে দিলেন, "বলবেন তো মশাই, যে আপনারা পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ইনটারেসটেড।"

টেলিফোনের বোতামটা ফ্ল্যাশ করতে করতে গণেশবাবু বললেন, "পুলিসে ঢোকবার আগে শরৎ চাটুজ্যে মশায়ের একটা লাইন পড়েছিলাম: 'মড়ার আবার জাত আছে নাকি, ভাই?' তখন ভেবেছিলুম খুব বৈপ্লবিক কথা।

কিন্তু এ-লাইনে ঢুকে দেখলুম মড়ার অবশ্যই জাত আছে। এক-আধরকম নয়—টাকাকড়ি, চাকরি, সামাজিক পোজিশন, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি অনুযায়ী আট-দশ জাতের মড়ার কথা আমিই আপনাকে মুখস্থ বলে যেতে পারি।"

গণেশবাবুর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। টেলিফোনে উত্তর পাবার প্রতীক্ষা করতে করতে গণেশবাবু বললেন, "হায়েস্ট মড়ার জন্যে খাঁটি ঘি এবং চন্দন কাঠ। এবং লোয়েস্ট লেভেলে কী হয় তা দেখতে হলে আপনাকে মাঝে-মাঝে পুলিসের সঙ্গে শ্মশানে ঘুরে আসতে হবে।"

ওদিক থেকে উত্তর না-পেয়ে গণেশবাবু কিছুক্ষণের জন্যে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "ভাগ্যে আপনি এখনই এসে বললেন যে, আপনারা ঈশ্বরের পোস্টমর্টেমে ইনটারেসটেড। না-হলে আমাকে হয়তো লজ্জায় পড়তে হতো।"

লজ্জায় পড়বার কারণটা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না। গণেশবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "যে মড়ার 'ক্যাচ' নেই. সরকারী হেফাজতে অনেক সময় তার প্রচণ্ড দুর্গতি।"

ক্রিকেটের মাঠ ছাড়া 'ক্যাচ' কথাটা এর আগে আমি কখনও শুনিনি।

গণেশ সরকার তাঁর ডায়েরি লিখতে-লিখতে বললেন, "ক্রিকেটের মাঠ থেকেই কথাটা এখন আপিসে. থানায়, হাসপাতালে এমনকি মর্গেও ছড়িয়ে পড়েছে। 'ক্যাচ' মানে ধরাধরি করার লোক। ধরাধরি করার লোক না থাকলে এখন মরেও শান্তি নেই, শংকরবাবু। আপনি গণপতিবাবুর ভায়ের মতো, তাই সত্যি কথাটা চাপতে পারছি না।"

গণেশ সরকার টেলিফোন যোগাযোগের আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। এবার তিনি একটু অধৈর্য হয়ে উঠছেন।

আমি বললাম, "ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মিসেস সামতানি শুধু আমাকে অনুরোধ করলেন সময়টা জেনে আসতে। মনে হলো পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে উনি ইনটারেসটেড।"

"ব্যস্ত কী আর সাধে হচ্ছি! ছটফটানির যথেষ্ট কারণ আছে", অর্ধমৃত টেলিফোনটা কানে লাগিয়েই গণেশ সরকার মন্তব্য করলেন। তারপর আবার রিসিভারটা স্বস্থানে নামিয়ে রাখলেন।

গণেশ সরকারের এতো ব্যস্ততার কারণ আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি একবার বললেন. "ডেডবডিটা যখন আপনার কোনো আত্মীয়ের নয়, তখন ব্যাপারটা আপনাকে বলা চলে। মর্গে মড়া পাঠিয়ে আজকাল সব সময় নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। এই তো পরশু-দিন, একটা রান-ওভার কেস মর্গে পাঠালাম। বাইরের পার্টি, কলকাতায় কোনো কাজে এসেছিল, এখানেই গাড়িচাপা পড়ে মৃত্যু কপালে লেখা ছিল। পকেটে একখানা রেলের পাশ ছিল। সেইটা দেখে টেলিগ্রাম করে দিলাম। খবর পেয়েই আত্মীয়স্বজন ছুটে এলো। কিন্তু তখন কী লজ্জা. কী লজ্জা!"

"লজ্জার কারণটা কী?" আমি গণেশ সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

গণেশ সরকার ফিসফিস করে উত্তর দিলেন, "ইঁদুর। মানুষখেকো ইঁদুর মর্গে এতো বেড়ে গিয়েছে, আপনাকে কী বলবো! নরমাংসের স্বাদ পেয়ে ইঁদুরগুলোর এমন হয়েছে যে, ব্যাটাদের মুখে এখন অন্য খাবার রোচে না! মর্গে ডেডবডি খোঁজ করতে গিয়ে দেখি যে ইঁদুরে খুবলে খুবলে

ওয়ান-ফোর্থ খেয়ে ফেলেছে! ভাগ্যে অ্যাক্সিডেণ্ট কেস তাই, ওয়ারিশনের কাছে প্রেস্টিজ রক্ষে হলো! মর্গের ইন্দুবাবু বললেন, 'কিছু ভাববেন না, ছুরি কাঁচি চালিয়ে, এবং ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে এমন করে দিচ্ছি, কার সাধ্য বুঝতে পারে যে, ইঁদুরে ফিস্টি করেছে—ঠিক মনে হবে অ্যাক্সিডেণ্ট ইনজুরি!"

গণেশবাবুর কথা শুনে আমার সমস্ত শরীর ঘিন ঘিন করে উঠছে। গণেশ সরকার ইতিমধ্যে টেলিফোন যোগাযোগে সফল হয়েছেন। "হ্যালো, হ্যালো, ইন্দুবাবু, পেয়েছেন?"

ইন্দুবাবু বোধ হয় ওদিক থেকে চায়ের কথা কী একটা বললেন।

গণেশবাবু বিব্রতভাবে উত্তর দিলেন, "না মশাই, সস্তা দামের চায়ের প্যাকেট এখনও পাঠাতে পারিনি।"

ইন্দুবাবু বোধ হয় ওদিক থেকে এবার সিনেমা টিকিটের কথা বললেন।

গণেশবাবু উত্তর দিলেন, "হবে হবে। আপনি এবং বউদি যেদিন চাইবেন সেদিনই পাশের ব্যবস্থা করা যাবে। খুব হাসির বই একখানা উলটে এসেছে। ফার্স্ট উইকটা যাক, তখনই পাশ নেওয়া যাবে। এ-সপ্তাহে সর্ব-প্রকার ফ্রি পাশ বন্ধ।"

গণেশবাবু এবার কাজের কথায় ফিরে এলেন। "হ্যালো, ইন্দুবাবু। সকালে যা পাঠিয়েছি তা নিশ্চয় পেয়ে গেছেন? ওয়ান আন-আইডেণ্টিফায়েড হিন্দু এজেড্ অ্যাবাউট সিক্সটিফাইভ।"

"মেল না ফিমেল?" ওদিক থেকে প্রশ্ন করলেন ইন্দুবাবু।

"আরে মশাই মেল! মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি রয়েছে।" শকুনি লাগালেন গণেশ সরকার।

ইন্দুবাবু কিছুক্ষণ সময় নিয়ে 'স্টক পোজিসন' দেখে এসে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। বডি এখানে আমরা রিসিভ করেছি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়িও রয়েছে। কিন্তু হাসির ছবিটা কবে দেখাবেন?"

পুনর্বার ছবি দেখাবার আশ্বাস দিয়ে, গণেশবাবু এবার জেনে নিলেন, "হাতে কাজের প্রেসার কী রকম, দাদা?"

"লাসকাটা ঘরের প্রেসার কী কলকাতার মতো শহরে কখনও কমে!" উত্তর দিলেন ইন্দুবাবু।

"ঠিক বলেছেন, দাদা", সায় দিলেন গণেশ সরকার। "এক এক সময় মনে হয়, স্রেফ মরবার জন্যেই যেন বহু লোক এই কলকাতা শহরে হাজির হয়। পৈত্রিক প্রাণটা ত্যাগ করা ছাড়া এখানে আসবার আর কোনো মোটিভ তাদের মধ্যে খুঁজে পাই না।"

টেলিফোনের ওপাশ থেকে সরব হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। লাসকাটা ঘরের ইন্দুবাবু একটু নরম হয়েছেন আন্দাজ করে গণেশ সরকার এবার টোপ ফেললেন। "শুনুন, স্যার—ডেডবডি পাঠাবার পরে কিছু ডেভেলপ-মেণ্ট হয়েছে। ওই যে আনআইডেণ্টিফায়েড হিন্দু মেল বলেছিলাম ওটা এখন এগজ্যাক্টলি ঠিক তা নেই!"

"আপনাদের তো, মশাই, কিছুই এগজ্যাক্ট নয়—মড়া পুড়ে ছাই না-হওয়া পর্যন্ত আপনারা ইনফর্মেশন পাল্টে যান", ওদিক থেকে মন্তব্য করলেন ইন্দু বাবু।

গণেশ সরকারের ইজ্জতে ঘা-লাগলো। তিনিও প্রত্যুত্তরে মৃদু কামড়

দিলেন, "কী করবো বলুন? কলকাতার লোকরা তো আপনাদের পোস্ট-মর্টেমের ফর্ম ফিল-আপ করে তারপর মরে না! মরবার আগেও কেউ পুলিস ডাকে না।"

এবার গণেশ সরকার নিজের কথায় ফিরে এলেন। "হ্যালো, ইন্দুবাবু, যা-বলছিলাম, আনআইডেণ্টিফায়েড বডির অ্যালেজ্‌ড্ নাম ঈশ্বর!"

"আর নাম খুঁজে পেলেন না! স্বয়ং ঈশ্বর তাও অ্যালেজ্‌ড্" ওপাশ থেকে টিপ্পনি কাটলেন ইন্দুবাবু।

"যতক্ষণ না হাতে-কলমে প্রমাণ করতে পারছি যে, ইনিই ঈশ্বর ততক্ষণ অ্যালেজ্‌ড্ কথাটাও ব্যবহার করে যান।"

ইন্দুবাবু অত সহজে নরম হবার পাত্র নন। তিনি সাফ বলে দিলেন, টেলিফোনে এই সব ইমপর্টাণ্ট মেসেজ রিসিভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। গণেশবাবু চাইলে সংশোধিত ফরওয়ার্ডিং নোট পাঠাতে পারেন।

গণেশ সরকার এবার মিষ্টি করে বললেন, "সেসব ইন ডিউ কোর্স হবে'খন, স্যার। আপনি শুধু বলুন, সায়েবের হাতে আজ ক'টা কেস?

ইন্দুবাবু বললেন, "মড়া কাটা ডাক্তারবাবুর ভাগ্নের অন্নপ্রাশন আজ—বিকেলে খুব ব্যস্ত থাকবেন!"

গণেশ সরকার বললেন, "শুনুন স্যার, ঈশ্বরের ফ্রেণ্ডস্ অ্যাণ্ড রিলেটিভ্‌সরা আমাকে খুব ধরে বসেছে—একটু তাড়াতাড়ি রিপোর্টটা করিয়ে দিন।"

ইন্দুবাবু বোধ হয় আবার কোনো ওজর তুলতে যাচ্ছিলেন। গণেশ সরকার বললেন, "আপনার সায়েব এক্সপার্ট লোক। আপনি বললেই মেশিনের মতো হাত চালিয়ে দেবেন।"

এবার বোধ হয় ইন্দুবাবু একটু সন্তুষ্ট হলেন। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে গণেশ সরকার আবেদন জানালেন, "আর একটা রিকোয়েস্ট স্যার। ইঁদুরগুলো সম্বন্ধে একটু দুশ্চিন্তা রয়েছে। আনআইডেণ্টিফায়েড বডি জানতে পারলে, হয়তো কোনো ট্রেসই পাওয়া যাবে না। জগাকে একটু বলে দেবেন ঈশ্বরের ওপর নজর রাখতে।"

আমার জন্যে গণেশ সরকারকে এতো হাঙ্গামা সামলাতে হবে তা জানতাম না। আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে গেলাম। শান্তভাবে গণেশ সরকার বললেন, "আরে মশাই, এই তো আমার কাজ। আপনি এখন চলে যান। আমি আবার কিছুক্ষণ পরেই ইন্দুবাবুকে ফোন করবো। দেখি কত তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পাওয়া যায়। রিপোর্ট না-পাওয়া পর্যন্ত আমার হাঙ্গামাও তো চুকছে না।"

ঈশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে সেদিন দুই রাজপুরুষের টেলিফোন সংলাপ এই এতোদিন পরেও আমি ভুলতে পারি নি। এর মধ্যে এমন এক হৃদয়হীন শীতলতা ছিল যা আমাকে আজও ব্যথিত করে।

সদ্য থানা থেকে ফিরে কথাগুলো কানে বারবার বাজছে। দুপুরের অন্ন মুখে কেমন বিস্বাদ ঠেকলো। ঈশ্বরের শেষ যাত্রার ছবিটাও চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগলো।

তেলকালিবাবু একটু পরেই আমার ঘরে পদধূলি দিলেন। বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার, মশাই। যাঁকে আমি হৃদয়হীনা ভাবতাম, সেই কুইন ভিক্টোরিয়া চোখ লাল করে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। দুপুরের ভাত পর্যন্ত

মুখে তোলেন নি। দেখেশুনে আমারও মশাই খুব কষ্ট হচ্ছে। ভাবলাম আপনার থেকে জেনে আসি, ঈশ্বরের কোনো গতি হলো কিনা!"

"সরকারী খাতায় ইনি এখন 'অ্যালেজ্‌ড্‌' ঈশ্বর। খবরাখবর পেতে কতক্ষণ লাগবে কিছুই জানি না।"

এর পর দুপুরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পোস্টমর্টেমের খবরাখবর আনতে কত সময় লাগে সে সম্বন্ধে আমার কোনো আন্দাজও ছিল না।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে, কাউকে না-বলে আবার থানায় হাজির হয়েছি। গণেশ সরকার তখনও ডিউটি দিচ্ছেন। ভদ্রলোক কাজের নেশায় পাগল। তাছাড়া আজ একই সঙ্গে অনেকগুলো গোলমেলে কেসে জড়িয়ে পড়েছেন। তবু গণেশ সরকারের মুখে বিরক্তির ছাপ নেই।

আমাকে দেখেই হাসিমুখে গণেশ সরকার বলে উঠলেন, "কোথায় ছিলেন মশাই? আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু ফোন ধরলো আপনাদের রাম সিংহাসন। রাম সিংহাসনই আপনাদের ওই মিসেস সামতানিকে ফোনে ডেকে দিলেন।"

গণেশ সরকার বললেন, "বসুন, মশাই, বসুন। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট যে অত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে আন্দাজ করি নি। কিন্তু আমাদের ওই ইন্দুবাবু, মুখে যতই বেজার ভাব দেখান, আমি কোনো অনুরোধ করলে যতখানি সম্ভব কথা রাখেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ইন্দুবাবু নিজেই খবর দিলেন। বললেন, আপনার ভাগ্য ভাল আজ সায়েবের ভাগের অন্নপ্রাশন। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ক্লিয়ার করে সাহেব সরে পড়লেন।"

গণেশবাবু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সম্বন্ধে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। "না মশাই কোনো ফাউল প্লে নেই। যা ভেবেছিলাম তাই। রোগ-ভোগেই ঈশ্বর মরেছে। এই খবরটা দেবার জন্যেই আপনাকে ফোন করেছিলাম। মিসেস সামতানি নিজেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন!"

গণেশবাবু এবার একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, "এর পর মশাই তাজ্জব ব্যাপার। টেলিফোন নামিয়ে রাখবার কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস সামতানি এখানে সশরীরে হাজির হলেন।"

ধোঁয়া ছেড়ে গণেশবাবু বললেন, "আমি তখন ঈশ্বরের ফিউনারালের ব্যবস্থা করছি। সরকারী খরচে এই ফিউনারালের মশাই অনেক হাঙ্গামা। আনক্লেম্‌ড্‌ বডি হলেও অনেক আইনকানুন আছে। লোকটাকে প্রথমে দেউলিয়া ডিক্লেয়ার করতে হবে। নিজের খরচে দাহ হবে না, ডিক্লেয়ার করলে তবে সরকারী খরচ।"

সিগারেটটা ছাইদানিতে রেখে গণেশবাবু বললেন, "ওই সব ব্যবস্থা পাকা করতে যাচ্ছি, তখন মিসেস সামতানি বললেন, 'মিস্টার সরকার, তোমাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। ঈশ্বরকে আমার হাতে তুলে দাও। সারাজীবন ঈশ্বর অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে ; ওর শেষটা অন্তত সম্মানজনক হোক।'

গণেশ সরকার বললেন, "অনেকদিন এ-লাইনে আছি। কিন্তু কখনও মশাই কাউকে ভিখিরির বডি চাইতে দেখিনি।"

গণেশ সরকার প্রথমে উৎসাহ দেখান নি। মিসেস সামতানিকে বলেছিলেন, "অনেক হাঙ্গামা, এসব ব্যাপারে কেন জড়িয়ে পড়বেন?"

কিন্তু মিসেস কুসুম সামতানি শোনেন নি। চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বলেছেন, "না, ঈশ্বরকে আমি ফুল দিয়ে সাজিয়ে খাটে চড়িয়ে শ্মশানে পাঠাতে চাই।"

গণেশ সরকার বললেন, "আমি মশাই রাজী হচ্ছিলুম না। এই সব ডেড-বডির অনেক হাঙ্গামা—কোত্থেকে কী হয়ে যায় কিছুই ঠিক নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হলো আমাকে। লোকজন নিয়ে মিসেস সামতানি নিজেই মর্গে চলে গিয়েছেন এবং ওখান থেকে বডি সাজিয়ে ওঁরা সোজা চলে যাবেন শ্মশানে।"

গণেশবাবু এবার নিজের মনেই হাসলেন। তারপর বললেন, "আমি হয়তো ডেডবডি দিতাম না। এতো আদিখ্যেতা আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকছিল। হঠাৎ একটু বিরক্তভাবেই আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার এ-ব্যাপারে এতো আগ্রহ কেন? ও কি তোমার কেউ হয়?"

একটু থামলেন গণেশ সরকার। তারপর বললেন, "মানুষের মনের ভিতরে কত কি যে থাকে! ওই মহিলা আমাকে হঠাৎ বললেন, মিস্টার সরকার কেউ জানে না। তোমাকেই আজ বললাম। আমি এক ভিখিরির মেয়ে। পার্ক স্ট্রীটের ম্যাসনিক লজের গেট থেকেই আমার নতুন মা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন থ্যাকারে ম্যানসনে। অনেক দিন পরে আমি শুনেছি, আমার ভিখিরি বাবার মৃতদেহের পাশে বসে আমি নিশ্চিন্তে খেলাধুলো করছিলাম।"

গণেশ সরকার শান্তভাবে বললেন, "ডেডবডি ওঁর হাতে দিতে লিখে দিয়েছি। ওই দেহ নিয়ে মিসেস সামতানি যা-খুশী করুন।"

জীবনে যা-পাওয়া যায় নি, মৃত্যুর পরে ঈশ্বর তা অতি সহজেই পেয়েছিল।

মিসেস সামতানির খোঁজ-খবর করবার জন্যে আমি নিজেই একবার মর্গের দিকে যাবার কথা ভাবছিলাম।

মর্গের ঠিকানা খোঁজ করায় সদাশয় গণেশ সরকার বলেছিলেন, "পিক-আওয়ারের ভিড় ঠেলে ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে কোথায় যাবেন মশাই?"

সেই মুহূর্তে নিজেকে মিসেস সামতানির তুলনায় খুব ছোট মনে হচ্ছিল। ঈশ্বর হাজার হোক আমার দেশের লোক; কিন্তু একজন সিন্ধি রমণী তার জন্যে যা করছেন আমি তার শত ভাগের এক ভাগও করতে পারলাম না। ঈশ্বর যখন আমাদেরই লোক তখন অন্ততঃ একবার এই শেষ যাত্রায় আমার অংশ গ্রহণ করার নৈতিক দায়িত্ব পালন না-করা পর্যন্ত মনটা হাল্কা করতে পারছি না।

এস-আই গণেশ সরকার কেন যে আমার ওপর এতো সদয় হয়ে উঠলেন তা বুঝতে পারছি না। হয়তো গণপতিবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়টাই এই মুহূর্তে বিশেষভাবে আমার কাজে লাগছে।

সংসার সম্বন্ধে গণেশ সরকার আমার থেকে সহস্রগুণ অভিজ্ঞ। আমার

মনের কথা জানতে পেরে বললেন, "ঈশ্বর সম্পর্কে আমি আপনার 'নোব্‌ল' সেণ্টিমেণ্ট 'অ্যাপ্রিসিয়েট' করছি। আমাদের এই থানায় এক সপ্তাহ ডিউটি দিলে আপনার এই সব সেণ্টিমেণ্ট ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতো। কিন্তু আপনি যখন কোমরে চামড়ার বেল্ট বেঁধে সরকারের কাছে দাসখত লিখে দেন নি, তখন আপনি অবশ্যই মনটাকে কচি এবং কাঁচা রাখবেন।"

অপ্রত্যাশিত এই স্নেহপ্রশ্রয়ের জন্যে গণেশবাবুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

বকুনি লাগালেন গণেশ সরকার। "কথায়, কথায় এমন কৃতজ্ঞতা জানাবেন না, মশাই।"

আমি গণেশ সরকারের আপাতকঠিন মুখের দিকে তাকালাম। গণেশ সরকার আমার সেই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "কোথায় যাবেন, মশাই? দাঁড়ান দেখি এখন মিসেস সামতানি অ্যান্ড পার্টি কোথায় আছেন।"

গণেশ সরকার এবার টেলিফোনে লাসকাটা ঘর চেয়ে বসলেন।

"হ্যালো, হ্যালো, ইন্দুবাবু—আমার ওই কেসটা!"

ইন্দুবাবু ওদিক থেকে বকুনি লাগালেন গণেশ সরকারকে। "হ্যাঁ মশাই, আপনারা পুলিসের লোকরা তো দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করতে পারেন। আপনারা কী বলে মিস্টার ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে ফার্স্ট রিপোর্টে ভিখিরি বলে ডেসক্রাইব করেছিলেন? আমি তো মশাই, পরে ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাজ্জব। ঈশ্বরের ফ্রেন্ডস্ অ্যান্ড রিলেটিভসরা যা ফুল সঙ্গে করে এনেছিল তা দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। খাটখানা..." এই বলে ইন্দুবাবু একটু ঢোক গিললেন।

"খাটের আবার কী হলো? কথা আটকালো কেন?" এদিক থেকে প্রশ্ন করলেন গণেশ সরকার।

ইন্দুবাবু উত্তর দিলেন, "মড়ার খাট না, মশাই—এমন খাট যে ইজিলি ফুলশয্যায় পাঠিয়ে দেওয়া যায়!"

ইন্দুবাবুর সঙ্গে আরও কথাবার্তা হলো গণেশ সরকারের। তিনি জানালেন, "আপনার জানা-শোনা পার্টি, আপনার চিঠি নিয়ে এসেছে, তাই যথাসাধ্য কো-অপারেশন করেছি। এবার আপনি ওই হাসির ছবিটা তাড়াতাড়ি ক্রি-পাশে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

টেলিফোন নামিয়ে গণেশ সরকার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর আমাকে বললেন, "কোথায় যাবেন মশাই? ডেডবডি দেড় ঘণ্টা আগে ওঁরা ডেলিভারি পেয়েছেন। তারপর ট্রাকে করে ওঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। আপনি যদি চান তা হলে কোন্ শ্মশানে ও'রা গিয়েছেন তাও দু' একটা জায়গায় ফোন করে জেনে দিতে পারি।"

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁকে আবার টেলিফোন করার হাঙ্গামা থেকে অব্যাহতি দিলাম। গণেশ সরকারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে সেদিন আবার কলকাতার রাজপথে নেমে এসেছিলাম।

ঈশ্বর আমার পরিচিত আপনজন নয়, কিন্তু তার মৃতদেহকে কেন্দ্র করে আমি কুসুম সামতানির এক নতুন রূপ আবিষ্কার করেছি এবং গণেশ সরকারের খুব কাছে চলে এসেছি।

এই মুহূর্তে আমি ঈশ্বরকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। মানসচক্ষে

আমি বহ্নিমান চিতা দেখতে পাচ্ছি, যার অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শোক-সন্তপ্ত কুসুম সামতানি।

এখন অন্ধকার নেমেছে। অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে থ্যাকারে ম্যানসনের চারদিকে নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে। উদগ্রীব রিকশওয়ালারা বারংবার ঘণ্টি বাজিয়ে ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের অপরিচিত পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

এইসব আহ্বান উপেক্ষা করে নিজের মনে বেশী দূর এগিয়ে যাবারও উপায় নেই। ঘণ্টার আওয়াজ আরও বেড়ে যায় এবং দু একজন প্রতিনিধি একেবারে ঘাড়ের কাছে এসে সমান তালে পথ হাঁটতে শুরু করে।

অন্ধকারের এই গাইড আজ সন্ধ্যায় শ্মশানযাত্রীকেও রেহাই দিল না। নিজস্ব ভঙ্গীতে চাপা গলায় ডাকলো, "টপ কিলাশ চিজ স্যর—পাঞ্জাবি, ম্যাড্রাসি, বেঙ্গলী কলেজ গার্ল!"

প্রত্যুত্তর না-পেয়েও হাল ছেড়ে দেয় না গাইড। এবার সে আরও কাছে সরে এসে বললো, "থ্যাকারে ম্যানসন স্যর।"

নিজের বাড়িরই নাম শুনে আমার মেজাজটা একটু তিক্ত হয়ে উঠলো। এ-বিষয়ে ভাবনানি ম্যানসনের যথেষ্ট বদনাম আছে ; কিন্তু আমাদের থ্যাকারে ম্যানসনও যে সম্প্রতি কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে তা আমার জানা ছিল না।

শুধু শুধু মনটা বিগড়ে গেল। এই বদনামের একটা বিহিত না করা পর্যন্ত আমার মেজাজ শান্ত হবে না। এই সব অপ্রীতিকর খবর থ্যাকারে ম্যানসনের মালিক বিলাসিনী দেবী অথবা তাঁর কন্যা পমার কানে গেলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। গণপতিবাবুও বা কী ভাববেন? এতো কষ্টের পর একটা চাকরি পেয়েও আমি তাঁর মুখরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না।

রাতের অপরিচিত গাইড এখনও হাল ছেড়ে দেয়নি। থ্যকারে ম্যানসনে আমি উৎসাহী নই আন্দাজ করে সে এবার জিজ্ঞেস করলো, "লেডিজ হোস্টেল হুজুর?"

পর পর দু'দিন রাস্তার দালালের মুখে এই সম্ভ্রান্ত মহিলা প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম। আমার দুশ্চিন্তার আরও কারণ এই মহিলা হোস্টেলে আমাদের দু'-একজন পরিচিতা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। তাঁদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে ভেবে আমার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল।

আমি নিজের মনেই ফুটপাত ধরে হেঁটে চলেছি। কিন্তু রাতের গাইড এখনও জোঁকের মতো আমার পিছনে লেগে রয়েছে।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার একটা সহজ উপায় মাথায় এসে গেল। আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "মদনা কোথায়?"

মদনার নামে ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। অনুপস্থিত মদনার উদ্দেশে একটি সশ্রদ্ধ সেলাম জানিয়ে লোকটা বললো, "আপনি মদনবাবুর খদ্দের হুজুর? তা হলে তো খুবই ভাল হলো। আমি মদনবাবুর অ্যাসিটেণ্ট। আমার নাম কেষ্ট।"

কেষ্ট লোকটা এখনও বেশ সরল রয়েছে মদনার রেফারেন্স পেয়ে সে বললো, "আমি নতুন কাজে নেমেছি—সমস্ত পার্টির সঙ্গে এখনও জানা-শোনা হয় নি। কিছু মনে করবেন না স্যর।"

নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে কেষ্টকে বললাম, "মদনবাবু আমার ফ্রেন্ড।"

'ফ্রেন্ড' কথাটা শুনে কেষ্ট একেবারে গলে গেল। আর একটা সেলাম ঠুকে বললো, "আপনি আসছেন জানলে, মদনবাবু নিশ্চয় আজ হাজির থাকতেন। উনি একটু সিনেমায় গিয়েছেন—মাসের শেষ তো, এখানে তেমন 'প্যাসিঞ্জার' নেই।"

আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে কেষ্ট বলে ফেললো, "আমি, হুজুর রাস্তায় জুতো বুরুশ করি। খেটে খেতে চাই—এ-লাইনে কাজ করছি জানতে পারলে আমার বাবা পিঠের চামড়া তুলে ফেলবে। কিন্তু হাল্লা-পুলিস এসে আমার পালিস-বাক্স নিয়ে চলে গেছে। দু'মাসের মধ্যে তিনবার বাক্স চলে গেল, হুজুর। এখন খাবো কী স্যর? মদনবাবু দয়া করে কাজে লাগিয়ে দিলেন। তা আপনি এখন কোথায় যাবেন বলুন। নিজের দুঃখু ভুলতে এসে আমার দুঃখুর কথা শুধু-শুধু শুনবেন কেন স্যর?"

"আমার দুঃখের কথা তুমি জানলে কী করে?" কেষ্টকে প্রশ্ন না-করে থাকতে পারলাম না আমি।

কেষ্ট বললো, "নিশ্চয় কোনো দুঃখু আছে, হুজুর। না-হলে ঘরবাড়ি ছেড়ে এই ভরসন্ধ্যে বেলায় কেন এ-পাড়ায় আসবেন?"

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কী দুঃখ কেষ্ট?"

"আমার দুঃখ ওই একটাই, হুজুর। আমার পালিশের বাক্স পুলিশে নিয়ে চলে গেল। এখন মদনবাবুর এই কাজ করে খোরাকি ছাড়াও আমাকে বারো টাকা তুলতে হবে তবে আবার একটা বাক্স হবে।"

"বারো টাকায় বাক্স হয়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"নতুন তৈরি করে ভাল পালিশ দিয়ে সাজাতে হলে আরও অনেক খরচ। সিপাইজীরা বারো টাকায় পুরনো বাক্স বিক্রি করেন।"

এবার আমি থ্যাকারে ম্যানসনের খবরাখবর সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। জানতে চাইলাম, কত নম্বর ঘরের সঙ্গে কেষ্টর কাজকারবার। একটু দ্বিধা করলো কেষ্ট, কিন্তু মদনবাবুর বন্ধুর কাছে কিছুই চেপে রাখলো না শেষ পর্যন্ত। কেষ্ট বললো, "বাইশ নম্বর ঘর, হুজুর।"

"আজ আমি অন্য কাজে যাচ্ছি। মদনবাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।" এই বলে আমি কেষ্টকে বিদায় করলাম এবং আমার নামটাও জানিয়ে দিলাম। কেষ্ট এখনও সত্যিই অনভিজ্ঞ। কারণ সে থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজারের নাম শোনেনি।

হাঁটতে-হাঁটতে থ্যাকারে ম্যানসনের গেট পেরিয়ে আমার দৃষ্টি প্রথমেই বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে চলে গেল। গেটের ভিতরে ঢুকে ড্রাইভ-ওয়ে থেকে বাইশ নম্বরের বিরাট জানালাটা বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। জালে ঢাকা ব্যালকনিতে একটা আলো জ্বলছে। এবং সবচেয়ে যা আশ্চর্য সত্যিই এক সুন্দরী মহিলা সেখানে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

ড্রাইভ-ওয়ে থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে দোতলার বাইশ নম্বর জানলার 'শো কেসের' দিকে আমি দ্বিতীয়বার সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। পাশাপাশি আরও কয়েকটা ফ্ল্যাটে সমান-সাইজের জানলা রয়েছে। কিন্তু একমাত্র বাইশ নম্বর ছাড়া আর কোথাও আলো জ্বলছে না। বাতিটা অন্তত দেড়শ পাওয়ারের হবে, এবং সেই আলোতে বাইশ নম্বরের সুবেশিনী সুন্দরী

বেশ রহস্যময়ী হয়ে উঠেছেন।

বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে মিস্টার খোসলার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হয়েছে। বরদাপ্রসন্নবাবু এঁকে রেগুলার পে-মাস্টার বলেই মার্কা করে গিয়েছেন। দু'এক বারের তাগাদাতেই মিস্টার খোসলা ভাড়া মিটিয়ে দেন।

আপিস ঘরে ফিরে এসেই সহদেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুনিয়ার লোকের হাঁড়ির খবর রাখে সহদেব। ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে, বাইশ নম্বর ঘরের মিস্টার খোসলা সম্বন্ধে কোনো খবর রাখিস?"

সহদেব চটপট জবাব দিল, "খুব রাখি। এক সময় উনি আমার বড় খরিদ্দার ছিলেন। মেমসায়েব প্রায়ই কুঁড়েমি করে রাঁধতেন না, আমাকে পরোটা মাংসের অর্ডার দিতেন। নজর খুব উঁচু ছিল, এক আধ টাকা নিয়ে কখনও টানাটানি করতেন না।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মাথা চুলকে সহদেব বললো, "তারপর যা-হয়। তখন বোধ হয় বিজনেস ভাল ছিল খোসলা সায়েবের। ক্রমশ খরচ কমে গেল—পরোটা মাংস তো দূরের কথা, পাঞ্জাবি সায়েবের বাঙালী মেমসায়েব ডাল রুটির অর্ডারও বন্ধ করে দিলেন। শুনি ব্যবসা-পত্তর খারাপ। একটা হোল-টাইম ঝি ছিল সেটাও বিদেয় হলো। তাকে মেমসায়েব বন্ধুর বাড়ি না কোথায় বিদেয় করলেন। তাতে আমাদের আর কী! শুধু রামসিংহাসনজী একবার খোঁজখবর করে-ছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন কেন চলে গেল?"

"রামসিংহাসনজীর তাতে কী আগ্রহ?" আমি প্রশ্ন করি।

সহদেব বললো, "সে কথা এখন থাক, স্যর। বাইশ নম্বর মেমসায়েবের জন্যে দুঃখ হয়। ক'দিন তো খোসলা সায়েবকে দেখতেও পাই না। কোথায় থাকেন, কী করেন, কে জানে! আমি স্যর চাই যে এ-বাড়ির সবার খুব উন্নতি হোক।"

সহদেবের এই উদার্য ও মহানুভবতার কারণ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু সহদেব নিজেই তার ব্যাখ্যা করে বললো, "সবার ভাল হলেই আমার ভাল. স্যর। লোকের যত ভাল হবে, আমি ততো স্পেশাল খাবারের অর্ডার পাবো।"

সহদেব বিদায় নেবার ঘণ্টাখানেক পরেই শ্রীমান মদনা হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকলো। সিমেনা হল থেকে বেরোন মাত্রই দূত মারফৎ জরুরী খবর সে পেয়ে গিয়েছে। এক মিনিট সময় অপচয় না-করেই মদনা নিজেই ছুটে এসেছে আমার কাছে।

উত্তেজনায় দুটো হাতের চেটো ঘষতে-ঘষতে মদনা আমার দিকে তাকালো। আমিও মুখ না খুলে মদনার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

মদনা এবার কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কিছু যদি মনে না করেন, স্যর, আজ কী আপনি ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীট ধরে হেঁটে এসেছেন?"

আমার 'হ্যাঁ' উত্তর পাওয়া মাত্রই মদনা কাল্পনিক কোনো ব্যক্তির ওপর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।

"আমি যা ভয় পেয়েছি তাই!" চাপা রাগে গর্জন করে উঠলো মদনা। "আপনার নাম শোনা মাত্র, কেষ্টাকে আমি আড়ং-ধোলাই দিয়েছি, স্যর।

ব্যাটাচ্ছেলে, তুমি এই দালালি লাইনে রয়েছো, অথচ তোমার 'হস্যি-দীর্ঘ' জ্ঞান নেই। টায়ার-কা-বাচ্চা, তুমি লোক চেনো না। আমার মালিকের কাছে খাপ খুলেছো!"

মদনার ভাব-গতিক আমি এখনও ঠিক ধরতে পারছি না। মদনা এবার আমার পা-জড়িয়ে ধরে বললো, "মা কালীর দিব্যি বলছি, আর কখনও আপনার এই অসম্মান হবে না। আমি একদিন সিনেমা গিয়েছি, আর ঠিক সেই সময় কেষ্টা কেস গুবলেট করে দিয়েছে। আমি স্যর আন্দাজ করেই এমন পিটিয়েছি যে হাড়ের ব্যথা সারতে সাত দিন লেগে যাবে।"

মদনা এরপর কেষ্টাকে আপিস ঘরে উপস্থিত করবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। উদ্দেশ্যঃ "আপনার পা-জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাক। আমি ততক্ষণ ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ করে লাথি লাগাই!"

অনেক কষ্টে মদনাকে নিবৃত্ত করা গেল। মদনার ভাবগতিক মোটেই ভাল নয়, ক্রমশই সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও ওর ভাবভঙ্গীতে এমন এক সরলতা আছে যার জন্যে ওর উপর পুরোপুরি বিরক্ত হতে পারি না।

মদনাকে গম্ভীরভাবে মনে করিয়ে দিলাম, "তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা ছিল। কিন্তু তুমি ক্রমশই খারাপ পথে এগিয়ে যাচ্ছ, মদনা।"

মদনা বেচারা ছোটছেলের মতো সমস্ত অপরাধ নতমস্তকে স্বীকার করে নিল। মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, "আমি স্যর মতি শীল স্ট্রীটে একটা দোকান নেবার চেষ্টা করছি। ওটা যদি পেয়ে যাই, কোন শালা এই হাঙ্গামার লাইনে থাকে।"

"মদনা", গম্ভীর নির্লিপ্ত কণ্ঠে এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের মিস্টার খোসলাকে চেনো তুমি?"

"খুব চিনি, স্যর। এক সময় খুব রমরমা ছিল। এখন বিজনেসের খুব খারাপ অবস্থা। মাল সাপ্লাই করতে গিয়ে কোথায় অনেকগুলো টাকা আটকে গিয়েছে।"

"মিস্টার খোসলা এখন কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মদনা বললো, "আপনাদের রামসিংহাসন যখন বাকি ভাড়ার তাগাদা করতে যায়, তখন মেমসায়েব বলেন, খোসলা সায়েব ট্যুরে গিয়েছেন। কিন্তু সায়েব ট্যুরে যাননি। এই কলকাতা শহরেই আছেন, পাওনাদারদের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এটা, স্যর, রামসিংহাসনজীকে বলবেন না।"

মদনাকে আরও একটু চাপ দিতে প্রকাশ পেলো, খোসলার বাঙালী বউ বেচারার অবস্থা কাহিল। "সারাদিন পাওনাদারদের হাঙ্গামা সামলাতে হচ্ছে। ঘণ্টায় তিন চারবার কলিংবেল বাজছে এবং ওঁকে দরজা খুলে উল্টোসিধে কথা বলতে হচ্ছে—খোসলা সায়েব কলকাতার বাইরে টাকার তাগাদায় গিয়েছেন, এই ক'দিনের মধ্যে ফিরলেন বলে।"

মদনা এবার জিভ বার করে বললো, "আর কেউ না-জানুক, আমি জানি খোসলা সায়েব লুকিয়ে-লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন ; কখনও কখনও গা-ঢাকা দিয়ে রাত্তিরে বউয়ের সঙ্গে দেখা করে যান। পয়সা-কড়ির খুব টানাটানি।"

আমি আরও গম্ভীর হয়ে উঠলাম। মদনা এবং আমার মধ্যে এবার একটু দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাই আমি। "মদনা।"

"বলুন স্যর।" মদনা বুঝতে পারছে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে।

মুখের বিরক্তভাব মুছে দেবার চেষ্টা না-করেই জানতে চাইলাম, "১১

নম্বর ঘরের মিসেস ডরোথি ওয়াটের কথা মনে পড়ে? সেখানে তুমি কী করেছিলে মনে আছে?"

বিব্রত মদনা কোনো উত্তর না-দিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলো।"

আমি মনে করিয়ে দিলাম, "তুমি তখন আমাকে কথা দিয়েছিলে, বাইরে যা-করো, এই থ্যাকারে ম্যানসনে তুমি আমার হাঙ্গামা বাড়াবে না।"

"আমি তো স্যর, আপনার অবাধ্য হইনি।"

মদনার উত্তর শুনে আমি দপ্ করে জ্বলে উঠলাম। "মদনা, তুমি হয়তো ভাবছো, বাইশ নম্বরের আমি সব খবর পাইনি।"

মদনা আপত্তি তুলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমার মুখে বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের উল্লেখ শুনেই তার মুখ শুকনো হয়ে গেল।

"বাইশ নম্বর। আপনাকে কেউ কিছু বলেছে নাকি স্যর?" মদনা এবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

কেষ্টর নামটা ইচ্ছে করেই চেপে গিয়ে বললাম, "কোথা থেকে শুনেছি তা তোমাকে আমি বলতে বাধ্য নই, মদনা। তাছাড়া আজ নিজের চোখেও কিছুটা দেখেছি আমি।"

নিজের চোখের কথা শুনে মদনা বেশ ভড়কে গেল এবং বোধ হয় বাইশ নম্বরের ব্যাপারে আমি কতটুকু জানি তা বাজিয়ে দেখবার জন্যে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কী দেখেছেন, স্যর?"

বাইশ নম্বরের বারান্দার দেড়শ পাওয়ারের বাতি এবং সন্ধ্যায় সুবেশিনী মিসেস খোসলার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মদনার ওপর রাগটা আমার বেশ বেড়ে গেল। তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মদনাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বার করে দিলাম।

আপিস ঘরেও আমি আর অপেক্ষা করিনি। নিজের শোবার ঘরে যাবার পথে দেখলাম বাইশ নম্বরের বাতি নিভলো এবং মিসেস খোসলা ভিতরে চলে গেলেন।

দেখলাম, মদনা দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ; কিন্তু আমার উগ্র মূর্তি দেখে সে আর কাছে আসতে সাহস করলো না।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমার দৃষ্টি আবার বাইশ নম্বরের জানালায় চলে গেল। দেড়শ পাওয়ারের বাতি সেখানে আবার জ্বলে উঠেছে এবং মিসেস কিরণ খোসলা অন্য সাজে নিজের ঊর্ধাঙ্গ যথাসম্ভব কুসুমিত ও বিকশিত করে প্লাস্টিক পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার সমস্ত রাগটা এবার মদনার ওপর গিয়ে পড়লো। মদনা অ্যান্ড কোংকে একটু শায়েস্তা করার প্রয়োজন, না হলে এ-বাড়ির ভাড়াটে এবং ভিজিটর কারও শান্তি থাকবে না।

ন'টা বাজার একটু আগে আজও আমি আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় আজও বাইশ নম্বরের আলো নিভলো এবং কিরণ খোসলা ভিতরে ঢুকে গেলেন।

তেলকালিবাবু সেই সময় হাফপ্যান্ট পরে তেলকালিমাখা অবস্থায় বাইরে থেকে ফিরছিলেন। বললেন, "এই যে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভাল হলো। না হলে আমি নিজেই দেখা করতাম।"

তেলকালিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার কোনো সময়েই খারাপ লাগে না। তেলকালিবাবু এবার বলে ফেললেন, "মনে হচ্ছে, বাইশ নম্বর

নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন?"

"আরও একটা হাঙ্গামা বাড়লো বলে মনে হচ্ছে", আমি উত্তর দিলাম।

তেলকালিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মদনাকে আপনি খুব বকুনি লাগিয়েছেন বুঝি? ছোকরা আপনার কাছে আসবার সাহস না পেয়ে আমাকে এসে ধরেছে। বাধ্য হয়ে আমাকেও একটু খোঁজ-খবর করতে হলো। মিসেস খোসলাকে আমি চিনি—ওঁর পাখা সেরেছি। তাই উনিও এইসব কাজে নেমেছেন গুজব শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

তেলকালিবাবু বললেন, "কিরণ খোসলার এখন খুব অভাব। কিছু টাকা না-হলে ওঁর চলছে না, এটাও সত্যি। সুযোগ বুঝে, দু-একটা দুষ্টু লোক এসে টোপ ফেলেছিল। আমাদের জেঠমালানিও শুনছি এর মধ্যে আছেন। গৃহ এবং গৃহস্বামী একসঙ্গে লিজ পেলে ওঁর তো খুব সুবিধে, বুঝতেই পারছেন। কিন্তু কিরণ খোসলা অত সহজে তলিয়ে যেতে রাজী নয়। কোনো উপায় না পেয়ে বেচারা মিসেস খোসলা শেষপর্যন্ত আমাদের মদনার শরণাপন্ন হয়। দুনিয়াতে আর লোক পেলো না কিরণ খোসলা। মদনার নিজের তো এই অবস্থা, সে আবার কী করতে পারে?"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, "অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মদনাই এখন কিরণ খোসলাকে রক্ষে করে যাচ্ছে। কিরণ খোসলা এখনও তলিয়ে যায়নি, স্যর।"

"মানে?" তেলকালিবাবুর কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

তেলকালিবাবু বললেন, "মিসেস খোসলাকে কে নাকি বলেছিল, অনেক টাকাকড়ির দরকার থাকলে লাইনে নেমে পড়াই ভাল। কিন্তু কিরণ বলেছিল, অনেক টাকাকড়ির দরকার নেই, কোনোরকমে পেটটা চালাতে পারলেই যথেষ্ট, তাও কিছুদিনের জন্যে। মিস্টার খোসলার এরকম দুর্দিন চিরকাল থাকবে না।"

তেলকালিবাবু বললেন, "তারপরেই তো মদনা ব্যবস্থা করে দিল। বললে, দিদিমণি তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, তুমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে, প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলায় শুধু আলো জেলে ঘণ্টা দুয়েক জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা তোমাকে দশ টাকা করে রোজ দিয়ে যাবো।"

তেলকালিবাবু বললেন, "যাই বলুন, মদনা জেণ্টলম্যান। কথার খেলাপ করেনি। ওর দলের কাছ থেকে জোগাড় করে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। স্রেফ ওর দয়াতেই, মিসেস খোসলার দেহটা শিয়াল-কুকুরের হাত থেকে রক্ষে পেয়ে যাচ্ছে!"

ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন পরিষ্কার হচ্ছে না। "কী ব্যাপার, মশাই?" আমি তেলকালিবাবুকে জিজ্ঞেস করি।

"ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যেই মদনা আপনার কাছে আসছিল। কিন্তু আপনার রণংদেহি মূর্তি দেখে সাহস না-পেয়ে আমাকে পাকড়াও করেছে।"

তেলকালিবাবু আবার শুরু করলেন, "সংক্ষেপে বলতে গেলে, টোপ। এ-পাড়ার কিছু দালাল বোকা-সোকা 'প্যাসেঞ্জার' ঠকিয়ে খায়। তারা এক মেয়ের ছবি দেখিয়ে অন্য মেয়ে সাপ্লাই করে। কখনও, কিছুই করে না, কয়েকটা টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে প্যাসেঞ্জারকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে সটকে পড়ে।"

তেলকালিবাবু বললেন, "এই কাজ ভালভাবে চালানোর জন্যে একটি মানানসই টোপ দরকার। যাকে দূর থেকে দেখানো যায়। ডোল দশ টাকার পরিবর্তে বেচারা কিরণ খোসলা এখন সেই কাজটি করছেন।"

আমি কোনো উত্তর দিতে পারছি না। তেলকালিবাবু বললেন, "মদনা ছেলেটিকে আমি দোষ দিই না। সে সোজাসুজি আমাকে বললো, 'আমি চোরজোচ্চোর মানুষ। ভদ্দরলোকের ঘরের মেয়েমানুষকে বাঁচাবার জন্যে আমি কী সাহায্য করতে পারি বলুন? আমার মুরোদ কোথায়?' কিন্তু যে-লোক এ-লাইনে নিজের ইচ্ছেয় নামতে চায় না, টেনে হিঁচড়ে তার সব্বোনাশ করবো কেন?"

থ্যাকারে ম্যানসনের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে রহস্যময়ী এই নারীর আর এক আশ্চর্য দিক আমার চোখের সামনে খুলে গেল। নিজের চোখে না-দেখলে, নিজের কানে না-শুনলে এসব আমি বিশ্বাসই করতাম না।

আমি শেষবারের মতো মুখ খুললাম। "এই টোপের কথাটা কিরণ খোসলা জানেন?"

"কেন জানবেন না? ওঁর অবশ্য কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সাজগোজ করে দোতলার হাফ ব্যালকনির জানলার কাছে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। ওঁকে দেখিয়ে কোন দালাল কাকে কী বলছে তা ওঁর জানবার দরকার নেই।"

আমি কী বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

"মিসেস খোসলাকে আমি দোষ দিই না। শেয়াল-কুকুরের হাত থেকে দেহ বাঁচাবার জন্যে মেয়েমানুষরা যাই করুক তাতে অন্যায় হয় না।"—এই বলে তেলকালিবাবু থ্যাকারে ম্যানসনের ড্রাইভ-ওয়ে ধরে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

একের পর এক বিচিত্র সব চরিত্রের আনাগোনায় থ্যাকারে ম্যানসনে আমার সামান্য কর্মজীবন ক্রমশই যেন অসামান্য হয়ে উঠছে। সাধারণ একজন ম্যানসন ম্যানেজারের রুটিন কর্মধারায় যে এমন সব নাটক এত সহজে উপস্থিত হতে পারে, তা এ-পাড়ায় পদার্পণের আগে কে কল্পনা করেছিল?

গণপতিবাবু এবং সৃষ্টিকর্তা দু'জনের উদ্দেশ্যে আজও আমি গভীর কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করি। গণপতিবাবুর আশীর্বাদে আমি শুধু চাকরি পাইনি, অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত এক জীবনযাত্রাকে অনেক কাছ থেকে নিজের চোখে দেখার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছি। ডরোথি ওয়াট, এডিথ, সুলেখা সেন, পপি বিশোয়াস, কুসুম সামতানি, এমন কি কিরণ খোসলার বর্তমান ও অতীত একের পর এক উত্তাল তরঙ্গের মতো আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনের তীরভূমিতে আছড়ে পড়ছে। নিজেরই অজ্ঞাতে বিস্মিত ও অভিভূত আমি সময়ের পরিমাপ ভুলে গিয়েছি। আমি যে এখানে সামান্য কিছুদিনের আগন্তুক মাত্র তা আর খেয়াল নেই; জন্মাবধি আমি যেন এই থ্যাকারে ম্যানসনেই বসবাস করছি; থ্যাকারে ম্যানসনের আগে আমার জীবনে যেন কোনো অধ্যায় ছিল না।

আজও কলকাতার রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি এক এক সময় অবাক হয়ে যাই। এক একটা ম্যানসন বাড়ির দিকে তাকালেই প্রতিটি ফ্ল্যাটের কথা মনে পড়ে এবং তখন বিচিত্র এক বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে আসে। যেখানেই মানুষ, সেখানেই নাটক। জীবনদেবতা রক্ত-মাংসের চরিত্র দিয়ে

প্রতিটি ফ্ল্যাটে দিনের পর দিন নিজের খেয়ালে একের পর এক দৃশ্য উপস্থাপিত করে চলেছেন। অলিখিত সেই সব নাটক যদি কোনো সংগ্রহ-শালায় সঞ্চিত হয়ে থাকতো, তাহলে মানব-চরিত্রের আরও কত আশ্চর্য দিক কত সহজে আমাদের চোখের সামনে উম্ঘাটিত হতো। ফ্ল্যাটবন্দী এই-সব মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার পূর্ণ বিবরণ ছাড়া একালের নাগরিক মানুষের ইতিহাস সম্পূর্ণ কিনা সে-বিষয়েও আমার মনে ইদানীং সন্দেহের সূচনা হয়েছে।

কিন্তু এ-সব ব্যাপারে অনেকক্ষণ ধরে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের সময় কোথায়? জরাজীর্ণ ম্যানসন বাড়ির অতি প্রাচীন সমস্যাগুলো একদল নূতন পুরাতন ভাড়াটিয়ার স্বেচ্ছাসহযোগিতায় জটীল থেকে জটীলতর হয়ে উঠে ক্ষমতাহীন ম্যানেজারের জীবনকে সর্বদা কর্মব্যস্ত ও সংকটময় করে রেখেছে। আলো থাকে তো জল নেই, জল আসে তো পাম্প বিকল, পাম্প কর্মক্ষম হয় তো ছাদের মরচে-পড়া ট্যাঙ্কের দেহ বিদীর্ণ করে জল বেরিয়ে আসতে থাকে এবং সেই সংকটক্ষণে তেলকালিবাবুকে হাতের গোড়ায় পেলেও কল-কালির খোঁজখবর পাওয়া যায় না। বিশ্বসংসার তোলপাড় করে কলকালিকে যখন ফিরিয়ে আনা হয়, তখন ট্যাঙ্কে জল নেই। কমন-প্যাসেজের সঞ্চিত ময়লা নিয়ে আইন বিশারদ কোনো ভাড়াটিয়া কোর্ট-কাছারির ভয় দেখাতে আসেন, কারণ পৃথিবীর সমস্ত কমন-প্যাসেজকে তাজমহল হোটেলের মতো চকচকে ঝকঝকে রাখার আইনগত দায়িত্ব নাকি বাড়ির মালিকের এবং তাঁর কর্মচারীরাও কর্তব্যে অবহেলার জন্য নাকি আইনের আওতায় আসতে পারেন।

আইনের এই বিশেষ দিক সম্বন্ধে আমি তেমন অবহিত ছিলাম না। এ-বিষয়ে প্রথম যিনি সাবধান করে দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন, তিনি আমার তেমন পরিচিত নন। নিখোঁজ কলকালির খোঁজখবর করার জন্যে তখন আমি অফিস ঘরে খুব ব্যস্ত রয়েছি, ঠিক সেই সময় দশাসই এক গৌরকান্তি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্তভাবে আমাকে থ্যাকারে ম্যানসনের কমন-প্যাসেজের একাংশ পরিদর্শনের জন্যে জরুরি আহ্বান জানালেন। কলকালিবাবুকে খুঁজে বার করাটা যে সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে আরও জরুরি তা শুনে ভদ্রলোক আমার ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

ভদ্রলোক এবার ইংরিজীতে নিবেদন করলেন, এই ম্যানসন বসবাসকারীদের নিরাপত্তার জন্যে বাড়ির কমন-প্যাসেজ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টাও কম জরুরি নয়।

ভদ্রলোক এবার সৌজন্যের সীমানা প্রায় লঙ্ঘন করে জানালেন, কমন-প্যাসেজের একাংশ অস্বাস্থ্যকর আবর্জনায় বোঝাই হয়ে আছে।

উত্তরে আমি জানাতে বাধ্য হলাম ঐসব নোংরা শ্রীমতী বিলাসিনী দেবী অথবা তাঁর ম্যানেজার নিশ্চয় কমন-প্যাসেজে ছড়িয়ে আসেন নি।

ভদ্রলোকের সঙ্গী চটপট উত্তর দিলেন, কমন-প্যাসেজ পরিষ্কার করার দায়িত্ব যখন বাড়িওয়ালার তখন কে ময়লা ফেলেছে সে-নিয়ে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী বন্ধুর মাথাব্যথার কোনো প্রয়োজন নেই।

মেজাজটা আমার তেমন ঠাণ্ডা ছিল না। বললাম, কমন-প্যাসেজ অপরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিযোগিতায় এই শহরের ভাড়াটিয়ারা অবশ্যই বিশ্ববিজয়ী হতে

পারেন। সুতরাং এ-বিষয়ে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো অর্থ নেই, কারণ পরিচ্ছন্ন কমন-প্যাসেজ পুনরায় অপরিচ্ছন্ন হতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে।

ভদ্রলোকের সংগী তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলেন, তিনি ভারতের উচ্চতম ধর্মাধিকরণের অ্যাডভোকেট। গতকাল তিনি বন্ধুর সংগে কয়েকদিন বসবাসের জন্য কলকাতায় এসেছেন। তিনি আমাকে শান্ত অথচ আইনগত পন্থায় জানিয়ে দিতে চান যে কমন-প্যাসেজ পরিষ্কার রাখার কাজে ত্রুটি ঘটলে বাড়িওয়ালা আইনের খপ্পরে পড়তে পারেন।

আইনের রক্তচক্ষু আমাকে মুহূর্তের মধ্যে বেপরোয়া করে তুললো। আমি জানতে চাইলাম, "আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?"

"আমি বিশ নম্বরের মিস্টার চোপরা", ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "এবং ইনি মিস্টার চৌধুরী, অ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট।"

যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেটকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলাম, "তাঁর বন্ধুর সংগে বাক্যালাপ করতে আমি বাধ্য নই। কারণ আমাদের হিসেব অনুযায়ী কুড়ি নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া মিসেস কুসুম সামতানি। এবং যতদূর জানি মিস্টার চোপরা তাঁর পেয়িং গেস্ট ছাড়া কিছু নয়।"

চৌধুরী অকস্মাৎ চুপসে গেলেন! বন্ধুর হয়ে আইনের খেলা দেখাতে গিয়ে তিনি যে বেকায়দায় পড়েছেন তা বুঝতে পেরে জানতে চাইলেন, আমি কোন সালে আইন পাস করেছি। আইন তো দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রিও আমার পকেটস্থ হয়নি শুনে ভদ্রলোক একটু হতাশ হলেন। বললেন, "কথায়-কথায় কলকাতায় আইনভংগ হয় বলে শুনেছি, কিন্তু অর্ডিনারি সিটিজেনরাও যে আইনের এতো মারপ্যাঁচ জানেন তা আমার জানা ছিল না।"

মিস্টার চোপরা ততক্ষণে আমার হাবভাবে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে তিনি আমাকে 'ম্যানেজার সাব' বলে সম্বোধন করলেন এবং জানালেন তিনি সদ্য এই থ্যাকারে ম্যানসনে পি জি হিসেবে এসেছেন—এখনও তিন রাত কাটেনি। কমন-প্যাসেজের ময়লায় তিনি এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি—কলকাতা যে এতো ডার্টি সিটি তা তাঁর জানা ছিল না।

আর বৃথা বাক্যব্যয় না-করে মদনার বাবাকে ডেকে কমন-প্যাসেজ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

পরের দিন যথাসময়ে কর্মচারী মহলে এবং কিছু ভাড়াটিয়ার মধ্যে যে রসাল গোপন খবরটি ছড়িয়ে পড়েছিল তা হলো, অ্যাডভোকেটের আইনের ভয়ে নতুন ভাড়াটের দরজার সামনের প্যাসেজ তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করিয়ে দেবার পথ পাননি থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন ম্যানেজার! এ-খবরের উৎসও যে স্বয়ং চোপরা সায়েব তাও আমার জানতে দেরি হয়নি।

এসব সামান্য ব্যাপারে উত্তপ্ত হয়ে ওঠবার কোনো আগ্রহ আমার নেই। কাজকর্মের অবসরে আমি ক্রমশ এ-বাড়ির ভাবনা-চিন্তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাই।

এই গুটিয়ে নেবার ব্যাপারে সম্প্রতি আমার একটু সুবিধে হয়েছে—

পুলিসের গণেশ সরকারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা ক্রমশই জমে উঠছে।

ডিউটির বাইরে প্লেন ড্রেসে গণেশ সরকার দু-একদিন আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। গণেশ সরকারকে আপ্যায়ন করবার মতো কোনো ব্যবস্থাই আমার নেই। তবু আপিস ঘরের বারোয়ারি ঔৎসুক্য থেকে রক্ষা করবার জন্যে গণেশ সরকারকে আমার নিরাভরণ শয়নকক্ষে সরিয়ে এনেছি। একটি তক্তপোশ ও একখানা হাতলভাঙা চেয়ার ছাড়া আমার ঘরে কোনো আসবাব নেই ; কিন্তু গণেশ সরকার ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাননি। হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে অর্ডিনারি কাপে চা খেতে-খেতে গণেশ সরকার নিজের আনন্দেই গল্পগুজব করেছেন।

আমি নিজে অবশ্য বেশ কুণ্ঠা বোধ করেছি এবং বিশিষ্ট অতিথির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। থ্যাকারে ম্যানসনের গরম গঙ্গাজল মার্কা চা সেবন করতে-করতে গণেশ সরকার আমাকে বকুনি লাগিয়েছেন। বলেছেন "ও-সব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাবেন না। ফার্নিচারের সঙ্গে গল্প করতে তো এখানে আসি না ; এখানে আসি আপনার সঙ্গে একটু সময় কাটাতে। আদর আপ্যায়নের জন্যে তো ভাবনানি ম্যানসন রয়েছে। ওখানে ম্যানেজারের ঘরে রবারের গদিতে বসলে বডিটা একফুট নিচে নেমে যায়। ঘরে ঠাণ্ডা কলও আছে। ম্যানেজার অতি চালু লোক, ঘরে গেলে কিছু না-জিজ্ঞাসা করেই হুইস্কি, জিন, ব্র্যাণ্ডি এবং বীয়ারের বোতল বার করে বসবে। সঙ্গে-সঙ্গে চার-পাঁচ রকম চাটও চলে আসবে।"

ভরত সিং চলে যাবার পরে ভাবনানি ম্যানসনের ম্যানেজার কে হয়েছে আমার জানা ছিল না। গণেশ সরকার বললেন, "ভরত সিং ছেড়েও ছাড়েনি ; দূর সম্পর্কের এক ভাগনেকে বসিয়ে গেছে ম্যানেজারের পোস্টে—দূর থেকে কলকাঠি নাড়ার সুবিধে হবে। পুলিস, কর্পোরেশন, টেলিফোন-এর লোকদের ঢালাও আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা ভরত সিং-এর আমল থেকে। সাধে কী আর ভবত সিং অ্যাণ্ড পার্টির সেভেন মার্ডারস পারডনড, অর্থাৎ সাত খুন মাপ!"

গণেশ সরকার বললেন, "ভাবনানি ম্যানসনে গেলে জামাই আদর হয়, কিন্তু 'রিল্যাকসেসন' হবে না। হুইস্কি হজম করতে-করতে আপনাকে ভাবতে হবে, ওঠবার সময় আজ ভরত সিংয়ের ভাগনে সুদে-আসলে হুইস্কির দাম তুলবার জন্যে কী স্পেশাল ফেভার চাইবে।"

হা-হা করে হাসতে-হাসতে গণেশ সরকার বললেন, "চান্স পেয়ে ছোকরা একদিন এমন সুবিধে চাইলো যে মনে হলো তখনই বমি করে ফেলি ; বলি, রইলো তোমার হুইস্কি, আমাকে এখন মানে-মানে যেতে দাও! তার থেকে আপনার এই ভাঙা চেয়ার এবং 'হট' গঙ্গা-ওয়াটার অনেক ভাল ; বাড়তি কোনো চিন্তা নেই।"

গণেশ সরকার লোকটি খুবই স্নেহপ্রবণ। পরের দিনই সিপাইজী মারফত আমাকে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিলেন। এবং আমি নির্দ্বিধায় সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

সন্ধ্যের একটু পরেই, খুচরো কাজকর্মের হাঙ্গামা সরিয়ে রেখে আমি থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। গণেশ সরকার সন্ধ্যের পরেই থানায় চলে আসতে বলেছিলেন। ওখান থেকে একসঙ্গে বাড়ি যাওয়া হবে।

আন্দাজ করেছিলাম, গণেশ সরকার আমার জন্যেই অপেক্ষা করবেন এবং

আমাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু সেখানেও যে একটি ছোটখাট নাটক এমনভাবে তৈরি হয়ে থাকবে তা আমার জানা ছিল না।

ডিউটি রুমে গণেশ সরকার নিজের টেবিলেই বসেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি সাদর অভ্যর্থনা করলেন। ডায়রিতে কী একটা লিখতে-লিখতে গণেশ সরকার বললেন, "আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক, মশাই। আপনি তো লোক খুন করতে পারেন!"

গণেশ সরকারের রসিকতার অর্থ বুঝতে পারছি না। গণেশ সরকার ডায়রি থেকে দৃষ্টি না-সরিয়েই বললেন, "পুলিসের কাছেও আপনি খবর চেপে গেছেন! ভাগ্যে গতকাল গণপতিবাবুর সঙ্গে কোর্টে দেখা হয়ে গেল।"

ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। গণেশ সরকার এবার মুখ তুললেন। "আপন যে ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েবের বাবু ছিলেন তা তো আমাকে কখনও বলেননি।"

নিজের অতীতের কোনো পরিচয় দেবার মতো সুযোগই গণেশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় আসেনি।

গণেশবাবু বললেন, "বারওয়েল সায়েবের স্মৃতি আমার কাছে অতি পবিত্র। সারাজীবনে অনেক মানুষ দেখলাম, কিন্তু অমন মানুষের দেখা আর পেলাম না।"

সত্যি অপূর্ব মানুষ ছিলেন এই নোয়েল বারওয়েল। ভালবেসে মানুষকে আপন করে নেবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর কথা যে কারও স্মৃতিতে আজও অমলিন হয়ে আছে তা আবিষ্কার করে আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো।

গণেশবাবু বললেন, "ওঁকে কী ভুলবার উপায় আছে? এই যে প্রতিদিন করে খাচ্ছি সে তো তাঁরই দয়ায়। ইস্ট-পাকিস্তানে যথাসর্বস্ব হারিয়ে ভিখিরির মতো এই কলকাতা শহরে চলে এসেছিলাম। থাকতাম হাইকোর্ট পাড়ার এক চায়ের দোকানে। তারপর. ওঁরই চেষ্টায় আমার এই পুলিসে চাকরি হলো। অনেক লোকের সঙ্গে ওঁর জানা-শোনা ছিল, আর সেই সব পরিচয় ভাঙিয়ে লোকের চাকরি যোগাড় করে দিতে তিনি একটুও দ্বিধা করতেন না। আর আজকাল দেখুন, বড় বড় লোক, বড় বড় পোস্টে বসে আছেন একবার মুখ খুললেই একটা সংসার বেঁচে যায়, কিন্তু কেউ চাকরির কথা বলবেন না, তাতে নাকি প্রেস্টিজ নষ্ট হয়ে যাবে।"

"চাকরির জন্যে কাউকে রেকমেন্ড করাটা আজকাল কেউ-কেউ আবার অন্যায় মনে করেন" নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দুঃখের সঙ্গে বলি।

"আরে অন্যায় কী! তোমার কথায় একটা লোকের যদি রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়, তা হলে তুমি মুখ খুলবে না?" দুঃখ করলেন গণেশ সরকার। তারপর নিজের মনেই বললেন, "বারওয়েল সায়েব প্রতি শনিবারে নিয়ম করে কয়েক ঘণ্টা বেকার ছেলেদের চাকরির জন্যে আপিসে-আপিসে উমেদারি করতেন। সাক্ষাৎ স্বর্গে গিয়েছেন ভদ্রলোক, আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি। এই সব লোককে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে ভগবানের দূত অর্ধেক পথ এগিয়ে এসে আকাশে ঘোরাঘুরি করে, বুঝলেন মশাই" মন্তব্য করলেন থানার এস আই. গণেশ সরকার।

ঘড়ির দিকে তাকালেন এস-আই গণেশ সরকার। তারপর বললেন, "আর ফিফটিন মিনিটস। তারপর পুলিসের বেল্ট কোমর থেকে খুলে আপনাকে

নিয়ে বেরিয়ে পড়বো।"

আমার কোনো তাড়াতাড়ি নেই। তবু গণেশ সরকার বললেন, "একটু আগেই চলে যেতে পারতাম ; কিন্তু আজ অন্য সবাই বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়ে পড়েছেন। থানা খালি করে বেরিয়ে যেতে সাহস হয় না। লাস্ট মোমেন্টে অনেক সময় কাজ এসে যায়।"

আমার হাতে ম্যাগাজিন দিয়ে লাগোয়া ঘরের একটি টেবিল দেখিয়ে দিলেন গণেশ সরকার। "আপনি ওখানে বসে বই পড়ুন, আমি ঝটপট টেবিল গুছিয়ে নিই।"

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়! যেখানে আমি বসেছি সেখান থেকে গণেশ সরকারের টেবিলটা পরিষ্কার দেখা যায়।

গণেশ সরকার ডিউটি থেকে উঠতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় দুই ভদ্রলোক একই সঙ্গে ওঁর সামনে হাজির হলেন।

থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন মানিক-জোড় নয়? দূর থেকে যতটা সন্দেহ ছিল তা ওঁদের কথাবার্তায় পরিষ্কার হলো। মিস্টার চৌধুরী এখানেও সগর্বে নিজেকে সুপ্রীমকোর্টের অ্যাডভোকেট বলে পরিচয় দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন উচ্চতম সরকারী মহলে তাঁর বিশেষ দহরম-মহরম আছে।

গণেশ সরকার তাঁদের বসতে বললেন। ভি-আই-পি স্টাইলে চেয়ারে বসে দিল্লির মিস্টার চৌধুরী গুরুগম্ভীর স্বরে মন্তব্য করলেন, "ক্যালকাটা সিটিতে যে ল' অ্যান্ড অর্ডার এমন অধঃপাতে গিয়েছে তা তাঁর জানা ছিল না।"

গণেশ সরকার বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, মিস্টার চৌধুরীর কী অভিযোগ? কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত না-করে অ্যাডভোকেট চৌধুরী মন্তব্য করলেন, "চোর বদমাস গুন্ডারা যে এই সিভিলাইজড্ শহরে এমনভাবে রাজত্ব করছে তা রেস্ট অব ইন্ডিয়ার শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা জানেন না!" মিস্টার চৌধুরীর ভাবটা এমন যে তিনি এখনই ওপর-মহলে যোগাযোগ করবেন।

গণেশ সরকারের অনুরোধে মিস্টার চৌধুরী এবার তাঁর অভিযোগ নিবেদন করলেন। আলোয়-আলোকিত কলকাতার কেন্দ্রস্থলে গুন্ডারা তাঁদের কাছ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা ছুরি দেখিয়ে কেড়ে নিয়েছে।

ঘটনাস্থলটি কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে, থ্যাকারে ম্যানসন কথাটি শুনে আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। থ্যাকারে ম্যানসনের ভিতরে এবং বাইরে বহুরকম সমস্যা আছে আমাদের, কিন্তু ছুরি দেখিয়ে ছিনতাইয়ের খবর এই প্রথম। চৌধুরীর কথায় আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল ; এই ম্যানসন বাড়িতে ভদ্রপরিবারের বসবাস যে ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠবে সে বিষয়ে আমার মনে আর কোনো সন্দেহই থাকছে না।

গণেশ সরকার ইতিমধ্যে প্রশ্ন করলেন, "ঠিক থ্যাকারে ম্যানসনের গেটের কাছেই আপনাদের ওপর হামলা হলো? আপনারা বাড়িতে ঢুকছিলেন না বেরুচ্ছিলেন?"

চৌধুরী এবং চোপরা এবার একই সঙ্গে বললেন, "তাঁরা কলকাতায় নতুন এসেছেন। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আলোয়-মোড়া রাতের কলকাতা দেখে ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট ধরে দুই বন্ধু ফিরছিলেন, সেই সময় হয়তো নটোরিয়াস লোকটি তাঁদের পিছনে লাগে। তারপর থ্যাকারে ম্যানসনের কাছে গিয়ে

রাস্তার অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুর্বৃত্তরা কাজ হাসিল করে।"

"সাড়ে তিনশ টাকা?" গণেশ সরকার আবার জিজ্ঞেস করলেন।

ওঁরা জোরের সঙ্গেই 'হ্যাঁ' বললেন। "কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে এ-আর এমন কি টাকা?"

ইতিমধ্যে আমার ঘরের কাছে কেষ্টকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আড়াল থেকে উঁকি মেরে কেষ্ট ঘরের ভিতরের ঘটনা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছে। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে কেষ্ট তাজ্জব। লম্বা স্যালুট লাগিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, "স্যর, আপনি এখানে? আপনার আবার কী কেস্ হলো?"

"নেমন্তন্ন খেতে," আমি বললাম।

কেষ্ট ভাবলো আমি রসিকতা করছি। সে বললো, "নেমন্তন্ন খাবার জায়গাই বটে।"

গণেশ সরকার ততক্ষণে জিজ্ঞেস করছেন, দুষ্টু লোকটাকে মিস্টার চৌধুরী অথবা চোপরা দেখতে পেয়েছেন কিনা।

সৌভাগ্যক্রমে লোকটার দৈহিক বর্ণনা দুজনেই অনেকখানি মনে রাখতে পেরেছেন। মুখে একটু দাড়ি এবং কপালের কাছে একটা 'আব'-এর কথা শুনেই মনে পড়লো, এমন একজন লোককে আমিও চিনি। কিন্তু তার নাম তো সুলেমান—আমাদের বাড়ির মধ্যেই রিকশা রাখে, কয়েকবার তার গাড়িতে চড়ে নিউ মার্কেটে গিয়েছি। অতি অমায়িক এবং শান্ত লোক এই সুলেমান। তার সঙ্গে অবশ্যই এই ঘটনার কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত গণেশ সরকার বললেন, "আপনাদের বক্তব্য এবং অভিযোগ এখনই লিখে দিন।"

অ্যাডভোকেট চৌধুরী ঘস্-ঘস্ করে অভ্যস্ত কলমে অভিযোগ লিখতে শুরু করলেন।

কেষ্ট ইতিমধ্যে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ভিতরের লোক দুটোকে দেখেছেন, স্যর?"

দুজনের বর্ণনা দিলাম। এবং সেই রিপোর্ট শুনে কেষ্টর ছটফটানি হঠাৎ বেড়ে উঠলো। আমাকে চাপা গলায় বললো, "আমরা স্যর শান্তিতে কাজকর্ম করতে চাই---আমরা চাই না কেউ পুলিস আনুক।"

গণেশ সরকার বোধ হয় আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। কিন্তু আমার পাশে শ্রীমান কেষ্টকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলেন। কেষ্ট এবার লম্বা স্যালুট ঠুকলো এবং সবিনয়ে জানালো, কর্তার অর্ডারে সে থানা পর্যন্ত চলে এসেছে।

বন্য ব্যাঘ্রের মতো এক থাবায় কেষ্টকে একটু দূরে সরিয়ে নিলেন গণেশ সরকার। চাপা গলায় গণেশ সরকার বকুনি লাগালেন, "ব্যাটাচ্ছেলে, তোরা এবার ছিনতাই আরম্ভ করলি। কিন্তু হতভাগা ওই সুলেমানটার কপালে যতক্ষণ আব রয়েছে ততক্ষণ ওকে আইডেণ্টিফাই করতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।"

কেষ্ট এবার চমকে উঠলো। "ছিনতাই? কোন্ মা কালীর দিব্যি ওইসব লাইনে আমরা নেই স্যর।"

গণেশ সরকার হুঙ্কার ছাড়লেন, "তা হলে?"

কেষ্ট এবার ইতস্তত করছে। গণেশ সরকার এবার ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং কথাবার্তা শেষ করে আমার কাছে এসে তাকে বললেন, "ঠিক দশ মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি মাল সমেত সুলেমান এখানে হাজির না-হয় তা হলে ভীষণ কান্ড হবে।"

কেষ্ট এবার বুলেটের গতিতে থানা থেকে বেরিয়ে গেল।

গণেশ সরকার এবার ভিতরে গিয়ে মিস্টার চোপরাকে জিজ্ঞেস করলেন, "যা-লেখবার তা লিখলেন?"

আমি তখন ভাবছি, কেষ্ট এবং সুলেমান শেষ পর্যন্ত ছুরি দেখিয়ে টাকা আদায়ের লাইনে চলে গেল!

কিছুক্ষণের মধ্যে সুলেমান ও দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কেষ্ট আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। প্রচন্ড রঙ চঙ মাখা এই মেয়ে দুটি তখনও সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল।

গণেশ সরকার আবার এলেন। আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বললেন, তারপর আবার ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট তখন আবার লেকচার শুরু করেছেন। "ক্যালকাটা এইভাবে জঙ্গল হয়ে উঠলে বিজনেস-মেনরা আর এখানে আসবে না। ট্রেড অ্যান্ড কমার্স নষ্ট হয়ে যাবে।"

ঘণ্টা বাজালেন গণেশ সরকার এবং সঙ্গে-সঙ্গে সিপাইজী সুলেমানকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন? গণেশ সরকার জিজ্ঞেস করলেন, "দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?"

আবওলা সুলেমানকে দেখে চৌধুরী সায়েব অবাক। এতো সহজে আসামীকে পাকড়াও করে আনতে তিনি কখনও দেখেন নি। বিস্মিত চৌধুরী সায়েব মন্তব্য করলেন, "আপনাদের সঙ্গে কী এদের যোগাযোগ থাকে?"

"সে সব পরে ভাবা যাবে," গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন, গণেশ সরকার। "আগে বলুন, এই লোকটাই আপনার সাড়ে তিনশ টাকা মেরেছে কিনা।"

"এই লোকটাই মনে হচ্ছে," জবাব দিলেন চৌধুরী।

"হুজুর, সাড়ে তিনশ কোথায়?" আর্তনাদ করে উঠলো সুলেমান। "সবসুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ টাকা।"

চৌধুরী প্রথমে কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর ঘোষণা করলেন, "দিস ইজ দি কালপ্রিট!"

গণেশ সরকার বললেন, "থ্যাকারে ম্যানসনের পূর্ব দিকে গেটের কাছে ব্যাপারটা হয়, তাই তো?"

চৌধুরী বললেন, "ইয়েস!"

এবার হুঙ্কার ছাড়লেন গণেশ সরকার। "টাকাটা তো আপনাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। এবার দেখুন তো এই দুটি মেয়েকে চেনেন কিনা?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুই রমণীর মঞ্চে প্রবেশ। এই দুই নিম্নশ্রেণীর বারাঙ্গণাকে কাছে দেখে চমকে উঠলেন চৌধুরী ও চোপরা।

"এদের চেনেন?" গণেশ সরকার আবার প্রশ্ন করলেন, কিন্তু চৌধুরী উত্তর দিচ্ছেন না।

"কীরে? তোরা চিনিস এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের?"

মেয়ে দুটি খিল খিল করে হেসে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়লো। "কেন চিনবো না? একটু আগেই তো আমাদের দু'জনকে বুকিং করেছিলেন!"

গণেশ সরকার জিজ্ঞেস করলেন, "সুলেমান, তুই থ্যাকারে ম্যানসনের গেটের কাছে এঁদের ওপর চড়াও হয়েছিলি?"

সুলেমান হাত জোড় করে বললো, "না হুজুর। কেষ্টাকে নিয়ে আমি 'পার্কিস স্ট্রীটের' মোড়ে ডিউটি দিচ্ছিলাম।"

এর পর সুলেমান অকপটে যা বলে গেল তা মোটামুটি এই রকমঃ

নতুন পার্টি দেখেই সুলেমান জিজ্ঞেস করেছে, "লেডিজ হোস্টেল হুজুর? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ম্যাড্রাসি, পাঞ্জাবি, বেঙ্গলী হুজুর। অফিস গার্ল? কলেজ গার্ল? নার্স?"

লেডিজ হোস্টেলের মতো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নাম করে বেশ কয়েকজন লোক যে এই অঞ্চলে অপরিচিত লোকদের ঠকানোর ব্যবসা খুলেছে তা এই প্রথম আমার কাছে স্পষ্ট হলো।

মিস্টার চৌধুরী ও চোপরা টোপ গিলেছিলেন, এবং সুলেমান সোজা তাঁদের সুবিখ্যাত লেডিজ হোস্টেলের গেটের অনতিদূরে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, "একটু দূরে দাঁড়ান স্যর। মেয়েদের হোস্টেল তো, লেডি 'সুপ্রিনডেণ্ট' ভীষণ কড়া লোক, জানতে পারলে কেলেংকারি করবে।"

হোস্টেলের সামনে পানের দোকানের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে এসে সুলেমান জানিয়েছিল, "একশ টাকা করে মাথাপিছু লাগবে স্যর।"

সুলেমান এর পরে ওঁদের কাছ থেকে পনেরো টাকা আদায় করে বলেছিলো, আপনারা কেষ্টর সঙ্গে থ্যাকারে ম্যানসনের দিকে এগোন। আমি দারোয়ানের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে লেডিজদের নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা এখানে থাকলে খুব অসুবিধে হবে, 'সুপ্রিনডেণ্ট' এখনও গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছেন।"

লক্ষ্যস্থল যখন থ্যাকারে ম্যানসন, তখন চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং আপত্তি করেননি।

সুলেমান সেই সুযোগে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়ে রিপন স্ট্রীট অঞ্চলের নিষিদ্ধ গৃহ থেকে এই দুই বারবণিতাকে সংগ্রহ করে রিকশায় চড়িয়ে যথাস্থানে হাজির করেছে।

বিশিষ্ট অতিথিরা তখনও থ্যাকারে ম্যানসনের গেটের কাছে অপেক্ষা করছেন। লেডিজ হোস্টেলের আধুনিকার পরিবর্তে এই দুই রমণীকে দেখে চৌধুরী সায়েব আঁতকে উঠেছিলেন এবং চলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্ত তখন হাঙ্গামা বেধেছিল। মেয়ে দুটি রিকশা থেকে নেমে ওঁদের হাত চেপে ধরে বলেছিল, "আমরা সময় নষ্ট করে, অন্য কাজ ছেড়ে চলে এসেছি—এখন এইভাবে পালানো চলবে না!"

লোক ডাকাডাকি এবং হই-চই-এর ভয় দেখিয়ে সুলেমান আরও তিরিশ টাকা আদায় করে ওই দুই রমণীর হাতে তুলে দিয়েছিল এবং রিকশা আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়েছিল।

"সব সমেত তা হলে স্যর পঁয়তাল্লিশ টাকা!" থানায় করুণভাবে স্বীকারোক্তি করেছিল সুলেমান।

গণেশ সরকার যে এতো সহজে এই কেসের অনুসন্ধান শেষ করতে

পারবেন ভাবেননি। সাক্ষীদের বাইরে বার করে দিয়ে চৌধুরীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এবার? থানায় মিথ্যে অভিযোগ ফাইল করার কী শাস্তি তা আপনি নিশ্চয় জানেন?"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ চৌধুরী এবার গণেশ সরকারের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "আমাদের বাঁচান। ক্যালকাটা পুলিস যে এতো এফিসিয়েণ্ট তা আমার জানা ছিল না। ওইভাবে একটা রাস্তার লোকের কাছে পঁয়তাল্লিশ টাকা ঠকে গিয়ে আমার খুব রাগ হয়েছিল কলকাতা শহরের ওপর। তাই ভেবেছিলুম একটা পুলিস কেস করে দিয়ে যাই।"

"পঁয়তাল্লিশ টাকার জায়গায় সাড়ে তিনশ বললেন কেন!" জানতে চাইলেন গণেশ সরকার।

"আমরা ভাবলাম, সাড়ে তিনশর কমে ব্যাপারটা পুলিসের কাছে তেমন সিরিয়াস মনে হবে না!"

গণেশ সরকারের ডাকে সুলেমান ও ওই দুজন মহিলা আবার ভিতরে ঢুকলো। গণেশ সরকার বললেন, "তোমরা টাকা ফেরত দিয়ে দাও।"

সুলেমান মাথা নিচু করে হুকুম তামিল করলো। মুশকিল হলো ওই দুটি মেয়েকে নিয়ে। আঁচলের খুঁট খুলে তারা কিছুতেই পুরো টাকার হিসেব দিতে পারলো না। ওদের একজন ভয়ে-ভয়ে এবার জানাল, "টাকা রোজগার করেই তারা এক বোতল কোকাকোলা ও পান খেয়ে ফেলেছে।" চোদ্দ টাকার বেশী তারা ফেরত দিতে পারলো না।

গণেশ সরকারের নির্দেশে, মিস্টার চৌধুরী টাকাগুলো পকেটে পুরে ফেললেন। এবং হঠাৎ গণেশবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে এবারের মতো ক্ষমা করতে অনুরোধ জানালেন।

কী ভেবে গণেশবাবু বললেন, "লিখে দিয়ে যান আপনারা নিজেরা বদমাসী করতে এসে ঠকে গিয়ে কলকাতার নামে বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।"

চৌধুরী সুড় সুড় করে গণেশ সরকারের আদেশ মান্য করলেন।

থানা থেকে বেরুবার পথে এঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। চোপ-রাজী আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, "হ্যালো! তুমি এখানে?"

"আমার একজন ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম", এই বলে ভারিক্কী চালে চৌধুরী এমনভাবে এগিয়ে গেলেন যেন কিছুই হয়নি। গণেশবাবুও এবার বেরিয়ে এসেছেন। বললেন, "স্রেফ আপনার জন্যেই লোক দুটোকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে ছেড়ে দিলাম। না-হলে এখন কেস শুরু করতে গেলে আরও অনেক সময় লেগে যেতো. আমাদের রাতের খাওয়া এবং আড্ডাটা মাঠে মারা যেতো।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "একটা ব্যাপার বুঝলাম না। কেষ্ট কেন ঠিক ওই সময় থানায় চলে এল?"

"খুব সোজা", গণেশবাবু উত্তর দিলেন। লেডিজ হোস্টেলের এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানে মিথ্যে টোপ দিয়ে ওরা লোক ঠকাচ্ছে, কিন্তু কেউ থানায় গিয়ে অভিযোগ করুক তা ওরা চায় না। পুলিসে ছুঁলেই আঠারো ঘা, বুঝতেই পারছেন। তা ছাড়া সুলেমানের কপালে ওই আব রয়েছে-- আইডেণ্টিফিকেশনের খুব সুবিধে। চোপরা ও চৌধুরীকে ফলো করে কেষ্ট তাই থানায় চলে এসেছে।"

গণেশ সরকারের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরবার সময় সুলেমানের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল।

সুলেমান তখনও থ্যাকারে ম্যানসনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সে সেলাম করলো। সুলেমানের ওপর আমার রাগ হলো। সস্তা লাভের আশায় সে পরিশ্রমের কাজটা এড়িয়ে যাচ্ছে।

"সুলেমান, তোমার রিকশ কী হলো?" আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

"রামসিংহাসনজীর কাছে রিকশ বেখেছিলাম হুজুর। বউয়ের অসুখের খরচ চালাতে পারছিলাম না। টাকা শোধ দিতে পারিনি, রামসিংহাসনজী বন্ধক রিকশ বেচে দিয়েছেন।"

"এতো রাত্রে এখনও দাঁড়িয়ে আছো, সুলেমান?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সুলেমান একটু ইতস্তত করলো। তারপর সে মুখ খুললো।

"আজ যে-করেই হোক পনেরোটা টাকা রোজগার করতে হবে, হুজুর। বুকের ছবি তোলাবার জন্যে বউকে কাল বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা আছে", এই বলে নতুন প্যাসেঞ্জারের খোঁজে সুলেমান ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের অন্ধকার থেকে পার্ক স্ট্রীটের আলোর দিকে হাঁটতে লাগলো।

প্রাক্তন রিকশওয়ালা সুলেমানের ঘটনাটা আমার মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। সুলেমানের ওপর বিরক্ত হতে গিয়েও হতে পারলাম না। মাঝে মাঝে রাতের গভীরে শিকারের অন্বেষণে সুলেমানের ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে পার্ক স্ট্রীট যাবার দৃশ্যটা অকারণে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে মনের শান্তি নষ্ট করছে।

আমার অবস্থা লক্ষ্য করে তেলকালিবাবু বকুনি লাগিয়েছেন, "সামান্য ব্যাপার নিয়ে অতশত ভাববেন না স্যার। মুখ বুজে এবং তেমনি দরকার হলে চোখ বুজে নিজের কাজটুকু করে যাবেন কেবল। দুনিয়ার সবার ব্যাপারে যদি ভাবা শুরু করেন, তা হলে মাথা ঠিক রাখতে পারবেন না। ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠবে, নিজের শরীর-স্বাস্থ্য খারাপ হবে, কিন্তু দুনিয়ার কোনো পরিবর্তন আসবে না।"

তেলকালিবাবু অভিজ্ঞ লোক—সংসারের ঘাটে ঘাটে অনেক শিক্ষা লাভ করে তিনি যে মূল্যবান সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন, তা মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে বিচিত্র এক উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো দুর্জয় শক্তি আমার নেই : কিন্তু চোখের সামনে যা-ঘটে যাচ্ছে তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে আপন খেয়ালে দিনযাপনের মানসিকতাও আমার নেই। চোখ বুজে থাকলেও অনেক বেদনার্ত মুখ ও অনেক দুঃখের ইতিহাস সজীব হয়ে আমার মনের শান্তি ও চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।

তেলকালিবাবুর বুদ্ধি অনেক পরিণত। তিনি বললেন, "মুরোদ যদি থাকতো তাহলে ওই রামসিংহাসনের হাত থেকে সুলেমানের বন্ধকী রিকশ

ছাড়িয়ে ওর হাতে তুলে দিতাম। কিন্তু, স্যর, এ-মাসে আমার টাকার বেশ টানাটানি চলছে।"

আমার কাছে কয়েকটা টাকা রয়েছে। সেই কথা শুনে তেলকালিবাবু চটে উঠলেন। "আপনি এখনও পার্মেন্ট হন নি। কাঁচা ঘুঁটি ঘ্যাঁচ হয়ে যাওয়া কত সহজ তা তো আপনার অজানা নয়। সে-ক্ষেত্রে কয়েকটা টাকা বাঁচানো আপনার দরকার—না হলে অপরের গলগ্রহ হতে হবে। তাছাড়া ক'টা সুলেমানের রিকশ আপনি খালাস করবেন? রামসিংহাসনের কাছে এ-পাড়ার চুয়াল্লিশখানা রিকশ বন্ধক হয়ে আছে। এ-ব্যাটাদের হালচাল আমি কিছু বুঝি না—রামসিংহাসনের কাছে রিকশ দেবার জন্যেই যেন এদের জন্ম।"

তবু তেলকালিবাবুকে আমি একবার রামসিংহাসনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি নিজেও হয়তো তার কাছে যেতে পারতাম, কিন্তু তার এই প্রাইভেট ব্যবসার ব্যাপারটা আমি সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিতে চাই না।

তেলকালিবাবু খোঁজখবর নিয়ে বললেন, "রামসিংহাসনের তেজারতি আইন-কানুন ইংরেজের মালগুজুরীর থেকেও কঠিন। সুলেমানের রিকশ ক'সপ্তাহ আগেই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবং দেনা শোধ না-হওয়ায় পরশুদিন তা বিক্রি হয়ে গিয়েছে।"

তেলকালিবাবু মোটেই দুঃখিত হলেন না। বললেন, "ভালই হয়েছে, আপনার পঁচিশটা টাকা বেঁচে গেল। খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখলুম, সুলেমান গোড়ায় ওই পঁচিশটা টাকাই নিয়েছিল, কিন্তু সুদ এবং তস্য সুদে বকেয়া টাকার পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছিল তার থেকে একটা নতুন রিকশ কিনে নেওয়া অনেক সস্তা।"

আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে আছে বুঝতে পেরে তেলকালিবাবু নিতান্ত আপনজনের মতো মৃদু বকুনি লাগিয়েছিলেন, "তাকাবেন না, মশাই। দুনিয়ার সব জিনিস যদি ভগবান আমাদের দেখাতে চাইতেন তাহলে চোখের ওপর পাতা দিতেন না। চোখের ঢাকনার সদ্ব্যবহার না-করলে কেউ এই থ্যাকারে ম্যানসনে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারবে না।"

চোখ বন্ধ করার এই ব্যাপারটা তেলকালিবাবু মন্দ বলেন নি। থ্যাকারে ম্যানসনের আশে-পাশে এবং ভিতরে প্রহরে-প্রহরে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সে-দিকে সজাগ হয়ে চেয়ে থাকলে কোনো ম্যানেজারের জীবন স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

চোখ বন্ধ করেই সেদিন আমার কয়েকমাসের কর্মজীবনের হিসেব-নিকেশ করবার মতলব আঁটছিলাম। যারা একদিন অচেনা ছিল অজানা ছিল তারাই ক্রমশ কেমন করে চেনা-জানা হয়ে উঠলো তার ধারাবাহিক চিত্রমালা মনের মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। কত বিচিত্র মুখ মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল।

কিন্তু এইসব ছবি একের পর এক দেখতে-দেখতে আমি ক্রমশই যেন নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। একের পর এক দুঃখ, শোষণ, অপমান ও অধঃপতনের ইতিবৃত্ত আঁকবার জন্যেই যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আমি হাজির হয়েছি। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ—ডালহৌসি স্কোয়ারের এক অখ্যাত আপিসের অশিক্ষিত দারোয়ান অনেকদিন আগে আমাকে উপদেশ দিয়েছিল। তারপর এই এতোদিন শত পরীক্ষার মধ্যেও বিশ্বাসের সেই ক্ষীণ প্রদীপশিখাটি আমি সযত্নে

মনের মণিকোঠায় প্রজ্বলিত রেখেছি ; কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসনের ঘটনাবলী এবার আমাকে সন্দিহান করে তুলছে ; আমি আর দারোয়ানজীর সেই পুরনো কথায় বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

মনের যখন এই অবস্থা তখন নতুন এক ঘটনামালার শুরু হলো। সহদেব আমার ঘরে ঢুকে একটা চিঠি ভিড়িয়ে দিল।

চিঠি লিখেছেন ৩৩ নম্বর ঘরের মেমসায়েব। সহদেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি এখন তেত্রিশ নম্বরেও কাজ করছো, সহদেব?"

এক গাল হেসে সহদেব বললো, "আমার উপায় কী, হুজুর? যাঁর কাছ থেকে দুটো পয়সা পাই, তাঁরই সেবায় লেগে যাই!"

সহদেবের মুখের দিকে তাকালাম। সহদেব বললো, "আগে স্যর চৌত্রিশ নম্বর থেকে দুটো পয়সা আসছিল। ওখানকার পয়সাতেই দেশে কয়েক কাঠা জমিও কিনেছিলাম। তা অবশ্যি এবার বিক্রি করে দিলাম, হুজুর।"

"জমি বলে জিনিস, কেন বিক্রি করতে গেলে সহদেব? পয়সার এমন কী অভাব পড়লো তোমার?"

সহদেব বললো, "জমিটা কিনে খুব ভুল করেছিলাম, স্যর। দেশে গিয়ে এবার দেখলাম ওখানে থাকলে কেউ আমাকে ছোঁবে না—যত টাকারই মালিক হই, আমাকে ওই ধাঙড়ই থেকে যেতে হবে। তাই এবার ঠিক করে ফেলেছি, দেশের সংগে আর কোনো সম্পর্কই রাখবো না, স্যর। যা-হবার তা এই ক্যালকাটাতেই হবে। এখন থেকে আমার দেশ এই ক্যালকাটা। এখানে সহদেবের সাতগুষ্টির খবর কেউ খুঁড়ে বার করবে না।"

সহদেবের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। সহদেব বললো, "টাই-টেলও পাল্টে ফেলবো ভাবছি। আপনি কী বলেন, স্যর?"

"তোমার নাম তুমি যা-খুশি তাই করবে," সহদেবকে আমি উৎসাহ দেবার চেষ্টা করি।

সহদেব বললো, "স্যাটাবাবুর সম্মানে আমিও বোস টাইটেল নেবো ভাবছিলাম। কিন্তু এই রান্না-বান্নার লাইনে থাকতে গেলে 'রায়' টাইটেলই নিরাপদ ; তাই না স্যর?"

"রায় হলে তুমি বাউন না কায়েত, না বদ্যি, না অন্যকিছু তা ধরা সম্ভব নয়।"

সহদেব উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো, "তা হলে ওইটাই ভাল স্যর। মিথ্যে কথাও বলা হলো না, অথচ কাজকর্মের অসুবিধা হলো না।"

সহদেবকে আমি বোঝাতে যাচ্ছি, নামটা যখন তোমার, তখন সেখানে কোনো মিথ্যাচারের প্রশ্ন ওঠে না, ঠিক সেই সময় সহদেব জিজ্ঞেস করে বসলো, "নাম পাল্টাতে গেলে কী করতে হয়, স্যর? শিয়ালদার এক উকিলবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বলেছিলেন শ' তিনেক টাকা নিয়ে এসো সব করিয়ে দেবো।"

আমি বললাম, "যে-টাইটেল তোমার পছন্দ তা কাল থেকে ব্যবহার করো সহদেব ; তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। আদালতে অ্যাফিডেভিট করলেও গোটা পাঁচেক টাকার বেশী খরচের কারণ দেখছি না। গণপতিবাবুকে বলে তোমার একটা গতি করে দেবো। সহদেব, তুমি চিন্তা কোরো না।"

আমি ততক্ষণে তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মেমসায়েবের লেখার দিকে নজর দিচ্ছি।

নাম-সমস্যার সমাধানে আনন্দিত সহদেব বললো, "আপনি যা জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি স্যর কাজের কাঙাল। চৌত্রিশ নম্বর খালি করে আপনি তালা ঝোলালেন। আমি তখন খোসলা দিদিমণির কাঁধে ভর করলাম। ওঁরা অনেক খাবার দাবার কিনতেন। কিন্তু খোসলা দিদিমণিরও সময় খারাপ চলেছে—মাসে এখন দুটো টাকারও অর্ডার পাই না। তাই এখন অনেক ফ্ল্যাটের কাজকর্ম করতে হচ্ছে।"

"কী কাজকর্ম?" জানতে চাইলাম সহদেবের কাছে।

সহদেব মাথা নিচু করে বললো, "টিফিন বাক্সর বিজনেস শুরু করেছি হুজুর। অনেক ফ্যামিলি এখন রান্না-বান্না ছেড়ে দিচ্ছে। ওসব হাঙ্গামায় অনেক মেমসায়েব আজকাল যেতে চাইছেন না। ওঁরা হয় ম্যাড্রাসি হোটেলে, না-হয় সহদেবের কাছে টিফিন কেরিয়ার পাঠান। দু'খানা টিফিন বাক্স আর এক সপ্তাহের অর্ডার দিলেই সহদেব রান্না-বান্নার সব দায়িত্ব নিয়ে নেবে। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সহদেবের খাবার টিফিন বাক্সে দরজায় পৌঁছে যাবে। বাজারে যাবার হাঙ্গামা নেই ; কুটনো কাটার হাঙ্গামা নেই ; উনুন জ্বালানোর হাঙ্গামা নেই ; রান্না-বান্নার হাঙ্গামা নেই!"

"তেত্রিশ নম্বরের মেমসায়েব কি তোমার টিফিন বাক্স সার্ভিস নিচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করি সহদেবকে।

সহদেব জিভ বার করে বললো, "না, উনি কোন দুঃখে নিতে যাবেন? মেমসায়েব ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক ওভেন বসিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে আমার কাছে স্পেশাল ডিশ কেনেন। মধ্যিখানে যখন অসুখ ছিল, তখনও আমার খাবার কিনতেন সায়েবের জন্যে।"

এবার চিঠিটার দিকে নজর দিলাম। সেখানে শুদ্ধ বাংলায় লেখাঃ "শংকরবাবু, অনেক দিন খবরাখবর নেওয়া হয় না। আজ বিকেলের চা-পর্বটা আমার এখানে সারুন। না-এলে খুব রাগ করবো। জরুরী কথাও আছে। ইতি মিসেস টমসন।"

"তুমি এখন যেতে পারো", এই বলে সহদেবকে বিদায় করলাম।

বাংলায় লেখা চিঠিটার দিকে আর একবার তাকিয়ে আমার সঙ্গে মিসেস টমসনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে গেল।

টমসন ভদ্রলোক খোদ ইংরেজ। পাকে-চক্রে কীভাবে এই থ্যাকারে ম্যানসনের ছোট্ট জগতে তিনি হাজির হলেন তা তখন জানতাম না। কুলীন সায়েবদের যোগ্য বাসস্থান বলে এই ম্যানসন তখন বিবেচিত হলেও এখন থ্যাকারে ম্যানসনের সে-গৌরব নেই।

শুনেছিলাম সায়েব এখানে অনেকদিন আছেন। লালকেল্লার ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়বার পরে অনেক সায়েব সংসার গুটিয়ে লবণাম্বুর অপর পারে সরে পড়েছেন। কিন্তু টমসন সায়েবের সেরকম লক্ষণ নেই। তিনি আপন মনেই নিজের ব্যবসার কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকেন। সবার সঙ্গেই তাঁর ভাব—কখনও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার রিপোর্ট পাইনি।

মিসেস টমসনকে প্রথম দেখে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আবলুস কাঠের মতো গায়ের রঙ ; একটু ভারী চেহারা ; একমাত্র চুলের ছাঁট ছাড়া আর কোথাও পশ্চিমী স্টাইলের উপস্থিতি নেই। মেমসায়েব কখনও ফ্রক, আবার কখনও শাড়ি পরেন।

আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই এই মহিলাকে বেশ জাঁদরেল বলে মনে

হয়েছিল। হাতে বাজারের ঝুলি নিয়ে তিনি আমার আফিস ঘরে এসেছিলেন এবং আমাকে দেখেই ভারী পুরুষালি গলায় চিৎকার করে বলেছিলেন, "ওমা! এ যে কচি ছেলে দেখছি! তুমি পারবে এই থ্যাকারে ম্যানসন সামলাতে?"

এই ধরনের মন্তব্যে রাগ করাই উচিত, কিন্তু মিসেস টম্‌সনের মন্তব্যে এমন একটা স্নেহমিশ্রিত ভাব ছিল যে কোনো প্রতিবাদ সম্ভব হলো না। আইন মতে আমি যে সাবালক তা নিবেদন করেও কোনো ফল হলো না। মিসেস টমসন বাজারের শাক-সব্জী আমার টেবিলে রেখে বললেন, "হাজার বার বলবো কচি ছেলে—মুখ দেখলেই বোঝা যায়।"

জাঁদরেল ভাব থাকলেও, মিসেস টমসনই এ-বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা যিনি আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "উনি তো লাজুক মানুষ—সাত চড়ে রা নেই। বলে-বলে এলে গেলাম, যাও একবার নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে এসো। কিন্তু সংসারের এসব কাজ ওঁকে দিয়ে হয় না। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই এলাম। তা শংকরবাবু, তেমন কোনো অসুবিধে হলে আমাকে বলবেন; হাতের গোড়াতেই রইলাম।"

প্রথম দিন ওই পর্যন্ত। বাজারের থলে নিয়ে ভারী মধ্যবয়সিনী দেহখানি নাড়তে-নাড়তে মিসেস টমসন বিদায় নিয়েছিলেন। অফিস ঘরের একজন মন্তব্য করেছিলেন, "সায়েবস্য কৃষ্ণা ভার্যা! এই মেয়ে বে করবার জন্যে সায়েব যে কত টাকা নগদ পণ নিয়েছেন ভগবান জানেন!"

"খাট-বিছানা-আলমারি, ঘড়ি-আংটি-বোতাম দানসামগ্রী এবং নগদের লোভে সায়েবরা বিয়ে করে না, ওরে মূর্খ," আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিলেন।

প্রথম টীকাকার এবার মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। "তা হলে?"

"তা হলে আবার কী? নিশ্চয় দেখাশোনা করে ভাবসাব হয়ে মাল্যদান হয়েছে!"

আর একজন এবার গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "কিংবা কিছুই হয়নি!"

আমি এই সব আলোচনায় কোনো রকম অংশ গ্রহণ করিনি। মুখ বুজে এই মন্তব্যও শুনেছি, "আমাদের যেমন ফর্সা মেয়ের দিকে টান; সায়েবদের তেমনি কালো মেয়ের দিকে নজর। সাদায় কালো টানে, বুঝলি? না-হলে সায়েবদের হুইস্কি এবং সিগারেটের নাম ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট হয় কেন?"

মিসেস টমসনের ব্যাপারে এই ধরনের কথাবার্তা আমার ভাল লাগেনি। তাঁর সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্যও কমেনি।

সময়মতো একদিন তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ফাইলখানাও খুলে দেখেছিলাম। এবং সেখানকার বিবরণ পড়ে একটু মুষড়ে পড়েছিলাম। কারণ সেখানে টমসন দম্পতির কোনো উল্লেখ নেই। ভাড়াটিয়া হিসেবে লেখা আছে মিস উমারাণী সামন্তর নাম।

কে এই মিস উমারাণী সামন্ত? এঁর কাছ থেকে ফ্ল্যাটটা কীভাবে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস টমসনের দখলে গেল? প্রায় এই সময়েই আর সি ঘোষের ফ্ল্যাটে খোঁজ করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছি। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। এ-বাড়িতে কেউ কি নিজের ফ্ল্যাটে থাকে না? এখানে সবই কি বেনামী? মিসেস টমসন সম্বন্ধেও কিছু সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগলো।

সন্দেহের নিরসন হলো কয়েক দিন পরেই। স্বয়ং মিসেস টমসন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন, "আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে। বাড়িওয়ালার খাতায় নামটা পাল্টে দিতে হবে। সেই কোন্‌কালে মিস উমারাণী সামন্ত ছিলাম, আপনাদের রেকর্ডে এখনও তাই চলেছে, ইতিমধ্যে আদি গঙ্গার নালা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে : অথচ মিস সামন্তর কোনো গতি হলো না।"

লিখিত রেকর্ডে কোনো পরিবর্তনের কথা উঠলেই ডবল সাবধান হতে হয়। গণপতিবাবু নিজেও এ-বিষয়ে আমাকে বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে ছিলেন। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্কটা খুব জটিল, লিখিত রেকর্ড একটু এধার-ওধার হলেই গোলমালের সম্ভাবনা।

এই সাবধান-বাণী স্মরণ করেই মিসেস টমসনকে জিজ্ঞেস করেছি, "এর আগের ম্যানেজারবাবুকে কিছু বলেননি?"

মিসেস টমসন উত্তর দিয়েছেন, "বলেছি বই কি ক'বার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি। আপনাদের ওই রামসিংহাসনকেও বহুবার রিকোয়েস্ট করেছি। প্রায়ই বলে করিয়ে দেবে ; কিন্তু কাজের বেলায় ঠুঁটো জগন্নাথ।"

"নামে আর কী এসে যায়?" মিসেস টমসনকে তখনকার মতো নিবৃত্ত করবার জন্যে আমি বুঝিয়েছি।

কিন্তু ফোঁস করে উঠলেন মিসেস টমসন। বললেন, "অবশ্যই এসে যায়! নামটাই তো সব। সেই কবে আইবুড়ো নাম ঘুচিয়েছি, অথচ আপনাদের খাতায় কেন এখনও মিস উমারাণী সামন্ত থাকবো আমি?"

মিসেস টমসন এরপর আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য চেষ্টা করে-ছিলেন। সেই সুযোগে আমি ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, অপরিচিতা বিবাহিতা মেমসায়েবও মিস বলে ডাকলে খুশী হন।

মিসেস টমসন তখন আমাকে বলেছিলেন, "সায়েব-মেমদের ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না। একটা বয়স পর্যন্ত ওই মিস ডাকটা মন্দ লাগে না ; কিন্তু তার পরেই অচল। এই ডাইভোর্সের কথাই ধরুন না কেন?"

ডাইভোর্স শব্দটা আমাকেও একটু বেশী সজাগ করে তুললো।

মিসেস টমসন আমার কৌতূহলে বিন্দুমাত্র ইন্ধন না-জুগিয়ে বললেন, "ভাল করে শুনে রাখুন ব্যাপারটা। বিলিতী সায়েবের দিশী বউয়ের কাছ থেকে সায়েবদের হাঁড়ির খবরাখবর নেবার এমন সুযোগ আর পাবেন না।" এই বলে একটু থামলেন মিসেস টমসন।

তারপর শুরু করলেনঃ "বিয়ের পরে ডিভোর্স হলেও মেয়েরা নিজেদের নাম সম্পর্কে দুটো চয়েস পায়। ইচ্ছে করলে তারা আবার পৈতৃক নামে ফিরে গিয়ে 'মিস' হতে পারে। অথবা, স্বামীর নামটি বহাল রেখে নিজেকে মিসেস 'অমুক' বলেই চালিয়ে যেতে পারে। ছেলেপুলে আছে কিনা এবং মহিলার নিজের বয়সের ওপর এই 'চয়েস' নির্ভর করে। আমাদের এই বয়সে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও কেউ আর কুমারী নামে ফিরে যাবে না। অথচ আপনারা আমাকে এখনও মিস উমারাণী সামন্ত বলেই চালিয়ে যাচ্ছেন। উনি নেহাত ভাল মানুষ তাই ; অন্য কোনো স্বামী হলে আমার সম্বন্ধে কী ভাবতেন বলুন তো!"

"খাতাপত্তর খুলে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখি", এই বলে তখনকার মতো

সময় চেয়ে নিয়েছিলাম ওই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে।

আমার শুভানুধ্যায়ী তেলকালিবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন, "একটু সাবধানে এগোবেন স্যর। এ-পাড়ার সায়েব-মেমদের ব্যাপার-স্যাপার বোঝা দায়! কে কার সঙ্গে এমনিই আছে, আর কে কাকে আইন মতে বিয়ে করেছে তা আপনি জানবেন কী করে?"

রামসিংহাসনজীও তেমন উৎসাহ দেখান নি। এতোদিন মিস উমারাণী সামন্ত নামেই হাসিমুখে ভাড়ার রসিদ গ্রহণ করেছেন, হঠাৎ মিসেস টমসনের নাম ঢোকানোর চেষ্টার মধ্যে রামসিংহাসন কোনো অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছে।

দু' একবার মনে করিয়ে দেবার পরে একদিন আবার চড়াও হয়েছিলেন মিসেস টমসন। আমাকে বললেন, "আজ যখন ধরেছি তখন কিছুতেই ছাড়ছি না।"

"আমার হয়েছে উভয় সংকট! হঠাৎ বাড়ি ভাড়ার রসিদখানা দেখে আমার স্বামীর কানে কেউ মন্তর দিয়েছে, বিয়ের এতো দিন পরেও উমারাণী এখনও মিস সামন্ত হয়ে আছেন কেন? ওঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে আপনাদের কাছে ছুটে এলাম। অথচ আপনারা বলছেন অ্যাদ্দিন পরে মিস সামন্তকে আমরা কেন মিসেস টমসন করবো?"

আমি কোনো উত্তর দিইনি। হাসিমুখেই ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মিসেস টমসন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "আমি জানি এতোদিনে আপনি খাতায় নাম পাল্টে দিতেন। কিন্তু আপনার কানে মিথ্যে মন্তর ঢোকানো হচ্ছে।"

মৃদু আপত্তি জানাতে গেলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। মিসেস টমসন বললেন, "শুধু এখানে কেন, আমার দু-একজন আত্মীয়স্বজনও সে-সময় কুৎসা রটিয়েছিল। তারা ভাবতেই পারে না যে খোদ সায়েব আমার মতো কালো বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।"

মিসেস টমসন এরপর হুড় হুড় করে নিজের ইতিহাস বলে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় এ-বাড়ির মালিকের নার্সিং করে সস্তায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন মিস উমারাণী সামন্ত। দেখতে-শুনতে ভাল নয় বলেই তাঁর মা নার্সিং লাইনে দিয়েছিলেন, কারণ এ-মেয়ের নাকি বিয়ের কোনো আশা নেই। কিন্তু কপালে যার গোরা বর নাচছে, তাকে কি ঠেকানো যায়?

যুদ্ধ সংক্রান্ত কী এক কাজে বিল টমসন এ-দেশে এসেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে এক গুরুতর অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়ে হাসপাতালে পড়ে রইলেন উইলিয়ম টমসন। সেইখানেই দেখা মিস উমারাণী সামন্তর সঙ্গে।

"হাড়গোড় ভেঙে মাসের পর মাস যখন বিছানায় পড়েছিল তখন কে দেখেছিল বিলকে? তখন এই উমারাণী ছাড়া কোনো গতি ছিল না।"

উমারাণী জানালেন, "দুষ্টু লোকেরা বলে আমি লোভে পড়েই সায়েবের সেবা করেছিলাম। কিন্তু তখন উনি যে আবার হেঁটে চলে বেড়াবেন তেমন আশা ছিল না। ডক্টর ম্যাকফারলেন তো বলেই দিয়েছিলেন কোমরের তলা থেকে পার্মানেন্ট প্যারালিসিস থাকতে পারে।"

উমারাণী বললেন, "কেউ-কেউ রটিয়ে বেড়ায়, আমিই নাকি বিলের কাছে প্রপোজ করেছিলাম। ভাবলে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়! কোন্

দুঃখে আমি ওই হাত-পা ভাঙা সায়েবের কাছে মাথা নিচু করবো? ওই সায়েবই দিনের পর দিন আমার কাছে ফেভার ভিক্ষে করেছে এবং শেষ পর্যন্ত যখন বিয়ের কথা তুলেছে, তখনও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিইনি, বলেছি, ভেবে দেখি।"

উমারাণী এবার নিজের হাত-ব্যাগ খুলে ফেললেন। "দুষ্টুজনেরা, হিংসেয় জ্বলতে জ্বলতে বলে বেড়ায় আমাদের নাকি বিয়ে হয়নি—সায়েব স্রেফ আমার ফ্ল্যাটে থাকে। সেই জন্যে প্রমাণ এনেছি। হাতে পাঁজি মঙ্গল-বার", এই বলে উমারাণী রেজিস্ট্রি বিবাহের সার্টিফিকেটখানাও আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

এর পর সত্যিই কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আমাদের খাতায় মিস সামন্তকে মিসেস টমসন না করবার কোনো যুক্তি নেই। আমি তখনই নিজের দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন মাসের ভাড়ার রসিদে বড় বড় করে মিসেস উমারাণী টমসনের নাম লিখে দিয়েছি।

খুব খুশী হয়েছিলেন মিসেস টমসন। বললাম, "বাজে গুজব ছড়িয়ে লোকে যে কী আনন্দ পায়!"

গুজব-ছড়ানো শত্রুদের ওপর উমারাণী কিন্তু খুব রাগ করলেন না। রসিদখানা হাতে পেয়ে মনের আনন্দে বললেন, "ওদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে সায়েবকে তো প্রথমেই এখানে তুলে-ছিলাম। তখনও তো আমাদের বিয়ে থা হয়নি। কিন্তু অসুস্থ লোককে কোথায় ছাড়ি বলুন তো! আর কোমর ভাঙা ওই লোককে তো বলতেও পারি না বিয়ে করে তবে বাড়িতে ঢোকো!"

গম্ভীর হয়ে উমারাণী বলেছিলেন, "কিছুই হতো না। কথা দিয়ে কথা না রাখলে ভাঙা চেয়ারের কাঠ দিয়ে সায়েবের কোমর ভেঙে আবার শুইয়ে রাখতাম।" এই বলে মিসেস টমসন নিজেও হাসতে লাগলেন।

এবার আমরা দুজনে একই সঙ্গে হেসে উঠেছিলাম। আমার ওপর সদয় হয়ে উমারাণী জানতে চাইলেন, "হাসলেন কেন?"

"আপনি কেন হাসলেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"মেয়েরা অকারণে হাসাহাসি করে। তা ছাড়া আমার ইচ্ছে আমি হেসেছি। আপনি কেন হাসলেন বলুন।"

এবার সত্যিকথা বলতে হলো। "কোমর ভাল হয়ে সায়েব যদি আপনাকে বিয়ে না-করতেন তা হলে কী হতো তাই ভাবছিলাম।"

এরপর থেকে মিসেস টমসনের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ তিনি কেন সহদেবের হাতে জরুরী চিঠি পাঠালেন?

"আসুন, আসুন," উমারাণী সামন্ত ওরফে মিসেস ডবলু এন টমসন আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে।

বসবার চেয়ারটা সরিয়ে দিতে-দিতে উমারাণী বললেন, "আপনি তো একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন—দেখতেই পাওয়া যায় না।"

"একটা লোককে আর কত জায়গায় দেখতে পাবেন, মিসেস টমসন?" আমি নিজের পক্ষে ওকালতি করি। "একের পর একটা ঝড় আসছে। সেসব সামলাতে আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকের অনেক সময় চলে যাচ্ছে।"

উমারাণী বললেন, "দু-একটা ব্যাপার আমার কানেও এসেছে, শংকরবাবু। ব্যাপার-স্যাপার শুনলে, লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে। বলি, আমাদের হলো কী? সায়েবরা চলে গেলে এদেশের নৈতিক উন্নতি হবে আশা করা গিয়েছিল; কিন্তু এখন তো দেখছি উল্টো অবস্থা।"

সমস্ত দেশের কথা জানি না, কিন্তু এই থ্যাকারে ম্যানসন যে অদ্ভুত এক পরিবেশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

উমারাণী দুঃখ করলেন, "আপনার কপাল মন্দ। ইংরেজ আমলে এই থ্যাকারে ম্যানসনে কাজ করতে এলে আপনার এতো কষ্ট হতো না। তখনও নিয়ম-কানুন বলে একটা কিছু পদার্থ ছিল।"

বিগত দিনে এখানে নিয়মের রাজত্ব ছিল জেনে হিংসে হতে লাগলো।

মনের দুঃখে উমারাণীর কাছে কিছু ভিতরের কথা ফাঁস করে দিলাম। ভদ্রতা-সভ্যতা এবং মডার্ন জীবনযাত্রার নামে এই সুসভ্য ম্যানসনে এখন কী চলেছে তা উমারাণী সামন্তর কাছে চেপে রাখার কোনো মানে হয় না। এই ম্যানসনে সামান্য যে কয়েকটি পরিবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন মিসেস টমসন অবশ্যই তাঁদের একজন; সুতরাং তিনি হয়তো বিবেকানন্দ ইস্কুলে লেখাপড়া শেখা হতভাগ্য ম্যানেজারের দুঃখ কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন উমারাণী। "ওমা! বলেন কি! এই সব লোকের সঙ্গে দিনের বেলায় কথা বললে তো কিছুই বোঝা যায় না! এরা আলোতে এক রকম, অন্ধকারে আরেক রকম!"

মিসেস টমসনের ফ্ল্যাটের ভিতরটা আমি এবার এক নজরে দেখে নিলাম। সায়েবের সংসার বলেই মনে হয় না। ঠিক যেন যে-কোনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঙালী বাড়ি। টমসন সায়েবের একখানা প্রাক-বিবাহকালের ছবি স্টীলের ফ্রেমে বন্দী হয়ে টেবিলে শোভা পাচ্ছে।

আমার নজর যে স্বামীর ছবিটার দিকে রয়েছে তা লক্ষ্য করে মিসেস টমসন ছবিখানা তুলে এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "হাতে নিয়ে ভাল করে দেখুন না। ওঁর সঙ্গে যখন হাসপাতালে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল তার কিছুদিন আগে তোলা।"

উমারাণীর কথাবার্তায় বোঝা যায় তিনি সুরসিকা। তাই সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, "দেখা-সাক্ষাতের পর ছবি তোলেন নি?"

চোখ বড় বড় করে উমারাণী বললেন, "তখন ফটো তুললে তো শুধু প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছবি উঠতো! হাত, পা, কোমর সর্বত্র সাদা সিমেন্ট লাগানো। নাকের মধ্যে পাইপ। ঠিক বলেছেন, ওই সময় একটা ছবি তুলিয়ে রাখলে হতো। তখন তো আর বুঝিনি, আমার কপালে ইনিই নাচছেন!"

মিসেস টমসন বললেন, "এই যে ছবি দেখছেন, তার থেকে খুব বেশী পরিবর্তন হয়েছে কি ওঁর?"

সত্যি, এতো বছরেও সায়েবের তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। একটু ওজন বাড়লেও প্রায় একই রকম রয়েছেন টমসন সায়েব। শরীরটা যে ওঁর বেশ ফিট তা সায়েবের হাঁটার ধরন দেখলেই বোঝা যায়। সকালবেলায় উনি

আমার অফিস ঘরের সামনে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যান, মুখে হাসিটি লেগে থাকে কিন্তু কারও সঙ্গে গায়ে-পড়ে কথা বলেন না।

"এই ক'বছরে কলকাতার আবহাওয়ায় সায়েবের যদি কোনো 'ডেপ্রিসিয়েশন' না হয়ে থাকে তাহলে তার সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্যই আপনার।" উমারাণী সামন্তকে অভিনন্দন জানাতে আমার কোনোরকম দ্বিধা হলো না।

একগাল হেসে মিসেস টমসন বললেন, "শুধু ওই চুলটুকু ছাড়া। বিয়ের আগে ওঁর যা চুল ছিল তা অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে।"

এই পাতলা চুলের ব্যাপারটা আমার অবশ্য তেমন নজরে পড়েনি। সায়েবের মাথার পিছন দিকে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ একটি টাক ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে বটে।

মিসেস টমসন বললেন, "তার জন্যে দায়ী আপনারা। এ-বাড়ির জলে ওই দুষ্টু কলকালি যে কী মিশিয়ে দেয় ভগবান জানেন। এ-বাড়িতে থাকলেই যে চুলের বারোটা বেজে যায় একথা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি।"

এ-বাড়ি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনেছি, কিন্তু চুলের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু বিশেষ জল-ঘোলা করবার সাহস পেলাম না—সায়েবের চুল যখন পাতলা হয়েছে তখন তাঁর স্ত্রী কোনো একটা দোষ খুঁজে বার করবেনই।

মিসেস টমসন এবার আমার আপ্যায়ন শুরু করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবেন?"

আমি ভাবলাম মিসেস টমসন জানতে চাইছেন, চা না কফি। তাই বলে ফেললাম, চা কফি কোনোটাতেই আমার আপত্তি নেই।

মিসেস টমসন এবার আমাকে অবাক করে দিলেন। বললেন, "ইচ্ছে করলে আপনি লেবুর জলও খেতে পরেন। ওঁকে তো চা-কফি কিছুই দিই না—কাজ থেকে ফিরে উনি লেবু-বাতাসার সরবত খান। ওতে শরীর গরম হয় না!"

বউ-এর পাল্লায় পড়ে কোনো খাস ইংরেজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একদা-দ্বিতীয় নগরীতে বাতাসার সরবত খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন তা আমার জানা ছিল না।

আমি কিন্তু সরবতের পক্ষে ভোট দিতে পারলাম না। মিসেস টমসন আমার জন্যে ইলেকট্রিক উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিলেন।

রান্নার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে শাড়ির আঁচলে নিজের হাত মুছলেন উমারাণী। তারপর নিজের গপ্পো শুরু করলেন।

বললেন, "আমার মা ছিলেন খুব গোঁড়া—একটু সেকেলে ধরনের। সায়েবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছে শুনে ওঁর সে কি দুশ্চিন্তা! আমাকে দেখে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বললেন, 'একি করলি তুই উমা। কেন আমি তোকে নার্সিং পড়তে পাঠিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম জাত ধর্ম দুটোই নষ্ট করে বসবি তুই'!"

একটু থামলেন উমারাণী। বললেন, "মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না, বিয়ে করলেই জাত ধর্ম নষ্ট হয় না।"

সুদূর অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে উমারাণী বললেন, "মা আবার ছিলেন স্বদেশী। ইংরেজদের মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না।"

মেয়ের বিদেশী স্বামী গ্রহণের সংবাদে সংসারে কীরকম উত্তেজনা সে যুগে সৃষ্টি হতে পারে তা কল্পনা করা আমার পক্ষে মোটেই শক্ত হলো না।

উমারাণী বললেন, “মায়ের ধারণা হয়েছিল, আমার কপালে অনেক অসম্মান ও দুঃখ লেখা আছে। ইংরেজ আমাকে নাকি খুব কষ্টে রাখবে এবং শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ঘরও করবে না!”

একটু থেমে উমারাণী বললেন, “হাজার হোক মায়ের মেয়ে তো! আমার মনেও একটু স্বদেশীভাব ছিল। তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম, বিয়ে করলেও নিজের হাবভাব চালচলন আমি পাল্টাচ্ছি না।”

চায়ের জলের দিকে একবার নজর দিয়ে এসে উমারাণী বললেন, “সামন্ত নামটা সরিয়ে কেবল টমসন করেছি। উনি তবুও বলেছিলেন, সামন্ত নামটা ছাড়বার দরকার কী? ইচ্ছে হলে, সামন্ত-টমসন লিখতে পারো তুমি। কিন্তু আমার ওই বিরাট গালভরা টাইটেল পছন্দ হলো না। বললাম, বিয়ে যখন করেছি, তখন গোত্র নাশ হয়েছে; সুতরাং শুধু শুধু ওই কুমারী নামটা রেখে স্বামীর অমঙ্গল ডেকে আনা কেন?”

মিসেস টমসন জানালেন, “এই সংসারে সব কিছুই আমার কথামতো চলছে। আমাকে একটি জাঁদরেল গিন্নি বলতে পারেন। উনি বলেছিলেন, আমাকে ‘বিল’ বলে ডাকো। আমি রাজী হইনি। মরণ আর কী! হিন্দুর ঘরের মেয়ে হয়ে কোন দুঃখে আমি স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে যাবো? আমি ও-নাম করি না, ‘ওঁকে কোনো নাম ধরেই ডাকি না। তবে ওঁর অভ্যেস পাল্টাতে পারিনি। উনি সেই যে গোড়া থেকে উমা ডাক ধরেছেন। তা পাল্টান নি। তাও আমি বলে দিয়েছি, আমার বাপের বাড়ির লোকজনদের সামনে যেন ‘উমা ডার্লিং’ বলে বোসো না। সায়েবদের ওই মস্ত দোষ—যেখানে-সেখানে বউয়ের ওপর ভালবাসা দেখায়, কোনো লজ্জাসংকোচ নেই!”

চা এসে গিয়েছে। সঙ্গে কিছু পেসট্রি। উমারাণী বললেন, “ওঁর আবার এইসব পেসট্রিটেসট্রি সহ্য হয় না। কাজ থেকে ফিরেই পরোটা দিয়ে আলু-চচ্চড়ি খেতে ভালবাসেন।”

খাস বিলিতী সায়েব পরোটা-আলুচচ্চড়ি দিয়ে জলখাবার সারছেন ভাবতে কেমন একটু অস্বস্তি লাগছিল।

উমারাণী ঘোষণা করলেন, “ওঁর ধাতটা একেবারে এদেশী। শুধু জন্মটাই ওদেশে। ব্রেকফাস্টে ওঁর প্রিয় খাবার চিঁড়ে, দই আর লেবু। আজ দুপুরে ওঁকে লাঞ্চ পাঠিয়েছি—বেগুন ভাজা, শুকতো, রুই মাছের ঝাল, আর চাটনি।”

খোদ ইংরেজ সায়েবের লাঞ্চ মেনু শুনে আমি তো তাজ্জব। উমারাণী বললেন, “ওঁর ত সব ভাল। কিন্তু ছোট ছেলের মতো মাছের কাঁটা এখনও আমাকে বেছে দিতে হয়। কিছুতেই ওই কাঁটা বাছা শিখতে পারলেন না। একবার তো নিজে মাছ খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা বিঁধিয়ে বসেছিলেন।”

“তারপর?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“এই শর্মা না থাকলে হাসপাতালে ছুটতে হতো আবার”, হুঙ্কার ছাড়লেন প্রাক্তন নার্স মিসেস উমারাণী টমসন। তারপর বর্ণনা করলেন কী-ভাবে ছোট্ট একটি চিমটে দিয়ে সায়েবের গলা থেকে মাছের কাঁটা বার করে আনলেন তিনি।

“দুপুরে সায়েবের মাছ বেছে দেবার জন্যে আপনাকে কী টিফিন-বাক্সের

সঙ্গে আপিসে যেতে হয়?" আমি এবার প্রশ্ন করি। মিসেস টমসনের কথাবার্তায় এমন আন্তরিকতার সুর রয়েছে যে এই ধরনের অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করতে একটুও দ্বিধা হয় না।

"ওইটেই বাকি আছে!" ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন উমারাণী টমসন। তারপর নিবেদন করলেন রান্নার আগেই মাছের কাঁটাগুলো বেছে ফেলে দেই। তাতে মাছের স্বাদ একটু অন্যরকম হয়ে যায়। কিন্তু কী করবো? সায়েব নিয়ে ঘর করছি যখন, তখন সব সুখ জুটবে কী করে?"

আমি সময়োচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করে মিসেস টমসনের কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি দুঃখ করলেন, "এক সময় আমার ফ্যাসা মাছ খাবার অভ্যেস ছিল। এই থ্যাকারে ম্যানসনে ভাড়া এসেও বিয়ের আগে আমি কতবার ফ্যাসা মাছ ভাজা এবং ঝাল খেয়েছি। কিন্তু এখন সে-গুড়ে বালি! আমি একলা টেবিলে বসে রসিয়ে-রসিয়ে ফ্যাসা মাছ চেবাবো, আর ও বেচারা মুখ শুকনো করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে তা হয় না, শংকরবাবু।"

উমারাণীর আত্মীয়স্বজনরা সায়েবকে কী বলে ডাকেন তা জানবার লোভ হলো। একগাল হেসে উমারাণী জানালেনঃ "বিলুদা। প্রথম নাম উইলিয়াম—অর্থাৎ বিল।"

"কী? খারাপ নাম হয়েছে?" মন্তব্য আহ্বান করলেন বিলুদার গৃহিণী।

"মোটেই না। একেবারে ঘরোয়া নাম হয়েছে ঠিক যেন কোন্নগর কিংবা উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করে আপনার স্বামী কোনোরকমে হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে এই থ্যাকারে ম্যানসনে চলে এসেছেন!"

খুশী হলেন মিসেস টমসন। বললেন, "কপালে যখন সায়েব স্বামী ছিল তখন কী করা যাবে! মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে হয়েছে!" উমারাণীর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব নেই।

দূরে ইনডোরে একটা দড়ি থেকে দু-একখানা পাঞ্জাবি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে আমি একটু সংশয়ে পড়ে গেলাম। আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে মিসেস টমসন বললেন, "বিলিতী স্লিপিং স্যুট আমার দু'চোখের বিষ। ঠিক যেন জেলের কয়েদী মনে হয়! সেইজন্যে পাঞ্জাবি-পায়জামার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ওঁর কোনো আপত্তি নেই—বাড়ির মধ্যে ওই ড্রেসেই থাকেন।"

চায়ের আসরে মিসেস টমসন আমাকে আরও বলেছিলেন, "উনি তো দেশে ফিরলেন না—এখানেই রয়ে গেলেন।"

দুষ্টু লোকরা রটায় আমিই নাকি ওঁকে দেশে ফিরতে দিইনি—ওদেশে গেলে আমার কালো চামড়ার জন্যে নাকি অসুবিধা হতো। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্যি নয়—ভগবানের নাম করে যখন পতি হিসেবে মেনে নিয়েছি, তখন উনি যেখানেই যাবেন, সেটাই আমার স্বর্গ। বিলেত যেতে আমার মোটেও ভয় ছিল না। কিন্তু উনিই তেমন উৎসাহ দেখালেন না। নিজের দেশে আত্মীয়স্বজনের তেমন পিছুটান নেই : এখানকার জল-হাওয়াটাও ওঁর সয়ে গেছে ; তাই সাত-পাঁচ ভেবে কলকাতায় রয়ে গেলেন।"

দ্বিতীয় বার চায়ের কাপ বোঝাই করে নিয়ে আমি মিসেস টসসনের মুখের দিকে তাকালাম। উনি মুখে একটা পান পুরে ফেললেন।

"আপনি পানও খান?" আমি একটু অবাক হয়ে যাই।

পানের বোঁটা থেকে জিভে চুন লাগাতে-লাগাতে উমারাণী বললেন, "ওমা! সায়েব বিয়ে করেছি বলে পানও খাবো না, তা আবার হয় নাকি?

বিয়ের সঙ্গে পানের কী সম্পর্ক?"

"বিলুদা পান খান?" আমি সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করি।

"সে আর বলবেন না। একবার পান খাওয়াতে গিয়ে কী বিপদ! সুপুরি বুকে আটকে গিয়ে সে কি সমস্যা। ইজি-চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় শুইয়ে দু গেলাস জল খাইয়ে কোনো রকমে ফাঁড়া কাটলো। সব জাতের লোকের সব জিনিস সহ্য হয় না, শংকরবাবু," এই বলে পরম নিশ্চিন্তে উমারাণী টমসন পান চিবোতে লাগলেন।

পানের পিক খানিকটা গিলে ফেলে উমারাণী টমসন সায়েবের কর্মজীবন সম্বন্ধে খবরাখবর দিলেন।

বললেন, "বিয়ের পরেই বলে দিয়েছিলাম, আর কাজকর্ম করা আমার পোষাবে না। নার্সের চাকরির যে কত হাঙ্গামা, অন্য লোকরা তা বুঝতেই পারে না। উনি অবশ্য কোনো আপত্তি করেননি—এক কথায় চাকরি ছেড়ে বাড়িতে এসে বসেছি। উনি ততদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নিজেই রয়েড স্ট্রীটে ছোট্ট একটা কারখানা খুলে বসেছেন।"

মুখে আর একটা পান গুঁজে উমারাণী বললেন, "ছোটবেলা থেকেই আমাকে সবাই একটু জেদী বলে জানে। মা তো ভেবেছিলেন, সায়েব একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবে। কিন্তু কপালগুণে সেসব তখন কিছুই হয়নি। উনি একেবারে মাটির মানুষ, নিজের কারখানার কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সংসারের ব্যাপারে আমিই সর্বেসর্বা, কখনও উনি কোনোরকম বাধা দেননি।"

এবার একটু চাপা গর্বের আভা ফুটে উঠলো মিসেস টমসনের মুখে। বললেন, "রাগ হলে আমি যে অন্য মানুষ তা উনি বুঝে গিয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই আমি ঘরে সুভাষ বোসের একটা ছবি রেখে-ছিলাম। উনি রেগে উঠলেন—গান্ধী সম্বন্ধে ওঁর ভক্তিশ্রদ্ধা আছে; কিন্তু সুভাষ বোসের ওপর কেন জানি না, খুব রাগ। কিন্তু আমার জেদ বেড়ে গেল। বললাম, বেশী কিছু করলে আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো। রাগের নমুনা বিয়ের পরেই একবার পেয়েছিলেন উনি। এবারে তাই একটি কথাও বললেন না, সুভাষ বোসের ছবি সেই থেকে আমার ঘরে রয়ে গেল।"

"ঘরের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ!" আমি মন্তব্য না-করে থাকতে পারলাম না।

"তা বলতে পারেন," উত্তর দিলেন মিসেস উমারাণী টমসন। "আমার মাকে হাতে-নাতে প্রমাণ দিয়ে দিয়েছি, সায়েবের দাসী-বাঁদী হবার জন্যে আমি বিয়ে করি নি। আমার গলার স্বর চড়লেই সায়েব যে ভয় পেয়ে যান এ-দেখে মা তো তাজ্জব। প্রথম-প্রথম দু-একদিন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেন নি।"

বিলুদা সায়েবটি সত্যিই নির্বিবাদী। অতি শান্তশিষ্ট লোক। নিজের ছোট্ট ব্যবসা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে আছেন। রয়েড স্ট্রীটের কারখানায় ইলেকট্রিকের কী সব যন্ত্রাংশ তৈরি করেন এবং সেগুলো বিখ্যাত এক কোম্পানিকে বেচে দিয়েই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরেও বিলুদা এই ক'বছর সেই এক কাজ করে যাচ্ছেন—ইংলণ্ডে ফিরে যাবার নামও করেননি তিনি।

উমারাণী টমসন বললেন, "শ্বশুরবাড়ির দেশে ওঁর থেকে-যাওয়ার পিছনেও আমি। যদিও মুখ ফুটে আমি কখনও বিদেশে যাবার অনিচ্ছা

প্রকাশ করিনি। বরং মুখে বলেছি, বিয়ে যখন করেছি, তখন স্বামী যদি নরকে নিয়ে গিয়ে রাখেন তবু হাসিমুখে ঘর-সংসার করবো। বলুন, হিন্দু-ঘরের মেয়েদের স্বামীর প্রতি এইটাই কর্তব্য কিনা?"

আমি বললাম, "অবশ্যই। পাত্র যখন নির্বাচিত হয়ে গিয়েছে, তখন স্থান-কাল নিয়ে আর কোনো কথা উঠতেই পারে না।"

আমার উত্তরে খুব খুশী হলেন মিসেস টমসন। বললেন, "ভারি সুন্দর বলেছেন আপনি। কিন্তু উনি একবারও ইণ্ডিয়া ছেড়ে লণ্ডনে চলে যাবার কথা তুললেন না। তার একমাত্র কারণ এই উমারাণী। উনি জানেন, শীতটা আমি তেমন সহ্য করতে পারি না। শীত পড়লেই সর্দি-কাশির অত্যাচার আরম্ভ হয়, কিছুতেই সামলে উঠতে পারি না।"

"ওঁর গরমে কষ্ট হয় না?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"হলেও বুঝতে দেন না। সমস্ত গরমকালটা তো ঘোলের শরবতের ওপর থাকেন। ফ্লাস্কে করে আপিসেও ঘোল নিয়ে যান।"

বেচারা বিলুদার ক্ষেত্রে বারবার এই ঘোল খাওয়াকে প্রতীকের মতো মনে হচ্ছে! কিন্তু মিসেস টমসনকে তা বলতে সাহস করলাম না।

চায়ের পর্ব শেষ করে দিয়ে আমি টমসন পরিবারের কথা ভাবছি। সুখের সংসার বলতে যা বোঝায়, তাই। বিলুদার রোজগার আছে, স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আছে ; কখনও তাঁর কথার অবাধ্য হন না। উমারাণীও স্বামীগরবে গরবিনী এবং পতিব্রতা। উমারাণী কুঁড়ে নন, সমস্ত সংসার মাথায় করে রেখেছেন। ছবির মতো ঘরসংসার। ঘরের এক কোণে শিবঠাকুরের মূর্তি রয়েছে—মিসেস টমসন এখনও নিয়মিত পুজো-আচ্চা করেন। বিলুদা কখনও আপত্তি করেননি। ঘরে ঠাকুর থাকায় রান্নাঘরে নিষিদ্ধ মাংস প্রবেশ করে না। কিন্তু মাঝে-মাঝে পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে স্বামীকে বীফ-স্টেক খাইয়ে আনেন উমারাণী। বাড়িতে মদ্যপানেরও ব্যবস্থা নেই। মিসেস টমসনের ভাষায়, "ভদ্র গৃহস্থ বাড়ি বলতে যা বোঝায়!"

এমন একটি শান্ত স্নিগ্ধ ছবি দেখার পরে মনটা প্রশান্তিতে ভরে যায়। থ্যাকারে ম্যানসনে ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার মধ্যে এমন একটি পরিবার যে ওয়েসিসের মতো বসবাস করছে তা ভাবতে আমি দ্বিগুণ আনন্দ অনুভব করছি। এই ধরনের প্রসন্ন পারিবারিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার পরে শুধু একটি কথাই বলার থাকে। তা হলো—অতঃপর তাঁরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পরম আনন্দে কালাতিপাত করতে লাগলেন।

আমি সেইরকমই আন্দাজ করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু চায়ের বাসন-পত্তর সরিয়ে মিসেস টমসন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "শংকরবাবু, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

কথা থাকলেই দেখেছি গোলমেলে পর্ব শুরু হয়ে যায়। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস টমসন বললেন, "আপনাকে আমি ভাল লোক বলেই জানি। আপনি এক কথায় ভাড়ার রসিদে আমার নাম পাল্টে দিলেন। আপনাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করি।"

আমি এখনও বুঝতে পারছি না, ব্যাপারটা কোন দিকে মোড় নেবে। মিসেস টমসন এবার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ৪৩ নম্বর ফ্ল্যাটের ওই অসভ্য মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

আমাকে সামনে বসিয়ে রেখে 'অসভ্য' এবং 'মেয়ে' দুটো কথার ওপর সমান জোর দিলেন তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মিসেস উমারাণী টমসন।

'মেয়ে' শব্দটির আগে অসভ্য বিশেষণটির অর্থ গুরুতর হতে পারে ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা না-থাকলে এ-বিষয়ে কোনো রকম মন্তব্য করা নিরাপদ নয়। সুতরাং এইক্ষেত্রে নির্বাক থাকাই যুক্তিসঙ্গত।

উমারাণী টমসন এবার গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, "আপনি আপনার কাজের জন্যে সমস্ত ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখেন না? নিজের চোখে সব না দেখলে এতো বড়ো রাজত্ব চালাবেন কী করে?"

মিসেস টমসনের প্রশ্নের কী উত্তর দেবো? কাজের সুবাদে কিছু কিছু ফ্ল্যাটে যে গতায়াত নেই, এমন নয়। কিন্তু এই থ্যাকারে ম্যানসনের খোপে খোপে কী হচ্ছে তা নিজে ঘুরে ঘুরে দেখতে আরম্ভ করলে ফলাফল শুভ নাও হতে পারে। এক এক ভাড়াটে এক এক রকম খেয়ালে থাকেন। মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে তাঁরা নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন; কিন্তু আশ্রয় পেয়েই তাঁরা ভুলে যেতে চান যে, বাড়িটার অন্য মালিক আছেন। বিনা প্রয়োজনে বাড়িওয়ালার প্রতিনিধির উপস্থিতিকে তাঁরা প্রাইভেসীর ওপর অত্যাচার ও অনধিকার চর্চা বলে মনে করেন।

বরদাপ্রসন্নবাবু একবার আমাকে বলেছিলেন, "ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার সম্পর্কটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। মানুষ ছাড়া ভগবানের রাজত্বে আর কোথাও এই পয়সা নিয়ে থাকতে দেবার ব্যবস্থা নেই। কোকিল, সাপ, সিংহ অনেকেই পরের তৈরি বাসায় বসবাস করে—কিন্তু এর জন্যে ভাড়া গোনার ব্যবস্থা নেই! একমাত্র মানুষই পয়সার বদলে অন্য লোকের তৈরি ঘরে মাথা গোঁজে। কিন্তু গোড়াতেই গলদ থেকে যায়—তাই এদের সম্পর্কটা কখনও স্বাভাবিক হয় না।"

উমারাণী টমসনকে এসব কথা বলে লাভ নেই। বাড়িওয়ালার কর্মচারীর কী দুঃখ সে সম্বন্ধে তিনি কেন মাথা ঘামাতে যাবেন?

আমাকে নিরুত্তর দেখে মিসেস টমসনের একটু বোধহয় অভিমান হলো। বললেন, "কী, চুপ করে রয়েছেন কেন? আপনাদের বুঝি এক ভাড়াটের কাছে অন্য ভাড়াটে সম্বন্ধে আলোচনা বারণ?"

আমি আমতা আমতা করছি, ৪৩ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া সম্বন্ধে আমি ৩৩ নম্বর বসে কোনো মন্তব্য করা নিরাপদ কিনা তাও বুঝতে পারছি না। গণপতিবাবু আমাকে বারবার বলে দিয়েছিলেন, "এই ফ্ল্যাটবাড়িতে নিজের দেমাকে কাজ করতে হলে নিজের মনের চাবিকাঠিটা কাউকে দেবে না। এক-ঘরে তোমার কথা টেলিগ্রাফের তারে অন্য ঘরে ছড়িয়ে পড়তে কয়েক মিনিটও লাগবে না, এবং তার হেফা সামলাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।"

মিসেস টমসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কাছ থেকে তিনি কিছু একটা উত্তর চান।

নিরুপায় হয়ে আমি বললাম, "আপনি ৪৩ নম্বর ফ্ল্যাটের মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ঠাকুরের কথা বলছেন?"

কোনো রকম দ্বিধা না-করে মিসেস টমসন বললেন, "একসঙ্গে একই ফ্ল্যাটে থাকলেই মিসেস হওয়া যায় না, শংকরবাবু। মিস্টার ঠাকুরের ফ্ল্যাটে যে মেয়েমানুষটি আছেন, আমি তাঁরই কথা বলছি।"

মিসেস টমসনকে সচরাচর এমন বিরক্ত হতে দেখা যায় না।

৪৩ নম্বরের মালিককে মনে করবার চেষ্টা করলাম। এ-বাড়িতে যে-সামান্য কয়েকজন বঙ্গসন্তান সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে এখনও ভাসমান রয়েছেন তাঁদেরই একজন। এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, ভাড়ার পেমেণ্টও তেমন নিয়মিত ছিল না। তবে ইদানীং ৪৩ নম্বরের মিস্টার ঠাকুর নিজের দুর্নাম অনেকখানি ঘুচিয়েছেন—মাসের ভাড়া মাসের মধ্যেই চলে আসছে।

৪৩ নম্বরের ভিতরের কথা আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু কিছুদিন আগে রামসিংহাসন আমাকে একটা নেমপ্লেট দেখিয়ে গেছে। বাড়িওয়ালার অনুমতি ছাড়া এ-বাড়িতে কোনো নেমপ্লেট টাঙানোর নিয়ম নেই। রাম-সিংহাসন যে বোর্ডখানা দেখিয়েছিল তা যে তারই কোনো পার্টির কাছে আঁকানো তা ওর আগ্রহ দেখেই বোঝা যায়। সেখানে লেখাঃ 'অভিনব ঠাকুর ও অঞ্জলি ঠাকুর'। আমার সামনে বোর্ডখানা রেখেই রামসিংহাসন মন্তব্য করেছিল, "কিছু চিন্তা নেই, সায়েব নিজের এবং মিসেসের নাম বাইরে লিখে রাখতে চান।" স্ত্রী স্বাধীনতার এই যুগে অনেকেই বাড়ির বাইরে স্ত্রীর নামও লিখে রাখছেন, এ-বিষয়ে আমাদের কিছুই বলবার নেই, সুতরাং আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়েছি।

ঘটনাটা মনে পড়ায় মিসেস টমসনকে বললাম, "আপনি মিস্টার অভিনব ঠাকুর এবং মিসেস অঞ্জলি ঠাকুরের কথা বলছেন?"

মিসেস টমসন যেন আঁতকে উঠলেন, "কী বললেন? উনি আবার অঞ্জলি হলেন কবে? বলেন কী! বাইরে আবার ওই নাম লিখে দিয়েছে, এবং আপনারা খোঁজখবর না করে পারমিশন দিয়ে দিলেন। আপনি বড্ড সরল লোক, শংকরবাবু, আপনি কোনদিন হঠাৎ বিপদে পড়ে যাবেন।"

আরও কথাবার্তা হতো, কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে বেল বেজে উঠলো। আওয়াজটা শুনেই উমারাণী বললেন, "এই যাঃ! উনি এসে গেলেন। এতো সকাল সকাল তো আসেন না।"

দরজা খুলে দিতেই টমসন সায়েব ভিতরে এসে ঢুকলেন এবং উমারাণী একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। সায়েবকে চেয়ারে বসিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এতো তাড়াতাড়ি চলে এলে? শরীর ভাল তো।"

সায়েব রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন এবং তারপর এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চাইলেন। মেমসায়েব একেবারে দেশী প্রথায় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, 'তেতে-পুড়ে এসে জল খেতে নেই, এখনি সর্দি ধরে যাবে।'

বেচারা সায়েব বউয়ের কথার প্রতিবাদ করলেন না। মিসেস টমসন কিন্তু সত্যিই স্বামীর সেবাযত্ন করেন। উঠে গিয়ে একটা পাতি লেবু নিয়ে এলেন। স্বামীর হাতে লেবুটা দিয়ে বললেন, "এটা ততক্ষণ শোঁকো, তেষ্টার ভাবটা কমে যাবে। তারপর জল দিচ্ছি তোমাকে।"

আমাকে দেখিয়ে উমারাণী বললেন, "এঁকে চেনো তো? আমাদের ম্যানসনের ম্যানেজার। বাড়ি ঘরদোরের অবস্থা সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম।"

এরপর আমাকে বিদায় জানাবার জন্যে মিসেস টমসন বললেন, "আচ্ছা শংকরবাবু, অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। আবার দেখা হবে।"

মিস্টার টমসনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো এখানে?"

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। তিনি এই বাড়িতে এবং এই দেশে বেশ ভাল আছেন। টমসন সায়েব যে খুব শান্ত এবং নির্বিবাদী তা তাঁর কথাবার্তার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায়।

৩৩ নম্বর থেকে বেরোবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দ্বিতীয় চিঠি এসে গেল। এবারেও দূতের কাজ করেছে সহদেব। একটুকরো চিরকুটে এবারে চায়ের নেমন্তন্ন পাঠিয়েছেন ৪৩ নম্বরের মিসেস ঠাকুর। লিখেছেন, "আজকেই আসা চাই। তিনি কোনো কথা শুনতে চান না।"

হঠাৎ এ-বাড়ির ভাড়াটিয়ারা আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে উঠছেন কেন বুঝতে পারছি না? সহদেবের মুখের দিকে তাকালাম। "তুই কিছু বলেছিস? ব্যাপার কী?"

সহদেব সরল মনে বললো, "আমি কিছু জানি না, হুজুর। তবে আপনার যত নিমন্ত্রণ আসে আমার ততই ভাল। তেত্রিশ নম্বরে রান্নার পাট বন্ধ তো এখন। আমি পুরা সাপ্লাই করছি। একেবারে ইংলিশ কুকিং—ও-ঘরে দিশীখানা চলেই না।"

সহদেবকে তখনকার মতো বিদায় করে দিলাম। ৪৩ নম্বরের চিঠিটা আমার টেবিলের ওপরেই পড়েছিল। নিজের কাজে একবার অফিস ঘরে এসে তেলকালিবাবু আড়চোখে চিঠিখানা দেখলেন। তেত্রিশ নম্বরের মিসেস টমসনের সঙ্গে আমার অসমাপ্ত সাক্ষাতকারের কথা তেলকালিবাবু জানেন।

তিনি বললেন, "যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হলো—তেত্রিশ নম্বর থেকেও আপনাকে ডেকে পাঠালো!"

ভয় পাবার কী থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। তেলকালিবাবু বললেন, "একটা জিনিস জেনে রাখবেন আপনার পিছনে স্পাই আছে। তেত্রিশ নম্বরে আপনার টি পার্টির ব্যাপারটা নিশ্চয় জানাজানি হয়ে গিয়েছে।"

তেলকালিবাবু এ-বিষয়ে বেশী উৎসাহ দেখালেন না। এই অবস্থায় বেশী কিছু প্রকাশ করতেও চাইলেন না। শুধু বললেন, "কলকালির ওপর একটু নজর রাখা দরকার। ওর স্টিয়ারিংটা নিজের কনট্রোলে রাখবেন, স্যর।"

আমার চিন্তা বাড়লো, কিন্তু এখন পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। তাই যথাসময়ে তেত্রিশ নম্বরের ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছি। তখন ঠিক চারটে বাজে। বিকেলের এই সময়টা থ্যাকারে ম্যানসন একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে—কোথাও তেমন প্রাণচাঞ্চল্য থাকে না। এমন সময়েই বিভিন্ন ফ্ল্যাটের গৃহিণীরা কেন যে আমাকে আপ্যায়িত করেন, ভগবান জানেন। বোধ হয়, বাড়ি সংক্রান্ত অপ্রিয় কাজকর্মগুলো একালের গৃহিণীরা কর্মক্লান্ত স্বামীর গৃহ-প্রত্যাবর্তনের আগেই সেরে ফেলতে চান।

মানস নেত্রে শাড়ি-পরিহিতা অঞ্জলি ঠাকুরের যে ছবি এঁকে রেখেছিলাম তার সঙ্গে যিনি ৪৩ নম্বরের দরজা খুললেন তাঁর ছবি মিললো না। ইনি একটি লুজ ফ্রক পরেছেন, পায়ে চটি, মাথায় ববছাঁট চুল এবং মুখে ইংরেজী

ভাষা। ভদ্রমহিলা অবশ্যই তন্বী, বয়স এখন তিরিশের সীমানা স্পর্শ করেনি।

এই ইঙ্গ বঙ্গ ললনা অবশ্যই অঞ্জলি ঠাকুর হতে পারেন না। আমি কী দরজা ভুল করলাম?

কিন্তু মহিলা হাসিমুখে আমাকে ভিতরে আসতে বললেন। আমি সাহস সঞ্চয় করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে বললাম, "কিছু মনে করবেন না, আমি মিসেস অঞ্জলি ঠাকুরকে খোঁজ করছি।"

একগাল হেসে ইঙ্গবঙ্গ-ললনা ইংরিজীতে উত্তর দিলেন, "আসুন। আমিই মিসেস ঠাকুর।"

মিসেস ঠাকুরের মুখখানা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। মিসেস ঠাকুরও আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কখনও কী হাইকোর্ট পাড়ায় টেম্পল চেম্বার্সে কাজ করতেন?"

অবশ্যই করতাম। ওইখানেই ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েবের চেম্বার ছিল।

মিসেস ঠাকুর বললেন, "আমিও তো ওই বাড়ির টপ ফ্লোরে কাজ করতাম। লিফটে ওঠবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। আমার নাম ছিল মিস বোস্টন—অ্যানজেলা বোস্টন। আমার বউদির ডাইভোর্স কেস আপনাদের চেম্বারেই হয়েছিল।"

ওঁর বউদিকে মনে পড়লো বটে। বললাম, "কিছু মনে করবেন না। উকিলের কাজ—যিনি আসবেন তাঁর হয়েই লড়াই করতে হয়। অনেক চেষ্টা করেও আপনার দাদা বিয়েটা অক্ষত রাখতে পারেননি—মিসেস বোস্টন ডাইভোর্স পেয়েছিলেন।"

মিসেস ঠাকুর ও-ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামালেন না। বললেন, "টেম্পল চেম্বারের লিফ্‌টের সামনে কত রকম ইণ্টারেস্টিং লোক দেখতে পাওয়া যেতো। এবার মিসেস ঠাকুর কোনো রকম দ্বিধা না করেই জানালেন, "মিস্টার ঠাকুরের সঙ্গে ওই লিফ্‌টেই আমার প্রথম দেখা।"

লিফটে দেখা-সাক্ষাৎ হতে হতে প্রেম ও বিবাহ! প্রেমের সম্ভাবনা কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

মিসেস ঠাকুর এবার পরিচয়ের সূত্র খুঁজে পেয়ে অনর্গল বকে চলেছেন। বললেন, "মিস্টার ঠাকুরদের সঙ্গে টেগোর ফ্যামিলির দূর সম্পর্ক আছে। ওর নামটাও খুব রেয়ার। 'অভিনব'—স্বয়ং পোয়েট ওই নাম দিয়েছেন। ওই নাম আর একটাও শুনেছো তুমি?"

সত্যিই এ-নামের আর কাউকে চিনি না। মিসেস ঠাকুর বললেন, "আমার স্বামী একটি জিনিয়াস! আমার নাম ছিল অ্যানজেলা—একটু অ্যাডজাস্ট করে নতুন নাম দিয়েছেন 'অঞ্জলি'।"

"ভারী সুন্দর নাম হয়েছে," আমাকে স্বীকার করতেই হয়।

প্রাক্তন মিস বোস্টন বললেন, "নামটা আমারও খুব ভাল লেগেছে।"

নাম ছাড়া আর সব ব্যাপারেই এই ফ্ল্যাটে সায়েবী কায়দার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

আমার দিকে চায়ের ট্রে এগিয়ে দিতে দিতে অঞ্জলি ঠাকুর বললেন, "আমি যদি জানতুম, আমাদের চেম্বারের লোকই এখানকার ম্যানেজার তা হলে অবশ্যই অনেক আগে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।"

এর পর অঞ্জলি ঠাকুর আমাকে অনেক কথা বলে গেলেন। মিস্টার ঠাকুর

নাকি অতি চমৎকার লোক। টেম্পল চেম্বারের কোনো আপিসে চাকরি করেন। একটু ইংরিজী-কেতার লোক। নিজের নামছাড়া বাংলা ভাষার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। টেগোরের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা কখনও ভুলেও মুখে আনেন না। মিসেস ঠাকুর আমাকে সাবধান করে দিলেন, "কখনও যেন ওই প্রসঙ্গ ওঁর সামনে তুলো না। আমার ওপর রাগ করবেন। বাঙালী দেখলেই আমি নাকি টেগোরের কথা তুলতে চাই।"

চা পর্ব শেষ করার পরেই মিসেস ঠাকুর কাজের কথা শুরু করলেন। বললেন, "আমি এখানে বেশী দিন আসিনি, মিস্টার শংকর। আমার স্বামীর মুখে আগে শুনতাম তোমাদের থ্যাকারে ম্যানসন বাড়িটা ভাল। কিন্তু আমি এখন মতামত চেঞ্জ করছি।"

মতামত পাল্টাবার মতো কী এমন ঘটনা ঘটলো? আমি মিসেস ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

"এ-বাড়িতে ভাল লোক নেই এমন কথা বলছি না—কিন্তু কয়েক জন খুব খারাপ লোক আছেন।" নির্দ্বিধায় নিজের মতামত ঘোষণা করলেন অঞ্জলি ঠাকুর।

"এতো বড় বাড়িতে কয়েকজন খারাপ লোক থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?"

মিসেস ঠাকুর আমার কথায় কান দিলেন না। বললেন, "৪৩ নম্বরের ঠিক নিচে যে ৩৩ নম্বর ফ্ল্যাট রয়েছে তার মহিলাটি মোটেই সুবিধের লোক নয়।"

"আপনি মিসেস টমসনের কথা বলছেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওই সো-কলড মিসেস টমসন ছাড়া আর কার কথা তোমাকে বলবো।"

দুই বিরোধী পক্ষের গুলি বিনিময়ের মধ্যে পড়ে গেছি মনে হলো। এ-অবস্থায় কী ধরনের কথাবার্তা বলা নিরাপদ তা ঠিক করে উঠতে পারছি না।

মিসেস ঠাকুর বললেন, "আপনি অনুগ্রহ করে ওই মহিলাটিকে মনে করিয়ে দেবেন যে, একখানা ফ্ল্যাটের ভাড়া দিয়ে সমস্ত থ্যাকারে ম্যানসনের মালিকের মতো ব্যবহার কেউ বরদাস্ত করবে না।"

আমাকে নিরুত্তর দেখে মিসেস ঠাকুর আরও তপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "অন্য কেউ সহ্য করলেও, আমি সহ্য করছি না।"

মিসেস ঠাকুরের রাগ আরও বেড়ে উঠলো। বললেন, "শুনছি উনি দল পাকাবার চেষ্টা করছেন আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না।"

মিসেস টমসনের বিরুদ্ধে মিসেস ঠাকুরের এতো রাগের কারণ কী বুঝতে পারছি না। মিসেস ঠাকুর বললেন, "আমি ওঁকে সোজাসুজি জানিয়ে দিতে চাই আমার ঘরে আমি যা-খুশি তাই করবো। উনি যতই চেষ্টা করুন আমাদের এখান থেকে তুলতে পারবেন না।"

যতদূর জানি মিস্টার ঠাকুর এখানে বেশ কয়েক বছর আছেন, মিসেস টমসন কখনই ওপরের ফ্ল্যাটের ভাড়াটের সঙ্গে ঝগড়া করেননি। কিন্তু এখন কী ব্যাপার হলো?

মিসেস ঠাকুর বললেন, "এক একজন হিংসুটে মহিলা থাকেন। ব্যাচে-

লরদের তাঁরা কিছু বলেন না, তাদের, সাতখুন মাপ। কিন্তু ম্যারেড মহিলা দেখলেই তাদের গ্যাসট্রিক আলসারে জ্বালা শুরু হয়ে যায়।"

আমি এই পরিস্থিতিতে মোটেই মুখ খুলতে চাই না। শুধু বুঝছি, দুই ভাড়াটের মধ্যে উত্তেজনা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্ল্যাট বাড়ির ওই দোষ। কখন কার সঙ্গে কী মনোমালিন্য হবে তা বলা শক্ত।

মিসেস ঠাকুর বললেন, "আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে রাখছি, তেমন হলে আমাকে পুলিসে অথবা আদালতে ওই ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে হতে পারে—এবং বাড়িওয়ালা হিসেবে আপনাকেও ওর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো না। আপনি যদি পারেন, ওই মহিলাকে আর পাঁচটা ভদ্র ভাড়াটের মতো ব্যবহার করতে বলবেন।"

মিসেস ঠাকুর বললেন, "মহিলা যদি ভেবে থাকেন দুনিয়ার সমস্ত লোক ওঁর ফ্ল্যাটের পুরুষমানুষটির মতো হাঁদা-গঙ্গারাম, তা হলে খুব ভুল করেছেন।"

মিসেস ঠাকুরের রাগ আরও চড়বার আগেই আমি ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এই সব ব্যাপার জানলে কে ওঁর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতো? বেরুবার আগে বললাম, "অফিসে খুব জরুরী কাজ আছে। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।"

মিসেস ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে আপিস ঘরে ফিরে তখনও হাঁপাচ্ছি। এমন সময় কলকালির প্রবেশ। আমার সেই অবস্থা দেখে কোথায় সহানুভূতি দেখাবে, না পানের কষে লাল হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বার করে কলকালি হাসছে।

কলকালি জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ মেমসায়েব আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, হুজুর? ৪৩ নম্বর, না তেত্রিশ?

"তাতে তোমার দরকার?" একটু রাগতভাবেই কলকালিকে উত্তর দিয়েছিলাম।

কলকালি মোটেই বিরক্ত হলো না। বরং দুঃখের সঙ্গে বললো, "আমার 'মাথা' খারাপ হয়ে যাবে, হুজুর।"

মাথা খারাপ হয়ে যাবার মতো পরিস্থিতি এখনও উপস্থিত হয়নি। কিন্তু কলকালি একটুতেই নার্ভাস হয়ে পড়েছে মনে হলো।

কলকালি এবার জানতে চাইলো, "আমার কথা কিছু উঠেছে কিনা?"

আমি সোজাসুজি কোনো উত্তর দিতে চাই না। কলকালি জানালো, তার কাছে ভিতরের খবর আছে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবার জন্যেই রামসিংহাসনের পরামর্শে ৩৩ নম্বরের মেমসায়েব এবং ৪৩ নম্বরের মেমসায়েব দুজনেই উঠে পড়ে লেগেছেন। এবং এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, চতুর রামসিংহাসন সুযোগ বুঝে দু'পক্ষকেই গোপন পরামর্শ দিয়ে চলেছে।

চাতুর্যে কলকালিও যে কারুর চেয়ে কম যায় না, এমন একটা গুজব আমার কানে আসতো। কিন্তু আজকে কলকালির মুখের ভাব ও নার্ভাস অবস্থা দেখে তা মনে হলো না।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আরও কিছুক্ষণ ধরে হয়তো চলতো, কিন্তু এই সময় তেলকালিবাবু চটি এবং হাফপ্যাণ্ট পরে গম্ভীর মুখে আপিস ঘরে ঢুকলেন। তেলকালিবাবুকে দেখামাত্র কলকালি কথা বন্ধ করে দিলো; তৃতীয় ব্যক্তির অস্বস্তিকর উপস্থিতিতে সে যে, গোপনীয় আলোচনা চালিয়ে যেতে উৎসাহী নয় তাও সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেলো।

কলকালি এবার কাজের ছুতোয় সুড়ুক করে আপিস ঘর থেকে কেটে পড়লো। বলে গেলো, তার হাতে জরুরি কাজ রয়েছে—ছাদের রান্নাঘরে পাইপ লিক হয়ে কেলেংকারি কান্ড হয়েছে। তীরের বেলে জল বেরিয়ে রান্নাঘরে বন্যা—বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে।

ছাদের রান্নাঘরের পাইপ কয়েক দিন আগেও যেন মেরামত হয়েছে, মনে পড়লো।

তেলকালিবাবু হেসে বললেন, "ছাদের পাইপের আর দোষ কি স্যর! ফুটো হয়ে কালোয়ারের দোকানে ফিরে যাবার জন্যেই তো ওদের জন্ম!"

তেলকালিবাবুর কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তিনি একগাল হেসে বললেন, "লোহার জীব বলে কি আর 'পেনসিয়ন' খেতে ইচ্ছে করে না, স্যর? সেই ন্যাড়া রাজার আমলের লোহার পাইপ সব যে এখনও টিকে আছে এইটাই আশ্চর্য।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "এই তো সাতদিন হয়নি, রিপেয়ার করেছে।"

কলকালির হয়ে তেলকালি আর্গুমেণ্ট করলেন, "অন্য দেশ হলে একই পাইপে একশ' বছর চলে যেতো। কিন্তু এ যে কলকাতা শহর, স্যর—নোনা লাগার জন্যে ওয়ার্লর্ড ফেমাস! এখানকার আকাশে বাতাসে এমন কি নিশ্বাসে পর্যন্ত নোনা—মানুষ থেকে আরম্ভ করে মেসিন, ম্যানসন কিছুই এখানে লংলাইফ পাবে না!"

তেলকালিবাবুর বলবার ধরনে নাটকীয়তা রয়েছে। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে মুখ চোখের ভাব লক্ষ্য করছি। হাত পা নেড়ে তেলকালিবাবু বললেন, "কলকালিটা যদিও ছিঁচকে, নজরও একটু নিচু, তবু ওকে আমি হিংসে করি না, স্যর। পাইপ এবং প্লাম্বিং-এর কাজ করে শান্তিতে থাকবার জায়গা এই কলকাতা শহর নয়। এখানকার জল, স্যর জল নয়—অ্যাসিড।" এই বলে তেলকালিবাবু এমনভাবে মুখ বিকৃত করলেন যেন ভুলক্রমে কিছুটা অ্যাসিডই এই মুহূর্তে তিনি পান করে ফেলেছেন।

ডান পা টানতে টানতে তেলকালিবাবু এবার একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, "দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ লোহার পাইপের ভিতর দিয়ে জলের সঙ্গে অ্যাসিড গেলে সে পাইপের আর কী থাকবে বলুন?"

তেলকালিবাবু যা বলছেন তার পিছনে অবশ্যই যুক্তি আছে। আমার নিঃশব্দ নিরুৎসাহ লক্ষ্য করে তেলকালিবাবু দুঃখ করলেন, "ওই ব্যাটা কলকালিকে বলি, তুই একটা রিপোর্ট কর—কর্তাদের জানিয়ে দে দাদু-পাইপদের খরচের খাতায় নাম লিখিয়ে এবার নাতি-পাইপদের আমদানী না করলে আর কাজ চলবে না। কিন্তু হতভাগা কলকালি কিছুতেই তা

করবে না।”

কলকালির এই নির্লিপ্ততার কারণ জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি এমন সময় চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে উঃ বলে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তেলকালিবাবু আবার বসে পড়লেন।

যন্ত্রণায় তেলকালিবাবু তখনও মুখ বিকৃত করে আছেন। আমি শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম, “কিছু হলো নাকি? অমন মুখ বেঁকাচ্ছেন কেন?”

মুখের বিকৃতভাব পরিবর্তন না-করেই কাতরভাবে তেলকালিবাবু বললেন, “আর বলবেন না, স্যর। পায়ের অবস্থাটা দেখুন না! ফুলে ঢোল হয়ে আছে—সাধে কী আর হাফ প্যাণ্টের সঙ্গে শু-এর বদলে চটি চাপিয়েছি!”

বয়স হচ্ছে তেলকালিবাবুর। আমি ভাবলাম, বাত বা ওই ধরনের কোনো অসুখবিসুখ ওঁকে পাকড়াও করেছে।

আমার কথা শুনে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন তেলকালিবাবু। বাঁ পাটা ডান পায়ের ওপর তুলে ফোলা অংশে খুব সাবধানে হাত বোলাতে লাগলেন।

পায়াভারীর কারণও এবার জানা গেল। অসুখবিসুখ নয়, একটা পুরনো পাখার যন্ত্রাংশ হঠাৎ পায়ের ওপর পড়ে যাওয়ায় এই দুর্ভোগ।

ইংরেজ আমলে বোধ হয় প্রথম এই বাড়িতেই ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বিনা খরচে ইলেকট্রিক ফ্যান বসানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। তেলকালিবাবুর বাবাও এ-বাড়িতে ইলেকট্রিকের কাজকর্ম করেছেন। তাঁর মুখেই তেলকালিবাবু শুনেছেন, “বিনা পয়সায় পাখা ফিটিং-এর খবরটা ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ মন্তব্য করেছিল, অন্য বাড়ির ভাড়াটে ভাঙাবার জন্যে এও এক ষড়যন্ত্র। এ-যে অর্ধেক রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা দেবার ব্যবস্থা!”

তেলকালিবাবু দুঃখ করলেন, “পাখার পরমায়ু মানুষের থেকে বেশী নয়, স্যর। কিন্তু সেই যে ফ্যান ঝোলানো হলো, তারপর এতো বছর ধরে কেউ আর নতুন পাখা সাপ্লায়ের ব্যাপারে মাথা ঘামালো না।”

আমি বললাম, “যা সব ভাড়ার পরিমাণ! দেওয়াল রংয়ের খরচই ওঠে না, আবার বিনা পয়সার পাখার-হাওয়া!”

তেলকালিবাবু উত্তর দিলেন, “বেশ তো, না-পোষায়, পুরনো যন্ত্র-গুলো ফ্ল্যাট থেকে নামিয়ে এনে ও-বেচারাদের মুক্তি দিন। হাড়-ভাঙা অবস্থায় কতদিন আর ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলবে? আর আমাকে জ্বালাবে?”

চিন্তিতভাবে তেলকালিবাবু জানালেন, “সাত নম্বর ঘরের পাখাটা বেশ কিছুদিন ধরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে চিৎকার করতো; আমাকে দেখলেই ওর চিৎকার বেড়ে যেতো। আমি সেদিকে তেমন কান দিই নি। এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নিলো। হাড়গোড় ভেঙে নির্বংশ হবার আগে আমার হাড়-গোড় ভাঙবার চেষ্টা করে গেল!”

তেলকালিবাবুর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যেন সত্যিই বিশ্বাস করেন এ বাড়ির পুরনো যন্ত্রগুলোর প্রাণ আছে: সাত নম্বর ঘরের পাখার কিছু অংশ ইচ্ছে করেই ওঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত দিয়েছে।

ফ্যানের ব্যাপারে আমার নিরুৎসাহ ভাব লক্ষ্য করে তেলকালিবাবু একটু দুঃখ পেলেন। বললেন, “আপনি ইয়ংম্যান, আপনার মন পড়ে রয়েছে

ভবিষ্যতের দিকে। কোনোদিন পার্ক স্ট্রীট বা থিয়েটার রোডের নতুন হাই-রাইজ ফ্ল্যাটের ম্যানেজার হয়ে চলে যাবেন, তাই পুরনো পাখা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। কিন্তু, স্যর, এই বিল্ডিং লাইনে যখন এসেছেন, তখন পাখার হাত থেকে আপনার মুক্তি নেই। আজকালকার নতুন নতুন ফ্ল্যাটে বাড়ি-ওয়ালাই ঘরে ঘরে ফ্যান ঝুলিয়ে রেখে দিচ্ছে। রুটির সঙ্গে মাখন, কচুরির সঙ্গে ডাল, পানের সঙ্গে চুন, আর ফ্ল্যাটের সঙ্গে 'ফার্নিচার অ্যান্ড ফিটিংস!' না হলে দুশো টাকার কুটুরি লোকে কেন পাঁচশ টাকা ভাড়ায় নেবে? দু'-চারখানা পাখা আর সস্তা আলমারি না দেখালে সেলামীই বা আসবে কী করে? বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপনে দেখেন না, ফার্নিচার বায়িং এসেনশিয়াল। কেনো ফার্নিচার ঢোকো বাড়িতে ; তুমি কী আমার পর?"

তেলকালিবাবুকে জানিয়ে দিলাম, "আপাতত এই থ্যাকারে ম্যানসনে টিকে থাকতে পারলেই আমি ধন্য। অসংখ্য নতুন-পাখাওয়ালা বাড়িতে আমার কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরের কোনো পরিকল্পনা এখন আমার নেই। কিন্তু এ-বাড়িতে ঘরে ঘরে বিনা মূল্যে ফ্যান সরবরাহ করার কোনো চুক্তিতে আমরা আবদ্ধ নই। এবং কেনই যে সে-যুগের কর্তারা এই ফ্যান সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা আমার জানা নেই।"

"উত্তর খুব সোজা", মুখের ওপর বললেন তেলকালিবাবু। "ভাল ভাড়াটে টানবার জন্যে। এ-সংসারে ভাড়াটে অনেক আছে, স্যর। কিন্তু বেশীর ভাগ বাউন্ডুলে ভাড়াটে! ভাল ভাড়াটে আনবার জন্যে এবং রাখবার জন্যে সে যুগে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতো।"

"নিজের ইচ্ছেয় এ যুগে বউ ছাড়া কিছুই নির্বাচন করা যায় না, তেল-কালিবাবু। ইচ্ছে থাকলেই ভাড়াটে পাল্টানোর স্বাধীনতা মালিক বা ম্যানেজার কারও নেই। সুতরাং, এ-বাড়িতে ফ্যান বদলাবার আশা ছাড়ুন।"

তেলকালিবাবু বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "পাখা দেওয়া না-দেওয়া সে না-হয় আপনাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু জলের পাইপ? পাইপের একটা গতি করুন।"

নিজের এক্তিয়ার থেকে কলকালির দিকে সরে যাচ্ছেন তেলকালিবাবু। আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখেও নিরুৎসাহ হলেন না তিনি। তেলকালি-বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মানুষের শরীরে কত শিরা উপশিরা আছে, জানা নেই।" জানেন?

তেলকালিবাবু বললেন, "বউবাজার মিশনারী ইস্কুলের মাস্টারমশাই আমাদের বলে দিয়েছিলেন, মানুষের দেহে যে শিরা-উপশিরা আছে তা বেশ কয়েক মাইল লম্বা। এই থ্যাকারে ম্যানসনের পাইপ লাইন তার থেকেও লম্বা এবং তার থেকেও জটিল। কিন্তু এ-বাড়ির সমস্ত পাইপের এখন হাড়-মড়মড়ি ব্যারাম ধরেছে। সময় থাকতে একটা কিছু না-করলে কোনদিন বিপদে পড়ে যাবেন।"

"কী বিপদ?" আমি জানতে চাই।

একগাল হেসে তেলকালিবাবু আমাকে সাবধান করে দিলেন, "জল আর হাওয়া এক জিনিস নয়, স্যর। কলকাতার আইনে, ভাড়াটেকে হাওয়া না-খাওয়ালে আদালত আপনাকে কিছু বলবে না। হাওয়ার বদলে কয়লাবিষের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই করে দিলেও কেউ আপনার টিকি স্পর্শ করবে না।

কিন্তু জলের ব্যাপার অন্য। জল-সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব বাড়িওয়ালার—এই দায়িত্বে অবহেলা করে কলকাতার কত বাড়িওয়ালা হাজত ঘুরে এসেছে! জলের ব্যাপারে আইন খুব কড়া স্যর।"

জল-পাইপের ব্যাপারে তেলকালিবাবু যা বলছেন অবশ্যই তার যৌক্তিকতা রয়েছে। এ বিষয়ে বাড়ির মালিকের যে সজাগ হবার সময় এসেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তেই তেলকালিবাবুর কাছে আমার নিরুপায় অবস্থার ছবি তুলে ধরতে চাই না।

সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়ে, মূল প্রশ্ন এড়াবার জন্যে অন্য কথা তুলতে বাধ্য হলাম।

বললাম, "জলের ব্যাপারে আপনি এতো ভাবনা-চিন্তা করছেন। কিন্তু কলের ডাক্তার কলকালির তো মাথাব্যথা নেই। এ-বাড়ির নলচে পাল্টে দেবার কোনো কথা সে তো একবারও বলে না। এই যে রান্নাঘরে জলের পাইপ ফুটো হয়ে পিচকিরি দিয়ে জল বেরুচ্ছে, সে তো কোনো মন্তব্য না-করে কলের চিকিৎসার জন্যে চলে গেল।"

তেলকালিবাবুর মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, "কোন্ দুঃখে কলকালি আপনাকে ওসব কথা বলতে যাবে? হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে?"

তেলকালিবাবুর বক্তব্যে কিছুটা হেঁয়ালিপনা থেকে যাচ্ছে। তাই ওঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হলাম।

গলার ভল্যুম কমিয়ে দিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "আপনার মাইনের ওপর নির্ভর করে কলকালির ঘরসংসার চলছে কী? আপনার মাইনের টাকায় ভবানীপুরে যে বাঙালী মেয়েমানুষটি রেখেছে তারই খরচ ওঠে না!"

কলকালির ব্যক্তিগতজীবন নতুন আলোকে রহস্যময় হয়ে উঠছে। কিন্তু ভবানীপুরের ওই বাঙালী-মেয়েটি সম্বন্ধে আমার এই মুহূর্তে কোনো আগ্রহ নেই। আমি থ্যাকারে ম্যানসনে কলকালির কর্মজীবন সম্বন্ধে অবহিত হতে চাই।

তেলকালিবাবু বলেন, "পাইপের রোগ এ-বাড়িতে লেগেই আছে-- সুতরাং কলের ডাক্তারের নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই। কেস খুব খারাপ। সুতরাং ডাক্তারবাবু যা ভিজিট চাইবেন ভাড়াটেদের তাই দিতে হবে।"

কেস খারাপ কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তেলকালিবাবু বললেন, "কারণ ভূভারতে আর একটিও ডাক্তার নেই যিনি এই থ্যাকারে ম্যানসনে জল-পাইপের রোগ সারাতে পারেন। আপনি আসবার আগে বরদাপ্রসন্নবাবু তো একবার চেষ্টা করেছিলেন। রেগে ক্ষেপে কলকালিকে ছুটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চারদিনের মধ্যে ত্রাহি মধুসূদন রব উঠলো। নতুন মিস্ত্রি কল সারাতে এসে রোগ বাড়িয়ে দিলো, যেখানে হাত দেয় সেখানেই পাইপ ভেঙে পড়ে, কল 'চোক' হয়ে যায়। ব্যাটা কলকালি তখনও দেশে যায়নি। ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটে মেয়েমানুষের বাড়িতে শুয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। বরদাবাবু নিজে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন।"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। মন্তব্য করলেন, "বরদাবাবু যখন গলবস্ত্র হয়ে ডাকতে গেলেন তখন কী মেজাজ কলকালির। বললে, 'ভেবে দেখি, কাজ করবো কিনা।' কিন্তু বাঙালী মেয়েমানুষটি অতি ভদ্র। বরদাবাবুর

দুঃখ সে বুঝলো। পুরুষমানুষটি তখনও তা-না-না করছে দেখে বকুনি লাগালো, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। এখনই কাজে যেতে হবে তোমাকে। না-হলে আমার দরজাও বন্ধ। বাউন মানুষ, স্নান করে অভুক্ত অবস্থায় তোমাকে আদর করে ডাকতে এসেছেন, আর তুমি কিনা বলছো, ভেবে দেখি।' তখন ফিরে আসবার পথ পায় না কলকালি।"

বরদাবাবু পরে বলেছিলেন, "সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর দেখা পেলুম, তেলকালি। একেবারে দয়ার শরীর। আমার দিকে পুরো না ঝুঁকলে কলকালিকে ফিরিয়ে এনে ওই ফাটা পাইপ রিপেয়ার করাতে পারতাম না।"

তেলকালি এবার আমাকে বললেন, "বরদাবাবু বাধ্য হয়ে বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটেরও ওই মেয়েমানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ওর ভয়েই কলকালি বিশেষ অবাধ্য হতো না বরদাবাবুর।"

কলকালি সম্বন্ধে আমার যা-ধারণা ছিল তা ক্রমশই পাল্টে যাচ্ছে। লোকটি যে মহামূল্যবান তা বরদাপ্রসন্নবাবু আমাকে বলেও যাননি। বোঝা যাচ্ছে, ম্যানেজার অথবা মালিক ছাড়া থ্যাকারে ম্যানসন চলবে, কিন্তু কলকালির অনুপস্থিতিতে এ-বাড়ি অচল!

তেলকালিবাবু বললেন, "আজব ব্যাপার, বিশ্বাস করবেন না। সেবার কলকালি ফিরে এল, আর আড়াই ঘণ্টার মধ্যে থ্যাকারে ম্যানসনের সমস্ত জলের পাইপ আবার ঠিক হয়ে গেল।"

"সেটা কী করে সম্ভব?" আমি জানতে চাই।

"আমাদের তো সেই একই প্রশ্ন ছিল", উত্তর দিলেন তেলকালিবাবু। "স্বীকার করছি, লাইনের হাড়-হদ্দ কলকালি জানে, তাড়াতাড়ি সারাতে পারে, কিন্তু তা-বলে আড়াই ঘণ্টায়! কিন্তু ব্যাটা কলকালি পান চিবোতে চিবোতে আমাকে তখন কী বলেছিল জানেন?"

কলকালির গোপন রহস্যটি জানবার জন্যে আমিও উৎসুক হয়ে উঠেছি। অনুরোধ করলাম, "বলে ফেলুন।"

"যন্তর হাতে নিয়ে কলের পাইপে প্যাঁচ লাগাতে লাগাতে ফিক করে হেসে কলকালি বললো, সর্দার চলে যাওয়ায় পাইপ এবং বিব্‌ ককগুলো এসট্রাইক করেছিল। বুঝুন মশাই, কত বড় স্পর্ধা! কলের পাইপের স্ট্রাইক, এমন কথা বিশ্বসংসারে কেউ শুনেছে? কিন্তু মিথ্যে না-হতেও পারে! কলকালি ছাড়া ওইসব ঝড়-ঝড়ে আদ্যিকালের পাইপে অন্য কেউ হাত দিক সঙ্গে সঙ্গে কুড়মুড় করে মুচড়ে যাবে, ঝরে পড়বে। কিন্তু কলকালি নিজে হাত দিক! কিছুই হবে না—মনে হবে যেন স্টুয়ার্ট-লয়েড কোম্পানি থেকে এইমাত্র পাইপ কিনে এনে মালিক বসিয়ে দিয়েছেন!"

আমি বললাম, "ওসব কথা এখন থাক, তেলকালিবাবু। জল আর পাইপের কথা তুলে আমাকে আর ভয় পাইয়ে দেবেন না। এমনিতেই আমার মাথায় অনেক দুশ্চিন্তা।"

"আমরা থাকতে আপনার দুশ্চিন্তা কেন? কলকালি তো আপনাকে অমান্য করে না। তেমন অবাধ্য হলে বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের ঠিকানা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।"

আমার দুশ্চিন্তা যে অন্য তা এবার নিবেদন করলাম তেলকালিবাবুকে। "তেতাল্লিশ নম্বর ও তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধে মনে হচ্ছে না, তেলকালিবাবু। দু'জনেই আমাকে ডেকেছেন, দু'জনেই আমাকে

চা খাইয়েছেন—মিসেস উমারাণী টমসন এবং মিসেস অঞ্জলি ঠাকুর। কিন্তু কোথায় যেন একটু গোলমাল মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, নিজের অজান্তে কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছি কি না। অথচ এ-ব্যাপারে আপনি ছাড়া আর কারও কাছে পরামর্শ নেবার কথা ভাবতে পারছি না।"

বয়োজ্যেষ্ঠ তেলকালিবাবু অভয় বাণী দিলেন। বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, যতক্ষণ এই তেলকালি রয়েছে, ততক্ষণে আপনার বিটেল-লিফ থেকে লাইম রিমুভ করতে দিচ্ছি না কাউকে।"

তেলকালিবাবুর কথাবার্তায় সত্যি ভরসা পেলুম। ওঁর কাজকর্ম কথা-বার্তায় আমার বেশ বিশ্বাস জন্মেছে।

তেলকালিবাবু বললেন, "ওয়ান মিনিট—আপনি ৩৩ নম্বরের মিসেস টমসন এবং ৪৩ নম্বরের মিসেস ঠাকুরের কথা বলছেন। একখানা ফ্ল্যাট ঠিক আর একখানা ফ্ল্যাটের ওপর। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। ঘরের মধ্যে ঘর এক রকম, ঘরের বাইরে ঘর সে তো অতি উত্তম ; কিন্তু ঘরের মাথায় ঘর ? গড সেভ দি কুইন!—খুব খারাপ কেস হতে পারে!"

"কেন ? কী ব্যাপার!" আমি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না।

কিন্তু তেলকালিবাবু নিপুণভাবে আমার কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "যথা সময়ে সব বলবো'খন, এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনি এখন বলুন, মিস্টার টমসন আপনাকে কী বলেছেন ?"

"কিছুই বলেন নি," আমাকে নিবেদন করতে হলো।

"মিস্টার অভিনব ঠাকুর ?" তেলকালিবাবু এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন।

"উনিও কিছু বলেন নি। যা-কিছু কথাবার্তা দুই মহিলার সঙ্গে হয়েছে।" আমার উত্তর শুনে তেলকালিবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললেন, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা আর লোয়ার লেভেলে নেই।"

"ডিসট্রিক্ট কোর্ট থেকে কেস এখন হাইকোর্টে চলে গিয়েছে!" মন্তব্য করলেন তেলকালিবাবু।

খোঁড়া পা-নিয়েই তেলকালিবাবু এবার উঠে পড়লেন। বললেন, "কিছু কিছু হাঁড়ির খবর আমার কাছে আছে। কিন্তু আরও কিছুটা সরেজমিনে তদন্ত করে বার করে নিচ্ছি। একেবারে ভাববেন না, ফুল রিপোর্ট আপনি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন," এই বলে বাঁ পাটাকে সাবধানে ফেলতে-ফেলতে তেলকালিবাবু তেইশ-তেত্রিশ তদন্তের জন্য আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

যাবার আগে দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "কলকালির সঙ্গে এ বিষয়ে যেন একদম আলোচনা করবেন না। বুঝলেন ?"

তেইশ নম্বরের উমারাণী এবং তেত্রিশ নম্বরের অ্যানজেলা সম্বন্ধে তেল-কালিবাবুর গোপন প্রতিবেদন আমার হাতে পুরোপুরি পৌঁছবার আগেই

পরিস্থিতি কিছুটা গুরুতর হয়ে উঠলো।

তেলকালিবাবু আমাকে ধৈর্য ধরবার উপদেশ দিয়েছিলেন। দুএকদিন পরেই বলেছিলেন "যথাস্থানে খবর সংগ্রহের জন্যে ঝি এবং সুইপারদের লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু একটু সময় লাগবে। খবর পেয়েই আপনাকে দেওয়া যাবে না, একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। ঝি-চাকরের রিপোর্ট অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছেন তো মরেছেন!"

তেলকালিবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন, "এ ব্যাপারেও মেয়েমানুষ আছে, স্যর। নাটকীয় কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।"

"নাটক-নভেলের প্রয়োজন নেই আমার, তেলকালিবাবু। আমি এই দুই ফ্ল্যাটের সমস্যা মিটিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে চাই", আমার উদ্দেশ্যটা সোজা বাংলায় তেলকালিবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আমার কথায় মোটেই শান্ত হলেন না তেলকালিবাবু। গম্ভীর-ভাবে বললেন, "যে-কোনো সমস্যার পিছনে মেয়েমানুষের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আমার মনে সন্দেহ থেকে যায় স্যর! মনে হয় গলদের গোড়ায় এখনও পোঁছতে পারি নি।"

"এখানে দুজন মহিলা তো চোখের সামনেই রয়েছেন", আমি তেলকালি-বাবুকে পরিস্থিতিটা আবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে সচেষ্ট হলাম।

তেলকালিবাবু আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। "আমি স্যর বলছি থার্ড পার্টির কথা! প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ তো চোখের সামনে থাকবেই। কিন্তু যত গোলযোগ তো তৃতীয় পক্ষ থেকে!"

রিপোর্ট না পেয়ে আমার ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে দেখে কয়েক দিন পরে তেল-কালিবাবু বললেন, "তা হলে যতটা খবর সংগ্রহ করেছি আপনাকে বলেই ফেলি।"

তেলকালিবাবুর প্রাথমিক রিপোর্ট এই রকম ঃ

তেত্রিশ নম্বরের উমারাণী সামন্ত অনেক দিন নিজের মনে নিজের সায়েবকে নিয়ে ঘরসংসার করছিলেন। কোথাও কোনোরকম অশান্তি ছিল না।

ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটেই অনেকদিন থাকেন মিস্টার অভিনব ঠাকুর। আদবে-কায়দায় একেবারে ১০৫% সায়েব। বিলিতি খানা খান অভিনব ঠাকুর, বিলিতি ছবি দেখেন, বিলিতি গান শোনেন। হাসি কান্না, স্বপ্ন দেখা মিস্টার ঠাকুরের সব কিছুই ইংরিজীতে। মাঝে মাঝে ইংরিজী গানের সুর মেঝে চুঁইয়ে নিচের ফ্ল্যাটে উমারাণীর ঘরে চলে আসতো। নৃত্যের তালে-তালে কোনো কোনো রাত্রে উমারাণীর পাতলা ঘুম কিছুটা বিঘ্নিত হলেও উমারাণী সেসব নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামাননি। বলেছেন, "ব্যাচেলরদের কিছু প্রিভিলেজ তো থাকবেই। ইয়ংম্যানের প্রাইভেট ব্যাপারে আমরা কেন শুধু শুধু নাক গলাতে যাবো?"

"তারপর?" আমি এবার তেলকালিবাবুকে জিজ্ঞেস করি।

তেলকালিবাবু বললেন, "যতদিন মিস্টার ঠাকুর বিয়ে-থা করেননি ততদিন দুই ঘরের সম্পর্কে কোনো চিড় ধরেনি। বরং জানাশোনা, যাতায়াত ভালই ছিল। কখনও কখনও তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের চাবি জরুরী কাজ-কর্মের জন্যে তেইশ নম্বরে রেখে গিয়েছেন মিস্টার ঠাকুর।"

তেলকালিবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "ব্যাপারটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

ব্যাচেলর হয়ে একলা ফ্ল্যাট সাজিয়ে থাকার অনেক সুবিধে। ঝি চাকর দারোয়ান ধোপা নাপিত সবাই ব্যাচেলরের সঙ্গে কাজকর্ম করতে পছন্দ করে। কোনো রকম হাঙ্গামা নেই। কিন্তু ব্যাচেলরের মুশকিল একটিই। সেটি হলো ফ্ল্যাট খুলে রাখা—কখন কোন্ গয়লা, কোন্ জমাদার, কোন্ ঝি আসবে তার জন্যে হাঁ করে অপেক্ষা করো।"

আমি তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, "সেই জন্যে ফ্ল্যাটের চাবিটি কারও কাছে দিয়ে যাবার সুযোগ থাকলে, ব্যাচেলরের আর বিয়ে করবার কোনো দরকার নেই! সেই স্পেশাল সার্ভিস উমারাণী অনেক সময় আপনার ওই তেতাল্লিশ নম্বরের মিস্টার ঠাকুরকে দিয়েছেন। হাজার হোক বাঙালীর ছেলে, এই সায়েবপাড়ায় একা-একা রয়েছেন।"

তেলকালিবাবু বললেন, "এতো সুবিধে সত্ত্বেও, মিস্টার ঠাকুর একদিন ওই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেম-সায়েবকে ঘরে এনে তুললেন। খুব আগেকার ব্যাপার নয়, মাত্র সেদিনের ব্যাপার।"

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম "ফ্ল্যাট যখন মিস্টার ঠাকুরের, তখন কাকে গৃহিণী নির্বাচন করে ঘরে আনবেন তার পুরো স্বাধীনতা অবশ্যই তাঁর।"

তেলকালিবাবু নিবেদন করলেন, "সে তো আপনি বলছেন, স্যর। কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকলেই নানা রকম কথা উঠবেই। নানা লোকে, বিশেষ করে অন্য বাড়ির গিন্নিরা জানতে চাইবেন—মহিলা কে? কোত্থেকে এলেন? কীভাবে আলাপ পরিচয় হলো?"

"এই সব স্পেশাল কেসে আবার খোঁজখবর চলে আদৌ বিয়ে হয়েছে কিনা? না, স্রেফ কাউকে ঘরে এনে বসিয়ে মিসেস বলে ডাকা হচ্ছে!" তেলকালিবাবু আমাকে এখানকার সামাজিক পরিবেশটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

বিভিন্ন জাতের মিলনক্ষেত্র এই কসমোপলিটান ম্যানসনে এই ধরনের কৌতূহল এবং সন্দেহ প্রকাশের কোনো স্থান নেই বলেই আমার আন্দাজ ছিল। সকলেই যে-যার কাজে-কর্মে ব্যস্ত রয়েছে বলেই আমি মনে করেছিলাম।

তেলকালিবাবু আমার ভুল ভেঙে দিলেন। বললেন, "সমস্ত ব্যাপারটা পিক্যুলিয়র বলতে পারেন। যেসব ফ্ল্যাট মার্কামারা হয়ে গিয়েছে, যেমন চৌত্রিশ নম্বর, সে সম্বন্ধে লোকজনদের তেমন স্পেশাল আগ্রহ নেই। কে আসছে, কে যাচ্ছে, ভিতরে কী হচ্ছে সে নিয়ে লোকে গবেষণা করছে না। কিন্তু যত গোলমাল এই সব গেরস্ত ফ্ল্যাট নিয়ে। ব্যাচেলরের ফ্ল্যাটে নতুন মহিলাকে বসবাস করতে দেখলেই, সাধারণভাবে ধরে নেওয়া উচিত ভদ্রলোকের 'ব্যাচেলরত্ব' শেষ হয়েছে এবং এবার স্টিয়ারিং ধরবার লোক এসে গিয়েছেন। কিন্তু এখানে আজকাল এই বিশ্রী ব্যাপার। নতুন মহিলা দেখলেই প্রথমে জানতে চায় বিয়ে হয়েছে কিনা।"

এই কৌতূহল যে অশোভন ও অসঙ্গত তা তেলকালিবাবুকে জানিয়ে দিতে আমি দ্বিধা করলাম না।

তেলকালিবাবু বললেন, "এক সময় আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু ধোপা, দর্জি, মাছওয়ালা—এ বাড়ির অনেকেই ঠেকে শিখেছে।"

"ঠেকবার কী হলো?" আমি এখনও তেমন বুঝতে পারছি না।

তেলকালিবাবু বললেন, "ছত্রিশ নম্বরেই তখন এক ইয়ং ম্যান থাকতেন।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক। কোত্থেকে এক ফুটফুটে মেয়েকে এনে তুললেন। সবাই ধরে নিলো, মিস্টার চন্দ্রনের ওয়াইফ। সন্দেহ করবার কোনো স্কোপ নেই—মেমসায়েব নিজে বাজার করেন, ঘর পোঁছেন, রান্না করেন, চন্দ্রন সায়েবের সংগে একই টেবিলে খানা খান। চন্দ্রন সায়েব যখন স্কুটারে চড়ে আপিসে যান তখন মহিলা বারান্দা থেকে হাত নেড়ে টা—টা করেন। তারপর হঠাৎ মশাই, মেমসায়েব একদিন দুপুরে ট্যাক্সি ডেকে কিছু মালপত্তর নিয়ে উধাও হলেন। আমরা ভাবলাম, মেমসায়েব বোধ হয় বাপের বাড়ি যাচ্ছেন। কিন্তু ওমা! ও সব কিছুই নয়—মেমসায়েব অনেক জিনিসপত্তর নিয়ে কেটে পড়লেন।”

“তারপর?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“কেলেংকারি কাণ্ড, বলতে পারেন” উত্তর দিলেন তেলকালিবাবু। “যাবার আগে, মেমসায়েব বহুলোকের কাছ থেকে মালপত্তর কিনেছেন। বাজারে দেনা কিছু না হোক সাত-আটশ' টাকা। তা ছাড়া দর্জির মোটা বিলও ছিল। এ পাড়ার ফেরিওয়ালা দর্জি নতুন মেমসায়েব দেখে অনেক মাল গছিয়ে দিয়েছে। সেই সব ব্লাউজ এবং জামাকাপড়ের বিল না দিয়ে মেমসায়েব টুক করে কেটে পড়লেন। সায়েবের কাছে তাগাদা দিতে সায়েব কোনো দায়িত্ব নিলেন না। বললেন, তাঁরও কিছু দামী জিনিস ওই মহিলা নিয়ে গিয়েছেন।

পাওনাদাররা বললো, “আপনার বউ যা দেনা বাধিয়েছে তার দায়িত্ব আপনার। সেই না শুনে, চন্দ্রন সায়েব স্রেফ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। সত্যি কথাটাও জানিয়ে দিলেন। ওই সুন্দর মেয়েমানুষটি অবশ্যই ওঁর বউ নয়।”

“তার মানে?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“বউ যখন নয়, তখন আর কী হতে পারে আন্দাজ করে নিন! এ বাড়ির লোকগুলো নিজেদের আঙুল কামড়াতে লাগলো। অনেকগুলো টাকা লোকসান দিয়ে তাদের শিক্ষা হলো, ফ্ল্যাটের কলিংবেল টিপলে যিনি বেরিয়ে আসেন তিনি সায়েবের মিসেস নাও হতে পারেন। আর জেনুইন মিসেস না হলে দেনাপাওনার দায়িত্ব সায়েব অক্লেশে উড়িয়ে দিতে পারেন।”

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, “এরকম কেস রোজ হয় না। কিন্তু এখানকার লোকদের লোকদের ভরসা কমে গিয়েছে। তারা কোনো ফ্ল্যাটে নতুন মেমসায়েব দেখলেই গবেষণা শুরু করে—জানতে চায় বিয়ে করা বউ না এস্পেশাল বউ।”

আবার একটু থামলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, “তেতাল্লিশ নম্বরের ক্ষেত্রে তা ব্যাপারটা আরও জটিল। সায়েবের নাম ঠাকুর—কিন্তু গাউনপরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেমসায়েব। খাঁটি বিলিতী মেমসায়েব দাস ঘোষ চক্রবর্তীর ঘর করছে এমন তো দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেম-সায়েব বাঙালীকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছেন এমন তো সচরাচর দেখা যায় না। তাই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।”

এবার আমি প্রশ্ন করি, “মিস্টার ঠাকুরের সংগে ওই অ্যাংলো মেম-সায়েবের কণ্ঠিবদল হয়েছে না রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছে, না আদৌ কিছু হয় নি তাতে আমাদের কী এসে যায়, তেলকালিবাবু? বিশেষ করে ওঁরা যখন নিজেদের মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বলে পরিচয় দিচ্ছেন?”

তেলকালিবাবু এবার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। বললেন, "মেমসায়েব আসবার পর সবই আরও ভালভাবে চলা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের সকলের ওপরে যিনি রয়েছেন তাঁর বোধহয় তা ইচ্ছে নয়। বিয়ের পরে যেখান গেলমাল লাগে সেখানেই লাগলো।"

"নতুন বউ নিয়ে মিস্টার ঠাকুর ঘরকন্না করছেন, এর মধ্যে মিসেস উমারাণী সামন্ত এসে পড়লেন কী করে?" আমি জানতে চাই।

কোনো রকম অবাক না হয়ে তেলকালিবাবু উত্তর দিলেন "নর্মাল প্রসেসেই গোলমালটা বেধে গেলো। যাকে আপনারা বলেন কিনা থ্রু প্রপার চ্যানেল।"

"দুটি পরিবার দুটি আলাদা ফ্ল্যাটে নিজের-নিজের ভাড়া গুণে থাকেন। এর মধ্যে আবার প্রপার চ্যানেল কী?"

তেলকালিবাবু আমাকে শান্ত হবার উপদেশ দিলেন। বললেন, "মাথাটা একটু খাটাতে হবে। আইন-কানুন আপনি অনেক জানতে পারেন স্যর, কিন্তু ফ্ল্যাট বাড়ির পলিটিক্স এখনও আপনার পুরো হজম হয়নি। মনকষাকষি, ঝগড়াঝাটির চ্যানেল ফ্ল্যাট বাড়িতে একটিই থাকে!"

"দারোয়ান?" আমি আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম।

"দারোয়ান তো সর্বশক্তিমান! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ আর ফ্ল্যাটে বাস করে দারোয়ানের সঙ্গে ঝগড়া একই জিনিস। সুতরাং, রামসিংহাসনজীর কথা উঠতেই পারে না।"

"তা হলে?"

গম্ভীর হয়ে তেলকালিবাবু জানালেন, "ঝি. সুকুমারী ঝি অনেকদিন ধরে কোনো গোলমাল না করে ঠাকুর সায়েবের ফ্ল্যাটে কাজকর্ম করতো। মাইনে, ডিউটি কিছু নিয়েই কোনো গোলমাল ছিল না। গোলমাল শুরু হলো এই নতুন মেমসায়েব আসবার মাসখানেক পরেই। ছোটখাট ব্যাপারে খিটিমিটি লেগে আছে। সুকুমারী আবার ভীষণ অভিমানিনী. একটুতেই তার মানসম্মানে লেগে যায়। আর লাগবে নাই বা কেন? স্বয়ং রামসিংহাসনজীর ফেভারিটদের লিস্টিতে সুকুমারী একেবারে টপ পোজিশনে রয়েছে। এ বাড়ির কত ঝি-চাকর তাকে খাতির করে চলে, সে কেন ওই নতুন বউয়ের মুখঝামটা সহ্য করবে?"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গলার স্বর নামিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "তারপরই অঘটন ঘটলো! বলা নেই কওয়া নেই সুকুমারী একদিন তেতাল্লিশ নম্বরের মেমসায়েবকে বরখাস্ত করলো।"

"মিসেস ঠাকুর ওই সুকুমারীকে বরখাস্ত করলেন, বলুন", আমি তেলকালিবাবুর বক্তব্য সংশোধনের চেষ্টা করলাম।

কিন্তু তেলকালিবাবু আমার কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়েই উত্তর দিলেন, "যা বলেছি ঠিকই বলেছি। এ-পাড়ায় আজকাল ঝি-রাই মালিকদের বরখাস্ত করে মালিকদের সাধ্য কি ঝিদের তাড়ায়!"

তেলকালিবাবু বললেন, "সুকুমারী ঝি এর পরেই তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের মেমসায়েবকে সিলেকশন করলো। মিসেস ঠাকুর একদিন মিসেস টমসনের ফ্ল্যাটে বেড়াতে এসে সুকুমারীকে কাজ করতে দেখলেন। গল্প করা মাথায় উঠলো, হাসি মুখে এসেছিলেন, কিন্তু মুখ হাঁড়ি করে নিজের ফ্ল্যাটে ফির

গেলেন অঞ্জলি ঠাকুর।”

ঝি-এর ব্যাপারটা তেতাল্লিশ নম্বরের মেমসায়েব পার্সোনাল অপমান হিসেবে নিলেন। ঝি-ভাঙানো যদি শত্রুর কাজ না হয় তাহলে আর কিসে শত্রুতা হবে? সেই থেকেই যুদ্ধ ঘোষণা হলো দু'পক্ষের। মিস্টার ঠাকুর মাঝে মাঝে আসতেন উমারাণীর কাছে। তা বন্ধ হলো। উমারাণী নিজেও ওপরের ভাড়াটের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন।”

সামান্য ঝি থেকে যে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে মনোমালিন্যের শুরু হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

তেলকালিবাবু বললেন, “এ আর কী! বছর দশেক আগে এখানে একজন ঝি-কে নীলামে তোলা হয়েছিল।”

“মানে? মানুষকে এযুগে আবার নীলামে তোলা যায় নাকি?”

“পুরুষমানুষ মেয়েমানুষ কাউকেই এই স্বাধীন ভারতবর্ষে নীলামে তোলা যায় না। কিন্তু ঝি-এর মাইনেকে অবশ্যই ‘অকশন’ করা যায়। এক ভদ্রলোক ঝি-কে পনেরো টাকা দিচ্ছিলেন, অন্য ফ্ল্যাটের কর্তা তাকে কুড়ি টাকা মাইনের লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিলেন। খবর পেয়ে ভীষণ চটে উঠলেন এক নম্বর ফ্ল্যাটের কর্তা। তিনি ঝিকে চল্লিশ টাকা মাইনে দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন। দু'নম্বর কর্তারও মেজাজ চড়া। অপমানিত বোধ করে তিনি এবার ষাট টাকা মাইনে দিতে চাইলেন সেই ঝিকে। ঝি-এর মাইনে এই থ্যাকারে ম্যানসনে শেষ পর্যন্ত কত উঠেছিল জানেন?”

আমি আন্দাজ করতে সাহস পেলাম না।

তেলকালিবাবু বললেন, “সোনা দিয়ে বাঁধানো স্পেশাল ঝি নয়! বাসন মাজা, বাটনা বাটার অর্ডিনারি ঝির মাইনে উঠেছিল, বললে বিশ্বাস করবেন না মাসে দেড়শ' টাকা!”

শুনে আমি তাজ্জব। অবাক হবারই কথা। এখনও সেই ঝি এই বাড়িতে কাজ করছে কিনা জানতে চাইলাম।

তেলকালিবাবু দুঃখ করলেন, “আর কয়েক বছর আগে এখানে এলেই আপনাকে ওই দুজন নীলামদার ও ঝিকে দেখিয়ে দিতাম। কিন্তু দুজনেই এখন জেলে। একজনের পিছনে লাগলো কাস্টমস—বাড়ি সার্চ হলো। আর একজনের পিছনে লাগলো আবগারী ইন্সপেক্টর—চোলাই মদফদ কী সব নাকি কোথায় পাওয়া গেলো। শুনেছি, দুজনেই দুজনের পিছনে গোপনে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছিল। তার থেকেই সার্চ এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীঘর!”

“আর নীলামের ঝি-এর?”

“বেচারা ফুলেশ্বরী!” দুঃখ করলেন তেলকালিবাবু। “নীলামের রেটে মাইনে পেয়েছিল মাত্র মাস চারেক। মেজাজ দেখিয়ে অন্য সব ঠিকে কাজও সে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর কেঁদে কুল পায় না। দুই কর্তা জেলে যাওয়ার পরে পুরনো রেটেই ফুলশ্বরী কাজকর্ম খুঁজেছিল। কিন্তু এ-বাড়িতে কেউ তাকে রাখতে সাহস পেলে না। তখন বাধ্য হয়ে ফুলেশ্বরী ভাবনানি ম্যানসনে চলে গেলো। ওখানে এখনও কাজ করছে—কিন্তু মনে সুখ নেই। এখনও জিজ্ঞেস করে সায়েব কবে জেল থেকে বেরোবেন। কিন্তু জেল থেকে বেরোলেও কর্তাকে আর থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরতে হচ্ছে না। সেই সব ফ্ল্যাট খালি করে রামসিংহাসন কবে আবার নতুন ভাড়াটে বসিয়ে দিয়েছে।”

তেলকালিবাবুর সঙ্গে আর কথা বলা গেলো না। কারণ, তেত্রিশ নম্বর থেকে আবার জরুরী ডাক এসেছে। সহদেব বললো, "দেরি করলে চলবে না। মেমসায়েব আপনাক সঙ্গে নিয়ে চলে আসতে বলেছেন।"

খুন জখম ছাড়া এই ধরনের জরুরী তলবে ভাড়াটে বাড়ির ম্যানেজার অভ্যস্ত নয়। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে হলো।

সেখানে গিয়েই দেখলাম উমারাণী টমসন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। কোনো রকম উপক্রমণিকা না করে ভদ্রমহিলা আমাকে নিয়ে স্নান-ঘরের কাছে চলে গেলেন।

দরজা বন্ধ ছিল কিন্তু এমারজেন্সি টোকা দিতেই দরজা খুলে গেলো। প্রায় অনাবৃত দেহে স্নানরত অবস্থায় আমার মতো তৃতীয় পক্ষকে উপস্থিত দেখে উমারাণীর ইংরেজ স্বামী মিস্টার টমসন বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু উমারাণীর সেজন্য কোনো দ্বিধা নেই। তিনি আমাকে বললেন, "নিজের চোখে দেখে যান। না হলে তো বিশ্বাস করবেন না।"

সমস্ত ব্যাপারটা এমন দ্রুত ঘটে গেলো যে, আমি তাজ্জব। উমারাণী বললেন, "পুরো ভাড়া মাসে মাসে দেওয়ার পরে আমার স্বামী কীভাবে স্নান করছেন দেখুন।"

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, মিস্টার টমসন সাবেকী বাংলা প্রথায় একটা বালতী থেকে মগে করে মাথায় জল ঢালছেন। হাওড়া বিহারী চক্রবর্তী লেনে আমরা এইভাবেই স্নান করতাম ; কিন্তু খাস ইংরেজ সায়েবকে কখনও এই অবস্থায় দেখিনি আমি। কোনো সায়েব যে স্নানের এই দিশী পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত তাও আমার অজানা ছিল।

উমারাণীর নির্দেশে সায়েব আবার কলঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আফ্রিকার সিংহিনীর মতো রাগে টগবগ করে ফুটছেন মিসেস উমারাণী টমসন। স্থলের প্রাণী হলেও জলের অভাবে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান এমন লুপ্ত হয়ে যায় যে সেই সংকট মুহূর্তে কোনোরকম তর্ক করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই দুঃখ প্রকাশ করে আমি জানতে চাইলাম জল সাপ্লাই কখন বন্ধ হলো? যদিও মনে মনে আমারও বিরক্তি বাড়লো। যে-ব্যাপারে কল-কালিকে খবর দেওয়া উচিত ছিল সে ব্যাপারে শুধু শুধু আমাকে এইভাবে টেনে আনার কোনো অর্থ হয় না।

উমারাণী বললেন, "উনি যখন স্নান করতে ঢুকলেন তখনও শাওয়ারে জল ছিল। কিন্তু যেই ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘরে ঢুকলো অমনি জল বন্ধ।"

আমি বললাম, "হয়তো পাইপে কোনো গোলমাল হয়েছে, তাই হঠাৎ বন্ধ হয়েছে। আমি মিস্ত্রির খোঁজ করছি।"

উমারাণী বললেন, "হঠাৎ বন্ধ হয়নি। মিস্ত্রিকেও এখন খবর দেবেন না। আমার স্বামীকে আপিস পাঠিয়ে দিই, তারপর আপনাকে সব বলবো।"

অগত্যা আমাকে ফিরে আসতে হলো।

নির্দিষ্ট সময়ে টমসন সাহেব আমার অফিস ঘরের সামনে দিয়েই নিজের কাজে চলে গেলেন। এবং একটু পরেই তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে আমার আবার ডাক এলো। ইতিমধ্যে চাপা রাগে আমি গজগজ করেছি।

কিন্তু তেত্রিশ নম্বরে পা-দেওয়া মাত্রই উমারাণী আমার মনের অবস্থা আন্দাজ করে ফেললেন। তিনি বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, ওঁকে

আপিস পাঠিয়েই আপনাকে প্রথম ডেকে পাঠালাম না কেন ? কিন্তু তাহলে পরিস্থিতিটা আপনার পক্ষে অস্বস্তিকর হত।"

অস্বস্তির এতে কী থাকতে পারে তা আমি আন্দাজ করতে পারছি না। মিসেস টমসন বললেন, "নিজের চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। তাহলে আপনাকে ডেকে পাঠাতে হতো আমি যখন স্নান করছি সেই সময় !"

অসম্পূর্ণস্নাতা রমণীকে বাথরুমে দেখবার জন্যে আমন্ত্রিত হবার আশঙ্কায় আমি আঁতকে উঠলাম।

উমারাণী বললেন, "আমার পিত্তের প্রকোপ। অনেকক্ষণ ধরে স্নান না করলে শরীরের জ্বালা কমে না। কিন্তু গতকালও যেই স্নানঘরে ঢুকে স্নান আরম্ভ করেছি সেই জল বন্ধ হয়েছে। কালকে আবার বালতিতে জলও তোলা ছিল না। আধভেজা অবস্থায় জলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে সর্দি ধরে গেলো। ভাবলাম একবার আপনাকে ডেকে এনে দেখাই। কিন্তু সুকুমারী বা সহদেব কেউ কাছাকাছি ছিল না।"

ব্যাপারটা একটু ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। কারণ কতকগুলো বিশেষ সময়ে, বিশেষ করে মিসেস টমসন যখন স্নানের ঘরে ঢোকেন তখনই হঠাৎ জল বন্ধ হয়ে যায় এবং সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মিসেস টমসন এবার গম্ভীরভাবে নিবেদন করলেন, "ব্যাপারটা মোটেই ভূতুড়ে নয়। এই রহস্যের উৎস সন্ধানে আমাকে ঠিক ওপরের ঘরে অর্থাৎ মিসেস ঠাকুরের তেতাল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটে যেতে হবে। আগে কখনও জল নিয়ে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি ; কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির পর থেকেই জলের ভৌতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

মিসেস টমসন বললেন, "শুনলুম, তেতাল্লিশ নম্বরের মিসেস ঠাকুর আপনার সংগে খুব ভাব করেছেন। আপনি ওখানে প্রায়ই গল্প করতে যান।"

বুঝলাম দু'পক্ষেরই গোপন সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। তেতাল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটে আমি যে চা খেয়ে এসেছি তা যথাসময়ে এখানে রিপোর্ট হয়েছে।

মিসেস টমসন গম্ভীর হয়ে গেলেন এবার। বললেন, "আপনি যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না সে বিশ্বাস আমার কাছে। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। একটা কিছু বিহিত করুন, নাহলে অবস্থা কিন্তু খু-উ-ব খারাপের দিকে এগোবে। আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি ওপরের ঘরের ওই অসভ্য মেয়েটা নিজে মাথা খাটিয়ে এইসব অসভ্যতা করছে। কিন্তু আমিও ইচ্ছে করলে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটার সব খবর জানেন আপনি ?"

সামান্য ম্যানেজারি করি। সুতরাং তেইশ নম্বরের মিসেস ঠাকুর, যাঁকে উমারাণী 'অসভ্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটি' বললেন তার 'সব খবর' আমি কীভাবে রাখবো ?

মিসেস টমসন এবার রেখে-ঢেকে কথা বলার চেষ্টা করলেন না। বললেন, "এ-পাড়ার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েগুলো সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কখনও এদের বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করেছেন তো ঠকেছেন। এদের মতিগতি বোঝা দায়।"

কয়েকজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। অন্য পাঁচজন ভারতীয় মহিলার থেকে তাঁদের কোনো পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি। সুতরাং উমারাণী টমসনের উপদেশ নতমস্তকে গ্রহণ করতে পারলাম না।

উমারাণী ততক্ষণ নিজের বক্তব্য অঝোরে বর্ষণ করে চলেছেন। "ইংরেজ আমলে এরা খোদ সায়েবের ঘাড়ে চাপবার জন্যে স্পেশাল চেষ্টা করতো। সায়েবের মন জয় করবার জন্যে এমন সব কাণ্ড বাঁধাতো যে মনে হবে এ-কাজের জন্যে এরা স্পেশাল ট্রেনিং নিতো। কিন্তু অতো করেও বিশেষ সুবিধে হতো না! সায়েবরা খাঁটি ইন্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করবে, কিন্তু অ্যানজেলার মতো পাঁচমেশালি মেয়ে মরে গেলেও নয়।"

পাঁচমেশালির ওপর বিরক্তি প্রকাশ করাটা উমারানীর পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ তাঁর নিজের সন্তান হলেও সেই পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু সাময়িক রাগে অন্ধ হয়ে মিসেস টমসন বলে চললেন, "বড় বড় মার্চেন্ট আপিসে তো সায়েবদের কনট্রাকটে লেখা থাকতো, ওই অ্যানজেলার মতো মেয়ে বিয়েই করতে পারবে না। করলে চাকরি যাবে।"

এ-রকম খবর শাজাহান হোটেলে চাকরি করবার সময় একবার শুনেছিলাম বটে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ওসব আইনকানুন অনেক পাল্টে যাচ্ছে বলে খবর পেয়েছিলাম।

মিসেস টমসন দুঃখ করলেন, "ব্রিটিশ ফার্মে এখন আর ওসব নিয়ম-কানুনের বালাই নেই। সেই সুযোগ নিয়ে অনেকগুলো মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কতকগুলো ভাল-ভাল সায়েব ছোকরার মাথা চিবিয়ে ফেললো। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ফল ভাল হচ্ছে না, এমন খবর আমার কানে আসছে।"

এসব খবরে সত্যিই যে আমার কোনো আগ্রহ নেই তা মিসেস টমসনকে বোঝাই কী করে?

মিসেস টমসন বললেন, "ওই অ্যানজেলা সম্বন্ধে সময় থাকতে খোঁজখবর নিয়ে রাখবেন, না-হলে কোন সময়ে আপনিও বিপদে পড়ে যাবেন।"

ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না। পাওনা ভাড়া আদায় করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—সকলের ঠিকুজি-কোষ্ঠীর খবর নিয়ে রাখতে হবে কেন সামান্য সেই কাজের জন্যে?

চাপা রাগে খইয়ের মতো ফুটতে ফুটতে মিসেস টমসন তেতাল্লিশ নম্বরের অ্যানজেলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "ওসব মেয়ের কাজকর্মের কায়দাই আলাদা। ওনার জানা-শোনা এক ইংরেজ ছোকরা তো ওইরকম এক মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। প্রথমে লোভের বশে একটু প্রশ্রয় দিয়েছিল, তারপর এক-পা বাড়াতেই বঁড়শি গেঁথে গেলো। সেই অবস্থায় ধড়ফড় করছে, নিজেকে ছাড়াবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বেচারা আমার কাছেও এসেছিল। কিন্তু আমি খোঁজখবর নিয়ে বললাম, সামান্য টাকার লোভে ওই মেয়ে ছিপ ফেলেনি। খোদ তোমাকে পার্মানেণ্টলি পাকড়াও করবার জন্যে ওর স্পেশাল আয়োজন।"

একটু থেমে মিসেস টমসন বললেন, "আমার স্বামীটি সদাশিব। মানুষ। উনি প্রথমে আমার কথা বিশ্বাসই করছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উমারাণীর পোড়া কথাই সত্যি হলো। বঁড়শি ছাড়ানো গেলো না! ওই বঁড়শি গিলে বেচারা মিস্টার প্রাইসকে ব্যাংককে ট্রানসফার নিয়ে চলে যেতে হলো।"

এবার মিসেস টমসন কোনোরকম দ্বিধা না-করে মিস্টার ঠাকুরের ইতিহাসে চলে এলেন। "মিস্টার ঠাকুরকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। কতদিন আমার ঘরে এসে কফি খেয়ে গিয়েছে। কতদিন ঝি-চাকরকে আমি ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েছি। আবার চাবি আদায় করে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি। কিন্তু ওই বেচারা যে শেষ পর্যন্ত অমন একটা মেয়ের খপ্পরে পড়বে তা ভাবিনি।"

কিন্তু যা-হবার তা হয়ে গিয়েছে, এই সাধারণ কথাটি মিসেস টমসন কেন বুঝেও বুঝছেন না ?

মিসেস টমসন কিন্তু এরপর ওঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে যা বলে ফেললেন, তাতে আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

আমার অবস্থা লক্ষ্য করলেন মিসেস টমসন। তারপর বললেন, "আই অ্যাম স্যরি, এসব কথা এইভাবে আপনাকে বলা আমার হয়তো উচিত হয়নি। কিন্তু কানে যখন আসছে, সন্দেহ যখন হচ্ছে, তখন আমার উচিত আপনাকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা।"

এরপর আমি তেত্রিশ নম্বর ঘর থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলাম। যাবার সময়েও মিসেস টমসন আবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "জলের অবস্থা আপনি নিজের চোখে দেখে গেলেন। এর একটা বিহিত না হলে গোলমাল আরও বাড়বে, শংকরবাবু।"

মিসেস টমসনের শেষ কথাগুলো আমার কাছে সাবধানবাণীর মতো শোনালো। একটা কিছু ব্যবস্থা না-নেওয়া পর্যন্ত আমার যে মুক্তি নেই তা এবার বেশ সহজেই আন্দাজ করতে পারছি।

এসব সমস্যায় পড়লে কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর না করে দ্বিতীয় কোনো মাথার পরামর্শ নেওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী.

আমি কলিংবেল টেপামাত্র তিনি নিজেই দরজা খুলে দিলেন। এর আগের বারে ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু মিসেস টমসনের গোপন কথাবার্তার আলোকে লক্ষ্য করলাম মিসেস ঠাকুর আসন্নপ্রসবা।

আমাকে দেখেই মিসেস ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার তেত্রিশ নম্বরের ফ্রেন্ড কেমন্ আছেন ?" কথার মধ্যে বেশ ব্যঙ্গ মিশ্রিত রয়েছে।

আমি বললাম, "এ-বাড়িতে যাঁরা ভাড়া দিয়ে থাকেন তাঁরা সবাই আমার ফ্রেন্ড মিসেস ঠাকুর।"

মিসেস ঠাকুর অত সহজে সন্তুষ্ট হবার পাত্রী নন। বললেন, "এতো ঘন ঘন ওই ফ্ল্যাটে আপনার নেমন্তন্ন হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

"অসুবিধে থাকলেই আমাদের ডাক পড়ে, মিসেস ঠাকুর। ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারকে কেউ তো গল্প করবার জন্যে ডেকে পাঠায় না।"

মিসেস ঠাকুর এবার রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, "আমার পরামর্শ যদি নেন, তাহলে মিস্টার শংকর, ওই বুড়ী ব্রাউনির সঙ্গে বেশী জড়িয়ে পড়বেন না। মেয়েমানুষটি মোটেই সুবিধের নয়। আমার হাজবেন্ডও এক-

সময় বুড়ী ব্রাউনির ভক্ত ছিল ; কিন্তু এতোদিনে ব্যাপারটা বুঝেছে।”

এরপর অভিযোগের তালিকা পেশ করতে লাগলেন মিসেস ঠাকুর। বললেন, “আপনি কখনও শুনেছেন, কোনো ফ্রেন্ড কোনো ফ্রেন্ডের ঝি-চাকর ভাঙিয়ে নেয় ? ব্রাউনী আমাকে মোটেই পছন্দ করে না। তাছাড়া ব্রাউনী জানে, আমি চিরকাল আপিসে কাজ করে এসেছি, সংসারের কাজকর্ম তেমন শিখিনি। তার ওপর আমার শরীরের এই অবস্থা। পাকে-চক্রে আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ঠিক সময়ে ব্রাউনী আমার ঝি-কে ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেলো। অথচ মিস্টার ঠাকুর যতদিন বিয়ে করেননি, ততদিন এই সব ঝি-চাকরকে ব্রাউনিই ম্যানেজ করে এসেছেন, বলেছেন সায়েবকে ভালভাবে দেখা-শোনা করবে।”

ব্রাউনি বলতে মিসেস ঠাকুর যে উমারাণী টমসনের ব্রাউন রংয়ের কথাই ব্যঙ্গ করছেন তা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। মিসেস ঠাকুর নিজে অবশ্যই কালো নয় ; তাঁর সাদা চামড়ার ওপরে শুধু কিছু বাদামী ডট ছড়ানো রয়েছে। শ্বেতাঙ্গিনী সৃষ্টি করে খেয়ালী বিধাতা যেন ক্রীড়াচ্ছলে পেনের বাদামী কালী সমস্ত দেহে ছিটিয়ে দিয়েছেন।

মিসেস ঠাকুর এবার সগর্বে ঘোষণা করলেন, “ঝি ভাঙিয়ে নিয়ে ভেবে-ছিলেন আমার সংসার একেবারে আটকে যাবে। কিন্তু কী হলো? আমি তো ভালই ম্যানেজ করে চলেছি। এবং এও আপনাকে বলে রাখছি, ওই সুকুমারী ঝি একদিন আমার কাছে ফিরে আসবে। এ যদি না হয় তো কী বলেছি!”

এতো জোরের সঙ্গে অ্যানজেলা ঠাকুর ঝি-এর কথা বলছেন কী করে?

মিসেস ঠাকুর কিছুই চেপে রাখলেন না। বললেন, “হাইকোর্ট পাড়ার অ্যাসট্রো-পামিস্ট মিস্টার ভট্টাচারিয়া আমাকে নিজে বলেছেন। মিস্টার ভট্টাচারিয়ার ফোরকাস্ট কখনও মিথ্যা হয় না। তিন বছর আগে—আমি তখন প্লেন অ্যান্ড সিমপল মিস বোস্টন। মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়ায় যাবার কথা ভাবছি। মিস্টার ভট্টাচারিয়া আমাকে তখনই বলেছিলেন, তোমার বিদেশ যাওয়া হবে না। তোমার বিয়ে হবে একজন ইন্ডিয়ানের সঙ্গে। কিছুদিন আগে মেড সারভেন্টের ব্যাপারে মনের দুঃখে আবার গেলাম ওঁর কাছে। মিস্টার ভট্টাচারিয়া বললেন, তুমি কিছু ভেবো না। স্টারস অ্যান্ড প্লানেটস এই মুহূর্তে তোমার হোম ফ্রন্টে কিছু ট্রাবল দিচ্ছে। কিন্তু ওই সুকুমারী আবার তোমার ঘরে ফিরে এসে কাজ করবে।”

একটু থামলেন অ্যানজেলা ঠাকুর। ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের মিস্টার ভট্টাচারিয়ার ওপর তাঁর যে অগাধ বিশ্বাস তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মিসেস ঠাকুর বললেন, “কতদিনের মধ্যে সুকুমারী ফিরবে তাও আমার অ্যাসট্রো-পামিস্ট বলে দিয়েছেন।”

আমি কোনো বিশেষ কৌতূহল দেখাচ্ছি না লক্ষ্য করে অ্যানজেলা ঠাকুর নিজেই সুকুমারীর প্রত্যাবর্তনের দিনক্ষণ আমাকে শুনিয়ে দিলেন। আমি তখন স্মৃতি থেকে টেম্পল চেম্বারের পুরনো লিফটের সামনে মিস বোস্টনের ছবিটি খুঁটিয়ে দেখছি। সুন্দরী কুমারীর সেই সদর্প ভঙ্গিমা থেকে কে বিশ্বাস করবে যে বিবাহের কয়েকমাসের মধ্যে তিনি একটি ঠিকে ঝিয়ের ভূত-ভবিষ্যতের ওপর এমন নির্ভরশীলা হয়ে উঠবেন?

অ্যাসট্রো-পামিস্ট মিস্টার ভট্টাচারিয়ার হিসেব অনুযায়ী সুকুমারীর

প্রত্যাবর্তন আসন্ন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মিসেস ঠাকুর বললেন, মধ্যিখানে আর ষাট দিনও নেই। মিসেস টমসনের ফ্ল্যাটে সুকুমারীকে রীতিমত জাঁকিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। দৈবিক বা ভৌতিক কোনো অঘটন ছাড়া কিভাবে এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে সুকুমারী আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু মিস্টার ভট্টাচারিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর মিসেস ঠাকুরের এমন অগাধ বিশ্বাস যে তিনি ব্যাপারটা নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছেন।

প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলেও মিসেস ঠাকুর তাঁর অঘোষিত যুদ্ধ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। উমারাণী টমসন সম্বন্ধে তাঁর মনে একটুও মায়া-দয়া নেই। রক্তের বদলে যেমন রক্ত, দাঁতের বদলে যেমন দাঁত, তেমনি ঝিয়ের বদলে ঝি না-নেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তিনি রণে ভঙ্গ দেবেন না।

উমারাণী টমসনের চতুর্দিকে সন্দেহের ধূম্রজাল বিস্তার করতেও অ্যানজেলা ঠাকুর একটুও দ্বিধা করলেন না।

বললেন, “আমার সম্বন্ধে এ-বাড়িতে নানা গুজব ছড়িয়েছে। এসব গুজব কোথা থেকে তৈরি হয় তা আন্দাজ করবার মতো সামান্য বুদ্ধি আমার অবশ্যই আছে।”

“সত্যি কথা বলতে কি, অ্যানজেলা সম্বন্ধে তেমন কিছু গুজব আমার কানে আসেনি। মিসেস ঠাকুর বললেন, “ঝি ভাঙাবার পরে প্রথমে গুজব রটলো, আমার সঙ্গে মিস্টার ঠাকুরের সত্যিই বিয়ে হয়েছে কিনা? আপনার এই বাড়ির কমন দর্জি আবদুলের এতো বড়ো আস্পর্ধা যে, সোজা বলে দিল, মিস্টার ঠাকুর পার্সোনালি না বলা পর্যন্ত সে আমার জামাকাপড় ধারে তৈরি করতে পারবে না।”

“ব্যাপারটা যখন তলিয়ে বুঝলাম, তখন জানতে পারলাম গলদ কোথায়। আমার স্বামী সব লোককে ডেকে-ডেকে বলবেন, হ্যাঁ একেই আমি বিয়ে করেছি, এর থেকে অসম্মানজনক আর কী হতে পারে? শেষে বুদ্ধি করে, ওই জয়েণ্ট নেম-বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছি ঃ মিস্টার অভিনব ঠাকুর ও মিসেস অঞ্জলি ঠাকুর। এখন লোকের বিশ্বাস হয়েছে, ভরসা বেড়েছে। দর্জিটাও আর কোনো কথা বলে না—যা জামাকাপড় চাই, এক কথায় দিয়ে যায়।”

অ্যানজেলা ঠাকুরের রাগের আরও অনেক কারণ জমে আছে। আজ সুযোগ পেয়ে আমার কাছে তার ফিরিস্তি দিয়ে তিনি নিজেকে হাল্কা করবার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন। আমার কাছে এসব বলে যে কোনো লাভ নেই এই আসন্নপ্রসবা ভদ্রমহিলা তা মোটেই বুঝতে চাইলেন না।

আক্রমণের ভঙ্গীতে মিসেস ঠাকুর বললেন, “আমার সম্বন্ধে রটানো হয়, আমি নাকি সাধারণ গৃহস্থের মতো থাকি না। হ্যাঁ, আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, আমি একটু নাচ, গান, পার্টি, হৈ-হুল্লোড় পছন্দ করি। আমার বাড়িতে এসবের আসর বসে এবং বসবে। এর জন্যে আমার কোনো লজ্জা নেই।”

এ-ব্যাপারে কে ওঁর কাছে আপত্তি জানিয়েছেন তা আমার বোধগম্য হলো না। আমার কানে এসব তোলার কী অর্থ তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

মিসেস ঠাকুর এবার নিবেদন করলেন, “কিন্তু হৈ-চৈ যাই করি, সেখানে

আমার স্বামী উপস্থিত থাকেন। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। আমার স্বামীকে আমি সবার সঙ্গে ফ্রিলি মিশতে দিই। আমি অন্য কারুর কারুর মতো স্বামীকে সবসময় গোডরেজ লকারে পুরে রেখে পাহারা দিই না।"

ইঙ্গিতটা যে তেইশ নম্বরের দিকেই তা আন্দাজ করলেও সোজাসুজি কিছু বলা গেলো না।

মিসেস ঠাকুর এবার আরও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। বললেন, "আমার অতো হারাই-হারাই ভয় নেই। কারুর-কারুর সম্বন্ধে চাকর-বাকরদের থ্রু দিয়ে যা শুনেছি তা বলতে লজ্জা লাগে।"

লজ্জার কথা মুখেই বললেন মিসেস ঠাকুর, কিন্তু পরবর্তী বক্তব্যে কোনো দ্বিধা লক্ষ্য করা গেলো না। বললেন, "নাম করতে চাই না। কিন্তু শুনে রাখুন। ইংলণ্ডের পাখী হঠাৎ যাতে একদিন আবার ইংলণ্ডে উড়ে না পালায় তার জন্যে পাখীকে নেশা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুইস্কি, ব্রান্ডির নেশা নয়—ওসব জিনিস তো ওদেশে আরও ভাল পাওয়া যায়। গাঁজা সিদ্ধির নেশা, যা ইণ্ডিয়া ছাড়লে যোগাড় করা খুব শক্ত।"

কথাটা বিশ্বাস না হলেও, মানসচক্ষে একবার একবার বিলুদা ওরফে মিস্টার টমসনের মুখটা স্মরণ করলাম। বড় শান্ত মুখশ্রী—একেবারে গোবেচারা মানুষ। এঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার জন্যে উমারাণী নিয়মিত গাঁজা কিংবা আফিমের জাল বুনছেন তা ভাবতে কষ্ট হলো। কিন্তু মিসেস ঠাকুর কোনো নাম না তুলে যা ইঙ্গিত করছেন তা চুপচাপ শুনে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নেই।

পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠলো যে মিসেস টমসনের সমস্যার কথা কীভাবে এখানে তুলবো তা ঠিক করে উঠতে পারলাম না। কথা উঠলেও, মিসেস ঠাকুরের মেজাজ যেরকম দেখছি তাতে এখনই কোনো ফল হবে কিনা সন্দেহ।

অগত্যা কাজকর্ম কিছু না-এগিয়ে চুপচাপ ফিরে আসতে হলো। এ-অবস্থায় তেলকালিবাবুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তেলকালিবাবু আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কিছু চিন্তা নেই, সব খবরাখবর আপনাকে যোগাড় করে দিচ্ছি।" তেলকালিবাবু বললেন, "আজকালকার যুগে খবরই শক্তি—এখানকার লোকগুলোর খবরাখবর আমাদের সব সময় রেখে যেতে হবে।"

এবারে কোনোরকম দেরি না করেই তেলকালিবাবু সমস্ত খবর দিলেন। একটু গম্ভীরভাবেই জানালেন, "সামান্য ঝি-এর ব্যাপার থেকে ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে, স্যর।"

মাথা চুলকে তেলকালিবাবু বললেন, "কদ্দুর আপনার কাছে খবর এসেছে জানি না, ঝি ভাঙাবার কয়েকদিন পরেই গোলমালের সূত্রপাত হলো। তেত্রিশ নম্বরের বাথরুমটা ঠিক তেইশ নম্বরের বাথরুমের ওপর। হঠাৎ দেখা গেলো তেত্রিশ নম্বরের বাথরুমের জল চুঁইয়ে তেইশ নম্বরের বাথরুমে পড়ছে। সেই বাথরুমের নোংরা জলে দুদিন মিসেস টমসনের জামাকাপড় নষ্ট হয়ে গেলো—ওঁকে ডবল স্নান করতে হলো।"

অন্য বাড়ির নোংরা জল গায়ে পড়লে মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে না। খাপ্পা হয়ে কড়া চিঠি লিখে মিসেস টমসন তেত্রিশ নম্বরে পাঠিয়ে দিলেন। মিসেস ঠাকুর রেগে ছিলেন। তিনি চিঠি নিলেন কিন্তু কোনো উত্তর

দিলেন না।

তেত্রিশ নম্বরের বাথরুমের জল আবার যথাসময়ে তেইশ নম্বরের মেম-সায়েবকে নোংরা করে দিলো। আরও খাপ্পা হয়ে মিসেস টমসন আরও কড়াভাবে তাঁর দ্বিতীয় চিঠি দূত মারফত পাঠালেন। আরও লিখে দিলেন ঃ পত্রবাহক উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পত্রবাহক খালি হাতে ফিরে এলো। চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিসেস ঠাকুর ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। আধঘণ্টার মধ্যেও যখন তিনি ফিরে এলেন না তখন বেচারা পত্রবাহক আবার বেল বাজিয়েছিল। রেগেমেগে এবার মেমসায়েব বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, "আমাকে এভাবে জ্বালাতন করতে এসো না। বুঝলে? প্লিজ।" তারপর তিনি শুনিয়ে দিয়েছিলেন, "তোমার মেমসাহেবকে বোলো, আমার স্বামী অথবা আমি থ্যাকারে ম্যানসনের ল্যান্ডলর্ড নই!"

"ফুটো বাথরুমের সমস্যা যখন, তখন দায়িত্বটা বাড়িওয়ালার। আমাদের কাছে খবরটা এলো না কেন?"

"আরও বাড়বে, শংকরবাবু।"

আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, "সেইটাই তো সমস্যা। বেড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধবে? মিসেস টমসনের বক্তব্য ঃ যখন তোমার বাথরুমের জল লিক করে আমার ঘরে পড়ছে, তখন বাড়িওয়ালাকে খবর দেবার দায়িত্বটা তোমার। বন্ধুমহলে, মিসেস ঠাকুর ঠিক উল্টো কথা বললেন ঃ তোমার সিলিং লিক হয়েছে তুমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করো। যদি তোমার ওপরে আর কোনো ফ্ল্যাট না থাকতো এবং বৃষ্টির জল লিক করতো, তাহলে তুমি কি ভগবানকে বলতে বাড়িওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করতে?"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তেলকালিবাবু বললেন, "ব্যাপারটা জানেন কি স্যর? কথাগুলো পাঁচকান হয়ে মিসেস টমসনের কানে এমনভাবে ফিরে এলো যে তিনি বেশ খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তিনিও গোঁ ধরে বললেন, কিছুতেই তিনি বাড়িওয়ালার কাছে যাবেন না। যেতে হলে মিসেস ঠাকুরকেই যেতে হবে।" রাগের আরও একটা কারণ তেলকালিবাবু ব্যাখ্যা করলেন। "মিসেস টমসনের ধারণা, এই জল লিক করবার পিছনে খোদ মিসেস ঠাকুরের নিজস্ব কিছু কারিগরী আছে। নাহলে এতোদিন কখনও জল লিক করলো না, আর এই ঝি-বদলের পরেই টপটপ করে জল পড়তে আরম্ভ করলো কেন?"

এরপর যা শুনেছেন তাও তেলকালিবাবু জানালেন, "মিসেস টমসন নাকি লুকিয়ে উকিলের পরামর্শও নিয়েছেন। ওপরের ভাড়াটের জলে নিচের ভাড়াটের জিনিসপত্তর নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণের নোটিশ দেওয়া চলে কিনা। ভগবান জানে, কী অ্যাডভাইস পেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, আমি তো শুনে তাজ্জব। উকিলবাবুদের মাথা কত খাসা হয়। সামান্য কয়েকফোঁটা জলের ব্যাপারকে হয়তো হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন—টপটপ জল পড়ার জন্যে দায়িত্ব কার? ফ্ল্যাটের বাসিন্দার? না মালিকের?"

"যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আদালতের দিকে গেলেন না মিসেস টমসন। তার বদলে তিনি কারও সঙ্গে গোপন পরামর্শ করলেন। শোনা যায়, কলকালিকে কয়েকবার ওঁর ঘরে দুপুরবেলায় ঢুকতে দেখা গিয়েছে। তারপর মশায় একদিন তাজ্জব ব্যাপার। জল থাকলে তবে তো লিক করে নিচের

ফ্ল্যাটে পড়বে? তেত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট মাঝে মাঝে একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মোক্ষম সময়ে একেবারে জল থাকে না।”

“কী ব্যাপার? ম্যাজিক নাকি?” জিজ্ঞেস করি তেলকালিবাবুকে।

তিনি বললেন, “নিজের চোখে না-দেখে কোনো মন্তব্য না করাই ভাল। তবে কলের পুরনো পাইপগুলো শিরা-উপশিরার মতো এমন জট পাকিয়ে আছে, এবং কলকালির পাইপগুলি এতোই গভীর যে সে পারে না এমন কাজ নেই।”

এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হলো না। তেলকালিবাবু জানালেন, “কলকালির মন-মেজাজ ভাল যাচ্ছিল না। বলরাম ঘোষ ঘাট স্ট্রীটের মেয়েমানুষটি একজোড়া সোনার দুলের জন্যে আব্দার করছিল অথচ কলকালি তেমন সুবিধে করতে পারছিল না। ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে আপনার কলকালিকে তেত্রিশ নম্বরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেলো।”

“মানে?” আমি জিজ্ঞেস করি।

তেলকালিবাবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “কী যে বলি, বুঝে উঠতে পারছি না।”

দু-একখানা নতুন মোটা পাইপ নিয়ে কলকালিকে দুপুরবেলায় তেত্রিশ নম্বরে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। তারপর কলকালি নিজেই স্বীকার করলো, মীনা-করা সোনার দুল কিনে সে বলরাম ঘোষ ঘাট স্ট্রীটের মানভঞ্জন করিয়েছে এবং তারপরেই মিসেস টমসন আপনাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর কলঘরে স্নানের সময় জল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টু প্লাস টু করে আন্দাজ করুন, আমি সোজাসুজি কি বলবো?”

কলকালিকে সঙ্গে করেই আমি আচমকা তেত্রিশ নম্বর ইনসপেকশনে গেলাম। যা আন্দাজ করেছিলাম তাই—কলঘরের কিছু অংশে চকচকে মোটা নতুন পাইপ এবং বিশেষ স্থানে নতুন কয়েকটি স্টপ কক শোভা পাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন পাইপের রহস্য জিজ্ঞেস করতে কলকালি যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো, বহুদিনের পুরনো সব পাইপ। মাঝে মাঝে ভাড়াটিয়ারা নিজের খরচে পাইপ পাল্টে নিতে বাধ্য হন, কিন্তু তার সঙ্গে দুই ফ্ল্যাটের ঝগড়ার কোনো সম্পর্ক নেই!

আরও চাপ দিতেও কলকালি কিছু স্বীকার করতে চাইছিল না। কিন্তু তখন বলতে হলো, পুলিস কেসের ভয় রয়েছে। পুলিসের কানে কারা যেন কলকালির নামটা তুলে দিয়েছে। এবার সে নরম হয়ে পড়লো, স্বীকার করলো যে পাইপের সঙ্গে এমন সব কলকব্জা যে-কেউ লাগিয়ে নিতে পারে যে সেই কল খোলা থাকলে নিচের ফ্ল্যাটে একফোঁটা জল পড়বে না!

দারোগা গণেশ সরকারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের খবরটা এক্ষেত্রে কাজে লাগলো। কলকালি কিছুটা নার্ভাস হয়ে অনুরোধ করলো, আমি যেন তাঁকে বোঝাই, তেইশ নম্বরে সাময়িক জল বন্ধ হওয়ার সঙ্গে কলকালির বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই।

এই জলযুদ্ধে কোনোরকমভাবে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। জলযুদ্ধ বন্ধ করবার উপায় সম্বন্ধেও খোঁজখবর নিয়েছিলাম। কিন্তু কলকালি যা হিসেব দিলো তাতে পাইপের জট ছাড়িয়ে দুই ফ্ল্যাটে একেবারে আলাদা লাইন তৈরি করতে কয়েক হাজার টাকা দরকার হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্যে এতো টাকা খরচের স্বাধীনতা

আমার নেই।

দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের ঝাঁঝ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মধ্যিখানে কয়েকদিন দুই পক্ষের যুদ্ধে সাময়িক বিরতি পড়েছিল। সেই সময় মিসেস ঠাকুর নার্সিং হোমে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে গিয়েছিলেন। দিন দশেক পরেই তিনি সদর্পে থ্যাকারে ম্যানসনের তেত্রিশ নম্বরে ফিরে এলেন।

আমি ভেবেছিলাম নবজাতকের আবির্ভাবে এবার মিসেস ঠাকুর এতোই ব্যস্ত থাকবেন যে পুরনো ঝগড়ার কথা মনে রাখবেন না। কিন্তু আমার প্রত্যাশা ভুল প্রমাণিত হলো।

মিসেস টমসন আমাকে ডেকে বিরক্তির সংগে বললেন, "সন্দেহের অংক মিলে যাচ্ছে, শংকরবাবু। ওপরের ওই মহিলা যতদিন বাড়িতে ছিলেন না, ততদিন আমাদের স্নানের সময় কোনো অসুবিধে হয়নি। উনি ফিরেছেন আর আমাদের জল আবার বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে।"

মিসেস টমসন বললেন, "আমিও ছেড়ে কথা বলবো না। এই দেখুন বাঁশের মাথায় বাঁধা দুরমুশ আনিয়েছি। জল বন্ধ হলেই ওপরের ছাদে আওয়াজ করবো।"

তেলকালিবাবুও রিপোর্ট দিলেন, দু পক্ষের ঝগড়া বেশ জমে উঠেছে। এক পক্ষ এক পক্ষের কল বন্ধ করছেন এবং অপর পক্ষ ওপরের ছাদে দুমদুম আওয়াজ করছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যুত্তরে ওপরের ঘরে হামানদিস্তায় মশলা পেটার আওয়াজ হচ্ছে বহুক্ষণ ধরে।

মিসেস টমসন আমাকে ডেকে রেগেমেগে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের ফ্ল্যাটে হাতুড়ি দিয়ে কয়লা ভাঙবার পারমিশন আছে?"

খোঁজখবর নিয়ে উত্তর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু কী উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না। অবস্থা যে ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি। এ-বিষয়ে তেলকালিবাবুর সংগেও আলোচনা করেছি। তেলকালিবাবুও একমত, দুই পক্ষের রেষারেষি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অভিজ্ঞ তেলকালিবাবু আমাকে শুনিয়ে দিয়েছেন, এই ধরনের মন কষাকষি মোটেই ভাল নয়। উত্তাপ বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মারামারি খুনোখুনি লেগে যায়।

নিয়মকানুনের খোঁজখবর করেও তেমন লাভ হলো না। হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি, বাটনা বাটা ইত্যাদি বন্ধ করার কোনো শর্ত লিখিতভাবে করিয়ে নেওয়া হয়নি। একালের ফ্ল্যাটবাড়ির মালিকরা সে বিষয়ে খুব সাবধানী। ফ্ল্যাটবাড়িতে কী করা যাবে এবং কী যাবে না, এমন কী কোন কোন জিনিস খাওয়া যাবে এবং যাবে না তারও মুচলেকা নিয়ে নেন।

খোঁজখবরের উত্তর দেবার আগেই আর একটি এস-ও-এস হাজির হলো। রাগে গর-গর করতে করতে মিসেস টমসন বললেন, "নিজের চোখে দেখে যান। কীভাবে এখানে অত্যাচার চলছে।"

দেখলাম ওপরের ফ্ল্যাট থেকে ভিজে কাপড় মেলে দেওয়া হয়েছে। কোনোদিন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা অকল্পনীয় থাকায়, এ-বাড়ির স্থপতি নকশা আঁকবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেননি, ফলে উঁচুতলার ভিজে কাপড়ের জল নিচুতলার ব্যালকনির সমস্ত জিনিসপত্র ভিজিয়ে দিচ্ছে। মিসেস টমসন হাউ-মাউ করে উঠলেন, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো। আমার দামী দামী জিনিস ওই কাপড়ের জলে নষ্ট হয়ে গেলো।"

অনেক মাথা ঘামিয়ে সমস্যার কোনো সমাধান দেখছি না। একবার মিসেস টমসনকে বললাম, "উপায় একটাই দেখছি। আপনি এখান থেকে সরে যান। অন্য যে ফ্ল্যাট খালি হয়েছে, অ্যাজ এ স্পেশাল কেস আপনাকে সেখানে সরিয়ে দিচ্ছি।" আমার প্রস্তাব ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন মিসেস টমসন। বললেন, "কোন্ দুঃখে আমি সরবো? সরাতে হলে ওই দুষ্ট মেয়েমানুষকে সরান—একের পর এক অন্যায় করে যাবে, আর আপনারা সবাই তা সহ্য করে যাবেন, তা চলবে না।"

শেষ চেষ্টা হিসেবে তেলকালিবাবুকে শান্তিদূত হিসেবে তেতাল্লিশ নম্বরে পাঠালাম। তেলকালিবাবু সন্ধ্যের সময় মুখ শুকনো করে ফিরে এলেন। বললেন, "বাচ্চা হবার পরে একেবারে বাঘিনীর মতো মেজাজ হয়ে রয়েছে এই ঠাকুর মেমসায়েবের। আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যাটাক করেন আর কী? সোজা বললেন, আপনার ম্যানেজার এবং ওই তেত্রিশ নম্বরকে জানিয়ে দেবেন, ভাড়া যখন পুরো টাকায় নিয়েছি, তখন যেখানে খুশী যখন খুশী ভিজে জামা-কাপড় শুকোতে দেবো, কারও কথা শুনবো না।"

অপ্রিয় ঘটনার অনাগত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তেলকালিবাবু বললেন, "অবস্থা আজকে আরও পাকিয়েছে। টমসন মেমসায়েবের একটা বেড়াল ভুল করে তেতাল্লিশ নম্বরে ঢুকে পড়েছিল। সেই বেড়ালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"অবস্থা যেভাবে গড়াচ্ছে সেটা মোটেই সুবিধে নয়", তেলকালিবাবু আমাকে সাবধান করে দিলেন। "সব কিছু ঘটনা ডাইরিতে নোট করে রাখবেন, স্যার। কখন থানায় বা আদালতে খুনোখুনির কেসে সাক্ষী দিতে হবে ঠিক নেই। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে এবং ভাড়াটে-ভাড়াটের মধ্যে ফৌজদারী কেস কলকাতা শহরে লেগেই আছে।"

ইতিমধ্যে মিসেস টমসনের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগপত্র এসে গেল। দীর্ঘ চিঠিতে তিনি তেতাল্লিশ নম্বরের নানা অন্যায়ের ফিরিস্তি দিয়েছেন এবং আমাকে অবিলম্বে তার প্রতিবিধানের উপদেশ দিয়েছেন। সময়মতো প্রতিবিধান না-হলে আমরাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন মিসেস টমসন।

মিসেস টমসনের চিঠির সুর বেশ কড়া। কিন্তু তাঁকে তেমন দোষ দিতে পারি না। তেতাল্লিশ নম্বরের মেমসায়েবই যে ইদানীং আক্রমণ বাড়িয়ে চলেছেন এবং একের পর এক অন্যায় করে চলেছেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

সমস্যার সমাধানের কোনো পথই আমি খুঁজে পেলাম না। বেচারা তেলকালিবাবুও ভেবে-চিন্তে কিছু বার করতে পারলেন না। শুধু বললেন, "শেষ পর্যন্ত রক্তারক্তি কাণ্ড একটা হবে মনে হচ্ছে, যদি না ভগবান একটা কিছু করে দেন।"

অগতির গতি গণপতিবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। বিপদের সময় ছাড়া অন্য কখনও তাঁর নাম আমার স্মরণে আসে না। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

গণপতিবাবু মোটেই উদ্বিগ্ন হলেন না। সব শুনে বললেন, "তেতাল্লিশ নম্বরের অন্যায়টাই বেশী মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে চুপচাপ বসে থাকা উচিত হবে না। এখনই তেত্রিশ নম্বরের চিঠির একটা কপি তেতাল্লিশ নম্বরে পাঠাও, সঙ্গে লিখে দাও তোমার সম্বন্ধে এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই আসছে। আর মিসেস টমসনকে বলো থানায় একটা ডায়রি করে রাখতে। ভিজে

কাপড়ের জল অন্যের বাড়িতে পড়া সম্বন্ধে অনেক কেস আছে ; আর ওই বেড়াল বন্দী করে রাখার ব্যাপারটা সিরিয়াস!”

থানায় ডায়রির ব্যাপারটা খুব শক্ত হবে না। এস আই গণেশ সরকার যখন রয়েছেন। আগামীকাল সকালে গণেশবাবু ডিউটিতে থাকবেন। সেই সময় আমিও একবার থানা ঘুরে আসবো ; তেতাল্লিশ নম্বরকে লেখা আমাদের চিঠির একটা নকলও ওখানে জমা রেখে আসবো। বাঘিনীর যা মেজাজ, কখন কী করে ফেলেন তার ঠিক নেই। তার মিসেস টমসনকেও বিশ্বাস নেই। জলের অভাবে আধা স্নান করে এবং ওপরের ফ্ল্যাটের ভিজেকাপড়ের ফোঁটা হজম করে এই প্রসন্ন মহিলা বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং প্রায়ই বলছেন, “আমাকে ওরা এখনও চেনেনি। আমার নাম উমারাণী টমসন!”

আনুষ ভাবে এক এবং শেষ পর্যন্ত হয় আর এক। এই জটিল পরিস্থিতির যে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় এমন সমাধান হবে তা ভাবতে আজও আমার আশ্চর্য লাগে। যুদ্ধ আগত, আমাদের তখন সাজ-সাজ রব। আমাদের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার তেলকালিবাবু। তাঁর পরামর্শেই, আমি নিজে জেনারেলের ভূমিকা নিয়েছি—অর্থাৎ এই যুদ্ধের দুই পক্ষের সঙ্গে আমি নিজে তেমন দেখাসাক্ষাৎ করছি না ; সমস্ত কাজ দূত মারফৎ চলেছে। কারণ, আমাকে শেষপর্যন্ত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে।

মিসেস টমসনকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামীকাল সকালে তিনি আমার সঙ্গে থানায় যাবেন। গণেশ সরকার ডিউটিতে আসা মাত্রই আমি খবর পাঠাবো। মিসেস টমসন সানন্দে জানিয়েছেন, তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

তেতাল্লিশ নম্বরকে লেখা আমার চিঠিটাও তেলকালিবাবু মন দিয়ে পড়ে খামে সযত্নে পুরেছেন। বলেছেন, “ঠিক ছক করা পথে এগোচ্ছে স্যার। খুব ভালবাসা—মন কষাকষি—দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ, আড়ি-রেষারেষি—পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া—বাড়িওয়ালাকে নোটিশ—থানা পুলিস। এর পর মাত্র গোটা পাঁচেক স্টেপ বাকি রইলো ঃ হাতাহাতি—হাসপাতাল—কোর্টকাছারি—জেল—শ্রাদ্ধ।”

“কিসের শ্রাদ্ধ?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“মার্ডার কেস হলে এক পার্টির জেনুইন শ্রাদ্ধ, না হলে স্রেফ টাকার শ্রাদ্ধ!” অভিজ্ঞ তেলকালিবাবু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় পরের পর্বে নাটক গড়ালো না। পরের দিন ভোরবেলায় যখন দুই দূতকে দুই দিকে পাঠালাম ততক্ষণে সমস্যার নাটকীয় সমাধান হয়ে গিয়েছে।

তেতাল্লিশ নম্বর পিওন-বইতে চিঠি ধরাতে এক ছোকরা সুইপারকে পাঠিয়েছিলাম। সে কাঁদ-কাঁদ হয়ে ফিরে এলো। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। কয়েকবার বেল বাজাবার পরে একজন মেমসায়েব বেরিয়ে এলেন এবং চিঠিখানা দেখে, পড়ে, সুইপারের সমানে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। পিওন বইতে সইও করেননি, শুধু বলে দিয়েছেন, তোমাদের ম্যানেজার সাহেবকে নিজে আসতে বলবে।

এই মহিলাটি যে মিসেস ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নয়, সে সম্বন্ধে আমার মনে তখন কোনো সন্দেহ নেই। পত্রদূত বললো, মেমসায়েবের কোলে সে একটি বেবিও লক্ষ্য করেছে। মিসেস ঠাকুরের ঔদ্ধত্যে আমিও বেশ চটে

উঠলাম। চিঠি ছিঁড়ে ফেললেই চিঠির হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় না, এই সামান্য সত্যটি এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এইসব কারণেই আইন পাড়ায় চিঠি বাড়ির দেওয়ালে অথবা দরজায় লটকে দেবার ব্যবস্থা আছে।

তেলকালিবাবুও বিফল হয়ে ফিরে এলেন ইতিমধ্যে। অনেকবার তেত্রিশ নম্বরে বেল বাজিয়েছেন তিনি। কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না। মিসেস টমসন কী একলা থানায় চলে গেলেন?

আগের কাজ আগে। চিঠির একটা কপি হাতে আমি তেলকালিবাবুকে তেতাল্লিশ নম্বরে দিয়ে আসতে বললাম। আমার মেজাজও তখন একটু গরম। চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেবার ব্যাপারটা কিছুতেই হজম করতে পারছি না।

একটু পরেই তেলকালিবাবু একগাল হাসি নিয়ে ফিরে এলেন। মুখে হাসি, কিন্তু বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে স্যার। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন! অ্যাপেনডিসাইটিস কেস—কোর্ট কেস, পুলিশ কেস আর দরকার হবে না।"

তেলকালিবাবু বললেন, "তেতাল্লিশ নম্বরের কলিং বেল বাজাতেই যে-ঝি বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে আমি তাজ্জব। আরে! সুকুমারী না? তুমি এখানে?" সুকুমারী মুখ ঝামটা দিলো, 'আমি কোথায় আছি তাতে তোমার কী?' তখনই বুঝলাম, সামথিং সিরিয়াসলি রং। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঠাকুর মেমসায়েব কোথায়?' মরণ আর কি! জানে না কোথায়।' সুকুমারী মুখ ঝামটা দিলো! ইতিমধ্যে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে আমার ফেণ্ট হবার অবস্থা। স্বয়ং মিসেস টমসন! কোলে একুশ দিনের বেবি। বললাম, 'সব্বোনাশ হয়েছে, ম্যানেজারবাবুর চিঠি এখানকার মেমসায়েব ছিঁড়ে ফেলেছে, অথচ সই করেননি।' মিসেস টমসনের তখন অন্য রূপ। আমাকে বকুনি লাগিয়ে বললেন, ছিঃ, অ্যানজেলা কেন ছিঁড়বে? চিঠি আমিই ছিঁড়ে ফেলেছি। ও সবের আর দরকার নেই। আমি এখন খুব ব্যস্ত।"

তেলকালিবাবু এরপর যা বললেন তা মোটামুটি এই রকম। সন্ধ্যেবেলায় অ্যানজেলা ঠাকুরের অ্যাপিনডিসাইটিস যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ডাক্তার এসে বললেন, এখনই হাসপাতালে অপারেশন করা দরকার। তিন সপ্তাহের বেবির কথা ভেবেই অভিনব ঠাকুর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এরকম অবস্থায় পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। এই অবস্থায় খবরটা কীভাবে গোপন চরের মাধ্যমে তেত্রিশ নম্বরে এসে পৌঁছয়। চর ভেবেছিল, এই খবর পেয়ে তেত্রিশ নম্বর খুশী হবন।

কিন্তু পরিস্থিতি মুহূর্তে পাল্টে গেলো। সব কাজকর্ম ছেড়ে পি-জি হাসপাতালের প্রাক্তন নার্স উমারাণী ছুটলেন তেতাল্লিশ নম্বরে। অ্যানজেলা ঠাকুর তখন রোগের যন্ত্রণা এবং বেবির চিন্তায় কান্নাকাটি করছেন। কিন্তু উমারাণী তখন জরুরী অবস্থায় হাল ধরেছেন। বললেন, "বেবি ক্লিনিকে অনেক দিন কাজ করেছি আমি। কোনো চিন্তা নেই তোমাদের।" সুকুমারী একটু গাঁইগুঁই করেছিল। কিন্তু উমারাণী তাকে প্রচণ্ড বকুনি লাগিয়ে মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর ঝগড়া অ্যানজেলার সঙ্গে, বেবির সঙ্গে নয়।

অ্যানজেলাও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

তেলকালিবাবু জানালেন, "দুধে আমে আবার মিশে গিয়েছে! বাচ্চাটা বেশ খুসমেজাজে মিসেস টমসনের কোলে খেলা করছে মনে হলো। মাঝখান

থেকে পুলিসের কথা বলতে গিয়ে আমি প্রচণ্ড বকুনি খেলাম। মিসেস টমসন বললেন, ম্যানেজারবাবুর চিঠি আমিই ছিঁড়ে ফেলেছি। বেশ করেছি, ছিঁড়েছি, আমার এখন অনেক কাজ।" এই বলে মিসেস টমসন সুকুমারীকে তেতাল্লিশ নম্বরের দরজা বন্ধ করে দিতে হুকুম করলেন।

থ্যাকারে ম্যানসনে আজ আমার ছ'মাস পূর্ণ হলো। অথচ যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ। এই ছ'মাসে এতো মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, এতো ঘটনার মুখোমুখি হলাম, এতো সুখ-দুঃখের নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম, যে নিজের হিসেবনিকেশ মেলাবার অবকাশ হয়নি।

কে বলবে, ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের এই আশীর্বাদহীন ম্যানসন বাড়িতে মাত্র ছ'মাস জীবিকা উপার্জন করেছি আমি? সাডার স্ট্রীটের ধারে, ফ্রি স্কুলের কাছে জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে আমি যেন পুরো ছ'যুগ অতিবাহিত করেছি। নানা ঘটনা, নানা সমস্যা দিন-রাত্রির সিঁড়ি বেয়ে একের পর এক আমার অনভিজ্ঞ জীবনকে এমন কর্মমুখর করে তুলেছে যে মনে হচ্ছে, এই থ্যাকারে ম্যানসনকে আমি যুগ-যুগান্ত ধরে চিনি। এই থ্যাকারে ম্যানসনেই আমার যেন জন্ম, এই থ্যাকারে ম্যানসনেই মৃত্যু লঘু পদক্ষেপে এসে আমার এই অতৃপ্ত অস্থির অসহায় জীবনে অবশেষে চিরশান্তির তিলক এঁকে দেবে। শেষ হবে আমার এই অনিচ্ছুক জীবিকা সন্ধান ও অক্ষম জীবন সংগ্রাম।

আজ এই মুহূর্তে আমার মনের শামিয়ানা স্নিগ্ধ প্রীতির সোনালী আলোতে ঝলমল করছে। আজ কারও ওপর এমন কি সেই খেয়ালী বিধাতা যিনি অকারণ কৌতুকে আমাকে বারংবার সংসারের হাটে হাটে নিরন্তর পদযাত্রার অভিশাপ বর্ষণ করেছেন তাঁর ওপরেও আমার কোনো অভিযোগ নেই।

ম্যানেজারবাবুর জন্যে পাঠানো দোকানের স্পেশাল চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ভাবছি, নিজেরই অজ্ঞাতে আমি কেমনভাবে এই থ্যাকারে ম্যানসনের বিচিত্র মানুষমেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। যে-মানুষ একদিন মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন দেখতো, যে একদিন লেখাপড়া করার আর্থিক সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চোখের জল ফেলেছিল, যে-মানুষ একদা বিদেশী বারওয়েল সায়েবের আশীর্বাদে মানবসাগরের তীরে মহামানবতার সাক্ষাৎ পেয়ে বিদেহী বিধাতাকে বিনম্র প্রণাম জানিয়েছিল, সাজাহান হোটেলের ভোগ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নররূপী সত্যসুন্দরদার স্নেহস্পর্শে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা ফিরে পেয়েছিল, সে-ই এই ক'মাসে কেমন করে ফ্যান ফোন কল জল ভাড়াটে ও ভাড়ার তাড়ায় নিজেকেই ভুলতে বসেছে?

এই ক'মাসে কত সহজে মানুষের ওপর কত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়েছো তুমি, শংকর। আজ নিজেকেই আমি নিজের প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি।

শংকর, এই ক'মাসে তুমি অনেক বিষয় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছো। ছোট আইনের ছোট কূটকৌশল এখন তোমার আয়ত্তে, মানুষকে আজ তুমি কত সহজে সন্দেহ করতে পারো, অথচ একদা অনভিজ্ঞ গ্রাম্য বালকের সরলতা তোমার দুঃখী জীবনকে সবুজ সজীব করে রেখেছিল।

এই ক'মাসে আমার জীবনে কী কী ঘটেছে তা আবার সিনেমা ছবির মতো মনের রূপালী পর্দায় অদৃশ্য আলোছায়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। প্রতিদিনের এই সব সামান্য খুঁটিনাটি, এই সব দৈনন্দিন সাংসারিক ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতার সঙ্গে আমাকে জীবনের অবশিষ্ট সময় বসবাস করতে হতে পারে ভেবে মনটা ক্ষণেকের জন্য নিরুৎসাহী হয়ে উঠলো।

এই মুহূর্তে আমার বরদাপ্রসন্ন হালদারের কথাও মনে পড়ছে। তীর্থ-দর্শনের নাম করে ভদ্রলোক সেই যে উধাও হলেন, তারপর অনেকদিন তাঁর কোনো হদিশ নেই। কলকাতা থেকে বেরিয়ে হরিদ্বার, বারাণসী এবং বদ্রিনাথ থেকে ডাকযোগে বরদাপ্রসন্ন হালদার আমাদের জন্যে দেবতার আশীর্বাদী ফুল ও প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সম্পূর্ণ নীরবতা। যাঁরা তাঁর সংগে অনেকদিন ঘর করেছেন, তাঁদের কারও কারও ধারণা, বরদাপ্রসন্ন থ্যাকারে ম্যানসনের এই বন্দীশালা থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। বিষয় বৈরাগী মানুষ এতোদিন ভাগ্যদোষে বিষয়বিষে জর্জরিত হচ্ছিলেন এবার আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তিনি মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করছেন। হয়তো আর কখনও ফিরবেন না।

কেউ কেউ অবশ্য আড়ালে অন্য কথাও বলে। নানা কান ও মুখের জটীল চ্যানেল-পথ ঘুরে সেইসব বিষাক্ত শব্দ আমাকে অবশ্যই বিব্রত করে, আমাকে বিমর্ষ করে তোলে। বরদাপ্রসন্নের কলকাতা ত্যাগের কারণ নাকি আমি নিজে। পিতৃপুরুষের এই কর্মক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তিত্বের আকস্মিক উড়ে এসে জুড়ে বসায় তিনি নাকি গোপনে ব্যথিত হয়েছেন এবং প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে পড়েছেন তীর্থের দেবতাসন্ধানে।

এই খবর আজকেও আমাকে বিষণ্ণ ও অস্থির করে তুলছে। আমি অসহায়বোধ করছি। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, বরদাবাবু আপনার দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্রকে অস্বস্তিকর করে তুলবার জন্যে জেনে-শুনে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আমি আসিনি। এই বিরাট বিশ্বে আমার একটা কাজের এবং সামান্য একটু আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। তারই সন্ধানে, নানা ঘাটে ঠেকতে-ঠেকতে অবশেষে আমি থ্যাকারে ম্যানসনে হাজির হয়েছি। আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই আমার। বরদাবাবু, বিশ্বাস করুন।

বরদাবাবুর চিন্তা-প্রসংগে হঠাৎ খেয়াল হলো, আমি নিজেও আমার দায়িত্ব পালন করিনি। বিলাসিনী দেবী, পমা অথবা বিপুলভূষণ বারিক কারও সংগে যথাসময়ে যোগাযোগ করিনি। বহু দিনের পুরনো ব্যবস্থা অনুযায়ী টাকাকড়ির লেনদেন রামসিংহাসন মারফতই চলে আসছে। আমাদের সামান্য মাইনে এবং অন্য খরচাপাতি ভাড়ার টাকা থেকে কেটে নেওয়া হয়। মনে হলো, একবার বিডন স্ট্রীটে বিলাসিনী দেবীকে বরদাপ্রসন্ন সম্বন্ধে অবহিত করাটা বিশেষ প্রয়োজন। এমনও হতে পারে বরদাপ্রসন্নর খবরা-খবর ওখানে আসছে, অথচ এখানে আমরা কিছুই জানতে পারছি না।

"বাবু, আপনার চিঠি", সুইপারের পরিচিত গলা আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিলো। এ-বাড়িতে সুইপাররাই আমার বিশেষ অনুগত। এবং অবসর

সময়ে তারা অন্য কাজ করতে ভালবাসে। সুযোগ এবং স্বাধীনতা পেলে এরা যে একদিনও জমাদারের কাজ করবে না, তা আমি লিখে দিতে পারি। এদের নিজস্ব পেশায় কোথাও গোপন বেদনা আছে ; আমাদের চরম অবহেলাও বোধ হয় এদের নজর এড়ায় না।

চিঠি! আমাকে কে আবার চিঠি লিখতে পারে? সংসারের পুরনো দিনের সব সম্পর্কের কথা ভুলেই তো থ্যাকারে ম্যানসনের এই আত্ম-নির্বাসনে এসেছি। লোকে শুধু শুধু আমার খোঁজ খবর নিয়ে কেন অযথা সময় নষ্ট করবে?

রাজকীয় রয়াল ব্লু কালিতে অন্তর্দেশীয় পত্রে গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে আমার নামটাই কিন্তু জ্বল জ্বল করছে।

আরও যা আশ্চর্য, লেখার ধাঁজটি একটি নারীর অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করছে। আমার এই ষাম্মাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসে থ্যাকারে ম্যানসনের ঠিকানা খুঁজে কে এইভাবে আমাকে স্মরণ করলেন? এবং কৌতূহল আরও বাড়লো। কারণ চিঠির এক কোণে আরও একটি সুমধুর ঘোষণা ঃ 'ব্যক্তিগত'।

থ্যাকারে ম্যানসনের মানুষের ভিড়ে আমার ব্যক্তিসত্তা তো কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, যেটুকু এখানে কর্মতৎপর রয়েছে সেটি আমার প্রতিষ্ঠানগত ব্যক্তিত্ব। থ্যাকারে ম্যানসনের অস্থায়ী ম্যানেজারকে অবশ্যই জল, পাইপ,কল, ইলেট্রিসিটি ইত্যাদি সম্বন্ধে চিঠি লেখা যায়। তা বলে ব্যক্তিগত চিঠি?

ঈষৎ দ্রুতগতিতেই আমি চিঠিটা খুলে ফেলেছি। না, কোনো ভুল হয়নি, চিঠিটা আমারই, কারণ ভিতরেও আমার নামটা রাজকীয় নীলিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নামের পরে, সম্বোধনের স্থলে কাটাকুটি পত্রলেখিকার দ্বিধার নিশ্চিত সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রথমে বোধ হয় অন্য কোনো সম্ভাষণ ছিল, 'প্রীতিভাজনেষু' অথবা 'শ্রদ্ধেয়' তা পাঠোদ্ধারের কোনো পথ রাখা হয়নি। অসতর্ক সম্বোধনটি সযত্নে বার বার লেখনিতে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে।

এরপর ব্যক্তিগত সম্বোধনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। তার বদলে 'সবিনয় নিবেদন' ঃ

'সবিনয় নিবেদন,

আজ ভোরবেলায় স্নানের সময় হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়লো। আরও মনে পড়লো, থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নেবার পরে আপনাকে কোনো খবরই দেওয়া হয়নি। এতোদিন কেন জানি না, একটা ধারণা ছিল, আপনিই আমাদের খবরাখবর নেবেন। কিন্তু আজ খেয়াল হলো, আপনাকে ঠিকানা দিয়ে আসা হয়নি ; আপনার ঠিকানা আমি জানলেও, আপনি আমার ঠিকানা জানেন না।

বাবা এখানকার নতুন পরিবেশে ভালই আছেন, মধ্যিখানের গ্লানিময় স্মৃতি ভুলবার পক্ষে জায়গাটা খারাপ নয়। বাবাকে সুখী দেখলে সীমার আনন্দ হবারই কথা। সে বেশী সুখী। কিন্তু সঞ্চয়ের কলসী ক্রমশই শূন্য হয়ে আসছে, তাই সুলেখার চিন্তা বাড়ছে।

সুলেখাকে নিয়েই যত মুশকিল। সে কী করবে এখনও বুঝে উঠতে

পারছে না। তার জন্যে আপনি একটু প্রার্থনা করবেন। আপনার কাছে সে এবং আমি দু'জনেই কৃতজ্ঞ।

ইতি
সীমা

চিঠিটা পর পর কয়েকবার পড়ে ফেলবার ইচ্ছা দমন করতে পারলাম না।

সীমা, তুমি আমাকে চিঠি না লিখলেই পারতে। বাবার সঙ্গে দেশে পাঠিয়ে দিয়েই তোমায় আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। সীমা, আমি ভাবতে চেয়েছিলাম, কোনো কর্মফলে তোমার কিছু দিনের নরক নির্বাসন হয়েছিল; তারপর নিজের বাবার হাত ধরে তুমি আবার পৃথিবীর বৃহৎ জনারণ্যে মিশে গিয়েছো। সীমা, তাইতো ভাল ছিল। তুমি কেন আবার চিঠি লিখতে গেলে? বিশেষ করে আমাকে, যার কোনো সঙ্গতি নেই, সহায় নেই। একটা ভদ্রস্থ চাকরিও এই এতোদিন ধরে কলকাতার পথে পথে ঘুরে যে সংগ্রহ করতে পারেনি তাকে আবার চিঠি লেখা কেন? তার প্রার্থনা অথবা শুভেচ্ছার কী মূল্য আছে এই পৃথিবীতে?

সীমাকে চিঠির উত্তর দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আমি সীমাকে লিখতে চাই ঃ সুলেখার কথা তুমি আর মুখে এনো না। সুলেখাকে শেষ করে, মাটির অনেক তলায় পুঁতে ফেলে, সীমা তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে গ্রামের দেশে থাকো। সীমা, প্লিজ সুলেখার কথা তুমি আর কখনও মুখে এনো না।

সীমাকে আমি এখনই একটা চিঠি লিখতে চাই। তার এক কোণেও বড় বড় করে লেখা থাকবে ব্যক্তিগত। চিঠির ভিতরে C/o সীমা দেবী, সুলেখা সেনকেও একটা কড়া চিঠি লিখবো আমি। দোহাই, সীমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না আপনি, সীমাকে আপনি শান্তিতে থাকতে দিন।

বোকার মতো চিঠি দুটো খস খস করে লিখে ফেলেছি আমি। কাগজ দুটো সযত্নে মুড়ে খামের মধ্যে ঢুকোতে গিয়ে আমার খেয়াল হলো সীমাকে চিঠি লেখার কোনো উপায় নেই। সীমা নিজের ঠিকানা লেখেনি।

নিজের ঠিকানা লিখতে ভুলে গেল নাকি সীমা? অথবা সীমা আমাকে চিঠিই দিয়েছে, উত্তর চায়নি। সীমা আমার উত্তর চাইবে না কেন? উত্তরই যদি না-চাইবে, তাহলে সীমা হঠাৎ আমাকে এইভাবে চিঠি লিখলো কেন? এই সব নানা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আজকের স্নিগ্ধ সরল সকালকে হঠাৎ বেশ জটিল করে তুললো।

সীমার চিঠিখানা হাতে করে আপিস ঘরে রেখে এসেছি। জমাখরচের কিছু রুটিন কাজকর্ম অসম্পূর্ণ অবস্থায় টেবিলে পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতে গেলে, অবশ্যই হিসেবপত্তরগুলো একেবারে আপটুডেট রাখা প্রয়োজন।

আমার হাতে এখন অনেক কাজ, সীমা, এই সময় এইভাবে ঠিকানা-বিহীন চিঠি আমাকে না লিখলেই পারতে।

ভেবেছিলাম, সীমার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকার হয়ে গিয়েছে! থ্যাকারে ম্যানসনের চৌহদ্দিতে অন্তত তার সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্যরকম ভাবনা চিন্তার মেঘ মাথার মধ্যে জড়ো হচ্ছে। মনে হচ্ছে সীমার ব্যাপারে শেষ কথা এখনও আমার জানা হয়নি। আমাকে এবং সীমাকে হয় এখানে অথবা অন্য কোথাও আবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

"গুড মডিং, স্যর!" মর্নিংকে মডিং বলে তৃপ্তি পায় এমন একটি লোক-কেই আমার জানা আছে। তার নাম মদনা।

"আরে মদন! এতোদিন কোথায় ছিলে? তোমার দেখাই নেই।" মদনার সঙ্গে সত্যিই অনেকদিন দেখা হয়নি।

মদনা সলজ্জভাবে নোখ কাটতে কাটতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "আমাদের কথা সবই তো জানেন, স্যর। আমাদের তো যাবার একটিই জায়গা আছে।"

উত্তর শেষ না করে মদনা নোখের নির্দিষ্ট অংশটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেললো। তারপর বললো, "আর বলেন কেন স্যর, এক ঘেটকেল খ্যাঁক-শেয়ালের পাল্লায় পড়ে কিছুদিন হোটেলে থেকে খাট্‌টা খেয়ে আসতে হলো।"

আমি ভাবলাম, কারও পাল্লায় পড়ে মদনা কলকাতার বাইরে কোনো হোটেলে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছে; কিন্তু সেখানে মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু মদনা নিজেই আমার ভুল ভাঙালো—জানালো সে কিছুদিন জেলে কাটিয়ে এল। খাট্‌টা মানে যে জেলের খাবার, হোটেলে মানে জেল এবং ঘেটকেল খ্যাঁকশিয়াল যে দুষ্ট পুলিস তা আমি জানবো কী করে?

"কী করেছিলে এবার? কোথায় ধরা পড়লে?" আমি জানতে চাই মদনার কাছ থেকে।

কিন্তু মনের দুঃখে মদনা বললো, "মা কালীর দিব্যি, কিছুই করিনি। শুধু শুধু বেগার খেটে আসতে হলো।"

"মানে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

বেশ তিক্তভাবে মদনা উত্তর দিল, "আর বলেন কেন, স্যর। থানার ওই ধম্মের ষাঁড় মিত্তিরবাবু। অনেক দিন চেনাশোনা, ওঁর লিস্টিতে আমার নাম আছে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেখাশোনা না করলে চলে না। যখন যা বলে ফাইফরমাশ খেটে দিয়েছি। কয়েকবার এধার-ওধারের খবর দিয়ে দুচারটে কেস ধরিয়ে দিয়েছি, তাতে মিত্তিরবাবু গরমেণ্টের রিওয়ার্ডও পেয়েছেন।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তারপর মিত্তিরবাবু বলে কিনা তুই আমাদের সব সময় খবরাখবর দে, মাঝে মাঝে কিছু হাত-খরচা পাবি। আমি হাতজোড় করে বলেছিলাম, "না স্যর, আমি পার্মেণ্ট 'উলটিবাজ' হতে পারবো না—ওপরে ভগবান রয়েছেন, কখনও ক্ষমা করবেন না।"

আমি আন্দাজ করছি, উলটিবাজের অর্থ বিশ্বাসঘাতক।

রেগে মেগে মদনা বললো, "মিত্তিরবাবুর মতো কালোমামাগুলো যা হয়েছে না! সব সময় ঘুষের পয়সায় পেট্রোল টেনে-টেনে মোটকা হচ্ছে আর কুঁড়ে মেরে যাচ্ছ। নিজে থেকে চোর ধরবার আর খ্যামতাই নেই! তোমার ভুঁড়ির ওপর দিয়ে চোর পালাবে, আর অত্যাচার বাড়বে আমাদের ওপর।"

আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি মদনার দিকে। মদনা বললো, "মিত্তির খ্যাঁকশিয়ালের কথা আপনাকে কত বলবো! ভাবনানি ম্যানসনে স্পেশাল ঘরে পেট্রোল টেনে একটা মুটকী ডবলডেকার মেয়ের কদমায় হাত দিয়ে বসে আছে। সেই অবস্থায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। কোনো লজ্জা শরম নেই।

হালচাল দেখলে মনে হবে পয়সা খরচ করে টমটম এসেছেন। অথচ ফ্রি-পাসের প্যাসেঞ্জার!"

মদনা বলে চলেছে, "আমি তো স্যর বাধ্য হয়ে সেলাম করে খ্যাঁকশিয়ালের সামনে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছি। লোকে স্যর গরু-ঘোড়া দেখলেও এই অবস্থায় সামলেসুমলে নেয়। মিত্তিরবাবুর ভাব গতিকের কোনো চেঞ্জ হলো না, শুধু বললেন, মদনা তুই এসেছিস। আমি তখনও সেলাম করে স্ট্যাচুর মতো হয়ে আছি। উনি তখন ডবলডেকার মেয়ের ঢল্-ঢল্-এর তলা দিয়ে ডালিম দুখানায় সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। বলছেন, আহা! বোঁটাকাটা বেলফুল।"

"আঃ, মদনা," আমি বিরক্তভাবে বকুনি লাগালাম।

কাঁদ-কাঁদ হয়ে মদনা বললো, "আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না স্যর। ঐ অবস্থায় মিত্তিরবাবু আমাকে বললেন, 'একটা কেসে তুই চালান হয়ে আমাকে হেল্প করবি, মদনা? এই মাস তিনেক জেল হবে তোর। কিন্তু আমার প্রমোশন মারে কে? কোলকে চুরির কেসে ব্যাটা মিত্তিরবাবু আমাকে জড়াতে চাইলো।"

এই কোলকে জিনিসটা যে রিভলবার, তাও মদনা আমাকে বুঝিয়ে দিলো।

মদনা বললো, "আমি স্যর ওই অবস্থায় মিত্তিরবাবুর পা জড়িয়ে ধরলাম। ব্যাটা আমার কথা শুনতোই না। শেষে ওই ডবলডেকার মেয়ে আমার দুঃখে কষ্ট পেয়ে মিত্তিরবাবুকে বললে, আহা ওইটুকু ছেলেকে রিভলবার কেসে জড়াবেন না। মিত্তির তখন নেশায় টং হয়ে দিদিমণির থাম খুলছেন। আমাকে চটপট বিদেয় করবার জন্যে বললেন, তাহলে, তুই অন্তত ওই চড়াই-বাজের কেসটা উদ্ধার করে দে।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে মদনার কথা শুনছি।

মদনা বললো, "আমার কোনো উপায় ছিল না। কোথায় কে কার বাড়িতে পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে চুরি করতে গিয়ে কেটে পড়লো, আর আমাকে বাবুর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখবার জন্যে এবং বাবুর প্রমোশনের জন্যে দেড় মাসের জেল খেটে আসতে হলো। তাও আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ভাবনানি ম্যানসনের ওই দিদিমণি তো বলেছিলেন, তোর কপালে ছ মাসের দুঃখ আছে। কিন্তু আদালতের খোকাবাবুটি ভাল মানুষ—কী ভেবে আমাকে মাত্তর ছ'সপ্তাহের জন্য শ্বশুরবাড়িতে পাঠালেন।"

মদনা বললো, "জেল থেকে বেরিয়ে এসে এ লাইনে ঘেন্না ধরে গিয়েছে, স্যর। বিশ্বাস করবেন না স্যর, দু'একবার গোটোগিরি ছাড়া স্রেফ নুলো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি।"

"গোটো জিনিসটা কী, মদনা?" আমি জানতে চাই।

জিভ কেটে সলজ্জভাবে মদনা উত্তর দিল, "বিনা নেমন্তন্নে যারা কাজের বাড়িতে ঢুকে পেটপুরে খেয়ে আসে, স্যর। পুলিস এদেরই 'গোটো' বলে।"

মদনাদের জীবনের এই অন্ধকার দিক সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। মদনার কথা শুনে এক বিজাতীয় ঘৃণায় আমার রক্ত জ্বলছে; কিন্তু মদনার কথাবার্তায় কোনো ক্রোধের পরিচয় নেই।

মদনা বললো, "আপনি একটা কোম্পানির সায়েব হবার জন্যে মা কালীর কাছে মানত করুন, স্যর। ডানলপ, ফেনার ওয়ালফোর্ড—কাছাকাছি কত কোম্পানিই তো রয়েছে।"

"তাতে তোমার কী লাভ হবে, মদনা?" আমি প্রশ্ন না করে থাকতে

পারলাম না।

এক গাল হেসে মদনা উত্তর দিল, "সায়েব হলেই তো আপনার চাপরাসী লাগবে। তখন আপনি এই মদনাকে নিয়ে নেবেন, স্যর।"

মনের গোপন কোণে গভীর দুঃখ বোধ করলাম। আমিও সায়েব হয়েছি, আর তোমারও দুঃখ ঘুচিয়েছি আমি, মদনা।

"এখন তুমি কী করছো, মদন?" আমি এবার জানতে চাই।

মদনা বললো, "সিলভার ড্রাগনেই জয়েন করলাম, স্যর। চাওলা মেম-সায়েব এর আগেও আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এখন আমার আর বিষ দাঁত নেই—একটা কিছু তো করতেই হবে।"

মিসেস শকুন্তলা চাওলা। এ-পাড়ার একটি বিখ্যাত নাম। থ্যাকারে ম্যানসনের একতলায় বিখ্যাত রেস্তোরাঁ সিলভার ড্রাগনের সর্বময় কর্তৃত্ব এই প্রাতঃস্মরণীয় মহিলার।

মদনা বললো, "আপনার সঙ্গে খুব জরুরী কথাবার্তা ছিল, স্যর।"

"মদনা, যখন এসেই পড়েছো, তখন জরুরী কথাবার্তাগুলো এখনই সেরে নাও।"

আকাশ থেকে পড়লো মদনা। "আমার কী জরুরী কথাবার্তা থাকতে পারে, স্যর? আমি তো সামান্য বেয়ারা।"

"তাহলে," আমি এবার একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

মদনা বললো, "চাওলা মেমসায়েব নিজেই জানতে চাইলেন, ম্যানেজার-বাবুর সঙ্গে তোমার কী রকম সম্পর্ক? আমি বললাম, 'একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ সম্পর্ক!' সেই না শুনে মেমসায়েব খুব খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক টাকা বকশিশ দিলেন এবং বললেন, এখনই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসো।"

মদনা এবার আমার দিকে এগিয়ে এলো। একটা কিছু স্পেশাল কথা যে সে এবার বলবে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

সিলভার ড্রাগনের নবনিযুক্ত কর্মচারী শ্রীমান মদনা এবার সগর্বে ঘোষণা করলো, "বড় মেমসায়েব আপনাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।"

খোদ মিসেস শকুন্তলা চাওলা কর্তৃক ডিনারে আপ্যায়িত হওয়া যে বিরাট সম্মানের ব্যাপার তা আমার খেয়াল হওয়া উচিত ছিল।

মদনা নিজেই ব্যাখ্যা করলো, "থ্যাকারে ম্যানসনের কোনো লোকের সঙ্গে মিসেস চাওলা ডিনার খেয়েছেন বলে কখনও শুনিনি। কয়েকজনের জন্যে ডিনারের ব্যবস্থা করেছেন—কিন্তু তার মানে, সিলভার ড্রাগনের ম্যানেজারকে বলে দিয়েছেন। এঁরা সিলভার ড্রাগনের মেনু কার্ড থেকে যা-খুশি অর্ডার করেছেন, প্রাণভরে খেয়েছেন, কিন্তু বিল দিতে হয়নি।"

আমার সদ্যোপার্জিত অভাবনীয় সম্মানে মদনা গর্বিত। সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করলো, প্রথমে সে ভেবেছিল, আমাকেও ওইরকম নেমন্তন্ন করা হচ্ছে। আমার খাবার সময় বড়জোর ম্যানেজারবাবু পাশে এসে বসবেন।

"পুলিসের অনেকে প্রায়ই ওইভাবে খেয়ে যান। মিত্তিরবাবু তো যাবার সময়েও প্যাকেট বেঁধে চাইনীজ খাবার নিয়ে যান। ভাবনানি ম্যানসনের স্পেশাল ঘরে ফূর্তি করবার সময় প্রায়ই তিনি স্লিপ পাঠিয়ে বোনলেস চিলি চিকেন ও ফ্রায়েড প্রণের বাক্স আনিয়ে নেন।"

মদনা এবার হেসে ফেললো। মিত্তিরবাবুর স্লিপে সব সময় লেখা থাকে, "পত্রবাহকের হাতে মাল দিয়ে ক্যাশ নেবেন। আমি তো জানি না, পরশুদিন বাক্সগুলো মিত্তিরবাবুর লোকের হাতে দিয়ে টাকা চাইতেই সে বেচারা মাথায় হাত দিয়ে বসলো। বললো, সায়েব শুধু স্লিপ পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোনো টাকা-পয়সা দেননি।"

মদনা বলে চললো, "আমি ভেবেছিলুম, বেটা বেয়ারাই কোনো গোলমাল করছে! টাকা এনে খাবার নিয়ে যাবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম তাকে। এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে আমাকে খুব বকুনি লাগালেন। বললেন, 'ইডিয়ট তুমি নিজেও বিপদে পড়তে এবং আমাকেও অথৈ জলে ফেলতে। মিত্তিরবাবুর কাছে তুমি পয়সা চাইলে চাকরিটি সঙ্গে সঙ্গে ফিউজ হয়ে যেতো।' আমি বললাম, 'উনি নিজেই তো স্লিপে টাকা নেওয়ার কথা লিখেছেন।' ম্যানেজারবাবু দাবড়ানি দিলেন, 'তুমি বুঝবে না। ওঁদের ওই রকম লিখতে হয়। ওঁর হাতের লেখা কাগজগুলো যদি কারুর হাতে পড়ে তারা ভাববে পুলিসের এস-আই ফ্রি খাবার লুটছে।"

এহেন মিত্তিরবাবুও নাকি কখনও স্বয়ং শকুন্তলা চাওলার সান্নিধ্যে সান্ধ্যভোজের সৌভাগ্য অর্জন করেননি। এই বিরল সম্মানটি যেন এতোদিন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এবং থ্যাকারে ম্যানসনে আমার অর্ধ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে তা দূত মারফত ঘোষিত হলো।

সেদিন রাত্রেই শকুন্তলা চাওলার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। তিনের দশক পেরিয়ে চাওলাগৃহিণী অবশ্যই চতুর্থ দশকের বিপজ্জনক অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন; কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা, এমনকি দেহেও সূর্যাস্তের কোনো ইঙ্গিত নেই! পুরনো বাসিন্দাকে উৎখাত করে নিজের দখল না পেয়ে বেচারা বয়স যেন মনের দুঃখে বনে পালিয়েছে। শকুন্তলার কোটরে বন্দী একজোড়া কালো ভ্রমর যেন চঞ্চলভাবে সর্বত্র সেই ফেরারির সন্ধান করছে।

শকুন্তলা চাওলা একটি ধবধবে সাদা শাড়ি পরেছেন যার কোনো রঙীন পাড় নেই। শুধু মিহি সাদা নকশা পাড়ের জায়গাটুকু অস্পষ্টভাবে দখল করে রেখেছে। শাড়ির এই উদ্ধত সাদা রং শকুন্তলার সুগঠিত দেহের শুভ্রতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। শকুন্তলার ঊর্ধ্ব দেহের অন্য বস্ত্রটিকে 'যৎসামান্য ব্লাউজ' বলা চলতে পারে। এই ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডটি রক্তাক্ত লাল হওয়ায় অনভ্যস্ত দৃষ্টি ওই নো পার্কিং এরিয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

শকুন্তলা হাত জোড় করে আমাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যেন তাঁর সঙ্গে আমার কতদিনের পরিচয়। চাওলাগৃহিণীর সমগ্র স্বাস্থ্য যে ইংরিজী শব্দটি স্মরণ করিয়ে দেয় তা হলো 'ওয়েল-প্রিজার্ভড'। সুসংরক্ষিত শব্দটি আমাদের বাঙালী চিন্তায় নারীদেহ সম্বন্ধে সুপ্রযোজ্য নয়।

সিলভার ড্রাগন ভোজনালয়টি পিন উটাং নামের যে চীনা ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠিত তাঁর কথা থ্যাকারে ম্যানসনে চাকরি নেবার পরেই বরদাপ্রসন্নর

কাছে শুনেছি। এই ভোজনালয়ে ক্রমশ পানশালা সংযোজিত হয়েছে, এবং এই বার লাইসেন্সের বিস্তৃতির পিছনে মিসেস চাওলার স্বামী সুরিন্দরের কিছু অবদান ছিল শোনা যায়। লাহোর থেকে বিতাড়িত সুরিন্দর চাওলা একদিন ভাগ্য সন্ধানে শকুন্তলাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। অন্য কোনো পথ না পেয়ে সুরিন্দর এই সিলভার ড্রাগনেই চীনা সাহেবের অধীনে সামান্য চাকরি নিয়েছিলেন।

সিলভার ড্রাগন তখন নামেই সিলভার—কোথাও কোনো চাকচিক্য নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বিদেশী সৈন্যরা কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে চীনা রেস্তোরাঁকে বিপদে ফেলে গিয়েছে। তখন থ্যাকার মধ্যে কিছু দুর্নাম। এই সামান্য দোকানের সামান্য চাকরিতে স্বামীর কতই বা মাইনে হতে পারে? কিন্তু নিরাশ না হয়ে তেজস্বিনী শকুন্তলা নিজের হাতে সংসারের এবং স্বামীর কর্মক্ষেত্রের হাল ধরলেন। হোটেলের সামান্য শ্রীবৃদ্ধি হলো। কাজের সুবিধার জন্যে স্বয়ং শকুন্তলা দেবী প্রতিদিন ঘড়ি ধরে হোটেলে উপস্থিত হতে লাগলেন।

চীনা সায়েব তো কর্মরতা শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ। এর পর কাজের সুবিধার জন্যে শকুন্তলা চাওলা একদিন চীনা সায়েবকে রাজী করিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনে সিলভার ড্রাগনের একটি লাগোয়া ঘরে উঠে এলেন। রাতারাতি সিলভার ড্রাগনের ভোল পাল্টাতে শুরু করলো। তারপর কোনো এক যাদুপ্রভাবে স্বয়ং শকুন্তলা চাওলা সিলভার ড্রাগনের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে বসলেন।

বুড়ো পিন উটাং নিজের ভাইপোকে ব্যবসা থেকে বিদায় করলেন। মনের দুঃখে সে বোম্বাইতে চাইনীজ ইটিং হাউস খুলে বসলো। বুড়ো পিন উটাং কিছুদিন পরে কোনো অজ্ঞাত কারণে সদর স্ট্রীট ছেড়ে বেণ্টিংক স্ট্রীটে ফিরে গেলেন। প্রথম দিকে মাঝে মাঝে তাঁকে রেস্তোরাঁয় আসতে দেখা যেতো—তারপর সিলভার ড্রাগন থেকে তিনি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কেউ বলে চীনা সায়েব সিলভার ড্রাগনের স্বত্ব পুরোপুরি বেচে দিয়ে বিদায় হয়েছেন। কেউ বলে একেবারে বাজে কথা। শকুন্তলার সম্মোহনী শক্তিতে বুড়ো চীনেও কুপোকাৎ হয়েছেন, তাঁকে ঠকিয়ে এই দোকান থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। সিলভার ড্রাগনের খাতাপত্তর বাইরের লোকদের কে আর খুঁটিয়ে দেখছে? গুজব শোনা যায় যে কাগজে-কলমে বুড়ো সায়েব এখনও অংশীদার আছেন, কিন্তু স্লিপিং পার্টনার। আইনের দড়িতে ধীরে ধীরে তাঁকে এমন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়েছে যে বুড়োর ফিরে আসার ইচ্ছে হলেও এখন কোনো উপায় নেই।

এখন সিলভার ড্রাগন বলতে একমাত্র শকুন্তলা চাওলাকেই বোঝায়; এমন কি বেচারা সুরিন্দর চাওলাকেও নয়। এই রেস্তোরাঁয় কোনো কাজেই স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে কোনো নির্দেশ দেবার ক্ষমতা যে সুরিন্দর চাওলার নেই, তা থ্যাকারে ম্যানসন থেকে আরম্ভ করে এ-পাড়ার সব বাড়ির কর্মচারী ও বাসিন্দাদের সুবিদিত। এমন কি মদনাও চাকরির জন্যে সোজাসুজি শকুন্তলার কাছেই দরবার করেছে, সুরিন্দরজীকে বিব্রত করেনি। আসলে সিলভার ড্রাগন বলতে এখন শকুন্তলা চাওলা, যদিও খাতাপত্রে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কে তা আজও সাধারণের কাছে রহস্যাবৃত। অনেকের ধারণা চীনে সায়েব যে কোনোদিন আবার ফিরে এসে কর্তৃত্ব দখল করতে পারেন;

কিন্তু শকুন্তলা চাওলার স্পেশাল মন্ত্রে অমন দুর্দান্ত চীনা ড্রাগনও অবশ হয়ে আছেন।

শকুন্তলা চাওলা মিষ্টি বাংলায় আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন। কতদিন থেকে ভাবছি আপনার সঙ্গে একটু ভাব করবো, কিন্তু আপনি যা ব্যস্ত থাকেন।"

"আপনি সুন্দর বাংলা শিখেছেন তো", আমি বিস্ময় চেপে রাখতে পারি না।

মিষ্টি হেসে শকুন্তলা উত্তর দিলেন, "বাংলায় আছি, বাংলার অন্ন খাচ্ছি, আর বাংলা শিখবো না তা কখনও হয়?"

শকুন্তলা আরও বললেন, "আমি তো এখন বাঙালী, বাঙলাই তো আমার দেশ। আমার মেয়েকে তো আমি বাংলা গানও শিখিয়েছি।" শকুন্তলার হাসির সঙ্গে তাঁর দন্তকৌমুদী এবার বিকশিত হলো। এমন ধবধবে সুন্দর এবং সাজানো দাঁত আমি কখনও দেখিনি।

আমি এখন দন্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছি ততক্ষণে শকুন্তলা চাওলা মৃদু হেসে বলছেন, "ইচ্ছে ছিল বাঙালীর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিই, কিন্তু তা তো হলো না। তবে বাঙালীদের সঙ্গেই আমার ভাবসাব। এই দেখুন না মিস্টার দত্ত, মিস্টার সেন, মিস্টার ঘোষ," এই বলে কলকাতার সরকারীমহলের কয়েকজন কেষ্ট-বিষ্টুর নাম শকুন্তলা দেবী হুড় হুড় করে বলে গেলেন।

"আমার এই সামান্য জায়গা, দেখতেই পাচ্ছেন। এসব কী ওঁদের মতো লোকের যোগ্য? তবু ওঁরা আমাকে ভোলেন না। দয়া করে পায়ের ধুলো দেন।" এই বলে চমৎকার বাংলায় নিজের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন শকুন্তলা চাওলা।

শকুন্তলা চাওলার ঘরে ইতিমধ্যেই গরম স্যুপের পাত্র এসে গেলো। একটা সুদৃশ্য ব্যোল আমার দিকে তিনি যে লীলায়িত ভঙ্গিমায় এগিয়ে দিলেন তাতেই বোঝা যায় অতিথি আপ্যায়নে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী।

নিজের দিকেও একটা স্যুপ-ব্যোল টেনে নিয়ে শকুন্তলা সাদরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খেতে ভালবাসেন, তাও জানা হয়নি। চাইনীজ? মোগলাই? ইংলিশ?"

শাজাহান হোটেল ছেড়ে আসবার পরে সুখাদ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে। এতোদিন পরে আবার কেউ এমন মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কী খেতে ভালবাসি।

আমি উত্তর দিতে দেরি করছি দেখে শকুন্তলা চাওলা তুলিতে আঁকা তাঁর ভ্রূপটটি সজীব করে তুললেন। বললেন, "কোনো রকম দ্বিধা করবেন না—আমাদের এখানে সব রকমের ব্যবস্থা আছে। আমাদের বীফ স্টেক এবং আর একটি ডিশ এখন বিশ্ববিখ্যাত বলতে পারেন। হ্যানোভার থেকে লোক ছুটে আসে কলকাতায় এই সিলভার ড্রাগনে।"

কী এই বিশেষ খাদ্য যা হ্যানোভার নাগরিকের হৃদয়দৌর্বল্য ঘটিয়ে থাকে?

আমার কথার উত্তর না-দিয়ে ইনটার্নাল টেলিফোনে শকুন্তলা চাওলা মেনুকার্ডের নম্বর ধরে শুদ্ধ পাঞ্জাবি ভাষায় কী সব নির্দেশ দিলেন।

২৬

এবং কিছুক্ষণ পরেই যে-বস্তুটি আমাদের সামনে উপস্থিত হলো তা একটি দুগ্ধসেব্য শূকরশিশু। জন্তুটি যেন জীবন্ত! মনে হচ্ছে ট্রে থেকে করুণ-ভাবে মিসেস চাওলার দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু কন্যার জননী শ্রীমতী শকুন্তলার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ছুরি দিয়ে শিশুটির অঙ্গচ্ছেদ করতে করতে বললেন, "সাকিং পিগ রোস্ট! জেনুইন সাকিং পিগ ছাড়া আমি কিনতেই দিই না—আগে আমি নিজে সিলেক্ট করে দিতাম, তার পরে মারা হতো!"

কোনো নারী অন্য এক জননীর স্তন্যপানরত শিশুকে হত্যার জন্য নির্বাচন করছেন, দৃশ্যটি আমার মোটেই ভাল লাগল না।

শূকরশিশুর একটি অংশ নিপুণভাবে ছুরিকাবিদ্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন শকুন্তলা চাওলা। কিন্তু আমি ওই খাদ্যে নিরুৎসাহ দেখালাম।

তখন আমার জন্যে মাছ এলো। কিন্তু শকুন্তলা চাওলা নিজের প্লেটে রোস্টেড পিগ অথবা মাছ কিছুই নিলেন না। শকুন্তলা চাওলা জানালেন, তিনি নিরামিষাষী। তাঁর দেখাদেখি তাঁর মেয়েও স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান হয়েছে। হাসতে হাসতে শকুন্তলা বললেন, "উর্বশীর ওই জন্যে বাঙালীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া গেলো না! যে-বউ মছলি খায় না তাকে কোন্ বাঙালী বিয়ে করবে বলুন তো?"

"আমার জামায়ের সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়নি?" শকুন্তলা এবার টেলিফোনে সিলভার ড্রাগনের হল-ঘর থেকে কাকে যেন ডেকে পাঠালেন।

শাশুড়ীর হুকুমে জামাই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাইভেট রুমে হাজির হলেন। জামাইটিকে আমি বেশ কয়েকবার সিলভার ড্রাগনের সামনে দেখেছি। শকুন্তলা বললেন, "পুরুষ, মিট মিস্টার শংকর। ওয়ান্ডারফুল ইয়ংম্যান—কিন্তু লোনলি! সব সময় থ্যাকারে ম্যানসনের আরও কয়েকটা ফ্ল্যাট কীভাবে খালি করা যায়, তাই ভাবছেন।"

"দিস ইজ মাই ম্যানেজার মিস্টার পুরুষোত্তম কাপুর, হু অলসো হ্যাপন্স্ টুবি মাই ডটারস হাজবেন্ড!" ইংরিজীতে নিজের দক্ষতা দেখিয়ে দিলেন শকুন্তলা চাওলা। জামায়ের দিকে আড়চোখে তাকালেন শকুন্তলা। শাশুড়ী ভুরিভোজনে ব্যস্ত এবং বিনয়াবনত জামাই সম্মুখে হুকুমে হাজির, এমন দৃশ্য কোনো পরিচিত পরিবারে আগে কখনও দেখিনি।

মৃদু হেসে শকুন্তলা এবার কন্যার পতিদেবতাটির প্রশংসা করলেন। বললেন, "তোমার চেষ্টা যেমন কীভাবে ফ্ল্যাট খালি করা যায়, 'পুরুষের' ধ্যানজ্ঞান তেমন একটিই ঃ কী করে সিলভার ড্রাগনের সমস্ত চেয়ার সব সময় বোঝাই রাখা যায়।"

পুরুষ কাপুর ওসব রসিকতায় উৎসাহ দেখালেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "হাউ ওয়াজ দি সাকিং পিগ?"

শকুন্তলা হেসে উত্তর দিলেন, "উনি আমারই মতো সেন্ট পার্সেন্ট বেঙ্গলী। পিগটিগ পছন্দ করেন না!"

পুরুষ কাপুর আড়চোখে টেবিলের ওপর আরও কী সব সন্ধান করলেন। তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট অ্যাবাউট সাম ড্রিংকস?"

বেলফুলের মতো দাঁতগুলো বিকশিত করে শকুন্তলা এবার মন্তব্য করলেন, "মিস্টার শংকর ইজ এ সেন্ট! উনি ড্রিংকও করেন না। কোন্‌দিন

শুনবে উনি আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গিয়েছেন!”

পুরুষ কাপুর আমাদের আর বিরক্ত করলেন না। শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, “কোনো সুইট ডিশ পাঠিয়ে দেবো কিনা।”

“মিস্টার শংকরের জন্যে ইয়েস। তবে নট ফর মি। আমি আমার ফিগারের আর সর্বনাশ করতে চাই না!”

পুরুষোত্তম কাপুর শাশুড়ীর রসিকতায় হতোদ্যম না হয়ে আবার অনুরোধ করলেন, “একটু ক্যারামেল কাস্টার্ড?”

শকুন্তলা চাওলা এবার আড়চোখের শরসন্ধানে কাপুরতনয়কে আহত করে বললেন, “যদি তুমি চাও, উর্বশীকে ওই সব খাইয়ে তার ফিগারের বারোটা বাজিয়ো—কিন্তু ওই জিনিস নট ফর মি!”

নিজের কন্যার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে জামাতার সঙ্গে এমন রসিকতা শুনতে অনভ্যস্ত আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম।

পুরুষোত্তম এবার বিদায় নিলেন। এবং ছোট কাপে কফির ইনফিউশন ঢেলে নিয়ে শকুন্তলা আমাকে ডিনার টেবিল থেকে সরে এসে নরম সোফায় তাঁর পাশে বসতে মধুর আহ্বান জানালেন। এঁকে-বেঁকে আলুলায়িত ভঙ্গীতে নিজের নরমদেহটি অধিকতর নরম সোফায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শকুন্তলার বেশবাস একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অভ্যস্ত নিপুণ-তার সঙ্গে কাঁধের কাছেও একবার হাত দিয়ে বাইরে উঁকিমারা অন্তর্বাসের স্ট্র্যাপটি ব্লাউজের আবরণের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন শকুন্তলা।

তারপর সোফায় পিঠ এলিয়ে দিয়ে শকুন্তলা বললেন, “আমি খু-উ-ব দুঃখ পেয়েছি। আপনি কখনও সিলভার ড্রাগন থেকে খাবার আনিয়ে খান না। ব্যাচেলর মানুষ, কত ভাবে আর নিজেকে বঞ্চিত করবেন মিস্টার শংকর? সব সময় হাত পুড়িয়ে রাঁধবার বা বাজারের আজেবাজে জিনিস খাবার কোনো দরকার নেই। স্রেফ স্লিপ এবং টিফিন কেরিয়ার পাঠিয়ে দেবেন, পুরুষকে আমার বলা আছে।”

শকুন্তলা সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, “সন্ধ্যের দিকে যখন ইচ্ছে চলে আসবেন। একটু ফোন করে দেবেন শুধু। মিস্টার সেন, মিস্টার চ্যাটার্জি ওরাও চলে আসেন মাঝে মাঝে। আর কমপ্লেন করেন, আমার এখানে খুব জায়গা কম। এবার আমি আপনার কথা বলে দেবো। জায়গা বাড়াবার মালিক তো আমি নই। তার লর্ড হচ্ছেন, আমার ল্যান্ডলর্ড মিস্টার শংকর!”

“আমি লর্ডও নই, ল্যান্ডলর্ডও নই, মিসেস চাওলা। আমি অতি সামান্য একজন ম্যানেজার”, এবার আমি প্রতিবাদ জানাই।

চোখের বাণে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরাশায়ী করবার চেষ্টা করলেন লাস্যময়ী শকুন্তলা চাওলা। বললেন, “ওসব কথা আপনি যাকে খুশী বলবেন, বাট নট টু ইওর শকুন্তলা! আমি জানি হু ইজ হোয়াট।”

আমি এবার আরও ঠাণ্ডা কঠিন হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

শকুন্তলা বললেন, “আমার কথাগুলো মুখোমুখি বলে আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাই না। মদন আপনার সঙ্গে দেখা করবেখ'ন। আমি কিন্তু কোনো কথা শুনতে চাই না।”

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে এগিয়ে এসেছি। শকুন্তলা

তখনও তাঁর রসিকতা শেষ করেননি। বললেন, "আমার মেয়ে উর্বশী সাঁতার কাটতে গিয়েছে। আবার আসতে হবে। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তারপর বোধ হয় আপনাকে এখানে আসবার জন্যে এত পেড়াপিড়ি করতে হবে না!" হাজার হোক আমার নিমন্ত্রণ ও উর্বশীর নিমন্ত্রণ তো এক নয়! এরপর শুভরাত্রি জানিয়ে আমাকে বিদায় করলেন শকুন্তলা চাওলা।

এসব দৃশ্য হজম করতে আমাদের মতো মানুষের সময় লাগতে বাধ্য। ঘরে ফিরে রোমন্থন শুরু করেছি সবে। এমন সময় শ্রীমান মদনা হাজির হলো।

আমারই সম্মানে আজকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মদনার ছুটি হয়ে গিয়েছে। একগাল হেসে মদনা বললো, "আপনি এ-বাড়ির খোদ মালিক হয়ে যান, স্যর। তা হলে আমার খুব সুবিধে হয়ে যাবে। এই চাওলা মেমসায়েব আমাকে আগে চিনতেই পারতেন না অথচ এখন আপনার সঙ্গে আমার ভাব আছে দেখে খুব ভালবাসছেন।"

"ব্যাপারটা কী ?" আমি সোজাসুজি মদনের কাছে জানতে চাই।

মদনা বললো, "আপনি তো সটাসট তিন চারখানা ফিলাট খালি করে ফেলেছেন। গুজব রটেছে, আরও দু'একটা ফ্ল্যাট আপনি কয়েক দিনের মধ্যে দখল করে ফেলবেন। এদিকে মিসেস চাওলার বিজনেস বাড়ছে। ওঁর আরও ঘর দরকার। আপনি হেল্প না করলে কে আর করবে? আগে এমন কাজ রামসিংহাসনের থ্রু দিয়ে হতো। কিন্তু গত কয়েক মাস রামসিংহাসনজী মেমসায়েবের কাছ থেকে শুধু টাকাই খাচ্ছে, অথচ কাজ কিছু এগোচ্ছে না। দেখে-দেখে মেমসায়েবের মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। নিজের বরকেও খুব বকুনি লাগিয়েছেন কাল। বলেছেন, কোনো কম্মের নও তুমি। যা কিছু করবার তা আমাকে আর পুরুষোত্তমকে করতে হবে।"

"তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে?" আমি এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।

মদনা মাথা চুলকোতে লাগলো। তারপর বললো, "দিন না, দু'একখানা ফ্ল্যাট ছেড়ে—আপনারও সুবিধে হয়ে যাবে। যখন খুশী চাইনীজ, ইংলিশ খানা অর্ডার করবেন, আমি নিজের হাতে নিয়ে আসবো।"

আমি বললাম, "ঘর খালি করবার কাজ আমার, কিন্তু ঘর বোঝাই করবার আগে মালিকদের সঙ্গে কথা বলতেই হবে আমাকে।"

"আপনার কথা কে ফেলবে, স্যর? আপনাকে যে ইনসাল্ট করবে তার মাথা এই মদনা আস্ত রাখবে না। আপনি শুধু মাথাখানা দেখিয়ে দেবেন।" মদনা প্রস্তাবটা বেশ সহজভাবেই দিচ্ছে।

আমি এবার জানতে চাইলাম, "সিলভার ড্রাগনের হাতে কোন্ কোন্ ফ্ল্যাট আছে, মদন ?"

মদনের মাথা চুলকনো বাড়লো। "পুরো হিসেব, মিস্টার চাওলাও দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। আপনার লোকও পারবে না।"

খাতায়-কলমে সিলভার ড্রাগন রেস্তোরাঁ কতখানি জায়গা নিয়েছে তা আমার অবশ্যই জানা আছে। আমি তার বাইরের কথা বলছি।

"আমিও তো সেই হিসেবই করছি, স্যর। বড় মেমসায়েবের কোমরে যে চাবির গোছা আছে তার ওজন কয়েক সের হবে স্যর! সেই সব চাবি দিয়ে কখন যে কোন্ ফ্ল্যাট খুলে ফেলেন ওঁরা।"

আমি মদনার কথা শুনবার জন্যে অপেক্ষা করছি। মদনা বললো, "আমি হিসেব করে আপনাকে বলবো স্যর। আগে তো এ-বাড়ি যেই ছেড়ে চলে যেতো সেই টাকা নিয়ে ফ্ল্যাটের চাবি মেমসায়েবকে দিয়ে যেতো। ভালই চলছিল, কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু আপনি এসে হাজির হলেন। এখন রামসিংহাসন আর তেমন টকাটক ঘর ম্যানেজ করে দিতে পারছে না। অথচ ফ্ল্যাটের খুব দরকার।"

আমি এখনও মুখ বুঁজে মদনার দিকে তাকিয়ে আছি। মদনা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু জায়গার খুব দরকার। ব্যবসা-বাণিজ্য, খদ্দেরপাতি যেভাবে হুড় হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে তাতে চাওলা মেমসায়েব সামলাতে পারছেন না। কত বড় বড় লোক পায়ের ধুলো দেন; কিন্তু যত বড় লোক, তত হাঙ্গামা। কেউ কারও মুখ দেখতে চায় না। চাওলা মেমসায়েব নিজের মেয়ের ফ্ল্যাটের চাবিও নিয়ে রেখেছেন। সেই নিয়ে সেদিন কী ঝগড়া। দিদিমণি রেগে-মেগে আগুন। বললেন, আমার ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দেবো না। চাওলা মেমসায়েবও খুব বকলেন। বললেন, ব্যবসা থেকে টাকা না-এলে ফ্ল্যাট কোথায় থাকতো? জামাইবাবু অবশ্য কিছু বললেন না। উনি কখনও মেম-সায়েবের অবাধ্য হন না।"

"আর মিস্টার চাওলা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"উনি তো সাতে-পাঁচে নেই। ওঁকে মেমসায়েব যা হুকুম করেন, উনি তাই মুখ বুজে করেন। ওঁর কথার, ওঁর হুকুমের কোনো দাম নেই, একথা সিলভার ড্রাগনের সবাই আমরা জানি।"

মদনা বললো, "গতকালের ঝগড়ার পরেই, মেমসায়েব উঠে পড়ে লেগে-ছেন। বলেছেন, ফ্ল্যাট তিনি যোগাড় করবেনই।"

আমার কথার ভাবে মদনা বুঝলো বিডন স্ট্রীটের বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে দেখা না-করে আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করবো না।

মদনা বললো, "ওসব ঠিকঠাক করতে তো সময় লাগবে। আপনি টেমপোরারি একটা ফেসিলিটি দিন।"

"মদনা যা বলতে চাও, সোজাসুজি বলো।"

মদনা মাথা চুলকে বললো, "এগারো নম্বর ফিলাট তো গড়ের মাঠ হয়ে পড়ে আছে। যতদিন না আপনি ভাড়া দিচ্ছেন, ততদিন প্রাইভেট একটা ব্যবস্থা করুন। একটা চাবি আপনার কাছে থাক, একটা মেমসায়েবকে দিন।" দু'চারটে জিনিসপত্তর ওখানে রাখতে চায় মেমসায়েব। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি যদি ভাড়া এদের নাও দেন, এই মদনা আপনার 'গ্যারান্টি' রইলো, আপনি মুখ খোলার এক ঘণ্টার মধ্যে ঘর খালি করে চাবি ফেরত দিয়ে যাবে।"

-

মদনা বললো, "দুনিয়ার সবাই যখন লুটেপুটে খাচ্ছে, তখন আপনি বোকার মতো কষ্ট পাবেন কেন, স্যর? এর কোনো মানে হয় না। রামসিংহাসন নতুন লরি কিনে দেশে পাঠালো, আর আপনার দু'খানার বেশী শার্ট নেই। এটা ঠিক নয় স্যর, কিছুতেই ঠিক নয়।"

মদনা আমার দুর্বলতম স্থানেই আঘাত হানবার চেষ্টা করেছে। মাত্র দুখানার বেশী শার্ট নেই আমার। এবং তার একটার কলারেব অবস্থা এই থ্যাকারে ম্যানসনের ছাদের মতো! শাজাহান হোটেলে থাকলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হতো ; ওখানে উপবাস করে থেকেও ডিউটি টাইমে কড়া ইস্তিরি করা রিপুবিহীন শার্ট পরতে হয়। থ্যাকারে ম্যানসনে ওসব হাঙ্গামা নেই ; কিন্তু বিপদ-বাধায় নিজের কুড়েমি। সারাদিনের কাজের শেষে রাত্রে শোবার আগে এই প্রাত্যহিক শার্ট কাচার পাট বেশ ক্লান্তিদায়ক হয়ে ওঠে। এক এক দিন মনে হয় বাড়তি একটা-আধটা শার্ট থাকলে মাঝে-মাঝে কুড়োমি করা যেতো। আকাশে মেঘ দেখলেও ভিজে জামার চিন্তাতে ব্যতিব্যস্ত হতে হতো না।

মদনা আমার দিকে তাকালো এবং আমার মুখের ভাব থেকে কী আন্দাজ করে নিলো কে জানে। মদনা বললো, "আপনাকে 'গ্রাণ্টি' দিচ্ছি, কোনো হাঙ্গামা হবে না ; শুধু এগারো নম্বরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চাওলা মেম-সাহেবকে দিয়ে দেবেন।"

মদনা আমার সন্দেহভঞ্জনের জন্যে আরও এক-পা এগিয়ে গেলো। আমাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে ঘোষণা করলো, "আপনি কী ভয় পাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি।"

আমি এবার মদনার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালাম।

মদনা একগাল হেসে বললো, "মেয়েমানুষ সম্বন্ধে আপনার যে ভয় আছে তা চাওলা মেমসাহেবকে আমি সাফসাফ বলে দিয়েছি। আমি আপ-নাকে গ্রাণ্টি দিচ্ছি, আপনার ওই ঘরে কোনো মানুষই ঢোকানো হবে না।"

"তা হলে, ঘর নিয়ে কী করবেন ওঁরা?" আমি প্রশ্ন করি।

"ইস্টোর! খুব দরকার হলে একটু-আধটু মালপত্তর ইস্টক রাখবেন ওখানে। সিলভার ড্রাগনের ইস্টোর তো বেড়েই চলেছে, বুঝতেই পারছেন।"

আমি কোনো কথাই বললাম না। কয়েক মিনিট উসখুস করে মদনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ওকে বিদায় করবার জন্যে এবার আমাকে মুখ খুলতে হলো। পুরনো শার্টটা হাতে নিয়ে বললাম, "এখন আমার অনেক কাজ, মদনা। শার্ট এখনই কাচতে হবে।"

মদনা তখনকার মতো রণে ভঙ্গ দিলেও শার্টের ব্যাপারটা ওইখানেই মিটলো না। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় মুখ উজ্জ্বল করে শ্রীমান আবার আসরে পদার্পণ করলো, আগাম খোঁজ নেবার জন্যে। আমাকে দেখেই বললো, "আপনি এখন আছেন তো? চলে যাবেন না, কিন্তু প্লিজ।"

এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যে অপরিচিতা এক রমণীর আবির্ভাব। রমণী নিজেই পরিচয় দিলেন, "আমি উর্বশী কাপুর। আমার মার সঙ্গে গতকাল আপনার দেখা হয়েছিল। আমি তখন একটু সাঁতার কাটতে বেরিয়ে-ছিলাম।"

উর্বশী এবার এমনভাবে নমস্কার জানালেন যে মনে হলো কোনো সময়ে ইনি নৃত্যপটীয়সী ছিলেন।

আমার এই সামান্য ঘরে উর্বশীকে কোথায় বসাই? চেয়ারের অবস্থাটাও সঙ্গিন, কোনোক্রমে জোড়া দিয়ে রাখা হয়েছে।

উর্বশী আমাকে বিব্রত না-করে নিজেই তক্তপোশের ওপর বসে পড়লেন। এবার আমি জননী শকুন্তলার সঙ্গে উর্বশীর তুলনা করবার সুযোগ পেলাম। উর্বশী যদি নিজে না বলতেন যে শকুন্তলা চাওলা তাঁর মা, তাহলে বিশ্বাস করাই শক্ত হতো। কারণ কন্যার তুলনায় জননী যে অনেক সতেজ এবং তাজা রয়েছেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শকুন্তলার তুলনায় উর্বশীর গায়ের রং অনেক কালো। শকুন্তলার সযত্নরক্ষিত ত্বকের মসৃণতাও উর্বশী জন্মসূত্রে লাভ করেননি। উর্বশী মায়ের তুলানায় দৈর্ঘেও একটু ছোট মনে হচ্ছে। উর্বশী অবশ্যই একটু মোটা—মায়ের মতো নিজের দেহের ওজন কঠিন শাসনে বন্দী রাখতে পারেননি।

সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বস্ত কেউ না বললে বিশ্বাস করাই মুসকিল যে আমার সামনে বসা উর্বশী গতরাত্রে আমার পরিচিতা সুদর্শনা শকুন্তলা চাওলার গর্ভজাত কন্যা। সুরক্ষিত যৌবনা কোনো কোনো মাতাকে তাঁদের আত্মজার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীরূপে তুলনীয় হতে শুনেছি। এই আলোচনায় জননীর কন্যাদেরও সকৌতুকে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। একজন মুখরা কন্যা জননীর জ্যেষ্ঠাভগ্নীভ্রম সম্পর্কে বলেছিল, "এতে আর আশ্চর্য কী? মায়ের সঙ্গে মেয়ের বয়সের তফাৎ এদেশে মাত্র ষোলো বছর হতে পারে। ষোলো বছর এমন কী বেশী বয়স? দুই বোনের মধ্যেও এর থেকে বেশী বয়সের পার্থক্য থাকতে পারে।"

এক্ষেত্রে যা আমাকে অবাক করছে, জননী ও কন্যার মধ্যে উর্বশীকেই জ্যেষ্ঠা সহোদরা হিসেবে ভুল করবার সম্ভাবনা বেশী।

শ্যামাঙ্গিনী উর্বশীর চোখ দুটির বয়স কিন্তু বেশী নয়। কন্যার ওই হরিণ নয়নের কাছে অনন্তযৌবনা জননী অবশ্যই পরাভব স্বীকার করেছেন। শকুন্তলা চাওলার চাহনি থেকে এমন কোনো অদৃশ্য রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় যা অবশ্যই অস্বস্তি উৎপাদন করে। কিন্তু উর্বশীর চাহনি অনেক শান্ত ও স্নিগ্ধ, ওখানে কোনো অস্বস্তিকর গ্লেয়ার নেই।

উর্বশীর হাতে একটা সুদৃশ্য উপহারের মোড়ক। উর্বশী এখন কী বলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন তা আমি কিছুটা আন্দাজ করছি।

উর্বশী এবার মুখ খুললেন। "এতোদিন এখানে এসেছেন। অথচ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, মা দুঃখ করছিলেন।"

"তেমন বেশীদিন আর এসেছি কই?" আমি সৌজন্য রক্ষা করে উত্তর দিলাম।

উর্বশী হাসলেন না। মায়ের মতো সুমধুরভাষিণী তিনি অবশ্যই নন! উর্বশী মনে-মনে উত্তরটা ভেঁজে নিয়ে বললেন, "কাছাকাছি থেকে কেউ অবজ্ঞা করলে আমার মা ভীষণ রেগে যান। মার ধারণা হয়ে যায়, তাঁকে বুঝি ইচ্ছে করেই অপমান করা হচ্ছে।"

এর উত্তর দেওয়া যেতো আপনার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনো বিজনেস আমার নেই। কিন্তু এসব কথা মুখের ওপর বলা মানেই বিপদ বাড়ানো।

আমি বললাম, "আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার মায়ের সঙ্গেই মুখোমুখি ঝগড়া করে নেওয়া যাবেখন।"

"তা হলে নিশ্চয় হেরে যাবেন আপনি। কারণ আমার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে পৃথিবীতে কেউ কখনও জিততে পারেনি! উনি হচ্ছেন চ্যাম্পিয়ন উইনার!"

একটু হেসে উর্বশী বললেন, "এবার কাজগুলো সেরে ফেলা যাক।"

উর্বশী কাপুরের হাতের প্যাকেট থেকে এবার একটি সুদৃশ্য শার্টের কাপড় বেরিয়ে এলো, দেখলেই বোঝা যায় কাপড়টা বিদেশে তৈরি।

উর্বশী বললেন, "দেখুন কেমন লাগে?" সেই সঙ্গে বুকের কাছে ব্লাউজের ভিতর থেকে একটা দর্জির টেপও বেরিয়ে এলো।

"মায়ের হুকুম, আপনার মাপটা আমাকেই নিতে হবে। আমার মা বিলেত ফেরত কাটারের কাছে আমাকে টেলারিং শিখিয়েছেন।"

মাপের ফিতেটা এতোক্ষণে উর্বশীর গলায় মালার মতো শোভা পাচ্ছে। উর্বশী বললেন, "কাপড়ের রংটা মা নিজে সিলেকশন করেছেন। এই রংয়ের শার্ট আপনাকে যা দেখাবে না!"

এ এক অদ্ভুত বিপদে পড়া গেলো!

উর্বশী বললেন, "বোঝা যাচ্ছে, আমার মা আপনাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছেন। উনি যাকে পছন্দ করেন তাকে শুধু শার্টের কাপড় উপহার দিয়েই স্বস্তি পান না, মাপজোক যোগাড় করে শার্ট তৈরির ব্যবস্থাও করে দেন।"

আমি বেশ শঙ্কিত বোধ করছি। নিজের ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অপরিচিতা উর্বশী চাপা গলায় বলছেন, "কাম্ অন। আপনার মেজারমেণ্ট নিয়ে নিই।"

এ-অবস্থায় কী বলা যায়? দেবী সরস্বতী, এই মুহূর্তে আপনি আমার সহায় হয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

আমার মনে হলো আর এক মুহূর্ত দেরি করলে উর্বশী কাপুর আমার দিকে এগিয়ে এসে নিজের গলার টেপটি আমার গলায় চাপিয়ে দেবেন!

অকস্মাৎ মনে পড়ে গেলো আজ শনিবার। সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে পিছিয়ে গেলাম। সভয়ে বললাম, "আমার মা জানতে পারলে কান্নাকাটি করবেন। খুব কষ্ট পাবেন। প্লিজ!"

উর্বশী অবাক হয়ে গেলেন। মাপ নিতে গিয়ে কাউকে এমনভাবে আঁতকে উঠতে তিনি কখনও দেখেননি বোধ হয়।

"কী হলো?" উর্বশী তখনও দর্জির মাপ-জোকের টেপটা ফুলের মালার মতো দুহাতে ধরে আছেন।

আমি বললাম, "শনি আমার ওপর কুপিত। তাই শনিবারে আমার কোনোরকম মাপজোক করা একেবারে বারণ।"

"কেন শনিবারে মাপজোক করলে কী হবে?" উর্বশী আমার সেকেলে গোঁড়ামিতে বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন।

"আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই শনিবারে দর্জির দোকানে যাওয়া, এমন কি দাড়ি কামানোও নিষেধ আমার। আই অ্যাম স্যরি, মিসেস কাপুর।"

শেষের কথাটা বলেই বোধ হয় ভুল করলাম। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু উর্বশী বোধ হয় আড়চোখে দেখতে পেলেন টেবিলের এক-কোণে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আয়নাসহ খোলা পড়ে রয়েছে। একটু আগেই

এগুলি ব্যবহার করেছি, এখনও ধুয়ে মুছে বাক্সবন্দী করা হয়নি।

সেদিকে আড়চোখে তাকালেন উর্বশী। আমার সদ্য-কামানো মুখমণ্ডল খুঁটিয়ে দেখে বোধ হয় সব বুঝতে পারলেন।

এবার পরিস্থিতি কোন বিপজ্জনক দিকে মোড় নেবে ভাবছি। হয়তো উর্বশী আমাকে বেশ কিছু কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কিছুই হলো না।

উর্বশী সব বুঝে, আমাকে ধরেও ধরলেন না। বললেন, "আপনার মায়ের যখন মানা তখন মাপ নেবো না।"

একটুটু থেমে উর্বশী জানতে চাইলেন, "আপনারা একটা পুরনো জামা দেবেন নাকি?"

এবার আমার লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবার অবস্থা। একটা জামা পরে আছি এবং দ্বিতীয়টি এখনও ভিজে অবস্থায় হ্যাঙারে শুকোচ্ছে।

বাধ্য হয়ে জানালাম, জামাটা এখন দেবার অবস্থায় নেই। উর্বশী কাপুর আমার কথা বোধ হয় বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু শাপে বর হলো। তিনি ধরেই নিলেন, আমি এই অযাচিত উপহার গ্রহণ করতে আগ্রহী নই।

সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর মুখে-চোখে পরিবর্তন এলো। আমাকে যেন তিনি এবার একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখতে লাগলেন।

উর্বশী যাবার আগে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি এই কাপড় নিলেন না বলে, আমি কিন্তু মোটেই রাগ করলাম না, মিস্টার শংকর।"

আমি নিজে শকুন্তলা চাওলার কন্যার মুখে এই ধরনের কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

উর্বশী কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "মদনা হয়তো ঘর ভাড়া দেবার জন্যে আপনার ওপর চাপ দেবে। কিন্তু এ-বিষয়ে আপনি নিজে যা-ভাল বোঝেন করবেন। শুধু জেনে রাখুন, উর্বশী কাপুরের এ-বিষয়ে আপনাকে কিছুই বলবার নেই।"

উর্বশী আমার হিসেবপত্তর সব গোলমাল করে দিচ্ছেন। উর্বশী আরও বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। মাকে আমি বলবো, এই মুহূর্তে আপনি কোনো উপহার নিতে আগ্রহী নন।"

"আপনি কিছু মনে করলেন না তো?" আমি সলজ্জভাবে নিবেদন করি।

উর্বশী উত্তর দিলেন, "মোটেই না। শুধু একটা অনুরোধ, আমার মায়ের কাছে থেকে যেন জিনিসটা নিয়ে বসবেন না।"

উর্বশী আমাকে অবাক করে দিয়ে এবং কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন রেখে বিদায় নিলেন।

মদনা বোধ হয় সিঁড়ির কাছেই অপেক্ষা করছিল। উর্বশী বিদায় নেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার সামনে দাঁড়ালো।

মদনার ধারণা আমার মাপজোক নিয়েই মেমসাহেব খুশীমনে ফিরে গিয়েছেন। মাথা চুলকে মদনা দুঃখ করলো, "আপনি স্যার একেবারে ভাল মানুষ। একখানা শার্টে রাজী হয়ে গেলেন। পুলিসের মিত্তিরবাবু ছ'খানা শার্ট করিয়ে নিয়েছেন। সব ফরেন। আপনি একটা-দুটো সুট করিয়ে নিলে

পারতেন। আম্‌রিকান কাপড়ের স্যুট! আপনাকে যা দেখাবে না!"

"আঃ, মদন!" আমি বকুনি লাগালাম।

মদন বললো, "কত জাপানী, জার্মানী, আম্‌রিকান ব্রিটিশ কাপড় রয়েছে ওঁদের কাছে। মিত্তিরবাবুর সাহেবদেরও স্যুট হচ্ছে ওখানে। বড় বড় সাহেব তো, শুধু কাপড় দিলে নেবে না—একেবারে তৈরি করিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে। ওঁরা শুধু দয়া করে পরবেন।"

কাপড়ের রহস্য মদনা নিজেই ফাঁস করে দিলো। "ওসব কাপড় নিতে একটুও মনোকষ্ট পাবেন না, স্যর। মিসেস চাওলা গাঁটের কড়ি খরচ করে কাপড় কিনছেন ভাববেন না। খিদিরপুর থেকে জাহাজী সাহেবেরা রাত্রে মদ খেতে এই সিলভার ড্রাগনে আসছে। কাঁচা টাকার বদলে গোরা সাহেবেরা এই জিনিসপত্তর নিয়ে আসে ; চাওলা মেমসাহেবের জামাই এসব মাল, ঘড়ি, ট্রানজিসটর, হুইস্কির বোতল, সিগ্রেটের বক্‌স, সাবান, সেণ্ট মাতাল সাহেবদের কাছ থেকে জলের দামে বাগিয়ে নেন ; তারপর শাশুড়ী ঠাকরুন ওইসব জিনিস সোনার দামে নিউ মার্কেটে বেচে দেন।"

মদনা বললো, "এসব জিনিসের খুব চাহিদা, স্যর। কলকাতার বড়-লোকেরা এই সব জেনুইন ফরেন মাল দশ গুণ দামে কেনবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে, স্যর।"

মদনা এবার মাথা চুলকোতে লাগলো। বুঝলাম, আরও কিছু বলবার জন্যে সে সাহস সঞ্চয় করছে। এবার সে বলেই ফেললো, "বউদি থাকলে, স্যার, একটা জিনিস আপনাকে এনে দিতাম। বউদির কাছে আপনার খুব নাম হয়ে যেতো, স্যর। মলমের সেণ্ট! ওরা বলে সেচেট। এই সেণ্টের লোভে কত বড় বড় সায়েব এসে চাওলা মেমসায়েবের সঙ্গে ভাব করেন।"

মদনা বললো, "ছেলেদের জন্যেও স্পেশাল সেণ্ট আছে, স্যর। আমি জানতাম না। যদি দরকার থাকে বলবেন। বেটা রামসিংহাসন একটা গুছিয়েছে কাপুর সায়েবের কাছ থেকে। দারোয়ানজীর ওই তো ছিরি! ওতে আবার গন্ধ ঢাললে কী হবে বলুন তো?"

হাতের গোড়ায় মদনাকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মিসেস চাওলার সংসারে আর কে কে আছে?"

মদনা জানালো, "চোখের সামনে ওই মেয়ে ছাড়া তো আর কিছুই দেখতে পাই না। শুনেছি, মেমসায়েবের এক ছেলেও আছে। কিন্তু কখনও তো দেখিনি। ওই জামাই সব। স্বয়ং চাওলা সায়েব পর্যন্ত জামাইয়ের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। আর মেয়ে......।" মাঝপথেই মদনার কথা থেমে গেলো।

একটু পরে মদনার মুখ আবার খুললো "কেউ কেউ বলে নিজের পেটের মেয়ে নয়। অমন চেহারার মায়ের কী অমন মেয়ে হয় স্যর? অঙ্ক মিলছে না বলেই, কেউ কেউ বলে বেড়ায়, নিজের মেয়ে নয়, সৎ মেয়ে। কিন্তু স্যর, আমি বিশ্বাস করি না। নিজের মেয়েকে না ভালবাসলে জামাইকে অত ভালবাসা যায়? এই যে এতো বড়ো ব্যবসা হয়েছে, সমস্ত কলকাতায় এতো যে সিলভার ড্রাগনের নাম-ডাক এসব তো ওই চাওলা মেমসায়েব এবং জামায়ের চেষ্টায়। শ্বশুর স্যর কিছু করে না। চুপচাপ দোকানে বসে থাকে, তেমন দরকার হলে জামাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমাকে পাঠাবে সিগ্রেট কিনে আনতে।"

ফিকফিক করে হাসলো মদনা। বললো, "জামাই খায় লাকি-স্ট্রাইক।

আমেরিমান সিগ্রেট—ভীষণ কড়া, একখানা খেলে গাঁজাড়ুর মাথাধরা সেরে যাবে। আর শ্বশুর আমাকে পাঠান পাসিংশো কিনতে, যার থেকে সস্তা সিগ্রেট হয় না—এ পাড়ার রিকশাওয়ালারা ওর থেকে দামী সিগ্রেট টানে।"

মিস্টার চাওলার ওপর মদনার কোনো শ্রদ্ধা নেই। বললো, "সস্তা দরের সিগ্রেট খেলে গায়ে সস্তা-সস্তা গন্ধ ছাড়ে। সাধে কী আর মেমসায়েব চাওলা সায়েবের শোবার ঘর আলাদা করে দিয়েছে। যেমন জামা-কাপড়, তেমন আগাছার মতো দাড়ি, তেমনি সস্তার নেশা, চাওলা মেমসায়েবের মতো অমন টপ্‌স মেমসায়েব ওসব সহ্য করবেন কী করে স্যর?"

মদনা এবার পুরনো কথায় ফিরে এলো। "ঘরের একটা ব্যবস্থা করে দিন, স্যর। মিসেস চাওলার মতো মানুষ আপনার ওপর সন্তুষ্ট থাকলে, সময়ে-অসময়ে আপনার খুব কাজে লেগে যাবে, স্যর।"

ঘরের ব্যাপারে অনেকেরই নজর পড়ছে মনে হলো। এ-ব্যাপারে আর সময় নষ্ট করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। যথা শীঘ্র সম্ভব বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাত করা প্রয়োজন। তাঁর নির্দেশ মতো খালি হয়ে-যাওয়া ফ্ল্যাটগুলোর একটা গতি করা যাবে। এ-অঞ্চলে বাড়ি-ঘরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সুতরাং নতুন ফ্ল্যাটগুলো কী ভাবে ভাড়া দেওয়া হবে, সে-বিষয়ে চিন্তা প্রয়োজন।

বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে ইচ্ছে করলেই সাক্ষাত করা যায় না। রাম-সিংহাসনের হাতে তাই চিঠি পাঠিয়েছি, যদি সময় মতো আমার সঙ্গে তিনি, কিংবা বিপুলভূষণ বারিক মহাশয় কিছু আলাপ আলোচনা করেন।

রামসিংহাসনের মাধ্যমে চিঠির উত্তর আসার আগেই, অাপিস ঘরে জরুরী টেলিফোন এসে গেলো, "হ্যালো! মিস্টার শংকর? চিনতে পারছেন?"

এই নারীকণ্ঠের মালিক একজনই হতে পারেন। মুখ খুলবার আগেই তিনি আক্রমণ শুরু করলেন, "আমাকে চিনতে পারবেন কেন মিঃ শংকর, আমি তো সুলেখা নই। শকুন্তলা চাওলাও নই আমি।"

ফোনের ওপারে যে মিসেস পপি বিশোয়াস রয়েছেন তা এবার স্পষ্ট বোঝা গেলো।

"হ্যালো, হ্যালো", পপি বিশোয়াসের অস্থির কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেলো।

ইতিমধ্যে তৃতীয় এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর লাইনের মধ্যে এসে পড়ছে। ক্রশ কানেকশনের আশীর্বাদে ব্যাপারটা কলকাতা শহরে মোটেই অভিনব নয়। কিন্তু পপি বিশোয়াস অত সহজে লাইন ছাড়বার পাত্রী নন। "হ্যালো, হ্যালো—প্লিজ লাইন ছেড়ে দিন। একজন মহিলা লাইনে কথা বলছেন, তার মধ্যে এই ভাবে ঢুকে পড়ে ডিসটার্ব করবেন না। প্লিজ।"

তৃতীয় ব্যক্তির লাইন ছাড়ার কোনো অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পপি বিশোয়াস এবার অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, "আমার বাড়িতে এখন খুউব অসুখ, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি...হ্যালো, হ্যালো ডক্টর শংকর আপনি দয়া করে লাইন ছাড়বেন না...হ্যালো, হ্যালো মিস্টার। প্লিজ, বিপদ-আপদের সময়ে আপনারা এইভাবে জ্বালাতন করবেন না। হ্যালো, আপনাদের কী মা বোন নেই? টেলিফোন কানে করেই আপনাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা জন্মায় বুঝি?"

এবার মন্ত্রবৎ কাজ হলো। তৃতীয়পক্ষ হিন্দীতে দু'একটি বিস্ময়সূচক শব্দোচ্চারণ করে লাইন থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হলো।

পপি বিশোয়াস এবার নিজের গর্বে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। "হ্যালো, হ্যালো, শংকরবাবু, আপনাকে ডাক্তার বানানো ছাড়া উপায় ছিল না। কিছু মনে করবেন না। হ্যালো, আপনি টেলিফোনের কাছেই আছেন তো? প্লিজ চলে যাবেন না। ক্রশ লাইনে কথা, বলা যাবে না। আপনাকে আমি আবার রিং করছি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার ফোন বেজে উঠলো। "হ্যালো, মিস্টার শংকর, পপি বিশোয়াস বলছি। কী হাঙ্গামা বলুন তো। টেলিফোন থেকেও কিছু সুবিধে হচ্ছে না। নিজের ফোন থেকে তো কিছুই কাজকর্ম করা যায় না। আজকাল বড্ড আড়িপাতার ভয় হয়েছে—পরের ঘরের কথা শোনবার জন্যে যন্ত্র নিয়ে দুষ্টু লোকগুলো আড়ি পেতে বসে আছে! সব কিছু টেপ করে রাখছে, শুনছি। সেই দুঃখে নিজের টেলিফোন ছেড়ে এই ওয়াই-ডবলু-সি-এর পাবলিক ফোন থেকে ফোন করতে এসেছি। তাও দুর্ভোগ। সঙ্গে অনেকগুলো খুচরো দশ পয়সা ছিল তাই রক্ষে, না হলে কী হতো বলুন তো।" পপি বিশোয়াসের কথা শেষ হতে চায় না।

"হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার শংকর? উত্তর দিচ্ছেন না কেন? সামনে কেউ বসে আছে নাকি?" আবার কামড় দিলেন পপি বিশোয়াস।

"সামনে কেউ নেই। আমি তো আপনার কথা শুনেই যাচ্ছি।" মিসেস বিশ্বাসকে আশ্বস্ত না-করে আমার মুক্তি নেই।

"হ্যালো, মিস্টার শংকর, আমার খুব দুঃখ হয়েছে। অভিমান হয়েছে। ভেবেছিলুম একদম আড়ি করে দেবো। আপনার সঙ্গে কথা বলবো না।"

হঠাৎ টেলিফোনে যান্ত্রিক গোলযোগ শুরু হলো। পপি বিশোয়াস মোটেই দমবার পাত্রী নন। তিনি শুরু করলেন, "হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার শংকর, জানেন তো, একবার আড়ি করে দিলে আমি কিছুতেই আর ভাব করি না। আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডকে অথবা আমার মাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।"

"না প্লিজ, আমার সঙ্গে আড়ি করবেন না, মিসেস বিশ্বাস। নতুন ব্যাপারটা কী?" আমি বিনাশর্তে শান্তি স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠি। কুপিতা হলে এই ধরনের মহিলারা টেলিফোনেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারেন।

পপি বিশোয়াস এবার অভিমান ভরা কণ্ঠে অভিযোগ করলেন, "এসব কী শুনছি; মিস্টার শংকর? পরের মুখে ঝাল খেয়েই এসব খবর আমাদের যোগাড় করতে হবে?"

আতঙ্কিত আমি জানতে চাই, "কী শুনলেন? আমি তো বুঝেই উঠতে পারছি না।"

পপি বিশোয়াস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না, মিস্টার শংকর। আমি তো খুউব বোকা ছিলুম, টেলিফোনে সরল মনে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলেই তো আমার এই অবস্থা।"

"হ্যালো, হ্যালো, টেলিফোনে অন্ততঃ একটু আভাস দিন? আমার সম্বন্ধে কী শুনলেন? আপনারও বা কী হলো বলুন?"

"কিছু বলবো না। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তা মিটছে না। হ্যালো, হ্যালো, আপনি এখন আছেন তো? শকুন্তলা চাওলার ওখানে আপনার আজ আবার নেমন্তন্ন নেই তো?" এই বলতে বলতে প্রবল শব্দ করে অর্ধবিকল টেলিফোনটা হঠাৎ পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গেলো।

টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং পপি বিশোয়াস সশরীরে আবির্ভূতা হলেন।

এ কী চেহারা হয়েছে পপি বিশোয়াসের। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছেন। পপি বিশোয়াসের ত্বক দেখলে আগে ফ্রিজে-জমে-থাকা কেভেণ্টার মাখনের কথা মনে পড়তো। চামড়ার সেই টাইট ভাব এখন একেবারেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

"একি! আপনার অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?"

আমার প্রশ্নে পপি খিল খিল করে হেসে উঠলেন। "উঃ! আপনার মতো বোকা ছেলে দেখিনি। এতোদিন থ্যাকারে ম্যানসনে থেকেও আপনার মন থেকে হাওড়া-কাসুন্দের আইডিয়াগুলো গেলো না। সেই মফস্বলের লোকই রয়ে গেলেন।—অসুখ ছাড়া বুঝি কেউ রোগা হতে পারে না?"

নিজের ব্যাগের মধ্যে ডানহাত পুরে হাতড়াতে হাতড়াতে পপি বিশোয়াস বললেন, "ভগবান আপনাদের পুরুষমানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, মেয়ে হওয়ার দুঃখু তো বুঝবেন না! এই আমার কথা ধরুন না! পুরুষ-মানুষ হলে একটু মোটা হলুম কি না হলুম তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু ক্যাপটেন স্ট্যানলি, ইংলিশ এয়ারলাইনস-এর পাইলট, সেদিন আমার ওখানে এসেই বললেন, ডার্লিং তোমার ওজন বেড়েছে।"

ব্যাগের মধ্যে অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান অব্যাহত রেখে পপি বলে চললেন, "ক্যাপটেন স্ট্যানলির সঙ্গে আমার অনেকদিনের কানেকশন; দুজনের মধ্যে ফার্স্ট নেমের সম্পর্ক। বিল তিন সপ্তাহ অন্তর একবার করে আমাকে দেখে, সুতরাং চেহারা কী পাল্টেছে তা বুঝতে পারে।"

ব্যাগের মধ্যে থেকে হাতটা বার করে নিয়ে পপি বিশোয়াস প্রথমে ক্যাপটেন স্ট্যানলির সংবাদটি পুরোপুরি পরিবেষণ করলেন। কোনোরকম দ্বিধায় সঙ্কুচিতা না হয়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার ওখানে বিশ্রাম করতে-করতে স্ট্যানলি বলে উঠলো, পপি তোমাকে কিন্তু এবার বেশ হেভি লাগছে।"

"আমার মুখ জানেন তো। সায়েব অথবা গেস্ট বলে চুপচাপ ছেড়ে দেবার পাত্রী আমি মোটেই নই। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যানলিকে শুনিয়ে দিলাম 'ডার্লিং, প্লেনের কার্গো-ট্রাফিক ওজন করে তোমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব জায়গায় তুমি একসেস লাগেজ খুঁজে বেড়াচ্ছো'।"

"বেচারা স্ট্যানলি এরপর সত্যিই দুহাতে আমাকে তুলে ফেললো।

আমি তো ভয়ে যাই। 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও', করতে স্ট্যানলি আমাকে মেঝেতে নামিয়ে দিলো এবং বললে, 'অ্যাটলিস্ট সিকসটি সিক্স কেজি।'

"আমি তো তখনও বিছানায় পড়ে হাঁপাচ্ছি! খুব বকলাম সায়বকে। তোমরা খুব নিচু হয়ে যাচ্ছো। মানষুকেও ওজন দরে যাচাই করতে চাও।"

আমি পপি বিশোয়াসের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি।

পপি বিশোয়াস শান্তভাবে, আমার বিস্ময়ে মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চললেন, "ছুটলাম সঙ্গে সঙ্গে ওজন নিতে। আপনি বিশ্বাস করবেন না। এই দেখুন আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে," এই বলে দম্ভথলিকা থেকে একখানা ওজনের টিকিট বার করে ফেললেন। "কাঁটায় কাঁটায় মিলে গিয়েছে স্ট্যানলি যা বলেছে। ছেষট্টি কিলো।"

"বাধ্য হয়ে 'বিউটি-বাথ'এর মিসেস শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলো। ওঁদের ওজন কমাবার ক্র্যাশ-প্রোগ্রামে তিনশ পঞ্চান্ন টাকা ষাট পয়সা চার্জ করলেন।"

পপি বিশোয়াস দাম কমাবার চেষ্টা করেছিলেন। বললেন, "দেড়শ টাকার ওপর কেজি পড়ে গেলো—মাত্র দু কেজি ওজন কমিয়েছি। মাংসের দাম এতো বেশী হলে কি আমাদের পোষায়? ওসব বিজনেসম্যানদের মোটা-মোটা বউদের পক্ষে ভাল। মিসেস শর্মাকে সেকথা বললাম। কিন্তু একেবারে চামার। বড় বড় লোকের মেয়েমানুষের চর্বি গলিয়ে গলিয়ে মনটা পাথর হয়ে গিয়েছে। ওয়ার্কিং উয়োম্যানদের জন্যে কোনোরকম দয়ামায়া অবশিষ্ট নেই।"

মাত্র দু কেজি। অথচ পপি বিশোয়াসকে দেখে মনে হচ্ছে তার ওজন অনেক কমে গিয়েছে।

পপি বিশোয়াস বললেন, "একটু চা আনান ভাই। দুঃখের কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।"

চা এসে গেলো। পপি বিশোয়াস বললেন, "আজ কিন্তু অনেক আশা নিয়ে এসেছি, মিস্টার শংকর। সবাই আমাকে জলে ফেলবার চেষ্টা করছেঃ এই সময় আপনি কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নেবেন না, ভাই।"

চায়ের কাপে চুমুক দেবার আগে ব্যাগ থেকে একটা মাথা ধরার বড়ি বার করে স্পেশাল কায়দায় গিলে ফেললেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "মাথাখানাই আজ ছেষট্টি কেজির মতো ভারি হয়ে আছে। নেহাত আপনার সঙ্গে দেখা না করলেই নয়, তাই বেরিয়ে এলাম। আমার রাধাকে বলে এসেছি, সমস্ত এনগেজমেণ্ট ক্যানসেলড। টেলিফোন এলেই কোনো উত্তর না দিয়ে নামিয়ে রাখতে।"।

পপি বিশোয়াস এবার আমাকে আরও অবাক করে দিলেন। বললেন, "আপনার কোনো বেয়ারা আছে নাকি?"

বেয়ারাকে সিগারেট আনবার জন্যে পয়সা দিলেন পপি বিশোয়াস। কিন্তু যে-সিগারেটের নাম করলেন তা এখানকার তৈরি। ডানহিল ইণ্টার-ন্যাশনাল ছাড়া আর কিছুই যাঁর সহ্য হতো না, তাঁর এ কি দশা?

পপি বিশোয়াস এবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "দুর্বিপাকে পড়লে মানুষের সব সহ্য হয়ে যায়; আমি এই সিগারেলা মুখ বুজে খেয়ে যাচ্ছি।"

পপি বিশোয়াস এবার ব্যাখ্যা করলেন, "জানেনই তো ডানহিল ছাড়া

আর কিছুই আমার সহ্য হতো না। কিন্তু যে দিতো সেই স্ট্যানলিরই দেখা নেই। এরোপ্লেন লাইনে আমার বিজনেসটা কী ভালই ছিল! কিন্তু সে কি আর ফিরে পাবো? মনকে এখন থেকে তৈরি করছি। এই দিশী সিগারেলা অভ্যেস করে নিচ্ছি। চুরুটের ছোট বোন এই সিগারেলা—একটু গোলাপের গন্ধও পাবেন।"

সিগারেলার গোলাপগন্ধী ধোঁয়া ছাড়লেন পপি বিশোয়াস। মুখে পরিতৃপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া গেলো না। গম্ভীর মুখে পপি বিশোয়াস বললেন, "উপায় কী বলুন? আমার ফরেন এয়ার লাইনের গেস্টরা যে এভাবে উধাও হয়ে থাকবেন, তা কখনও ভেবেছিলুম কী?"

কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে আন্দাজ করছি। পপি বিশোয়াস দার্শনিকের নিরাসক্ত ভঙ্গীতে পুনর্বার ধোঁয়া স্প্রে করে বললেন, "ওদেরই বা দোষ দিই কী করে? যা কান্ড হয়ে গেলো! হয়তো আমার ওই বুটিকে জাহাজ কোম্পানীর সায়েবদের আর দেখাই যাবে না। ওদের নিজেদের মধ্যে যে খুব জানাশোনা! খুব পার্সোনাল কথাবার্তাও মুখ থেকে কানে, কান থেকে মুখে ওয়ার্লডের সমস্ত এয়ারপোর্টে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।"

আমি এবার পপি বিশোয়াসের সংশোধিত সংক্ষেপিত অনুদেহের দিকে ভালভাবে তাকালাম। পপি যে শাড়ি ছেড়ে আজ ফুল প্যান্ট পরেছেন তা বলা হয়নি। প্যান্টের ওপর একটা লাল নাইলনের টাইট গেঞ্জি।

গেঞ্জির দিকে আমার নজর পড়েছে দেখে পপি বিশোয়াস বললেন, "কী রেড বলুন তো?"

রেড বলতে আমি রেডই বুঝি। পপি বিশোয়াস বকুনি লাগালেন, "দুশো রকমের রেড হয়। একটা রেডের সঙ্গে আর একটা রেডের আকাশ-পাতাল তফাত। এই রেডের নাম হলো এনচ্যানটিং গ্লোরিয়া রেড।"

পপি জানতে চাইলেন, এই গ্লোরিয়া রেডে তাঁকে কেমন মানিয়েছে?

প্রশংসা করতেই হলো। কিন্তু পপি বিশোয়াসকে ফাঁকি দেওয়া গেলো না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "বুঝেছি! লাল আপনার ফেভারিট নয়। স্ট্যানলি ড্রেসটা ফরেন থেকে এনে দিয়েছে। না-হলে শাড়ি ছেড়ে নিজের পয়সায় এই সব কোটপ্যান্ট পরতে আমার বয়ে গেছে।"

রংয়ের কথা ফুরোতেই চায় না। পপি বিশোয়াস আমাকে জানালেন, "অনেকে আবার আপনার মতো লাল রঙ স্ট্যান্ড করতেই পারে না।"

কোনো রং সম্বন্ধে আমার বিশেষ বিরক্তি নেই। কিন্তু আমার প্রতিবাদে কান না দিয়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "কী মুশকিলই যে হয় না এক এক সময়। ফ্লাইং নেভিগেটর মিস্টার জনসন, ওঁকে রিসিভ করবার জন্যে লাস্ট মান্থে এই ড্রেস পরেছিলাম। বিশ্বাস করবেন না, দশ মিনিটের মধ্যে ওর শরীর খারাপ করতে লাগলো। বললেন, এই রেড খুব কাছ থেকে দেখলে ভীষণ মাথা ধরে, শরীরের ভিতরটা আনচান করে, কোনোরকম রিল্যাক-সেশন হয় না। বাধ্য হয়ে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে এই গেঞ্জি পাল্টে টারকুইজ ব্লু স্পোর্ট পরতে হলো।"

আমি কোনো মন্তব্যই করিনি। তবু পপি বিশোয়াস ব্যাখ্যা করলেন, "আপনি হয়তো বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে জামা চেঞ্জ করে অত আদিখ্যোতা না দেখালেই হতো! কিন্তু আমাকে বুটিক চালাতে হয়, সব দিক দেখে, বুঝে

সুঝে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া মায়া তো হয়! হাজার হোক রিল্যাকসেশনের জন্যে এসে কারুর মাথা ধরুক এটা কেউ চায় না।"

পপি বিশোয়াস ইতিমধ্যে সিগারেট শেষ করে ফেলেছেন। বললেন, "উঃ, এতোক্ষণে যেন সারিডনের বড়িটা কাজ করছে। মাথাটা এবার যেন নিজের মাথা বলে মনে হচ্ছে। এতোক্ষণ মনে হচ্ছিল দুনিয়া সুদ্ধ বেওয়ারিশ লোকের বিকল মাথাগুলো আমার ঘাড়ে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে।"

পপি এবার পকেট থেকে লজেন্সের মতো ওষুধ বার করে চুষতে চুষতে বললেন, "শরীরের যা অবস্থা, মিস্টার শংকর, খুব দরকার না হলে আজ আপনার কাছে আসতাম না। আমাকে হেল্প করতেই হবে। খুব বিপদে পড়ে এসেছি।"

"কী হলো মিসেস বিশোয়াস?" মানুষ হিসেবে যে যেরকমই হোক এই পৃথিবীতে কেউ বিপদে পড়ুক তা আমি চাই না।

পপি বিশোয়াস উত্তর দিলেন, "ছেলেমানুষের মতো ওসব কথা বলে তো লাভ নেই। মানুষ বিপদে আপদে পড়বেই, এবং তাদের ওপর আপনার যদি মায়া-দয়া থাকে, তাহলে আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।"

পপি বিশোয়াস এবার খুব নম্র হয়ে গেলেন। বললেন, "মিস্টার শংকর, আমার ওই বুটিক, আমার ওই মেজানাইন এয়ারকণ্ডিশন কনফারেন্স রুম আমার ওই সায়েবপাড়ার ফ্ল্যাট আমি সব ছেড়ে দেবো। বুটিকের ব্যবসায়ে আমার ঘেন্না হয়ে গিয়েছে। আর আপনি যদি আমাকে হেল্প করেন...."
হঠাৎ ছোট্ট একটি হাই তুললেন পপি বিশোয়াস।

তিনবার টুসকি মারলেন পপি বিশোয়াস। বললেন, "স্কিউজ মি! আমি কী রকম টায়ার্ড বুঝতেই পারছেন। হঠাৎ এইভাবে হাই তোলা খুব ব্যাড ম্যানারস। আপনি নেহাত ঘরের লোক তাই। অন্য লোক হলে আমার সম্বন্ধে কী ভাবতো বলুন তো?"

একবার চোখ বন্ধ করলেন পপি বিশোয়াস। তারপর শুরু করলেন, "যা বলছিলাম। আপনি যদি আমাকে একটু হেল্প করেন, তা হলে আমি নাকে-কানে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করবো যে, কোনো জানাশোনা মেয়েমানুষকে আমি জীবনে হেল্প করবো না।"

নিজে হেল্প চাইবেন অথচ কাউকে হেল্প করবেন না, এ কেমন কথা? পপি বিশোয়াস কি ভুল বকতে আরম্ভ করলেন!

পপি বিশোয়াস মুখ তুললেন। "পুরুষ মানুষ? সে আলাদা কথা। একশবার হেল্প করবো। সে আমার সুইট উইল। কিন্তু জানা-শোনা মেয়েমানুষ—বিশেষ করে কপালচেরা মেয়েমানুষ"—কপালচেরা বলতে মিসেস বিশোয়াস যে বিবাহিতা মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করছেন তা বোঝা যাচ্ছে।

"কিছুতেই নয়। আমার অনেক শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।" মিসেস পপি বিশোয়াস বেশ জোরের সঙ্গে তাঁর সঙ্কল্পের কথা আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা যে জটিল তা কিছুটা মিসেস পপি বিশোয়াসের ভাবভঙ্গী দেখে এবার আমি আন্দাজ করতে পারছি।

পপি দুঃখ করলেন, "আমার বুটিক, আমার ফরেন পার্টি এ সব নিয়ে আমি খুব সুখে শান্তিতে ছিলাম। আমার কোনো দুঃখু ছিল না। আমাকে দেখে আমার লাইনের দু' একজনের বুক টাটাতো।

"তা বুকে ব্যথা হবার কথাই। আমি ভদ্রপাড়ায় ঠান্ডাঘরে হাতে-সিলেকশন করা পার্টিদের নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমি কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমার ওখানে হই-হুল্লোড় নেই, বেলেল্লাপনা নেই। যদি ভিজিটর বুক রাখবার রেওয়াজ থাকতো তা হলে দেখতেন অতিথিরা সবাই পঞ্চমুখে প্রশংসা করে পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন পাঁপ বিশোয়াস। তারপর মৃদু বকুনি লাগালেন, "চোখ বড় বড় করছেন কী? আমি নিজের কানে শুনেছি, টোকিওতে একবারে টপ-ক্লাস মেয়েরা ভিজিটর বুক মেনটেন করে অতিথিরা খুশী হয়ে কাজ দ্বিধা না করে তাঁদের মতামত লিখে দিয়ে যান।"

আমার কান গরম হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঁপ বিশোয়াস তাঁর এই ব্যবসায়িক জীবনটা কত সহজভাবে গ্রহণ করেছেন।

পাঁপ বললেন, "ভিজিটরস বুকের কথা ছেড়ে দিন—আমাদের এই পোড়া দেশে ওসব কথা ভাবলেও পাপ। তবে, আমি যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটা চালাচ্ছিলাম, তাতে অনেকের হিংসা হয়েছে। আমি নাকি স্রেফ কষ্টির জোরে আর মেমসায়েবী ইংরিজীর স্টাইলে আসর জাঁকিয়ে বসে আছি।"

"তা আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ডাক্তারী, ওকালতি, ছবি আঁকা, গান গাওয়া কোন লাইনে খেয়োখেয়ি নেই? কোন্ লাইনে সাকশেসফুল লোকের পিছনে হিংসুটে লোকেরা বদনাম রটিয়ে বেড়ায় না? আমি, বিশ্বাস করুন, ওসব নিয়ে একটুও চিন্তা করিনি। কারও পাকা ধানে মইও দিইনি। আমার সময় কোথায়?"

পাঁপ বিশোয়াস জানালেন, "কিছু-না কিছু-না করে আমার এক্সপোর্টের লাইনটাও গরম হয়ে উঠছিল। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল, এই হাতে তৈরী ব্যাগ এবং হাতে-ছাপা কাপড়ের লাইনটা নিয়েই মেতে থাকি। ওদের দেখিয়ে দিই পাঁপ বিশোয়াস যা ছোঁয় তাই সোনা হয়ে যায়।"

স্বর্ণতত্ত্বে এসেই পাঁপ বিশোয়াসের কণ্ঠ করুণ হয়ে উঠলো। বুঝলাম, এবার তিনি নিজের বিপদের কথা বলতে আরম্ভ করবেন।

পাঁপ বিশোয়াস জিজ্ঞেস করলেন, "তুহিনা তালুকদার। চেনেন নাকি, হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ কিছুদিন আপনাদের কুইন ভিকটোরিয়ার ফ্ল্যাটে পি জি ছিল। তারপর মিসেস সামতানি ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়ায় হাজবেন্ডকে নিয়ে ভাবনানি ম্যানসনে ফ্ল্যাট কিনলো।"

"ভাবনানি ম্যানসনে ফ্ল্যাট বিক্রি হয় নাকি? শুনিনি তো। ওই ম্যানসনের মালিক তো মস্ত বড়লোক, কোন্ দুঃখে তিনি আলাদা-আলাদা ফ্ল্যাট বেচতে যাবেন?"

"রাখুন, মিস্টার শংকর। বাড়িওয়ালা কেন ফ্ল্যাট বেচতে যাবে? বেচছে দারোয়ান! তাও ঠিক কেনা-বেচা নয়, তবে অ্যাজ গুড অ্যাজ ওনারশিপ ফ্ল্যাট। বার-চোদ্দ হাজার টাকা ক্যাশ দারোয়ানকে দিয়ে খুব সস্তা ভাড়ায় ফ্ল্যাট নিয়ে নাও। তুহিনাদের ফ্ল্যাটের ভাড়া শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না—ভাবনানি ম্যানসনের মতো জায়গায় মাসে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা। আর তোমার লোকসানও নেই, পরে দারোয়ানকে কিছু শেয়ার দিয়ে তুমি ফ্ল্যাট অন্য কাউকে বেচে দিতে পারো।"

এই তুহিনার বর কাজ করে বড় আপিসে। প্রেম করে বিয়ে। তুহিনা

নিজেও খুব ভাল জায়গায় কাজ করে। দিল্লীতে ওদের হেডঅফিস। এক্সপোর্ট-ফেক্সপোর্ট ব্যাপারে তুহিনা অনেক কিছু জানে। তুহিনা বলেছিল, "পপিদি, কী এতো খেটে মরছো। দিল্লীতে কিছুদিন থেকে ঘাঁতঘোত সব জেনে এসো।"

পপি বিশোয়াস বলেছিলেন, "দিল্লীতে থাকলেই কি আর ঘাঁতঘোঁত জানা যায়। পথ দেখাবার গাইডের প্রয়োজন।"

তুহিনা তালুকদার বলেছিল, "পপিদি, বিশ্বাস করবে না। অন্যের টাকা, অন্যের কারখানা, অন্যের পরিশ্রম, অন্যের রিস্ক। তোমার শুধু লেটারহেড এবং কলম। আমাদের কোম্পানির মিস্টার চোপরা বলছিলেন, তাতেই হাজার হাজার টাকা ইনকাম। খেটে খাবার কোনো মানে হয় না। আমি তো লুকিয়ে লুকিয়ে মিস্টার চোপরার ভরসায় দু'একবার বল খেলেছি। মোটেই লোকসান হয়নি।"

তুহিনা তালুকদারের এইসব কথায় পপি বিশোয়াস একটু দুর্বলতা বোধ করেছিলেন। এবং তুহিনাও মিস্টার চোপরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। বলেছে, "ফাইন লোক। আপনার কথাও বলেছি। আপনাকেও গ্ল্যাডলি হেল্প করবেন। কলকাতা সম্বন্ধে ওঁর একটু দুর্বলতা আছে। ছোটবেলায় ভবানীপুরের এক গলিতে কিছুদিন ছিলেন, সেই সময় বাঙালী এক ইস্কুল গার্লের সঙ্গে কীসব একটু আধটু ইয়ে-টিয়ে হয়েছিল। কিন্তু, বাস। ওই পর্যন্ত। দ্যাট ফার অ্যান্ড নো ফার্দার। উনিও তারপর দিল্লীতে চলে গিয়েছিলেন।"

পপি বিশোয়াস এবার মিস্টার চোপরার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেছেন। পপি আমাকে বললেন, "মিস্টার চোপরা কী রকম টাইপের লোক তা আমি আন্দাজ করে নিয়েছি। আমি ইচ্ছে করলেই ওঁকে ডাইরেক্ট হ্যান্ডল করতে পারতাম। সমস্ত খবরাখবর জেনে নিতেও আমার দু'তিন দিনের বেশী লাগতো না।"

একটু থেকে পপি বললেন, "কিন্তু আমি ওয়ার্কিং উয়োম্যান অফ প্রিন্সিপল। তুহিনাকে ডিঙিয়ে ঘাস খাবার নোংরা অভ্যাস পপি বিশোয়াসের নেই। আমি বলেছি—তুহিনা, তুমিই মিস্টার চোপরাকে ম্যানেজ করো। যখন খুশি আমার ওখানে নিয়ে এসো। আমার আপিস থেকে তোমার চিঠি-চাপাটি লেখাও। আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি তোমার স্বার্থ পুরো রেখে আমাকে কিছু হেল্প করতে পারো খুউব ভাল কথা। তবে ভাই তুহিনা, তোমার নিজের স্বার্থ সব চেয়ে আগে। নিজে বাঁচলে তবে তো পপির নাম।"

পপি বিশোয়াস বললেন, "মিস্টার চোপরার সঙ্গে তুহিনা আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। কলকাতায় এলে ওঁরা দু'জনে একসঙ্গে আমার এখানে এসেছেন। তুহিনা ও মিস্টার চোপরা দুজনে ঘুরে ঘুরে আমার বুটিক ও আপিস ঘুরে দেখেছেন।"

"পরে তুহিনা বলেছে, 'পপিদি, চোপরা তো তোমার ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ! বিশেষ করে তোমার এয়ারকন্ডিশন মেজানাইন চেম্বার দেখে! এমন সুন্দর ব্যবস্থা, এমন প্লিজিং ডেকর, এমন কাজের ফার্নিচার নাকি দিল্লী বম্বেতেও খুউব কম আছে।"

"আমার তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল," দুঃখ করলেন পপি।

বিশোয়াস।” “আমার শো-রুম আমার বুটিক। আমার বিজনেসের প্রশংসা না করে চোপরা কেন আমার এয়ারকণ্ডিশন চেম্বারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ? আমি বোকার মতো প্রশংসায় গলে গিয়ে তুহিনাকে বলেছি, 'তোমার বস্-কে বলো, এর নাম হলো 'বিজনেস উইথ প্লেজার'। বিজনেস থেকে প্লেজারকে, অথবা প্লেজার থেকে বিজনেসকে সরিয়ে রাখার যুগ এখন নেই।”

“এরপর আমি তুহিনা তালুকদারকে সরল মনে সেই বিখ্যাত কথাটাও বলেছি। এটমিক এজ-এর পরে আমরা যেখানে পৌঁচচ্ছি তার নাম 'সোফা-কাম-বেড এজ”।

“সেই শুনে তুহিনার কী হাসি! আমি সেই ন্যাকা হাসির অর্থ তখন বুঝিনি।” দুঃখ করলেন পপি বিশোয়াস।

“এর পর বিজনেস সূত্রে চোপরা ও তুহিনা দু'একদিন এসেছে, এখানে সময় কাটিয়ে গিয়েছে। আমি মাথা ঘামাইনি।”

“তারপর, জানেন মিস্টার শংকর” পপি বিশোয়াসের গলা করুণ হয়ে উঠলো।

“তারপর সেই অশুভ শুক্রবার,” পুনরাবৃত্তি করলেন পপি বিশোয়াস।

বেলা এগারোটা নাগাদ চোপরার ক্যালকাটা অফিস থেকে তুহিনা তালুকদারের ফোন পেয়েছিলেন পপি বিশোয়াস। “হ্যালো পপিদি। আমি তুহিনা বলছি। আজ তোমার ওখানে খুব ভিড় নাকি?”

“ভিড়ের জায়গা তো এটা নয় ভাই, তুহিনা.” সগর্বে আশ্বাস দিয়েছিলেন পপি বিশোয়াস।

তুহিনা জিজ্ঞেস করেছিল, “তোমার এয়ারকণ্ডিশন সোফা-কাম-বেড রুম এনগেজড নাকি?”

“দু'খানা কনফারেন্স রুম আছে আমার। চিন্তা কী?” আশ্বাস দিয়েছিলেন পপি বিশোয়াস।

তুহিনা তালুকদার বলেছিল, ঠিক দুটোর সময় সে আসবে। আর্জেন্ট এবং কনফিডেনসিয়াল বিজনেস ডিসকাশন আছে যা আপিসে সম্ভব নয়। গোটা আফটারনুনটা সে রুমখানা চায়।

পপি বিশোয়াস আপত্তি করেননি। কারণ জানাশোনা কোনো মেয়ের বিজনেসে অকারণে কাঁটা দেওয়া পপি বিশোয়াসের স্বভাব নয়। সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে পপি বিশোয়াস টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিলেন।

পপি বিশোয়াস জানালেন, “ঠিক সময়ের একটু আগেই চোপরাকে নিয়ে তুহিনা এসে গিয়েছে। আর্জেন্ট বিজনেস আছে। আমি তখন ওদের সময় নষ্ট করিনি। সোজা ঘর দেখিয়ে দিয়েছি।”

“এরপরে আমারও শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছিল। কিন্তু ঘুমোবার উপায় নেই। তিনটের সময় আমার ফরেন এয়ারলাইনের একজন গেস্ট আসবার কথা। নতুন গেস্টকে নিয়ে আমি দু' নম্বর কনফারেন্স রুমে ঢুকেছি।”

“পনেরো মিনিটও হয়েছে কিনা সন্দেহ, মিস্টার শংকর।” পপি বিশোয়াস এবার হাঁপাতে লাগলেন। “এমন সময় হৈ-হৈ কাণ্ড। কান্নাকাটি চিৎকার, বাঁচাও বাঁচাও আওয়াজ। সেকি কেলেঙ্কারি, আপনাকে বোঝানো যায় না।” হাঁপানোর গতি আরও দ্রুত হলো। পপি বিশোয়াস ফিসফিস করে বললেন, “তুহিনা তালুকদারের স্বামী! কীভাবে খবর পেয়ে বউকে

হাতে-নাতে ধরবার জন্যে সোজা আমার বুটিকে চলে এসেছে। এখানে কীভাবে তুহিনার ঘরে ঢুকে বউ এবং চোপরা দু'জনের গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে।"

"চোপরার সমস্ত বডিতে অ্যাসিড! আর তুহিনার মুখে। যন্ত্রণায় জ্বলছে দু'জনে।"

"সে কি কাণ্ড! তুহিনাকেও বলিহারি যাই। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করেনি। ভিতর থেকে লকিং-এর সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি সেসব ব্যবহার না করো তাহলে লোকে কী বলবে?"

পপি বিশোয়াসের চোখ ছলছল করছে। "সে কি কেলেংকারি। ডাক্তার, পুলিস। ওই এস আই মিত্তির বলে কিনা আমার ঘরের সায়েবকেও থানায় নিয়ে যাবে। সায়েব তো ভয়ে কাঠ। আমি ভরসা দিলাম। কোনো চিন্তা নেই। আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কেউ থানায় নিয়ে যাবে না। পুরো তিন হাজার টাকা মিত্তিরের হাতে গুজে দিয়ে হোটেলের সায়েবকে হোটেলে পাঠাতে পেরেছি।"

"এতো টাকা পেয়েও মিত্তিরের ক্ষিধে মেটেনি। তুহিনার স্বামীটা নিশ্চয় পাগল। কিন্তু পুলিসকে বলেছে, টাকার লোভ দেখিয়ে কাপুর তার আপিসের স্টাফের সঙ্গে ব্যভিচার করছিল। হাতেনাতে ধরে সে ধরে সে নগদ শাস্তি দিয়েছে। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে কাপুর বলেছে, একেবারে বাজে কথা। তিনি বিজনেস ডিসকাশনে এসেছিলেন।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তারপর আর কী। আমার কপাল ভেঙেছে। আমার মেয়েগুলো সব ভয়ে পালিয়েছে। সায়েবরা সেই যে অ্যাবাউট টার্ন করেছেন, আর দেখা নেই। এস-আই মিত্তির আমাকে শেষ করে ফেলেছে। এখানে ওখানে আমার যত টাকা ছিল সব ওর পেটে গিয়েছে। তবে একটা দয়া আমার গায়ে হাত পড়েনি। খুব কায়দা করে, আমাকে কেসের হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! মামলা আবার কোর্টে উঠবে। একমাত্র ভরসা আমাকে সাক্ষী দিতে ডাকবে না। মিত্তির দারোগা লিখে দিয়েছে গোলমালের সময় আমি বুটিকে ছিলাম না। তুহিনা তালুকদার এখনও হাসপাতালে। বাঁচে কিনা সন্দেহ।"

চোখ দুটো আলতোভাবে মুছে পপি বিশোয়াস বললেন, "কে আমার এই সব্বোনাশ করলো কে জানে। কেউ বলছে, চোপরার আপিসের ইউনিয়নের লোকই ওই তুহিনার স্বামীকে খবর দিয়েছিল। কেউ বলছে, ওসব ইউনিয়ন-ফিউনিয়নের ব্যাপার নয়; আমারই কোনো ফ্রেন্ড এইসব কাণ্ড বাধিয়েছে। তা আমারও ওইরকম সন্দেহ হয়, কিন্তু এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

পপি বিশোয়াস এবার কাজের কথায় এলেন। বললেন, "আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, মিস্টার শংকর। আমি এবার এসব থেকে দূরে সরে যেতে চাই। আমি শুনলাম, আপনার হাতে অনেক ঘর। মিসেস শকুন্তলা চাওলার সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হচ্ছে। শকুন্তলা আপনাকে যা-ভাড়া দেবে, আমিও তাই দেবো। প্লিজ মিস্টার শংকর, আমাকে একটা ফ্ল্যাট দিন। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি আজ—আমি ওই বুটিক ছেড়ে চলে আসতে চাই।" এই বলে পপি বিশোয়াস রুমালে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন।

বিডন স্ট্রীটের বিলাসিনী দেবীর কাছ থেকে এখন কোনোও খবর না পেয়ে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম।

রোজই ভাবি, আজ কোনো সুখবর এসে পৌঁছবে। রামসিংহাসনের মুখের দিকে তাকিয়েও থাকি। কাজকর্ম সেরে রামসিংহাসন চৌরাশিয়া আপিস ঘরে ফিরে রুপোর পাতে-মোড়া লাঠিখানা এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখলেই জিজ্ঞেস করি, "আমার জন্যে কোনো খবর আছে নাকি?"

রামসিংহাসন অবশ্যই নিরাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে গেয়ে রাখে, খবর থাকলে সে এক মুহূর্ত দেরি না-করে আমার কাছে ছুটে আসবে।

তেলকালিবাবু একদিন এই অবস্থায় আমাকে লক্ষ্য করলেন। রামসিংহাসন ঘর থেকে বিদায় নিতেই ফিস-ফিস জানতে চাইলেন, "কিছু যদি মনে না করেন, স্যার, রামসিংহাসন আপনার জন্যে কী খবর নিয়ে আসবে?"

ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারলাম না। আর আমার উত্তর শুনে তেলকালিবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। "এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ব্যারিস্টারি করে এলেন?"

"ব্যারিস্টারি কোথায় করলাম?" তেলকালিবাবুর ভুল ভেঙে দেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম।

"ওই হলো। নিজে ব্যারিস্টার না-হলেও, অতো বড়ো ব্যারিস্টারকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস সামলেছেন তো? সেণ্ট পারসেণ্ট বিলিতি ব্যারিস্টার সে কি সোজা কথা!"

তেলকালিবাবু বিরক্তভাবে ঠোঁট উল্টে বললেন, "পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে আপনি রামসিংহাসনকে বললেন, মেন সুইচের সঙ্গে আপনার কানেকশন করে দিতে! আপনার সঙ্গে মেন সুইচের ডিরেক্ট যোগাযোগ হলে রামসিংহাসনের সুইচ কী হবে? সে তো জ্বলে-পুড়ে ফিউজ হয়ে কোথায় উবে যাবে!"

"কানেকশন আর কী! আমি শুধু একবার একটু মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ চেয়েছি।" আমি এবার তেলকালিবাবুর কাছে কিছুই লুকোলাম না।

"ওই হলো! একবার আপনার লাইন সোজাসুজি মেন সুইচে চলে গেলে, এ-বাড়ির সমস্ত লাইনকে আপনার কাছ থেকেই পাওয়ার নিতে হবে। না-হলে আলো জ্বলবে না, স্যার। ইলেকট্রিক লাইনের এই নিয়ম!"

তেলকালিবাবু এরপর সাবধান করে দিলেন, "রামসিংহাসনের আশায় আপনার বসে থাকাটা মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না, স্যার। আপনার ঐ চিঠি রানীমা তো দূরের কথা, রাজকুমারীর মাস্টারমশায়ের কাছে পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ!"

সন্দেহ নিরসনের জন্যে রামসিংহাসনকে পরের দিন আবার জিজ্ঞাসা করলাম এবং তেলকালিবাবুর ভবিষ্যৎবাণী একশ ভাগ ফলে গেলো। রামসিংহাসন আমার চিঠিটা বিলাসিনী দেবীর হাতে দেয়নি। পমার মাস্টারমশায় বিপুলভূষণ বারিকের জন্যেই সে চিঠিটা রেখে এসেছে, এবং

যথাসময়ে আমি নিশ্চয় দেখা করবার অনুমতি পাবো।

তেলকালিবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করেছি। এবং তিনি বললেন, "যদ্দিন আছি তদ্দিন অন্তত একটু আধটু কনসাল্টেশন করবেন, যতখানি পারি পথের হদিশ দিয়ে যাবো।"

মাথা চুলকোলেন তেলকালিবাবু। বললেন, "দাঁড়ান স্যর, বুদ্ধির মোটরে একটু তেল দিয়ে নিই।"

কয়েক মুহূর্ত পরেই তেলকালিবাবু ঘোষণা করলেন, "পেয়েছি! মগজের গোড়ায় তেল ঢুকতেই মতলব বেরিয়ে এসেছে।"

আমি এই স্নেহশীল সদাস্নিগ্ধ লোকটির প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই সব মানুষের সান্নিধ্য ও করুণা সংসারের দুর্গম পথে আমাকে বারবার নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

তেলকালিবাবু বললেন, "শুনুন স্যর। আপনি এতো বড়ো ম্যানসনের ম্যানেজার। মালিকের সঙ্গে দেখা করা আপনার পক্ষে একটুও শক্ত নয়। আপনি লাস্ট তিন দিনের ভাড়া কালেকশনের টাকা একটা তবিলে পুরুন এবং সোজা বিডন স্ট্রীটে রওনা দিন। তেমন দরকার হলে রামসিংহাসনকে আমি অন্য-পথে নিয়ে যাবো। ওখানে গিয়ে সোজা টাকাগুলো রানীমাকে দিন।"

তেলকালিবাবু এবার হাসলেন। বললেন, "খাজনার টাকা হাতে পেয়ে খুশী হন না এমন রাজারানী এখনও জন্মায়নি! তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারুন। বলুন, কয়েকখানা খাস ফ্ল্যাটের কী হবে? সেলামীর কথাও তুলুন। অনেক বাড়িওয়ালা আজকাল শুধু ভাড়ার টাকায় নড়েন না চড়েন না; সেলামীর টনিক ছাড়া তাঁদের উৎসাহ আসে না!"

তেলকালিবাবুর কাছে সেদিন বিডন স্ট্রীটের কিছু অজানা খবরও সংগ্রহ করা গিয়েছিল। আমি বিডন স্ট্রীটে যাচ্ছি শুনে তিনি বলেছিলেন, "বিডন স্ট্রীটের গুপ্তদের তারিফ করতে হয়, স্যর। এরা বাঘের বাচ্চা।"

"বাঘের বাচ্চা মাত্রই বীর হয়, এমন একটা ধারণা আমাদের সকলেরই কীভাবে হলো?"

"অতশত জানি না, মশাই। বাঘের বাচ্চা বলতে আমি গুপ্তদেরই বুঝি।" এর পর তেলকালিবাবু উপদেশ দিয়েছিলেন, "এসব জেনে রাখুন, স্যর। খবরই শক্তি!"

তেলকালিবাবু বললেন, "এই তেলকালির তো বাড়ি-ঘর লাইনে কম দিন হলো না! দুধে দাঁত ভাঙবার পরেই পেটের জন্যে এই মেশিন-তেলানো লাইনে এসেছি। কলকাতার বাড়িঘরদোরের হিসট্রি তো জানতে বাকি নেই কিছু।"

তেলকালিবাবু দুঃখ করলেন, "সে একদিন ছিল মশাই। কলকাতা শহরে বাড়ির মালিক বলতেই দে, দত্ত, লাহা, সাহা, গুপ্তু, গুপ্ত এই সব টাইটেল বোঝাতো। পুরো নর্থ ক্যালকাটা এবং সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, এমনকি সমস্ত বড়বাজারের মালিকানা তখন ওঁদের হাতে। সায়েবপাড়ায় দু'একটা আর্মেনিয়ান এজরা, গলস্টন, স্টিফেন কিংবা মাজদা থাকলেও, লাহা সাহারা এখানে কম যেতেন না।"

তেলকালিবাবু বলে চললেন, "বলিহারি যাই এই সব মল্লিকের পো'দের।

ব্যবসাবাণিজ্যে টাকা করে, সেই পয়সা জলে ফেলে না দিয়ে এরা একের পর এক বাড়ি করেছে এবং কিনেছে। ওই যে সিটি অব প্যালেসেস না কি বলতো, প্রাসাদপুরীর সেই কলকাতা স্যর ইংরেজ বাচ্চার তৈরি নয়, তার ফুল ক্রেডিট এই বাঙালী বেনে এবং আর্মানি ইহুদিদের।"

"বাড়ি কী, মশাই! সেকালের এক একখানা বাড়ির সাইজ দেখলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়! ক'খানা পাখা আর লাইট পয়েণ্ট আছে গুনতেই আমার পাকা দেড় সপ্তাহ লেগে যাবে! তখনকার কলকাতায় তো আর মশাই এতো বাজে লোকের আমদানি হয়নি। আরশোলার মতো এই শহরে লোক থিকথিক করবে তা তো সে যুগের কেউ জানতেন না ; তবে মল্লিকের পো, লাহার নাতিরা স্বপ্ন দেখেছিলেন। যথাসর্বস্ব এই ভিতকেটে ইটের মধ্যে তাঁরা পুঁতে দিয়েছিলেন।"

তেলকালিবাবু বললেন, "আমি যখন এ-লাইনে প্রথম এসেছি, তখনও গোঁফ গজায়নি। তখনই আমাদের সরকারমশায় বলতেন, ধন্য বেনের পো! স্থানীয় লোকেদের মান সম্মান তোমাদের জন্যেই রক্ষে হলো।"

"ক্যানিং লাইন থেকে খ্রীস্টান হয়ে দেশত্যাগ করে বাবা এন্টালিতে চলে এসেছিলেন। বাবার মুখেও এ সব কথা শুনতাম ; আর সেই শুনে গর্বে বুক ফুলে উঠতো, স্যর।" তেলকালিবাবু পুরনো দিনের কথা শোনাতে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন।

"আপনার গর্ব হবার কারণ?"

"আমিও তো অরিজিন্যাল বেনের পো, স্যর। বাবা ধম্মো পাল্টালেও জাত তো পাল্টোননি! ছিলেন হিন্দু বেনে, হলেন খ্রীস্টান বেনে।"

তেলকালিবাবুর ব্যক্তিজীবনের এই সব খবর আমার এতোদিন জানা ছিলনা।

"তা, যা বলছিলাম, লোকাল লোকদের এই সব বাড়িঘর দেখে সত্যি গর্বে বুক ফুলে উঠতো। আপনি হয়তো বলবেন, বেল পাকলে কাকের কী? আমার মধ্যেও যে ওরকম প্রশ্ন মাঝে-মাঝে ঢেঁকুর দিতো না এমন নয়। তবু কেন জানি না, আনন্দ হতো, মশাই। ভাবতুম, বেলটা তো কাকদেরই কনট্রোলে রয়েছে : গাছ থেকে পড়ে ফাটলে কাকদেরই সেবায় লাগবে।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করলাম তেলকালিবাবুকে।

ভদ্রলোক বললেন, "তারপর আর কি! একতরফা নাটক দেখেই যাচ্ছি। দেখে-দেখে মনমেজাজ খারাপ হয়েছে—কিন্তু সহ্যও হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ওইটাই বাংলার নিয়ম। লাহা সিংহ দে দত্তরা রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে একের পর এক দলিলে সই লাগিয়ে সম্পত্তিগুলো চামেরিয়া, কানোরিয়া, কারনানি, ভাবনানির হাতে তুলে দেবেন, মল্লিক ম্যানসনেরই নাম হয়ে যাবে কানোরিয়া কোর্ট! আমরা তাতেই অভ্যস্ত। কোনো দুঃখ নেই, কোনো লজ্জা নেই। বরং রসিকতা।"

তেলকালিবাবু শুনিয়ে দিলেন, "যা বলছি হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু একটুও বানানো নয়!"

"শুনুন মশাই। গণেশ লাহা। নামকরা ফ্যামিলির ছেলে। বাপ পিতামহকে লোকে একডাকে চিনতো। লক্ষ্মীর সাধনা করে খেটেখুটে তাঁরা এই শহরে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। গণেশ লাহা রহিশ আদমী। ইয়ার বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃত হয়ে দিন কাটান। একদিন মশাই কোর্টে কী এক সাক্ষী

দিতে গিয়ে ধর্মাবতার জিজ্ঞেস করলেন, "কী করা হয়'?"

'এই একটু ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম!' গণেশ লাহা মাথা চুলকে উত্তর দিলেন।

অপর পক্ষের উকিল জিজ্ঞেস করলো, 'কী ধরনের কাজকর্ম?'

গণেশ লাহা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এই সেলস লাইনে একটু-আধটু আছি।'

'কী সেল করেন?' জজ ধরে নিয়েছেন কোনো সেলস্-এর কোম্পানি-টোম্পানি খুলেছেন এই গণেশ লাহা। কিংবা কোনো কোম্পানির সেল্স ম্যানেজার।

মাথা চুলকে গণেশ লাহা এবার উত্তর দিলেন, 'অন্য কিছু নয়। কেবল বাপের সম্পত্তি সেল করি। এক-একটা বাড়ি বেচি, কিছুদিন চলে যায়।'

কোর্টসুদ্ধ লোকের কী হাসি! গণেশ লাহা নিজেও ওদের হাসিতে যোগ দিলেন।

"কিন্তু এটা কী হাসির বিষয়? আপনি বলুন?" তেলকালিবাবু বেশ দুঃখের সঙ্গে আমার মতামত আহ্বান করলেন।

তেলকালিবাবু বলে চললেন, "এই গণেশ লাহার সেলস-এর খদ্দের ছিলেন একজনই। দুর্লভচাঁদ রাজঘরিয়া। শেষের দিকে দুর্লভচাঁদজী আর উকিলকেও খবর পাঠাতেন না। লাহাবাবুর জন্যে সম্পত্তি বিক্রির ব্ল্যাংক দলিল স্পেশালি তৈরি করে রেখেছিলেন। স্রেফ ব্ল্যাংক জায়গায় সম্পত্তির বিশদ বিবরণটা ঢুকিয়ে দিতেন এবং গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। পরের সেই গাড়িতে চড়ে আমাদের গণেশ লাহা ড্যাং ড্যাং করে রেজিস্ট্রি আপিসে হাজির হতেন, পকেট থেকে সোনার কলম বার করে খসখস করে নিজের নাম সই করে দিতেন। কোনো লাজলজ্জা নেই, পিতৃপুরুষের জন্যে কোনো বিবেচনা নেই।"

"দুর্লভচাঁদ রাজঘরিয়ার মোটর গাড়িতেই রেজিস্ট্রি আপিস থেকে সোজা চলে আসতেন বিন্দুবাসিনীর ঘরে। বিন্দুবাসিনী! ওরে বাবা! আবার থ্যাকারে ম্যানসন।" একটু থামলেন তেলকালিবাবু।

তেলকালিবাবু বললেন, "গণেশবাবুর রিকোয়েস্টে দুর্লভচাঁদ রাজ-ঘরিয়াই কালোয়ার শ্যামলাল গুপ্তাকে ধরে বিন্দুবাসিনীকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে প্রোভাইড করেছিলেন।"

সেই বিন্দুবাসিনীর ঘরে গণেশ লাহা এলে কী কাণ্ড হতো! স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলস যেন ভবানীপুরের গুপ্ত বাড়ি ভিজিটে আসছেন! সে কি এলাহি ব্যবস্থা। তখনকার যুগে বিন্দুবাসিনীর ঘরে আমি দুখানা ফ্যান ঝুলিয়েছিলাম, কারণ একখানা ফ্যানে গণেশবাবু পুরো হাওয়া পেতেন না। কষ্ট অনুভব করতেন। এ ছাড়াও নিজের চোখে দেখেছি, পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিয়ে বিন্দুবাসিনী নিজের হাতে গণেশ লাহার বুকে হাওয়া করছে, জিজ্ঞেস করছে, "আহা আজ খুব খাটাখাটনি হয়েছে বুঝি? সমস্ত বুকটা ঘামে ভিজে রয়েছে।"

তেলকালিবাবু বললেন, "গরম! কিন্তু কীসের গরম ভগবান জানেন। হ্যাণ্ডনোটের টাকার কী করে এতো গরম হয় আমরা বুঝতে পারতাম না!"

"শেষ পর্যন্ত গরম থাকলোও না", দুঃখ করলেন তেলকালিবাবু। "যে-বিন্দুবাসিনী নিজের হাতে বাবুর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে পাখার

হাওয়া করতো সেই একদিন গণেশ লাহাকে নিজের ফ্ল্যাট থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলো। সবার সামনে বললো, "আপনি আর এই ঘরে পা বাড়াবেন না। আমার সময়ের ক্ষতি হয়।"

তেলকালিবাবু বললেন, "বিন্দুবাসিনীকেও দোষ দেওয়া যায় না। প্রেমের ফ্রি পাশ সাপ্লাই করবার জন্যে তো সে-বেচারা এই লাইনে আসেনি। তাকেও নিজের পেট চালাতে হবে। যার টাকা নেই, কেবল দম্ভ আছে তাকে নিয়ে সময় নষ্ট কে করতে পারে?"

তেলকালিবাবুর মুখে আরও শুনলাম, "গণেশ লাহার তখন ঘোর দুর্দিন। বাড়িঘর সব শেষ হয়েছে। সেল করবার মতো আর কিছুই নেই। নিজের বাড়িতেই তিনি তখন ভাড়াটে হয়ে আছেন। ওখানেই ছোট্ট একখানা ঘরে গণেশ লাহা অনেক অভিমান বুকে জড়ো করে মারা গেলেন। কলকাতা শহরের কালা জাদু তিনি বুঝে যেতে পারলেন না।"

"আর বিন্দুবাসিনী?" আমি জিজ্ঞেস করি।

তেলকালিবাবু বললেন, "সেও একদিন কোথায় হারিয়ে গেলো এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে। এই কলকাতা শহর কত বড় বুঝতেই তো পারছেন! বছরে বছরে কত মেয়েমানুষের যৌবন ফুটছে, তখন টানাটানি দরাদরি হচ্ছে। দাম উঠছে। তারপর সেই ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়ছে, ততক্ষণ দুধ ছানা মাছ মাংস ইত্যাদির সঙ্গে আবার নতুন ফুলের সাপ্লাই কলকাতায় এসে পড়ছে, কে মশায় অতশত খবর রাখবে? শুকনো ফুলের গোমস্তা হলে তো সুস্থ লোকের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ওসব দিকে তাকাতে নেই মশাই", সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন তেলকালিবাবু।

তেলকালিবাবুর শেষ কথাগুলো যে আমার ভাল লাগছে না তা ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝতে পারলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসব কী আজকের কথা যে অতশত মনে রাখবো? বিন্দুবাসিনী যখন প্র্যাকটিস করছে, গণেশ লাহার ডেথ সার্টিফিকেট যখন লেখা হলো, তখনও দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধেনি।"

"সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ার বাঁধবার আগে থেকেই দে দত্ত লাহা সাহা মল্লিকরা নিজেদের বিষয় সম্পত্তি রাজঘরিয়া কানোরিয়াদের কাছে বেচে দেওয়ার ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছেন। ইংরিজীতে যাকে বলে কিনা 'বিগিনিং অব দি এন্ড'। শেষ পর্বের শুরু হয়ে গিয়েছে বেশ ভালভাবে, বুঝলেন স্যর।" মনের দুঃখে বললেন তেলকালিবাবু।

মুখ বুজে আপন মনে কলের মধ্যে তেল দেওয়ার কাজে যিনি ব্যস্ত থাকেন তাঁর ভিতরে যে এতো জিনিস লুকিয়ে আছে তা আবিষ্কার করে আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম।

তেলকালিবাবু এবার চেয়ারের পিছনে ঠেস দিলেন। ডান পা'টা অন্য পায়ের ওপর তুলতে তুলতে বললেন, "পুরনো ব্যথাটা যেয়েও যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে টনটন করে ওঠে।"

পায়ের ব্যথা সামলে নিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, "এক সময় এই বিডন স্ট্রীটের গুপ্তদের কত তারিফ করেছি। তারিফ করবার মতই লোক, মশাই।"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। "আপনি তো স্যর বরদাবাবুর কাছে শুধু ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিন সায়েবের গপ্পো শুনেছেন। পাকেচক্রে কী করে এই সোনার সম্পত্তি কালোয়ার শ্যামলাল গুপ্তর হাতে চলে গেলো তা

নিশ্চয় শুনেছেন। কিন্তু তার পরের ঘটনা তো শোনেন নি। শুনলে আপনিও বিডন স্ট্রীটের গুপ্তদের তারিফ করবেন।”

তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম আমি। আজ যখন বিডন স্ট্রীটে রাজদর্শনে যাচ্ছি তখন যতটা পারি জেনে রাখাই ভাল।

তেলকালিবাবু বললেন, “শ্যামলাল গুপ্তজী হাফ প্যান্ট পরে এই কলকাতায় ছেঁড়া কাগজ বেচা-কেনা করতেন। ওই অবস্থা থেকে ভগবানের দয়ায় এই এতো বড় থ্যাকারে ম্যানসনের মালিক হয়েছিলেন। দেবদ্বিজে ভক্তি হওয়াটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল পিতৃভক্তি।”

“বাবা তো বলতে গেলে জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন নি। না শিখিয়েছিলেন লেখাপড়া, না রেখে গিয়েছিলেন অর্থ। তবু শ্যামলাল গুপ্তা অনেক খরচা করে পুরনো একখানা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি থেকে বাপ প্রভুদয়াল গুপ্তার বিরাট রঙীন ছবি তৈরি করিয়েছিলেন। ওই যে উনি এখনও আমাদের মাথার ওপর অবস্থান করছেন।” এই বলে অফিসঘরে এখনও অক্ষত ছবিটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বললেন, “আগে প্রতিদিন এই ছবির সামনে ধুনো দেওয়া এবং ধূপ জেবলে দেবার অর্ডার ছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি কত সম্মান ছিল এই ছবির। আমি খৃষ্টান হয়েও দুএকদিন ধূপ জবালানোর ডিউটি দিয়েছি —রামসিংহাসনের বাবা তখন দেশে গিয়েছে।”

নিজের জখম পায়ে নিজেই একটু হাত বুলিয়ে নিলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, “বাপকে ভক্তি শ্রদ্ধা করলে খুব রম-রমা হয়। শ্যামলজীরও তাই হলো। কিন্তু পিতৃভক্তি থাকলেই যে নিজের পুত্রভাগ্য ভাল হবে এমন কোনো কথা নেই, মশাই।”

আমি তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। তেলকালিবাবু বললেন, “এও ভগবানের এক খেল বলতে পারেন। বাপের ছেলে সব সময় বাপের মতো হলে তো একই বংশে বারবার সূর্য উঠতো ; অন্য কাউকে আর বড় হতে হতো না।”

তেলকালিবাবু বললেন, “ওসব কথা থাকগে। যার যা-খুশী করুক ; তাতে আমাদের কী? ওই যে দে দত্ত লাহা সাহাদের কথা বলছিলাম না, ওখানেই ফিরে আসি। আমি তো ভেবে নিয়ে বসে ছিলুম, এদের এখন থেকে ক্ষয়ে যাবারই সময়। পূর্ণিমার চাঁদ যেভাবে ক্ষইছে তাতে ঘোর অমাবস্যার জন্যে পনেরোদিনও অপেক্ষা করত হবে না!”

“কিন্তু!” তেলকালিবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ নাটকীয় হয়ে উঠলো। বুঝলাম পরবর্তী ঘটনা ভদ্রলোককে বেশ উৎসাহিত করে তুলছে।

তেলকালিবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, “হঠাৎ যেন কী হলো! ভাঁটার টাইমে যদি দেখেন কল কল করে নদীতে জোয়ার আসছে তা হলে কেমন অবাক লাগে বলুন তো? থ্যাকারে ম্যানসনে হঠাৎ আমাদের সেই অবস্থা হলো।”

গণেশ লাহার ভগ্নিপতি পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। শালা ভগ্নিপতিতে স্বভাবে মেজাজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পূর্ণচন্দ্র গুপ্তর সামান্য কী সব কারবার ছিল ; কিন্তু সেগুলোই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে চললেন। কিন্তু পয়সা এলেই তাকে লাথি মেরে বার করে না দিয়ে, কীভাবে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা

যায় সে-বিষয়ে চিন্তা করতেন বিডন স্ট্রীটের পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মশায়।

"তখন ঘোর যুদ্ধের সময়। হঠাৎ একদিন আমরা অবাক হয়ে শুনলাম, ঝানু কালোয়ার কানহাইয়ালাল গুপ্তা এই থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে দিচ্ছেন এবং নতুন মালিক হচ্ছেন আর এক গুপ্তর পো। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, নতুন গুপ্ত আমাদের পুরনো গুপ্তর কোনো আত্মীয়স্বজন হবেন। বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধের জন্যে শ্যামলালজীর ছেলে সম্পত্তি বেনামা করে রাখছেন।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেলকালিবাবুদের ভুল ভাঙলো। পূর্ণচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে শ্যামলাল পুত্র কানহাইয়ালাল গুপ্তার কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই।

তেলকালিবাবু বললেন, "তখন জাপানী বোমার হিড়িক পড়েছে! কলকাতার একটি লোকও জাপানীদের হাতে বেঘোরে প্রাণ দিতে চায় না। মানে গরীব বড়লোক সবাই তখন কলকাতা ছেড়ে পালাবার জন্যে যে যেদিকে পারে ছুটছে। এক শ টাকার সম্পত্তি তখন রাতারাতি কুড়ি পঁচিশ টাকায় নেমে যাচ্ছে—সে দামেও খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না। উঃ সে এক যুগ—জাপানী বোমার হিড়িক তো আপনারা দেখলেন না! হিড়িকের শহর কলকাতা। সব সময় কিছু না কিছু হিড়িক এখানে লেগেই আছে।"

"জাপানী হিড়িকের মধ্যে এক ব্যাটা জ্যোতিষী এসে কানহাইয়া-লালজীকে ভবিষ্যদ্বাণী করলো, থ্যাকারে ম্যানসনের ভবিষ্যৎ ভাল নয়। এ বাড়ির পরমায়ু নাকি খুব কম। কানহাইয়ালালজী ধরে নিলেন এই থ্যাকারে ম্যানসনের ঘাড়েই তা হলে জাপানীদের পয়লা নম্বর বোমা এসে পড়বে।"

"কানহাইয়ালালজী নিজেও কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে কানপুরে পালাবার মতলব আঁটলেন। এবং তার আগেই পূর্ণচন্দ্র গুপ্তমশায় আসরে অবতীর্ণ হলেন। যে-বাড়ি থেকে তাঁর শালাকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, সেই ম্যানসনখানাই তিনি নগদ টাকায় কিনে নিলেন। ঘড়িব কাঁটা হঠাৎ যেন পিছনে হাঁটতে লাগলো, স্যর। দে দত্ত লাহা সাহারা যে আবার কিছু সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে পারবে তেমন আশা তো আমরা কখনোই করিনি।"

সেই থেকেই এ-বাড়ির সমস্ত কর্তৃত্ব এই বিডন স্ট্রীটের। পূর্ণচন্দ্র ওই সময় নিজের নামে ঝটপট বেশ কিছু ভাল সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়েছিলেন।

"বেশ তো। ভাল খবর। এঁরাও তা হলে মন দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করলে লক্ষ্মীকে ঘরে বাঁধতে পারেন." তেলকালিবাবুর গল্প শুনতে শুনতে আমি মন্তব্য করলাম।

তেলকালিবাবু কিন্তু আমার কথায় তেমন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন. "দাঁড়ান. স্যর। অত তাড়াহুড়ো কোনো মতামত প্রকাশ করে বসবেন না।"

তেলকালিবাবু বললেন. "টাকাকড়ি ছিল। চান্স পেয়ে সস্তা দরে থ্যাকারে ম্যানসন কিনলেন পূর্ণচন্দ্র গুপ্তমশাই। ওই পর্যন্ত ভাল। কিন্তু তারপর আর ভাল নয়। অ্যাদ্দিন বেশ ভাল চলছিল, কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসনের মালিকানা হাতে আসার পরেই যেন গোলমাল শুরু হলো", সখেদে মন্তব্য করলেন তেলকালিবাবু।

তেলকালিবাবু বোধ হয় সুযোগ পেলে একবার এই থ্যাকারে ম্যানসনের কোষ্ঠিটা নিজেই যাচাই করে নিতেন।

একবার তেলকালিবাবু শুনেছিলেন, পূর্ণচন্দ্র নিজেই বিডন স্ট্রীট ছেড়ে এই থ্যাকারে ম্যানসনের একটা অংশে বসবাস শুরু করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মতের পরিবর্তন হলো।

বরদাপ্রসন্ন সেই সময় নাকি পূর্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন, মহাসমারোহে যাগযজ্ঞ করিয়ে এ-বাড়ির পুরনো দোষটুকু কাটিয়ে নিতে। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র বিশেষ উৎসাহ দেখান নি।

এর পর পূর্ণচন্দ্রের সংসারেও নাকি অশান্তির ছায়া পড়েছিল। "পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত নিজে তখন সাবধানী সাত্ত্বিক মানুষ হলে কী হয়, ছেলেটি মোটেই বাপের লাইনে গেলো না। বাপ কত আশা করে নাম রেখেছিলেন অর্ধচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু বাপের অর্ধেক গুণও ছোকরা পেলো না", দুঃখ করলেন তেলকালিবাবু।

তারপর বললেন, "এর পরের ব্যাপার তো জানেন নিশ্চয়। হাইকোর্টে কাজ করেছেন যখন তখন শুনেছেন নিশ্চয়। পুত্রের হালচাল নিরাপদ নয় বুঝে, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত জীবিতকালেই আটঘাট বাঁধবার ব্যবস্থা করলেন। অ্যাটর্নি ডেকে সম্পত্তির নতুন ব্যবস্থা করলেন। তাঁর অবর্তমানে বিষয়-সম্পত্তির অধিকার তাঁর ছেলের থাকবে না—এসব কর্তৃত্ব থাকবে বউ-মা বিলাসিনী দেবীর ওপর। বিলাসিনীর গর্ভজাত সন্তান আঠারো বছর বয়সে সব দায়িত্ব বুঝে নেবে। অর্ধচন্দ্র গুপ্ত বাড়িতে বসবাস করবেন কিন্তু তাঁর কোনো অধিকার থাকবে না।"

"তাবপর ?" আমি জিজ্ঞেস করি। কারণ অতীতের ব্যাপার-স্যাপার গণপতিবাবু আমাকে অত বিস্তারিতভাবে বলেননি।

তেলকালিবাবু বললেন, "অমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো বউ মা—বাপ-মা কত আশা করে নাম দিয়েছিলেন বিলাসিনী। কিন্তু কোনো বিলাসই সহ্য হতে চায় না। শ্বশুর নিজের হাতে বউমার ঘাড়ে ওই সব দায়িত্ব চাপিয়ে গেলেন। তারপর শোনা যায়, অর্ধচন্দ্রগুপ্ত খুব মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। স্ত্রীকে নাকি বলেছিলেন, এই সব ছেড়ে চলো আমরা অন্য কোথাও পালিয়ে যাই। বেচারা বিলাসিনী দেবীর উভয়সংকট। শ্বশুর রাখি না স্বামী রাখি ?"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। "সেকালের মেয়ে তো। ইচ্ছে করলেই শ্বশুরকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার ওপর শ্বশুর তখন অসুস্থ, শয্যাশায়ী।"

বিলাসিনী ভেবেছিলেন, বাপ এবং ছেলেতে মান-অভিমানের পালা চলেছে। ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসন কেনার পর থেকে ভুল বোঝাবুঝি বেড়েই চললো। পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত একদিন ছেলেকে কিছুই না-দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

বাবার সেই অপমান ছেলে সহ্য করতে পারলো না। বউ-এর অন্ন খাওয়ার চেয়ে জীবন না রাখাই ভাল, এই বলে মশাই, অর্ধচন্দ্র গুপ্ত একদিন আত্মহত্যা করে বসলেন। কী অবস্থা ভাবুন। বিলাসিনী দেবী তখন অন্তস্বত্বা। শ্বশুর তিন মাস আগে গত হয়েছেন। স্বামী এইভাবে বাপের ওপর প্রতিশোধ নিলেন।

বিলাসিনী দেবীর জীবনে আর কি রইলো ? তাঁর পরিচয়ঃ এস্টেট লেট পি সি গুপ্ত, W/O উইডো অফ লেট অর্ধচন্দ্র গুপ্ত।

বিলাসিনী দেবীর নাম হতেই, বহু দিন আগে বিডন স্ট্রীটের জলসা-ঘরের অস্বস্তিকর দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মোমের পুতুল একটি—পমা। আমার হাবভাব দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

তেলকালিবাবু বললেন, "বিলাসিনী যথাসময়ে একটি মেয়ের জন্ম দিলেন। পূর্ণচন্দ্র গুপ্তর ডাইরেক্ট বংশধারা রক্ষা সম্ভব হলো না। এখন ওই পমার মুখ চেয়েই বিলাসিনী দেবী বসে আছেন। বাকি সময়টা পুজোর মধ্যেই ডুবে থাকেন। পুজো ছাড়া আর কিছুই জানেন না, ওই বিলাসিনী দেবী।"

তেলকালিবাবু এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। পুরনো ক্লকে টং টং করে ন'টা বাজলো। তেলকালিবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "আপনি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবেন না। এখান থেকে ট্রামে-বাসে বিডন স্ট্রীট যেতে আপনার এক ঘণ্টা। সাড়ে দশটার সময় মা জননী একবার পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এখনই ভগবানের নাম করে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বেরিয়ে পড়ুন।"

বিডন স্ট্রীটের চন্দ্রোদয় ভবনের সামনে ইম্পিরিয়াল গোঁফের দারোয়ান গেট আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছ'মাস আগে গণপতি সামন্তর সঙ্গে এ-পাড়ায় প্রথম এসে যে-দৃশ্য দেখেছিলাম একেবারে সেই এক দৃশ্য—কোনো পরিবর্তন হয়নি। দারোয়ানজী যেন তখন থেকেই একই জামাকাপড় পরে পাথরের স্ট্যাচুর মতো ওইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

দারোয়ানজী প্রথমেই আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। অচেনা-অজানা লোক যে এই প্রাসাদ দুর্গে স্বাগত নয় তা দারোয়ানজীর সন্দিগ্ধ হুঙ্কার শুনলেই বোঝা যায়। কিন্তু পরিচয় দেওয়ায় সুফল হলো।

"ঠাকরে ম্যানসন! বলবেন তো সাব। আমার কী আজকাল সব মনে থাকে?" দারোয়ানজী আমার কাছে প্রায় ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং সবিনয়ে জানালেন যে ঠাকরে ম্যানসনের মেনজারবাবুর জন্যে তাঁর গেট সব সময় খোলা আছে।

একটু খৈনি ভক্ষণ করলেন দারোয়ানজী। তারপর জানালেন, তাঁর এই দরজা বন্ধ কেবল দুষ্টু লোকদের জন্যে। এবং সেই সব লোকের জন্যে যারা কোনো কাজকর্ম করবে না, আর সুযোগ বুঝে মা-জননীর কাছে এসে মিথ্যে কথা গেয়ে-গেয়ে টাকা নিয়ে চলে যাবে।

দারোয়ানজীর সঙ্গে এই দ্বিতীয় সাক্ষাতেই আমার ভাব বেশ জমে উঠল। দারোয়ানজী বললেন, "আপনি তো 'গানপট্টি' বাবুজীর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন? তখন সন্ধেবেলা ছিল।"

"গানপট্টি নয় বাবা, গণপতি সামন্ত।" ওই প্রিয় মানুষটির নাম কেউ বিকৃত করুক তা আমার মোটেই পছন্দ নয়।

লজ্জায় জিভ কাটলেন দারোয়ানজী। "গণপতি বাবু! তাই বলুন। আর জনার্দন মিশির আমাকে বলেছিল কিনা গানপট্টিবাবু—হাইকোর্টে

ওইরকম 'ব্লাইতি' নাম নাকি আছে।"

দারোয়ানজী এবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "বাবুজী, আপনার তবিয়ৎ আচ্ছা যাচ্ছে না?"

অকস্মাৎ এই ধরনের প্রশ্নে বেশ বিব্রত বোধ করছি। গোড়ার বক্তব্য ভুলে গিয়ে দারোয়ানজী এবার সগর্বে দাবী করলেন যে তিনি কিছুই ভোলেন না। শ্রীহনুমানজীর দয়ায় তাঁর বুকের কাছে নাকি একখানা কেমরা লাগানো আছে—যেখানে সমস্ত ছবি তোলা হয়ে যায়।

দারোয়ানজীর মনে আছে, গণপৎবাবুর সঙ্গে ছ' মাস আগে আমি যেরকম এসেছিলাম এখনও ঠিক সেই একই রকম আছি। বরং একটু রোগা হয়েছি।

দারোয়ানজী চিন্তিতভাবে জানালেন, "এরকম তো হবার কথা নয়। গুপ্তা এস্টেটে ছে-মাহিনা কাম করেও যে আদমী মোটা হয় না তার নিশ্চয় কোনো অসুখ-বিসুখ আছে, এখানে যে-কোনো লোক মোটা হতে বাধ্য। চিরকাল তো তাই হয়ে এসেছে। ওই যে রামসিংহাসন চৌরাশিয়া— প্রথম যখন এসেছিল তখন দেশলাই কাঠির মতো রোগা ছিল, এখন দু'খানা পালোয়ানকে একখানা করলে যেরকম হয় সেরকম চেহারা!"

দারোয়ানজী দুঃখ করলেন, যৌবনে তাঁরও একবার থ্যাকারে ম্যানসনে বদলী হবার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সবাই তাকে বোঝালো, হেড-আপিসের কামই নাকি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এখন দারোয়ানজী বুঝেছেন যে তাঁর পরামর্শদাতারা খুব দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন না। হেড আপিস মানেই ভাল জায়গা নয়।

দারোয়ানজীকে আশ্বস্ত করলাম, আমার শরীরে তেমন কোনো গোলোযোগ নেই, এবং তাঁর শুভেচ্ছায়, এবার যাতে ওজন বৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকবো।

কয়েকটি শ্বেতাঙ্গিনী পরী এবং স্নানরতা প্রস্তরসুন্দরীকে অতিক্রম করে অবশেষে সেই জলসাঘরে প্রবেশ করলাম যেখানে মোমের পুতুল পমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ঘরদোর ঠিক সেই একইভাবে সাজানো রয়েছে। কিন্তু পমা নেই। কিন্তু পমার তো এখন থাকবারও কথা নয়। পমা এতোক্ষণে নিশ্চয় ইস্কুল অথবা কলেজে চলে গিয়েছে।

চাকরের মাধ্যমে ভিতরে খবর দিয়ে জলসাঘরেই বসে আছি। এই সব রাজকীয় পরিবেশ আমাদের অনভ্যস্ত ব্যক্তিত্বর ওপর অলক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করে। হাত-পা গুটিয়ে বেশীক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলে মনে হয় হঠাৎ কখন নিজেরই অজ্ঞাতে আমিও এখনকার টেবিল, চেয়ার, স্ট্যাচু এবং ঝাড়লণ্ঠনের মতো কাঁচ অথবা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যাবো।

কিছুক্ষণ পরেই একজন পাচকের প্রবেশ। একটি শ্বেতপাথরের থালায় দুটি মিষ্টি ও এক গেলাস জল রেখে সে নিঃশব্দে বিদায় নিলো। এই মিষ্টান্ন যে আমার জন্যে সে-কথাও লোকটি বলে যাবার প্রয়োজনও বোধ করল না।

ছোটবেলায় মা শিখিয়েছিলেন, নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও অনুরুদ্ধ না হয়ে কখনও ভোজন করবে না। পুরনো সেই শিক্ষা অনুযায়ী হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছি। এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করছি। একাধিক ঘড়িও ওই জলসাঘরে নজর পড়লো—কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়

নির্দেশ করছে। কোনোটি পঁয়তাল্লিশ মিনিট, কোনোটি আধঘন্টা পিছিয়ে রয়েছে।

ফতুয়া পরে, চোখে মোটা চশমা লাগিয়ে কে এম দাসের বিদ্যাসাগরী চটি ফটাফট করে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবার জলসাঘরে প্রবেশ করলেন।

পরিচয় দেবার আগেই, ভদ্রলোক আমাকে বকুনি লাগালেন। "একি! এখনও খাননি কেন? সামনে খাবার রেখে দিয়ে কেউ এই ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে? অতিথি বলে, এ-বাড়ির মাছি মশারা তো আপনাকে খাতির করবে না!"

এই খাবারগুলো যে আমারই জন্যে পাঠানো হয়েছে সে-বিষয়েও যে আমার মনে কিছুটা সন্দেহ ছিল তা আর এই ভদ্রলোককে বলবার সুযোগ পেলাম না।

এবার পরিচয় হলো। সুরসিক বৃদ্ধ বললেন, "আমি কৈলাশ চক্রবর্তী। জাতে ব্রাহ্মণ, পেশায় গোমস্তা।"

কৈলাশবাবু জানালেন, "আপনার খবর অনেকদিন পেয়েছি, কিন্তু কখনও চোখের দেখা হয়নি। তা কথাবার্তা হবেখন, তার আগে খেয়ে নিন।"

কৈলাশবাবু আরও জানালেন, মা-জননীর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসেন তাঁরা কেউ অভুক্ত অবস্থায় এখান থেকে ফিরে যান না—একটু মিষ্টি-মুখ করতেই হয়। মা-জননীর তাই নির্দেশ।

আমি এবার কী করবো ভাবছি। কৈলাশবাবু বললেন, "আপনিও তো বাউন মশাই? বাউনের আবার খাবারে এতো দ্বিধা কেন?"

সুরসিক কৈলাশবাবু এবার পরিবেশটা বেশ হাল্কা করে তুলছেন। তিনি বললেন, "খেয়ে নিন। চন্দ্রোদয় ভবনের জন্যে এই মিষ্টি হাতিবাগানের হরিলাল ঘোষের দোকানে স্পেশাল তৈরি হয়। এই সন্দেশ ক্যাশ টাকা ফেলে হরিলালের দোকানেও পাবেন না। নাম গুপ্তপাক। পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মশায়ের বাবা লগ্নচন্দ্র গুপ্ত এই পাক খেতে ভালবাসতেন। সেই থেকে লাস্ট ফিফটি ইয়ারস এই সন্দেশ এ-বাড়িতে সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে হরিলাল ঘোষ। কত লক্ষ টাকা যে হরি ঘোষের ফ্যামিলি এর থেকে কামিয়েছে তার ঠিকানা নেই।"

গুপ্তপাক একখানা মুখে পুরলাম। সত্যি অতি উপাদেয় সন্দেশ। আমার মুখে পরিতৃপ্তির লক্ষণ আবিষ্কার করে খুশী হলেন কৈলাশ চক্রবর্তী। বললেন, "দেখে নিন, খেয়ে নিন। এসব আর কতদিন? বেলা তো পড়ে এলো। বিলাসিনী দেবী উইডো অফ অর্ধচন্দ্র গুপ্ত, এখনও সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন, তারপর এখানে এক গেলাস জল চাইলেও পাবেন না। ওই রাস্তায় গিয়ে ট্যাপের কলে খেয়ে আসতে হবে।"

আমি আড়চোখে ঘড়িগুলোর দিকে তাকাচ্ছি এবং আমার হাতঘড়িটা মেলাবার কথা ভাবছি।

কৈলাশবাবু একটু থামলেন। তারপর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "এঁরাও আমার ঘাড়ে চেপেছেন। আগে আমাদের মাইনে-করা ঘড়িবাবু ছিল। ওয়েস্ট-এন্ডের বাড়ি থেকে পছন্দ করে ঘড়িবাবু আনিয়েছিলেন লগ্নগুপ্ত। সেই ঘড়িবাবুর ছেলেই এখানে কাজ করছিলেন। কিন্তু মাস্টারবাবুর দিন এখন। তিনি বললেন, মাইনে-করে ঘড়িবাবু রাখার কোনো দরকার নেই।"

"ঘড়ি-ফড়ি সব বন্ধ হয়ে পড়েছিল, মশাই।" দুঃখ করলেন কৈলাশবাবু। "মরা ঘড়ি দেয়ালে ঝুলতে দেখলে আমার ভীষণ কষ্ট হয় মশাই—বিশেষ করে যে-ঘড়িকে আপনি সারাজীবন জ্যান্ত দেখেছেন। শেষে বাধ্য হয়ে কয়েকটা ঘড়ি আমি নিজেই চালিয়ে রেখেছি। তেল-ফেল তো দিতে পারি না—জানিও না। কিন্তু আশ্চর্য মশাই, একটা ঘড়িও ফাস্ট নেই। এখানকার সব কিছু স্লো চলছে। আধঘণ্টা কাঁটা এগিয়ে দিয়েও দেখেছি পরের দিন দশ মিনিট পিছিয়ে পড়েছে।"

কৈলাশবাবু এবার ফিসফিস করে শোনালেন, "অথচ বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, নিজের চোখে দেখেছি, এই সব ঘড়িই পূর্ণচন্দ্র গুপ্তর আমলে টাট্টু ঘোড়ার মতো দৌড়তো। সমস্ত ঘড়ি ফাস্ট! ওদের সামলে রাখতে আমাদের ঘড়িবাবু হিমসিম খেয়ে যেতেন।"

কৈলাশ চক্রবর্তী আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, "ভালই করেছেন এসে। এতোদিন আসেননি কেন? আমাদের মা-জননী তো সেরকম লোকই নন যে কাউকে দূরে সরে থাকতে হবে।"

এবার কৈলাশবাবু আসল প্রসঙ্গে এলেন। আমাকে বললেন, "ধৈর্য ধরে বসতে হবে কিন্তু, আজ আবার মা-জননীর স্পেশাল পুজো। ঠাকুরের জন্যে আড়াইশ বেলপাতা আলাদা করে আনিয়েছেন। প্রতিটি পাতা বাবার মাথায় চড়াবেন, তারপর মা-জননীর ছুটি।"

আমি অবাক হয়ে এ-বাড়ির খবরাখবর সংগ্রহ করে যাচ্ছি। ঠিক এই ধরনের কোনো মনিবের কাছে আগে চাকরির অভিজ্ঞতা হয়নি। পূর্ববর্তী দুই মনিবই ম্লেচ্ছ!

কৈলাশবাবু সব খবরই একটু-একটু রাখেন দেখলাম। বললেন, "আগে তো বারওয়েল সায়েবের বাবু ছিলেন আপনি? বড় ভাল লোক ছিলেন শুনেছি। হেদোর ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবে সুভাষ বোসের সঙ্গে ওঁকে মিটিং করতে দেখেছি। অমন লোক আপনার আমার পোড়া কপালে টিকবে কেন?"

"সবই ভাগ্য। বুঝতেই পারেন," আমি নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারি না।

কৈলাশবাবুও এবার দুঃখ করলেন। "সেই এলেন এই গুপ্তদের এখানে চাকরি করতে, একটু আগে এলেন না। এখানেও কম রমরমা ছিল না। বড়বাবুর ছিল ছুরির মতো বুদ্ধি। রূপে গুণে চরিত্রে সরস্বতীর বরপুত্র—এই পূর্ণচন্দ্রমশাই। পাঁচ মিনিটের কথায় ওই থ্যাকারে ম্যানসন কিনে নিয়েছিলেন। ভবিষ্যতটা যেন স্পেশাল চশমায় দেখতে পেতেন। কিন্তু কেবল ওই ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যত। নিজের ছেলের ভবিষ্যতটা বুঝলেন না।"

একটু থামলেন, কৈলাশবাবু। তারপর বললেন, "ছেড়ে দিন, মশাই। আমরা কথা বলবার কে? আমরা এসব জিনিস গড়তেও পারবো না, ভাঙতেও পারবো না। তবে আপনাকে যা-বলছিলাম, গুপ্তবাড়ির চাকরি মানেই খারাপ চাকরি ছিল না। এই শর্মাও তো শ্যামপুকুরে একখানা দোতলা বাড়ি কিনেছিলেন এই চাকরি থেকে। মানে, বাবুই কিনিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় তখন ইংরেজের গেল-গেল অবস্থা। মহাপ্রলয়ের বুঝি আর দেরি নেই। কিন্তু বাবু বলেছিলেন, কৈলাশ, তোমাকে বলে

রাখলাম, যুদ্ধ চিরকাল থাকবে না। আর যে-যাই বলুক, ইংরেজদের হারও হচ্ছে না। স্বয়ং রবি ইংলণ্ডের সহায় রয়েছেন। হলেও তাই। ভাগ্যে, বাবুর কথা শুনে তখন জলের দামে বাড়িটা কিনতে আপত্তি করিনি। এখন মাস গেলে আড়াইশ টাকা ভাড়া পাচ্ছি।”

কৈলাশবাবু আমাকে পরামর্শ দিলেন, “এখন ছটফট করবেন না। বাবার মাথায় সবে পঁচিশটি বেলপাতা পড়েছে—আমি উঁকি মেরে ঠাকুর ঘরে দেখে এসেছি। আর এই ঠাকুর পুজোর ব্যাপারে মা-জননী কোনো তাড়াহুড়ো করেন না। আগে ঠাকুর—তারপর বিশ্বসংসার, বুঝলেন শংকরবাবু।”

হতেই পারে। আমরা বিষয়ী মানুষ—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর প্রাণান্তকর পরিশ্রমেই সারাক্ষণ ব্যস্ত রয়েছি। জীবনরক্ষার উত্তেজনায় জীবন দেবতার কথা স্মরণ করবার বা তাঁর চরণে নিজেকে নিবেদন করবার সুযোগ আসেনি।

কৈলাশবাবু এবার ফিসফিস করে বললেন, “মা-জননী তবু রাজত্ব চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—ওঁর শ্বশুর মশায়ের দূরদৃষ্টি মিথ্যে হয়নি। কিন্তু এর পর যে কী হবে, ভগবান জানেন।”

থ্যাকারে ম্যানসনে চাকরি করে এসব সমস্যার কথা আমার মনেই পড়েনি। ভেবেছি, “দূরে এমন একজন মালিক আছেন, যিনি শুধু ম্যানসন বাড়ির রোজগারেই আগ্রহী, কিন্তু এর উন্নতির ব্যাপারে কোনো চিন্তা করতে রাজী নন।”

কৈলাশবাবু বললেন, “মা-জননীকে তো আপনি দেখেননি। আহা! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা। স্বর্গ থেকে সোজা যেন আলতা-পায়ে এই বিডন স্ট্রীটে চলে এসেছেন। দেখবেন। কথা বলেও আনন্দ পাবেন, প্রাণটা জুড়িয়ে যাবে।” এবার কৈলাশবাবু নিজের মনেই হেসে ফেললেন।

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কৈলাশবাবু বললেন, “কত আশা করে বাপ-মা এই মেয়ের নাম দিয়েছিলেন বিলাসিনী। কিন্তু এতো রূপ, এতো বৈভব দিয়েও ঈশ্বর কী রসিকতা করলেন! একে কি বিলাসিনী বলে? শ্বশুরবাড়ি এসেও থান-কাপড় পরে কাঁচ কলা সেদ্ধ আর ভাত-খেতে খেতে এই রাজত্বের তদারকী করা? পমা দিদিমণি কিন্তু মানুষ হচ্ছেন মডার্ন স্টাইলে। ইংলিশ মিডিয়মে পড়েছেন। ইংরেজী শুনলে মনে হয় যেন মেমসায়েব কথা বলছে। অথচ পুজো-আর্চাতেও মন রয়েছে। সত্যনারায়ণ পুজোর সব আয়োজন দিদিমণি নিজের হাতে করেন।”

আরও একঘণ্টা পরেও বিলাসিনী দেবীর কোনো পাত্তা নেই। কৈলাশবাবু নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, “এতো দেরী হবার তো কথা নয়। আপনার কপালটাই খারাপ।”

তবু, যখন এসেছি। তখন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাবো।

আরও একঘণ্টা পরে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো! হন্তদন্ত হয়ে ভিতর থেকে এগিয়ে এসে কৈলাশবাবু আমাকে খবর দিলেন, মা-জননী, এ-দিকেই আসছেন।

একটু পরেই সেই বিলাসিনীযোগিনীর মুখোমুখি হলাম আমি। অপরূপ সে মাতৃমূর্তি। দীর্ঘদিনের বৈধব্য ও কৃচ্ছ্রসাধনেও গৌর অঙ্গের স্বর্ণাভা নিস্প্রভ হয়নি। একটি গরদের থান পরেছেন বিলাসিনী দেবী।

সোনার হাত দুটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ। কোথাও কোনো স্বর্ণালঙ্কার নেই। কিন্তু এই সুবর্ণমূর্তিতে স্বর্ণালঙ্কারের প্রয়োজন কী?

মাথার চুল এই বয়সেও কোমর পর্যন্ত বর্ষার লাউ ডগার মতো নেমে এসেছে।

এই মাতৃমূর্তিকে নিজের অজান্তেই মাথা নত করে প্রণাম করতে গেলাম। বিলাসিনী অকস্মাৎ পিছিয়ে গেলেন। "ব্রাহ্মণের নমস্কার! আমার পাপের বোঝা আরও বাড়াবো?"

বুঝলাম, কৈলাশবাবু আমার ওপর দয়াপরবশ হয়ে ইতিমধ্যেই সমস্ত খবরাখবর দিয়েছেন।

কৈলাশবাবু এবার মা-জননীকে বললেন, "শংকরবাবু কিছু টাকা এনেছেন।"

মা-জননী নির্দেশ দিলেন, "আপনি গুণে নিয়ে রসিদ দিন।"

আমি টাকার বাণ্ডিলটা প্রথমে মা-জননীর দিকে এগিয়ে দিতে গেলাম। তিনি আবার সভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

কৈলাশবাবু বললেন, "মা-জননী এই সব টাকাকড়ি কখনও স্পর্শ করেন না। তবে কাগজপত্তরে সই করেন, রসিদও দেন।"

এবার মা-জননী বললেন, "কৈলাশবাবু, শংকরবাবুর প্রসাদ?"

আমি যে ইতিমধ্যেই খেয়েছি তা সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। মা-জননীর নির্দেশে কৈলাশবাবু দ্বিতীয়বার খাবার আনতে চলে গেলেন। বিলাসিনী বললেন, "সেই কখন এসেছেন। যাবেন কত দূরে!"

এবার প্রথম সুযোগেই বিলাসিনী দেবীর বিশ্বাস ও প্রশংসা অর্জনের জন্য থ্যাকারে ম্যানসনে আমার কীর্তিকাহিনীর কথা একের পর এক বলতে শুরু করলাম। কী আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কয়েকটা ফ্ল্যাট আমি গুপ্তপরিবারের খাস দখলে এনেছি তাও শুনিয়ে দিলাম।

শান্তভাবে সব শুনে যাচ্ছেন বিলাসিনী দেবী। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, "গণপতিবাবু যে আমাকে খারাপ লোক দেবেন না তা আমি জানতাম। ওঁর অনেক অভিজ্ঞতা, উনি মানুষ চিনতে ভুল করেন না।"

আমি এবার বললাম, "এই থ্যাকারে ম্যানসনের সম্ভাবনা অনেক। ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারলে এই সম্পত্তি সোনার খনি হয়ে দাঁড়াবে।"

কিন্তু স্বর্ণখনির সম্ভাবনাও বিলাসিনী দেবীকে উৎসাহিত করলো না। তিনি গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, "যাঁদের আমরা বাড়ি থেকে উঠিয়েছি তাঁদের ওপর কোনো অবিচার করা হয়নি তো? অন্যায়ভাবে আশ্রয়চ্যুত করলে মহাপাপ হয়।" পাপের বোঝা আরও বাড়াতে বিলাসিনী দেবী মোটেই উৎসুক নন।

কোনো বাড়িওয়ালার মুখে এই ধরনের কথাবার্তা আমি প্রত্যাশা করিনি।

বিলাসিনী দেবী এবার হাফ-ফ্ল্যাটের কথাও তুললেন। সেখানে রামসিংহাসন যে নিজের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে তা বিলাসিনী দেবী জানেন বলে মনে হলো না।

বিলাসিনী দেবী বললেন, "বিপদে-আপদে পড়া মানুষকে মাঝে মাঝে ওখানে আশ্রয় দেবেন। ধর্মশালা তো গড়তে পারলাম না।"

চোখ বুজে বিলাসিনী দেবী এবার কিসের স্তব আরম্ভ করলেন। কৈলাশবাবু ইতিমধ্যে আরও কিছু খাবার নিয়ে ফিরে এলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

কৈলাশবাবু বললেন, "আপনার যা বলবার বলে যান না। মা-জননী সব শুনে যাবেন।"

কিন্তু স্তবের মধ্যে সংসারের কথাবার্তা টেনে আনার ব্যাপারটা আমার পক্ষে বিশেষ অস্বস্তিকর। সুতরাং চুপ করে রইলাম।

একটু পরেই বিলাসিনী দেবী চোখ খুললেন। আমাকে বললেন, "আগে খেয়ে নিন। তারপর কথা হবে।"

অগত্যা খাওয়াই শুরু করতে হলো। বিলাসিনী দেবী যে সেই সকাল থেকে অভুক্ত রয়েছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমি খেয়ে যাচ্ছি, আর একজন সকাল থেকে কিছু মুখে না-দিয়ে বসে থাকবেন তা কী করে হয়? আমি না-হয় অপেক্ষা করছি, বিলাসিনী দেবী খাওয়া-দাওয়া সেরে আসুন।

বিলাসিনী দেবী শান্তভাবে বললেন, "আজ আমার উপবাস। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

কৈলাশবাবুও অবাক হয়ে গেলেন। "পরশু তো উপোস ছিল। আজ তো কোনো উপোস নেই মা-জননী।"

মৃদু হাসলেন বিলাসিনী দেবী। "আছে, ঠাকুরমশাই। কোনো কারণ না থাকলে কেউ কি শুধু শুধু উপোস করে। আজ পমার জন্মদিন।

বিলাসিনী দেবী এবার আমার দিকে তাকালেন। "আপনার কথাবার্তাগুলো শুনে নিই। অতবড়ো ম্যানসন বাড়ি চালানো কী সোজা কাজ। আপনাদের কত কষ্ট!"

"কষ্ট আর কী!" আমি উত্তর দিই। "বরদাপ্রসন্নবাবু ওইভাবে হঠাৎ চলে গেলেন, এখনও ফিরলেন না।"

বিলাসিনী দেবীর এবার যেন মনে পড়ে গেলো। "ও হালদার মশায়। বৃন্দাবন থেকে জোড়া পোস্টকার্ডে একখানা চিঠি লিখেছিলেন আমাকে।"

কৈলাশবাবু বললেন, "আশ্চর্য লোক মশাই। লিখেছে, 'মা আমাকে খুঁটিতে বেঁধে রেখো না—আমার দড়ি লম্বা করে দাও।' মা-জননী অমনি লিখে দিতে বললেন, আপনার যতদিন খুশী তীর্থধর্ম করুন। থ্যাকারে ম্যানসনে তো অনেক কাজ করেছেন।"

এবার থ্যাকারে ম্যানসনের ব্যবসায়িক কথাবার্তা আরম্ভ করলাম। বললাম, "সমস্ত কলকাতা শহরে ভাড়ার বাজারে আগুন লেগেছে। মাসে মাসে ভাড়ার হার বেড়ে চলেছে। রাতারাতি টাকা রোজগার করে বড়লোক হবার আশায় এবং সুখের লোভে হাজার হাজার লোক ভারতবর্ষের সব প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে এই শহরে। তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই চাই—সুতরাং বাড়ির ভাড়া বেড়েই চলবে। যে ক'খানা ফ্ল্যাট ভাগ্যক্রমে খালি হয়েছে, সেগুলো কী হবে?"

বিলাসিনী দেবী মন দিয়েই আমার কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "আমি আর ক'দিন। কিন্তু পমার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে আমাকে। সুতরাং কী করলে ভবিষ্যৎ ভাল হতে পারে, বলুন।"

আমি বললাম, "দু'রকম পথ আছে। কেউ কেউ কম ভাড়া আর মোটা

সেলামী নিচ্ছেন। সেলামীর টাকায় পুরনো বাড়ি অনেকে মেরামত করছেন। মাছের তেলে মাছ ভাজা হলো। ঘর থেকে টাকা ঢালতে হলো না। আবার কেউ কেউ ওই সব হাঙ্গামায় না-গিয়ে যত বেশী সম্ভব টাকায় ভাড়াটে খুঁজছেন।”

বিলাসিনী দেবী মন দিয়েই আমার কথাবার্তা শুনে যাচ্ছেন। আমি বললাম, “যাই হোক, লিজ ছাড়া কেউ আজকাল কথা বলছেন না। থ্যাকারে ম্যানসনে বহুকাল ধরে একমাসের ভাড়া নিয়ে লোককে ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার যে ঢুকলো তার আর নড়বার চড়বার নাম নেই। ভাড়ার পরিমাণও তাঁরা বাড়াবেন না—মান্ধাতার আমলের যে রেট তাঁরা বাড়িওয়ালাকে ঠেকিয়ে দিচ্ছেন তাতে কর্পোরেশনের খাজনাও ওঠে না। এঁদের কোনো চক্ষুলজ্জা নেই—যাবার সময় এঁরা মোটা টাকা পকেটে পুরে অন্য লোককে ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। বাড়িওলার কথা একবারও ভাবে না।”

মৃদু হাসলেন বিলাসিনী দেবী। কিন্তু বিরক্ত হলেন না। এসব কথা আগেও তিনি শুনেছেন।

এবার আমি খালি ফ্ল্যাটগুলোর কথা বলতে লাগলাম। অনেকেই যে এর খোঁজখবর করছেন, এবং এ-বিষয়ে কীভাবে এগনো যেতে পারে সে-কথাও তুললাম।

এমন সময় একটা বুড়ো রাঁধুনি আমাদের সামনে হাজির হয়ে বললে, “মা একবার ভিতরে আসুন। আপনার টেলিফোন।”

“আমার টেলিফোন?” মা-জননী যেন একটু আশ্চর্য হলেন। এবং ভিতরে চলে গেলেন।

কৈলাশবাবু বললেন, “এ-বাড়িতে টেলিফোন ছিল না। পমা দিদিমণির জন্যেই ফোন হলো। দিদিমণির বন্ধুরা ক্লাসের পড়াশোনা জানবার জন্যে ফোন করে।”

এরপর বিচিত্র কাণ্ড। পনেরো মিনিট চুপচাপ বসে আছি, মা-জননীর দেখা নেই।

আরও আধঘণ্টা কাটলো। এখনও বিলাসিনী দেবী ফিরলেন না।

বিলাসিনী দেবী কি আমার কথা ভুলেই গেলেন? আমি গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

কে এমন টেলিফোন করলো যে আধঘণ্টা ধরে দেখা নেই? এ বিষয়ে মনে-মনে গবেষণা করে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটানো গেলো। ঘড়ির কাঁটা আরও কিছুটা ঘুরলো, কিন্তু ফল তেমন হলো না। এখনও বিলাসিনী দেবী জলসাঘরে ফিরলেন না।

একবার অন্যরকম মনে হলো। সংসারে নিরাসক্ত অথচ ধনবতী মহিলাদের জীবনযাত্রা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমার তেমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। হয়তো এইভাবেই তাঁরা একটা কাজের মধ্যেই অন্য কাজের

দিকে এগিয়ে যান এবং অর্ধসমাপ্ত প্রথম কাজের কথাটা তাঁদের মোটেই মনে থাকে না।

কৈলাশবাবু একবার উঁকি মেরে গেলেন। আমাকে তীর্থকাকের মতো বসে থাকতে দেখেও তিনি কোনো কথা বললেন না।

আরও কিছুক্ষণ পরে, আমার ধৈর্যের বাঁধ যখন ভাঙতে বসেছে তখন কৈলাশবাবু ফিরলেন। বললেন, "মা-জননী হঠাৎ আবার পুজোর ঘরে ঢুকলেন। এ রকম সাধারণত করেন না—নিশ্চয় কোনো এমার্জেন্সী প্রয়োজন হয়েছে।"

ঠাকুর ঘরের সঙ্গে এই ধরনের অর্ডিনারি, আর্জেন্ট অথবা এমার্জেন্সি যোগাযোগের রহস্য আমার কাছে অজ্ঞাত। সুতরাং মুখ বন্ধ করে মক্কেল মনিবের সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

কৈলাশবাবু আমার অবস্থাটা আন্দাজ করে নিজেও অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু তিনিও তো সামান্য কর্মচারি মাত্র! এমন অবস্থায় তিনি কীই বা করতে পারেন?

কৈলাশবাবু নিবেদন করলেন, "পুজোর ঘরে ঢুকে মা-জননীর বোধ হয় আপনার কথা খেয়াল হয়েছে। আমাকে ডেকে আপনাকে বলতে বললেন, থ্যাকারে ম্যানসন যেমন চলছে চলুক। খালি ফ্ল্যাটগুলো সম্বন্ধে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এ সম্বন্ধে পরে খবরাখবর দেবেন।"

গভীর নৈরাশ্য নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে সেদিন থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে এসেছি। একবার মনে হলো এদেশের মহিলা মালিকরা এমনই হন। কোনো ব্যাপারে সোজাসুজি সিদ্ধান্ত তাঁরা জানাতে পারেন না। এই কারণেই তাঁদের স্বার্থ ব্যাহত হয়; প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। আর যাঁরা কাজ করেন? তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কার কী এসে যায়?

কলকালি এই সময় আমার ঘরে উঁকি মারলো। চন্দ্রোদয় ভবনে আমার যাবার সংবাদটি যে আর গোপন নেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

"কলকালি, তুমি কিছু বলবে?" আমি সৌজন্যবশত প্রশ্ন করি।

বিনয়ে বিগলিত কলকালি এবার মাথা চুলকোতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "স্যর, থ্যাকারে ম্যানসনের সমস্ত পুরনো পাইপ নাকি পাল্টে ফেলা হবে?"

আমি নিরুত্তর। কিন্তু খবরটা সম্বন্ধে কলকালি এতোই নিশ্চিত যে, সে জানতে চাইলো এই পাইপ পাল্টানোর কাজ ঠিকাদার মারফৎ হবে, না দায়িত্বটা সে-ই পাবে।

আমি এখনও কথা বলছি না দেখে কলকালি ভাবলো, ব্যাপারটা এই মুহূর্তে সরকারীভাবে তাকে জানাতে আমি আগ্রহী নই।

কলকালির এই অত্যধিক ব্যগ্রতার কারণও এবার বেরিয়ে পড়লো। সে করজোড়ে নিবেদন করলো, কাজটা যদি তার হাতে না দেওয়া হয়, তাহলে অন্তত একটি অনুগ্রহ আমাকে দেখাতেই হবে। পাইপ পাল্টানোর এই চাঞ্চল্যকর খবরটা অন্তত একটি সপ্তাহ আমাকে গোপন রাখতেই হবে; নাহলে এই গরীব কলকালিকে শোচনীয় আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে। কলকালি আজ আর নিজের ব্যাপারটা গোপন রাখলো না।

থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়াটিয়াদের এমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য ———

পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শকুন্তলা চাওলা দূত মারফত আমার শরণাপন্ন হলেন। মেমসায়েব অবিলম্বেই আমার দর্শনাভিলাষিণী।

শকুন্তলা আজও শ্বেতশুভ্রসাজে নিজেকে সৌন্দর্যময়ী করেছেন। বাড়তি ঐশ্বর্যের মধ্যে করবীতে সদ্যফোটা বেলফুলের সুগন্ধী মালা জড়িয়েছেন। কপালে একটি লাল সিঁদুরের বিন্দু, প্রায় হাফগিনি সাইজের।

"কোথায় ছিলেন আপনি, মিস্টার শংকর? সকাল থেকে খুঁজেই পাচ্ছি না। আজ খুব ইচ্ছে ছিল আপনাকে দুপুরে খাওয়াবো। আজ আপনি নিশ্চয় আমাকে না বলতে পারতেন না।"

কারণটা কী হতে পারে আমি আন্দাজ করতে পারছি না। শকুন্তলা বললেন, "সকালবেলায় কালীঘাট থেকে ফিরে এসেই আপনার খবর করেছি—কিন্তু আপনি উধাও। গতকাল একটু বেরিয়েছিলাম। আমার মেয়েকে বলেছিলাম আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু....

একটু সলজ্জ দ্বিধার ভাব দেখালেন শকুন্তলা চাওলা। তারপর বললেন, "উর্বশীর আপনার ওপর খুব অভিমান। আপনি আমার সঙ্গে খানা খেয়েছেন, অথচ উর্বশীকে জামার মাপ নিতে দেন নি। পৃথিবীতে এই প্রথম কোনো পুরুষমানুষ আমার মেয়েকে সোজাসুজি না বলে দিয়েছে। ইউ আর এ গ্রেট ম্যান, মিস্টার শংকর!"

বুঝলাম, বিশেষ পদ্ধতিতে শকুন্তলা চাওলা আমাকে এবার আকাশে তুলতে চাইছেন। ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যে বললাম, "আমার জামার দরকার হলে অবশ্যই আপনার মেয়েকে বলবো।"

মিষ্টি হেসে শকুন্তলা বললেন, "ওর ধারণা, ওকেই আপনি পছন্দ করেন না; আমি নিজে রিকোয়েস্ট করলে আপনি নাকি নিশ্চয় শুনতেন। গত রাত্রেও অভিমানে সে আপনার সঙ্গে কথা বলেনি।"

অধমকে এমনভাবে স্মরণ করবার কারণ কী জানতে চাই এবার। শকুন্তলা মৃদু হেসে বললেন, "আজ আপনি কিছুতেই আমাকে ফিরিয়ে দিতেন না মিস্টার শংকর। আজ আমার জন্মদিন। কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। আপনার জন্যে দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তখনও দেখা নেই আপনার।"

মিসেস চাওলা এবার নিজের হাতে এক বাটি পায়েস এগিয়ে দিলেন। বললেন, "জেনুইন বেঙ্গলী বার্থ-ডে পায়েস। আমার এক বান্ধবীর কাছে এই রান্না শিখেছি।"

এই অবস্থায় না বলা প্রায় অসম্ভব। সৌজন্যের খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার পায়েস?"

ভারী সুন্দর হাসলেন শকুন্তলা চাওলা। মনে হবে যেন কোনো নিষ্পাপ গৃহবধূ। শকুন্তলা বললেন, "জন্মদিনে আমি কিছুই খাই না, মিস্টার শংকর। সেই ছোটবেলা থেকে আমার অভ্যাস। একবার আমার জন্মদিনে মাকে মিঠাই বানাতে বলেছিলাম। খুব গরীবের সংসার—মা মিঠাই বানাবেন কোথা থেকে? কিন্তু আমি বুঝতে চাইলাম না। এমন রাগ হলো যে উপোস করে রইলাম। পরের বারের জন্মদিনে, মা নিজেই রইলেন না এই পৃথিবীতে। জন্মদিনে আগেরবারের কথা মনে পড়ে গেলো। সেই

থেকে এই দিনটা উপোস করি। আফটার অল, জন্মের প্রথম দিনে কেউ তো বেশী খায় না—নার্সরা তো শুধু একটু মধু এবং জল খাইয়েই রেখে দেয়।”

পায়েস খাইয়েই বিদায় করলেন শকুন্তলা চাওলা। কোনো ব্যবসায়িক কথা তুললেন না। কিন্তু একটু পরেই শ্রীমান মদনা একগাল হেসে আমার আপিসে হাজির হলো।

এই ক'দিনে মদনার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শরীরের জেল্লা বেড়েছে, চুলগুলো চকচকে হয়েছে, এবং জামা-কাপড়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

আমি যে মদনার জামাকাপড় লক্ষ্য করেছি তা দেখে মদনা খুব খুশী হলো। একগাল হেসে গর্বের সঙ্গে বললো, “আণ্ডার-প্যাণ্ট ছাড়া সর্বাঙ্গ [illegible] ফরেন, স্যার। কী সব জিনিস স্যার, কী মোলায়েম! একবার এই সব [illegible] ইণ্ডিয়ান জিনিস আর গায়ে তুলতে চাইবেন না, স্যার। গেঞ্জি পর্যন্ত স্পেশাল—যেন জার্মান ইস্প্রিং দিয়ে তৈরি, একেবারে সেঁটে ধরে [illegible] শরীরটাকে ফুটবলের মতো হাল্কা করে রেখেছে, ইচ্ছে করলে নিজের বডি নিয়েই যেন লোফালুফি খেলা যায়।”

মদনার এই সরলতা আমার ভাল লাগে। নিজের সুখ দুঃখ কিছুই সে আমার কাছে চেপে রাখে না।

“আর কিছু না নিন, দুখানা ইনটারলকিং জার্মান গেঞ্জি হাতিয়ে নিন, আমার কথা শুনুন, স্যার', আমাকে পরামর্শ দেয় মদনা।

“তোমার কাজকর্ম কেমন হচ্ছে মদনা?” আমি প্রশ্ন করি।

একগাল হেসে মদনা বললো, “চুরি জোচ্চুরি পকেটমারি কোনো মানে হয় না স্যার। রাজা লাইন ক্যালকাটায় এই একটাই আছে স্যার—এই চাওলা মেমসায়েবের লাইন। টাকা-কে-টাকা, খানা-কে-খানা, প্রেসটিজ-কে-প্রেসটিজ।”

শেষোক্ত জিনিসটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। চোখ বড়ো বড়ো করে মদনা বললো, “কী বলছেন স্যার? কলকাতার কত বড় বড় লোক মেমসায়েবের স্পেশাল রুমে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন।”

মদনা এবার নিজের মনের কথাও বলে ফেললো। “পরের জন্মে স্যার লেখাপড়ায় ফাঁকি না দিয়ে বাপ-মায়ের কথা শুনে, বড় বড় এগজামিন দিয়ে গরমেণ্ট অফিসার হবার চেষ্টা করবো। আপনি তো এবারেই চেষ্টা করলে হতে পারতেন—কেন যে হলেন না!' আমার মেধা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মদনার অগাধ বিশ্বাস।

“তাতে কী লাভ হবে মদনা?” আমি প্রশ্ন করি।

চোখ বড়ো বড়ো করে মদনা বললো, “গট-গট করে ওপরে উঠে যাবেন ; যা খুশী খাবার অর্ডার দেবেন, আমি অর্ডার নেবার জন্যে দরজার বাইরে অ্যাটেনশন হয়ে থাকবো, যতক্ষণ খুশী দরজা বন্ধ করে রাখবেন, তারপর যখন খুশী গটগট করে চলে যাবেন। একটি আধলা বিল করবো না। বেয়ারারা পর্যন্ত একটি পয়সা বকশিস চাইবে না। এসব কী আর এমনি হয় স্যার—পেটে অনেক বিদ্যে আছে বলেই তো এইসব সুবিধে হয়েছে।”

মদনা এবার কাজের কথায় চলে এলো। “ঘরের খুব অসুবিধে হচ্ছে, স্যার। এতো সব বড় বড় লোকরা পায়ের ধুলো দিচ্ছেন যে মেমসায়েব খুব চিন্তায় পড়ে যাচ্ছেন। ট্রাফিক জ্যাম না হয়ে যায়।”

ট্রাফিক জ্যাম কথাটার ভারি সুন্দর প্রয়োগ করেছে মদনা। "ট্রাফিক জ্যাম হলে তোমার কী?" আমি মদনাকে নিরুৎসাহ করবার জন্য বললাম।

ঠোঁট উল্টোল মদনা। আমার সঙ্গে সে একমত হতে পারলো না।

সে বললো, "আপনি তো নিজের চোখে দেখেন নি, সেই জন্যে ওরকম বলছেন। মেমসায়েবের স্পেশাল রুমগুলোতে ভিড় দেখলে বড় বড় সায়েবরা ভীষণ রেগে যান। মোটা-মোটা বই উল্টে এতোসব লেখাপড়া শিখেছেন; কিন্তু দশ মিনিট ধৈর্য ধরতে পারেন না। একটু দেরি হলেই মুখ হাঁড়ি করে গটগট করে বেরিয়ে চলে যাবেন। আর কেউ চলে গেলে চাওলা মেমসায়েব খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।"

মদনা এবার মাথা চুলকে বললো, "কিছু খবর আছে নাকি স্যর? সকালবেলায় আপনাকে না-পেয়ে চাওলা মেমসায়েব বললেন, নিশ্চয় আপনি ঘরের ব্যাপারেই বেরিয়েছেন। আপনি স্যর একখানা ফ্ল্যাট ছাড়লেই আমার উন্নতি হয়ে যাবে!"

"খবর থাকলেই জানতে পারবে।" সুযোগ মতো মদনাকে পাঠানোর এই পদ্ধতিটা আমি পছন্দ করতে পারছি না। কিন্তু, আমার পছন্দ অনুযায়ী এইসব শক্তিমতী মহিলারা কেন চলবেন?

সন্ধ্যার একটু আগেই আমার ঘরে যে বিশিষ্ট অতিথির আবির্ভাব হলো তাঁর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

"কী ব্যাপার? এমনভাবে মুখ ব্যাজার করে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে আছো কেন?" গণপতিবাবুর গলা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

গণপতিবাবু হাসিমুখে বললেন, "তড়বড় করে, অথবা দুশ্চিন্তা করে কখনও লাভ হয় না। খুব তাড়াতাড়ি থাকলে অনেকে যেমন ট্যাক্সির সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে!"

আমার ঘরের সবেধন নীলমণি চেয়ারে বসে পড়ে গণপতিবাবু আমার বাবার প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, "তোমার বাবা বলতেন—তোমার 'পরে নাই ভুবনের ভার, হালের 'পরে মাঝি আছে করবে তরী পার।"

গণপতিবাবুকে আপ্যায়নের জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। তিনি বললেন, "আজ স্রেফ এক কাপ চা। অনেক কাজ আছে।"

খুব তাড়াতাড়ি স্পেশাল কাপে চা এসে গেলো। গণপতিবাবুর মতো লোককেও একটু বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারছি না বলে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। কিন্তু গরম চাকে দ্রুত ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টা থেকেই বুঝতে পারছি, গণপতিবাবুর সত্যিই তাড়া রয়েছে।

গণপতিবাবু যেন অন্তর্যামী! জিজ্ঞেস করলেন, "চন্দ্রোদয় ভবনের মা-জননীকে কেমন দেখলে?"

আমার চন্দ্রোদয় ভবনে যাবার সংবাদ গণপতিবাবু কী ভাবে পেলেন?

একটু হাসলেন গণপতিবাবু। তারপর বললেন, "ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন গণপতিবাবু। বললেন, "বড় খারাপ দিনে তুমি বিডন স্ট্রীটে গিয়েছিলে।"

গণপতিবাবু এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "হাতে কোনো কাজ নেই তো? চলো আমার সঙ্গে একটু।"

রাস্তায় বেরিয়ে গণপতিবাবু ফিস ফিস করে বললেন, "বিলাসিনী

দেবীর আজ বড় দুর্দিন।" তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সকালবেলায় তুমি যখন গিয়েছিলে তখন পমাকে দেখেছিলে?"

পমা! সেই মোমের পুতুলটি। তাকে তো একবারই মাত্র দেখেছিলাম অনেকদিন আগে। সেই ছবিটা তো এখনও ভুলতে পারিনি। সেই হাসিটি আমার এখনও মনে আছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গণপতিবাবু বললেন, "বড়ই দুঃসংবাদ। কাউকে বোলো না। খবরটা এখনও খুবই কনফিডেনশিয়াল। পমাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"পমাকে পাওয়া যাচ্ছে না!" নিজের অজান্তেই আমি গণপতিবাবুর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করি।

গণপতিবাবু বললেন, "তুমি যখন মা-জননীর সঙ্গে কথা বলছিলে সেই সময়েই তো টেলিফোন এলো।"

গণপতিবাবু জানালেন, "ফোন করেছিল, বাড়ির ড্রাইভার নগেন মান্না। দিদিমণিকে কলেজ থেকে আনতে গিয়ে সে হাঁ-করে আধঘণ্টা বসেছিল। তখনও খবর না-পেয়ে নগেন মান্না পমার ক্লাসের মেয়েদের কাছে খবর নিয়েছিল। তারপরেই সে সামনের স্টেশনারি দোকান থেকে মা-জননীকে ফোনে খবরটা দিয়েছিল।"

বিলাসিনী দেবীর বাড়িতে সেই মুহূর্তের নাটকটা এবার পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অকারণে আমি হাজার রকম সন্দেহ করে বসেছিলাম।

গণপতিবাবু বললেন, "যথাসময়ে আমার ডাক পড়েছে। আমার বাবুরাও অতশত জানেন না। তাঁরা শুধু বললেন, বিলাসিনী দেবী তোমাকে একবার জরুরি খবর পাঠিয়েছেন।"

সদর স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে আমরা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পড়েছি। রাস্তার কয়েকটা আলো জ্বলছে না। এ-পাড়ার কিছু লোক কয়েকটা পোস্টের ল্যাম্প সুপরিকল্পিতভাবে ভেঙে দেয়। সাময়িক অন্ধকারের এই গণ্ডী সৃষ্টি করে লোকগুলোর কী উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

গণপতিবাবু আজ এসব দিকে নজরই দিলেন না। পশ্চিম দিকের সরু ফুটপাথ ধরে গম্ভীরভাবে তিনি দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগলেন।

ভিড়ের চাপে আমি একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম, একটু থেমে তিনি আমার পাশে চলে এলেন। তারপর গণপতিবাবু শান্তভাবে বললেন, "এ-ব্যাপারে তোমার একটু সাহায্য প্রয়োজন হবে, শংকর।"

গণপতিবাবু বললেন, "এ-পাড়ার অন্য বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার আলাপ-সালাপ হয়ে গিয়েছে।"

হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসনের খুঁটিতেই তো সব সময় বাঁধা রয়েছি। বাইরে ঘোরাঘুরি করবার অবকাশ কোথায়? কর্পোরেশনের বাবু, ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের তারকাটা ইনসপেক্টর, টেলিফোনের পেটমোটা জগলাল মিস্ত্রি এবং কয়েকজন রিকশওয়ালা ছাড়া এ-পাড়ায় আর কাকে-

কাকে চিনি তা মনে করতে সচেষ্ট হলাম।

গণপতিবাবু বোধ হয় আমার এরকম অবস্থা আন্দাজ করেননি। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বললেন, "সেকালের লোকরা বলতেন লোকবলই বল। এ-যুগে কলকাতা শহরে লোকবল আর কোথায় পাবে? কিন্তু এখন হচ্ছে পরিচয়বলের যুগ। পরিচয় থাকলেই প্রয়োজনের সময় লোকবলের অভাব হয় না। সময় পেলেই লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে রাখবে।"

গণপতিবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা। তিনি ঠিকই বলেছেন, "প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয়বল কখন প্রয়োজন হবে, তার ঠিক নেই।"

গণপতিবাবু বললেন, "ভাবছিলাম, ভাবনানি ম্যানসন থেকেই শুরু করবো।"

আমি বললাম, "আশ্চর্য বাড়ি এই ভাবনানি ম্যানসন। ওর মধ্যে যে কী নেই তা ভেবে উঠতে পারি না।"

হাসলেন গণপতিবাবু। এবং আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, "আমার ফ্রেন্ড মদনার মুখে যা খবরাখবর পাই—তাতে মাথা ঘুরে যাবার কথা।"

"কলকাতা শহর বলে কথা! এতো সহজে মাথা ঘুরলে চলবে কেন?" সহাস্য মন্তব্য করেন গণপতিবাবু।

আমি বললাম, "ছোটখাট একটি পৃথিবী বলতে পারেন এই ভাবনানি ম্যানসনকে। ওখানে কী নেই? ওখানে দোকান আছে, আপিস আছে, কারখানা আছে, গেরস্ত ঘর আছে, দুর্নীতির জন্যে ছোট-ছোট খুপরি আছে, আবার শ্রীশ্রীঅমৃতানন্দ স্বামীর ভজনালয়ও আছে। বেআইনী অ্যাবরসনের গোপন চেম্বার আছে, আবার ছোটদের ইস্কুলও খোলা হলো।"

গনপতিবাবু বললেন, "এই তো এ-যুগের নিয়ম। ভাল-মন্দর সাড়ে বত্রিশ ভাজা সাজিয়ে না বসলে বিজনেস জমবে না। যে দুধ খাবে সে তামাক খাবে না এ-নীতি বোধ হয় একালের বড়লোকদের জন্যে নয়। যেসব বিজনেস-মেন ভিতরের রহস্যটা বুঝে নিয়েছে তারা হুড় হুড় করে এগিয়ে চলেছে। গীতায় সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে একালের বুদ্ধিমান লোকদের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধেও সেই একই মনোভাব। সুকর্ম কুকর্ম কোনোটা সম্বন্ধেই তাঁদের অত্যধিক টান নেই—যখন যা প্রয়োজন তাই করতে প্রস্তুত না-হলে বড়লোকরা আরও বড়লোক হতে পারবে না!"

ভাবনানি ম্যানসন প্রসঙ্গে অন্য কথা মনে পড়ে গেলো। গণপতিবাবুর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বললাম, "একদম কাউকে চিনি না বললে ভুল হবে। ভাবনানি ম্যানসনের এক্স-ম্যানেজার ভরত সিংকে দু-একবার দেখেছি। এখন বরুণা প্রপার্টিজের ডিরেকটার না কি হয়েছেন, ঠাকুরে ম্যানসনে ভরত সিং একবারও এসেছেন বলে উল্লেখ নেই। আমাদের মিসেস পপি বিশোয়াসের সংগে খুব আলাপ। প্রয়োজন হলে ওঁর কাছে আমরা অবশ্যই যেতে পারি। কোনো অসুবিধে হবে না। আমি বললে মিসেস পপি বিশোয়াস সঙ্গে-সঙ্গে ভরত সিংকে ডাইরেক্ট নম্বরে ফোন করে দেবেন।"

"ডাইরেক্ট নম্বরের ব্যাপারটা কী?" জানতে চাইলেন গণপতিবাবু। বহু ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ। আইনপাড়ায় এতোদিন ঘোরাঘুরি করেও গণপতিবাবু মনটা বেশ তাজা রেখেছেন।

আমি বললাম, "পপি বিশোয়াসের কাছে শুনেছি, বড় বড় লোকদের

দুটো করে টেলিফোন থাকে। একটা আপিসের বারোয়ারি নম্বর—শুধু বিজনেস টক-এর জন্যে। আর একটা স্পেশাল ডাইরেক্ট নম্বর, যার হদিশ খুব স্পেশাল লোক ছাড়া কাউকে দেওয়া হয় না। মিসেস পপি বিশোয়াসকে সবাই স্পেশাল ডাইরেক্ট নম্বরটাই দিয়ে রাখেন, না-হলে উনি ইনসালটেড ফিল করেন।"

মৃদু হাসলেন গণপতি সামন্ত।

আমি বললাম, "অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এই মিসেস পপি বিশোয়াসের। ওঁর স্পেশাল জানাশোনা লোকদের টেলিফোন নম্বর আঙুলের ডগায় সবসময় ঝুলছে। ইচ্ছে হলেই টকাটক ডায়াল করছেন। টেলিফোন ডিরেক-টারির ধার ধারেন না মিসেস বিশোয়াস। খুব দরকার হলে পার্স-এর মধ্য থেকে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বার করে ফেলেন। সেখানে শুধু পরের পর কয়েকটা নম্বর লেখা আছে, কোনো নাম নেই।

নাম না থাকলেও মিসেস পপি বিশোয়াসের কোনো অসুবিধে হয় না। নম্বর দেখলেই ওঁর নাম মনে পড়ে যায়। সবচেয়ে মজার হলো, যে-নম্বর লেখা আছে, সে নম্বর তিনি ডায়াল করেন না। প্রথম দুটো নম্বর থেকে দুই বিয়োগ করে শেষের দুটো নম্বরের সঙ্গে দুই যোগ করে কীভাবে অন্য একটা নম্বর তৈরি করেন।"

গণপতিবাবু আবার হাসলেন। বললেন, "মাতাহারি নাকি?"

আমি বললাম, "মাতাহারি কিনা ভগবান জানেন। তবে মিসেস পপি বিশোয়াস বলছিলেন, যাঁদের টেলিফোন নম্বর তাঁরাই নাকি কাঁচা নম্বরটা ওঁর খাতায় লিখিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করেন। যদি কখনও অন্য কারও হাতে কাগজটা পড়ে যায়, তাই বাধ্য হয়েই ওঁকে ওই স্পেশাল পপি কোড বার করতে হয়েছে, যার অর্থ পপি বিশোয়াস ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।"

"খুব মাথা আছে বলতে হবে" যেতে-যেতে মন্তব্য করলেন গণপতি সামন্ত।

আমি বললাম, "মিসেস বিশোয়াস নিজে এই কোড মাথা ঘামিয়ে বার করেননি। শিখেছেন ওই ভরত সিং-এর কাছ থেকে। পপি বিশোয়াস এবং আরও অনেকের নম্বর ওঁর পকেট-বুকে লেখা থাকে, কিন্তু এমনভাবে যে কেউ বুঝতে পারবে না।"

এই মুহূর্তে ভরত সিং-এর ডাইরেক্ট টেলিফোন নম্বর সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না গণপতিবাবু। ভরত সিং-এর যে-আত্মীয় এখন ভাবনানি ম্যানসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, এবং বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন কারণে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার সম্বন্ধেও আগ্রহ নেই গণপতিবাবুর।

খুব সাবধানে পরিস্থিতি বিবেচনা করেই যেন গণপতিবাবু বললেন, "ওই লেভেলে আমি এখন যেতেই চাই না। নিচুমহলের কাউকে একবার পাকড়াও করতে হবে।"

মদনার বন্ধু কেষ্টোর কথা মনে পড়ে গেলো। থ্যাকারে ম্যানসনের বিজ-নেস থেকে তাড়িত হয়ে কেষ্টো ভাবনানি ম্যানসনেই কী একটা চাকরি নিয়েছে শুনেছিলাম!

একটু খোঁজ করতেই কেষ্টোকে পাকড়াও করা গেলো। কেষ্টো আমাকে

দেখেই দুঃখ করতে লাগলো। "পেটের দায়ে এখানে স্যর সুইপারি করছি। ময়লা ঘেঁটে-ঘেঁটে হাতে ঘা হয়ে গেলো স্যর—কোনোরকমে পেটটা চলে যায়, জামাকাপড়ের খরচও ওঠে না।"

সহানুভূতি দেখলাম বেচারা কেষ্টোকে। বললাম, "কেন, কত মাইনে দেয় তোমাকে?"

মাথা চুলকে কেষ্টো বললো, "লিখিয়ে নেয় তো আড়াইশো টাকা। কিন্তু হাতে দেয় কই? আমি পাই একশ পাঁচ টাকা, বাকিটা যায় ম্যানেজার-বাবুর পকেটে। কিছু বলবার উপায় নেই। মুখ খুললেই, ম্যানেজারবাবু এখান থেকে বিদায় করে দেবেন। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলবে না, কারণ অন্য সুইপাররা আমাকে পছন্দ করে না। বেজাতের লোক বিদায় হলেই ওদের আনন্দ।"

কেষ্টো এবার কাতরভাবে অনুরোধ করলো, "আপনার ম্যানসনেই আমাকে একটা সুইপারের কাজ দিয়ে দিন। কলকালি, তেলকালির সঙ্গে আমাকে ঝাঁটাকালি বলে ডাকবেন।"

গণপতি এবার বললেন, "কেষ্টো ঝাঁটা হাতে সব ফ্ল্যাটেই নিশ্চয় তোমার যাতায়াত আছে। এ-বাড়িতে কখন কে আসছে তাও নিশ্চয় নজরে পড়ছে।"

কেষ্টো বললো, "আমি আর কতটুকু দেখি? গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সব-কিছুর ওপর নজর রাখে ওয়াচম্যান হনুমানপ্রসাদ। খুব হুঁশিয়ার আদমী এই হনুমানপ্রসাদ—ওকে ফাঁকি দিয়ে এখানে ঢোকা বা বেরনো খুব শক্ত।"

হনুমানপ্রসাদের সঙ্গে কেষ্টোই আমার ভাব করিয়ে দিলো। হনুমান-প্রসাদজীর হাতে একটি দু'টাকার নোট গুঁজে দিয়ে গণপতিবাবু পকেট থেকে ফস করে একটা ছবি বার করে ফেললেন। ছবিটা যে পমার তা আমি দেখেই বুঝতে পারলাম।

গণপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এই মহিলাকে আজ হনুমানপ্রসাদজী এখানে আসতে দেখেছেন কিনা।

হনুমানপ্রসাদজী ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে বেমালুম বললেন, আজ অবশ্যই এ-ধরনের কোনো জেনানাকে তিনি এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখেননি। কিন্তু এই মুখ হনুমানপ্রসাদজীর সম্পূর্ণ অচেনা নয়। অন্য কোনো একদিন নিশ্চয় এই মহিলাকে দেখেছেন তিনি।

হনুমানপ্রসাদজী বুদ্ধি দিলেন, একবার মেনজারবাবুর সঙ্গে বাতচিত করুন। তবে, দোহাই, হনুমানপ্রসাদজীর প্রসঙ্গ যেন সেখানে একেবারেই না ওঠে। কারণ, এ-বাড়িতে কে আসছেন বা কে যাচ্ছেন এ-খবর মেনজারবাবু ছাড়া আর কাউকে বলা সম্পূর্ণ নিষেধ।

ভাবনানি ম্যানসনের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহ বোধ করছেন না গণপতিবাবু।

পমা। পমার জন্যে সত্যি চিন্তা হচ্ছে আমার। মোমের পুতুলকে আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমার কাণ্ডকারখানায় ফিক করে হাসলেও, পমাকে বেশ সহজ সরল মনে হয়েছিল।

এই পমা কীভাবে হঠাৎ উধাও হয়? পমা যে ধনীর দুলালী, ইংরিজীতে যাকে বলে এয়ারেস, তা নিশ্চয় কলেজের বান্ধবীদেরও জানতে বাকি নেই।

এইসব উত্তরাধিকারীণীদের উচিত খুব সাবধানে চলা-ফেরা করা। প্রয়োজন হলে সঙ্গে একজন সাদা-পোশাকের রক্ষী রাখা উচিত। কয়েকদিন আগেই রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে, এইরকম এক উত্তরাধিকারিণী চুরির চাঞ্চল্যকর আমেরিকান গল্প পড়েছি। এইসব গল্প যে সত্যঘটনা অবলম্বনে লেখা তার ইঙ্গিতও বইয়ের মুখবন্ধে রয়েছে।

গল্পের বালিকাটি সুদর্শনা ও বিখ্যাত এক ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সাঁতার শিখতে গিয়েছিল সে সুইমিংপুলে। ওইখান থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে এক নির্জন বাগানের কাছে তিনজন মুখোশধারী গুন্ডা স্পেশাল কায়দায় সুশানকে সাইকেল থেকে ফেলে দিলো। তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সুশানকে অজ্ঞান করে ফেলে তারা গাড়ির মধ্যে পুরে ফেললো। প্রথমে সাইকেলটা তারা পথেই ফেলে এসেছিল। গাড়ি চালিয়ে কিছুক্ষণ যাবার পরে ব্যাপারটা তাদের খেয়াল হলো।

তখন গাড়ি আবার ফিরলো ঘটনাস্থলে। সাইকেলটা তখনও মুখ থুবড়ে রাস্তার একধারে পড়ে আছে। সাইকেলটা নিয়ে লোকগুলো বিপদে পড়বে বলে আমি আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। কারণ মুখোশধারীদের একজন সাইকেলটা একটু নেড়ে চেড়েই ব্যাপারটা বুঝে নিলো।

অর্ডিনারি জিনিস নয়, স্পেশাল আমেরিকান সাইকেল। চাপ দিয়ে দু-তিন ভাঁজ করে নেওয়া যায়। এই ধরনের সাইকেল মোটরগাড়ির বুটে রেখে ধনবান মার্কিনীরা প্রমোদভ্রমণে বের হন। মোটর চালিয়ে বেশ কিছু-দূর গিয়ে স্বাস্থ্যলোভী ধনীরা মোটরগাড়ির মোহমুক্ত হন। তখন গাড়ির বুট থেকে দোমড়ানো সাইকেল বেরিয়ে পড়ে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেটি পুরনো রূপে ফিরে আসে। তখন পেডাল করে স্বাস্থ্য, আনন্দ ও নিঃসঙ্গতার জন্যে খেয়ালী মার্কিনী একাকী অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

অচৈতন্য সুশানের সাইকেলটা দুষ্ট লোকগুলো এবার নিজেদের মোটর গাড়ির পিছনে তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরে পালিয়ে যাবার পথে একটা ব্রিজের ওপর গাড়ি থামালো ওরা। আমার প্রথমে ভয় হয়েছিল, অচৈতন্য সুশানকেই বুঝি ওরা নদীর জলে বিসর্জন দেবে। না, ওরা শুধু সাইকেলটাই নদীর বুকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়েছিল। সুশানকে ওরা হারাতে চায় না, কারণ তার পরিবর্তেই তো ওর বাবার কাছ থেকে কয়েক লক্ষ ডলার দাবি করবে।

পমার প্রসঙ্গে সুশানের কথা মনে পড়তেই আমার সমস্ত শরীরটা শির-শির করে উঠলো। আমেরিকান কায়দায় অনেক কান্ডকারখানাই তো এখানে শুরু হয়ে গিয়েছে। কাউকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ আদায় করার ব্যাপারটা এখানেও আর অভিনব নয়।

ঘুমোতে যাবার আগে পড়া রোমহর্ষক গল্পটার চরিত্রগুলো আমি ভুলতে পারছি না। ভাবনানি ম্যানসনের চত্বরে দাঁড়িয়েই আমার মনে পড়লো, তিন-জন মুখোশধারীর তিনরকম চরিত্র। নাটের গুরুটি একটি সুপরিচিত গুন্ডা। সবরকমের দোষ আছে লোকটির। এর আগে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে আধডজন কিডন্যাপ কেসে সফল হয়েছেন এবং বহু অর্থ উপার্জন

করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই সঞ্চয় করা সম্ভব হয়নি—কোনো এক জুয়ার আড্ডায় এই দুষ্টটি সর্বস্বান্ত হয়ে আবার অর্থের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন।

এক নম্বর দুষ্টু কিন্তু কখনও একা কোনো কাজ হাসিল করেন না। সবসময় দু'একজন সহযোগী জুটিয়ে নেন। এবারের দু'জন সহযোগী দুই প্রকৃতির। একজন সুশানের বাবার ব্যবসায়ের প্রাক্তন কর্মচারি। কোনো এক ব্যাপারে ভীষণ রেগে গিয়ে সুশানের বাবা এই লোকটিকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অন্যায় অপমানের বদলা নেবার জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সুশানের বাবার প্রচণ্ড ক্ষতি দেখা না-পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম নেই।

তৃতীয় ব্যক্তিটিও বেশ জটিল চরিত্রের। সুশানের মায়ের প্রেমিক। গোপন অভিসারের এই নায়কটির সুশান জননীর ওপর বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সুশান-জননীর মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। কন্যা বয়সিনী হতে চলেছে এবং মাকে এবার শান্ত হতে হবে এই যুক্তিতে তিনি সুশানের পিতার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ফিরিয়ে এনেছেন এবং প্রথম সুযোগেই কোনোরকম শৈথিল্য প্রদর্শন না করে তৃতীয় ব্যক্তিকে তাঁর জীবনপথ থেকে বিনা বাক্যব্যয়ে সরিয়ে দিয়েছেন।

গল্পটার কথা যতই মনে হচ্ছে ততই ভয় বাড়ছে আমার। কে না জানে পমার পিছনে বিপুল ঐশ্বর্য আছে? গুপ্তবাড়িতে অথবা তাঁদের ব্যবসায়ে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত কোনো কর্মচারি এক আধজন থাকাও অসম্ভব নয়। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের যে ভয়াবহ অবনতি এদেশে হঠাৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে কখন কী হয় বলা যায় না। তৃতীয় লোকটির কথা সৌভাগ্যক্রমে এ প্রসঙ্গে ভাববার প্রয়োজন নেই।

গল্পের শেষ পাতাটি না-পড়া পর্যন্ত সেরাত্রে ঘুমোতে যেতে পারিনি। সুশানের বাবা মুক্তিপণ দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু একমাত্র অর্থেই সব সমস্যার সমাধান এই জটিল সমাজে আর সম্ভব নয়। সুশানকে কেন্দ্র করে তিনজন মানুষ তিন প্রত্যাশা পূরণের জন্য অর্ধ-উন্মাদের মতো ব্যবহার করছে। দলনেতা চায় অর্থ, দ্বিতীয় জনের অর্থে কোনো লোভ নেই—কিন্তু প্রতিশোধ অবশ্যই চাই-চাই। তৃতীয় জনের হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুনে উত্তপ্ত বিদ্বেষবিষ নেই ; কিন্তু সুশান-জননীর প্রেমের স্বর্ণভাণ্ডটি তাকে ফিরে পেতেই হবে—ভিক্ষায় না পেলে লুণ্ঠনেও আপত্তি নেই তার।

দলপতি অর্থের বিনিময়ে এখনই সমস্যা মিটিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—কারণ জুয়াখেলার নেশা তাঁর প্রাচীন রক্তে আবার জেগে উঠেছে। কিন্তু অপর দু'জনও এই কুকর্মের সমান অংশীদার—রিক্ত হাতে ফিরে যেতে তাঁরা মোটেই প্রস্তুত নন। তাঁদের প্রাপ্য 'পাউণ্ড-অফ-ফ্লেশ' কোথায়?

গল্পের পরিণতি বিয়োগান্ত। সুশান ও তিনজন কিডন্যাপার উপন্যাসের শেষ পাতায় চরম মূল্য দিয়েছে। তিনটি রিভলবারের তিনটি গুলিতে ঝাঁঝরা সুশানের মৃতদেহ শেষপর্যন্ত পুলিস তার বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এবার পমার কথা স্মরণ হতেই কেন জানি না ভীষণ চিন্তা বেড়ে গেলো। গণপতিবাবু এতো শান্তভাবে সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করছেন কেন তাও আমি বুঝতে পারছি না।

আমি জানতে চাইলাম, "আপনি এখনও থানায় যাচ্ছেন না কেন? এখানকার থানায় আপনার অত পরিচিত গণেশবাবু রয়েছেন। আমার তো মনে হয় আর দেরি করা উচিত নয়।"

গণপতিবাবু বললেন, "থানা তো পড়েই আছে। থানার দরজায় তো কখনই খিল পড়ে না। সুতরাং গেলেই হবে।"

গণপতিবাবু এবার আমাকে নিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনের দিকেই ফিরতে লাগলেন। থ্যাকারে ম্যানসনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গণপতিবাবু একটা বিড়ি ধরালেন। বললেন, "তখন থেকে ঘুরছি। দুশ্চিন্তায় বিড়ি ধরাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছি।"

বিড়িতে একটা লম্বা টান দিলেন গণপতিবাবু। বললেন, "বড় খারাপ নেশা। আমাকে এ-লাইনে ঢুকিয়েছিল খড়িয়ান বসু রিসিভার এস্টেটের জাঁদরেল গোমস্তা, তোমার বাবার কর্মচারি বরদা মণ্ডল। চাকরি-বাকরিতে যতই উন্নতি হোক, খবরদার এ-নেশাটা কোরো না," আমাকে উপদেশ দিলো গণপতিবাবু। বললেন, "বিড়ি-সিগ্রেট মানুষকে একেবারে কেনা-চাকর করে রাখে।"

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে গণপতিবাবু বললেন, "তোমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনেও একবার খবর নাও। তবে দারোয়ানের কাছে নয়। এ-বাড়ির দু-খানা মুখ। সুতরাং দারোয়ানের পক্ষে সব জানাও সম্ভ নয়।"

দারোয়ান ছাড়া কাকে কী জিজ্ঞেস করি? অকস্মাৎ মদনার কথা মনে পড়ে গেলো।

"মদনা ছেলেটি কে?" জিজ্ঞেস করলেন গণপতিবাবু।

এ-পাড়ার গেজেট এবং আমার স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট। আত্মোন্নতির জন্যে পৈতৃক পেশা ছেড়ে বিভিন্ন লাইনে চেষ্টা করে দেখছে।"

মদনা এলো। কিন্তু হাঁপাতে-হাঁপাতে। দেখেই মনে হয় ভীষণ ব্যস্ত, ছুটে এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে মদনা কখনও এরকম ব্যস্ততা দেখায় না।

গণপতিবাবুকেও একটা সেলাম ঠুকলো মদনা। "সব সময় তুমি এভাবে সেলাম করো কেন, মদনা? আমি বকুনি লাগাই। আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান অক্ষত রেখেই মদনা বড় হয়ে উঠুক এই আমি চাই।

মদনা আমার কথায় অবাক হয়ে গেলো। "কী বলছেন, স্যার? সেলাম না করলে সায়েবরা অসন্তুষ্ট হবেন। চাওলা মেমসায়েব বলে দিয়েছেন, চাকর-বাকর সেলাম না করলে বড় বড় গেস্টরা ভাবেন তাঁদের অপমান করা হচ্ছে। সব সময় সেলাম করে যাবে, এতে তোমাদের শরীরও ফিট থাকবে।" মদনা এবার করুণভাবে বললো, "সেলাম করবো না স্যার? সেলাম করার জন্যে তো আমার গাঁটের কড়ি খরচ হয় না।"

মদনা যে ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করছে তা বুঝতে পারছি। মদনা বললো, "খুব জরুরী কাজ। ভুল হলে চাকরি থাকবে না।"

"মদনা, খুব সুন্দরী অচেনা কোনো মেয়েকে আজ এদিকে আসতে দেখেছো?" গণপতিবাবু নিজেই জিজ্ঞেস করলেন।

মদনা মাথা চুলকোতে লাগলো। গণপতিবাবু এবার ছবিটা দেখালেন মদনাকে। এবং ছবি দেখেই মদনা অবাক। "এঁকে তো দেখেছি! সেদিনই তো আমাদের দোকানে চাইনীজ খেতে এসেছিলেন।"

মদনা বললো, "আমি উঠি স্যর। এ'রই তো আজ আমাদের ওখানে আসবার কথা। সেই এগারোটা থেকে হাঁ করে আছি। মেমসায়েব বলে দিয়েছেন যেন কোনোরকম অসুবিধে না হয়। কিন্তু এখনও এলেন না।"

মদনা বললো, "আর দাঁড়াবো না, স্যর। চাওলা মেমসায়েব আমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। এসে যদি শোনেন, ওঁরা এসেছিলেন অথচ আমি ছিলাম না তা হলে চাকরি থাকবে না।"

গম্ভীরভাবে গণপতি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের মনেই বললেন, "অন্নপূর্ণা নিজেই ভিখারিণী! নিজের বাড়িতেই ফ্ল্যাট ভাড়া খুঁজছেন!"

আমি ব্যাপারটা আরও বুঝবার আগেই গণপতিবাবু বললেন, "তুমি বোসো। আমি এখনই থানায় গণেশ দারোগার সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।"

একটু পরেই গণেশবাবুর ব্যক্তিগত সহায়তায় গণপতিবাবু নিখোঁজ পমার রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। ভাবনানি ম্যানসনের গেস্টরুমে বিপুলভূষণ বারিক মাস্টারমশায়ের সঙ্গেই পমাকে পাওয়া গিয়েছিল। মালিকের নির্দেশে ম্যানেজারবাবু বারিকমশায়কে খুব খাতির করেই আতিথ্য দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা শকুন্তলা চাওলারও অজানা ছিল না। কারণ তাঁর গেস্টরুমেই আশ্রয় নেবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসনে আচমকা পরিচিত মুখ দেখতে পাবার আশংকায় বিপুলভূষণ বারিক মাস্টারমশায় শেষ মুহূর্তে ভাবনানি ম্যানসনে চলে গিয়েছিলেন।

চুপি চুপি কাজ শেষ করে এস-আই গণেশবাবু বলেছিলেন, "থানা পুলিস করে হাঙগামা বাড়াবেন না। লোক হাসাহাসি ছাড়া কিছুই হবে না। কোর্টঘর করেও কিছু সুবিধে হবে না—কারণ, পমা নিজেই বলছে পরশুদিন তার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে।"

পমাকে আমি দূর থেকেই দেখলাম। শান্তভাবে সে ট্যাকসির মধ্যে বসে আছে। দূরে মাস্টারমশায় বিপুলভূষণ বারিককেও দেখলাম। একটা সিগারেটের পোড়া অংশ রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ট্যাক্সির সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়লেন। এই ভদ্রলোককে বিলাসিনী দেবী কোনোক্রমেই ক্ষমা করবেন কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ।

রয়াল রোমান্স!" আমার কানে-কানে চুপি-চুপি বললেন গণপতিবাবু। "গণেশবাবু না-থাকলে খুব হাঙগামায় পড়তে হতো। এখন ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। আচ্ছা পরে দেখা হবে", এই বলে গণপতিবাবু ট্যাক্সির মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং গাড়িটা দ্রুত স্টার্ট নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চন্দ্রোদয় ভবনে সেদিন সুখের অস্তিত্ব ছিল না। পমা দিদিমণির কলেজ থেকে বাড়ি না-ফেরার খবর আসবার পর থেকেই অদ্ভুত এক অন্ধকার নেমে এসেছিল সমস্ত প্রাসাদে।

এ-বাড়ির সব কিছুই অতীতের স্মৃতি বহন করে। অতীতের মর্যাদা ভরসা করেই এরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাকর-বাকর, দারোয়ান, কর্মচারি, পূজারী

সবাই পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিজের হাতে চাকরি দেওয়া লোক। শ্বশুরের মৃত্যুর পরও বিলাসিনী দেবী সবদিক বহাল রেখে এস্টেট এবং সংসার দুইই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সংসারে তাঁর বিশেষ কোনো টান নেই।

বিলাসিনী দেবী নিজেই বলতেন, "আমি তো বদলী। আসল লোকরা কদিন উপস্থিত না থাকায় আমাকে ডিউটি দিতে হচ্ছে। বদলীর কখনও কাজে মন বসে?"

বিলাসিনী দেবীর এই মনোভাব ধীরে ধীরে এ-বাড়ির সমস্ত কর্মচারির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের যা-কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি তা সব সুদূর অতীতের, বিলাসিনী দেবীর শ্বশুর মহাশয়ের আমলের। ঘটবার মতো যা কিছু ঘটনা তা সেই সময়েই ঘটে গিয়েছে—তারপর এ-বাড়ির ঘড়ি যেন বন্ধ হয়ে আছে।

ঘড়ি বন্ধ হলেও নাটকের শেষ অধ্যায় আসেনি। সবাই জানে এ-বাড়ির সব কিছুই অতীত—বর্তমান এখানে কোনো রকমে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করছে বদলী চাকরের মতো—এবং ভবিষ্যৎ বলতে একমাত্র পমা। পমা দিদিমণির তাই এখানে বিশেষ গুরুত্ব।

পমা দিদিমণির কলেজ থেকে না-ফেরার খবর আসার পরই কৈলাসবাবু নিজেই মা-বিপত্তারিণীর পুজো শুরু করেছিলেন। "মা মঙ্গলচন্ডী, তুমিই দুর্গতিনাশিনী। এই মহাবিপদ থেকে পার করো আমাদের। যত ফুল চাইবে তত এনে দেবো আমি।" পমা দিদিমণির যে কোনদিন কিছু ঘটতে পারে তার জন্যে এ-বাড়ির কেউই তৈরি ছিল না।

গণপতিবাবুর সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকারের পর বিলাসিনী দেবী নিজেও সেই যে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলেন আর বেরোননি। তাঁর একমাত্র কথা ঃ আমি যদি সতী হই, সমস্ত অন্তর দিয়ে যদি শ্বশুরের পদসেবা করে থাকি তাহলে পমার কোনো ক্ষতি হবে না। কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। সে নিরাপদে ফিরে আসবে।

কৈলাসবাবু তখনই পুলিসে খবর দেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা গণপতিবাবুর ওপর চাপিয়ে দিয়েই বিলাসিনী দেবী নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "গণপতিবাবু বিচক্ষণ লোক, পুলিসে খবর দেবার হলে তিনিই দেবেন।"

কৈলাসবাবুকেও চুপচাপ বসিয়ে রাখেননি বিলাসিনী দেবী। তাঁর ওপর অন্য দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল। সিন্দুক খুলে পমার জন্মপত্রিকা বার করেছিলেন বিলাসিনী দেবী এবং সেই কাগজ নিয়ে কৈলাসবাবু ছুটেছিলেন সাঁতরাগাছির জান—বাড়িতে।—জন ওভার দি স্কাই, হিজ হাইনেস লর্ড কিচেনার কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

ট্যাক্সি করে সাঁতরাগাছির জান-বাড়ি থেকে দ্রুত ফিরে এসেছিলেন কৈলাশবাবু। জটিল গণনার শেষে জান বলেছেন, "এখনও কোনো বিপদ হয়নি। নিরাপত্তাযোগ প্রচন্ড থাকায় আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু তার মধ্যেই উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করতে পারলে ভাল হয়।"

গণপতিবাবু প্রথম একদফা খোঁজখবর করে চন্দ্রোদয় ভবনে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে এসেছিলেন। জান-বাড়ির রিপোর্ট কৈলাশবাবু তাঁকে দেখিয়েছিলেন। জান-বাড়ির ওপর গণপতিবাবুর কীরকম বিশ্বাস আছে জানি না। তিনি রিপোর্ট শুনে বলেছিলেন, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু কোথায়

খুঁজবো ?”

কৈলাশবাবু বললেন, সে-কথাও তিনি জিজ্ঞেস করতে ভোলেননি। জান বলেছেন, এখনও নিকটেই আছেন, দিদিমণি। খুব সম্ভবত ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত অঞ্চলে। জানের এই শেষ মৌখিক উপদেশটি কৈলাশবাবু তখনও মা-জননীকে জানাতে সাহস করেননি।

গণপতিবাবু এরপর কিছুক্ষণ গোপন আলোচনা করেছিলেন বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে এবং আবার বেরিয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রোদয় ভবন থেকে।

নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত গণপতি সামন্ত হাজির হয়েছিলেন এই থ্যাকারে ম্যানসনে।

এতো জায়গা থাকতে কেন তিনি এই পাড়ায় হাজির হয়েছিলেন এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তা প্রথমে আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। প্রশ্নটা আমার মনে জেগেও ওঠেনি।

গণপতিবাবু আমার কাছে অনেকদিন পরে এসেছেন, আমার খোঁজখবর করেছেন তাতেই আমি ধন্য। তাছাড়া তখন তিনি বিপদে পড়েছেন, পমাকে খুঁজে বার করবার দুরূহ চেষ্টায় তিনি হয়তো সবার কাছে খোঁজ খবর নিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং সেই প্রসঙ্গে হয়তো আমার কথাও তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত এই থ্যাকারে পাড়াতেই যে পমা দিদিমণির খোঁজখবর পাওয়া যাবে তা আন্দাজ করলেন কী করে গণপতিবাবু ?

সেই রাত্রে উত্তেজনার মাথায় বাড়তি কোনো প্রশ্ন করা সম্ভব হয়নি। গণপতিবাবু তখন পুলিস, পমা এবং পলাতক বিপুলভূষণ বারিককে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন।

ট্যাক্সি চড়ে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নেবার আগে গণপতিবাবু আমাকে বলেছিলেন, “এসব সীন দেখে ঘাবড়ে যেও না।”

সত্যি বড়ঘরের বড় ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি একটু চিন্তিত হয়েই পড়েছিলাম।

গণপতিবাবু ফিসফিস করে বললেন, “হরি-উকিলের ছেলে না তুমি? আইন নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করে, তারা জন্মমৃত্যু, বিবাহ, ভাব-ভালবাসা লেঠোলেঠি খুনোখুনি কিছুতেই চমকে যায় না—যখন যে-অবস্থায় পড়বে সেই অনুযায়ী কাজ করবে।”

সর্দারজীর ট্যাক্সিতে তখন পমা দিদিমণিকে তোলা হচ্ছে। খুবই গম্ভীর মুখ তার। এইভাবে ট্যাক্সির মধ্যে উঠে বসে আবার নর্থ ক্যালকাটায় সুড়-সুড় করে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছাই যেন নেই বিলাসিনী দেবীর একমাত্র সন্তান পমার মনে।

গণপতিবাবুর মুখে-চোখে তখনও কোনো উদ্বেগ নেই। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির দিকে নজর রেখে গণপতিবাবু আমাকে বলেছিলেন, “আইন-আদালতে আমাদের মতো মানুষদের কথা ভেবেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ হয় বলেছিলেন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।”

সামনে অমন নাটকীয় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, অথচ গণপতিবাবুর কোনো দুশ্চিন্তা নেই, আপন মনে রামকৃষ্ণ বাণী আওড়ে যাচ্ছেন। আমাকে বললেন, "কথামৃতখানা আমি পড়িনি। তোমার বাবার মুখে শুনে-শুনে কিছু কিছু লাইন মুখস্ত হয়ে আছে। মোক্ষম সময়ে খুব কাজে লেগে যায়।"

গণপতিবাবু ঐ পরিবেশে রাতের অন্ধকারে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ও সদর স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আপন মনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। "জানো শংকর, যত বয়স বাড়ছে তত বুঝছি, আমাদের মনের মধ্যে একজন করে জজ সায়েব গম্ভীর মুখে এজলাস আলো করে বসে আছেন! কেস্-ল ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতে চান না, তাই মহাপুরুষদের বাণী এবং জীবনের ঘটনা [illegible]-থাকলে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার খুব সুবিধে হয়।"

গণপতিবাবু কেমন মিষ্টি করে কথা বলছিলেন, আমার সঙ্গে। [illegible] বিপুলভূষণ বারিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তিনি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। অথচ আমার চাকরির সময় বিডন স্ট্রীটে এই বিপুল বারিকের [illegible] গণপতিবাবু কেমন মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলেছিলেন তা আমার মনে আছে।

ফিনলে কোম্পানির 'সাচ্চা হীরা' আদ্দির ফিন ফিনে পাঞ্জাবি পরে বিপুলভূষণ বারিক রাস্তার ধারে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা সিগারেটের শেষাংশে লম্বা টান দিয়ে তিনি জ্বলন্ত টুকরোটা ফুটপাতের ওপর ফেলে দিলেন এবং নিজের খেয়ালেই সেটা পদদলিত করলেন।

গণপতিবাবু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী ঠিক করলেন, মিস্টার বারিক?"

মিস্টার বারিক বোধ হয় ওই দলে যোগ দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে খুব উৎসাহ বোধ করছিলেন না।

কিন্তু গণপতিবাবু গম্ভীরভাবে নিবেদন করলেন, "আপনি তো জানেন, পুলিসের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলেছি। পুলিসের মতামত : এ-পাড়ায় এই ভাবনানি অথবা থ্যাকারে ম্যানসনের সামনে কোনো রকম বাড়তি হাঙ্গামা সৃষ্টি না-হওয়াই ভাল। যা-কিছু মতভেদ তার শুরু বিডন স্ট্রীটের চন্দ্রোদয় ভবনে হলে সব দিক দিয়েই সুবিধে।"

বিপুলভূষণ বারিক তখনও গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার ওপর। গণপতিবাবু এবার গলাটা আরও ভারী করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, "আমি বাইরের লোক, মিস্টার বারিক। পমাকে খুঁজে বার করে একবার মা-জননীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ। সেটা বিনা হাঙ্গামায় করতে পারলে আমার শান্তি। আপনাদেরও সুবিধে।"

মানে? "বিপুলবাবু এই পরিস্থিতিতে যে একটু অস্বস্তি বোধ করেছেন তা তাঁর কথাবর্তার ভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছিল।"

গণপতি সামন্ত তখন গম্ভীর হয়ে নিবেদন করলেন, "দেখুন, বিপুল-বাবু, আপনি মাস্টার লোক। আপনার জ্ঞানগম্যি আদালতের এই তদ্বির-কারকের থেকে অনেক বেশী বলেই আশা করা যায়। আপনি শুধু জেনে রাখুন, এখন কোনো হাঙ্গামা হলে আমরা তিনপক্ষ মিলে তা মেটাতে পারবো না। হাঙ্গামা মানেই পুলিস। এবং পুলিস মানেই ম্যাজিসট্রেটের কোর্ট। ম্যাজিসট্রেটের কোর্ট মানেই উকিল-মোক্তার এবং খবরের কাগজে পাবলিসিটি।"

বিপুলভূষণ বারিক তখনও কীসব ভেবে চলেছেন। গণপতি এবার

বললেন, "হয়তো এসব হাঙ্গামা সামলানোর ক্ষমতা আপনার আছে। সবাই অবশ্যই এসবে ভয় পায় না, তা হলে কোর্টে এতো মামলা হতো না এবং কোর্ট কাছারিতে এতো ভিড় থাকতো না। কিন্তু এক্ষেত্রে বাড়তি একটু বিপদ আছে।"

বাড়তি এই বিপদের কথা শুনেই বিপুলভূষণ বারিক একটু চনমন করে উঠলেন। আড়চোখে তিনি গণপতি সামন্তের দিকে তাকালেন। অকুস্থলে এই আইন এক্সপার্টের আকস্মিক আবির্ভাব যে তাঁকে খুব সন্তুষ্ট করেনি এই মনোভাব তিনি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন না।

গণপতিবাবু মোটেই দমে গেলেন না। বললেন, "আইনের ব্যাপারটা মোটেই সোজাসুজি নড়ে না, মিস্টার বারিক। এইটাই আমাদের দুঃখ। আমি যা বলতে যাচ্ছি, তাতে আমার ওপর দোষ নেবেন না—দেশের আইন-কানুন ইংরেজরা এইভাবেই তৈরি করে দিয়েছে, এবং তারা চলে যাবার পরেও দেশটা ঠিক সেইভাবে চলেছে।"

বিপুলভূষণ বিরক্তভাবে এবার গণপতিবাবুর দিকে তাকিয়েছিলেন। ট্যাক্সির সর্দারজী ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই রেখেছেন, তিনি রাজপথে এই দীর্ঘ সংলাপের অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না।

গণপতিবাবু এবার বললেন, "সমস্যাটা কী জানেন, মিস্টার বারিক?"

বিপুলভূষণ বারিক এখনও মেজাজ নরম করেননি। তিনি মন্তব্য করলেন, "থামলেন কেন ? যা বলতে চাইছেন, বলে ফেলুন!"

গণপতি এরপর আর দ্বিধা করেননি। অপ্রিয় সত্যটাই বিপুলভূষণ বারিককে জানিয়ে দিলেন। মিস্টার বারিক, মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলমাল করার পক্ষে এই রাত্রিবেলাটা মোটেই ভাল সময় নয়। এখন তেমন কোনো গোলমাল থাকলে, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্য থানায় ছুটতেই হবে। থানার ব্যাপার তো জানেনই ? কোনো মেয়েকে কোনো অজানা জায়গা থেকে তার বাবা-মা উদ্ধার করেছে শুনলে, তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। তারা প্রথমে বাবা-মায়ের কথাই বিশ্বাস করে বসে থাকবে। তখন যদি কোনো আপত্তি ওঠে, কোনো গোলমাল হয় তারা বলবে এসব কথা ম্যাজিসট্রেটের সামনে বলা হোক, আমরা ওসব শুনে কী করবো ?"

গণপতিবাবু এর পর একটু থেমেছিলেন। তারপর নাটকীয় কায়দায় বলেছিলেন, "এই পর্যন্ত মন্দ নয়। ম্যাজিসট্রেটের কাছে আপনার সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা বলতে দ্বিধা নাও থাকতে পারে। কিন্তু দুঃখের কথা এই রাত দুপুরে ম্যাজিসট্রেটকে পাওয়া যায় না। খুব তাড়াতাড়ি হলেও, সকাল এগারো-টার আগে ম্যাজিসট্রেট সায়েবের কোর্টে কাউকে পাওয়া যায় না। এই সময়টুকু পুলিসের হেফাজতে থাকা ছাড়া উপায় নেই।"

হেফাজত মানেই যে পুলিসের লক-আপ তা বোধহয় বিপুলভূষণ বারিক এই প্রথম বুঝতে পারলেন। এবং ব্যাপারটা মাথায় ঢোকামাত্রই একটু নরম হয়ে পড়েছিলেন।

গণপতিবাবু তখনও থামলেন না। বললেন, "এ-ক্ষেত্রে আরও একটু মুশকিল রয়েছে। আগামীকাল রবিবার, সুতরাং ম্যাজিসট্রেট সায়েবের নাগাল পেতে আরও চব্বিশ ঘণ্টা লেগে যাবে।"

এরপর গণপতিবাবু বেশ নরম হয়ে গিয়েছিলেন। গলার স্বর নিচু করে

বিপুলভূষণ বারিককে বলেছিলেন, "তার থেকে চলুন না একবার চন্দ্রোদয় ভবনে। মা-জননীর সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি কী?"

"এমনও তো হয়, দুধে আমি মিশে যায়, আঁটি পড়ে গড়াগড়ি খায়, আমরাই শেষে অপ্রিয় কথাবার্তার জন্যে আপনাদের কাছে চিরকাল দোষী হয়ে থাকবো।" বিনীত নিবেদন করেছিলেন গণপতিবাবু।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল হয়েছিল। বিপুলভূষণ বারিক মহাশয় আর বিলম্ব করেননি। তাঁর ধবধবে পাঞ্জাবি ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে। পকেট থেকে সুগন্ধী রুমাল বার করে ঘাড়টা মুছে নিয়ে, কোনোরকম মন্তব্য না করে বিপুলভূষণ বারিক এবার ট্যাক্সির মধ্যে বসে পড়েছিলেন।

চলমান ট্যাক্সি থেকেই গণপতিবাবু আমাকে বলেছিলেন, "অসংখ্য ধন্যবাদ। বোধ হয় কালকেই তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।"

দেখা হচ্ছে, কিন্তু কোথায়? গণপতিবাবু আমাকেই ওঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা বললেন কিনা তাড়াতাড়ির মাথায় ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

আজ আমার হাতে কাজকর্ম তেমন নেই। কিন্তু হাইকোর্ট পাড়া এবং গণপতিবাবুর সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করবারও কোনো উপায় নেই।

কিন্তু আমাকে বেশী ছটফট করতে হলো না। দুপুরের দিকে গণপতিবাবু নিজেই আমাদের থ্যাকারে ম্যানসনে এলেন। সেই সকাল থেকে গণপতিবাবু যে একটুও অবসর পাননি তা ওঁর মুখচোখ দেখে বুঝতে পারছি। বিলাসিনী দেবীর ব্যাপারে হয়তো অনেক খোঁজখবর চলছে। সব ব্যাপারে তিনি আমাকে খোলাখুলি কথা বলেন না। বলবেনও বা কেন? সুতরাং আমি কখনও বাড়তি কৌতূহল প্রকাশ করি না; উনি যতটুকু নিজে থেকে বলেন ততটুকু শুনেই সন্তুষ্ট থাকি।

আমার অদম্য কৌতূহলের প্রথম অংশটা গণপতিবাবু নিজেই প্রশমন করলেন। গতকাল রাত্রেই পমা ও বিপুল বারিক নাটকের শেষাংশ জানতে আমি উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। সর্দারজীর ট্যাক্সি গাড়ি চন্দ্রোদয় ভবনের কমপাউণ্ডে ঢোকবার পর কী হলো তা জানতে চাই আমি।

গণপতিবাবু সামান্য কয়েকটা কথায় ওই পর্ব শেষ করে দিলেন। গত রাত্রে বিলাসিনী দেবী ঠাকুর ঘরেই বসেছিলেন। পমা ফিরে এসেছে শুনে তিনি ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন মনে হলো ওঁর চোখগুলো জ্বলছে।

পমা উদ্ধারের কথা ততক্ষণে গণপতিবাবু জানিয়ে দিয়েছেন বিলাসিনী দেবীকে। বিপুলভূষণ বারিকের কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন। একথা তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ দিয়ে—"মাস্টারমশায়"!

"হতেই পারে", মন্তব্য করলেন গণপতিবাবু আমার কাছে। "এই মাস্টার মশায়ের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতেন বিলাসিনী দেবী।"

পরের মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন বিলাসিনী দেবী। "পমা, পমা ফিরে এসেছে," নিজের মনেই বিড়বিড় করেছিলেন যোগিনী বিলাসিনী দেবী।

পমা ততক্ষণে মাথা নিচু করে গণপতিবাবুর সঙ্গে ভিতরে ঢুকে এসেছে। পমার মুখের দিকে তাকালেন বিলাসিনী দেবী—ওঁর চোখের দৃষ্টি যেন

বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এবার তিনি এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরলেন এবং বললেন, "পমা, তুমি ভিতরে এসো।"

পমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে বিলাসিনী দেবী আবার ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলেন।

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন গণপতিবাবু। কারণ, সর্দারজীর ট্যাক্সি ও বিপুল বারিককে তিনি তখনও আটকে রেখেছেন।

কিছুক্ষণ পরে বাধ্য হয়ে গণপতিবাবু আবার ভিতরে ঢুকলেন। কৈলাশ-বাবুর সাহায্যে ঠাকুর ঘরের মধ্যে আবার খবর পাঠালেন।

একটু পরেই বেরিয়ে এলেন বিলাসিনী দেবী। তাঁর চোখ দুটো এখনও বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে—সেখানে কোনো উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

"কিছু বলবে বাবা?" সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন বিলাসিনী দেবী।

বিব্রত গণপতিবাবু তাঁকে জ্বালাতন করবার জন্যে প্রথমে ক্ষমা চাইলেন।

"জ্বালাতন কী? আজে-বাজে কাজে বিশ্বসংসার তো তোমাকেই জ্বালাতন করছে, বাবা" স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন বিলাসিনী দেবী।

গণপতিবাবু এবার বিপুলভূষণ বারিকের কথা তুললেন। "বিপুল-বাবুকে এখনও অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি মা-জননী।"

বিলাসিনী দেবী এই লোকটি সম্পর্কে কোনো রকম ঔৎসুক্য দেখালেন না। বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বিলাসিনী জানিয়ে দিলেন, ওই লোকটি সম্বন্ধে কোনো রকম চিন্তা করবার মতো সময় এখন তাঁর নেই।

বাড়ির বাইরে এসে বিপুলভূষণকে বিদায় করেছিলেন গণপতিবাবু। "ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছে। আপনি এখন যেতে পারেন, বিপুলবাবু। এর পরের অঙ্কে কী আছে তা আমিও জানি না, আপনি জানেন না। একমাত্র বোধ হয় জানেন বিলাসিনী দেবী—কিন্তু তিনি এখন ঠাকুর ঘরে ঢুকে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।"

গণপতিবাবুর কথা থেকে আন্দাজ করলাম, আজ সকালেও তাঁর সঙ্গে বিলাসিনী দেবীর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনার ওপর কোনোরকম আলোকপাত করলেন না গণপতিবাবু। শুধু জানালেন, এক মুহূর্তের জন্য পমাকে তিনি দেখেছেন দূর থেকে। সারা রাত কেঁদে কেঁদে তার মুখ ফুলে উঠেছে মনে হলো।

গণপতিবাবু এক কাপ চা খেয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, "উঠি। এখন অনেক কাজ। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে না সাপ বেরিয়ে যায়!"

যাবার আগে গণপতিবাবু হঠাৎ আমাকে বেশ চিন্তার মধ্যে রেখে গেলেন।

গণপতিবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ট্যাক্সিতে চড়তে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ব্যাপারটা জানতে?"

আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। গণপতিবাবু বললেন, "সময় মতো একটু ভেবেটেবে রেখো।"

এবার আমার আরও অবাক হবার পালা।

"পরে কথা হবে খ'ন।" এই বলে গণপতিবাবুর ট্যাক্সি এবার অজানা উদ্দেশ্যে হুস করে বেরিয়ে গেল।

একটি মাত্র আচমকা প্রশ্নে গণপতিবাবু আমাকে এক অস্বস্তিকর পরিবেশে ফেলে দিলেন। পমা ও বিপুলভূষণ বারিকের প্রণয়কাহিনীটা হঠাৎ যেন একটু রহস্যময় হয়ে উঠলো।

বিলাসিনী দেবীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং বড়লোকের বাড়ির মাস্টারমশায়—তাঁরা অবশ্যই খেয়ালখুশি মতো যে-কোনো ঘটনার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু এই মণিহার তো আমায় নাহি সাজে। আমার মতো একজন সহায়সম্বলহীন কর্মচারীর পক্ষে এই সব রাজকীয় বিলাসিতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তো কোনোক্রমেই নিরাপদ নয়।

কিন্তু গণপতিবাবু হঠাৎ আমাকে এমন প্রশ্ন করলেন কেন? কেন তিনি জানতে চাইলেন, পমা ও বিপুলভূষণের গোপন প্রণয়ের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আগাম খবরাখবর ছিল কিনা?

গণপতিবাবুকে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় গণপতিবাবু। তাঁর ট্যাক্সিটা প্যাসেঞ্জারের স্পেশাল নির্দেশে ততক্ষণে ডবল স্পিডে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ধরে রাণী রাসমণির বাড়ির দিকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছে।

এমন একদিন ছিল যখন সামান্য সমস্যা আমাকে বিব্রত করতো না—ছোটখাট বিপদের মেঘ আমাকে চিন্তায় ফেলতো না। তখন আমার অভাব থাকলেও, জীবনে অনিশ্চয়তা ছিল না। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমার আশেপাশে বিভূতিদা, বারওয়েল সাহেব এবং সত্যসুন্দর বোসের মতো মানুষ ছিলেন। কৈশোরের অপরিণতবুদ্ধি নিয়ে তখন আমি শুধু বিস্ময়ে মানুষের লীলাখেলা দেখে চলেছি, নিজের উপর ঘটনার কী প্রভাব পড়বে তার হিসেব-নিকেশের প্রয়োজন উপলব্ধি করিনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে—আমার বয়স বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও হয়েছে, কিন্তু নিরাপত্তাবোধ হারিয়েছি। এতোদিন চেষ্টা করেও আমি একটা নিরাপদ চাকরির ব্যবস্থা করতে পারিনি। আজ আমার পিছনে সায়েব অথবা সত্যসুন্দরদার মতো শুভানুধ্যায়ী মানুষের নিত্য উপস্থিতিও নেই। ইঁট কাঠ কংক্রিটের এই জঙ্গলে আমি নিঃসঙ্গ ও নির্বান্ধব। পোড়া গরুর মতো আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই আমার তাই দুশ্চিন্তা হয়—চাকরির অনিশ্চয়তা আমার ব্যক্তিত্বকে অতিমাত্রায় দুর্বল করে তুলেছে। আমি যেমনভাবে বড় হতে চেয়েছিলাম তেমন হতে পারলাম না। বরং আমি ক্রমশ নিচে নেমে চলেছি, আমার এই অধঃপতনের কোনো সীমা নেই—আমি নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলছি।

থ্যাকারে ম্যানসনে ইতিমধ্যেই কিছু গুজব ছড়াতে আরম্ভ করেছে। গত রাত্রে ব্যাপারটা এমন অতর্কিত ভাবে ঘটে গিয়েছে এবং গণপতিবাবুর দূরদৃষ্টিতে সংবাদটা মাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় গুজব প্রচারে পটু ব্যক্তিরা একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন।

আজ সকালে কড়া খবরের সামান্য কিছু গন্ধ গুজব প্রচারকদের নাকে হাজির হয়েছে এবং তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উদ্যমে নিজেদের কাজে লেগে গিয়েছেন।

অমন যে অমন রামসিংহাসন সেও গতকাল বেশ চিন্তিত ছিল। থ্যাকারে ম্যানসন থেকে সকালবেলায় সুদীর্ঘ সময়ের জন্য আমার রহস্যজনক অন্তর্ধান তার উদ্বেগের অন্যতম কারণ। আমি কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম, তা পুরোপুরি না-জানা পর্যন্ত রামসিংহাসনের পক্ষে নিশ্চিন্তে নিশিযাপন যে সম্ভব নয়, তা অবশ্যই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল।

আমার ধারণা ছিল, চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে আমার বিশেষ সাক্ষাৎকারের গোপন সংবাদ কিছুক্ষণের মধ্যেই সদাসতর্ক রামসিংহাসন চৌরাশিয়ার কানে এসে পৌঁছবে। খোদ হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে কোনো প্রিয় সহকর্মীর মাধ্যমে রামসিংহাসন নিশ্চয় হট-লাইন যোগাযোগের ব্যবস্থা রেখেছে।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল। চন্দ্রোদয় ভবন থেকে কোনো কর্মচারীই বোধ হয় রামসিংহাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে বিশ্বাসযোগ্য টুকরো টুকরো সংবাদ মালার আকারে গাঁথতে গাঁথতেই আমি রাত্রের অন্ধকারে দ্বিতীয়বারের মতো উধাও হয়ে গেলাম নিঃশব্দে। এবার রহস্য ঘনীভূত হওয়া ছাড়া উপায় কী?

ব্যাপারটা প্রথমে বেশ রঙীনভাবেই রটেছে। যে-নিয়ে রামসিংহাসনের ঘনিষ্ঠ মহলে চাপা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সে-খবরও আমার কানে এসে গেলো।

সাত-সকালে যে লোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো তার নাম কলকালি। এই সকালে কলকালি কখনও আমার শোবার ঘরে আসে না।

কলকালি দরজায় টোকা দিয়ে সোজা আমার ঘরে ঢুকে পড়লো এবং আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রইলো।

কলকালি এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলো। "আপনি ভাল আছেন তো, স্যর? আপনাকে হঠাৎ কাল স্বপ্নে দেখলুম।" কলকালি এর আগে কখনও এরকম প্রশ্ন করেনি।

"তোমার কী দরকার কলকালি?" এবার আমি প্রশ্ন করলাম। আন্দাজ করছিলাম, ওই নতুন পাইপের প্রাইভেট স্টক সম্বন্ধে আমার কাছে তার কোনো বিশেষ নিবেদন আছে। সেহেতু বলরামবসুঘাট স্ট্রীটের সেই বঙ্গরমণীটির ভাগ্য এই পাইপের স্টকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সেই হেতু কলকালি হয়তো কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ভোরবেলাতেই সে আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ছুটে এসেছে।

কলকালি কিন্তু ওই প্রসঙ্গে গেলোই না। ইতিমধ্যে সে বলরামবসুঘাট স্ট্রীট ঘুরে এসেছে মনে হলো না।

কলকালি এবার আমার ঘরের এক কোণে যে জলের বেসিন রয়েছে সেই দিকে এগিয়ে এগিয়ে গেলো। এবং ঘোষণা করলো, আমার ঘরের এই কল অনেক দিন অবহেলায় পড়ে রয়েছে এবং প্রায় সারাক্ষণই টিপ টিপ করে জল চুঁইয়ে পড়ছে। এই কলের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার কথা কলকালি নাকি কিছুদিন ধরেই ভাবছে এবং আজ সমস্ত কাজ দূরে সরিয়ে রেখে সে যন্ত্রপাতি হাতে এখানে চলে এসেছে। ম্যানেজারবাবুর কল দিয়েই কলকালি আজ তার কাজের বউনি করবে।

কলকালি বিপুল উৎসাহে আমার ঘরের কলের মুখ খুলে ফেললো। নলের ভিতর একটা সরু তার ঢুকিয়ে নিপুণভাবে সে কিছু কাদাও বার করে

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। "দেখুন স্যার, ভিতরে কীসব জমে ছিল। লাইন ব্লক বললেই চলে! জল কী করে পড়বে?"

আমি কলকালির এই অত্যধিক ডিউটিপ্রীতিতে অস্বস্তি বোধ করছি এবং এর পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা আন্দাজ করতে সফল না হয়ে নিরুত্তর রয়েছি।

নিপুণ কলকালি অপারেশন থিয়েটারে শল্যচিকিৎসারত দক্ষ সার্জেনের মতো কলের চিকিৎসা করতে করতে জানালো, "এতোদিন মুখ ফুটে বলেননি কেন স্যার? খোদ ম্যানেজার সায়েবের ঘরেই এমন গোলমাল হয়ে থাকলে আমরা মুখ দেখাবো কী করে?"

আমি কলকালির কর্মনিষ্ঠায় ঈষৎ কৌতুক বোধ করছি। মুখে চাপা হাসিও ফুটে উঠছে।

বেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে কলকালি বললো, "আপনি একলা লোক বলেই এসব সহ্য করতে পারছেন। এই ঘরে যদি মেমসায়েবও থাকতেন তা হলে কবে হৈ-হৈ কান্ড বেধে যেতো—কলকালিকে অনেক আগেই এই ফ্ল্যাটে ছোটাছুটি করতে হতো।"

কলকালি এই মুহূর্তে ঝুঁকে পড়ে কলের পাইপ থেকে আরও কিছু ময়লা নিষ্কাষণের চেষ্টা করছে। বললো, "স্যার, একজন মেমসায়েব ইজিকলটু তিনজন সায়েব।"

আমার চমকে ওঠবার অবস্থা। এরকম বৈপ্লবিক বিবৃতি এর আগে কখনও শুনিনি। "তুমি কী বলতে চাও?" কলকালিকে আমি প্রশ্ন করে বসলাম।

কলকালি বললো, এই মন্তব্য শুধু তার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। ভাবনানি ম্যানসন, কুইনস ম্যানসন, ডিউক ম্যানসন সব জায়গায় খোঁজ নিয়ে সে দেখেছে—একজন মেমসায়েব মানেই তিনজন সায়েব।

আমার বিস্ময় আর বাড়তে না দিয়ে কলকালি জানালো, এটা শুধু জল খরচের ব্যাপারে—অন্য কোনো বিষয় এর সঙ্গে জড়িত নয়।

কলকালি এবার আমার কলের ওয়াশার বদলের কাজে লেগে গেলো। বললো, সমস্ত থ্যাকারে ম্যানসনে এই টিপ-টিপে রোগ ধরেছে। দিন নেই রাত নেই ফোঁটা-ফোঁটা করে জল প্রত্যেক কল থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে। ওয়াশার বদলে দেবার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিতে চায় কলকালি—তাতে এ-বাড়ির জল খরচ নাকি অর্ধেক হয়ে যাবে।

স্পেশাল ওয়াশার লাগিয়ে তোড়ে জল খুলে দিলো কলকালি ; তারপর দ্রুত উল্টোদিকে কল ঘুরিয়ে সে দেখিয়ে দিলো নতুন ওয়াশারের কল্যাণে একফোঁটা জলও এখন চুঁইয়ে পড়ছে না।

আমি এই বিশেষ সার্ভিসের জন্য অবশ্যই কলকালির কাছে কৃতজ্ঞ। তাকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগেই সে আমার দিকে আড়-চোখে তাকালো এবং হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, "আপনি ভাল আছেন তো, স্যার?"

আমি সময়োচিত উত্তর দিয়ে তখনকার মতো কলকালিকে বিদায় করলাম। কিন্তু শেষ প্রশ্নটা আমার কাছে একটু রহস্যময় ঠেকলো। আমার ঘরে অতক্ষণ ধরে কাজকর্ম করার পরে ওই ধরনের প্রশ্ন করার অর্থ কী?

আরও আধঘণ্টা পরে সুইপার আমার ঘরে ঝাড়ু-হাতে হাজির হলো। সেও আজ একটু বেশী নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ঘরের সামনেটা পরিষ্কার করলো। তারপর আমার দিকে কিছুক্ষণ রহস্যময়ভাবে তাকিয়ে কোনো প্রশ্ন না করেই সে বিদায় নিলো।

এবার আবির্ভাব সহদেবের। শ্রীমান সহদেবের এই সময় মনিবের কাজে রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু সে এসে আমাকে একটা লম্বা সেলাম দিলো।

"সহদেব এসময়ে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ কী করে?" আমি মৃদু হেসে জানতে চাইলাম।

সহদেব গম্ভীরভাবে জানালো, গতকাল থেকে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে।

"কেন? লটারির টিকিট পেলে নাকি, সহদেব?" আমি প্রশ্ন করলাম।

সহদেব অবশ্যই লটারির টিকিট পায়নি। যে ফ্ল্যাটে সে রান্নার কাজ করে সেখানে সায়েব ও মেমসায়েবের মধ্যে প্রবল ঝগড়া বেধেছে। দমকল ডাকতে হয় এরকম অবস্থা।"

"আঃ, সহদেব! স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হলে কেউ ফায়ার ব্রিগেড ডাকে না—খুব খারাপ কেসে পুলিস ডাকতে হতে পারে," আমি সহদেবের ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করি।

মাথা চুলকে সহদেব বললো, "না হুজুর, দমকলের কেস! সায়েব রেগে গিয়ে সিগারেট লাইটার জেবলে টেবিলক্লথে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। মেমসায়েবের কান্না শুনে আমি ছুটে গিয়ে কোনো রকমে সেই আগুন নেভাই।"

সে-রাত্রে মেমসায়েব এবং সায়েব দুজনেই নাকি ডিনার খাননি। "দু'-জনের ডিনার ওই রাত্রিবেলায় আমাকেই খেতে হলো, হুজুর। চিকেন রোস্টটা খুব ভাল হয়েছিল, স্যর। আমরা তো 'শুখা' বাবুর্চি—নিজের রান্না নিজে খাবার চান্স পাইনা।"

সহদেব জানালো, তার পরের দিন মেমসায়েব মেনু বলে দেননি। সহদেব নিজের মাথা খাটিয়ে যা পেয়েছে তাই রেঁধেছে। সায়েব-মেমের মেজাজ গরম দেখে এমন সব জিনিস রান্না করেছে যা খেলে শরীর গরম হয় না, পেট ঠাণ্ডা থাকে।

তারপর গতকাল মেমসায়েব নিজের সুটকেস নিয়ে রেগেমেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সন্ধ্যেবেলায় সায়েবের জন্যে দুটো আইটেম মাত্র রেঁধেছে সহদেব। আধ ঘণ্টায় রাইস অ্যান্ড কারি বানিয়ে ফেলেছে সহদেব। তার পরেই ছুটি। সহদেব বুঝতে পারছে, মেমসায়েব না থাকলে সায়েবদের ম্যানেজ করা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

আজ সকালেও আধ ঘণ্টায় ব্রেকফাস্টের পর্ব চুকিয়ে দিয়েছে সহদেব। দুপুরে লাঞ্চের হাঙ্গামাই নেই। সায়েব জানিয়েছেন, তিনি আপিসের ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেয়ে নেবেন। রাত্রেও আজ ডিনার করবেন বাইরে।

মেমসায়েব না-থাকলে সংসার যে এতো সুখের হয়ে ওঠে তা আবিষ্কার করে সহদেব আজ সকাল থেকে খুবই আনন্দের মধ্যে ছিল। নিজের পার্ট-টাইম কাজকর্মে কীভাবে আরও মন দেওয়া যায় তারই চিন্তা

করছিল। কিন্তু এমন সময় আমার কথা কানে গেলো সহদেবের।

"আপনার খবর নিতে এখানে না-চলে এসে পারলাম না, হুজুর। আপনার সঙ্গে আমার কতদিনের জানাশোনা। আপনার খোঁজ না-নিয়ে আমি পারি? ঘুগনির মটর ডেকচিতে সেদ্ধ বসিয়েই চলে এলাম।"

আমার খোঁজ নেবার জন্যে আমার প্রিয়জনদের মধ্যে হঠাৎ এতো ব্যস্ততা কেন তা এবার বোঝা গেলো।

সহদেব বললো, "আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল হুজুর। আমি শুনলাম, কাল রাত থেকেই আপনি নাকি বিপদে পড়ে গিয়েছেন। কীসব কারণে পুলিস এসে গিয়েছে!"

সহদেব সত্যিই আমাকে ভালবাসে। সে বললো, "আমি তখন থেকেই বলছি, ওসব হতেই পারে না। আমাদের ম্যানেজার সায়েব তো তেমন লোকই নয়। তিনি কেন পুলিসের হাঙ্গামায় পড়বেন?"

সহদেব জিজ্ঞেস করলো, "কলকালি এসেছিল নাকি? ও বেচারারও খুব মন খারাপ আপনার খবর শুনে। হয়তো এখনই খোঁজ করতে আসবে।"

কলকালি এতোক্ষণ কেন এখানে ঘুরঘুর করছিল তা এবার বোঝা গেলো। বেচারা আমার মুখের ওপর সহদেবের মতো প্রশ্ন করতে পারেনি। আমাকে বহাল তবিয়ত দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে সে ফিরে গিয়েছে নিজের কাজে।

সহদেবকে প্রশ্ন করতে ভিতরের খবর আরও একটু জানা গেলো। গতকাল যে-মেয়েটিকে কেন্দ্র করে এমন নাটকীয় কান্ড ঘটে গেলো তার প্রকৃত পরিচয় এখানে বেরিয়ে পড়েনি। কিন্তু গুজব রটেছে আমাকে নিয়ে।

গুজবটা এই যে এ-বাড়ির কোনো খালি ঘর নাকি কোনো মহিলাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভাড়া দিয়ে আমি বিপদে পড়ে গিয়েছি। বালিকা উদ্ধারের পর পুলিসের নজর নাকি আমার ওপরেই এসে পড়েছে এবং বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। সুতরাং এই বিপদের ফাঁড়া কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে খুবই শক্ত হবে।

সহদেব বললো, "আমার তো হুজুর চোখে জল এসে গিয়েছে। আমি বলছি, আমার সায়েব এ-কাজ করতেই পারেন না। নিশ্চয় অন্য কেউ সায়েবকে বিপদে ফেলেছে।"

সহদেবকে জানালাম তার কোনো চিন্তার কারণ নেই। সহদেব রাগের মাথায় বললো, "তেমন কোনো গোলমালে পড়লে আমাকে বলবেন, হুজুর। এখানে কোন্ কোন্ লোক আপনার পিছনে ঘোঁট পাকাচ্ছে সব খোঁজখবর রাখবো এবার থেকে।"

সহদেব তখনকার মতো চলে গেলো। এবং আমার চোখ অকারণে সজল হয়ে উঠলো। এই থ্যাকারে ম্যানসনেও আমার কথা ভাববার মতো মানুষ আছে। সুতরাং আমার দুঃখ কীসের?

তবু ভাবনা আজ আমাকে ছাড়বে না। কয়েকটা রহস্য আমার কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না।

গত রাত্রে পমার ব্যাপারে ভাবনানি ম্যানসনের নতুন এক রূপ ধরা পড়লো। ওদের দারোয়ান নির্দ্বিধায় আমাকে বললো এখানে পমা বা কেউ আসেনি। অথচ শেষ শেষ পর্যন্ত ওখান থেকেই গণেশ সরকার পমা ও বিপুলভূষণ বারিককে উদ্ধার করে দিলেন। দারোয়ান কি ব্যাপারটা সত্যিই

জানতো না? না, মালিকের নির্দেশমতো আমাকে ইচ্ছে ক'রেই বিপথে চালালো দারোয়ানজী?

শকুন্তলা-চাওলার সিলভার ড্রাগনের ভূমিকাই বা কী? এঁরা কি অনেক ব্যাপারেই আগাম কিছু জেনে বসে আছেন?

কিন্তু সব থেকে যা আশ্চর্য, গণপতিবাবু কী ভাবে পমাসন্ধানে এই থ্যাকারে ম্যানসনে হাজির হলেন? এবং আজ কেন তিনি প্রশ্ন করলেন পমার বিষয়ে আমি আগেই কিছু জানতাম কিনা?

এসব ব্যাপারে অকারণে উদ্বিগ্ন হবার মানে হয় না। কিন্তু প্রসঙ্গটা সত্যিই গুরুতর, বিশেষ করে যখন বিলাসিনী দেবীর একমাত্র সন্তান এই রহস্যজালে জড়িয়ে রয়েছেন।

আকাশ-পাতাল ভাবছি। এমন সময় বেয়ারা এসে বললো, "হুজুর, আপনার ফোন।"

আপিস ঘরে এসে ফোন ধরতেই ওদিক থেকে যে হাসির ঝড় উঠলো তাতেই বুঝতে বাকি রইলো না কে এই ফোন করছেন।

"হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার শংকর? কোথায় লুকিয়ে-লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন? সকাল থেকে ফোন করে-করে পাত্তাই পাচ্ছি না! শকুন্তলা চাওলা কি আজও আপনাকে ডেকে সকালবেলায় গপ্পো জুড়েছেন?" মিসেস পপি বিশোয়াস অকারণেই টেলিফোনের ওধারে হাসিতে ভেঙে পড়ছেন।

মিসেস বিশোয়াসের আন্দাজটা যে মিথ্যে তা আমি জানিয়ে দিলাম।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "উঃ আপনাকে ধরা যে কী শক্ত হয়ে উঠছে! অন্তত চারবার ফোন করেছি সকাল থেকে। এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি।"

সর্বনাশ! এই মহিলারা টেলিফোনেও কীভাবে লোকের গা ছুঁয়ে ফেলেন ভগবান জানেন!

পপি বিশোয়াস অভিযোগ করলেন, "আপনি আমাকে কিছুই বলছেন না। কিন্তু আমি সব জানি!"

"কী ব্যাপারে?" পমার বিষয়টা নিজে থেকে প্রচার করবার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না।

আবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন পপি বিশোয়াস। "আমার কাছে বোকা সেজে থেকে কী লাভ, মিস্টার শংকর? যাই হোক আপনি আপিস ঘরেই বসে থাকুন। আমি এখনই একবার ঘুরে যাচ্ছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পপি বিশোয়াস এখানে উপস্থিত হলেন। আজ একেবারে টাঙ্গাইল শাড়ি পরে খাঁটি বাঙালী সেজেছেন পপি বিশোয়াস।

পপি বললেন, "মিস্টার জেঠমালানির রিকোয়েস্টে আজ একেবারে দেশী সাজ করেছি। দিল্লীর পার্টির কাছে সেণ্ট পারসেণ্ট বেঙ্গলী লুকের ভীষণ কদর। বিশেষ করে এই অল-কটন টাঙ্গাইল শাড়ির। কাপড় দেখে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে পৌনে তিনশ' টাকা দাম!"

পপি বিশোয়াস আজকে আর সিগারেট ধরালেন না। বললেন, "গলাটা ঠান্ডা লেগে একেবারে বুঁজে আছে। একটু পরেই আবার বকর-বকর করতে হবে এক গেস্টের সঙ্গে। পুরনো পার্টি, আগেও লুক-আফটার করেছি, ভদ্রলোক একেবারে কথার জাহাজ! সারাক্ষণ আবোলতাবোল বকে না যেতে পারলে ভাববেন আমি অ্যাটেনশন দিচ্ছি না!"

পপি বিশোয়াস এবার বোমা ফাটালেন! নিজেই বললেন, "পমাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা গেলো!"

আমি তো পপির কথা শুনে তাজ্জব।

পপি বিশোয়াস বললেন, "ওই বিপুলভূষণ বারিক লোকটা মোটেই সুবিধের নয়! অনেকদিন থেকেই নিশ্চয় মনে-মনে কুমতলব ছিল। ভাবটা এমন যে ধরেই নিয়েছে সে নিজেই পমার মায়ের সব সম্পত্তির মালিক হয়ে যাচ্ছে।"

"কী বলছেন আপনি?" আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করি।

পপি বিশোয়াস বললেন, "মুখ একখানা—কিন্তু কান দুখানা! তাই অনেক খবর কানে এসে যাচ্ছে আমার। কোত্থেকে আসছে সেসব খুঁটিয়ে জানতে চাইবেন না। বুঝতেই পারছেন, আমি মিস্টার জেঠমালানির ফ্রেন্ড!"

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মিসেস পপি বিশোয়াসের দিকে তাকিয়ে আছি।

পপি বললেন, "আপনারা খবর রাখেন না। কিন্তু চালাক লোকেরা সময় থাকতে-থাকতেই ওই বিপুলভূষণ বারিকের সঙ্গে আগাম ভাব জমানো শুরু করেছে! এই ভাবনানি ম্যানসনের ম্যানেজারবাবু। তিনি বিপুলবাবুকে কয়েকদিন ধরেই আদর আপ্যায়ন করেছেন। তার পরেই যখন আপনার ওই শকুন্তলা চাওলা আসরে নামলেন তখন থেকে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

পপি বিশোয়াস একটা থ্রোট লজেন্স চুষতে-চুষতে বললেন, "শুনে রাখুন আমার কাছ থেকে, পমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে ওই বিপুল বারিক একদিন এই সিলভার ড্রাগনে এসেছে। এবং আসা মাত্রই রাজকীয় রিসেপশন পেয়েছে। সেদিন থেকেই বিপুল বারিকের সাহস বেড়ে গিয়েছে। এবং ফাইন্যাল পরিকল্পনা ভাঁজতে আরম্ভ করেছে।"

পপি বিশোয়াস বললেন, "জেনে রাখুন, এই শর্মা না থাকলে গণপতিবাবুর সাধ্য ছিল না পমাকে খুঁজে বার করার।"

আমি সত্যিই তাজ্জব।

পপি এবার অভিমানে ভেঙে পড়লেন। "আপনি আমার জন্যে মোটেই ভাবেন না। আমাকে হয়তো আপনি পছন্দই করেন না। কিন্তু আমি আপনার জন্যে ভাবি। আহা, কত কষ্ট করে এই থ্যাকারে ম্যানসনে পড়ে আছেন। আমার ইচ্ছে আপনি মালিকের নজরে পড়ুন—আপনার চড়চড় করে উন্নতি হোক। তাই গোপন খবর পেয়েই গতকাল বিকেলে যখন ফোনে বিলাসিনী দেবীর বাড়িতে যোগাযোগ করলাম তখন আপনার বুড়িটাও ছুঁইয়ে রাখলাম। যে-ভদ্রলোক ফোন ধরেছিলেন তাকে বললাম, মিস্টার শংকরকে নিয়েই খোঁজাখুঁজি শুরু করুন। ওঁর পাড়াতেই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।"

পপি বিশোয়াসই তা হলে আমার অদৃশ্যে এই উপকারটি করেছেন ; এবং তাঁর খবরের ওপরে ভরসা করেই গণপতিবাবু আমার কাছে এসেছিলেন এবং ভাগ্যচক্রে পমাকে উদ্ধার করেছেন। পমার সঙ্গে যে বিপুলভূষণ বারিকও জড়িয়ে আছেন এ-খবরটা গণপতিবাবু বা বিলাসিনী দেবী কেউই স্বপ্নে ভাবতে পারেননি।

গভীর কৃতজ্ঞতায় আমি এবার পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পপি বিশোয়াস বললেন, "এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়ান, মিস্টার শংকর। টেলিফোন নামিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি। আপনি আবার যেরকম লোক, আমাদের পছন্দই করেন না! একটু দেরি হলেই হয়তো অন্য কাজে বেরিয়ে যেতেন।" পপি বিশোয়াসের গলায় রীতিমত অভিমানের সুর।

পপি বিশোয়াসের অবশ্যই অভিমান করার কারণ আছে। বারবার তিনি আমার কাছে আসবার চেষ্টা করেছেন, নির্দ্বিধায় নিজের মনের সব কথা আমার কাছে খুলে বলেছেন, কিন্তু আমি কেন জানি না তাঁকে কখনও সাহায্য করিনি।

আজ এই মুহূর্তে পপি বিশোয়াসের প্রতি আমার বিদ্বেষ যেন অনেক কেটে গেলো। তাঁকে আমি আর আগেকার মতো ঘৃণা করতে পারছি না।

কালো কুঁজো থেকে এবার আমি নিজেই পপি বিশোয়াসের জন্যে জল গড়িয়ে দিলাম। সমস্ত জলটা প্রায় এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করে ফেললেন তিনি। তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, "উঃ বুকখানা যেন সাহারা মরুভূমি হয়েছিল। বাউনের দেওয়া জলে দেহটা ঠাণ্ডা হলো!"

পপি বিশোয়াস এবার পমা প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন, "বিলাসিনী দেবীর কন্যার কাহিনী যখন কানে এলো তখন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় নেই। তা ছাড়া ভাবলাম, উঁচু মহলে এ ব্যাপারে হয়তো আপনার কথা কারও মনে পড়বে না। কিন্তু এই সবই তো সুযোগ।"

আমার দিকে তাকালেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "সারা জন্ম খেটে যা হয় না, মনিবের বিপদ-আপদের সময় একটি কাজ করেই তার দশগুণ ফল অনেক সময় পাওয়া যায়।"

"বুঝছেন কিছু, মিস্টার শংকর?" এবার সস্নেহে প্রশ্ন করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

অবশ্যই কিছুটা বুঝতে পারছি। সংসারের বিভিন্ন ঘাটে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই ক'বছরে তো কিছু কম জল খাওয়া হলো না।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার নিজের নাম তো আপনার ওই বিডন স্ট্রীটে ফাঁস করার কোনো মানে হয় না। তখন ভাবলাম, নিজের কোনো উপকার যখন করতেই পারছি না, তখন অন্য কারুর কাজে লাগি একটু। এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার কথাই মনে পড়ে গেলো। কিন্তু ধরি তো মাছ না-ছুঁই পানি। চন্দ্রোদয় ভবনে টেলিফোন ডায়াল করে এমনভাবে ব্যাপারটা বলেছি, সমস্ত ব্যাপারটা পিছলে গেলেও আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।"

পপি বিশোয়াস নিপুণ হাতে এবার একটি সিগারেট ধরালেন। বললেন, "আমার দুঃখু কিন্তু এখনও ঘোচেনি, মিস্টার শংকর। দেখতেই পাচ্ছেন

এখনও এই অখাদ্য দিশী সিগারেটগুলো মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি।"

বিলিতি ডানহিল ইনটারন্যাশনালে অভ্যস্ত মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখটা এবার সত্যিই করুণ দেখালো। এঁরা যে কেন এই সব মূল্যবান বিদেশী নেশার দাসী হয়ে পড়েন তা বুঝতে পারি না।

পপি বিশোয়াস কিন্তু সামনেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। সিগারেটের রিং ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "চিরকাল কারও দুঃখ থাকে না, মিস্টার শংকর। আমারও দিন আসতে পারে। আজ সন্ধ্যে বেলাতেই যদি দেখেন আমি আবার দু-তিন বাক্স বিলিতি সিগারেটের মালিক হয়েছি তা হলে আশ্চর্য হবেন না!"

কীভাবে পপি বিশোয়াস আবার সৌভাগ্যবতী হতে চলেছেন তা বর্ণনা করবার জন্যে ভদ্রমহিলা প্রস্তুত হয়েই আছেন মনে হলো। কেবল আমার দিক থেকে একটি সবুজ সংকেতের অপেক্ষা। কিন্তু আমার মন পড়ে রয়েছে অন্যত্র। আমি পমা ও বিপুলভূষণ বারিক সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাই।

একবার মনে হলো, পমা ও বিপুলভূষণ বারিকের যা হয় হোক। আমার তাতে কী এসে যায়? আমি তো পমার বিধবা মায়ের একখানা বাড়ির সামান্য কর্মচারী। সমস্ত গুপ্ত এসটেট এবং চন্দ্রোদয় ভবনের লোকজন সম্পর্কে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন তো আমার নেই।

কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার ওই পমা ও বিপুল বারিক সম্বন্ধেই আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করেছি। আমার মন হঠাৎ বলছে, বিষয়টাকে অবহেলা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। বিধাতার অমোঘ আইনে এর সঙ্গেই হয়তো আমাদের এই ম্যানসন বাড়ির ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে।

পপি বিশোয়াসের অভিজ্ঞ চোখে আমার এই অন্যমনস্ক ভাব ধরা পড়তে বেশীক্ষণ সময় লাগলো না।

উচ্ছল কণ্ঠে মিসেস পপি বিশোয়াস প্রশ্ন করলেন, "কী হলো, মিস্টার শংকর? মন যেন অন্য কোথায় পড়ে আছে মনে হচ্ছে?"

এইভাবে হঠাৎ করে ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত ভাব এড়াবার জন্যে আমি শুধু একটু হাসলাম।

কিন্তু মিসেস পপি বিশোয়াসের কাছ থেকে অত সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না। তিনি একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন, "কী হলো, মিস্টার শংকর? প্রেমে-টেমে পড়লেন নাকি? রোমান্স না এলে তো পুরুষমানুষরা এরকম অন্যমনস্ক হয় না। আমার প্রথম হাজব্যান্ড—আমার সঙ্গে প্রেমে পড়বার পরে এই রকম হয়ে পড়েছিলেন—কোনো কিছুই তাঁর মনে থাকতো না, সব সময় আমার কথা ভাবতেন!"

একবার একটা কিছু বলতে আরম্ভ করলে মিসেস পপি বিশোয়াসের উৎসাহের অন্ত থাকে না। জীবনের এই কলুষিত পর্যায়ে এসেও তিনি প্রথম প্রণয়ের কথা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারেননি। পপি বিশোয়াস বললেন, "আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার প্রথম হাজব্যান্ড, একবার জলের গেলাসে আমার ছায়া দেখেছিলেন। গেলাস তুলে জল খেতে গিয়ে দেখেন জলের মধ্যে আমার ছবি ফুটে উঠেছে। জল খাওয়া মাথায় উঠলো, তখনই আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন তিনি।"

"এসব অবশ্য বিয়ের আগেকার কথা! প্রেম করবার স্টেজে অনেকেই

হয়তো খাবার জলে অমন ছবি দেখে থাকে!" বেদনায় মুখ বিকৃত করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "বিয়ের পরেই প্রেমের সমাধি! ছাঁদনাতলা ঘুরে আসবার পরেই এদেশের পুরুষমানুষদের যে কী হয়! প্রেম-ফেমের কথা মনেই থাকে না। শুধু বিয়ের দড়িতে আজকালকার পুরুষমানুষকে রেঁধে রাখা খু-উ-ব শক্ত।"

"কী বলছেন, আপনি!" আমি মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের ওপর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানালাম।

কিন্তু তেমন কোনো ফল হলো না। মিসেস পপি বিশোয়াসও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "ওসব প্রতিবাদ সতীসাধ্বী ঘরের বউদের কাছে করবেন। সরল বিশ্বাসে তারা হয়তো আপনার কথা মেনেও নেবে। কিন্তু এই পপি বিশোয়াসের কাছে মুখ খুলে আমাকে আর হাসাবেন না। 'হ্যাপিলি ম্যারেড' পুরুষমানুষদের নিয়েই তো আমার বিজনেস! ঘর-সংসারের দড়ি খুলে টুক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের ঘরে বা আমার ফ্ল্যাটে এঁরা যে কী কান্ড করেন তা যদি আমার জানা না থাকতো।"

এ সব ব্যাপারে পপি বিশোয়াস নিশ্চয়ই শেষ কথা বলতে পারেন। সুতরাং, প্রতিবাদ করার কোনো মানে হয় না।

রাগের মাথায় পপি বিশোয়াস বললেন, "এক এক সময় মনে হয়, গাছেরও খেতে এবং তলারও কুড়োতে এ দেশের পুরুষমানুষদের কোনো তুলনাই হয় না! ভগবান এদের আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছেন—বিশেষ করে এই হাই-সোসাইটির মিস্টারদের!"

কোনো বিশেষ ঘটনার কথা বোধ হয় মিসেস পপি বিশোয়াসের এবার মনে পড়ে গেলো। ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে নিয়ে তিনি ফিক করে হেসে ফেললেন। তারপর ঠোঁট উল্টে বললেন, "এই যে শাড়িটা—এটা নিয়েই একটা গল্প হয়ে যায়।"

মিসেস পপি বিশোয়াসের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বত্র যে অসংখ্য গল্প-উপন্যাস জমে আছে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

পপি বিশোয়াস ততক্ষণে তাঁর রঙীন টাঙ্গাইল শাড়ির ইতিহাস বর্ণনা শুরু করে দিয়েছেন। "দিল্লির মিস্টার জয়রতন।" এইটুকু বলেই ফিক-ফিক করে হাসতে আরম্ভ করেছেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

"নাম শুনেছেন নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন পপি বিশোয়াস।

"দিল্লির হাই-সোসাইটির লোকদের নাম আমার মতো অর্ডিনারি মানুষ জানবে কী করে? আমার মতো লোকদর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকবার কথাই ওঠে না।" আমি আশ্বাস দিলাম মিসেস বিশোয়াসকে।

আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "তাও ভালো। কোথায় কার সঙ্গে কার চেনা-জানা থাকে কিছুই বলা যায় না, মিস্টার শংকর। তখন এই সব ঘটনা পাঁচ কান হলেই মুশকিল। গেস্টদের কোনো রকমেই বিপদে ফেলাটা আমাদের লাইনে নিয়ম নয়। তা হলে ভবিষ্যতে মুশকিল হয়। মুখে যাই বলি গেস্টরাই তো আমাদের লক্ষ্মী! সেবার তো ওই কারণে আমার বুটিকের সুমনা বিশ্বাসকে বিদায় করলাম। আমারই এক গেস্টের কাছে গল্প করেছে অন্য এক গেস্টের ব্যাপার। বলেছে, মিস্টার

বাজাজ ওর কাছে রেগুলার আসেন। ব্যাপারটা আমার জানবার কথা নয়। অ্যাক্সিডেন্টালি, মিস্টার সুন্দরেশন সেবার আমার কাছে গল্প করতে-করতে ব্যাপারটা বললেন। আমি মিস্টার সুন্দরেশনকে সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলাম, কে বলেছে মিস্টার বাজাজ আমাদের প্যাট্রনাইজ করেন? এবং জেনে নিলাম যে কাজটি সুমনা বিশ্বাসের।"

এবার একটু থামলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর শুরু করলেন, "এসব ব্যাপারে আমার কোনো মায়া-দয়া নেই, মিস্টার শংকর। চোখ বুজে দু' মিনিট ভাবলাম। সুমনা বিশ্বাস খুব পপুলার হোস্টেস ছিল, কাজ-কর্মেও কোনো খুঁত ছিল না। কিন্তু আমার কাছে কাজের চেয়ে প্রিন্সিপল অনেক বড়ো। লাভ-লোকসানের কথা একটুও না ভেবে ওই সুমনা বিশ্বাসকে আমার বুটিক থেকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিলাম!"

মিসেস পপি বিশোয়াসকে এই মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে। তিনি যা ভাবেন তাই কাজে রূপান্তরিত করবার মতো সাহস যে তিনি রাখেন সে বিষয়ে কারও মনে এই মুহূর্তে কোনো সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

"কিন্তু বিদায় করলেই কি বিদায় হয়?" পরবর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা শুরু করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "অন্য কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে ওই সুমনা বিশ্বাস কী করলো জানেন? আপনি ভাবতে পারবেন না।" মিসেস বিশোয়াসের কণ্ঠে এবার বিস্ময়ের সুর।

আমি সত্যিই সুমনা বিশ্বাসের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনো আন্দাজ করতে পারছি না। সুতরাং, মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পপি বিশোয়াস আমার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, "ওই মিস্টার সুন্দরেশনকেই উকিল খাড়া করলো, সুমনা! ভাবলো, অতো বড়ো পার্টির রিকোয়েস্ট এই পপি বিশোয়াস ঠেলে ফেলে দিতে পারবে না। একদিন বিকেলে মিস্টার সুন্দরেশন ম্যাড্রাশ থেকে সোজা হাজির হলেন আমার বুটিকে। বললেন, "মিসেস বিশোয়াস, তুমি সুমনাকে মাপ করে দাও। ওকে তুমি লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছো!"

"লঘু পাপ! আমি মিস্টার সুন্দরেশনকে মিষ্টি মিষ্টি করে খুব শুনিয়ে দিলাম। আমাদের লাইনে একে লঘু পাপ বলে না, মিস্টার সুন্দরেশন। এর আগেও আমি সুমনাকে সাবধান করে দিয়েছি—পেট আলগা মেয়েদের লাইন এটা নয়। অপর লোকের কথা যারা চেপে রাখতে পারে না তারা আমাদের এ-লাইনের অযোগ্য। তাদের উচিত সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে গেরস্ত লাইনে চলে যাওয়া। কিন্তু গরীবের কথায় সুমনার শিক্ষা হয়নি।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "ওই ম্যাড্রাসি মিস্টার সুন্দরেশনের তখনও চোখ খোলেনি। তখনও বাটারফ্লাই সুমনার জন্যে লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, ওই ধরনের স্মার্ট অ্যাকটিভ মেয়ে আমার বুটিকের অ্যাসেট। তখন বাধ্য হয়ে আমি মিস্টার সুন্দরেশনের মুখের ওপর বললাম, "মিস্টার সুন্দরেশন, বড় বড় লোকরা, নির্ভয়ে আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আমার এই বুটিকে দু দণ্ডের পায়ের ধুলো দেন। তাঁদের আমি কিছুতেই বিপদে ফেলতে পারি না। এই যে আপনি আমাদের প্যাট্রনাইজ করেন, সময় পেলেই এখানে আসেন এবং সুমনার

টেলিফোন পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে অফিসের কাজ দেখিয়ে প্লেনে ম্যাড্রাস থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছেন, এ সব কথা আপনি কি চান আমি আমার অন্য গেস্টদের কাছে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করি?”

হিহি করে হেসে ফেললেন মিসেস পপি বিশোয়াস। আমাকে বললেন, “সেই না শুনে মিস্টার সুন্দরেশন তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে লাগলেন। ‘ও নো, নো। নেভার কখনই না। সেটা হবে ব্রিচ অব ট্রাস্ট।”

‘আসুন। তা হলে পথে আসুন!’ মন্তব্য করেছিলেন পপি বিশোয়াস। এবং তারপর সুন্দরেশন সায়েব বলেছিলেন, “তুমি মিস্ বিশ্বাসকে যা-খুশি করতে পারো। সেটা তোমার অ্যাফেয়ার—এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলবার থাকতে পারে না।”

মিসেস পপি বিশোয়াস হঠাৎ দুঃখে ভেঙে পড়লেন। বললেন, “কিন্তু কত কথা আর পেটে পেটে জমিয়ে রাখবো? এক এক সময় শরীর হাঁসফাঁস করে ওঠে। তখনই তো আপনার কাছে চলে আসি। আপনি তো আর আমার লাইনের লোক নয়—তাই মুখ খুলতে দ্বিধা হয় না। তা ছাড়া, আমি জানি, আমার ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আপনি করবেন না।”

শেষ কথাটা বোধ হয় তেমন মিথ্যা নয়। মিসেস পপি বিশোয়াসকে আমি আগে ঘৃণা করতাম। তারপর ওঁকে কোনো রকমে সহ্য করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ক্রমশ যেন ওঁকে আমি মানুষ বলে ভাবতে শিখছি। আজকাল ওঁর জন্যে আমার মাঝে মাঝে চিন্তা হয়—কেমন যেন অব্যক্ত দুঃখ বোধ করি এই দর্পিতা বিপথগামিনী পপি বিশোয়াসের জন্য।

পপি বিশোয়াস এবার শাড়ির গল্পে ফিরে এলেন। “ও মা! আমার এই শাড়ির ঘটনাই আপনাকে বলা হলো না!”

মিসেস পপি বিশোয়াস ঘোষণা করলেন, “আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার শংকর, কিন্তু এই বাংলা তাঁতের শাড়ির কদর ক্রমশই বেড়ে চলেছে।”

“কোথায়?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“ইন্ডিয়ার হাই সোসাইটিতে। বিশেষ করে দিল্লি-বোম্বাইয়ের টপ ভিজিটররা ক্রমশ এর ভক্ত হয়ে পড়েছেন। কিছুদিন আগেও সিল্ক শাড়ি ছাড়া অন্য কোনো শাড়ির কোনো কদর ছিল না—আমার বুটিকের মেয়েদের পই-পই করে বলে দিতে হতো, ভুলেও এই দিশী তাঁতের কাপড়গুলো পরে ডিউটিতে এসো না। কিন্তু এখন উলটো পুরাণের যুগ।”

আবার হাসলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। “আমার এই শাড়িটার কথা যদি শোনেন আপনি! ওই যে মিস্টার জয়রতনের কথা বলছিলাম—যাঁকে ভাগ্যে আপনি চেনেন না।”

“হাই সোসাইটির লোকদের আমি শাজাহান হোটেলে দেখতাম। এখানে তার সুযোগ কোথায়, মিসেস বিশ্বাস?” আমি নিবেদন করি।

“হাই সোসাইটির লোকদের সঙ্গে দেখা না করে আপনার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, মিস্টার শংকর, আমি আপনাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি। হাই-সোসাইটি চরিয়েই তো আমি বেঁচে রয়েছি—একেবারে অরুচি ধরে গিয়েছে! এক এক সময় ইচ্ছে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোনো গ্রামে পালাই—যেখানে বড় বড় পোস্টের বড় বড় লোকদের সঙ্গে দেখাই হবে না।”

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার ওই মিস্টার জয়রতন সম্বন্ধে

কী যেন বলছিলেন ?"

ডান হাতের একটি আঙুল আলতো দাঁতে কামড়ে মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "মস্ত লোক এই মিস্টার জয়রতন। দিল্লিতে বিরাট চাকরি করেন। বহু বড় বড় লোকের টিকি ওঁর কাছে বাঁধা। মিস্টার জেঠমালানি আমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন খুব স্পেশালি হ্যান্ডেল করতে হবে।

"এই কথা শুনে কার না রাগ হয় বলুন ? আমি মিস্টার জেঠমালানিকে শুনিয়ে দিয়েছিলুম, 'আমাদের সব গেস্টই স্পেশাল গেস্ট।'

"তখন মিস্টার জেঠমালানি বললেন, মিস্টার জয়রতন অনেকদিন কী সব কাজে ফরেনে ছিলেন, সুতরাং বুঝতেই পারছেন, টেস্ট অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।"

"ফরেন শুনেই আমার একটু চিন্তা হলো," বললেন মিসেস বিশোয়াস। "কিছুদিন ফরেনে থাকলেই কিছু কিছু ইন্ডিয়ানের মাথা বিগড়ে যায়—রুচি পাল্টে যায়। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে এই দিশী তাঁতের টাঙ্গাইল শাড়ি সিলেকশন করলাম। নামেই টাঙ্গাইল—এখন নবদ্বীপে রিফিউজিরা তৈরি করে।"

"তারপর ?" এবার আমি জিজ্ঞেস করি।

মিসেস বিশোয়াস এবার নাটকীয় কায়দায় বললেন, "টাঙ্গাইল শাড়ি পরলাম তো বটে। কিন্তু ভয় হলো, মিস্টার জয়রতন না আবার বিরক্ত হন। আফটার অল দিল্লির অত বড় অফিসার। তাঁর ডিউটিতে সামান্য তাঁতের শাড়ি।"

"তার পরের ব্যাপারটা আপনি ভাবতেও পারবেন না, মিস্টার শংকর। অপছন্দ হওয়া তো দূরের কথা, মিস্টার জয়রতন এই টাঙ্গাইল শাড়ি দেখে মোহিত। লোকটার ভাবগতিক কাণ্ডকারখানা দেখে কে বলবে চব্বিশ বছর হ্যাপিলি ম্যারেড, বড় ছেলে আমেরিকায় পড়ছে। যাই হোক, ভদ্রলোক সুপার প্লিজ্‌ড হয়ে আমার ওখান থেকে গেস্ট হাউসে ফিরে গেলেন। কিন্তু যাবার আগে দুম করে বলে বসলেন, "মিসেস বিশোয়াস, ওয়ান রিকোয়েস্ট, মিসেস জয়রতনের জন্যে, আমার শাড়ির আঁচলখানা হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন এই রকম একখানা শাড়ি তোমাকে জোগাড় করে দিতেই হবে।" শাড়ির টাকাটাও আমার হাতে গুঁজে দিলেন ভদ্রলোক।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "এরকম পরিস্থিতিতে জীবনে কখনও পড়িনি। বাধ্য হয়ে ছুটলাম দোকানে। পরের দিন সকালে এয়ারপোর্টে যাবার পথে মিস্টার জয়রতন আমার কাছে এলেন। এবং শাড়ির প্যাকেটটা তুলে নিলেন। বললেন, আমার ওয়াইফ এই শাড়ি পেয়ে খুব খুশী হবে, ওকে মানাবেও চমৎকার। আনফরচুনেটলি, তাকে বলতে পারবো না, কে এই শাড়ি কিনে দিয়েছে।"

এই ক'সপ্তাহ আগেকার ব্যাপার এ সব। মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "কী বলবো আপনাকে, সেই থেকে এই শাড়িটা দেখলেই আমার বেচারা মিসেস জয়রতনের কথা মনে পড়ে যায়। পুরুষমানুষরা যে কতটা নির্লজ্জ হয় তা যদি বেচারা গৃহবধূরা জানতো।" মিসেস পপি বিশোয়াস এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

এইখানেই আজকের পর্ব শেষ হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু হাসির রেশ

কাটবার আগেই পপি বিশোয়াস বললেন, "এই আপনাদের রাজকুমারী পমার কথাই ধরুন না কেন। ওই বিপুলভূষণবাবুর মাথায় কী আছে, কেন উনি রাজকন্যা হরণের মতলব এঁটেছিলেন, এ সব কেউ কী বলতে পারে?"

পমা ও বিপুলভূষণ বারিকের সমস্ত ব্যাপারটা আমার নিজেরও জানা নেই। হয়তো এটি একটি প্রকৃত রয়াল রোমান্স। সুতরাং, অন্য কিছু সন্দেহ করে বিষয়টা তিক্ত করে তোলা আমাদের কাজ নয়।

কিন্তু মিসেস পপি বিশোয়াস আমাকে শান্তিতে থাকতে দিলেন না। বললেন, "রাজকন্যের মা নিশ্চয় আপনার মূল্য এই বিপদে পড়ে কিছুটা বুঝতে পেরেছেন! খবরগুলো যদি কানে গিয়ে থাকে, তা হলে উনি নিশ্চয় আপনাকে আবার ডেকে পাঠাবেন। আর যদি ডেকে পাঠান, তা হলে, মিস্টার শংকর, আপনি বলে দেবেন, স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিতে। ওই মিস্টার বারিকের ব্যাপারটা আরও খোঁজখবর করা খুব দরকার।"

কেন এমন সব সন্দেহ প্রকাশ করছেন মিসেস পপি বিশোয়াস? এ সম্বন্ধে ওঁর কাছে কি নতুন কোনো খবর আছে?

পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার সন্দেহ করবার কিছুই ছিল না। রাজবাড়ির মাস্টার যদি রাজকুমারীর সঙ্গে রোমান্স করে, কার কী বলবার আছে? কিন্তু তাদের সঙ্গে তো ওই শকুন্তলা চাওলার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না! আপনাকে বলে রাখলাম, মিস্টার শংকর, ওই শকুন্তলা চাওলা মহিলাটি মোটেই সুবিধের নয়। কিছু প্রত্যাশা না করে দুনিয়ার কাউকে কিছু আগাম দেবার মহিলা তো উনি নন!"

পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার নিজের অঙ্কেরও কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আমি ভাবলুম, কোনো দুষ্টুবুদ্ধি নিয়ে মিসেস চাওলা ওই মিস্টার বারিককে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখছেন। আমিও সেই মতো উল্টো অঙ্ক কষে খবরাখবর দিলাম যে, এই থ্যাকারে ম্যানসনেই আপনার সাহায্যে মিসেস বিলাসিনী গুপ্ত নিজের মেয়েকে উদ্ধার করবেন এবং এই শকুন্তলার স্বরূপটি বুঝে নিতে পারবেন। কিন্তু..."

"এর পর কী?" আমি মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে সব গোলমাল হয়ে গেলো। আমি এইমাত্র শুনলাম, আপনারা নাকি এই সিলভার ড্রাগন থেকে পমাকে উদ্ধার করেননি? ওদের পেয়েছেন ভাবনানি ম্যানসনের গেস্ট ফ্ল্যাট থেকে? এটা কি মিসেস শকুন্তলা চাওলার শেষ মুহূর্তের চাল? না অন্য কোনো লোকও একই সঙ্গে দাবা খেলে যাচ্ছে? অঙ্কটা আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটু সাবধানে থাকবেন, মিস্টার শংকর। আপনাকে এইটুকু বলবার জন্যেই আমি এখানে চলে আসতে বাধ্য হলাম।"

পরের দিন মিসেস পপি বিশোয়াস আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আজ যেন মিসেস পপি বিশোয়াসের কোনো তাড়া নেই। আগে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতেন মিসেস বিশোয়াস—বলতেন, "আমাদের কাছে সময়ের অনেক দাম, মিস্টার শংকর। আমরা তো আর আপনার ওই বিলাসিনী দেবীর মতো ভাগ্য করে আসিনি, যে পায়ের ওপর পা তুলে বাড়ি ভাড়ার হিসেব নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। সময় ছাড়া আমাদের হাতে কিছুই নেই—এই সময় ভাঙিয়েই আমাদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।"

মিসেস পপি বিশোয়াসের কথার মধ্যে দার্শনিকতার সুর বেজে ওঠে আজকাল। ব্যাপারটা আমাকে কিছুটা বিস্মিত করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওঁর কথাগুলোর দুটো করে অর্থ হয়। সময় বিক্রি করেই আমরা সাধারণ মানুষরা এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে কোনোক্রমে প্রাণধারণ করছি। আবার পপি বিশোয়াসের মতো বিচিত্রপসারিণীদের ক্ষেত্রে সময় ভাঙানোর এক অস্বস্তিকর অর্থ আছে।

পপি বিশোয়াস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য কিছু ভেবে বসলেন। বললেন, "কী এতো আকাশ-পাতাল ভাবছেন, মিস্টার শংকর? অতো ভাবুক মন নিয়ে আপনার এই পাড়ায় আসা উচিত হয়নি। সেই কবে থেকে লিণ্ডসে স্ট্রীটের দক্ষিণে এবং পার্ক স্ট্রীটের উত্তরে অন্য এক দুনিয়া গড়ে উঠেছে—আপনার হাওড়া-হুগলীর চোখে এদিকে তাকিয়ে থেকে শুধু শুধু আরও বোকা বনবেন, কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না।"

মিসেস পপি বিশোয়াস আমার মফঃস্বলী মনোবৃত্তির ব্যাপারটা আচমকা আবিষ্কার করে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁকে বললাম, "আমি এই মুহূর্তে হাওড়া-হুগলীর বিদ্যে নিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনের সমুদ্র পেরোবার চেষ্টা করছি না। আমি ভাবছি, সময় ভাঙিয়ে জীবনধারণের কথা।"

মিসেস পপি বিশোয়াস এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন। "কিছু মনে করবেন না, মিস্টার, শংকর। আমার এই হাসি আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না। ছোটবেলা থেকেই আমার এই বদ-অভ্যেস। ফরেনে গিয়ে আমার ফার্স্ট হাজব্যেণ্ড এই হাসির জন্যেই আমার ওপর চটে উঠতেন। বলতেন, ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে এই হাসি নাকি কেউ সুনজরে দেখে না। এর জন্যে আমি অনেক মূল্য দিয়েছি, মিস্টার শংকর। আমার প্রায়ই মনে হয়, এই হাসি থেকে দূরে সরে থাকবার জন্যেই আমার ফার্স্ট হাজবেণ্ড আবার অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন।"

"আপনি যত খুশি হাসুন, আমার কোনো আপত্তি নেই", আমি আশ্বস্ত করি মিসেস পপি বিশোয়াসকে এবং তাঁকে যদেচ্ছ আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিই।

মিসেস বিশোয়াস আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "ওঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি, যে খুব দুঃখ পেলেও আমার এই হাসি এসে পড়ে। অনেকটা দমকা কাশির মতো—ইচ্ছে করলেও আমি চেপে রাখতে

পারি না, বাইরে হাসতে-হাসতে এবং ভিতরে কাঁদতে-কাঁদতে আমি অনেক সময় হাঁপিয়ে পড়ি, ঘেমে নেয়ে উঠি।"

পপি বিশোয়াস মুহূর্তের জন্য কথা বন্ধ রাখলেন। তারপর বললেন, "এই যে আমি হাসছি, এর পিছনেও কান্না রয়েছে। গত রাত থেকেই আমার শুধুই মনে পড়ে যাচ্ছে সাবিত্রী ঘোষালের কথা। সময় ভাঙিয়েই খাচ্ছিলেন, কিন্তু সময়ের হিসেব রাখছিলেন না।"

পপি বিশোয়াস এবার একটা সিগারেট ধরালেন। লম্বা টানের পর প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমিও ছিলাম এই সিগারেটের মতন আনকোরা—উই-দাউট এনি অভিজ্ঞতা। হাই-সোসাইটিতে ঘুরছি, চলন-বলন-মেজাজ সব হাই, কিন্তু হাই-সোসাইটির পেট্রল নেই। পয়সা ছাড়া আমার সব আছে।"

"এমন অবস্থায় লোকের কী করা উচিত?" প্রশ্নবান নিক্ষেপ করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আমি বোকার মতো বলতে গেলাম, "উচিত হাই সোসাইটি থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে আসা। নিচু তলাতেও তো কত মানুষ বেঁচে আছে"

"আপনি কিসসু জানেন না। ঠিক মফস্বলের ডেলি প্যাসেঞ্জারের মতো কথা বলছেন!" মন্তব্য করলেন পপি বিশোয়াস। "নিচুতলার লোকেরা শুধু হারতেই জানে, সব সময় আরও নিচে তলিয়ে যাবার জন্যে তারা রেডি হয়েই আছে!"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার মাথায় তখন আবার গোঁ চেপে বসেছে—এই সোসাইটি থেকে আমি কিছুতেই নামবো না। একটা কিছু এসপার-ওসপার করবো বলে মনস্থির করে ফেলেছি, কিন্তু কিছুতেই পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তখন এই মিসেস সাবিত্রী ঘোষালই আমাকে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন।"

মিসেস পপি বিশোয়াস জানালেন, "এক ককটেল পার্টিতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রমহিলা কী এক আপিসে কাজকর্ম করতেন শুনেছি—কিন্তু তাতে তো ওইভাবে লর্ড স্টাইলে থাকা যায় না!"

মিসেস পপি বিশোয়াস থামলেন না। "আমি ওঁর সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানতাম না। শুধু থার্ড পেগ হুইস্কির নেশায় নিজের অবস্থার কথা ওঁকে বলে ফেলেছি। মিসেস ঘোষাল আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছিলেন এবং তারপর মিটমিট করে হেসেছিলেন।"

"ওই হাসি দেখে আমি রাগ করতে পারিনি। উনি শুধু বলেছিলেন সময় থাকতেও কষ্ট পাওয়ার কোনো মানে হয় না, মিসেস বিশ্বাস।"

পপি বিশোয়াস আমাকে বললেন, "আমি কথাটার মানে তখনও বুঝতে পারিনি। মিসেস ঘোষালকে মানে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, সব কথার মানে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না—একটু ভেবে দেখতে হয়। যদি কখনও কিছু জানবার ইচ্ছে থাকে তা হলে আমাক রিং করবেন, এই বলে একটা টেলি-ফোন নম্বর আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, মিসেস ঘোষাল।"

"পরের দিন মদের নেশা কেটে যাওয়ার পরেও মন দিয়ে মিসেস ঘোষালের কথাগুলো ভাবলাম। কিন্তু রহস্যটা যেন পরিষ্কার হলো না।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আরও একদিন ভাবলাম। ইতিমধ্যে অভাব আরও বেড়েছে। কিছু কাঁচা টাকার জন্যে মনটা ছটফট করছে। তখন মিসেস ঘোষালকে ফোন করলাম। ভদ্রমহিলা সোজা আমাকে ওঁর ফ্ল্যাটে চলে আসতে

বললেন, এই থ্যাকারে ম্যানসনে। তখন আপনি এ-পাড়ায় আসেননি। মিসেস ঘোষালই আমাকে হিণ্ট দিলেন প্রথম—বললেন, তোমার তো সবই আছে, তবু চিন্তা কেন ? আমিই সব ব্যবস্থা করে দেবো!"

"কেন অকৃতজ্ঞ হবো, মিস্টার শংকর, উনিই আমাকে প্রথমে এ লাইনে সাহস করে পা ফেলবার পথ দেখিয়ে দিলেন। উনিই বললেন, 'মিসেস বিশ্বাস, তোমার নামটা একটু অলটার করে নাও।' পপি বিশ্বাস রাতারাতি এই অবিশ্বাসের লাইনে এসে পপি বিশোয়াস হয়ে গেলো।"

"আর মিস্টার বিশ্বাস ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"সব বাজে। কোথায় মিস্টার বিশ্বাস? মিস্টার বিশ্বাস কোনোদিনই ছিলেন না। এটা এ লাইনের একটা রেওয়াজ। যেমন মিসেস সাবিত্রী ঘোষাল ! আসলে সাবিত্রী দাস না কি! একবার ছোটবেলায় কী একটা বিয়েও হয়েছিল, কিন্তু বাল্যবিধবা হয়ে মামার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন সাবিত্রী। তারপর কোন একটা আপিসে চাকরিও জুটিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কী আর হবে? পাকেচক্রে কাজের সুবিধের জন্যে সাবিত্রী হলেন মিসেস সাবিত্রী ঘোষাল!"

পপি বললেন, "আপনি এ সব শুনে রাখুন, মিস্টার শংকর। নিজের গোপন কথা তো অন্য কাউকে বলে যেতে পারলাম না। মিসেস ঘোষালের মুখেই প্রথম শুনেছিলাম, এ লাইনে এই মিসেস টাইটেলটা একটা অ্যাসেট। মিস্ হলেই হাজার হাঙ্গামা বুদ্ধিমান লোকরা কপালে সিঁদুর না দেখলে এগোতেই চায় না! আমাদের এ লাইনে বেড সিগন্যালই হচ্ছে গ্রীণ সিগন্যাল!"

আমি অবাক হয়ে মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কেমন সহজে নিজের জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলি তিনি আমার সামনে একের পর এক তুলে ধরছেন। পাকেচক্রে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আসতে না পারলে মানুষের তৈরি এই বিচিত্র সমাজ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "মিসেস সাবিত্রী ঘোষালের কাছে আমি যথেষ্ট ঋণী। ওঁর সাহায্য না পেলে এতো দিনে কোথায় ভেসে চলে যেতাম, তার ঠিকই নেই। উনিই আমাকে মনে করিয়ে দিতেন, "পপি সব সময় মনে রাখবে, সময় ভাঙিয়ে খেয়ে চলেছি আমরা। আমাদের আপনজন বলে কেউ নেই এই নিজের দেহটুকু ছাড়া।"

"আমি ওঁর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখে চলবার চেষ্টা করেছি, মিস্টার শংকর।" মিসেস পপি বিশোয়াস এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কিন্তু যিনি আমাকে এতো জ্ঞান দিলেন তিনি নিজেই শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠলেন।"

আমি পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে আবার তাকালাম। সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিলেন তিনি। তারপর বললেন, "যতদিন সময় ছিল ততদিন বেপরোয়াভাবে কাটিয়ে দিলেন মিসেস ঘোষাল। কোনো চিন্তা করলেন না, সময় যে চিরকাল থাকবে না তাও ভাবলেন না।"

"খুব খরচ করতেন বুঝি, মিসেস ঘোষাল ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"খরচ তো করতেনই—দু'হাতে। থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটখানা ইন্দ্রপুরী করে রেখেছিলেন—গাঁটের টাকায় কেনা নিজের ফ্ল্যাটেও লোকে অত টাকা

ঢালে না। গরীবদুঃখী যে-যা চাইতো তাই হাত উজাড় করে দিতেন। তারপর পদস্খলন হলো!”

পদস্খলন কথাটা শুনেই আমি একটু সজাগ হয়ে উঠলাম। মিসেস বিশোয়াসের কথাবার্তা এবার মন দিয়ে শোনা বিশেষ প্রয়োজন।

পপি বিশোয়াস নিজের মনেই বললেন, “সব লাইনেই ভুলের ক্ষমা আছে, কিন্তু আমাদের এ লাইনে পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত নেই। মিসেস সাবিত্রী ঘোষাল এতো বুঝেও এই সামান্য ব্যাপারটা যথাসময়ে বুঝতে পারলেন না। কোথাকার একটা লোকের সংগে বড্ড বেশী ভাব জমিয়ে ফেললেন। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, পই পই করে সাবধানও করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। সাবিত্রী ঘোষালের প্রধান অ্যাড-ভাইসার তখন আপনাদের ওই শকুন্তলা চাওলা। দুজনে খুব ভাব। ওঁরই কাছে এই থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটখানা জমা রেখে সাবিত্রী ঘোষাল কল-কাতা শহর থেকে বিদায় হলেন সতীসাবিত্রীর রোলে চিরকাল পার্ট করবার লোভে!”

একটু থামলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর বললেন, “কিন্তু কপাল ভাঙতে দেরি হলো না মিসেস ঘোষালের। এক বছর যেতে না যেতে আবার ফিরে আসতে হলো এই শহরে। হবেই তো! পোড়া কপাল না হলে মেয়েরা এ লাইনে আসবে কেন বলুন?”

“সাবিত্রী ঘোষালকে দেখে তখন সত্যি দুঃখু হয়, মিস্টার শংকর! পোড়া কাঠের মতো চেহারা হয়েছে। টাকা কড়ি গয়নাগাঁটি অনেক করেছিলেন মিসেস ঘোষাল, সে সব ওখানে খুইয়ে, গোটা কয়েক কাপড় নিয়ে চলে এসে-ছেন। থুড়ি, চলে উনি হয়তো আসতেন না—ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে।”

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, “এখানেই দুঃখের শেষ নয়। আপনার ফ্রেন্ড শকুন্তলা চাওলা। ওঁর খুরে খুরে নমস্কার! ওঁকে তখনই তো চিনতে পারলাম আমি!”

মিসেস ঘোষালের কাছ থেকে এই থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাট জমা নেবার আগে মিসেস চাওলা বলেছিলেন, “তোমার কোনো চিন্তা নেই, সাবিত্রীদি। পিছনের দিকে না তাকিয়ে যেখানে যাচ্ছ সেখানে চলে যাও। তোমার ফ্ল্যাটটা পেলে আমার খুব সুবিধে হয়। আমি দেখাশোনা করবো, ভাড়া দেবো—তুমি একটা কাগজে লিখে দিয়ে যাও, আমার ফ্ল্যাটে আমার অনুপস্থিতিতে আমার বন্ধু মিসেস শকুন্তলা চাওলাকে কেয়ার-টেকারের দায়িত্ব দিয়ে গেলাম।”

মিসেস সাবিত্রী ঘোষাল সরল বিশ্বাসে সংগে সংগে ওই কথাগুলো একটা কাগজে লিখে মিসেস শকুন্তলা চাওলার হাতে দিয়েছিলেন। শকুন্তলা সেই কাগজখানা ব্যাগে পুরতে পুরতে বলেছিল, “কোনো ভাবনা নেই তোমার। তোমার ফ্ল্যাট তোমারই রইলো—ফিরে এসে এই ফ্রেন্ডের সংগে দেখা করলেই সংগে সংগে চাবি পেয়ে যাবে।”

“কিন্তু, মিস্টার শংকর, মানুষ চিনে রাখুন।” সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

“ওই শকুন্তলা চাওলা—আপনার ফ্রেন্ড, আপনাকে ডিনার খাওয়ায়! কিন্তু লোক মোটেই সুবিধের নয়। বেচারা মিসেস সাবিত্রী ঘোষালকে ওই

মহিলা অসময়ে চিনতেই পারলেন না! ফ্ল্যাটের কথায় আকাশ থেকে পড়লেন! আর ধন্য আপনাদের কয়েকজন কর্মচারি! মিসেস চাওলার সঙ্গে যোগসাজস করে, মিসেস সাবিত্রী ঘোষালের নাম ভাড়াটেদের লিস্টি থেকে ওরা কবে কাটিয়ে দিয়েছে। সেই জায়গায় কার নাম উঠেছে তাও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়!"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার কাছে গিয়ে মিসেস সাবিত্রী ঘোষালের সে কি কান্না! সর্বস্ব ত্যাগ করে ফিরে এসে ভেবেছিলেন মাথা গুঁজবার জায়গাটুকু অন্তত পাবেন। কিন্তু সেখানেও সর্বনাশ!"

দাঁতে দাঁত চেপে পপি বললেন, "এই শকুন্তলার হাত ধরে মিসেস ঘোষাল বললেন, শকুন্তলা, আমি অতশত আইনকানুন বুঝি না। তুমি তোমার মেয়ের সামনে আমাকে কথা দিয়েছিলে, আমি এলেই ফ্ল্যাট ফেরত পেয়ে যাবো।" দাঁতে দাঁত চেপে শকুন্তলা উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার আমার বিজনেস কথা-বার্তার মধ্যে আবার মেয়েকে টেনে আনা কেন?"

কাঁদতে কাঁদতেই সেদিন সাবিত্রী ঘোষালকে অসুস্থ শরীরে এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে চলে যেতে হয়েছিল। আমি নিজেও একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে ফোনে শকুন্তলার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। মহিলার তখন এত গর্ব যে, আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেননি।

"বেচারা মিসেস ঘোষাল তলিয়ে যাবার আগে একবার আড়ালে ওই মিসেস উর্বশী কাপুরের সঙ্গেও গোপনে দেখা করেছিল। মায়ের তুলনায় মেয়েটা তবু একটু নরম। মন দিয়ে মিসেস ঘোষালের কথা সে শুনেছিল। তারপর বলেছিল, 'এসব ব্যাপারে আমি হেলপলেস, আণ্টি। আমার কথা মা শুনবে না।' তবে মেয়েটা নিজের ব্যাগ খুলে মিসেস ঘোষালের হাতে কিছু টাকা দিয়েছিল।"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "তখন মিসেস ঘোষালের যা অবস্থা। ওই দুশো টাকাও কাজে লেগে গিয়েছিল।"

সাবিত্রী ঘোষালের শেষ পর্বও শুনেছিলাম সেদিন মিসেস বিশোয়াসের কাছে। আত্মীয়স্বজনহীন নিরাশ্রয় সাবিত্রী ঘোষাল দারিদ্র্যের জ্বালায় অধঃপতনের শেষ সীমানায় নেমে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে নানা রোগের আক্রমণ।

এই অবস্থায় রাস্তাতেই মরে পড়ে থাকতে হয় সাবিত্রী ঘোষালের মতো অভাগিনীদের। কিন্তু তাঁর ভাগ্য একটু ভাল। এ-পাড়ার দু একজন রিকশওয়ালা ওঁকে চিনতো—আগেকার দিনে মিসেস ঘোষালের কাছ থেকে কিছু কিছু দয়াও পেয়েছিল ওরা।

তারাই রিকশয় চড়িয়ে মার্কুইস স্ট্রীটের মিশনারি এক সেবাকেন্দ্রে অচৈতন্য মিসেস ঘোষালকে রেখে এসেছিল।

সেখানেই অনেকদিন ব্যাধি ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন একদা গরবিনী মিসেস সাবিত্রী ঘোষাল। দারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি কিন্তু শকুন্তলা চাওলার বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলতে পারেননি। রিকশওয়ালা-দেরও তিনি বলতেন, "তোমরা ওই শকুন্তলা সম্পর্কে খুব সাবধান। আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠেই আবার থ্যাকারে ম্যানসনে যাবো। আমার ফ্ল্যাট আমি উদ্ধার করবোই। দরকার হলে আমি হাইকোর্টে কেস করবো, শকুন্তলা চাওলাকে আমি সহজে ছাড়বো না!"

মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখে যন্ত্রণা মেশানো বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, "শকুন্তলা চাওলাকে বুদ্ধির যুদ্ধে হারিয়ে কোনো কিছু ফিরিয়ে নেওয়া কী অত সহজ!"

ফ্ল্যাটের ব্যাপারে মিসেস পপি বিশোয়াস যা বলছেন তা বানানো গল্প কিনা তা খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে আলমারি খুলে রেকর্ড বার করে ফেললাম। এখনকার পাতায় অবশ্যই সিলভার ড্রাগনের নাম ভাড়াটিয়া হিসেবে মুক্তাক্ষরে লেখা আছে।, এক মাস আগাম ভাড়াও ওই প্রতিষ্ঠানের নামে জমা রয়েছে।

পুরনো রেকর্ড খুলতেই মিসেস সাবিত্রী ঘোষালের নামটা বেরিয়ে এলো। ছ'মাস ভাড়া বাকি থাকায় তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। সাবিত্রী ঘোষালের অনুপস্থিতিতে তাঁর কেয়ারটেকার লিখিতভাবে জানাচ্ছেন যে, বাকি ভাড়া শোধের কোনো ব্যবস্থা যখন মিসেস ঘোষাল করেননি, তখন এই ফ্ল্যাটের অধিকার বাড়িওয়ালার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর কোনো উপায় নেই।

এর পরেই রামসিংহাসনের শ্রীহস্ত লিখিত একটি চিরকুটও রয়েছে। এই এস্টেটের বাড়ি ভাড়ার একটি পয়সাও নষ্ট হোক তা রামসিংহাসন চায় না। সৌভাগ্যক্রমে এমন একটি ভাড়াটিয়ার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যে মিসেস সাবিত্রী ঘোষালের বাকি-পড়া ছ'মাসের ভাড়া নগদ টাকায় শোধ করতে রাজী রয়েছে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্যে রামসিংহাসন এক মাসের আগাম ভাড়া দাবি করেছে এবং নতুন ভাড়াটে তাও দিতে প্রস্তুত। নিজের দক্ষতার চূড়ান্ত প্রমাণ দেখিয়েছে রামসিংহাসন শেষ লাইনে। সে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসিক দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বিলাসিনী দেবীর এস্টেটের আয়ও বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং রামসিংহাসনের এই মন্তব্যের জোরেই সিলভার ড্রাগন এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, মিসেস ঘোষালের ফ্ল্যাটের কেয়ার-টেকার যে শকুন্তলা চাওলা তা কোথাও স্পষ্টভাবে লেখা নেই। এবং কেয়ারটেকারই যে অন্য নামে ভাড়াটিয়া হচ্ছেন তার উল্লেখ কোথাও নেই।

নাম বদলের ব্যাপারটা খুব সহজে এবং গোপনেই হয়েছে। আদালতের হাঙগামায় যাওয়া হয়নি একবারও।

মিসেস বিশোয়াস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছেন অত শত ?"

ফ্ল্যাট হাত বদলের পদ্ধতিটা মিসেস বিশোয়াসকে জানিয়ে দিলাম আমি। এর মধ্যে গোপনীয়তা কিছু নেই।

তারপর পুরনো কাগজপত্তরের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেও চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলাম। সাবিত্রী ঘোষালকে আমি কখনও দেখিনি ; কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর জন্যে আন্তরিক দুঃখ বোধ করছি আমি। গণপতিবাবুকে হাতের গোড়ায় পেলে মন্দ হতো না—আইনের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ পাওয়া যেতো।

মিসেস পপি বিশোয়াস ইতিমধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "কী হলো আপনার? অতো মন দিয়ে

পুরনো কাগজপত্তর দেখবার হঠাৎ কী দরকার হলো? এসব কাণ্ডকারখানা তো আপনি থ্যাকারে ম্যানসনে আসবার আগেই হয়েছে। আমরা তো আপনার কোনো বদনাম দিইনি, আমরা তো বলিনি যে আপনার সঙ্গে যোগসাজসে মিসেস শকুন্তলা চাওলা এইসব করিয়েছেন! তবে একশবার বলবো, "আপনিও মিসেস চাওলার ফ্রেন্ড—তিনি ডিনারে নেমন্তন্ন করলে, আপনি খুশী হন!"

আমি বললাম, "মিসেস বিশোয়াস, আমি আইনের কথা ভেবে কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে দেখছি। এক কথায় ফ্ল্যাটের দখল পাওয়া গিয়েছে এই পর্যন্ত—পরে এই নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি তাও সত্য। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আইন অনুযায়ী সব কাজ হয়েছে এ কথা বোধ হয় বলা যাচ্ছে না। মিসেস সাবিত্রী ঘোষালের হয়ে ফ্ল্যাটের দখল বাড়িওয়ালার কাছে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা মিসেস শকুন্তলা চাওলার ছিল কিনা সন্দেহ। অনেকদিন আগেকার ব্যাপার—কিন্তু এখনও আদালতে গেলে জল ঘোলা হতে পারে কিনা, তাই ভাবছি।"

"আপনার ভাববার কোনো দরকার নেই, মিস্টার শংকর!" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "যিনি জল ঘোলা করতে পারতেন তিনি গতকাল সন্ধ্যাবেলায় এ সবের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছেন। গতকাল আপনার এখান থেকে ফেরবার পরেই মিশনারি সেবাশ্রম থেকে খবর এলো, সাবিত্রীদির শরীর খুব খারাপ। আমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।"

মিসেস বিশোয়াস একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "খবর পেয়েই ছুটলাম। সাবিত্রীদি তখন জীবন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন। দেখলে চেনাই যায় না। শীর্ণদেহটা প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। বড় করুণ সে দৃশ্য, মিস্টার শংকর। কী সুন্দর শরীরের মালিক ছিলেন এই সাবিত্রীদি, দেহের জন্যে কত গর্ব ছিল তাঁর, কত মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মিসেস পপি বিশোয়াসের গলাটা এবার যেন অভিমানে বুজে আসছে। বললেন, "আমাকে দেখে বিশ্বাসই করেন না, আমি এসেছি। বললেন, 'তুই এসেছিস পপি?' আমি ভেবেছিলাম তুইও আসবি না!"

"মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সাবিত্রীদি এই থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটের কথা ভুলতে পারেননি। বললেন, আমি তো মিসেস চাওলার কোনো ক্ষতি করিনি, বরং ওঁর উপকারই করতে চেয়েছি—তবু উনি আমাকে ওইভাবে কেন থ্যাকারে ম্যানসন থেকে তাড়িয়ে দিলেন?"

সাবিত্রী ঘোষাল নাকি শেষ মুহূর্তে মিসেস চাওলাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। "কত আমার বন্ধু ছিল, আমার ফ্ল্যাটে এসে কতক্ষণ বসে থাকতো। কত সুখ দুঃখের কথা বলতো। কিন্তু এখন সে এলো না। ওযে না আসতে পারে তা আমার জানা উচিত ছিল।" কাঁদতে-কাঁদতে বলেছেন সাবিত্রী ঘোষাল।

পপি বিশোয়াসের চোখ দুটো সজল হয়ে উঠছে। তিনি বললেন, "যাবার সময় সাবিত্রীদি আমাকে ভাবিয়ে গেলেন। আমার হাত ধরে বললেন, পপি, আমাকে দেখে শিক্ষা নিস। সময় ভাঙিয়ে সুখ করবার কথা একদিন বলেছিলাম তোকে। কিন্তু সময় আছে বলেই তাকে অবহেলায় উড়িয়ে দিস না।

সময় থাকতে থাকতে গুছিয়ে নিস, পপি।”

পপি বিশোয়াস এখন কাঁদছেন। বললেন, “সাবিত্রীদির ওই ফ্ল্যাটটাই এখন শকুন্তলা চাওলার স্পেশাল গেস্ট হাউস হয়েছে। আপনাদের পমা ও বিপুলভূষণকে রাজ-আদরে রাখবার ব্যবস্থা ওই ফ্ল্যাটেই হয়েছিল। শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করে সাবিত্রীদির শেষ কথাগুলো তাকে জানিয়ে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার দেখা করতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না।”

“একটা ফেবার করবেন, মিস্টার শংকর?” মিনতি করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

“বলুন।”

“ওই শকুন্তলা চাওলাকে বলে দেবেন, মিসেস সাবিত্রী ঘোষাল মারা গিয়েছেন। এবং মৃত্যুর সময়েও শকুন্তলার কথা তাঁর মনে ছিল, এই খবরটুকু শকুন্তলার কানে পেঁছে দিতে তিনি অনুরোধ করে গিয়েছেন।”

আমি রাজী হলাম। মিসেস পপি বিশোয়াস এবার সজল চোখে উঠে পড়লেন। বললেন, “শকুন্তলার ভাল হবে না, আপনি দেখবেন।”

শ্রীমতী শকুন্তলা চাওলা ও মিসেস পপি বিশোয়াস—এঁদের সব কথা এখনও আপনাদের জানানো হয়নি। আমার ব্যর্থ জীবনের এই ইতিবৃত্ত শেষ করবার আগে অবশ্যই এই দুই মহিলার বিচিত্র জীবনের শেষ কথাগুলি পুরোপুরি লিখে যেতে হবে। আপনারা নিজেরাই তখন এঁদের দুজনকে বিচার করতে পারবেন, আমার পক্ষে কোনো সওয়াল-জবাবের প্রয়োজন হবে না। সদর স্ট্রীটের পাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে কেন এমন ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পঙ্কোদ্ধার করে চলেছি তাও হয়তো আমার কিছু বিরক্ত ও অধৈর্য পাঠকের কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিন্তু তার আগে আমার একটা জরুরি কাজ আছে। সেই কাজটা করতে আমি আর দেরি করতে চাই না।

সেদিন অভিমানিনী মিসেস পপি বিশোয়াস আরও অনেকক্ষণ আমার কাছে বসে থেকে নিজের মনের বোঝা হালকা করতে চেয়েছিলেন। মিসেস পপি বিশোয়াস চা-ওয়ালাকে ডেকে নিজেই আরও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছিলেন।

চা আসার পর ব্যাগ খুলে মিসেস বিশোয়াস নিজেই দাম দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, “দিই না, মিস্টার শংকর? এর আগের কাপটা তো আপনিই খাইয়েছেন। মিসেস বিলাসিনী গুপ্ত তো ভাড়াটেদের আপ্যায়নের জন্যে আপনাকে কোনো হাতখরচ দেন না। শুধু শুধু আমাদের মতো আজে-বাজে লোকের কথা শোনবার জন্যে আপনি কেন পয়সা অপচয় করবেন?”

সহজভাবে এবং আমাকে ভালবেসেই মিসেস পপি বিশোয়াস কথাগুলো বলেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। আমার অফিস ঘরে আমারই সঙ্গে দেখা করতে এসে কেউ চায়ের খরচ বহন করতে চাইবেন এর থেকে দুঃখের কী থাকতে পারে? আমার বর্তমান অবস্থার এর

থেকে অস্বস্তিকর ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে? মিসেস বিশোয়াসকে আমি দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু আমারই ঘরে বসে চা-ওয়ালার সামনে তাঁর এই আর্থিক বদান্যতা আমাকে আর একবার আমার ব্যক্তিগত শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

মিসেস পাঁপি বিশোয়াসকে পয়সা বার করতে নিষেধ করলাম। আমার আর্থিক অবস্থা অবশ্যই খারাপ, আমার অতীত অনুজ্জ্বল ও ভবিষ্যত অনিশ্চিত, কিন্তু অতিথির কাছে চায়ের অর্থ আদায় আজও আমার কাছে অকল্পনীয়।

মিসেস পাঁপি বিশোয়াস এই মুহূর্তে যেন কোনো বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকের জগদ্বিখ্যাত ফ্রিজ শর্টে বন্দিনী হয়েছেন। ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো তাঁর নরম ডান হাতটি ভ্যানিটিব্যাগের কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মিসেস বিশোয়াসের চোখ দুটো এবার একটু নড়ে উঠলো। চোখের ইঙ্গিতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"প্লিজ দেবেন না। যতই গরীব হই—এ-জিনিসটা কখনো হয়নি।" আমি কাতরভাবে পাঁপি বিশোয়াসকে অনুরোধ করলাম।

মিসেস বিশোয়াস ব্যাপারটা বুঝেই বোধ হয় নিজেই একটু সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে উঠলেন আমাকে মৃদু সস্নেহ বকুনি লাগালেন। "ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কখনও এতো মাথা ঘামাতে নেই। আপনি আমার থেকে অনেক ছোট, মিস্টার শংকর, আপনি শুনে রাখুন, পৃথিবী সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি! এই পৃথিবীতে যদি সুখে বেঁচে থাকতে চান, তাহলে সব সময় হিজ হিজ হুজ হুজ—অর্থাৎ যার যার তার তার পলিসি ফলো করবেন। অপরের বোঝা এই দুনিয়ায় কখনও নিজের মাথায় তুলতে আছে?"

আমি চুপ করে রইলাম। মিসেস পাঁপি বিশোয়াস ব্যাগ থেকে হাত সরিয়ে এনে বললেন, "আপনি বোধ হয় এতোদিন শুধু ইংরেজদেরই দেখেছেন। যদি আপনি ডাচ বা আমেরিকানদের সঙ্গে ঘর করতেন, তা হলে, খরচ ভাগাভাগি নিয়ে মাথাই ঘামাতেন না। দু'জন আমেরিকান সেবার আমার ওখানে এসে ড্রিংকসের অর্ডার দিলো। আপনি বিশ্বাস করবেন না, ওইখানে আমার সামনে দুই বন্ধু পকেট থেকে পয়সা বার করে হুইস্কির খরচ এবং বেয়ারার বকশিশ দু'ভাগ করতে বসলো। এসব ব্যাপারে কোনো লাজলজ্জা নেই—যাদের অনেক আছে। যত লজ্জা আমাদের, এই অভাগা বাঙালীদের।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিসেস পাঁপি বিশোয়াস বললেন, "রাগ করবেন না, মিস্টার শংকর। নানান জাতের মানুষের সঙ্গে মিশে-মিশে কেমন জগাখিচুড়ি বনে গিয়েছি—কোথায় কেমন ব্যবহার করতে হয় সব সময় মনে রাখতে পারিনা।"

আমি মোটেই রাগ করিনি মিসেস বিশোয়াসের ওপর—দুঃখ হয়েছে নিজেরই অবস্থার কথা ভেবে।

মিসেস পাঁপি বিশোয়াস সস্নেহে বললেন, "পয়সার অনেক দাম এই দুনিয়ায়। আমার কথা যদি শোনেন, কখনও ভস্মে ঘি ঢালবেন না। এই যে-পাড়ায় এসেছেন, এটা তো আপনার হাওড়া-কাশুন্দে নয়—এটা তো সুন্দরবনের জঙ্গল। এখানে কোনো রকম চক্ষুলজ্জা রাখবেন না। এই যে চায়ের

দাম আমি দিতে চাইছি, ভাববেন আমি নিজের গাঁট থেকে দিতুম? মোটেই না! পাপি বিশোয়াস আর অতো বোকা নেই।"

তা হলে? আমি মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস বিশোয়াস এবার স্বভাবসিদ্ধ হাসির ঝিলিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। হাসির ধাক্কা একটু কমবার পর তিনি বললেন, "সব আমি আজকের পার্টির কাছ থেকে আদায় করে নেবো। আউট-অব-পকেট খরচ বলে যা চাইব তাই সুড়সুড় করে পার্টি দিয়ে দেবে। কোনো কথা বলবে না, কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না।"

একটু থামলেন মিসেস পাপি বিশোয়াস। তারপর বললেন, "আপনি রাগ করছেন তাই। না হলে জোর করে আমি খরচ দিয়ে দিতাম। যে টাকা দেবার জন্যে গৌরী সেন রাজী রয়েছেন সে-টাকার জন্যে আপনি-আমি কেন ক্ষতি স্বীকার করি?"

পাপি বিশোয়াস এরপর আমাকে আরও অবাক-করা খবর দিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন, "সায়েবরা অনেক সময় আমাদের কাছ থেকেও রসিদ চায়! কী হাঙ্গামা ভাবুন তো! তারপর শুনলাম এঁদের অনেকেই নিজের পকেট থেকে একটি আধলা খরচ করে না—পার্সোনাল ফুর্তির খরচও কোম্পানির ঘাড়ে ট্রাভেলিং এক্সপেন্স বলে চালিয়ে দেয়। কিন্তু সেই জন্যেই পাপি বিশোয়াসের কাছে এসেও রসিদ প্রয়োজন!"

ব্যাপারটা আমার কাছেও অভিনব বটে। এ ধরনের খরচের কথা কখনও আমার কানে আসেনি।

মিসেস পাপি বিশোয়াস বললেন, "কী বলছেন আপনি! বম্বে দিল্লিতে এর জন্যে ইনটারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড ভাঙাবার ব্যবস্থাও আছে। একটি পয়সা নগদ দিতে হয় না। ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে পছন্দ মতো সুন্দরীর সার্ভিস নাও, পরে যথাসময়ে বিল চলে যাবে। বড় বড় সায়েবেরা বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমেরিকান এক্সপ্রেস, ডাইনারস ক্লাব ইত্যাদি কার্ড নিয়ে—তাঁরা কাঁচাপয়সা সঙ্গে রাখার হাঙ্গামা পছন্দ করেন না, আজকাল নগদ বিদায়ের দরকারও হয় না!"

মিসেস পাপি বিশোয়াস এই রহস্যের ওপর আরও আলোকপাত করলেন। বললেন, "রসিদের এবং কাজের সুবিধের জন্যে কেউ কেউ বিউটি সেলুনের লাইসেন্স করিয়ে রেখেছে। আমার ওই বুটিকটাও খুব কাজে লেগে যেতো। রসিদ চাইল ওই বুটিকের নামে কোনো উপহার আইটেম লিখে দিতাম—টাকার অ্যামাউন্টটা সমান থাকলেই হলো, পার্টির তো ওইটা নিয়েই মাথা-ব্যথা। আর শুনেছি, বড় বড় সায়েবদের অ্যাকাউনটেন্ট মাথা ঘামায় না—সায়েবরা দেশে ফিরে গিয়ে যে রসিদই দেন তাই পাস হয়ে যায়।

মিসেস পাপি বিশোয়াস এবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "অমন মনের মতন সাজানো বুটিকটা আমার বন্ধ হয়ে গেলো! কী বলবো আপনাকে! এই গলাকাটা কম্পিটিশনের বাজারে লোকাল মেয়েরা নিজের গতর খাটিয়ে একটা বিজনেস চালাচ্ছে. কিন্তু তার জন্যে পুলিসের কোনো সিমপ্যাথি নেই। কোথায় একটু পান থেকে চুন খসেছে সেই সুযোগ নিয়ে আমার অমন একটা প্রতিষ্ঠানকে ওরা টেমপোরারি বন্ধ করে দিলো।"

কিন্তু পাপি বিশোয়াস যে একেবারে হতোদ্যম হননি, তা তাঁর পরবর্তী কথায় বোঝা গেলো। চোখ দুটো বড় বড় করে তিনি বললেন, "কিন্তু আমার

নামও পপি বিশোয়াস! সব খেলারই সেকেণ্ড ইনিংস আছে—অতো সহজে হার মানবার মেয়ে এই পপি বিশোয়াস নয়। ভগবান যদি অতো নরম কাঠে আমাকে তৈরি করতেন তাহলে কোন্ কালে বানের জলে ভেসে চলে যেতাম। এইভাবে টিঁকে থেকে আপনার সঙ্গে এই ভর-সন্ধ্যেবেলায় গল্প করতে পারতাম না।"

অদম্য আত্মবিশ্বাসের অধিকারিণী এই সুদেহিনী মহিলা! মিসেস পপি বিশোয়াস বিশ্বাস করেন যে, চিরকাল কারও খারাপ যেতে পারে না। এবং ভগবান যখন যা দেন, তা মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয় এবং তারপর আবার অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী সুসময়ের জন্যে।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "বাঙালী মেয়েদের স্বভাবই হলো অল্পেতে ভেঙে পড়া। মেঘ গর্জনেই এরা এমন ভাব করে যেন মহা-প্রলয় এগিয়ে এলো। আমার বাবা উল্টো কথা—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমার মন বলছে, আবার আমার সুদিন আসবে। আমার ওই বুটিক, আমার ওই বিজনেস, আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে আবার চালু হয়ে যাবে।"

মিসেস পপি বিশোয়াসের কাছ থেকে এবার আমায় বিদায় নিতে হবে। কাজকর্ম কিছু বাকি পড়ে আছে। দুজন ভাড়াটিয়া তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করবার জন্যে জরুরি খবর পাঠিয়েছেন। এই সশরীরে ফ্ল্যাট দর্শনের আহ্বান এলে আমি একটু চিন্তিত হয়ে উঠি—ভাড়াটিয়া এসব ক্ষেত্রে একটু গরম মেজাজে থাকেন। অথবা তাঁর এমন কোনো সমস্যা থাকে যার সমাধান আইনত আমার দায়িত্ব হলেও, আর্থিক কারণে সেদিকে নজর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।

এঁদের সঙ্গে দেখা করবার সময়সীমা এবার অতিক্রান্ত হবে। বাড়ির ম্যানেজারের সঙ্গে দিন-রাত্রির যে-কোনো সময়ে মুলাকাত করবার জন্যে ফ্ল্যাটের সব ভাড়াটিয়ারা প্রস্তুত নন। সন্ধ্যা সাতটার পরে একমাত্র এমার্জেন্সি কারণ ছাড়া কোনো ফ্ল্যাটের কলিংবেল টেপা ম্যানেজারের পক্ষে সম্ভব নয়।

মিসেস পপি বিশোয়াসের কাছে এবার বিদায় চাইতেই হবে। ওঁকেও তো ফিরতে হবে অনেক দূরে। সুতরাং বেশী দেরি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আমার কথায় মিসেস পপি বিশোয়াস্ আবার খিল খিল করে হাসতে শুরু করলেন। "দূর কোথায়? আপনি মাঝে-মাঝে এক একটা কথা এমন বলে ফেলেন যে হাসি চেপে রাখা যায় না!"

মিসেস পপি বিশোয়াস এবার আমার সঙ্গে কী ধরনের রসিকতা শুরু করেছেন তা আন্দাজ করতে পারছি না। হাসির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমি পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম।

পপি বিশোয়াস এবার আমাকে মোক্ষম খবরটি দিলেন। "আমি আর আপনার কাছ থেকে দূরে নেই, মিস্টার শংকর। আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছে; কিন্তু পাঁচজনের আশীর্বাদে এবার আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনেই উড়ে এসে জুড়ে বসেছি!"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "কী? আপনিও আমার উপরে বিরক্ত হচ্ছেন নাকি?"

"বিরক্ত হবেন না, মিস্টার শংকর," করুণ আবেদন জানালেন মিসেস বিশোয়াস। "আমার মাথায় অনেক চিন্তা—আমার এখন হাজার রকম অশান্তি। পুরনো বাড়িখানা এখনও আছে—কিন্তু ওখানে রুজি-রোজগারের

ব্যবস্থা অচল। বুটিকেও টেমপোরারি তালা পড়েছে। কোনো রকমে ওখানে মাথা গুঁজবার ব্যবস্থাটা আছে। কিন্তু মিস্টার শংকর, শুধু মাথাখানি দিয়েই তো ভগবান কোনো মেয়েমানুষকে দুনিয়ায় পাঠাননি—সঙ্গে পেট বলে একটা অবুঝ অঙ্গও জুড়ে দিয়েছেন রসিকতা করে। অথচ পেটের কোনো ব্যবস্থা ওই বাড়িতে সম্ভব হচ্ছিল না। তার ওপর ও-বাড়ির মাস মাস ভাড়াও আছে। সুসময়ের আশায় কিছুদিন হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ ভাড়াটে বাড়িতে হরিমটর খেয়ে বসবাস করবো তারও উপায় নেই। অতগুলো টাকা ভাড়া গুনতে হবে। কয়েকটা মাস যে ভাড়া বাকি রাখবো তার উপায়ও নেই! বাড়িওয়ালার উকিল তো ওই সুযোগের অপেক্ষাতেই আছে। একবার আমাকে ডিফলটার বানাতে পারলেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়, বা সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে গিয়ে আমাকে বিদেয় করবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে পারে।”

মিসেস পপি বিশোয়াস এবার একটু থেমে আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, “যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি। আমি যখন কী হবে ভাবছি, তখন মিস্টার জেঠমালানির দয়ায় একটা টেমপোরারি ব্যবস্থা হয়ে গেলো। আপনাকে তো আবার সব বলতে ভয় হয়। আপনি যা রাগী লোক!”

“এসব অবস্থায় আমি কি করতে পারি? মিস্টার জেঠমালানি ছাড়া কার বিরুদ্ধেই বা আমি ব্যবস্থা নিয়েছি?”

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, “না, মিস্টার শংকর, আপনার কাছে আমি কাঁচা মিথ্যে কথা বলবো না—তাতে আমার ক্ষতি হয় হোক।”

এবার কী খবর দেন তা শোনবার জন্যে মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস পপি বিশোয়াস ফিস ফিস করে বললেন, “আপনি বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের খবর জানেন? ওই ফ্ল্যাটের মিসেস কিরণ খোসলা বেচারা স্বামীর হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে কোনোক্রমে প্রাণধারণ করছিল, কিন্তু এখনও স্বামীর ভাগ্য ফিরলো না। বিজনেসম্যান মিস্টার খোসলা এখনও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। মান-সম্মান রাখবার জন্যে মিসেস খোসলা শেষ পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্যে কাকার কাছে পালাতে বাধ্য হয়েছে। হাতে একদম পয়সা ছিল না বেচারার। শেষ পর্যন্ত আপনাদের ওই মদনা, ওই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমাকে ফ্ল্যাটের চাবিটা দিয়েছে কিছু টাকার বিনিময়ে। কিন্তু মাকালীর পা ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছে যেদিন ও চাইবে সে দিনই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তা আমি তো আর আপনার শকুন্তলা চাওলা নই যে ঠোঁটে এক এবং বুকে আর এক হবো। আমি আপনার ওই মদনা এবং মিসেস খোসলাকে কথা দিয়েছি, আমি যে-কটা দিন ঘর আগলে থাকতে পারি ততদিনই আমার সুবিধে। মিসেস খোসলা যেদিন চাইবেন আমি সেদিনই এই থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাট থেকে বিদেয় হয়ে যাবো। তবে, ততদিনে ভগবান যদি মুখ তুলে চান। আপনি যদি আমার জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারেন তা হলে অন্য কথা!”

এই বলে, আমাকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে মিসেস পপি বিশোয়াস তখনকার মতো থ্যাকারে ম্যানসনের অফিস ঘর থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

পপি বিশোয়াস সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাববার সময় এখন হাতে নেই। সময় মতো চিন্তা করা যাবে এই বিচিত্ররূপিণী সম্বন্ধে। এঁকে আমি যতো দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি—এঁর চরিত্রটি আমার কাছে এখনও দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রয়েছে, এতো কাছে এসেও মিসেস পপি বিশোয়াসের কিছুই যেন আমার এখনও জানা হয়নি। পাকে-চক্রে দীর্ঘপথ ঘুরে এই মহিলা যখন অবশেষে আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করলেন তখন নিশ্চয় কোনো নতুন নাটকের শুরু হতে দেরি নেই।

পপি বিশোয়াসকে আমি যে আর ঘৃণা করি না তা যেমন সত্য, তেমনি তাঁর কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু আজকের এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ আমাকে যেন সাবধান করিয়ে দিচ্ছে, বলছে সামনেই হয়তো এমন কোনো নাটক ঘটতে চলেছে যার সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা ভেবে দেখো।

বেয়ারা এসে এবার আমাকে মিস্টার ভড়ের কথা মনে করিয়ে দিলো। মিস্টার ভড়ের ফ্ল্যাটে আমাকে অবিলম্বেই যেতে হলো।

সেখানে সেই পুরাতন সমস্যা। ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক আমাকে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে একটা কিছু বিহিত করবার জন্যে জরুরী আবেদন জানালেন। মিস্টার ভড়ের ঘরের সিলিং-এর একাংশ জলে ভিজে ফুলে রয়েছে এবং সেখান থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে।

মিস্টার ভড় সত্যিই বিপদে পড়েছেন। ওপরের ভাড়াটিয়ার বাথরুমের পাইপ চোক হয়ে গেলেও খেয়াল করেন না। ওই অবস্থায় পূর্ণ উদ্যমে তিনি বাথরুম ব্যবহার করে যান। নিজের ঘর সামলাতে, মিস্টার ভড় ইতিমধ্যেই গত মাসে দু-বার নিজের খরচে ওপরের ভাড়াটিয়ার ফ্ল্যাটের পাইপ পরিস্কার করিয়েছেন। কিন্তু আবার কোনো অজ্ঞাত কারণে জল জমতে শুরু করেছে।

বিরক্ত মিস্টার ভড় আমার কাছ থেকে জানতে চান, এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে আইন-কানুন সব উঠে গিয়েছে কিনা। তিনি কতদিন এইভাবে আত্ম-রক্ষার জন্য অপরের স্যানিটারি পাইপ পরিষ্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন?

প্রশ্নটি অবশ্যই ওপরের মিসেস হীরানন্দানিকে জিজ্ঞেস করলে ভাল হতো। এ-বিষয়ে আমার কী বলবার থাকতে পারে? কিন্তু এই মুহূর্তে ওই ধরনের কোনো উত্তর দিয়ে মিস্টার ভড়ের মেজাজ আরও গরম করে তুলবার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এ বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালাম মিস্টার ভড়কে। এই ঘরে বসে বসেই তিনি দুনিয়ার লোকের ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। ভদ্রলোক আগে মিলিটারি না কোথায় কাজ করতেন। কিন্তু অকালে অবসর গ্রহণ করবার পর, এই ভাগ্যগণনার প্রফেশনে প্রবেশ করেছেন। অকৃতদার মিস্টার ভড়ের একটি বাচ্চা চাকর আছে—সেই সংসারের সব কাজকর্ম করে। অন্য সময়ে ছাপানো হ্যান্ডবিল নিয়ে চাকরটি পার্ক স্ট্রীট অথবা কিড স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, ট্রাম ও বাসের মধ্যে মিস্টার ভড়ের হ্যান্ডবিল ছুঁড়ে দেয়।

এই হ্যান্ডবিল মন্ত্রের মতো কাজ দেয়। এবং প্রতিদিনই কয়েকজন অচেনা ভাগ্যান্বেষী থ্যাকারে ম্যানসনে মিস্টার ভড়ের ফ্ল্যাটে হাজির হন। বিদেশীদের

ক্ষেত্রে মিস্টার ভড় শুধু মৌখিক উত্তর দেন না, টাইপরাইটারে ইংরিজীতে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করেন।

এ হেন মিস্টার ভড়ের পক্ষে ওপর থেকে মাথায় টপ টপ করে জল পড়া অবশ্যই এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

মিস্টার ভড়ের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁকে মনে করিয়ে দিই, এই পুরাতন ম্যানসন বাড়িতে এই ধরনের গোলোযোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এ-বিষয়ে আমি অবশ্যই ম্যানসনের মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, কিন্তু বড় আকারের কোনো খরচের আশা প্রায় সুদূরপরাহত।

আমি জানতে চাইলাম, জলের পাইপের ব্যাপারে অবশ্যই ওপরের ভাড়াটিয়ার অনেকটা দায়িত্ব রয়েছে, সুতরাং মিস্টার ভড় কেন মিসেস হীরানন্দানির সঙ্গে আলোচনা করছেন না?

মিস্টার ভড় বললেন, "আমার ভাগ্যসম্বন্ধে কিছু জানা থাকলে আপনি এই ধরনের পরামর্শ অবশ্যই দিতেন না।"

মিস্টার ভড় জানালেন, তাঁর ভাগ্যে অপরিচিতা রমণী থেকে সমূহ বিপদের প্রবল যোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী দু-মাসে তিনি কোনো রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নন।

পাইপ সারানোর ব্যবস্থাটাও আমার কাছে একটু রহস্যময় মনে হলো। এই কাজের দায়িত্ব মিস্টার ভড় কার ওপরে দিয়েছেন তাও জানতে চাইলাম।

"কেন? কলকালি। এ-বাড়িতে অন্য কোনো মিস্ত্রির প্রবেশ তো আপনারা নিষেধ করে দিয়েছেন?" জানালেন মিস্টার ভড়।

ভাড়াটের কল কাকে দিয়ে সারানো হবে তা আমরা ঠিক করতে যাবো কেন?

মিস্টার ভড় বললেন, "কেন? কলকালি নিজেই তো কিছুদিন আগে ইংরিজীতে লেখা নোটিশে সই করিয়ে নিয়ে গেলো, ভবিষ্যতে কলের ব্যাপারে ম্যানেজারের স্পেশাল অনুমতি না নিয়ে বাইরের কোনো মিস্ত্রিকে ডাকা চলবে না!"

তখনকার মতো কোনো কিছু না বলে মিস্টার ভড়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। যাবার আগে মিস্টার ভড় বললেন, "একদিন সময় করে আসবেন, আপনার ভাগ্যটা পরীক্ষা করে দেখবো। যদি স্পেশাল কোনো কোশ্চেন থাকে, একটা ফুলের নামের সঙ্গে সেটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি অ্যানসার ঠিক করে রাখবো।"

মিস্টার ভড়ের ঘর থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় ভাড়াটের ঘরে যাবো, না কলকালিকে ডেকে ওই বিশেষ নোটিশের ব্যাপারটা খোঁজ নেবো ভাবছি। নোটিশটা যে কলকালির ব্যবসা বাড়াবার একটা বিশেষ পদ্ধতি সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এইভাবে আরও কত নোটিশ কে কোথায় ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

কলকালির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছাদে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময়

বেয়ারা এসে হন্তদন্ত হয়ে বললো, "আপনি কোথায় ছিলেন স্যর? আপনাকে খুব খুঁজছি।"

এতো ব্যস্ত হয়ে খোঁজবার কারণ কী জানাতে চাইলে বেয়ারা বেচারা কোনো ক্রমে বললো, "ট্যাক্সি—লেডিজ, স্যর।"

ট্যাক্সি অবশ্যই আসতে পারে। থ্যাকারে ম্যানসনের এই দু-মুখো গেট দিয়ে কত ট্যাক্সিই তো প্রতিদিন প্রবেশ করছে। অনেক ট্যাক্সিওয়ালা তো মেন রাস্তার হাঙগামা এড়িয়ে শর্টকাটের সুবিধা ভোগের জন্যে থ্যাকারে ম্যানসনে কোনো কাজ না থাকলেও এক গেট দিয়ে ঢুকে খোসমেজাজে অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। থ্যাকারে ম্যানসনের মাইনে-করা দারোয়ানরা ওই সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। রাস্তার ট্যাক্সিওয়ালাদের ওপর নজর রাখবার মতো সস্তা সময় রামসিংহাসন চৌরাশিয়ার সহকারীদের নেই—তারা সেই সময়ে রিক্সাওয়ালা এবং অন্যান্য পার্টিদের কাছে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা আদায়ে ব্যস্ত।

এ-বিষয়ে রামসিংহাসনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার কোনো তাগিদ অনুভব করি না। কারণ রামসিংহাসন চৌরাশিয়া বিচিত্র এক উপাদানে তৈরি। উপরওয়ালার মুখের ওপর প্রতিবাদ করার বা না বলার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। যে কোনো সমালোচনা অথবা আদেশ সে নীরবে মাথা নিচু করে মেনে নেয়, দু-একদিন সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজকর্মও করে। তারপর আবার সেই পুরনো অবস্থা, অথবা তার থেকেও খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

থ্যাকারে ম্যানসনের কম্পাউন্ডের মধ্যে পায়ে চলা পথের যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা রিকশা সম্পর্কে একবার রামসিংহাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। রামসিংহাসন সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু গরীব রিকশাওয়ালাকে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু সে মাত্র একদিনের জন্যে। তার পরেই সেই পুরনো অবস্থা—মধ্যিখান থেকে প্রত্যেক রিকশার ওপর রামসিংহাসনজীর মাসিক প্রাইভেট 'ট্যাক্স'-এর পরিমাণ দেড়া হয়ে গিয়েছিল।

রিকশাওয়ালারা সব জেনে-শুনেও প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। কারণ এ-পাড়ার আর কোথাও এতো ভাল যাত্রী পাওয়া যায় না, এবং ভাড়ার জন্যে অপেক্ষার সময় বাস, লরি কিংবা পুলিসের কথা ভেবে অযথা ব্যস্ত হতে হয় না, রিকশার ওপরে বসেই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেওয়া যায়।

দূরদর্শী রামসিংহাসনজী যে রোজগার বৃদ্ধির আরও সব অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন সে খবরও মদনার কাছ থেকে পেয়েছি।

মদনা বলেছে, "মা-কালীর দিব্যি, স্যর, চুকলি খাওয়ার লাইন আমি ছেড়ে দিয়েছি। আপনি যদি দারোয়ানজীর ওপর রাগ না করেন তবেই খবরটা দেবো, স্যর।"

শুধু রাগ নয়, মদনা সুযোগ বুঝে আমার কাছ থেকে আরও প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল। মদনার কথা শোনামাত্রই তড়িঘড়ি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, কারণ তাতে সংশ্লিষ্ট অনেকেরই খুব ক্ষতি হবে।

মদনার কোনো প্রস্তাবেই আমি না বলতে পারি না। ওর কথাবার্তা এবং হাবভাবের মধ্যে এমন এক ধরনের ছেলেমানুষী আছে যা আমাকে আকর্ষণ করে।

মদনা বলেছিল, "গলার পৈতে জড়ানো থাকলে কী হবে, স্যর? দারোয়ান-জীর নজর উঁচু থেকে নিচু সব দিকে! পয়সা কামানোর কোনো এস্কোপই উনি হাতছাড়া করেন না।"

আমি উৎসুকভাবে মদনার মুখের দিকে তাকালাম। মদনা বললো, "নদীর ঢেউ গুণতে দিলেও দারোয়ানজী তার থেকে টাকা কামানোর পথ বার করে ফেলবেন।"

"তুমি যা বলতে চাও তাই বলো, মদনা," আমি এবার মন্তব্য করি।

মদনা গম্ভীর হয়ে বললো, "এই কলকাতা শহরে পয়সা কামানোর কথা হচ্ছে, স্যর। পয়সা ছাড়া মানুষের এখানে কোনো দাম নেই, সুতরাং পয়সা কামাই করবেন না কেন দারোয়ানজী?"

বুঝলাম, মদনা আসল প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে একটু দ্বিধা বোধ করছে।

আরও একবার মাথা চুলকে মদনা প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করলো। তারপর বললো, "ঠিক হ্যায়, পয়সা তোমার যত খুশী পকেটে পোরো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখো অন্য লোকেরও পকেট এবং পেট আছে। দারো-য়ানজীর ধারণা,অন্য সব লোকের শুধু একজোড়া করে হাত আছে, ওঁর বিনা পয়সায় হুকুম তালিম করার জন্যে।"

"ব্যাপারটা কী? এতো উত্তেজিত হয়ে উঠছো কেন, মদনা?" আমি এবার মদনাকে শান্ত করার চেষ্টা করি।

মদনা এবার বললো, "সুইপারের লাইন আমি ছেড়ে দিয়েছি তাই। না-হলে স্যর এক হাত নিয়ে নিতুম।"

এবার মদনা জানালো, তার রাগের কারণ, দারোয়ানজী শুধু নানা সূত্র থেকেই অর্থোপার্জন করেন তা নয়, নিচের একটি ছোট্ট পায়খানাকেও রোজ-গার বাড়াবার কাজে ব্যবহার করছেন, অথচ দরিদ্র সুইপারদের একটি পয়সাও দেন না। এই টয়লেট ব্যবহারের জন্যে রিকশওয়ালাদের সঙ্গে মাসিক টাকার ব্যবস্থা আছে। এবং পুরো টাকাটি রামসিংহাসনজী পকেটস্থ করেন।

"এ তো গেলো থার্ড ক্লাশ প্যাসেঞ্জারদের কথা!" বললো মদনা। "অনেক ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জারও আছে, স্যর।"

সামান্য ব্যাপারে একাধিক শ্রেণীর উপস্থিতির উল্লেখ স্বভাবতই আমার কৌতূহল বাড়িয়ে তুললো। টয়লেটের অনুসন্ধানে দুর্ভাগা তৃতীয় শ্রেণীর রিকশওয়ালাদের দুর্ভোগের কথা না-হয় বোঝা গেলো, কিন্তু এই ফার্স্ট ক্লাশ যাত্রী কারা?

সত্য কথা বলতে কী, শাজাহান হোটেল ও থ্যাকারে ম্যানসনের যা-অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই সঞ্চয় করেছি তাতে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে আমার তেমন কোনো সন্দেহ হয় না, আমার যত চিন্তা এই ফার্স্ট ক্লাশ লোকদের নিয়ে। এঁরা আমার জীবনকে ইতিমধ্যেই কিছুটা অসহনীয় করে তুলেছেন, যত সমস্যা তার শুরুতেই থাকেন এই ফার্স্ট ক্লাশের লোকেরা।

সুতরাং আমাকে মদনার উল্লেখিত ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠতে হলো।

মদনা আমার উদ্বেগ লক্ষ্য করে হেসে ফেললো। সে বললো, "কিছু ভাববেন না, স্যর। কলকাতার সব জিনিসের মধ্যেই থার্ড ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশ, ফার্স্ট ক্লাশ আছে। ঘোড়ার গাড়িতেও যদি ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড ক্লাশ থাকে, তাহলে আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনের কল-পায়খানায় কেন

ক্লাশ থাকবে না, স্যর?”

মদনা এর পরেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছিল। “ফার্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার মানে ট্যাক্সিওয়ালা।” কিছু পয়সা ঠেকিয়ে অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভার এই থ্যাকারে ম্যানসনের কলঘরে স্নানটান সেরে নেয়। মনের সুখে স্নান করে, গাড়ির পার্টস চুরি হয়ে যাওয়ার বা ট্যাক্সি বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। দারোয়ানজীর লোকরা ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জারদের গাড়ি পাহারা দেয়। একখানা ওয়াইপার পর্যন্ত ট্যাক্সি থেকে সরাবার উপায় নেই।”

মদনার সঙ্গে গোপন কথাবার্তার পর থ্যাকারে ম্যানসনের ট্যাক্সি রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কমপাউন্ডের মধ্যে পড়ে থাকা চালক-বিহীন স্তব্ধ ট্যাক্সি এখন আমার মনে কোনো কৌতূহলের সূচনা করে না। আগে অনেক সময় এই ধরনের গাড়ি দেখলে ভাবতাম, কে এলো এই গাড়িতে? অথবা কার জন্যে এই গাড়ি থ্যাকারে ম্যানসনের ফয়ারের কাছে এইভাবে অপেক্ষা করছে?”

বেয়ারা এসে ট্যাক্সির কথা বলায় আমি প্রথমে তেমন মাথা ঘামাইনি। ভেবেছি মদনাই হয়তো খবর পাঠিয়েছে। সেদিন আমি ওর কথা তেমন বিশ্বাস করিনি, বলে নিজেই মদনা বলেছিল, ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জারের প্রমাণ সে হাতে-নাতে দিয়ে দেবে।

হয়তো কোনো ট্যাক্সিওয়ালা এই মুহূর্তে রামসিংহাসনের প্রাইভেট ধর্মশালায় পদার্পণ করেছে। এ বিষয়ে মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা এখন আমার নেই। তাই বেয়ারার সঙ্গেই ছাদ থেকে নিচে নেমে এলাম না। যে-কাজে এসেছিলাম তা কোনোরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে ধীরে ধীরে সেরে ফেললাম।

তারপর নিজের খেয়ালেই আপিস ঘরে ফিরে এসে আমি অবাক। একটা ট্যাক্সি তখনও ঘরের সামনে মিটার নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে।

ট্যাক্সির পিছনে মাথা নিচু করে যে রমণী মূর্তিকে পাথরের মতো বসে থাকতে দেখলাম তাকে ভুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সীমা! আমি চোখে ভুল দেখছি না তো?

না আমার ভুল হয়নি। সীমাই আমার জন্যে এই সন্ধ্যায় ট্যাক্সির মধ্যে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছে।

আমি দ্রুতপায়ে ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যেতেই সীমার নজরে পড়ে গেলাম। সীমা জানলার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেলো। কিন্তু আমি ততক্ষণে কাছে এসে গাড়ির দরজা খুলে ফেলেছি।

ট্যাক্সি থেকে সীমা ধীরে ধীরে নেমে এলো। মালপত্তর বলতে এবার সীমার সঙ্গে তেমন কিছু নেই—মাঝারি সাইজের একটা চামড়ার সুটকেশ।

সীমার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল ট্যাক্সিটা তার জন্যেই অপেক্ষা করে। কিন্তু ট্যাক্সির চালক আমাকে দেখেই অধৈর্য হয়ে উঠলো। সে এখন এই ছোটা-ছুটির টাইমে বেতো ঘোড়ার মতো ওয়েটিং-এ থাকতে চায় না। ট্যাক্সিওয়ালা স্পেশাল কায়দায় বললো, “হাতজোড় করছি, স্যর—এই সময়টায় আটকে রাখবেন না। ছেড়ে দিন স্যর, দরকার হলে এ পাড়ায় তু করে ডাকলেই দশ-খানা ট্যাক্সি ছুটে চলে আসবে।”

অগত্যা কথা না-বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে সীমা বিদায় দিলো। ওর হাত

থেকে ভারি স্যুটকেশটা ছাড়িয়ে নিলাম আমি।

ম্লান হাসলো সীমা। বললো, "আমার বোঝা আপনি বইবেন কেন?"

আমি বললাম, "এইটাই নিয়ম। শাজাহান হোটেলে কোনো মহিলাকে আমরা লগেজ বইতে দিতাম না।"

"আপনি তো এখন আর হোটেলে নেই", স্মরণ করিয়ে দিলো সীমা।

এখন সীমাকে নিয়ে কোথায় যাই? সোজা কী আমার ঘরে চলে যাবো? সীমা তো এখন আর এ-বাড়ির ফ্ল্যাটের কেউ নয়। সে যখন এখানে এসেছে তখন ভাড়াটে-ম্যানেজারের সম্পর্ক নেই, এখন সীমা আমার অতিথি।

সীমা কিন্তু অফিস ঘরের দিকেই এগুলো। ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা সে ওই সরকারী ঘরেই ঢুকে পড়লো। বাধ্য হয়ে আমিও ব্যাগ নিয়ে অফিস ঘরে তাকে অনুসরণ করলাম।

ঘরের দ্বিতীয় আলোটা আমি জেবলে দিলাম। এই উজ্জ্বল আলোটা অতিথি না-থাকলে সাধারণত নেবানোই থাকে।

দেড়শ ওয়াটের ওই ফিলিপস ল্যাম্পের আলোতেই অনেকদিন পরে আমি সীমার মুখ স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। সীমা যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। জেঠমালানির বিশ্বস্ত হোস্টেস স্মার্ট সুতনুকাকা যে সীমাকে কয়েকমাস আগে বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর আজকের এই শ্যামল নিষ্প্রভ সীমার মধ্যে যেন অনেক তফাত।

সীমার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়েছি। সে কোনো কথা না-বলে সেই চেয়ার অধিকার করেছে।

আবার এইভাবে কোনো এক সন্ধ্যায় সীমার সঙ্গে আমার দেখা হবে তা প্রত্যাশিত ছিল না। তবু অনেকদিন পরে সীমাকে আবার দেখতে পেয়ে মনের মধ্যে অনাস্বাদিত পরিতৃপ্তি অনুভব করছি।

কীভাবে কেমন করে কথার শুরু হবে তা মনের মধ্যে মহলা দিতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সীমাকে আমার কী বলবার আছে? এমনভাবে এই ভরসন্ধ্যায় বিনা খবরে সে এখানেই আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো কেন?

সীমা নিজেই এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো। আমার দিকে তাকালো সীমা, তারপর শান্তভাবে বললো, "এখানে কিছুই পালটায়নি দেখছি। সবই আগেকার মতো রয়েছে।"

"এখানে কিছুই বোধ হয় পালটায় না", আমি উত্তর দিলাম। "সেই কোন্ কাল থেকে, আমি আসবার অনেক আগে থেকে এখানকার জীবনযাত্রার ছক বাঁধা হয়ে আছে। আমরা চলে যাবার পরেও হয়তো এখানকার কিছু পালটাবে না।"

সীমা আমার কথা শুনে হাসবার চেষ্টা করলো। লম্বা ট্রেন জার্নিতে বেচারা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মুখের ওপর অনেক ধুলোবালিও পড়েছে। চুলগুলোও ট্রেনের হাওয়ায় বিশৃঙ্খল হয়ে আছে।

সীমা নিজেই এবার কিছু খবর দিলো। ট্রেন অনেক লেট। কোথায় কীসব দাবী জানাবার জন্যে একদল লোক রেল লাইনের ওপর বসে পড়ে ট্রেন বন্ধ করে দিয়েছিল। এদের কথা কর্তৃপক্ষ না-শোনা পর্যন্ত ট্রেন চলতে দেবে না তারা।

সীমা বললো, "কেউ ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসছে না, আর

আমার চিন্তা বাড়ছে। দিনের আলো থাকতে-থাকতে কলকাতায় পৌঁছনো যে কত দরকার তা এরা কী বুঝবে?”

সীমা বললো, “অবশেষে জেলা ম্যাজিসট্রেট না কে যেন ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওদের হাত থেকে কী এক-খানা অভিযোগপত্র গ্রহণ করলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন এসব খুঁটিয়ে দেখবেন, তখন লোকগুলো লাইন থেকে উঠে দাঁড়ালো।”

সীমা এবার ছোটমেয়ের মতো হাসছে। বোকা-বোকা নিষ্পাপ এই হাসিতে সীমাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

সীমা বললো, “কেউ প্রতিশ্রুতি দেয় না যে অভিযোগের প্রতিকার হবে। ছাপানো কাগজ হাতে নিয়ে বিবেচনা করাবার প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য এখন ট্রেন বন্ধ করতে হয়।”

সীমা এবার অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে বসলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “সংসারে শেষ পর্যন্ত কোনো বিচার-বিবেচনা হয়? কেন জানি না, আমার তো খুব সন্দেহ হয়—মনে হয়, যখন বিচার-বিবেচনার ইচ্ছে থাকে না, তখনই বড়-বড় লোকরা বলেন, এখন যাও, যথাসময়ে সব বিচার করে দেখবো।”

সীমা অবশ্যই ভুল বলেনি। আমাদের সমাজের অপ্রিয় সত্যগুলো অবশ্যই সে এবার বুঝতে আরম্ভ করেছে।

সীমাকে এইভাবে আপিসঘরের বসিয়ে রাখতে আমার মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। যদি আমার কোনো আপনজন হাওড়া কাসুন্দে অথবা বনগাঁ থেকে এখানে দেখা করতে আসতো তাহলে আমি কি এতোক্ষণ তাকে এই অফিসঘরে বসিয়ে রাখতাম?

দু-একটা অপ্রিয় প্রশ্নের সম্ভাবনা মনের মধ্যে উঁকি মারছে। কিন্তু ওইসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার মতো মানসিক অবস্থা এখন অবশ্যই আমার নেই।

কথা না বাড়িয়ে সীমার সুটকেশ আমি আবার হাতে তুলে নিলাম, তারপর সীমাকে বললাম আমাকে অনুসরণ করতে।

সীমার মনে অবশ্যই দ্বিধা ছিল। কারণ সে বললো, “এই, শুনুন। অতো তড়বড় করবেন না। এখানেই কথাবার্তা কিছু বলে নেওয়া যেতো।”

আমি অবশ্যই সীমার কথাবার্তায় এই মুহূর্তে কান দিতে চাই না। নিরুপায় হয়ে সীমাও আমার পিছন পিছন হাঁটতে লাগলো।

আমার ঘরে পৌঁছে গিয়েছি। সীমা আমার সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে গিয়ে একটু হাঁপাচ্ছে।

আমি সময় নষ্ট না-করে হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দিলাম।

সুইচ অন করে দিতেই সীমা বেশ অবাক হয়ে গেলো। বললো, “আপনার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি! হিটার কবে এলো? এর আগে তো একটা মাটির কুঁজো ছাড়া ঘরে কিছুই ছিল না।”

আমি চায়ের গেলাস দুটো টেবিলে সাজাতে সাজাতে বললাম, "চিরকাল বিনা হিটারে চলে না। মাঝে মাঝে কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে হয়, কোথাও না বেরিয়ে, কাউকে বিরক্ত না করে, এই ঘরটায় বসে-বসে একটু গরম চা উপভোগ করতে ইচ্ছে হয়। সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।"

"বেশ ভাল হিটার দেখছি!" মন্তব্য করলো সীমা।

সীমার জানা উচিত, আমি প্রতি মাসে এখন মাইনে পাচ্ছি। মাথা গুঁজবার জন্যে আমাকে ভাড়া দিতে হয় না। মাইনের পরিমাণ যতই কম হোক না কেন, আমি প্রতি মাসেই সমস্ত টাকাটা খাওয়ায় খরচ করছি না—কিছু কিছু জমছে।

হিটারের খবরটাও সীমাকে দিয়ে দিলাম। এই সব ছোট্ট খবর কাউকে দিতে পারলে মনটা হালকা হয়ে যায়। সীমাকে জানালাম, "এই হিটারের জনক তেলকালিবাবু। বিভিন্ন জায়গা থেকে যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করে অবসর সময়ে নিজের হাতে ভদ্রলোক এটা তৈরি করেছেন। দাম অবিশ্বাস্য কম পড়েছে—একমাত্র তেলকালিবাবুর পক্ষেই এমন অবিশ্বাস্য দামে বৈদ্যুতিক হিটার তৈরি করা সম্ভব।"

দ্রুতগতিতে চায়ের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আমি টেবিলের ওপর বার করে ফেললাম—চিনি, মিল্ক পাউডার, চায়ের পাতা।

আড়চোখে সীমা ওসব দেখলো। তারপর বললো, "আপনি গুড বয়ের মতো হাত গুটিয়ে তক্তপোশে বসুন। চায়ের কাজটা আমিই করবো।"

আমি এ প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাচ্ছি না। আমার ঘরে এসে অন্য কোনো অতিথি চা তৈরির হাঙ্গামা সহ্য করবেন, এ কেমন কথা!

সীমাকে বললাম, "ট্রেন জার্নির পরে এখনই কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।"

আমার অস্বস্তি ভাঙবার জন্যে সীমা ব্যাপারটাকে মুহূর্তের মধ্যে হালকা করে তুললো। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে সীমা বললো, "ক্লান্তিকর ট্রেন জার্নির পরে চা সম্পর্কে কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়—আপনার তৈরি চা সম্বন্ধে আমার একটুও ভরসা নেই। থাকলে, অবশ্যই আপত্তি করতাম না।"

"যার হিটার, যার কাপ তাকেই এইভাবে অপমান।" আমিও কপট রাগ দেখাই, কিন্তু বুঝতে পারি, সীমার হাতে চা তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।

সীমা কখন খেয়ে বেরিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এমনই অগোছালো অবস্থা যে ঘরে একখানা বিস্কুটও নেই।

কিছু খাবার আনাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। সীমা হেসে বললো, "খিদে পেয়েছে সত্যি কথা। কিন্তু তার জন্যে বাজারে ছোটবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

সীমা সত্যিই আমাকে অবাক করে দিলো। গরম জলে চায়ের পাতা ছড়িয়ে দিয়েই সে ব্যাগ খুলে ফেললো এবং সেখান থেকে একটা কাঁচের শিশি বার করে ফেললো। শিশির মধ্যে বেশ কয়েকটা মুড়ির মোয়া।

সীমা বললো, "আমার হট ফেভারিট। আপনার ভাল লাগবে কি না জানি না।"

"আমারও হট ফেভারিট এই মুড়ির মোয়া। কিন্তু পাবো কোথায়?"

আমি উত্তর দিই।

শিশিটা সীমা আমার দিকে এগিয়ে বললো, "একটা তুলে নিন। পিসিমা আজ সকালেই তৈরি করেছেন। আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছেন—ইচ্ছে করলেই এখন মুড়ির মোয়ার বিজনেস শুরু করে দিতে পারি।"

আমি একটা মোয়া তুলে নিয়েছি। সীমার নজর তখন চায়ের পাত্রর দিকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার আমি কেন জানি না অজানা আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

মুড়ির মোয়া চিবোচ্ছি—যে কেউ বাইরে থেকে আমাদের দেখলে ভাবব, এরা বেশ আনন্দর মেজাজে রয়েছে কিন্তু মনে মনে আমি এবার ভিন্ন এক পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। কে যেন আমাকে চুপি চুপি জানিয়ে দিলো। এবার তোমাকে অস্বস্তিকর প্রশ্নমালার সামনে পড়তে হবে।

আমার তৈরী চায়ের কাপে মুখ দিয়ে সীমা বললো, "বেশ ভাল ট্রেনিং হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে!"

"চায়ের দোকান খুললে বিক্রি কম হবে না তাহলে?" আমি রসিকতা করি।

সীমা কিন্তু ওইদিকেই গেলো না। ছোট্ট মেয়ের মতো বললো, "বালাই ষাট, আপনি কোন্ দুঃখে চায়ের দোকানে কষ্ট করতে যাবেন? ছোটবেলা থেকে অনেক কষ্ট করেছেন, এবার তো সুখের মুখ দেখবার সময়।"

সীমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, বেঁচে থাকার জন্যে এই প্রতি-দিনের যুদ্ধ আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে, এসব আমার সত্যিই আর ভাল লাগে না। অনেক পরিশ্রমে, অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে অবসন্ন আমি এবার কোনো শান্ত উপত্যকায় পৌঁছতে চাই—আমার মন এখন বিশ্রামপ্রয়াসী।

এসব কথা তো সহজে আমার চিন্তায় স্থান পায় না। কিন্তু আজ সীমাকে চোখের সামনে দেখে এমনভাবে আমি কেন নিজের কথা ভাবতে আরম্ভ করলাম?

আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে সীমা নিপুণা এয়ার হোস্টেসের মতো ঝটপট চায়ের গেলাস দুটো নিজের হাতে পরিষ্কার করে ফেললো।

এবার যে কথাবার্তার ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হবে তা আমি যেন আগে থেকেই বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেও কিন্তু আগাম প্রস্তুতির কোনো সুযোগ হচ্ছে না।

গেলাস দুটো যথাস্থানে রেখে সীমা সত্যিই এবার নীরবতা ভঙ্গ করলো। সীমা আমার দিকে তাকালো না। নিজের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থেকে, মাথা নিচু রেখে সীমা জিজ্ঞেস করলো, "আমার চিঠি পাননি?"

চিঠি একখানা পেয়েছিলাম কয়েক সপ্তাহ আগে। সেই চিঠি বারবার পড়েছি আমি। প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

"সে চিঠির উত্তর কিন্তু পাইনি," সীমা এবার অভিযোগ করে বসলো।

"যে চিঠির ঠিকানা থাকে না, পোস্ট অপিস তার উত্তর পৌঁছে দিতে পারে না, সীমা।" সীমার জানা উচিত, কারণ ডাকঘরের পরিবেশেই সে মানুষ হয়েছে।

"ঠিকানা ছিল না?" অবাক হয়ে যায় সীমা। ব্যাপারটা সে বিশ্বাসই

করতে পারছে না। "সে কেমন করে হবে?" ঠিকানা ছাড়া আপনাকে কেন লিখবো? আমার সম্বন্ধে আপনার তো জানবার কিছু বাকি নেই।"

তাহলে ভুল করেই ঠিকানাটা বাদ দিয়েছে সীমা। আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়েছিল, ইচ্ছে করেই নিজের ঠিকানা দেয়নি সীমা। সে চায় না, থ্যাকারে ম্যানসনের কোনো নোংরা মেঘ তার গ্রামের উজ্জ্বল পরিবেশকে হঠাৎ অন্ধকার করে তোলে।

এবার আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। এক মিনিটের মধ্যে সীমার চিঠিখানা নিজের সুটকেস থেকে বার করে ওর হাতেই ফিরিয়ে দিলাম।

সীমা তার সুন্দর হাতে গোটা গোটা করে লিখেছে, "আজ ভোরবেলায় স্নানের সময় আপনার কথা মনে পড়লো। বাবাকে সুখী দেখলে সীমার আনন্দ হবারই কথা......কিন্তু সঞ্চয়ের কলসী ক্রমশই শূন্য হয়ে আসছে, তাই সুলেখার চিন্তা বাড়ছে।......"

সীমা নিজেই অবাক হয়ে গেলো। তার চিঠি যে এমন যত্ন করে আমি রেখে দিয়েছি তা সে ভাবতেও পারেনি।

সীমা বললো, "আমি তো ভাবলাম, আমার চিঠি আপনার হাতেই পৌঁছল না। পৌঁছলেও, চিঠি নিয়ে মাথা ঘামাননি আপনি—কোথায় ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।"

সীমাকে কেমন করে বোঝাবো, সব চিঠি ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে ফেলা যায় না। ঘুরে-ফিরে একই চিঠির কথা মনে পড়ে যায়—বারবার একই চিঠি পড়তে হয়, এবং বারবার পড়লেও একঘেঁয়েমি আসে না। প্রতিবারই নতুন কোনো অর্থ বেরিয়ে পড়ে।

সীমার মুখের দিকে তাকালাম আমি। বিধাতার কী আশ্চর্য খেয়ালে আমি এই মেয়েটির এতো কাছাকাছি চলে এলাম? অথচ দশ নম্বর ঘরে সেই সুলেখা সেনের সঙ্গে আমার সেই অদ্ভুত প্রথম সাক্ষাতের কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

সীমা এখন কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম।

সীমা গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললো, "কোথায় সীমা? এখন আবার সুলেখার খবর জিজ্ঞস করুন। সুলেখা সেন। "একটু থামলো সীমা। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলো, সুলেখা সেন কেয়ার অফ......"

"কেয়ার অফ কে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

হেসে উঠলো সীমা। "বলবো, বলবো। কারুর কেয়ারেই তো সুলেখাকে থাকতে হবে, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি। এর আগে তো সুলেখা সেন ছিল কেয়ার অফ সিটি অফ ক্যালকাটা! বাবা তখনও জেলে ছিলেন, বেরিয়ে আসবার স্বাধীনতা ছিল না সুলেখা সেনের, খুব সুবিধে হয়ে গিয়েছিল।"

আমি কিন্তু সীমার খবর জানবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে আছি। সেই ভোর-বেলায় বাবার সঙ্গে সীমাকে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় করে দিয়ে আমি যেন স্বস্তির নিঃশবাস ত্যাগ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই বন্দীশালা থেকে যেন এক নিরপরাধ বন্দিনীকে অবশেষে মুক্তি দিতে পেরেছি।

সীমা এখন আবার গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বললো, "আমার সম্বন্ধে বাবা কিছুই বুঝতে পারেননি শংকরবাবু, তার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। সেই রাত্রে আপনি যদি ওইভাবে বাবাকে আশ্রয় না দিতেন,

তা হলে সীমা শেষ হয়ে যেতো।”

আমি ওসব পুরনো কথা শুনতে ততো আগ্রহী নই। আমি জানতে চাই তার পরের কথা।

সীমা বললো, “বাবা এখান থেকে যাবার সময় আপনার ওপর খুব সন্তুষ্ট। বললেন, তোমার বন্ধুর ছোটভাইটি বেশ!”

“বাবা, আপনার সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন,” সীমা এবার ঘোষণা করলো।

যার আদৌ কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা সন্দেহ, তার সম্বন্ধে বাণী থাকলে অবশ্যই তা জানবার লোভ হয়।

সীমা বললো, ট্যাক্সিতে হাওড়া স্টেশনে যেতে যেতে বাবা বললেন, খুব ভাগ্যবান ছেলে মনে হচ্ছে। তুই দেখিস সীমা, ও একদিন নাম-করা লোক হবে। অনেক উন্নতি ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।”

আমার হাসি দেখেই সীমা বুঝলো ওসব কথার আমি একটুও গুরুত্ব দিচ্ছি না।

সীমা চোখদুটো বড় বড় করে বললো, “বাবা জেলে বসে কীসব সাধনা করেছেন। মানুষের কপাল দেখলেই অনেক কথা বলে ফেলতে পারেন।”

সীমা সম্বন্ধে কী ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে তা জানবার আগ্রহ আমার কম নয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে সীমা হেসে ফেললো। “বাবা তো ধরেই নিয়েছেন, আমার সামনে অনেক ভোগ! বাবা বলেছেন, 'তোর কাছে তো রাজার ঐশ্বর্য থাকবার কথা—অথচ তুই এইভাবে আমার সঙ্গে কষ্ট করছিস।' জ্যোতিষের অঙ্কটা আমার ব্যাপারে বাবা মেলাতেই পারছেন না। তাই বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন তিনি।”

সীমা এবার নিজের কথা শুরু করলো। নতুন জায়গায় গ্রামে পিসিমার কাছে গিয়ে প্রথম কিছুদিন মন্দ কাটেনি। পিসিমা সবাইকে বলেছিলেন, তাঁর ভাই কড়া অসুখে পড়ে অনেকদিন স্যানাটোরিয়ামে ছিল। ওই জন্যেই চাকরি গিয়েছে। এখন সুস্থ হয়ে সে বাড়ি ফিরে এসেছে।.

“তারপর?” আমি জিজ্ঞেস করি।

সীমা প্রথমে গম্ভীর হয়ে রইলো। তারপর “আমার ভাগ্যে কোনো সুখই তো বেশীদিন সয় না। ভেবেছিলাম, বাবা হয়তো শেষ পর্যন্ত পেনসনের কিছু মাসিক টাকা পাবেন। কিন্তু আবেদন-নিবেদন করে কোনো ফল হলো না—তাঁরা জানালেন, যাকে বরখাস্ত করে জেলে পাঠানো হয়েছে, তাঁকে পেনসন দেবার কোনো কথাই ওঠে না।”

“উঁচু মহলে চিঠি লিখে সুফল না হোক, কুফল হতে দেরি হলো না, শংকরবাবু” সীমা নিজের খেয়ালেই বাবার দুঃখের কথা আমাকে জানিয়ে যাচ্ছে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কুফলের বিবরণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সীমা বললো, “যে-কারণে ওই গণ্ডগ্রামে বাপকে নিয়ে গেলাম, তাই ভণ্ডুল হতে লাগলো।” সীমার স্বরে এবার কান্নার ইঙ্গিত। অনেক কষ্টে সে যে চোখের জল চেপে আছে তা বুঝতে বাকি রইলো না আমার।

ওকে বিব্রত করার মতো কোনো প্রশ্ন আমি আর করবো না, তা স্থির করে ফেলেছি। সেই জন্যে আমি নির্বাক হয়েই সীমার দিকে তাকিয়ে আছি।

কিন্তু সীমা থামলো না। সীমা নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "বোধ হয় গ্রামের পোস্টমাস্টারের মাধ্যমেই খবরটা বেরিয়ে পড়লো। জেল থেকে বেরুনো দাগী আসামীই যে আবার ফিরে এসেছে তা কানে কানে সব ঘরে রটে গেলো।"

"আর আপনার খবর?" আমি নিজের উদ্বেগ আর চেপে রাখতে পারলাম না।

সীমা অদ্ভুত এক যন্ত্রণা হজম করে নিয়ে বললো, "জেলফেরত পোস্ট-মাস্টারকে নিয়েই তখন সবাই ব্যস্ত। সীমার খবর ওখানে পৌঁছয়নি!"

"বাবা প্রায় সব সময়ে ঘরের মধ্যেই বসে থাকেন। কোথাও বেরোন না। মাঝে মাঝে শুধু ডাকাতকালীর মন্দিরে মাকে রাঙা জবাফুল দিয়ে আসেন। এবং বাকি সময় পুজো, আর পুজো।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সীমা হেসে ফেললো। "বাবাও জানতে চাইলেন, তোর অফিসে কত দিনের ছুটি!"

"টাকা ফুরিয়ে আসছে। সুতরাং বলতেই হলো, 'ছুটি আর বেশী দিন নেই।' বাবার তখন মাথায় অন্য চিন্তা। বললেন, 'চাকরি জিনিসটা মেয়েদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়, সীমা।' আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু পিসিমার সঙ্গে পরামর্শ করে বাবা রায় দিয়েছিলেন। আমার জন্যে আর চাকরি নয়।"

একটু থামলো সীমা। তারপর বললো, "বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলতে যে কী কষ্ট হয়, আপনাকে কী বলবো! কিন্তু উপায় কী বলুন? পাপের বিষে আকণ্ঠ ডুবে থাকার অভিশাপ আছে আমার উপর।"

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে সান্ত্বনা ও সাহস দিতে গেলাম সীমাকে। কিন্তু সে আমার কথা কানেই তুললো না।

সীমা বললো, "বাবা ঘোষণা করলেন, মেয়ের বিয়ে না-দেওয়া পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম আসছে না। স্বপ্নের মধ্যেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আমার মা তাঁকে ভর্ৎসনা করছেন।"

বাবার এই উদ্বেগের পিছনে আমি কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না। বিশেষ করে যে-মেয়ের মা নেই তার বাবার তো বাড়তি দুশ্চিন্তা হতেই পারে।

আমার মত যে বাবার পক্ষেই যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে সীমা আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললো, "সব জেনেও আমাকে আর কষ্ট দেবেন না, শংকরবাবু। এই বিয়ে—আমার বিয়ের চেষ্টাই তো বাবার দুর্ভাগ্যকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে ডেকে আনলো। আমার বিয়ের পণ যোগাড় করতে গিয়ে আমার নির্লোভ বাবাকে জেলের যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করতে হলো। শেষ জীবনের একমাত্র সম্বল চাকরি এবং পেনসন তাও নষ্ট হলো।"

সীমা বোধ হয় বাবার অপমানের ও কষ্টের কথা স্মরণ করে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সে হাঁপাচ্ছে। এবং ওই অবস্থাতেই আমাকে বললো, "এক এক সময় নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, এমন দুর্ভাগ্য হয়ে এতোদিন বেঁচে থেকে বাবার দুশ্চিন্তার বোঝা হয়ে দাঁড়ালাম কেন? সংসারে আমার মতো বোকার কী দাম আছে?"

আমি পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দুর্ভাগিনী সীমার দুঃখের ইতিহাস এক মনে শুনে যাচ্ছি। কোনো রকম মন্তব্য করবার মতো ক্ষমতাও আমি

যেন এই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছি।

সীমা বললো, "সব চেয়ে দুঃখের কী জানেন? ছোট আদালতে যখন বাবার জেল হলো, পাকেচক্রে আমি যখন এই কলকাতার গোলকধাঁধায় বন্দী হয়ে পড়লাম, তখনও ভেবেছিলাম—একটু সুবিধে পেলেই, বাবাকে আমি মুক্ত করে আনবো। আমি শুনেছিলাম, আদালতে আপীল করলে এবং টাকা খরচ করে বড় উকিল-ব্যারিস্টার দিলে, তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। ওই যে আমি অমনভাবে মিস্টার জেঠমালিনীর কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছিলাম। তার একটা কারণ আপীলের বাড়তি টাকাটা, বড় ব্যারিস্টারের ফি-টা তাড়াতাড়ি যোগাড় করে ফেলা। কিন্তু......"

সীমা অনেকক্ষণ কথা বলে এবার একটু দম নিচ্ছে। অথবা পরবর্তী অধ্যায়ের খবরটা আমার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করছে।

"টাকার জন্যে আমি তখন কী করিনি? এ-লাইনের পুরনো মেয়েরাও আমার বিশ্বগ্রাসী লোভ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। ওই যে মিসেস পাপ বিশোয়াস, উনিও আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, 'কাঁচ-কাচাদের তো অত কাঞ্চন-কামনা থাকে না, লাইনে বেশ কিছুদিন থাকবার পর টাকার লোভ হয়, সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই সব কিছু গুছিয়ে নেবার জন্যে মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সুলেখা সেনের কথাই আলাদা! এ-লাইন সম্বন্ধে সব খবরাখবর নিয়ে ডক্টরেট হয়েই ও-মেয়ে যেন এই থ্যাকারে ম্যানসনে এসেছে।"

আমি এখনও সুলেখার সুন্দর শান্ত মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছি। থ্যাকারে ম্যানসনের বাইরে এ-মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে কে কল্পনা করতে পারতো ওর পিছনে এতো দুঃখ ও অপমান জড়ো হয়ে আছে?

সীমা বললো, "সেই টাকা হলো। ব্যারিস্টারের কাছেও গেলাম। কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে। উকিলরা বললেন, সময় পেরিয়ে গিয়েছে। ওঁর জেলশাস্তির অনেকখানি তো ভোগও হয়ে গেলো। এখন আর ব্যস্ত হয়ে লাভ কী?"

সীমা পুরনো কথা বলতে গিয়ে এখনও ফুঁসছে। সে বললো, "উকিলরা আমার ব্যস্ততা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, এতোদিন কী ঘুমিয়ে ছিলেন? কী তাদের উত্তর দেবো বলুন? কেন যে ওঁদের কাছে এতোদিন যেতে পারিনি তা ওঁরা জানবেন কী করে?"

সীমা এবার নিজেকে সামলে নিলো। তারপর বললো, "আমি ওঁদের বলেছিলাম, আপীলের সময়-অসময় কী? বাবাকে যদি একদিন আগেও জেলখানা থেকে বার করে আনতে পারি সেটাও আমার লাভ।"

"উকিলদের শেষ পরামর্শ মতো বাবার সঙ্গে জেলে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপীলের নাম শুনে বাবা আঁতকে উঠেছিলেন, 'সে তো অনেক খরচের ব্যাপার! টাকা কোথা থেকে আসবে?' বাবার মুখে সেই এক প্রশ্ন। এর সোজাসুজি উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, বাবা যদি একবার জানতে পারেন তাঁর আদরের সীমা তাঁর বিপদের সময় ঘূর্ণিঝড়ে কোথায় ভেসে গিয়েছে তা হলে ওই জেলের মধ্যেই তিনি হার্টফেল করতেন।"

সীমা বললো, "বাবাকে তখন মিথ্যা বলেছি। গুরুজনের কাছে মিথ্যাচারণ মহাপাপ, কিন্তু কী করবো? পাপের আগুনেই তো আমি পুড়ে

মরতে বসেছি তখন। বাবাকে বললাম, অফিসের এক ভদ্রলোক কিছু টাকা ধার দিতে রাজী হয়েছেন। তুমি মামলায় জিতে গেলে, মাইনে থেকে শোধ করে দেবো ? বাবা ওসব ঝুঁকিতে গেলেন না। বললেন, অফিস থেকে যে-কটা টাকা পাবো তা তোর বিয়ের জন্যে আমাকে রাখতেই হবে সীমা। জেলের সময় তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এখনই তো সয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। আমি ওই ক'টা টাকায় আর হাত বসাবো না। তোর একটা বিয়ে হওয়া আমার এই জেলে থাকার চেয়ে অনেক জরুরী ব্যাপার সীমা।"

সীমা বললো, "এই ক'মাসে দেশে ফিরে যাবার সময় স্বপ্ন বিফল হয়েছে। অফিস থেকে যে একটা পয়সাও উদ্ধার হবে না, তা বুঝতে ওঁর এই ক'মাস লেগে গিয়েছে। আমার বিয়ের জন্যেও ওঁর দুশ্চিন্তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কিন্তু যে-বাবার কোনো অর্থসংগতি নেই মেয়ের বিয়ের জন্যে তাঁর চিন্তার কী মূল্য এই দেশে থাকতে পারে বলুন ?"

সীমার এই প্রশ্নের উত্তর কী দেবো ? উত্তর তো কিছুই দেবার নেই। আমাদের এই তথাকথিত সুসভ্য সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থের ও বিত্তের অন্ধ পূজা অসভ্য সমাজকেও লজ্জা দিতে পারে।

সীমা বললো, "শাঁখা-সিঁদূরের বদলে মেয়েকে পার করবার লোভ বাবাকে পেয়ে বসেছিল। অনেক চেষ্টাও করলেন। এক জায়গায় খানিকটা এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু অপর পক্ষ যেমনি বাবার জেলে যাওয়ার খবরটা গ্রাম থেকে শুনলো অমনি অ্যাবাউটটার্ন করে কুইক মার্চ করে তারা উধাও হয়ে গেলো।"

এরপর কী হলো তা জানবার জন্যে আমি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছি।

সীমা সমস্ত খবরই আমাকে দিয়ে দিলো। "এদিকে আমার অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠছে। যা-কিছু সঞ্চয় এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম তা ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল। শেষে দিকে বাবা হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়ে গেলেন। ডাক্তার বদ্যি সামলাতে গিয়ে শেষের দিনটা হঠাৎ এগিয়ে এলো। আমি বুঝলাম, সীমার দিন এবার শেষ হতে চলেছে, এখন আবার সুলেখাকে প্রয়োজন। সুলেখা কলকাতায় না-ফিরে গেলে বাবার চিকিৎসাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

সুলেখা ? তাকে আবার কেন ? সে তো চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে সীমাকে সামনে রেখে। আমি নিজেই এবার ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

সীমা আমার উদ্বেগ বোধ হয় লক্ষ্য করলো না। নিজের মনেই সে বলে চললো, "বাবাকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছু গোলমাল হলো না। বাবা সরল মনেই ভাবলেন, কলকাতার চাকরিতে আমার ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছে। এবার কাজে যোগ না দিলেই নয়। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, "তবে এসো। খুব সাবধানে থেকো কিন্তু। আর..."

"আর কী!" আমি জানতে চাই শান্তভাবে।

সীমা এবার খিলখিল করে হেসে ফেললো। "বাবার কথা শুনে হাসিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বাবা বললেন, 'আর একটা কথা, খুকু। আমি তোমার বিয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। একটা কিছু ব্যবস্থা হলেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে দেবো। তখন কিন্তু একটুও দেরি কোরো না। তার পাওয়া মাত্রই সোজা এখানে চলে আসবে, না হলে কিন্তু আমার মুখ থাকবে না।"

সীমা বললো, "সব জেনে-শুনেও বৃদ্ধমানুষকে, বিশেষ করে নিজের বাবাকে ঠকাতে খুব কষ্ট হয়, শংকরবাবু। কিন্তু সংসারে আমাদের মতো মেয়েদের অন্য উপায় কী আছে বলুন?"

সীমা এবার হাসি দিয়ে বোধ হয় কান্না ঢাকবার চেষ্টা করছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে নিজের চোখ নামিয়ে নিলো। তারপর বললো, "বাবা আমার সম্বন্ধে যা-যা পরিকল্পনা করছেন আমি তার কোনোটাতেই প্রতিবাদ করিনি। উনি যা-যা বলেছেন, আমি তাতেই হ্যাঁ বলেছি। এবং একটা ব্যাপারে আপনাকেও জড়িয়ে এসেছি।"

আমাকে সীমা তাহলে সত্যিই নিজের দেশে ফিরে গিয়েও সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি। আমাকে কী আর জড়াতে পারে সীমা?

"বিনা অনুমতিতে এই যে আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছি তার জন্যেই ক্ষমা চাইতে এসেছি আজ, শংকরবাবু," সীমা কেমন করুণভাবে হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছে।

"আমাকে কী আর জড়ানো সম্ভব?" আমি বিমর্ষভাবেই উত্তর দিলাম। "আমার মতো মানুষের ক্ষমতা কতখানি তা সংসারের কারও জানতে বাকি নেই।"

সীমা এই ধরনের উত্তর আমার কাছে প্রত্যাশা করেছিল কিনা তা আজও আমি নিঃসন্দেহ নই। সে আমার কাছে আরও একটু ভরসা পেতে চেয়েছিল কিনা তাও জানি না।

সীমাকে বললাম, "আমি কীভাবে জড়িয়ে আছি তা জানতে পারি কি?"

সীমা এবার বেশ লজ্জা পেয়ে গেলো। এই লজ্জাকেও হাসি দিয়ে ঢেকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সীমা: এবং কোনো রকমে বললো, বাবার কাছ থেকে আমার বিয়ের টেলিগ্রাম এলে, আপনার ঠিকানাতেই আসবে। সীমা, কেয়ার অফ শংকর, থ্যাকারে ম্যানসন, ক্যালকাটা সিক্সটীন।"

সীমা এবার যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। হাসির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো, "কোনো রকম দ্বিধা করবেন না, শংকরবাবু। আমার নামে চিঠি টেলিগ্রাম, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, খাম যাই আসুক আপনি কোনো সংকোচ না-করে সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলবেন এবং পড়ে ফেলবেন। বুঝলেন? কোনো রকম দ্বিধা করবেন না," এই বলে সীমা হেসেই চললো। তার হাসির ব্রেকটা যেন এই মুহূর্তে তার নিজেরই আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে।

সীমার সময় যেন শেষ হতে চলেছে—আবার শুরু সুলেখার। আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে আমার হঠাৎ ভয় হলো, সীমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সুলেখাই যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অথচ সুলেখাকে আমি চাই না—তাকে চিরকালের নির্বাসনে পাঠিয়ে সীমার মুক্তি হোক। কিন্তু সংসারে আমার মতো মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কী মূল্য আছে?

এবার যে আমাকে প্রশ্ন করছে সে সীমা? না সুলেখা? সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে—"মিস্টার জগদীশ জেঠমালানির কী খবর? ভদ্রলোক কল-

কাতায় নেই নাকি?"

আমি সত্যিই ওই জেঠমালানি ভদ্রলোকের কোনো খবরাখবর রাখি না। বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ যেখানেই তিনি থাকুন আমার কিছু এসে যায় না।

সুলেখা বললো, "ওঁর চোখের মণি ভাগনেটির কী হলো? ভদ্রলোক তো আগে খুব অ্যাকটিভ ছিলেন।"

আমাকে এবার সত্য কথা স্বীকার করতে হলো। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট যে আর ওঁদের অধিকারে নেই তাও শুনিয়ে দিলাম। যে-ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই অঘটন ঘটেছে সেখানে তারও যে সামান্য ভূমিকা ছিল তা সুলেখা নিশ্চয় এখনও জানতে পারেনি।

জেঠমালানির কর্মচারি মিস্টার আর সি ঘোষকে সুলেখা অবশ্যই চিনতো। ফ্ল্যাটের দরজার সামনে যাঁর নাম অমন বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল তাকে অত সহজে সে ভুলবে কী করে? কিন্তু এতোদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারি মিস্টার আর সি ঘোষ কেন হঠাৎ এইভাবে জেঠমালানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবেন তা সে ভেবে উঠতে পারছে না। তার ধারণা কোনো অজ্ঞাত কারণে, এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মচারিরা শত দুঃখ-কষ্টেও মুখ খোলে না, নীরবে সমস্ত জীবন ধরে জেঠমালানিদের সেবা করে যায়।

ইংরিজীতে একটা কথা আছে—কেঁচোও কখনও কখনও ফোঁস করে ওঠে। সুতরাং আর সি ঘোষও তেমন পরিস্থিতিতে কেন ফোঁস করে উঠবেন না?

সুলেখার হয়তো আরও জানবার আগ্রহ ছিল। কিন্তু যে ঘটনামালায় আর সি ঘোষের কৃতী পদস্থ জামাইয়ের সঙ্গে সুলেখা নিজে আকস্মিকভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এবং যা-জানতে পেরে আর সি ঘোষ উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন, সুলেখার সামনে বসে তা আমি মুখে আনতে পারলাম না। এই থ্যাকারে ম্যানসনে এসে মানুষের অনেক অধঃপতনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে আছি আমি, অনেক পাপকে আমি প্রায় মেনেও নিয়েছি, কিন্তু সুলেখা, তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে সে-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করবার মতো মানসিক অবস্থায় আজও আমি পৌঁছতে পারিনি।

সুতরাং এই নাটকের কিছুটা তখনকার মতো সুলেখার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেলো। সুলেখা ভেবে বসলো, এই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়াটা বোধ হয় জেঠমালানিদেরই কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ।

একটু আশ্চর্যই হয়ে গেলো সুলেখা। সে বললো, "অবাক কাণ্ড! ওঁরা যে এই চৌত্রিশ নম্বর ছেড়ে কখনও চলে যাবেন তা আমি ভাবতেই পারিনি। কারণ মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি নিজেই বলেছেন আমাকে যে এই চৌত্রিশ নম্বর ঘরের উপর তাঁর বিশেষ টান আছে। এই যে জেঠ-মালানিরা সামান্য একখানা দোকান ঘর থেকে ক'বছরে বিজনেস এতো উন্নতি করেছেন তার পিছনে থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বর ঘরের অনেক দান আছে। সে কথা মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি কোনোদিন ভুলতে পারবেন না—সুতরাং জেঠমালানি কোম্পানির কর্মপ্রবাহে থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের গুরুত্ব ক্রমশই বেড়ে যাবে।"

সুলেখা একবার মিস্টার আর সি ঘোষের কথাও ভাবলো। পপি বিশোয়াসকে শিখণ্ডী রেখে যে জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জেঠমালানিরা এই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন তাও

আমি সুলেখার কাছে অপ্রকাশিত রেখেছি। অকারণে আমার কাজকর্মের এবং বিপদ-আপদের কথা এই মুহূর্তে সুলেখাকে জানিয়ে তার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই।

সুলেখা এবার জিজ্ঞেস করলো, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট মিস্টার জেঠমালানি নিজেই ছেড়ে দিলেন, না মিস্টার আর সি ঘোষ এই কাজ করলেন।

মিস্টার আর সি ঘোষের এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা আছে জেনে সুলেখা একটু মুষড়ে পড়লো। সুলেখা বললো, "আমার চিন্তা বাড়ছে, শংকরবাবু। একে ওঁরা স্থানীয় লোকদের তেমন বিশ্বাস করেন না, আপিসে গুটিকয়েক স্থানীয় কর্মচারি আছে। তার ওপর মিস্টার আর সি ঘোষের কোনো স্পেশাল ঘটনা ঘটে থাকলে, বিপদ আরও বাড়বে।"

সুলেখাকে এবার আমি কী বলি? জেঠমালানিদের সঙ্গে কতখানি কী যোগাযোগ করে সে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি না।

আমি এখনও অধীর আগ্রহে সুলেখার কথাবার্তার জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার মন বলছে সুলেখা হয়তো এবার আমার পরামর্শ চাইবে। এবং আমি তখনই কাতরভাবে অনুরোধ করবো, "সীমা, তোমার অতীতকে ভুলে যাও। তুমি আর জেঠমালানিদের সঙ্গে যোগাযোগ করো না। আমি জানি, আমি সামান্য লোক, তবু তুমি আমার ওপর নির্ভর করো।"

সুলেখা ওসব কিছুই করলো না। আমার আশংকা হলো, জেঠমালানি-দের দূত এখনই হয়তো সুলেখার জন্যে বিশেষ কোনো খবর নিয়ে এখানেই হাজির হবে।

সুলেখা এবার গম্ভীর হয়ে চৌত্রিশ নম্বর ঘরের খবরাখবর জানতে চাইলো। "ওই ফ্ল্যাট এখনও জেঠমালানিদের হাতে ফিরে আসেনি?" সে জানতে চাইলো।

চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটকে বড় বিজনেসম্যানের জাল থেকে মুক্ত করে এনে আমার মানসিক ঔদ্ধত্ব বোধ হয় একটু বেড়ে গিয়েছিল। নিজের সাফল্যে নিজেরই অজ্ঞাতসারে একটু মোহমুগ্ধ হয়ে ছিলাম। সুলেখাকে তাই গম্ভীর কিন্তু শান্তভাবে আমার বক্তব্য জানিয়ে দিলাম।

সুলেখা আমার মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, "চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট অত সহজে আর জেঠমালানিরা ফেরত পাচ্ছেন না। সময় অনেক পাল্টেছে, সুলেখা। থ্যাকারে ম্যানসনে এখন আর দারোয়ানদের পুরনো রাজত্ব নেই।"

এইখানেই আমার চুপ করে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সীমার কাছে নিজের সামর্থ্য ও সাফল্য প্রচারের উত্তেজনাতেই বোধ হয় আমি বলে ফেললাম, "মিস্টার জেঠমালানি যত বড় লোকই হোন, তাঁর হাতে যত ক্ষমতাই থাক—ওই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট আর তাঁর হাতে ফিরছে না।"

সুলেখা আমার কথা শুনে চুপ করেই রইলো। তারপর কী ভেবে সে জানতে চাইলো, "এই জন্যেই কী মিস্টার জেঠমালানি আমার কোনো খবরা-খবর করলেন না?"

খবরাখবর নেবার কী আছে তা ঠিক মতো আন্দাজ করতে পারছি না। সুলেখা কি মিস্টার জেঠমালানির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করেছে?

সুলেখাকে একটু চিন্তিত দেখালো। সে বললো, "বোধ হয় ভুল করে বসেছি। যা কিছু খবরাখবর তা বোধ হয় এই থ্যাকারে ম্যানসনের ঠিকানায় পাঠিয়েছি। এবং সেক্ষেত্রে আমার চিঠি, টেলিগ্রাম কিছুই ওঁদের হাতে পৌঁছয়নি।"

সুলেখা এবার দাঁত দিয়ে নিজের হাতের নখ কাটতে লাগলো। তারপর কী ভেবে উত্তর দিলো, "তাই বা কী করে হয়? আমার প্রথম চিঠির উত্তর তো মিস্টার জেঠমালানি দিয়েছিলেন, লিখেছিলেন, ফিকির্ মত্ কীজিয়ে। তোমার জন্যে জেঠমালানি কোম্পানিতে সব সময় কোনো না কোনো পোস্ট খালি থাকবে।"

সুলেখা এবার যেন বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। রহস্যটা সে বুঝতে পারছে না। তার প্রথম চিঠিটাও তো এই থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বরের ঠিকানায় লেখা। "সে চিঠি তাঁদের হাতে পৌঁছলো কী করে, যদি ওঁরা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে থাকেন? এবং সে চিঠি যদি বিনা হাঙ্গামায় ওঁদের হাতে পৌঁছে থাকে তা হলে পরের জরুরী চিঠি ও টেলিগ্রামের একই গতি হলো না কেন?"

ব্যাপারটা আমার কাছেও একটু রহস্যময় মনে হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে এখনই খোঁজ-খবর করে আমি কিছু আলোকপাত করতে পারি।

সুলেখার অবশ্যই একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। মুখে-চোখে জল দিয়ে ট্রেনযাত্রার কালিমা ঘুচিয়ে ফেলারও সময় হয়ে গিয়েছে।

আমি সুলেখাকে সেই সুযোগ দিতে চাইলাম। তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, "এতো চিন্তার কিছু নেই। এখন আপনি একটু মুখ চোখে জল দিয়ে নিন। আমি খোঁজ খবর নিয়ে এখনই আসছি।"

সুলেখা এবার আমার মুখের দিকে কেমন অসহায়ভাবে তাকালো। আমার মনে হলো, এবার সে যেন কিছু বলতে চায় আমাকে।

সুলেখা, তোমার সঙ্গে আমার তেমন কোনো যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। আমি সীমার সঙ্গে সংযোগ রাখতে ব্যাকুল।

সীমা এবার যেন আমার ওপর অভিমান করতে চায়। সীমা হঠাৎ শাড়ির আঁচলে মুখের ঘাম মুছে ফেলতে ফেলতে বললো, "ভাগ্যে আমার চিঠিতে ঠিকানা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

সীমা আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দেবে মনে হয়। এমনভাবে কথা বলছে, যেন তার নীরব বক্তব্য ঃ আমার চিঠিতে ঠিকানা না থাকায় আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, আমাকে সহজে দূরে সরিয়ে দিতে পেরে, আমার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে আপনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।"

সীমা, তুমি মুখ ফুটে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করো। আমার উত্তর তৈরি হয়ে আছে। শুধু মুখের উত্তর নয় আমার এই ঘরের মধ্যেই আমার চিন্তা ভাবনার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। তুমি যে এই মুহূর্তে আমার ঘরের মধ্যে বসেই এই সব কথা ভাবছো, তা আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে। অন্য কোথাও হলে তোমার মনের মধ্যে সন্দেহের সুযোগ থেকে যেতো। এখানে সেসব সম্ভব নয়। তোমার প্রশ্ন ও আমার উত্তরের মধ্যে কোনো সাময়িক বিরতি থাকবে না। তোমার কথা শেষ হওয়া মাত্র আমি ড্রয়ার খুলে আমার প্রমাণ বার করে আনবো।

কী প্রমাণ? প্রমাণটা প্রকাশের জন্যে আমি নিজেই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনের ব্রেক কষে উৎসাহের চক্রযানকে স্তব্ধ করতে হলো। আর একটু দেরি হলে হয়তো অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো।

মনের ভিতরের অন্য এক সাবধানী আমি আমাকে এবার চুপিচুপি মনে করিয়ে দিলো এই নির্জন সন্ধ্যায় সীমা তোমার অতিথি। তাকে তুমি কথাচ্ছলে অনেক দিন পরে থ্যাকারে ম্যানসনে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছো। তার নিজের মধ্যে এখনও অনেক সংশয় ও শঙ্কা। সে তোমার সাহায্যপ্রার্থী। হয়তো তোমার ওপর তাকে এই বন্ধুহীন বিদেশী পরিবেশে নির্ভর করতে হয় বলেই সীমা এতো মধুরভাষিণী, তার কণ্ঠে তাই হয়তো এই অন্তরঙ্গতা। এই বিশ্বাস, এই নির্ভরতা যেন অপমানিত না হয়।

মনের ভিতরের আমি এবার আমাকে প্রশ্ন করলো, "প্রমাণ দাখিলের জন্য এতো ব্যস্ততা কেন? সীমা কি তোমাকে এখনও মুখ ফুটে প্রশ্ন করেছে?"

মুখ ফুটে সবাই সব প্রশ্ন করে না, আমি নিজের সঙ্গেই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। কিন্তু ভিতরের সাবধানী আমি তবু আমাকে এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা দিল না, বললো, "এখনই তো সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না, তুমি প্রথমেই বরং সুলেখার পাঠানো চিঠি ও তারের একটা খোঁজ খবর করে এসো।"

সুলেখা আমার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে। আমার আবার মনে হচ্ছে, আমার নিজের সম্বন্ধে যা-বলার তা এখনই বলা উচিত ছিল।

আমার সময় বেশী লাগবার কথা নয়। এই মুহূর্তে টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেলতে হবে: সেখানে আমার সুখ-দুঃখের নিত্য-সঙ্গী যে ডায়রিটা আছে তা একবার আমার প্রয়োজন। সেই ডায়রির মধ্যেই যত্ন করে আমার প্রমাণটা রেখে দিয়েছি।

সেইটা বার করে, আমি এখনই সীমার হাতে তুলে দিতে চাই। বলতে চাই, "সীমা, তুমি যা আশঙ্কা করছো, তা মোটেই সত্য নয়। তোমার ছোট্ট ওই চিঠিটা পড়ে, দায়সারাভাবে এক কোণে সরিয়ে রাখিনি। তোমার ঠিকানা নেই দেখেই আমার দায়িত্ব সঙ্গে-সঙ্গে চুকে যায়নি। কেন জানি না, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা অবশ্যই তখনও হয়নি। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবেই। শুধু দেখা নয়, তার আগেই তোমার ঠিকানাটা আমি উদ্ধার করতে পারবো। এবং সেই আশাতেই দেখো আমি কত দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আমার ডায়রির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।"

সীমা আবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমিও ওর দিকে তাকাচ্ছি। মনে মনে আমি বলছি, "সীমা, তোমার ছোট্ট চিঠিটা আমার জীবনে অদ্ভুত এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। এই প্রথম তোমার কাছেই আমি স্বীকার করছি, একমাত্র এই চিঠিটাই আমি বার বার পড়েছি—বোধ হয় অকারণে।"

"সীমা, শুধু তোমার চিঠি পড়াতেই আমার কাজ শেষ হয়নি। কোনো কোনো অলস অবসরে এই ঘরে টেবিলের সামনে বসে আমি আকাশ-পাতাল ভেবেছি এবং শেষ পর্যন্ত কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। যে চিঠির ঠিকানা নেই, যাকে পোস্টাপিসের পিওন মানুষের ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বার করতে

পারবে না তাকেই আমি উত্তর লিখতে শুরু করেছি।”

“সীমা, আমার এই ভাগ্যহীন জীবনে, পত্র রচনায় কখনও দ্বিধা আসেনি। কত সহজে আমি মনের কথা কাগজে লিপিবদ্ধ করে যাই—এই ব্যাপারে ঈশ্বর আমার ওপর অযথা অকৃপণ হননি। আমার কলম আটকে যায় না। কিন্তু এই প্রথম আমার কলম সঙ্কোচে স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। আমি দু-একটা লাইন লিখে কেটে ফেলেছি। কিন্তু আবার লিখতে গিয়ে সেই কাটা লাইনগুলোই আবার ফিরে আসতে চেয়েছে। ফলে সেই কাগজ ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন কাগজে লিখতে বসেছি।”

সীমা একবার ঘড়ির দিকে, এবং আর একবার আমার মুখের দিকে তাকালো।

কী আশ্চর্য! এতোক্ষণ আমি নিজের সঙ্গেই কাল্পনিক কথা বলে চলেছি, সীমাকে কিছুই বলিনি। আর কথা বলার দরকার নেই। আমার লেখা ডাকে-না-ফেলা চিঠিখানা প্রাপকের হাতে তুলে দিলেই তো কাজ চুকে যায়।

কিন্তু হঠাৎ ভিতরের অ্যালার্ম বেল আবার আমাকে সাবধান করে দিলো। চিঠিখানা দেবার আগে একবার পড়ে দেখা অবশ্যই উচিত। যারা সহজেই মনস্থির করে ফেলতে পারে, কলম চালাবার আগেই যারা সিদ্ধান্তে পেঁছে যায়, আমি তো তাদের দলে নই। একা-একা বসে এই চিঠিতে আমি কী লিখে ফেলেছি, এই মুহূর্তে সীমার হাতে এই অবস্থায় তা তুলে দেওয়া যায় কিনা, তাও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন।

“সীমা, তুমি কী অধৈর্য হয়ে উঠছো?” আমি আবার শব্দহীন ভাষায় প্রশ্ন করি। “তুমি আমার অবস্থাটা একটু বুঝে দেখো। বিপদে পড়ে যে আমার কাছে পরামর্শ অথবা আশ্রয়ের জন্য এসেছে আমি তাকে কোনো-ভাবে বিরক্ত করতে চাই না। আমি হঠাৎ মনের সমস্ত অর্গল খুলে দিয়ে তাকে এমন অবস্থায় ফেলতে চাই না যে সে আরও বিপদে পড়ে যায়।”

এবার আমি সরব হয়ে উঠলাম। “আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি সমস্ত খবরাখবর নিয়ে এখনই ফিরে আসছি।” ততক্ষণ সীমাকে এই ঘর-খানা নিজের মতো ব্যবহার করবার অনুরোধ জানিয়ে গেলাম।

সীমা নিজেও যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। চৌত্রিশ নম্বর ঘরের ব্যাপারটা বোধ হয় বেচারাকে একটু বাড়তি ভাবিয়ে তুলেছে।

কিন্তু কোনো চিন্তা নেই, সীমা। তুমি যার কাছে এসেছো তাকেও একটু চিন্তার সুযোগ দাও, তার ওপর সব বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজে একটু নিশ্চিন্ত হও।

সীমা কী আমার মনের কথা বুঝতে পারলো? ও কেমন যেন অসহায়-ভাবে হাসলো এবং ইঙ্গিতে আমাকে বেরিয়ে যাবার অনুমতি দিলো।

স্নানঘরের জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সীমা আপত্তি করলো। বললো, “আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমার সব জানা আছে। আর জিনিসপত্তর আমার ব্যাগে আছে।”

সীমাকে লেখা চিঠিখানা আমি দ্রুতবেগে পকেটস্থ করে ফেললাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম নিজের কাজে।

চৌত্রিশ নম্বর ঘর। এ ঘরের ভূত আমাকে ছেড়েও ছাড়ছে না। এখন ঘরে ফিরে জেঠমালানিকে বিতাড়নের জন্যে আমি নিজেই না অপরাধী বনে

যাই।

চিঠিপত্রের রহস্য অনুসন্ধান করতে যে বেশী সময় লাগলো না তার কারণ রামসিংহাসন চৌরাশিয়ার সাময়িক অনুপস্থিতি।

মাত্র কয়েকদিন আগে রামসিংহাসনের পুত্রবধূ চৌরাশিয়া বংশকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছে। নবজাত এই বংশধরের মুখদর্শনের জন্য উৎফুল্ল রামসিংহাসন চৌরাশিয়া তার সমস্ত বৈষয়িক কাজে সাময়িক ইতি টেনে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দেশে যাবার জন্যে ট্রেনে উঠে পড়েছে। থ্যাকারে ম্যানসনের নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের ওপর হঠাৎ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের বিচারবুদ্ধি রামসিংহাসনের নখের তুল্যও নয়!

কয়েকজনের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলে যা বোঝা গেলো তা এই রকম। সরকারীভাবে জেঠমালানিদের সঙ্গে এ-বাড়ির কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, রামসিংহাসন তার নিজস্ব যোগাযোগ অবশ্যই রেখে চলেছে। তার ফলে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ঠিকানায় যেসব চিঠিপত্র আসে রামসিংহাসন অবশ্যই তার দিকে নজর রাখে এবং সেগুলি সযত্নে সংগ্রহ জেঠমালানি কোম্পানির মালিকদের কাছে নিজের হাতে পেঁৗছে দিয়ে আসে। নিজের হাতে পেঁৗছে দিয়ে আসবার একমাত্র কারণ ঐ সময়ে মালিকরা রামসিংহাসনের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে থাকেন।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী থ্যাকারে ম্যানসনের ঠিকানায় লেখা সুলেখার প্রথম চিঠি যে মিস্টার জেঠমালানির হাতে যথাসময়ে পেঁৗছবে তাতে আশ্চর্য কী?

কিন্তু রহস্য তার পরবর্তী চিঠি ও টেলিগ্রাম নিয়ে। সেগুলো কি যথাসময়ে জেঠমালানির হাতে পেঁৗচেছে?

রামসিংহাসনের সুযোগ্য সহকারী কানহাইয়ালাল দুবে আমাকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালো। সে বললো, "হুজুর, আমাকে একবার রামসিংহাসনজীর থলিয়াটা দেখবার সময় দিন। রামসিংহাসনজীর অনুপস্থিতিতে সমস্ত জিনিসপত্র আমরা ওঁর হুকুম মতো একটা থলিয়াতে জমিয়ে রাখছি, উনি এসে ব্যবস্থা করবেন। আমরা তো ভেবেছিলাম, আজই উনি চলে আসবেন। কিন্তু নাতির মায়া কাটিয়ে উনি বোধ হয় ট্রেনে চড়ে বসতে পারেননি।"

ব্যাগ সার্চ কর সত্যিই ফল হলো। সুলেখার চিঠি ও টেলিগ্রাম দুইই সেখানে রামসিংহাসনজীর প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

কানহাইয়ালাল দুবে অবশ্যই এই সব জিনিস জেঠমালানিদের আপিসে পেঁৗছে দিতে পারতো। কিন্তু রামসিংহাসনজীর বারণ থাকায় সে কাজটি করে নি—কারণ রামসিংহাসনজী ভেবে বসতে পারে যে কাঁচা বকশিসের লোভেই কানহাইয়ালাল ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছে। কানহাইয়ালাল শুনেছে, জেঠমালানিজী প্রতি চিঠির জন্যে রামসিংহাসনকে এক টাকা মূল্য ধরে দেন।

এ-বাড়ির আরও কত ব্যাপারে জেঠমালানি এখনও অদৃশ্য নজর রেখে চলেছেন তা একমাত্র ভগবান এবং রামসিংহাসনজীই জানেন!

চিঠি ও টেলিগ্রাম উদ্ধার করে আমি থ্যাকারে ম্যানসনের আপিসে এসে বসলাম। জেঠমালানি এখনও তাহলে সুলেখার খবর পাননি। এ-অবস্থায় আমার কী কর্তব্য? উত্তেজনায় আমার মাথা টিপটিপ করছে।

আপিস ঘরে বসে যতোই ওই দুটো কাগজের দিকে তাকাচ্ছি, আমার মাথার যন্ত্রণা ততই যেন বেড়ে চলেছে। অপরকে লেখা একজনের চিঠি যে আমার পক্ষে এমন অব্যক্ত বেদনার কারণ হয়ে উঠতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। গোলাপী রংয়ের টেলিগ্রামের কাগজটা যেন গরম লোহার শলাকার মতো আমার দেহে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

টেলিগ্রামে কী লেখা হয়েছে তাও আমি খুলে দেখিনি। কিন্তু হঠাৎ মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব মেয়েমানুষ এবং একজন মাত্র পুরুষকে অপমানের জন্যেই টেলিগ্রামটা ওই গোলাপী রঙ্ নিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনে হাজির হয়েছে।

নানা বিপদে বিব্রত ও বিধ্বস্ত একটা ভীরু লোক সব সময় আমার মনের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করে। সুযোগ বুঝে সেই অতিথি হঠাৎ আমার মধ্যেই মুখর হয়ে উঠলো। সে কাতর স্বরে চিৎকার করে উঠলো, তফাত যাও, তফাত যাও।

আমি তাকে কিছুক্ষণ অবজ্ঞা করায় সে যেন আরও বিরক্ত হয়ে গলার আওয়াজ দ্বিগুণ করে তুললো। সে এই মুহূর্তে আমাকে হুঁশিয়ার করতে চাইলো, "থ্যাকারে ম্যানসনের চালচুলাহীন টেমপোরারি বাবুজী, নিজের মিথ্যে অহঙ্কার ত্যাগ করো। বড় বড় মানুষের বড় বড় কীর্তির খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনো না। হাওড়ার হরিদাস পাল—বীরত্ব দেখানোর সময় নয় তোমার। তফাত যাও!"

আমার মনের মধ্যটা এবার সত্যিই দুলে উঠলো। আমি কী সত্যিই নিজের পৌরুষ জাহির করবার নেশায় কোনো অজ্ঞাত বিপদসীমার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছি?

মনে পড়লো, বরদাপ্রসন্নর মহামূল্যবান উপদেশ। "সংসারে সুখী মানুষরা সিঙিমাছের মতো—কখনও পাঁক লাগাতে দেন না শরীরে। কখনও পা-বাড়িয়ে কোনো কিছুতে জড়িয়ে পড়বেন না—বিশেষ করে এই মেয়ে-মানুষের ব্যাপারে। দুনিয়ার যতো ট্রাবল ওই মেয়েমানুষ থেকে—আমি সারা জীবন স্টাডি করে এই সত্যটুকু বুঝে নিয়েছি!" থ্যাকারে ম্যানসনের এই আপিস ঘরে বসে-বসেই বরদাপ্রসন্ন হালদার একদিন আমাকে বলেছিলেন।

কিন্তু আজকাল এইসব প্রাজ্ঞবচন আমার সব সময় পছন্দ হয় না। এই সব উপদেশ ও বাণীর এ যুগে আদৌ কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা সন্দেহ হয়। আত্মসমর্থন ও আত্মরক্ষার প্রবল উৎকণ্ঠায় যেসব নীতিবাক্য ঘোষিত হয়েছে তা প্রায়ই মানুষের স্বার্থপরতায় ইন্ধন যোগায় এবং বিদ্রোহী মানুষকে পশ্চাদপসরণের পরামর্শ দেয়।

বরদাপ্রসন্ন, আপনি তো তীর্থ দর্শনের নাম করে সেই কবে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে চলে গিয়েছেন। কিন্তু অত দূরে সরে গেলেও আপনার কণ্ঠস্বর আজ এমনভাবে আমার কানের কাছে ভেসে আসছে কেন?

কোনো উত্তর নেই।

বরদাপ্রসন্নবাবু, আপনাকে আমি সর্বদা শ্রদ্ধা করে এসেছি। আপনি যখন যা উপদেশ দিয়েছেন তা আমি মান্য করেছি, কখনও প্রশ্ন পর্যন্ত করিনি। কিন্তু আজ আমাকে ক্ষমা করুন বরদাপ্রসন্নবাবু। আজ আমি সত্যি মস্ত দ্বিধায় পড়ে গিয়েছি। আমার ঘরে সীমা বলে একটি মেয়ে বিরাট এক বারুদের স্তূপের ওপর অসহায়ভাবে রয়েছে, যে কোনো সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, বরদাপ্রসন্নবাবু!

অস্পষ্ট অন্ধকারে বরদাপ্রসন্নবাবুর মুখখানা ছায়ার মতো এই ঘরের মধ্যে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরদাপ্রসন্ন হালদার কি আমার কথাবার্তা শুনে মিটমিট হাসছেন?

বরদাপ্রসন্নবাবু, আপনি অনুগ্রহ করে ঐভাবে হাসবেন না। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সীমা সম্বন্ধে আপনার একটা নিজস্ব মতামত আছে যা আপনি এই মুহূর্তে আমার সামনে প্রকাশ করতে ব্যস্ত নন।

বরদাপ্রসন্নবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি দুটি মেয়েকে আলাদা আলাদা ভাবে চিনি—একজনের নাম সীমা, আর একজন সুলেখা। সীমা ও সুলেখা এক নয়, বরদাপ্রসন্নবাবু। এদের দু'জনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সীমা অসহায়, দুর্ভাগা বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে চার্নক সাহেবের এই আজব শহরে অনেক কষ্ট পেয়েছে। তাকে আমি একদিন তার জেল-থেকে-ফেরা বাবার সঙ্গে রাত্রিবাস করবার জন্যে আমার নিজের ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর সুলেখা! সে তো জেঠমালানি কোম্পানির ডল-পুতুল - জগদীশ জেঠমালানির বুদ্ধির দাবা খেলার সে তো একটা ঘুঁটি।

হাসছেন কেন, বরদাপ্রসন্নবাবু? আমি তো সুলেখার প্রতি কোনো দুর্বলতা দেখাইনি। বরং জগদীশ জেঠমালানির দাবা খেলার চালে প্রথম ভুলের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তড়িৎগতিতে থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বর ঘরখানি দখল করে ফেলেছি। সুলেখা সেনের প্রতি আমি কোনো রকম দুর্বলতা দেখাইনি, বরদাপ্রসন্নবাবু। দেখুন, আজ এই ঘরখানা জেঠমালানির হাতছাড়া হয়ে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছি বলেই সুলেখার এমন অসুবিধা। এই ফ্ল্যাটের চাবি জেঠমালানির দারোয়ানের কাছে থাকলে, কারও কোনো অসুবিধা হতো না। এমনকি, আমারও এই বিপদ হতো না।

আবার হাসছেন, বরদাপ্রসন্নবাবু? ভাবছেন, আমার নিজের আবার অসুবিধা কী?

অবশ্যই অসুবিধা আছে, বরদাপ্রসন্নবাবু! বিপদে না পড়লে এই সন্ধ্যেবেলায় সীমাকে নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে আমি চুপি চুপি এই আপিস ঘরে এসে একলা চেয়ার দখল করে বসে আছি কেন?

বরদাপ্রসন্নর অস্পষ্ট ছায়া এবার যেন অদৃশ্য হলো। একখানা বেওয়ারিশ ট্যাক্সির হেডলাইট আমার ঘরের মধ্যে সন্ধানী আলো স্প্রে করে গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

সীমা এবং সুলেখা, তোমাদের দু'জনকে নিয়ে এখন আমি কী করি?

সীমা এখন হয়তো আমার কলঘরে স্নানপর্ব সেরে নিয়ে নিজেকে শান্ত করছে। সীমা, বলকাতায় এতো লোক থাকতে, তুমি আমার কাছেই প্রথম এসেছো। কিন্তু সীমা, তুমি আমার কাছে তেমনভাবে মুখ খোলোনি। তুমি আমার কাছে কিছুই দাবী করোনি। তুমি কি সঙ্কোচ বোধ করছো,

সীমা? তা হলে অবশ্যই আমার কিছু বলবার নেই। সেই আদিকাল থেকে এই এখন পর্যন্ত সঙ্কোচের শৃঙ্খলেই আমার দেশের হতভাগিনী মেয়েরা বন্দিনী হয়ে চরম মূল্য দিয়ে আসছে। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না—আশ্চর্য মৃত্তিকা দিয়ে ঈশ্বর এই বাঙলার মেয়েদের তৈরী করেছেন।

সীমা, আবার বলছি, তোমার সংকোচ সম্বন্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই—আমার কোনো প্রশ্নও নেই। কিন্তু......

হ্যাঁ সীমা, এক কিন্তুর সন্দেহ দোলায় আমি এই মুহূর্তে দুলছি। এই কিন্তুটাই এই সন্ধ্যায় যত সংকটের সৃষ্টি করতে চলেছে। এই 'কিন্তু'টাই আমার মনের মধ্যে একটা লাল সাবধান বাতির রক্তচক্ষু প্রদর্শন করছে।

সীমা, তুমি আমার কাছে এসেছো, আমার খোঁজ করেছো, আমার ছোট্ট ঘরে আমার সঙ্গে গিয়ে বসতেও দ্বিধা করোনি। তোমার বাবার কথা, প্রথমে তোমাদের দুঃখের কথাও আমাকে শুনিয়েছো তুমি। কিন্তু তারপর আমার কাছে কিছু চাওনি। আমি কী, আমার কতখানি ক্ষমতা আছে, তা তোমার তো জানতে বাকি নেই। তবু তুমি কোনো ইঙ্গিত দিলে না কেন? তুমি আমার ক্ষমতার সীমা জানো বলেই কি এইভাবে চুপ করে রইলে? আমার ওপর নির্ভর করার কথাও ভাবলে না? আমাকে তেমন কোনো দায়িত্ব নেওয়ার অনুপযুক্ত মনে করলে?

সে-ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে চুপ করে থাকতে হয়। নীরব দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আমার অন্য কোনো ভূমিকা কী তোমার অনভিপ্রেত?

আমার এই সন্দেহ বোধ হয় নিতান্ত অমূলক নয়। যা আমার কাছে প্রত্যাশিত তার বাইরে কিছু করবার উৎসাহ দেখানো এই পরিস্থিতিতে বোধ হয় শোভন নয়। কিন্তু এই সব ভেবে, পিছিয়ে যাবার জন্যেই কি আমি নিজের ঘরে সীমাকে একলা বসিয়ে রেখে এখানে চলে এসেছি? আমার উদ্দেশ্য কি, কোনো রকমে একটা ছুতো খুঁজে বার করা, এবং সীমার বিপদের সময় পিছিয়ে যাওয়া এবং কিছু না-করা?

আমার মনের মধ্যে এবার অন্য এক দুঃসাহসী অভয়দাতা বিধি নিজের উপস্থিতি সগর্বে ঘোষণা করছে। ছোটখাট চিন্তা ও সন্দেহকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে সে সহজ ও সুন্দর কন্ঠে বলে উঠলো, "শংকর, ওঠো, জাগো, ক্লৈব্য পরিহার করো।"

নিমেষের মধ্যে আমার দ্বিধা উধাও হলো। আমার চোখের সামনে সীমার অসহায় মুখটা এবার নিয়ন আলোর মতো জ্বলে উঠলো।

সীমার চিন্তায় আমি বিভোর হয়ে উঠছি। আমার ভিতরের আমি এই মাত্র আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, ডুবন্ত মানুষ চিৎকার করে সাহায্য চাইবে তবে সাহায্য দেওয়া হবে এমন কথা কোথাও লেখা নেই। সংসারে প্রকৃত বিপদের সময় সৌজন্যের ছোটখাট আইন অচল—স্বার্থপর ছাড়া নিয়মের খুঁটিনাটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

সীমার লেখা অন্তর্দেশীয় পত্র ও টেলিগ্রামখানা আমার টেবিলেই পড়ে রয়েছে। সীমার নিজের হাতে ইংরিজীতে লেখা জগদীশ জেঠমালানির নামটা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমাকে যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে। জগদীশ জেঠমালানির নামটা এবার আকারে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। কোনো এক অদৃশ্য কাঁচের সহায়তায় দানবের মতো বাড়তে-বাড়তে জগদীশ জেঠ-

মালানি নামটাই আমাকে গিলতে এগিয়ে আসছে।

সীমার হাতের লেখা চিঠিখানা নিচে রেখে ওর ওপর টেলিগ্রামখানা উলটে রেখে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্যে শান্ত হবার চেষ্টা করলাম।

আমার হিসেবী মন এবার একাগ্রভাবে কাজে নেমে পড়েছে। আমার মনে হলো, সীমার চিঠি ও টেলিগ্রাম যে জগদীশ জেঠমালানির হাতে পেঁছয়নি এটা বোধ হয় সুসংবাদ। ভাগ্যে দারোয়ান রামসিংহাসন চৌরাশিয়া পৌত্র মুখ সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হয়ে স্বদেশে পালিয়েছে। তাই ঘটনার প্রবাহ অন্য দিকে বইতে শুরু করলো।

জগদীশ জেঠমালানি যখন পাঠকের এই অঙ্কে আকস্মিকভাবে অনুপস্থিত, তখন ভবিষ্যৎ ঘটনার সব দায়িত্ব আমার। সীমার জীবনের পরবর্তী অঙ্ক আমার নির্ধারিত • পদক্ষেপের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

সীমার ভবিষ্যতের সঙ্গে কেমন অদ্ভুতভাবে আমি ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি। কেউ কিছু বলেনি, সীমা নিজেও মুখ ফুটে কিছু চায়নি, তবু প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ নির্দেশে আমি যেন সীমার জীবন-নাটকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছি।

সীমা, তোমার অতীত আমার অজ্ঞাত নয়। তোমার বর্তমান সম্পর্কে কিছু ক্ষীণ ইঙ্গিত পেয়েছি। তার থেকে তোমার জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা অর্ধেক আলো এবং অর্ধেক অন্ধকারের সুতোয় আমি ইতিমধ্যেই বুনে ফেলেছি। এই কাল্পনিক জালের মধ্য দিয়ে এবার আমি তোমার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই। সীমা, তুমি কি জানো কেমন ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে একটু দূরেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?

সীমার সমস্যা মোটেই সরল নয়। নানা ঘটনা ও অঘটনের টানাপোড়েনে তার ভবিষ্যৎ অঙ্কটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে। আমার মাথার ভিতরটা এবার টিপটিপ করছে। আমি কপালে হাত দিয়ে চুপচাপ টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। হে ঈশ্বর, মানুষের জটিল অঙ্কগুলোকে সহজ করে ফেলবার মতো তীব্র বুদ্ধি, আমাদের মতো মানুষকে দাওনা কেন তুমি? আমি যে-অজানা ভবিষ্যতের ছায়াকে অদূরে সীমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখছি তা আমাকে আরও বিষণ্ন করে তুলছে।

সীমা, লক্ষ্মীটি, মন দিয়ে শোনো। এখন প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বনাশা বিপদ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমার জীবন অঙ্কের প্রতি পদক্ষেপে অনেক ভুল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবু অঙ্ক এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। এখনও সময় আছে। আমাদের যুগলবাবু স্যার বলতেন, অঙ্কের শেষ ফলাফলে না পেঁছনো পর্যন্ত নিরাশ হতে নেই। —পিছন দিকে তাকিয়ে এবং সামনের দিকে উঁকি মেরে ছোটখাট ভুল সংশোধন করে নিতে হয়। আগে বেশী যোগ হয়ে থাকলে এখন বিয়োগ করো, আগে অকারণ বিয়োগ হয়ে থাকলে নতুনভাবে যোগের ব্যবস্থা করো —সংসারের মানুষরা অঙ্কের শেষ ফলাফল নিয়েই ব্যস্ত, প্রতি পদক্ষেপের হিসেব-নিকেশ করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

সীমা, এই এতোদিন সংসারের পিচ্ছিল পথে এইভাবে চলাচল করে, আগুনের এই নির্মম উত্তাপে নিজেকে অর্ধদগ্ধ করেও তুমি কেমন সহজ

রয়েছো। তোমার মুখে কী এক অদ্ভুত প্রশান্তি নীল আকাশের শারদ মেঘের মতো হাল্কাভাবে বিচরণ করছে। তুমি সত্যি আমাকে অবাক করে দিচ্ছো। আমি তো এর থেকে অনেক কম কষ্টে বিচলিত হয়ে পড়ি, অনেক ছোট পরীক্ষার আগে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার উদ্দেশ্যে আমার অভিমানের অন্ত থাকে না।

সীমা, ভাগ্যে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই সব কথা বলছি না। চোখের সামনে আমার এই অস্থির ব্যাকুলতা দেখলে তুমি আমার সম্বন্ধে কীসব ভেবে বসতে তা তুমিই জানো। তুমি হয়তো ভাবতে, লোকটার কী মানসিক স্থিরতা নেই ?

সীমা, আমি বোধ হয় এই মুহূর্তে সত্যিই অত্যধিক ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এটা অন্যায় এবং আমার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত।

কিন্তু সীমা, আমার মনের মধ্যে যেখানে এই চিন্তাগুলো সংসারের উত্তাপে অসহায়ভাবে দগ্ধ হচ্ছে সেখানে তাকিয়ে দেখো। আমি তোমার কথা, তোমার ভবিষ্যতের কাল্পনিক ছবি দেখে চঞ্চল হয়ে উঠছি।

সীমা, তুমি বেশ চিন্তিত। সুলেখা সেনের সব সঞ্চয় প্রায় শেষ হতে না-চললে তুমি গ্রামের আশ্রয়ে বাবাকে ছেড়ে আবার ভাগ্য সন্ধানে এই কলকাতায় বিশেষ করে আমাদের এই পাড়ায় আজ ফিরে আসতে না।

সীমা, তুমি জেঠমালানির বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এসে আবার এতো-দিন পরে সেখানে ঢোকবার খবরাখবর করছো। তোমার কী ধারণা, জেঠমালানিরা ছাড়া এই বিরাট শহরের আর কোথাও সুলেখা সেনের ঠাঁই নেই ?

সুলেখা সেন, আপনিও এতোক্ষণ হয়তো আকাশ-পাতাল ভাবছেন। এই সন্ধ্যায় বিনা নোটিশে এখন জেঠমালানিদেরই বা কোথায় খুঁজে পাবে? শুনেছি জগদীশ জেঠমালানিজীর গুরুভক্তি ইদানীং বেশ বেড়ে গিয়েছে। বিজনেসের ক্লেদে সারাদিন ডুবে থেকে এই সন্ধ্যায় তিনি কিছুক্ষণের জন্য গুরু-ভজনে সম্পর্কে মগ্ন থানেক—তখন তাঁর নাগাল পাওয়া ভার। তখন নিতান্ত টপ সার্কেলের কর্তা ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের সাহস পায় না।

আগাম খবর পেলে জগদীশ জেঠমালানি অথবা তাঁর গুণধর ভাগ্নে সুলেখার জন্যে কী ব্যবস্থা করতেন তা কল্পনা করবার লোভ হয়। হয়তো জেঠমালানিজী সুলেখার চিঠি এবং টেলিগ্রামের ওপর কোনো গুরুত্বই দিতেন না। কলকাতার মাঝারি সাইজের বিজনেসের সঙ্গে এ-রকম কত সুলেখা সেন জড়িয়ে রয়েছে। হাই-লেভেল বিজনেসের প্রোডাকসন, ডিস্ট্রিবিউশন, সেল, সার্ভিসের মতো সুলেখা সেনদের সেবাও এক ধরনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে নিশ্চল ফাইলকে সচল করবার জন্যে, সচল সত্যকে অচল করবার জন্যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠর জয়তিলক পরাবার জন্যে, সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করবার কাজে অসংখ্য সুলেখা এই বিজনেস-কালচারের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুলেখাদের সার্ভিস আজকাল এমনই জরুরী হয়ে উঠেছে যে ঠিক সময় হাতের গোড়ায় এরা না-থাকলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

কোথায় যেন শুনেছিলাম, বিজনেসের নিয়মই তাই। বিজনেসম্যান দাবার ঘুঁটি এমন ভাবে সাজিয়ে বসতে অভ্যস্ত যেখানে তিনি নিজে ছাড়া

আর কেউ অপরিহার্য নয়। জেঠমালানিরা কখনও চান না তাঁদের বশংবদদের কেউ সাইজে অথবা শক্তিতে খুব বেড়ে ওঠে, কেউ বুঝতে পারে যে তার সাহায্য ছাড়া কোম্পানির চাকা অচল হয়ে পড়তে পারে। জগদীশ জেঠমালানির মতো সুচতুর বিজনেসম্যান কখনও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেবেন না—প্রত্যেক আর সি ঘোষ এবং সুলেখা সেনকে তাঁরা বুঝিয়ে দেবেন, তোমরা ভাল কাজ করেছো ভাল, কিন্তু তোমরা ছাড়াই এই জেঠমালানি কোম্পানি চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

চৌত্রিশ নম্বর ঘর হাতছাড়া হয়ে যাবার পর জেঠমালানিরা তাঁদের এই স্পেশাল লাইনে কী করছেন তার বিশেষ খোঁজখবর পাইনি। মোটামুটি তাঁরা আমার ব্যাপারে সুপরিকল্পিত নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমার আশঙ্কা ছিল, প্রথম রাউন্ডে চৌত্রিশ নম্বরের যুদ্ধে হার হলেও তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। কারণ, জগদীশ জেঠমালানির অভিধানে হার কথাটা নাকি এখনও পর্যন্ত লেখা হয়নি।

কিন্তু আমি যতই নতুন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকি না কেন, ওদিক থেকে সংগ্রামের কোনো প্রস্তুতি আমার নজরে পড়েনি। শুধু আজ আবিষ্কার করলাম, আমার অলক্ষ্যে এই বাড়ির অন্যান্য কর্মচারির সঙ্গে গোপনে-গোপনে তাঁরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। জেঠমালানিদের অন্য কাজকর্মের কিছু ইঙ্গিত মাঝে মাঝে অবশ্যই পপি বিশোয়াসের কথাবার্তায় পেয়েছি।

চৌত্রিশ নম্বরের আশ্রয় যে না-থাকতে পারে, সুলেখার পক্ষে তা বোধ হয় অকল্পনীয় ছিল। চৌত্রিশ নম্বর নেই এ-কথা আগাম জানলে সুলেখা এইভাবে আচমকা নিজের সুটকেস হাতে গ্রামের আশ্রয় ছেড়ে কলকাতায় হাজির হতো কিনা তাও সন্দেহ। খবরটা পেয়ে সুলেখার মুখে যে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছিল তা অবশ্যই আমার নজর এড়ায়নি।

সুলেখা, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট জেঠমালানির হাতছাড়া হয়েছে তো কী হয়েছে? ওটা নিয়ে জগদীশ জেঠমালানি ও তাঁর ভাগ্নে মাথা ঘামান। থ্যাকারে ম্যানসনে তুমি যখন একবার ফিরে এসেছো, আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন তোমার ভাবনা কী?

'সীমা, সীমা—সুলেখাকে তুমি বিদায় দাও।' আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে আমি আপিস ঘর থেকে থ্যাকারে ম্যানসনের সিমেন্ট বাঁধানো থরোফেয়ারে নেমে এলাম।

সীমা, তুমি যদি সুলেখাকে বিদায় দিতে রাজী থাকো, তা হলে থ্যাকারে ম্যানসনের এই টেমপোরারি ম্যানেজার তোমার জন্যে অসাধ্য-সাধন করবে।

কোথায় চৌত্রিশ নম্বর ঘর? ঐ ঘরের চাবিটা আমি আপিস ঘরের স্টীলের আলমারি থেকে বার করে এনেছি।

কে দেখছে? এই রাত্রে আমি যদি এক অসহায় মেয়েকে চৌত্রিশ নম্বর ঘরে ক্ষণিকের আশ্রয় দিই, তা হলে কার কী বলবার আছে? অনেকগুলো মুখ এবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ভাগ্যে রামসিংহাসন চৌরাশিয়া এখনও অনুপস্থিত। বড় জোর চাকরমহলে চাপা গুঞ্জন উঠবে, আমি কাউকে গোপনে টেমপোরারি ভাড়া দিয়েছি। কিন্তু সেই অপবাদে আমার কী এসে যায়?

হঠাৎ শকুন্তলা চাওলা ও মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখ দুটোও আমার

সামনে ভেসে উঠলো। এই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের জন্যে তাঁরা কত সাধ্য-সাধনা করেছেন, কিন্তু কোনো ফল লাভ না করে আহত বাঘিনীর মতো হয়ে আছেন।

না, চৌত্রিশ নম্বর ওইভাবে সুলেখাকে ফিরিয়ে দেবার অনেক অসুবিধা আছে। আমি ফ্ল্যাটের চাবিটা আবার পকেটে পুরে ফেললাম।

তোমার চাবি তো তোমার পকেটে ঢুকে গেলো? তাহলে ওই যে আশ্রয়হীনা মেয়েটি তোমার ঘরে এই মুহূর্তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, তার কী হবে? কে যেন আমার ভিতর থেকে আমাকেই ব্যঙ্গ করলো।

আমাকে ব্যঙ্গ করে লাভ নেই। আমি নিজে গিয়ে এবার হাফ-ফ্ল্যাটের খোঁজ করলাম। থ্যাকারে ম্যানসনের বিশিষ্ট এই হাফ-ফ্ল্যাটে সাময়িক আস্তানা জুটে যায়। স্বয়ং রামসিংহাসনজী ঐতিহাসিকভাবে ঐ ফ্ল্যাটের তদ্বির করে আসছেন। ঐ ঘরখানা যদি আজ খালি থাকে, তাহলে কোনো চিন্তা নেই। নিজের পয়সায় ভাড়া নিয়ে নেবো, এবং সীমাকে ওখানে ঢুকিয়ে দেবো। বলবো, "সীমা, আর কোথাও যাওয়া চলবে না।"

কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন। হাফ-ফ্ল্যাটও বোঝাই হয়ে আছে। কানাহাইয়ালাল দুবে বললো, "হুজুর, আপনি চাইলে কাল থেকে খালি করে দেবো। কোনো তর্কাতর্ক হবে না।"

তাহলে শুধু আজ রাতের সমস্যা। সে আর তেমন কী? আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি এখনই আমার ঘরে ফিরে গিয়ে সীমার মুখোমুখী হবো।

সীমা, এই রাত্রে অবশ্যই তোমার ব্যস্ত হওয়া চলবে না। তোমাকে কোথাও আমি একলা ছেড়ে দিতে রাজী নই। সীমা, তুমি সুলেখাকে ভুলে যাও। তাকে তোমার কাছে আসতে দিও না আর। আজ রাত্রিটুকু তুমি সেবারের মতো আমার ঘরে কাটাও—আমার জন্যে অমন সুন্দর আপিস ঘর তো পড়ে রয়েছে। আগামীকাল সকালেই থ্যাকারে ম্যানসনের হাফ-ফ্ল্যাটে তোমার ব্যবস্থা করে দেবো। তারপর প্রয়োজন হলে, বিলাসিনী দেবীকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে, ওই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটেও তোমাকে ফিরিয়ে দেবো। কিন্তু সীমা একটি শর্ত—ওই জেঠমালানিদের কাছে যেওনা তুমি। সীমা, তুমি সুলেখাকে আর ডেকে এনো না, তাকে চিরকালের মতো এই শহরের জনারণ্যে হারিয়ে যেতে দাও।

আমার সমস্ত শরীর অদ্ভুত এক উত্তেজনায় কাঁপছে। সীমাকে বলবো, তোমাকে এখনই শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে না। আজ রাত্রে তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো। কাল থেকে কিছুদিন তোমার সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমার অতিথি হয়েই ওই হাফ-ফ্ল্যাটে বসবাস করো। তারপর এই শহরে জীবিকার একটা সন্ধান করে নাও। আশ্রয়ের চিন্তা নেই—চৌত্রিশ নম্বর ঘর তোমাকে আমি ফেরত পাইয়ে দেবো। সীমা, হাতে অনেক সময় পাবে। সুলেখাকে বারণ করো ওই জেঠমালানিদের খোঁজ করতে।

অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করছি এই মুহূর্তে। এতোদিনে আমি যেন কোনো সাহসী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি। আমার এখন একমাত্র কাজ সীমার কাছে ফিরে যাওয়া।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে আমি ওপরে উঠে এসেছি। আমার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। তা দ্রুত খুলে ঘরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু হঠাৎ আমার বুকটা চমকে উঠলো। কোথায় সীমা?

সীমা নেই। সীমা যে এইভাবে আমার ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে তা আমার কল্পনাতীত।

প্রথমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ভাবলাম, থ্যাকারে ম্যানসনের চেনাজানা কারুর সঙ্গেই সে হয়তো একবার দেখা করতে গিয়েছে। ঘড়ির দিকে নিষ্ফল তাকিয়ে তাকিয়ে কোনো লাভ হলো না— সীমার ফেরবার কোনো লক্ষণই নেই।

হঠাৎ মনে হলো আমার নিজেরই একবার ঘুরে ফিরে সীমার খোঁজ করে আসা উচিত। কিন্তু এই বিরাট থ্যাকারে ম্যানসনের কোথায় পরিচিত অপরিচিত মানুষের ভিড়ের মধ্যে সীমার খোঁজ করবো?

পরিচিতজনদের ফ্ল্যাটে বেল বাজিয়ে আমি কী ভাবেই বা প্রসঙ্গের অবতারণা করবো? আচমকা এই সন্ধ্যায় যদি জিজ্ঞেস করে বসি, আপনারা কী সুলেখা সেনকে দেখেছেন, তা হলে এই সব পরিচিত মহিলারাই বা কী ভেবে বসবেন?

হঠাৎ আমার চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের কথা মনে পড়লো। পুরনো স্মৃতি রোমন্থনের আশায় সীমা কি শেষ পর্যন্ত ওখানেই গেলো?

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ হাতে ওই চৌত্রিশ নম্বরের দিকেই ছুটলাম আমি। কয়েক সপ্তাহের অব্যবহারে চৌত্রিশ নম্বরের সামনেটা কেমন মলিন হয়ে আছে। এরই মধ্যে কোত্থেকে এক অপয়া চামচিকে ওইখানে জবরদখল বসতি শুরু করেছে। আমার টর্চের আলোয় চামচিকেটা উড়ে তখনকার মতো পালালো। কিন্তু কোথায় সীমা?

সীমা শুধু শুধু এখানে এইভাবে আসতে যাবে কেন? আমার অবশ্যই এই সামান্য ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল। সীমা তো এখনও আমার মতো পাগল হয়নি যে তার কাছে চাবি নেই এবং ফ্ল্যাটে ঢোকবার কোনো অধিকারও নেই জেনেও ওই চৌত্রিশ নম্বরের সামনে রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু যুক্তি যতই থাক, সীমাকে তো এই রাতে এই ভাবে আমি কিছুতেই হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। সীমা, তোমার জন্যে আমি বেশ বিপদে পড়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ একবার তেলকালিবাবুর কথাও মনে হলো। ঘুরতে ঘুরতে আমি ওঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। মনের মধ্যে সামান্য একটু আশা ছিল, ওখানেই নিশ্চয় সীমাকে খুঁজে পাবো। আমাকে অনেকক্ষণ অনুপস্থিত দেখে সীমা হয়তো তেলকালিবাবুর সঙ্গেই গল্পের আসর জমিয়েছে।

চোখে চশমা লাগিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তেলকালিবাবু তখন কী যেন করছিলেন। আড় চোখে দেখলাম, ওঁর সামনে গোটা দশেক তালা সাজানো রয়েছে। তেলকালিবাবু আমাকে দেখেই বললেন, "আসুন, আসুন। শুভদিনেই এই অধমের ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে।"

তেলকালিবাবু কিছুতেই শুনলেন না। আমার সামনে এক টুকরো কেক হাজির করলেন এবং হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দিলেন।

একলা মানুষ তেলকালিবাবু। আমার ব্যস্ততার কথা বিশ্বাসই করলেন না। বললেন, "কিছুই শুনছি না। এসে যখন পড়েছেন, তখন অধমের

সঙ্গে একটু পানাহার করতেই হবে, আজ যে আমার জন্মদিন।"

"খান, স্যর, খান। নিউ মার্কেটের ম্যাক্স-ডি গামার তৈরি কেক। ঐ কেক ছাড়া আমার ওয়াইফ আমার বার্থ-ডে পার্টি সেলিব্রেটই করতো না। আমি একবার অন্য কী এক কোম্পানির কেক এনেছিলাম, গিন্নীর পছন্দই হলো না। ও আবার ছুটে গেলো, নিজে ম্যাক্স-ডি গামা থেকে বার্থডে-কেক কিনে আনলো।"

অগত্যা আমাকে কেকে কামড় দিতে হলো, যদিও আমার মন তখন অন্যত্র পড়ে রয়েছে।

তেলকালিবাবু বললেন, "এখন আর আমার কোনো ডিফিকাল্টি নেই, স্যর। ও মরবার পরে কেউ আর এইসব নিয়ে হাঙ্গামা বাধায় না। তবে আমি ওর কথার অবাধ্য হইনি—নিজের জন্মদিনে ম্যাক্স-ডি গামার দোকান থেকে নিজেই একটু কেক কিনে আনি। তবে কাউকে নেমন্তন্ন করি না। নিজেকে নিয়েই নিজের বার্থডে পার্টি মহাসমারোহে সেলিব্রেট করি।" এই বলে তেলকালিবাবু আপন মনেই হেসে ফেললেন।

ইংরিজী প্রথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তেলকালিবাবুকে বললাম, "মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দি ডে।"

তেলকালিবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন। "আর ওসব প্রার্থনা করবেন না, স্যার। আপনাদের মতো লোকের প্রার্থনা ভগবান শুনে ফেললেই আমার মুশকিল—আমার এই সশ্রম নির্জন কারাদণ্ড আরও বেড়ে যাবে। আপনাদের কথায় এই দিন হয়তো ফিরে আসবে, কিন্তু সেই ডে হ্যাপি হবে কী করে? তার তো কোনো চান্স নেই। যার বউ ছিল ছেলে ছিল, সংসার ছিল, অথচ এখন কিছুই নেই। তার আবার আনন্দ কী?"

তেলকালিবাবুর কথা শুনে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকটা কেমন করে উঠল। এতোদিন নানা কাজের মধ্যে এই শান্ত সুন্দর মানুষটিকে বার বার দেখেছি, তাঁর স্নেহ প্রশ্রয়ও লাভ করেছি, কিন্তু এই নিঃসঙ্গ মানুষটির মনের ভিতরের রূপ এমনভাবে আমার কাছে ধরা পড়েনি।

তেলকালিবাবু বোধ হয় আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরে পরিস্থিতির মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলেন। আমার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "না স্যার আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। ও বেঁচে থাকলে আমার ওপর খুব রেগে যেতো। আমার স্ত্রী আমাকে একবার ভীষণ বকুনি দিয়েছিল—জন্মদিনটা আনন্দের দিন,, দুঃখের দিন নয়। দুঃখ থাকলেও এই একটা দিনে শুধু আনন্দের কথা ভাববেন স্যার। আপনার নিজের জন্মদিনেও এটা মনে রাখবেন, কখনও দুঃখকে প্রশ্রয় দেবেন না। আপনার জন্মদিনটা কবে স্যার?"

তেলকালিবাবুর প্রশ্নে আমি যেন হঠাৎ সংবিত ফিরে পেলাম। আমার জন্মদিন কখনও উদ্‌যাপন করিনি—করবার মতো পরিস্থিতিও আসেনি। কিন্তু জন্মেছি যখন, তখন আমারও নিশ্চয় একটা জন্মদিন আছে। শুধু আমার কেন বিশ্ব সংসারের সমস্ত মানুষের এবং সীমারও একটা জন্মদিন আছে। এবং এই জন্মদিন থেকেই আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের বোঝা বয়ে ক্রমশ মৃত্যু দিনের দিকে এগিয়ে চলেছি। সেই মৃত্যুদিন, যার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি আমরা, এই পর্যন্ত। কিন্তু নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে সেই মহাদিনকে জন্মদিনের মতো বারংবার উদ্‌যাপনের উপায় নেই।

"কী হলো স্যার? জন্মদিনটা তো কনফিডেনসিয়াল রাখার নিয়ম নেই। জন্ম মানেই তো প্রকাশ—আত্মপ্রকাশ। যা গোপন, যা অপ্রকাশিত তাকে প্রকাশ করার নামই তো জন্ম স্যার", তেলকালিবাবুর মুখে এমন গুরুগম্ভীর কথা এর আগে কখনও শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না।

"সাতই ডিসেম্বর", আমাকে উত্তর দিতে হলো। এই প্রথম একজন জানাশোনা লোক আমার জন্মদিনের খবর নিলেন।

"তা ভাল। ভেরি গুড ডে। ক্রিসমাসের খুব কাছে," সন্তোষপ্রকাশ করলেন তেলকালিবাবু। অমন শুভ দিনটা অবহেলা করে নিজেকে অপমান করবেন না স্যার। কাউকে ইনভাইট করুন চাই না করুন। আত্মপ্রকাশের দিনটাকে কখনও ভুলবেন না। অন্তত কিছু না হোক, আমার এই স্টাইলে জন্মদিন সেলিব্রেট করবেন। আমার যে গেস্ট নেই একথা কিন্তু মোটেই সত্যি নয়। দেখতে পাচ্ছেন আমার গেস্টদের?" তেলকালিবাবুর এবারের প্রশ্নটটা আজব ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে।

কোথায় গেস্ট? জন্মদিনের কোনো অতিথিকেই তো এই থ্যাকারে ম্যানসনের ছোট্ট ঘরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

তেলকালিবাবু এবার ম্যাজিসিয়ানের মতো রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। "আমার গেস্টরা এখানেই রয়েছেন। তবু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না তো? অথচ ভি-আই-পি গেস্ট—অনেকক্ষণ ধরে স্পেশাল আদর যত্ন করছি।" এই বলে তেলকালিবাবু টেবিলের ওপর শোয়ানো ডজনখানেক তালার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন।

ভদ্রলোকের কী মস্তিষ্কের বিকৃতি হলো? না আমার সঙ্গে জন্মদিনের স্পেশাল রসিকতা করছেন তেলকালিবাবু?

এসবের কিছুই যে তেলকালিবাবুর মাথায় নেই তা ওঁর পরবর্তী কথায় বুঝতে পারলাম।

তেলকালিবাবু বললেন, "এক-এক জনের এক-এক খেয়াল। আমার স্ত্রীর ওই ম্যাক্সি-ডি গামার কেকের কথা তো বললাম। আর আমার ছেলেরও অদ্ভুত খেয়াল। নিজের জন্মদিনে যেখানকার যত তালা জোগাড় করে নিয়ে আসতো। নিজের বাবাকে তো যন্ত্রপাতিতে তেল দিতে দেখেছে। সেই দেখাদেখি খোকা ওই তালাগুলোকে জন্মদিনে তেল খাওয়াতো। আমি বকাবকি করেছি—কিন্তু কোনো ফল হয়নি। যদি জানতাম যে থাকবে না তা হলে বকাবকি করতাম না, স্যার। যারা থাকবে না তাদের জন্যে তো বকাবকি নয়। অল্পক্ষণের গেস্টকে কেউ বকে? আপনি বলুন।"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। ভদ্রলোকের গলাটা এবার ভিজে উঠেছে। কিন্তু জন্মদিনের দুঃখের কোনো স্থান নেই তা আবার স্মরণ করেই বোধ হয় তেলকালিবাবু নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, "জন্মদিনের পরেই ছেলে যখন ওইভাবে চলে গেলো তখন ওর দায়িত্বটা আমার ঘাড়েই এসে পড়লো।" এখন নিজের জন্মদিনে তেলকালিবাবু যেখানকার যত তালাকে 'দরিদ্রভোজনের' নেমন্তন্ন করেন। "উপোসী তালাগুলোকে সারা বছর তো কেউ দেখে না! এই এক দিন আমি যতটা পারি সেবা-যত্ন করি, পেট ভরে তেল খাইয়ে দিই।"

সীমার খোঁজ করতে এসে কী অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়লাম! এমন বিচিত্র জন্মদিনের কথা এর আগে আমি কখনও শুনিনি।

তেলকালিবাবু বললেন, "ছেলে যখন এই ভাবে তালাগুলোকে আপ্যায়ন করতো তখন আমার খুব হাসি লাগতো। কিন্তু এখন, স্যার, আমার মোটেই হাসি আসে না। বরং মাঝে মাঝে কান্নাই এসে যায়। এই সব গেস্টদের সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখের কথা বলি। এদের অনেকেই তা আমার ছেলের জন্মদিনের পার্টি অ্যাটেন্ড করেছে—ওর সব কথা জানে।"

আমি নির্বাক হয়ে তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

তেলকালিবাবু নিজের চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে বললেন, "এরা সবাই জন্মদিনে আমার কথা শোনে।"

তালাগুলোর গায়ে তেলকালিবাবু সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করলাম প্রতিটি তালার অঙ্গে সদ্য-পরিচর্যার প্রমাণ রয়েছে। তেলকালিবাবু আজ সারাদিন ধরে বোধ হয় এদের দেহ থেকে ময়লা পরিষ্কার করেছেন।

একটা তালার গায়ে বোধ হয় সামান্য ধুলো পড়েছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে তেলকালিবাবু সযত্নে যেন কোনো শিশুর মুখ মুছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এদের অনেক গুণ স্যার। এরা খুব লক্ষ্মী। পরে এসে অনেক আগে চলে গিয়ে এরা কাউকে কাঁদায় না।"

যে-খোঁজের জন্যে এসেছি তা কী করে জিজ্ঞেস করবো ভাবতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু এইভাবে তো দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই আমার। সীমার খবর করতেই হবে আমাকে।

শত দুঃখের মধ্যেও তেলকালিবাবু অপরের সুখ-সুবিধার কথা ভুলে যান না। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বোধ হয় কিছু ইঙ্গিত পেলেন। তালাগুলোকে টেবিলের একধারে সযত্নে সরিয়ে রাখতে রাখতে তেলকালিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মনটা যেন একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে?"

"সীমাকে দেখেছেন আপনি?" এবার আমি প্রশ্ন না-করে থাকতে পারলাম না।

"সীমা! সে আবার কে? সীমা বলে কাউকে তো আমি চিনি না।" তেলকালিবাবু আমাকে আরও বিপদে ফেলে দিলেন।

তারপর মাথা চুলকে বললেন, "আজ কিন্তু আর একজনের সঙ্গে অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো। আমার বার্থডে পার্টির আর একজন আনএক্সপেকটেড গেস্ট। সুলেখাকে মনে আছে আপনার? সুলেখা সেন—ঐ যে আমাদের চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে কিছুদিন ঘর আলো করে ছিল। ভারি ভাল মেয়ে, স্যার। কেন জানি না, আমাকে দাদু-দাদু করতো—ফ্ল্যাটের কোনো যন্ত্র সারাতে গেলে কী ভাল ব্যবহার করতো। যেন আমি মাইনে-করা মিস্ত্রি নই—পাশের বাড়ির কোনো আত্মীয় পাখার গোলমাল সেরে দিতে এসেছি।"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, "ঐ মেয়ে যখন আমাকে প্রথম দাদু বললো তখন একটু অসুবিধায় পড়ে গেলাম। ঐ নামে তার আগে ওয়ার্লডের কেউ আমাকে ডাকেনি। দাদু হওয়া কি সোজা কথা! বাপ হয়েও যে বাপ থাকতে পারলো না, এই দুনিয়ায় সে কি করে ডবল প্রমোশন পাবে?"

আবার থামলেন তেলকালিবাবু। গলার ভিতরটা আজ বেশ ভিজে ভিজে রয়েছে। সর্দি না কান্না বোঝা দায়। শোকের পর্ব তো তেলকালিবাবু

কতদিন আগে সেরে দিয়েছেন। কিন্তু আজ জন্মদিনে নিখিল বিশ্বের সব মানুষের সঙ্গে তিনি যেন আত্মীয়তা বোধ করছেন—সকলের দুঃখে দুঃখী হতে চাইছেন তেলকালিবাবু, সবার যন্ত্রণার বোঝা যেন নিজের মাথায় চাপাতে পারলেই তিনি সুখী হন।

দুঃখ ভোলাবার হাসিতে মুখ ভরে উঠলো তেলকালিবাবুর। তিনি বললেন, "হয়তো বিশ্বাস করবেন না, স্যর। কিন্তু ওই সুলেখা সেনের দাদু ডাক শুনেই আমি যেন সিনিয়রিটির সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম—তার আগে পর্যন্ত নিজেকে মধ্যবয়সী মনে হতো। এই মধ্য জিনিসটা মোটেই ভাল নয়, স্যর। তবু সবাই মধ্যবয়স থেকে বুড়োবয়সে পা বাড়াতে দ্বিধা করে। আমিও হয়তো করতাম। কিন্তু কী মিষ্টি ওই ডাক—দাদু। আমি তো স্যার সুলেখার ওপর রাগ করতে পারলাম না, বরং বেশ ভাব হয়ে গেল। তা ছাড়া সিলিং ফ্যানের সিঁড়ি থেকে নেমে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলাম মস্ত টাকও পড়েছে।

"দাদু যখন বলেছে, তখন দায়িত্ব অনেক। সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান সবই আমি স্পেশাল যত্ন নিয়ে সেরে দিয়েছি। সেই মেয়ে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো। তারপর আজ এই একটু আগেই হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নেমে এলো আমার নাতনী, আমার বার্থডে সেলিব্রেট করতে।"

তেলকালিবাবু বললেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতোদিন কোথায় ছিলে? কবে এখানে এলে। কিন্তু মশাই, এমন অবাধ্য নাতনী যে কোনো কোশ্চেনেরই উত্তর দিলে না। শুধু মিটমিট করে হাসতে লাগলো। আমার কোশ্চেনটাই এড়িয়ে গেলো।"

এইখানেই শেষ নয়। তেলকালিবাবু জানালেন, "সুলেখাকে আমি কিন্তু কেক খাইয়ে দিয়েছি। বলেছি, এসেছো যখন, তখন ম্যাক্স-ডি গামার কেক খেয়ে যাও, তোমার দিদিমার ফেভারিট ছিল।"

তেলকালিবাবু আরও বললেন, "কেক খাওয়াবার পরে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো দরকার ছিল নাকি? দরকার না থাকলে আমার কাছে কেউ তো আসে না, দিদিমণি।"

সুলেখা এবার কী বলেছে তা জানবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

নিজের খেয়ালেই তেলকালিবাবু বললেন, "সুলেখা দিদিমণি কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করলো না তার কোনো কাজ ছিল। আমার সন্দেহ ছিল, কোথাও হয়তো টেবিল বা সিলিং ফ্যান গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, বলো দিদিমণি, কোনো দ্বিধা কোরো না।"

সুলেখা এর উত্তরে নাকি শুধুই হেসেছিল। তারপর বলেছিল, "আমি খুব ভাল আছি, দাদু। আমার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই আপনার। তবে আমার বান্ধবীর জন্যে একটা খবর পেলে মন্দ হয় না।"

"কী খবর?" তেলকালিবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন।

সুলেখা শান্তভাবে বলেছিল, "মেয়েদের থাকবার মতো কোনো হোটেল আপনার জানা-শোনা আছে? যেখানে খুব বেশী খরচ লাগে না।"

তেলকালিবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এর থেকে ডিফিকাল্ট কোশ্চেন হয় নাকি? মেয়েদের থাকবার জন্যে এই পোড়া শহরটাই তৈরি হয়নি—হোটেল ধর্মশালা তো দূরের কথা।"

"তারপর?" আমি অধীরভাবে তেলকালিবাবুর কাছে জানতে চাই।

তেলকালিবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন। "তারপর যে কী হলো তা তো ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। বোধ হয় বললাম, এই সদর স্ট্রীট, চৌরঙ্গী লেন, কীড স্ট্রীটে তো কত হোটেলই রয়েছে, দিদিমণি। কিন্তু এসবের ভিতরে কে আর ঢুকেছে?"

তেলকালিবাবু এবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "তারপর যে দিদিমণি কেন হঠাৎ উঠে পড়লো তাও বুঝলাম না। আমি ভাবলাম, এ-বাড়িতে অনেক দিন পরে এসেছে, নিশ্চয় অন্য আরও সব চেনা-জানা লোকদের সঙ্গে দেখা করে যাবার সাধ হয়েছে। এ তো আর ছোটখাট বাড়ি নয়—থ্যাকারে ম্যানসন বলে কথা! এখান কত লোক রয়েছে, কোন ঘরে কার সঙ্গে সুলেখা ভাব জমিয়ে বসে আছে কে জানে?"

তেলকালিবাবু আমার মুখ দেখেই বোধ হয় বুঝতে পারছেন আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছি। তিনি বললেন, "আপনি যেন কী একটা মেয়ের নাম করছিলেন?"

আমি চুপ করে রইলাম। তেলকালিবাবু বললেন, "না স্যার, সুলেখা সেন ছাড়া আর কেউ আমার খোঁজ করতে আসেনি।"

উপরতলার ঘর থেকে দ্রুতপায়ে আমি আবার নিচে নেমে এসেছি। রাতের ঘন অন্ধকার আমাকে এবার ঘিরে ধরছে। এই অসময়ে সীমাকে আমি কোথায় খুঁজে পাবো? সীমা, তুমি এইভাবে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলে? আমার ফেরবার জন্যে একটু অপেক্ষাও করলে না। সীমা, তুমি এখন কোথায়? কলকাতার কোন্ আশ্রয়ে তোমার খোঁজ করি?"

সীমাকে খুঁজে পেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সে-রাত্রে নয়। বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে মানুষ যেমন হারিয়ে যায়, তেমনি কখনও কখনও বিধাতার বিচিত্র খেয়ালে আবার হারানিধির খোঁজও মেলে। অনন্ত এই রহস্যের কতটুকুই বা আমার মতো সামান্য মানুষের বোধগম্য?

সীমাকে সে-রাত্রে হারিয়ে আমার জীবনের মস্ত ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। আজ এতোদিন পরেও জীবনের অপরাহ্ণবেলায় সেই ক্ষতির বোঝা আমাকে নীরবে বহন করে চলতে হচ্ছে। অলৌকিক আনন্দের যে সম্ভাবনা মুহূর্তের জন্যে জোনাকির মতো জ্বলে উঠে আমার জীবনকে চিরদিনের মতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত করলো তার কথা ভাবলে আজও আমি কেমন হয়ে পড়ি। এই যে কলম ধরে সীমার কথা লিখে চলেছি এখন আমার দৃষ্টি ঈষৎ ঝাপসা হয়ে আছে, কোনো বাধা না মেনে আমার চোখ অকারণে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে।

সীমা, তুমি সেদিন কেন অমনভাবে আমাকে না বলে হঠাৎ থ্যাকারে ম্যানসন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে? আমি স্বীকার করছি, আমার সামান্য একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু লঘু অপরাধে আমার মাথার ওপর অমন

গুরুদণ্ডের বোঝা তুমি কেমন করে চাপিয়ে দিলে, সীমা?

সীমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া এখনও বাকি রয়েছে। সে-প্রসঙ্গে আমাকে শীঘ্রই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু তার আগেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল—সেই ব্যাপারগুলো এই পর্বেই বলে ফেলা ভাল।

সীমাকে খুঁজে বেড়াবার উদ্বেগ নিয়ে সে-রাত্রে কতক্ষণ থ্যাকারে ম্যানসনের সিমেণ্ট-বাঁধানো উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই।

একটা ট্যাক্সি এক ঝলক কালো ধোঁয়া ছেড়ে খাদির ধুতি পাঞ্জাবি-পরা এক স্পেশাল যাত্রীকে নিয়ে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বেরিয়ে গেলো।

গাড়ি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই আমি শুনতে পেলাম, "হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার শংকর! কী হলো আপনার?"

চমকে ফিরে দেখলাম মিসেস পপি বিশোয়াস। উত্তর দেবার আগেই মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আশ্চর্য লোক আপনি। বিশ্ব সংসারের কথা ভুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছেন মনে হচ্ছে। কতক্ষণ ধরে কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছি অথচ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন না!"

সত্যি মিসেস পপি বিশোয়াস যে কখন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা বুঝতে পারিনি।

"তা বুঝতে পারবেন কেন! আমরা কী বুঝেসুঝে নেবার মতো লোক!" মিসেস বিশোয়াস হালকা সুরেই অভিযোগ পেশ করলেন।

তাড়াতাড়ি ক্ষমা ভিক্ষা করে নিলাম মিসেস পপি বিশোয়াসের কাছ থেকে। কিন্তু তবু তিনি মৃদু শাস্তি দিতে ছাড়লেন না। বললেন, "আমি তো তাজ্জব। মনে হলো আপনি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কাছে চেপে রাখবার চেষ্টা করবেন না, মিস্টার শংকর, আমি সব বুঝতে পারছি।"

আঁতকে উঠবার মতো অবস্থা আমার। পপি বিশোয়াস যদি আমার সুলেখা-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার ইঙ্গিত পান তা হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে তা আন্দাজ করা শক্ত নয়। মুখ ফুটে মিথ্যা ভাষণের সাহসও পাচ্ছি না আমি —এই সব মহিলাদের তৃতীয় নয়নে অনেক অদৃশ্য জিনিসও ধরা পড়ে যায়।

পর মুহূর্তেই অবশ্য আমার দুশ্চিন্তা কাটলো। পপি বিশোয়াস সস্নেহে বললেন, "আপনি নিশ্চয় কবিতা লেখেন। কবি ছাড়া আজকাল আর কেউ তো এইভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে সময় নষ্ট করে না। বলুন, আমার গা ছুঁয়ে বলুন, আপনি কবিতা লেখেন না!" মুদ্রাদোষ-বশত পপি বিশোয়াস এক একটা কথা এমন বলে ফেলেন যার মানে বুঝলে মাথা ঘুরে ওঠে!

পপি বিশোয়াস বললেন, "সিগ্রেট ফুরিয়ে গিয়ে শরীরটা আইঢাই করছে তাই বেরিয়ে এসেছি ওই মিসেস খোসলার ফ্ল্যাট থেকে।"

মিসেস কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটটা তাহলে এখনকার মতো পপি বিশোয়াস এবং জেঠমালানিদের হাতেই চলে গিয়েছে।

মিসেস পপি বিশোয়াস অভিযোগ করলেন, "কাজকর্মের চাপ থাকলে আমার আবার সিগ্রেট না-হলে শরীরটা আইঢাই করে আজকাল! কিন্তু এই জেঠমালানি কিপ্টে নম্বর ওয়ান। থ্যাকারে ম্যানসনে টেম্পোরারি ঘর নিয়েছিস তো কী হয়েছে? সঙ্গে-সঙ্গে একটা-আধটা ফাইফরমাশ খাটবার

লোকের ব্যবস্থা কর।"

রাগ আরও বাড়ছে মিসেস বিশোয়াসের। বললেন, "দুঃখের কথা আর কী বলবো। আমাদের তো ইউনিয়ন নেই—থাকলে বাছাধনরা হাড়ে-হাড়ে মজা বুঝতো। ওদের ধারণা, আমাদের এই কাজটা ছেলেখেলা—কোনো মেহনত নেই, ধকল নেই। টাকাটা আমরা মাগনা নিয়ে নিই। জগদীশবাবুর উচিত ছিল না ফ্ল্যাটের চাবি নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা কিছু সার্ভিসের ব্যবস্থা করা?"

আমি রুদ্ধবাক হয়েই মিসেস পাঁপি বিশোয়াসের আবোল-তাবোল কথাগুলো একমনে শুনে যাচ্ছি। ভদ্রমহিলা নিতান্ত অস্বস্তিকর কথাগুলোও কেমন সহজে হুড়হুড় করে বলে যাচ্ছেন।

মিসেস বিশোয়াস থাকলেন না। বললেন, "একটু দাঁড়ান মিস্টার শংকর, আমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনি।"

আমাকেও বাধ্য হয়ে মিসেস বিশোয়াসের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হলো। পাঁপি বিশোয়াস এবার বললেন, "ভাগ্যে আপনি সঙ্গে এলেন। যা জায়গা! অন্ধকার হলে, একলা-একলা মেয়েদের পক্ষে ঘোরা খুব বিপজ্জনক।"

"ভগবান, পরের জন্মে যেন পুরুষ মানুষ হই। একলা একলা পুরুষ মানুষের পক্ষে যাওয়া যায় না এমন জায়গাই হয় না। যত বিপদ মেয়েদের!" মিসেস বিশোয়াস নিজের মনেই বলে চলেছেন।

আমার মনের অবস্থা আন্দাজ করেই মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, আমি খুব বকবক করি। সারাক্ষণই তো একলা-একলা থাকি। না-হয় আজেবাজে লোকের সেবা করি। বুকটা ভারি হয়ে থাকে। আপনার মতো চেনা-জানা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বুকটা হালকা করে ফেলতে ইচ্ছে করে।"

মিসেস পাঁপি বিশোয়াস এবার আমাকে আরও অবাক করে দিলেন। ডানহিল ইণ্টারন্যাশনাল ছেড়ে তিনি সস্তা দামের দিশী সিগারেট কিনলেন। বললেন, "মানুষ তো! সব সহ্য করবার শক্তি শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে ভগবান মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান। না হলে, এই সব ছাই-পাঁশ সিগ্রেট আমি কীভাবে সহ্য করছি?"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোকানের দড়ির আগুনে মিসেস পাঁপি বিশোয়াস সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন। ওঁর ধোঁয়া ছাড়ার কায়দা দেখেই বুঝেছি, এইসব সস্তা দামের সিগারেটে এখনও তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। মুখ বিকৃত করে আমাকে তিনি পুনর্বার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "কখনও কারও দাস হবেন না, মিস্টার শঙ্কর—সে অভ্যেসই হোক আর মানুষই হোক। আমি এখন প্যাকেচক্রে দুয়েরই দাসী হয়ে আছি।"

সিগারেটের দাসত্বটা না হয় বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের দাসত্বটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

মিসেস পাঁপি বিশোয়াস থ্যাকারে ম্যানসনের গেট দিয়ে আবার ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "অভ্যাসের দাসত্বর তবু একটু নড়চড় আছে। ক'দিন আগেও বিলিতী সিগ্রেট ছাড়া কিছুই মুখে দিতে পারতাম না, এখন সময় খারাপ হওয়ায় থার্ড ক্লাস দিশী ব্র্যাণ্ডে নেমে এসেছি। কিন্তু এই যে মিস্টার জেঠমালানি—ওঁর দাসত্বের শেষ যে কোথায় তা বুঝতেই পারছি না।"

আধপোড়া সিগারেটটা ফুটপাথে ফুঁড়ে দিলেন মিসেস বিশোয়াস। এবং

একজন ভিখিরী সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়ে সেটি তুলে নিয়ে পরম আনন্দে ধোঁয়া টানতে লাগলো। আড়চোখে সেদিকে তাকালেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর বললেন, "এর থেকে আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিস অনেক ভাল ছিল। মাইনে করা বাঁদী হওয়া থেকে এই প্রাইভেট প্র্যাকটিস অনেক 'বেটার' মিস্টার শংকর। এক আধ গুণ নয়—হাজার গুণ ভাল, আপনাকে লিখে দিতে পারি।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পপি বিশোয়াস এবার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি ওঁর সঙ্গে তাল রেখে চলেছি। উনি বলে চলেছেন, "আমার কপালে যে এমন দুঃখ তোলা আছে তা জানবো কী করে? আমার অমন সাজানো বুটিকে গোলমাল ঢুকে গেলো! আমার কপালে কতকগুলো নচ্ছারের কাছে দাসত্ব রয়েছে, আমি আটকাবো কী করে?"

আমি এখনও কোনো উত্তর দিচ্ছি না। মিসেস বিশোয়াসের দুঃখ বুঝবার মতো নারকীয় অভিজ্ঞতা তো আমার নেই। এই দুঃখী মানুষটিকে আমি সান্ত্বনাই বা কী দেবো?

মিসেস পপি বিশোয়াস কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেননি। তিনি বললেন, "তবে যতখানি পারি আটঘাট বেঁধে নেবার চেষ্টা করেছি ওরই মধ্যে।" ওঁর কথাবার্তায় যথেষ্ট মনোবলের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম।

মিসেস বিশোয়াস এবার নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোষণা করলেন, "আমার যতই সময় খারাপ চলুক পপি বিশোয়াস ইজ পপি বিশোয়াস। তুমি যত বড় ঘাঘু জেঠমালানিই হও না কেন আমি সহজে মচকাচ্ছি না।"

পরের ব্যাপারটটা মিসেস বিশোয়াস এবার আমাকে জানালেন। "ওই যে জেঠমালানিদের খেয়াল-খুশী মতো যখন খুশী হোটেল অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করা আর যখন খুশী বিদায় দেওয়ার সিস্টেম, ওটি আমার সঙ্গে চলবে না। আগেকার মেয়েটা—সুলেখা সেন না কি যেন নাম ছিল? ওকে ক'মাস তো খুব মাথায় তুলে নেচেছিল, কাবুলের আঙুরের মতো যত্ন করে তুলোর বাক্সে রেখেছিল, তারপর যে কী হলো কিছুই বোঝা গেলো না। কাঁচ মেয়েটা একদিন হঠাৎ কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেলো।"

সুলেখা প্রসঙ্গের উত্থাপনায় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি। কী কথা থেকে কী কথা বেরিয়ে পড়বে তা ভগবান জানেন।

পপি বিশোয়াস সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বললেন, "আমাদের এ-লাইনে কেউ কি আর শখ করে উবে যায়? নিশ্চয় কোনো গোলমাল করেছিল আর সেই চান্স নিয়ে মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

আবার একটা সিগারেট ধরালেন পপি বিশোয়াস। বুঝলাম এই সিগারেট না রুচলেও নেশার টানটা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না তিনি।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "আমি কিন্তু জেঠ-মালানির সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে তবে কাজ নিয়েছি। ছ'মাসের আগে আমার নট নড়ন-চড়ন। ততদিনে ওই বুটিকের হাঙ্গামাগুলো নিশ্চয় ঝিমিয়ে পড়বে, তখন আমি আবার নিজের বিজনেসে ফিরে যেতে পারবো।"

"মিস্টার জেঠমালানি কী বললেন?" এবার আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করি।

"সেসব অনেক কথা—বলছি, বলছি," উত্তর দিলেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জানালেন, "সব কথা কী এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যায়? মুখচোখ তো শুকিয়ে রয়েছে দেখছি। আসুন

না, মিস্টার শংকর, আমার ঘরে। না হয় আপনার পারমিশন না-নিয়ে ব্যাক-ডোরে থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাট দখল করে বসে আছি, কিন্তু তাই বলে ঘরে ঢুকে চেনা-জানা লোকের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেতে আপত্তি কী?"

সীমার কথা চিন্তা করে করে আমার মানসিক অবস্থা এমন হয়েছে যে এই মুহূর্তে একলা থাকতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। জ্বালা-ধরানো নিঃসঙ্গতা থেকে মিসেস বিশোয়াসের বিতর্কিত সান্নিধ্যও আমার কাছে এখন আকর্ষণীয়।

সুতরাং আর আপত্তি করলাম না এবং মিসেস বিশোয়াস সানন্দে আমাকে সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন যেখানে বারান্দা থেকে মিসেস কিরণ খোসলা মদনার নির্দেশে রহস্যময়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করতেন।

মিসেস পপি বিশোয়াস দুঃখ করলন, "দেখুন না, ফ্ল্যাটের কী ছিরি! ঘর না ধর্মশালা বোঝা দায়। কিন্তু উপায়ও নেই—কেয়ার-টেকার ফ্ল্যাট তো। কখন আবার ওই মিসেস খোসলাকে ঘর ফিরিয়ে দিতে হবে ঠিক নেই।"

এই ফ্ল্যাটে ঢুকে আমি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছি। ফ্ল্যাটের সেই গৃহবধূটি আর্থিক বিপর্যয়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন কে জানে? যারা একবার দুর্ভাগ্যের স্রোতে খড় কুটোর মত ভেসে যায় তারা আবার কখনও স্বক্ষেত্রে সসম্মানে ফিরে আসে এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। এইখানেই তাহলে জগদীশ জেঠমালানি আবার আসর জাঁকিয়ে বসবেন।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আমি কিন্তু জগদীশবাবুকে ওয়ার্নিং দিয়েছি—ঘরদোর সাজানো-গোছানোর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এ তো ইস্টিশনের থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের মতো হয়ে আছে।"

ইস্টিশনের ওয়েটিং রুমকে আবার সাজিয়ে-গুছিয়ে ইন্দ্রপুরী করে তুলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মিস্টার জেঠমালানি, কিন্তু কিছুটা সময় চেয়েছেন। ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়ার সঙ্গে তিনি গোপনে কী সব কথাবার্তা চালাচ্ছেন এবং তার ফলাফলের ওপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "দেখুন না, ঘরে একটা ফ্রিজ পর্যন্ত নেই! কীভাবে যে এরা ঘর সংসার করতো জানি না। প্যানট্রিতে শুধু একটা জালের আলমারি আছে—ওখানেই একটু খাবারের ব্যবস্থা রেখেছি।"

সুগৃহিণীর মতো মিসেস বিশোয়াস এবার প্যানট্রিতে ঢুকে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরেই দু'কাপ গরম চা হাতে বড় ঘরে ফিরে এলেন। বললেন, "একটা পুরনো ইলেকট্রিক হিটার ছাড়া কিছুই নেই। তাও থাকবে কিনা সন্দেহ। আজ সকালেই তো ইলেকট্রিক লাইন কাটার নোটিস এসেছে শুনলাম—মিসেস খোসলা কতদিন বিলের টাকা জমা দেয়নি তার ঠিক নেই। মিস্টার জেঠমালানি অবশ্য বলেই চলেছেন ফিকর্ মত্ কীজিয়ে।"

মিসেস বিশোয়াসের স্বহস্তে প্রস্তুত চা-পান করে অনুগৃহীত বোধ করছি। এই প্রিলিভেজ যে বেশী লোকের হয়নি তাও জানতে পারলাম। মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমার এই সব রান্নাবান্নার কাজ একদম পোষায় না। ছোটবেলা থেকেই কিচেনের সঙ্গে আমার সতীনের সম্পর্ক। মা কতবার বলেছেন, পপি, মেয়েমানুষের একটু রান্নাবান্না জেনে রাখা খুব দরকার। কিন্তু আমি ওসব কথায় কানই দিইনি। আর এই এতোদিন পরে পাকে-চক্রে পড়ে আমাকে নিজের সব কাজকর্ম নিজেকেই করতে হচ্ছে।"

মিসেস বিশোয়াস এবার চামচ দিয়ে নিজের চায়ে চিনি মিশিয়ে নিলেন।

তারপর বললেন, "আমার নিজের চাকরবাকর ওই পুরনো জায়গাতেই রয়েছে। কিন্তু তাদের আমি এখানে আনতেই চাই না। এতো আমার অজ্ঞাতবাস! এখানে যে আমি চুপি চুপি সরে এসেছি, তা কাকপক্ষী পর্যন্ত না জানলেই সুবিধে।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন মিসেস পঁপি বিশোয়াস। বললেন, "বড় নিচু নজর এই জেঠমালানিদের। টাকার ওপর বড্ড মায়া—একটি আধলা খরচা করতে গেলে এদের বুকে খচ-খচ করে লাগে। আরে বাবা, টাকা কী সঙ্গে করে নিয়ে যাবি ? আমি জগদীশবাবুকে একদিন চান্স পেয়ে শুনিয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু লোকটা বলে কী জানেন ? একেবারে নিউ ফিলজফি! আমাকেও তাজ্জব করে দিয়েছে।"

আর একটু চা-পান করলেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর আবার শুরু করলেন, "জগদীশ জেঠমালানি বললো, মরবার সময় টাকা হয়তো নিয়ে যাওয়া যায় না, কিন্তু ছেলে, ভাইপো, ভাগ্নের কাছে টাকা রেখে দিয়ে যাওয়া যায় !"

বুঝুন, মিস্টার শংকর, পয়সা-কড়ির ব্যাপারে এদের মাথায় কত বুদ্ধি। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব আধঘণ্টা বুকে হাত বুলিয়ে দিলেও এদের টাকার লোভ যাবে না।"

এবার সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন পপি বিশোয়াস। বললেন, "তোমাদের টাকা নিয়ে তোমরা যা-খুশি করো। তবে বাবা আমার ফাইফর-মাজ খাটবার জন্যে একটা লোক দাও।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "যাকগে ওসব কথা। মিস্টার জেঠমালানি সম্বন্ধে তখন যেন কী কথা হচ্ছিল ? কাউকে বলবেন না কিন্তু, মিস্টার শংকর। মিস্টার জেঠমালানির মাথায় বড় বড় কীসব স্কীম আছে। আমাকে সেদিন তো হিণ্ট দিলেন, মিসেস বিশোয়াস, আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ-কর্ম করুন—আপনার লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।"

গলার স্বর নামিয়ে ফেললেন মিসেস বিশোয়াস, এবং ফিসফিস করে জানালেন, "খুব চালাক লোক তো। সাফ কথা এরা খুলে বলে না। কিন্তু বুঝছি, ওঁর মাথায় মস্ত কোনো স্কীম আছে—এবং সেই ব্যাপারে আমার সার্ভিস উনি কাজে লাগাবেন মনে হচ্ছে।"

স্কীমের ব্যাপারটায় মিসেস বিশোয়াস বিশেষ কৌতূহলী। কারণ এক-ঘেয়ে কাজকর্ম তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। "একটা কিছু হচ্ছে হচ্ছে ভাব না থাকলে আমি বোরিং ফীল করি। একসাইটমেণ্ট না থাকলে লাইফের কী মানে বলুন ?" মন্তব্য করলেন মিসেস বিশোয়াস।

চায়ের কাপ নিঃশেষ করে দিয়ে তিনি বললেন, "মিস্টার জেঠমালানির মাথায় কী স্কীম রয়েছে জানবার জন্যে মনটা চনমন করছে, মিস্টার শংকর। কিন্তু উনি যা লোক, ঠিক সময়ের আগে কিছুতেই মুখ খুলবেন না।"

এবার আমার প্রসঙ্গে এলেন মিসেস বিশোয়াস। জানতে চাইলেন, আমাকে কেন চিন্তিত দেখাচ্ছে ?

আমি সীমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সাহস পেলাম না।

মিসেস বিশোয়াস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের ওই ব্যাপারটার কী হলো শেষ পর্যন্ত ?"

"কোন ব্যাপারটা?" আমি জিজ্ঞেস করি। কারণ কত ব্যাপারই তো এখানে ঘটে চলেছে।

মিসেস বিশোয়াস এবার খিলখিল করে হেসে ফেললেন। "আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবার চেষ্টা করবেন না, মিস্টার শংকর। কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছি তা আপনি বেশ বুঝতে পারছেন। বিশ্বসুদ্ধু লোক সে-ব্যাপারটা নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে সে-ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না তা কখনও হয়?" মিসেস বিশোয়াসের হাসির গতিটা এবার আরও বেড়ে গেলো।

কী এমন গুরুতর ব্যাপার যা নিয়ে সর্বত্র চাপা গুঞ্জন চলেছে? যে ব্যাপারে গুজব রটলেও রটতে পারে তা হলো সুলেখার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার। কিন্তু সেতো কয়েক ঘণ্টা আগেকার কথা। গুজবের জীবাণু যথাস্থানে প্রবেশ করে ডিম পাড়তে বংশবৃদ্ধি করতে এবং কানে-কানে ছড়িয়ে পড়তে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা সময় নেয়।

মিসেস পপি বিশোয়াস আমার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করলেন এবং মৃদু হাসতে লাগলেন। আমাকে চিন্তায় ফেলে তিনি আনন্দ অনুভব করছেন।

পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার ফাস্ট হাজবেন্ড যা বলতেন তাই ঠিক দেখছি! ঘরের লোকের কানেই গুজবগুলো সবচেয়ে শেষে পৌঁছয়! বিশ্বশুদ্ধ লোক জানবার পরে বউ জানতে পারে স্বামী অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করছে।"

মিসেস বিশোয়াস স্বীকার করলেন তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। "আমার অমন হীরের টুকরো স্বামী যে একটা থার্ড ক্লাস মেমসায়েবের সঙ্গে মজেছেন তা যখন জানতে পারলাম তখন কিছুই আর করবার নেই। আমার সাজানো সংসার চোখের সামনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেলো, আমি কিছুই করতে পারলাম না, মিস্টার শংকর। বাড়িতে আগুন লাগলে দমকল পাওয়া যায়, কিন্তু কপালের আগুন নেবানোর কোনো দমকল বিশ্ব-সংসারে পাওয়া যায় না।"

অনেক দিনের পুরনো দুঃখ, প্রথম প্রেমের নিদারুণ ব্যর্থতা আজকের অধঃপতিত মিসেস বিশোয়াসকেও কিছুক্ষণের জন্যে কাতর করে তুললো। মিসেস বিশোয়াস হঠাৎ আনমনা হয়ে উঠলেন, বললেন, "পৃথিবীতে একটি পুরুষ মানুষকেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম, মিস্টার শংকর—তিনি আমার প্রথম স্বামী। তারপর থেকে আমি সাবধান হয়ে গিয়েছি। ঘর ভাঙবার পর আবার বিয়ে করেছি—কিন্তু মাটির ফাটা হাঁড়ি আর জোড়া লাগেনি। আর কোনো পুরুষমানুষকে আমি ব্ল্যাংক চেক দিইনি।"

মিসেস বিশোয়াস আমার দিকে সস্নেহে তাকালেন। নিজের গোপন দুঃখের অংশীদার হিসেবে আমাকে নির্বাচন করে তিনি আমাকে সম্মানিত করছেন, মনে হলো। আমার দিকে তাকিয়ে উদাসভাবে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "সংসারের লীলাখেলা দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। যাঁরা আমার

কাছের মানুষ তারা দূরে সরে গেলেন, যারা আপনজন তারা পর হলো, আর কোথা থেকে দূরের মানুষ আপনি আমার দুঃখের কথা শুনছেন।"

মিসেস পপি বিশোয়াস এবার উদাসভাবে বললেন, "কে জানে? হয়তো গত জন্মে আমরা খুব কাছাকাছি ছিলাম—এ-জন্মে ঘুরে-ফিরে সেই চেনা-চেনা ভাবটা ফিরে আসছে আমার মনে।"

মিসেস বিশোয়াসের রূপটা যেন ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। ওঁর সম্বন্ধে বিচিত্র এক ভালবাসার অনুভূতিতে আমার মন এই বিষণ্ন সন্ধ্যায় ভরে উঠছে।

মিসেস বিশোয়াস তাঁর প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার কথায় ফিরে গেলেন। বললেন, "আমার ফার্স্ট হাজবেন্ড—তাকে আমি নিজের স্বপ্নের মতো গড়ে তুলেছিলাম, মিস্টার শংকর। সে যে কখনও অবিশ্বাসের কাজ করতে পারে তা আমি ভাবিনি। বিদেশে ওই মেমসায়েবটার সঙ্গে যখন ও খুব মেলামেশা করতে লাগলো, তখন আমি ভেবেছি ইনটেলেকচুয়াল ভাব। দুজনে বসে-বসে ফ্রেঞ্চ কবিতা ও নাটক আলোচনা করতো। আমি আবার ওসবের কিছুই বুঝতে পারতাম না। আমি ভাবতাম, আমি যা দিতে পারি না, স্বামী বেচারা তা থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন?"

এবার নিজের আঙুল কামড়ালেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "অনেক দিন কাজে-কর্মের মধ্যে বেশ ডুবে ছিলাম। কিন্তু এই থ্যাকারে ম্যানসনের নির্বাসনে এসে আমার আবার পুরনো কথাগুলি মনে পড়ে যাচ্ছে, মিস্টার শংকর। নিজের অজান্তেই নিজের আঙুল কামড়ে ফেলি। ভাবি, গোড়ার দিকে আমি কেন সাবধান হলাম না? তাহলে ওই মেমসায়েবকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে আমার স্বামীকে আমার ঘরে রেখে দিতাম—সিঁথির সিঁদুর নিয়ে আমাকে বারবার এমন ছেলেখেলায় নামতে হতো না।"

মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকালেন মিসেস পপি বিশোয়াস। মনে হলো কোনো টেলিফোনবার্তা অথবা অ্যাপয়েন্টমেণ্টের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে মনে হচ্ছে নিজের পরিচিত জগতকে পিছনে ফেলে রেখে পাকে-চক্রে আমি কোনো উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করেছি এবং নিজেরই অজান্তে আমি উপন্যাসের চরিত্রের মত অবিশ্বাস্য ঘটনামালার সম্মুখীন হচ্ছি। এক অ্যাপয়েন্টমেণ্ট সেরে নায়ককে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আর এক চরিত্রের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে করতে নগরীর নারী পপি বিশোয়াস কেমন সহজে তাঁর বিবাহিত জীবনের স্মৃতি-চর্চায় ডুবে যাচ্ছেন। এই দুই জীবনের মধ্যে যে দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান আছে তা মিসেস বিশোয়াসের কথা শুনে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

মিসেস বিশোয়াস বোধ হয় অনেক দিন আমার মতো ধৈর্যশীল শ্রোতার সাক্ষাৎ পাননি। তাই আমকে আরও কিছুক্ষণ সময় কাটাবার জন্যে কাতর অনুরোধ করলেন। বললেন, "কাজ যদি না থাকে তা হলে বসুন না, মিস্টার শংকর। পেটের মধ্যে কথা জমিয়ে রেখে-রেখে দেহটা আই-ঢাই করছিল। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলে শরীরটা শান্ত হয়ে আসছে—মনে হচ্ছে, রোদে তেতেপুড়ে এসে শাওয়ার খুলে দিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করছি।"

মিসেস বিশোয়াসের মুখে-চোখেও প্রশান্তির ছায়া নেমে আসছে। আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি যে সত্যিই আনন্দ পাচ্ছেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মিসেস পপি বিশোয়াস আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর অভিযোগ করলেন, "দুঃখের কথা আপনাকে কী বলবো! আমার বুটিকে যেসব ফরেন গেস্ট আসতো তারা এক ধাতুতে গড়া আর এই আপনার জেঠমালানির গেস্ট-গুলো আর এক ধরনের চীজ!"

জেঠমালানি অবশ্যই আমার লোক নন, আর তাঁর স্পেশাল গেস্টদের সম্বন্ধেও আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই কী কুক্ষণে এই ভদ্রলোক যে আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনে শিকড় গেড়ে বসেছেন তা ভগবানই জানেন। যদি আমার হাতে আর একটু ক্ষমতা থাকতো, এবং যদি এই সম্পত্তির মালিক বিলাসিনী দেবী থ্যাকারে ম্যানসনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আর একটু মাথা ঘামাতেন তা হলে এই জগদীশ জেঠমালানি এবং তাঁর লটবহরকে কবে এখান থেকে বার করে দিয়ে শান্তি পেতাম। কিন্তু যা-হবার নয়, যা এই মুহূর্তে আমার আয়ত্তের বাইরে তা নিয়ে বেশী চিন্তা করে লাভ কী?

মিসেস পপি বিশোয়াস আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন না। তিনি এখনও নিজের দুঃখের ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছেন। তিনি আপন মনেই বললেন, "সায়েবগুলোর একটা জাত-ভদ্রতা আছে। গাঁটের কড়ি খরচ করে প্লেজার ট্রিপে এলেও মুখের ভদ্রতা নষ্ট করে না—থ্যাংক-ইউ বলে, কথায়-কথায় হাউ নাইস হাউ সুইট বলে তারিফ জানায়, জিজ্ঞেস করে মানুষটা কেমন আছে। আর এই দিশী গেস্টগুলো! ভগবান যে কী পদার্থ দিয়ে এদের তৈরি করেছেন তা তিনিই জানেন! নিজের পয়সা খরচের কথা তো এরা জানেই না—সব, এমনকি পপি বিশোয়াসের গেস্ট হবার খরচ অন্য পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় এমন ভাব দেখায় যেন নেটিভ স্টেটের মহারাজা! এদের সব কিছু পরস্মৈপদী—পরের ঘাড়ে বন্দুকটা রেখে জীবনের সমস্ত সুখ উপভোগ করবার জন্যেই যেন স্বর্গ থেকে রেজিস্টার্ড পার্সেল পোস্টে এই বিশ্বসংসারে এদের পাঠানো হয়েছে।"

পপি বিশোয়াস মুখ বিকৃত করলেন। বললেন, "ফরেন ভিজিটরগুলোর তুলনা হয় না। ওরা গপ্পোগুজব করতে চায়, ড্রিংকসের সময় টেপরেকর্ডে ইণ্ডিয়ান মিউজিক শুনতে ভালবাসে, দেওয়ালে ভাল ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং টাঙানো থাকলে তারিফ করে; এমন কি কেউ কেউ একটু ভাব হয়ে যাবার পরে আমার ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড হাজবেণ্ডের কথাও জানতে চায়। এক-একজন এতো 'হোমলি' আপনাকে কী বলবো! পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে নিজের ওয়াইফ এবং ছেলেপুলের রঙীন ফটো দেখায়, জিজ্ঞেস করে আমার হাজবেণ্ডদের কোনো ছবি হাতের গোড়ায় আছে কিনা।"

—"আর এখন! হিমালয়ের চুড়ো থেকে সোজা যেন আসানসোলে কোলিয়ারির খাদে নেমে এসেছি আমি। মিস্টার জেঠমালানির গেস্টগুলোর হাব-ভাব চাল-চলন দেখলে মনে হয় বিশ্বসংসারে ওঁরা ছাড়া যেন আর কেউ বেঁচে নেই। এই থ্যাকারে ম্যানসন, এই কলকাত শহর, এই বাংলাদেশ সব কিছুই যেন ওঁদের ভোগের জন্যেই তৈরি হয়েছে।"

এসব কথা আগে শুনলে আমার মনে কোনো দাগ কাটতো না। এই সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের কদর্য কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আগ্রহী হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু চোখের সামনে পপি বিশোয়াসের দুঃখ ও জ্বালা আমাকেও ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। এই দর্পিত নগরনন্দিনীর সঙ্গে আমিও যেন থ্যাকারে ম্যানসনে

মিসেস কিরণ খোসলার অ্যাপার্টমেণ্টের গোপন অতিথিদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি।

অপ্রিয় এই প্রসঙ্গ থেকে আমি এবার সম্পূর্ণ সরে আসতে চাই। মিসেস বিশোয়াস, দয়া করে জেঠমালানির মাননীয় অতিথি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করুন। যদি সম্ভব হয়, আমার উদ্বেগেরও অংশীদার হোন আপনি। সীমার কথা সাহস করে আপনার কাছে এখনও তুলতে পারিনি। সীমার ওপর আপনার বিজাতীয় ক্রোধ আছে মনে হয়। তার বিপদ ও প্রয়োজনের সময় আপনি কোনো রকম সাহায্য করতে আগ্রহ দেখাননি। অবশ্য তখন আপনি অন্য এক মিসেস পাপি বিশোয়াস ছিলেন। তখন আপনার সুখ ও সমৃদ্ধির সময়। এয়ারকণ্ডিশনড হাই-ক্লাস বুটিক থেকে নেমে এসে একদিন যে আপনাকেও এই থ্যাকারে ম্যানসনে মাথা গুঁজবার জন্যে আসতে হতে পারে তা নিশ্চয় আপনি তখন কল্পনাও করতে পারেন নি।

মিসেস বিশোয়াস আবার মুখ খুললেন, "এবার আপনার কথা বলুন, মিস্টার শংকর। আপনাকে নিয়ে বেশ মুশকিল—আপনার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোতে চায় না।"

অভিযোগ উত্থাপন করেই আক্রমণের জ্বালা কমিয়ে দিলেন মিসেস বিশোয়াস। সস্নেহে বললেন, "আমার প্রথম হাজবেণ্ডও ওই রকম ছিলেন। ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের লোক তো! সর্বদা হাসিখুশী, ভব্য-সভ্য, অতি ভদ্র কথাবার্তা—কিন্তু মনের মধ্যে যেসব কথা লুকানো আছে তা কিছুতেই বার হবে না। ককটেল পার্টিতে আড়াই ঘণ্টা প্রেজেণ্ট থাকবার পরেও মুখের ছিপি খুলে যাবে না। সেবার শুধু মস্তবড় পার্টিতে সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়িতে ফেরবার পরেও আমি রেহাই দিলাম না—সামনে স্কচ হুইস্কির বোতল এগিয়ে দিলাম। কী দিনকাল ছিল তখন—সোডার বোতলের দামে আমরা জেনুইন স্কচ কিনতাম!"

—"জানলেন, মিস্টার শংকর?" স্বামীর কাহিনী বর্ণনা করতে করতে একটু থামলেন মিসেস পাপি বিশোয়াস। তারপর করুণভাবে বললেন, "রাত সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত উনি সমানে ড্রিংক করে গেলেন—আমিও গেলাস হাতে সংগত করে যাচ্ছি। আমার তখন ধনুর্ভঙ্গ পণ—ওর পেটের কথা আজকে আমি টেনে বার করবোই—তাতে যদি হোল-নাইট ড্রিংক করাতে হয় ওকে, তাও রিস্ক নেবো।"

—"বুঝলেন কিছু?" এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মিসেস পাপি বিশোয়াস।

এবার আমার হয়ে তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, "বিয়ে করে অভাগিনী না-হলে এসব দুঃখ বোঝা যায় না, মিস্টার শংকর। ভগবান করুন, কোনো-দিন আপনাকে এসব যেন বুঝতে না হয়।"

আবার শুরু হলো প্রথম হাজবেণ্ডের কথা। মিসেস পাপি বিশোয়াস বললেন, "জানেন মিস্টার শংকর, রাত তখন দেড়টা। ওঁর সঙ্গে হুইস্কির তাল রাখতে রাখতে আমিও টলমল করছি। অ্যাটলাস্ট আমার হাজবেণ্ড মুখ খুললেন। বললেন, পাপি, তোমাকে আমি আর ভালবাসি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি হাসিমুখে আমাকে ডায়ানার কাছে যাবার পারমিশন দাও।"

সেই দুর্যোগের দিনের কথা স্মরণ করে এতোদিন পরেও মিসেস পপি বিশোয়াস কিছুক্ষণের জন্যে প্রায় ভেঙে পড়লেন। কয়েক মিনিট কোনো কথাই বললেন না।

কথার মোড় ফেরাবার জন্যে এবং মিসেস বিশোয়াসকে অন্য কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখবার জন্যে এবার আমি মুখ খুললাম। "আমার সম্বন্ধে আপনি কী যেন অভিযোগ করছিলেন?"

"বলছিলাম, আপনি বড্ড চাপা।"

"কথা চেপে রাখবার স্পেশাল ট্রেনিং তো হাইকোর্ট পাড়াতেই হয়ে গিয়েছে, মিসেস বিশোয়াস। আল্গা পেটের লোকেরা তো ব্যারিস্টারের চেম্বারে চাকুরি করতে পারবে না—একথা ব্যারিস্টার বারওয়েল সায়েব আমাকে নিজেই বলেছিলেন।"

এবার হাসবার চেষ্টা করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "আপনার ওই সায়েবের কাছে কয়েক দিন ট্রেনিং নিলে আমার পক্ষে খুব ভাল হতো। আমার আবার এমন ধাত যে কোনো কথাই হজম করে ফেলতে পারি না। যত সময় যাচ্ছে ততই যেন অভ্যেসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

সায়েবের কথা উঠতে আমার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। "ব্যারিস্টার বারওয়েলকে এখন আর কোথায় পাবেন? তিনি বেঁচে থাকলে আজ আমারও কী এই অবস্থা হতো? থ্যাকারে ম্যানসনের এই নির্বাসন যন্ত্রণা তিনি নিশ্চয় আমাকে সহ্য করতে দিতেন না।"

মিসেস পপি বিশোয়াস এবার আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। "বালাই ষাট। নির্বাসন যন্ত্রণা কেন? এখানে কত শিক্ষা হচ্ছে আপনার। একদিন হঠাৎ আপনার কপাল খুলে যাবে—আপনি মস্ত বড়লোক হয়ে যাবেন।"

এবার মিসেস বিশোয়াস বিষয়-সম্পত্তির কথায় ফিরে এলেন। মৃদু বকুনি লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি আপনি গরম গুজবের খবর রাখেন-নি?"

আমি কিছু জানি না বলায় মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এটা খুব অন্যায় আপনার। যে-গাছে ডিঙি বেঁধেছেন, সে-গাছের ডালে-ডালে কী খেলা চলেছে তা জেনে রাখা অবশ্যই আপনার ডিউটি। এ সব করে না বলেই তো বাঙালীরা কাজে-কর্মে এতো পিছিয়ে যায়," অভিযোগ করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

নতমস্তকে অভিযোগ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? এবার বোধ হয় মিসেস বিশোয়াসের আমার ওপর একটু মায়া হলো। গলার স্বর নামিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, "বিডন স্ট্রীটের বিলাসিনী দেবীর লেটেস্ট খবরাখবর কিছু পেয়েছেন?"

ওখানকার খবরাখবর সত্যিই আমার কানে আসেনি। হারিয়ে যাওয়া পমাকে নাটকীয়ভাবে উদ্ধার করে বিলাসিনী দেবীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গণপতিবাবু সেই যে গা ঢাকা দিলেন আর দেখা নেই।

পমা ও বিলাসিনী দেবী সম্বন্ধে সত্যিই আমার চিন্তা হয়। কিন্তু বড় ঘরের বড় কথার মধ্যে আমাদের মতো সামান্য লোকের নাক গলানোর কোনো অর্থ হয় না।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "পমা মেয়েটি কেমন?"

"বেশ ভাল বলেই তো মনে হয়। অমন সুন্দর চেহারার মানুষ কী করে খারাপ হবে?" আমি উত্তর দিই।

"আপনার এখনও কিসসু জ্ঞান হয়নি দেখছি!" বকুনি লাগালেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "মেয়েমানুষের দেহটা বড় ডেনজারাস জিনিস, মিস্টার শংকর। বাইরের খোলটা দেখে ভিতরটা সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা খুব শক্ত।"

এই মূল্যবান মন্তব্য শুনে আমার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। মিসেস পপি বিশোয়াস কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। বললেন, "কাঁচ কাঁচ পুরুষ-মানুষদের ট্রেনিং-এর জন্যে একটা ইস্কুল খুলবো ভাবছি। সুন্দর মুখ দেখলেই তারা মজে যায়। যেমন আপনি ভাবছেন এয়ারেস পমার রূপের সংগে ম্যাচিং করে ভগবান মগজে বুদ্ধিও দিয়েছেন।"

মিসেস বিশোয়াসের ট্রেনিং ইস্কুলের পরিকল্পনাটা অভিনব মনে হচ্ছে। ওই রকম একটা ইস্কুলের জন্যে আমি না-হয় একখানা ঘর এই থ্যাকারে ম্যানসনে ব্যবস্থা করে দেবো।

মিসেস বিশোয়াস উত্তর দিলেন, "এখন বলছেন। কিন্তু রিটায়ার করে যখন সত্যিই ইস্কুল খুলবার জন্যে জায়গা চাইবো তখন চিনতেই পারবেন না!"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "পমা মেয়েটি যে একেবারে গবেট তা আমি আদালতে গিয়ে হলফ নিয়ে বলতে পারি। না-হলে কেউ অমন মায়ের অজান্তে ওই বিপুলভূষণ বারিকের সংগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভাবনানি ম্যানসনে ঢুকে পড়ে?"

মিসেস বিশোয়াস এবার ঘোষণা করলেন, "আমি লিখে দিতে পারি, ওই বিপুলভূষণ বারিক লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। কেবল মাস্টারি করবার মতলব নিয়ে লোকটা বিডন স্ট্রীটের চন্দ্রোদয় ভবনে ঢোকেনি। গোড়া থেকেই ওর মাথায় অন্য মতলব ছিল।"

আমার মালিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল দেখাতে চাই না। মিসেস বিশোয়াসকে নিরুৎসাহ করবার জন্যে তাই বললাম, "ওঁদের ব্যাপার ওঁরা বুঝুন। ও'দের বাড়ির মাস্টার ভাল না মন্দ তাতে আমার কী এসে যায় বলুন?"

খিলখিল করে হেসে উঠলেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "এসে যায় বইকি। হাজার বার এসে যায় এবং যথা সময়ে সেটা বুঝতেও পারবেন, মিস্টার শংকর।"

মিসেস বিশোয়াসের শেষ কথাটা বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে ভাববেন। আপাতত গুজব হলো বিডন স্ট্রীটের বিলাসিনী দেবী রাতারাতি পমার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। একটি পাত্রও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। পুরো রাজত্ব এবং গোটা রাজকন্যে পাবার সুবর্ণ সুযোগ পাত্রটি কেন লাস্ট মোমেন্টে হাতছাড়া করলো তা বোঝা গেলো না।"

"ইতিমধ্যে আর এক বিপদ হয়েছে," জানালেন মিসেস বিশোয়াস।

"কী বিপদ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "শুনছি, রাজকন্যে নাকি আবার বেঁকে বসেছেন—বলছেন, বিপুল বারিককেই তাঁর চাই।"

এতো খবর মিসেস বিশোয়াস যে কোথা থেকে সংগ্রহ করেন তা আন্দাজ করতে পারছি না।

"জোগাড় করতে হয় না! কানে এসে যায়! জেঠমালানি, মিসেস চাওলা—কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে," উত্তর দিলেন মিসেস বিশোয়াস।

এখানেই থামলেন না তিনি। বললেন, "লেটেস্ট খবরটা শুনে রাখুন। চন্দ্রোদয় ভবনে ভীষণ উত্তেজনা। বিলাসিনী দেবী মনের দুঃখে অনশন শুরু করেছেন। একটা কিছু ঘটবে বলে মনে হচ্ছে এবার।"

কী ঘটতে পারে। এবং তাতে আমরা কীভাবে জড়িয়ে পড়তে পারি তা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘরের কোণের টেলিফোনটা তারস্বরে বেজে উঠলো।

টেলিফোনের আওয়াজ শুনে মিসেস পাঁপ বিশোয়াস কোনোরকম ব্যস্ততা দেখালেন না। বরং একটু মুখ বিকৃত করলেন।

তলার ঠোঁট ঈষৎ উল্টে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "উঃ, কে এই বিদ-ঘুটে যন্তরটা আবিষ্কার করেছিলেন বলুন তো?"

উত্তরটা জানা থাকায়, বললাম, "আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল।"

"নামেও বেল, কাজেও বেল!" মন্তব্য করলেন মিসেস পাঁপ বিশোয়াস। "নিজের নামের সঙ্গে ঘণ্টা আছে বলে নিজের যন্তরের সঙ্গে ঘণ্টা জুড়ে দেবার কী দরকার ছিল রে বাবা?"

মিসেস বিশোয়াসের অভিযোগ—দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য টেলিফোনের সঙ্গে অন্য কিছু ব্যবস্থা করা যেতো, এইভাবে ক্রিং ক্রিং করে কান ধরে টানবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

টেলিফোন এখনও বেজে চলেছে। মিসেস বিশোয়াস ছোট হাই তোলার পর আড়মোড়া ভেঙে আলসেমী বিদায়ের চেষ্টা করলেন। বললেন, "এরা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না। আপনার সঙ্গে যে হাত-পা গুটিয়ে একটু গল্প করবো, দুটো প্রাণের কথা বলবো তার উপায় নেই।"

আমি ব্যস্ত হয়ে ওঁকে টেলিফোনটা ধরতে অনুরোধ করলাম। উনি হেসে বললেন, "কিছছু ভাববেন না। দরকার হলে পাকা দশ মিনিট টেলিফোন কানে দিয়ে বসে থাকবে। পাঁপ বিশোয়াসের এ বিষয়ে নাম-ডাক আছে! আমি হুট করে গিয়ে ফোন ধরি না, বেশ কিছুক্ষণ ফোন বাজবার পরে রিসিভারটা তুলি। এতে হাঙগামা কম হয়। আল্টু-ফাল্টু লোকগুলো, যারা শুধু শুধু ফোন তুলে ডিস্টার্ব করে, তারা লাইন ছেড়ে দেয়। আর জেনুইন লোকদের কাছে আমার দর বেড়ে যায়—তারা বুঝতে পারে ফোন তুললেই পাঁপ বিশোয়াসকে পাওয়া যায় না।"

ফোনের বাজনা হঠাৎ থেমে গেলো। আমি ভাবলাম আমার উপস্থিতির জন্যেই বোধ হয় মিসেস বশোয়াসের ফোন কলটা বৃথা হলো, অন্য পার্টি লাইনটা ছেড়ে দিলেন।

মিসেস বিশোয়াস আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বোধ হয় বুঝতে পারলেন। বললেন, "কিছছু ভাববেন না, মিস্টার শংকর। লাইন ছেড়ে চলে যাবার পাত্র আমার পার্টিরা নয়। পার্টির মনের মধ্যে সন্দেহ হয়েছে ঠিক

নম্বরে ডায়াল করেছি তো? এখনই আবার পপি বিশোয়াসের নম্বর ডায়াল করবে এবং টেলিফোন বাজবে।"

পপি বিশোয়স সত্যিই এই টেলিফোন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। বললেন, "কাজকর্ম চুকিয়ে আজ আমার মুডটা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে, মিস্টার শংকর। এখন আর নতুন কোনো হাঙ্গামায় জড়াতে ইচ্ছে করছে না। টেলিফোন না বাজলেই আমি খুশি।"

মিসেস বিশোয়াসের এই অনাসক্তির কারণ কী বুঝতে পারছি না। বিজনেসকে বিজনেসের মতো নেবার দুর্লভ ক্ষমতা এঁর মধ্যে আমি আগে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আজ তিনি অন্য রকম ব্যবহার করছেন।

কারণটা এবার জানা গেলো। মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, পপি বিশোয়াসের হলো কী? এ সব কী কথাবার্তা শুনছি তার মুখে? কিন্তু বিশ্বাস করুন, একটু আগেই হঠাৎ ব্যাপারটা মনে পড়ে গেলো।"

কী এমন ব্যাপার যা স্মরণ করে মিসেস বিশোয়াসের মুড পাল্টে গেলো, প্রফেশনাল কাজকর্মে বৈরাগিনী হয়ে পড়লেন তিনি?

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ভুলতে পারলেই ভাল হতো। তবু মনে পড়ে যাচ্ছে, আজ আমার বিয়ের তারিখ। আমার ফার্স্ট হাজবেণ্ডের সঙ্গে এই তারিখেই বিয়ে হয়েছিল আমার।"

একটু থামলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা! অথচ কত বছর কেটে গিয়েছে, স্বামীর সঙ্গে ছাঁদনাতলায় শুভদৃষ্টির পরে হাওড়া ব্রিজের তলা দিয়ে কত জল বয়ে গেলো।"

অনেকের জীবনে জল এইভাবেই বয়ে যায়, প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে কারও কিছু করবার থাকে না। তাই কোনো মন্তব্য না করে চুপ করে রইলাম।

মিসেস পপি বিশোয়াস আমার দিকে তাকালেন। শান্তভাবে, ঈষৎ বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনি স্মৃতিচারণ করলেন, "বিয়ের দিনে আমি কী রকম ইনোসেণ্ট ছিলাম ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!"

একটু হাসবার চেষ্টা করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "সেই পপিকে এখনকার কেউ চেনে না। আমার ফার্স্ট হাজবেণ্ডও সেই পপিকে মনে রেখেছেন কিনা কে জানে!"

এবার ওঁর স্বর হতাশায় ভেঙে পড়লো। "সব চেয়ে দুঃখের কথা কী জানেন? থ্যাকারে ম্যানসনের এই মিসেস পপি বিশোয়াসও যে প্রথম বিয়ের রাতে একেবারে ভোরবেলার ফুলের মতো ইনোসেণ্ট ছিল সে-কথা দুনিয়াতে কেউ বিশ্বাস করবে না।"

পৃথিবীর অন্য লোকরা বিশ্বাস করুক না করুক, আমি বিশ্বাস করছি মিসেস পপি বিশোয়াসকে। সে-কথা তাঁকে জানিয়েও দিলাম।

অভিমানভরা কণ্ঠে মিসেস বিশোয়াস বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বললেন, "বিশ্বাস না করুকগে! তাতে আমার কী এসে যায়?"

মিসেস বিশোয়াস মনে মনে কী বললেন! তারপর বললেন, "বছরের তিনশো চৌষট্টি দিন আমার সম্বন্ধে কে কী ভাবলো তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। লোকের নোংরা চিন্তা ডোণ্ট-কেয়ার করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে

দেবার মতো শক্ত নার্ভ অবশ্যই পপি বিশোয়াসের আছে। কিন্তু এই একটা দিনই মুশকিল হয়ে যায়। প্রথম বিয়ের দিনটিতে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। কত কথা মনে পড়ে যায়।"

সেই সব স্মৃতির ছবি আমার সামনে তুলে ধরে সাময়িক আনন্দ পাচ্ছেন মিসেস বিশোয়াস। "বিয়ের দিনে সমস্ত দিন উপোস করে ছিলাম, মিস্টার শংকর। আমার এক বান্ধবী লুকিয়ে একখানা মাছভাজা এনে বললে, 'খেয়ে নে—তুই তো আবার বেশীক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারিস না।' কিন্তু আমি রাজী হলাম না। না বাবা, উপবাস ভংগ করে শেষে কোনো অমংগল হোক আর কী!"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এই ছেলেমানুষীর হয়তো কোনো মানে হয় না। সেই স্বামী, সেই সাজানো ঘর-সংসার কোথায় ভেসে গেলো। তবু বছরের এই একটা দিন আমি পুরনো দিনের পপি হয়ে যাবার চেষ্টা করি। বিয়ের তারিখে আমি মদ স্পর্শ করি না, সকালে কালীমন্দিরে পুজো পাঠিয়ে দিই।"

মিসেস বিশোয়াসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণ করে ঘরের টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো। বিরক্তভাবে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "দেখলেন তো! একবার আমার লাইনে নো-রিপ্লাই হলেও ছাড়বে না, আবার ডায়াল করছে। এই একটা দিনও এরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

টেলিফোনের বাজনা অবহেলা করেই মিসেস বিশোয়াস বললেন, "অন্য বছরে এই দিনে আমি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতাম। যতই টেলিফোন বাজুক পপির পাত্তা পাওয়া যেতো না। কিন্তু এবারে দিনকাল খুবই খারাপ। জেঠমালানির পাল্লায় পড়ে স্টেশন 'লিভ' করবার পারমিশন পাওয়া গেলো না।"

"হ্যালো, হ্যালো," আধা-বিরক্ত কণ্ঠে টেলিফোনে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন মিসেস বিশোয়াস।

ওদিক থেকে কিছু কথা ভেসে এলো। তার উত্তরে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "কোথায় আর যাবো, মিস্টার জেঠমালানি? এইখানেই তো সারা-ক্ষণ ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছি। নিশ্চয় টেলিফোনে গন্ডগোল হয়েছিল। জানেন তো কলকাতার টেলিফোনের কথা—ওয়ার্লডে এর জুড়ি পাবেন না! যেমন শহর তেমন টেলিফোন, বুঝলেন মিস্টার জেঠমালানি?"

মিস্টার জেঠমালানি উত্তরে কী নিবেদন করলেন তা আন্দাজ করতে পারলাম না।

কিন্তু মিসেস বিশোয়াসের কণ্ঠস্বর কানে এলো। "এ আর এমন কি ট্রাবল্? একবারের জায়গায় দু'বার টেলিফোন ডায়াল করেছেন। সেবার কানাডার মিস্টার জনসন কী করেছিলেন জানেন?"

"জানেন না যখন তখন শুনে রাখুন! টরন্টো থেকে ট্রাংক-কল বুক করে টেলিফোন ট্রাবলের জন্যে আমার ভয়েস ঠিক মতো শুনতে না পেয়ে নেক্সট প্যান-আম ফ্লাইটে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। হিসট্রির বইতে লিখে রাখবার মতো খবর এসব, এই পপি বিশোয়াসের লাইফেই হয়েছে। আমাকে আন্ডার-এস্টিমেট করবেন না, মিস্টার জেঠমালানি।"

ওদিক থেকে জগদীশ জেঠমালানি বোধ হয় বিরক্তি প্রকাশের জন্যে

ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। একবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই যথেষ্ট। টেলিফোনের যা অবস্থা, তাতে কলকাতার লোকের মেজাজ ঠিক রাখা অসম্ভব ব্যাপার, মিস্টার জেঠমালানি।"

"হ্যালো, হ্যালো—আমি পপি বিশোয়াস লাইনেই রয়েছি—না লাইন কেটে যায়নি। তবে একটু ডিসটারবেন্স হচ্ছে।"

এবার মন দিয়ে অপর পক্ষের কথা শুনলেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর প্রতিবাদ জানালেন, "অ্যাঁ! কী বললেন মিস্টার জেঠমালানি?"

"হ্যালো, মিস্টার জেঠমালানি। আজ আর কেন? অনেক তো হলো আজ। প্লিজ, আজকের মতো আমাকে ছুটি দিয়ে দিন, মিস্টার জেঠমালানি। টায়র্ড ফিল করছি বেশ।"

"হ্যালো। কী বললেন? আপনার খরচে এক বোতল ফ্রেঞ্চ ব্রান্ড আনিয়ে নেবো? থ্যাংক ইউ মিস্টার জেঠমালানি। ভেরি সুইট অফ ইউ। কিন্তু এখন আর কোনো অ্যাসাইনমেণ্ট দেবেন না। মুডটা ভাল নেই। নতুন চাকরি না-হলে আজ আমি এসব হাঙ্গামায় থাকতামই না।"

ওধার থেকে জগদীশ জেঠমালানির কী সব কথা ভেসে এলো। ভদ্রলোক প্রবল উদ্দীপনায় মিসেস পপি বিশোয়াসের স্যাঁৎসেঁতে মুডকে খটখটে করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন মনে হলো।

"বুঝলাম, মিস্টার জেঠমালানি," উত্তর দিলেন মিসেস বিশোয়াস। "কিন্তু আমরা তো মেশিন নই—আমরা মানুষ। মুড না-থাকলে আমাদের লাইনে কাজকম্মো গোলমাল হয়ে যায়। আপনার হিতে বিপরীত না হয়ে যায়!"

মিস্টার জেঠমালানি তবু নাছোড়বান্দা। তিনি যে হতোদ্যম না-হয়ে নিজের বক্তব্য নিপুণভাবে নিবেদন করে চলেছেন, তা আন্দাজ করতে পারছি।

এবার একটু সন্তুষ্ট হয়ে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "না, অত প্রশংসা করবেন না, মিঃ জেঠমালানি। ছোটবেলা থেকে আমার ট্রেনিং-ই আলাদা। বাবা বলতেন, যে-কাজই করবে তা ভালভাবে করবে।"

আরও কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে মিসেস পপি বিশোয়াস নিজের আসনে ফিরে এলেন। বললেন, "ভেরি স্যরি, মিস্টার শংকর। একটু যে হাত-পা গুটিয়ে গপ্পো করবো আপনার সঙ্গে তারও উপায় নেই। এই মিস্টার জেঠমালানি, বিশ্বশুদ্ধ বড়লোকের সঙ্গে ভাব করে রেখেছে। আর লোকগুলো চান্স পেলেই অবলাইজড হবার জন্যে জগদীশ জেঠমালানির শরণাপন্ন হয়।"

আমি মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, "কিছুতেই না-বলতে পারলাম না। ভীষণ হাই-সার্কেলের ব্যাপার। মিস্টার জেঠমালানি নাম বলতে বিশ্বাসই হতে চায় না। আমি ওঁকে বকুনি দিলাম, আপনি এসব কী বলছেন? মিস্টার জেঠমালানি উত্তর দিলেন, ফিকর মাত কীজিয়ে। উনি নিজেই একটু পরে আপনাকে ফোন করবেন। শুধু আমার গ্রীন সিগন্যালের অপেক্ষা করছেন ভদ্রলোক।"

মিসেস বিশোয়াস এই রহস্যময় ব্যক্তিটির নাম আমার কাছে প্রকাশ করছেন না। কৌতূহল বাড়লেও আমি ও-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে উৎসাহী নই।

মিসেস বিশোয়াস এবার একটা সিগারেট ধরালেন। শূন্যে ধোঁয়ার রিং

ছেড়ে বললেন, "জেঠমালানি সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে, মিস্টার শংকর। আমার ধারণা ছিল, পেটি বিজনেসম্যান। বড় জোর দু'একটা মাঝারি সাইজের গভরমেণ্ট অফিসারকে টোপ ফেলে বঁড়শিতে গেঁথে ফেলে। কিন্তু এখন যেসব কথা টেলিফোনে বললেন, যিনি এখানে আসতে চান তা শুনে আমার মতামত উল্টে যাচ্ছে।"

ব্যাপারটা নিয়ে মিসেস বিশোয়াস বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন মনে হলো। দ্বিতীয়বার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমাকে চমকে দেবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছেন জেঠমালানি। তবে দেখা যাক। আমার নামও পপি বিশোয়াস! এখনই টেলিফোন এলে সব বোঝা যাবে।"

একটু পরেই টেলিফোন এলো। এবং মিসেস পপি বিশোয়াস নিচু স্বরে কথাবার্তা সেরে আবার আমার কাছে ফিরে এলেন।

এবার আমার ওঠাবার পালা। কিন্তু মিসেস পপি বিশোয়াস বকুনি লাগালেন, "এতো ছটফট করছেন কেন? যাবার সময় হলে আমি নিজেই আপনাকে চলে যেতে বলবো। একটু বসুন। আমার মাথাটা যেন ঘুরছে। ঠিক লোকের সঙ্গে কথা বললাম তো?"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আজকের খবরের কাগজটা নিয়ে আসি।"

ঘরের এক কোণ থেকে বাংলা কাগজখানা উদ্ধার করে আনলেন তিনি এবং প্রথম পাতার তলার দিকে নিজস্ব ফটোগ্রাফার গৃহীত একটি ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেশ ও দশের সেবায় নিবেদিত এক শ্রদ্ধেয় নেতার কর্ম-মুখর জীবনের একটি মুহূর্ত ধরা পড়েছে স্টাফ ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায়। ছবিটি দূর থেকে আমারও নজর এড়ালো না।

শ্রদ্ধেয় নামটি ফিসফিস করে জানাবার আগে পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করুন কাউকে বলবেন না। জানাজানি হলে মিস্টার জেঠমালানি এবং উনি দু-জনেই খুব বিপদে পড়ে যাবেন।"

প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি আদায় করে মিসেস পপি বিশোয়াস যে নামটি জানালেন তা আমার অকল্পনীয়। এই শ্রদ্ধেয় প্রবীণ জননেতার দেশসেবার নানা রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কোনো সাক্ষর বাঙালীর পক্ষে এই নেতাকে না জানা প্রায় অসম্ভব বলা চলতে পারে।

নিরক্ষর হলেও তাঁকে চেনার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ বেতারেও তাঁর নাম দিল্লী থেকে বাংলা সংবাদে প্রচারিত হয়।

ধরা যাক তাঁর নাম প্রতুল বিশ্বাস। থ্যাকারে ম্যানসনে এই প্রতুল বিশ্বাসের আসন্ন উপস্থিতির আগাম খবর আমার কাছেও অবিশ্বাস্য মনে হলো।

প্রতুল বিশ্বাস একদা স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতাকে সাহায্য করে এবং বারংবার বিদেশী সরকারের কারাগারে গমন করে দেশের মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনটি দখল করেছেন।

মিসেস বিশোয়াস রাজ্যের রাজনীতির খবরাখবর তেমনভাবে রাখেন না। তাই আমাকে অনুরোধ করলেন, "আপনি তো অনেক কিছুর খবরাখবর রাখেন। বলুন না একটু প্রতুলবাবুর খবর।"

বললাম, "মস্ত লোক এই বিশ্বাসমশায়। দেশ-বিদেশে কত বড় বড় লেকচার দিয়ে বেড়ান।"

"দেখেছেন ওঁকে আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন।

"ওঁকে কে দেখেনি?" আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই। "স্বাধীনতা দিবস, গান্ধীজীর জন্মদিন, ভারত ছাড় দিবস ইত্যাদিতে প্রায়ই গড়ের মাঠে উপস্থিত হয়ে রস্ট্রামের সিঁড়ি বেয়ে বিশিষ্ট অতিথির আসনটি গ্রহণ করেন প্রতুল বিশ্বাস। তারপর বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে বারবার মাল্যভূষিত হন এবং সেই সব ফুলের বোঝা বইতে-বইতেই তিনি মাইকের সামনে উপস্থিত হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।"

"খুব ভাল বলেন বুঝি?" কৌতূহল প্রকাশ করেন মিসেস বিশোয়াস।

"অবশ্যই খুব ভাল বক্তা। এককালে ওঁর অগ্নিগর্ভ বাণী শুনে কত ছেলে হাসিমুখে জেলে গিয়েছে, কত মেয়ে হাতের গয়না খুলে দেশের জন্য দান করেছে।"

"ওমা! আপনার কথা শুনে আমার কিন্তু ভীষণ নার্ভাস লাগছে। এই ধরনের লোকের সামনে আমি কী করে মুখ খুলবো?" পপি বিশোয়াস আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

আমি ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। মিসেস বিশোয়াসকে শুনিয়ে বললাম, "শুনেছি সরকারী মহলে ওঁর খুব দাপট।"

"কার? মিস্টার বিশ্বাসের?"

"মিস্টার নয়। এই স্তরের মাননীয় নেতাদের কেউ মিস্টার বলে না, মিসেস বিশোয়াস। ওঁরা সব সময় শ্রী," আমি ওঁকে সাবধান করে দিলাম।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আমাকে সাবধান করে দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। আমি হয়তো পুরনো অভ্যেস মতো মিস্টার বিশ্বাস বলেই ডেকে ফেলতাম, তাতে উনি হয়তো ইনসালটেড ফিল করতেন।"

আমি বললাম, "প্রতুল বিশ্বাস যথাসময়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এখন অবশ্য তার থেকেও হায়ার পোজিসনে উঠে গিয়েছেন। ওঁর বাগানে এখন মন্ত্রী তৈরি হয়। ভবিষ্যতে যাঁরা সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে যেতে চান তাঁরা এসে দিনরাত ওঁর কাছে ধরনা দেন।"

"বলেন কী? আমি তো ফরেন লাইনে ছিলাম এতোদিন। ভি আই পি লাইনের অতশত জানবার চান্স পাইনি," আফসোস করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আমি বললাম, "মধ্যিখানে তো একবার গুজব রটে গেলো উনি কোন রাজ্যের লাটসায়েব হবে যাচ্ছেন।"

"তা লাটসায়েব হলেন না কেন?" জানতে চাইলেন মিসেস বিশোয়াস।

"আমি তখনও শাজাহান হোটেলে কাজ করি। আমারই সামনে কোনো এক ফরেন কনসুলেটের জাতীয় দিবসে একজন রিপোর্টার বন্ধু মাননীয় বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন লাটসায়েবী নিচ্ছেন কবে?"

"উনি খুব প্লিজড হলেন নিশ্চয়?" জানতে চাইলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

"মোটেই না। বরং একটু চটে উঠলেন। বললেন, রাজনীতিতে আমার কী এমনই অধঃপতন হয়েছে যে সামান্য গভর্নরশিপ নিতে হবে? ও-সমস্তই স্বার্থপ্রণোদিত গুজব।"

"ওমা!" কপালে হাত দিলেন পপি বিশোয়াস। "বলেন কি! লাট-সায়েবীটাও ওঁর কাছে সামান্য চাকরি?"

কর্মসূত্রে নিজের কানে যা শুনেছি তা অস্বীকার করি কী করে? পপি বিশোয়াস এবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, "এই সব বাড়তি খবর দিয়ে আপনি আমার নার্ভাসনেস বাড়িয়ে দিলেন। এইসব লোককে মিস্টার বিশ্বাস বলা চলবে না। যিনি লাটসায়েবী পেয়েও সন্তুষ্ট হন না তাঁকে তো শ্রীবিশ্বাস বলেও ডাকা চলবে না।"

নিজের কপাল টিপলেন পপি বিশোয়াস। "সব সময় লোকে মাননীয় বিশ্বাস, মাননীয় বিশ্বাস বলে ডাকবে কী করে, মিস্টার শংকর? সরকারী আপিসে চলতে পারে, কিন্তু আমাদের লাইনে ওসব অচল।"

আমি ভরসা দিলাম, "অত চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"চিন্তা করবো না, মানে?" ঝাঁঝিয়ে উঠলেন পপি বিশোয়াস। "কী বিপদে পড়লাম বলুন দেখি। অথচ মিস্টার জেঠমালানি জেনেশুনে ন্যাকা সাজলেন। বললেন, আমার পুরনো ফ্রেন্ড। খুব মসুর আদমী!"

পপি বিশোয়াস বললেন, "আপনার সঙ্গে ওঁর চেনা আছে নাকি?"

"ওঁরা যে স্তরের লোক সেখানে আমাদের সঙ্গে চেনাজানা হয় না। তবে হোটেলের চাকরি হারিয়ে ওঁর বাড়িতে কয়েক দিন ধরনা দিয়েছি চাকরির জন্যে।"

"কী হলো?" জানতে চাইলেন পপি বিশোয়াস।

"উনি সব শুনে উপদেশ দিলেন, ধৈর্য ধরতে হবে।"

মিসেস পপি বিশোয়াস এবার উৎসাহ দেখালেন। "তা হলে আপনি যাবেন না। আজই আপনার চাকরির কথা তুলবো আমি। এখানে এই টেমপোরারি কাজে কী অসুবিধেয় আছেন সে তো দেখছি আমি।" সগর্বে মিসেস বিশোয়াস বললেন "যতই মাননীয় ভি আই পি হন, পপি বিশোয়াসকে না বলা খুব কঠিন কাজ!"

ঘড়ির দিকে তাকালেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। এখানে পায়ের ধুলো দেওয়া মাত্রই আপনার চাকরির কথা তুলবো আমি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনি ফ্রি হয়ে যাবেন।"

আমি তো এখনও বদ্ধ উন্মাদ হইনি যে পপি বিশোয়াসের এই প্রস্তাবে রাজী হবো। আমি বললাম, "মাফ করুন আমাকে।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "তা হলে আপনি নিজের ঘরেই থাকুন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে আজ রাত্রে বা কাল সকালে সুবিধেমতো আপনাকে ডেকে পাঠাবো।"

আমি বিদায় নেবার সময় মিসেস বিশোয়াস বললেন, "কী ফ্যাসাদেই পড়া গেলো আজকে। মাননীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে কাগজে কত বড় বড় কথা বলছে, আর জগদীশ জেঠমালানি বললেন কিনা, একটি চালু মাল। জেঠ-মালানির শালার ফ্যাকটরির ইউনিয়নে বিশ্বাসের খুব হাত আছে। মাসে মাসে রেগুলার টাকা নিয়ে যাচ্ছে। এখন শ'দুয়েক লোককে ছাঁটাই করবার প্ল্যান হয়েছে, তাই প্রতুল বিশ্বাসকে একটু স্পেশাল সন্তুষ্ট না রাখলে উপায় নেই।"

সেদিন কিরণ খোসলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েই করিডরে মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসকে দেখতে পেয়েছিলাম আমি। যিনি সারাক্ষণ ভক্তপরিবৃত থাকেন তাঁকে অমন একলা দেখতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। প্রতুল বিশ্বাস রাতের অন্ধকারেও চোখে একটা কালো চশমা লাগিয়েছেন। ফ্ল্যাটের

নম্বরটার হদিশ করে মাননীয় বিশ্বাস মুহূর্তের মধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

পরের ঘটনা অপ্রত্যাশিত হলেও সংক্ষিপ্ত। দুপুর রাতে মিসেস পপি বিশোয়াস আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলেছিলেন। মিসেস বিশোয়াস তখন উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে।

সর্বনাশ হয়েছে। মাননীয় অতিথি বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হার্ট অ্যাটাক বলে সন্দেহ হচ্ছে।

রাতের গভীরে সেদিন আমাকে অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। জরুরি টেলিফোন পেয়ে জগদীশ জেঠমালানি এবং প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপো কয়েক মিনিটের মধ্যে অকুস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ডাক্তার ডাকাব কথা তুলতেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপো। বললেন, "ডাক্তার অবশ্যই ডাকা হবে, কিন্তু এখানে নয়।"

দেশনেতার ভাবমূর্তি অম্লান রাখবার জন্যে ভাইপো এবং মিস্টার জেঠ-মালানি দু-জনেই তখন বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

মিসেস বিশোয়াস আমার কাছে এসে বললেন, "কি আশ্চর্য লোক দেখুন এই জেঠমালানি। আমাকে বলে কিনা, এখনই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাও তুমি। অন্য কেউ আসবার আগেই নাকি আমি না চলে গেলে বিশ্বাসেব প্রেস্টিজের ক্ষতি হবে।"

এই গভীর রাতে কোথায় যাবেন মিসেস বিশোয়াস? অগত্যা আমার ঘরেই কয়েক ঘণ্টার আশ্রয় দিতে হলো তাঁকে।

কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলাম পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক। প্রতুল বিশ্বাসের আরও শারীরিক অবনতি হয়েছে।

বিশ্বাসের ভাইপো এবং জগদীশ জেঠমালানি তবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ওঁকে দ্রুত থ্যাকারে ম্যানসন থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

জগদীশ জেঠমালানি আমাকেও ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পবে প্রতুল বিশ্বাসকে নিয়ে তাঁরা দু'জনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

পরের দিন সকালেই প্রতুল বিশ্বাসের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল। শোক সংবাদে বলা হয়েছিল, আজ শেষ রাত্রে নিজের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতুল বিশ্বাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বিছানায় আশ্রয় নিয়ে কর্মযোগী প্রতুল বিশ্বাস অকস্মাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন। কোনো রকম চিকিৎসার আগেই তিনি অমৃতপথের যাত্রী হন।

সে রাত্রে কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে জগদীশ জেঠমালানি এবং বীবেন বিশ্বাসের সেই অহেতুক ব্যস্ততা আজও আমার কাছে এক বিচিত্র রহস্য হয়ে আছে। প্রতুল বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, না এখান থেকে সরাবার পরে তাঁর মৃত্যু হয় তাও জানবাব সুযোগ হয়নি আমার।

মর্মাহত মিসেস পপি বিশোয়াস গভীব বেদনায় মাথা নিচু করে বসে-ছিলেন। বলছিলেন, "ভীষণ খারাপ লাগছে মিস্টার শংকর। এই জেঠ-মালানি লোকটা কী? আজ একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। লোকটা

এমনভাবে মরে গেলো, তার জন্যে কোনো দুঃখ নেই। বরং বেশ খুশী। জগদীশবাবু আমাকে বললেন, থ্যাংক গড, আমাদের কোনো হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি। আমাদের 'ন্যারো এসকেপ' হয়েছে। কলগার্লের ফ্ল্যাটে প্রতুল বিশ্বাসের মতো মানুষ মরেছে এ খবর রটলে আমাদের খুব 'ট্রাবল' হতো।"

মিসেস বিশোয়াস আর কিছু বললেন না। আমার মনে হলো ওঁর চোখ দুটো ঘৃণা, বিরক্তি ও কান্নায় ভরে উঠছে।

দিন-রাত্রির দ্বিচক্র রথে মহাপরাক্রমশীল সময় কেমন উদ্ধতভাবে থ্যাকারে ম্যানসনের সমস্ত ঘটনাকে অবজ্ঞা করে মহাকালের রাজপথ ধরে অজানা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এই সোনালী রোদ, এই চড়ুই পাখির ডাক, এই শীতের আমেজ, এই অপরিচিত মানুষের অফুরন্ত প্রবাহ, এই শিশুদের অকারণ কোলাহল লক্ষ্য করে কে বলবে গত রাত্রে এই থ্যাকারে ম্যানসনে মিসেস কিরণ খোসলার ফ্ল্যাট অপরিচ্ছন্ন উত্তেজনায় ভরে উঠেছিল; রাতের অন্ধকারে জগদীশ জেঠমালানির মতো অর্থলোভী জীবরা হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, এবং জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় শায়িত এক বিখ্যাত মানুষের খ্যাতিকে অক্ষত রাখবার জন্যে তাঁর নিতান্ত আপনজনও অদ্বিধায় তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন?

হাইকোর্ট এবং হোটেলের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেও থ্যাকারে ম্যানসনের এই বিচিত্র উত্তেজনায় আমি এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। মনে মনে বিধাতা পুরুষকে আমি আর একবার বিনম্র নমস্কার জানিয়েছি। হে ঈশ্বর, আমার এই স্বল্প পরিসর জীবনে আরও কত পরীক্ষার বাকী আছে? এবার আমাকে এই অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে চলো। সদর স্ট্রীট, চৌরঙ্গী লেন, ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের এই অনভ্যস্ত জগৎ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে নেবার আশীর্বাদ দাও। আমার প্রবাসী মন আবার নদীর ওপারে কাসুন্দিয়া হাওড়ার অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলিতে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমার এই নির্বাসন যন্ত্রণা কবে শেষ হবে? আর কতদিন প্রভু? এই বিজাতীয় পরিবেশে আমি এবার ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।

প্রভাতের প্রার্থনা পরম পরিত্রাতার কানে অপেক্ষাকৃত সহজেই প্রবেশ করে এমন একটা কথা ছোটবেলা থেকেই শুনেছিলাম। কিন্তু আজ তার কোনো প্রমাণ পেলাম না। মনে হলো থ্যাকারে ম্যানসনের এই নাটক হৃদয়হীন সংসারের রঙ্গমঞ্চে যথারীতিই অভিনীত হয়ে চলেছে এবং চলবে; আমার জন্যে সেখানে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

ম্যানসন বাড়ির ছোটখাট নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলো সেরে ফেলে আমি যখন নিজের ঘরে ফিরে এলাম তখনও রাতের বিপন্ন অতিথি বিদায়গ্রহণ করেননি। মিসেস পপি বিশোয়াস তখন ঘুম থেকে উঠে আধখোলা জানালা দিয়ে পূর্ব আকাশের দিকে আপন মনে তাকিয়ে আছেন।

আমাকে দেখে মিসেস বিশোয়াস সুপ্রভাত জানালেন, "গুড মর্নিং, মিস্টার

শংকর। ভগবান আপনার খুব ভাল করুন। আপনি খু-উ-ব বড় মানুষ হোন। আপনার জন্যে আর কী প্রার্থনা করবো বলুন।'

আমি হাসলাম। কোথায় এই থ্যাকারে ম্যানসনে কোনোক্রমে বেঁচে থাকা, নিজের হাত পুড়িয়ে একবেলা রেঁধে খাওয়া, আর কোথায় এই সব বড় বড় স্বপ্ন?

মিসেস বিশোয়াস প্রশ্ন করলেন, "কী হলো? মুখ খুলছেন না কেন? স্বয়ং লক্ষ্মীকে আপনার ঘরে আসতে রিকোয়েস্ট করবো নাকি?"

আমাকে নিরুত্তর দেখে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমি জানি, লক্ষ্মীর চেয়ে সরস্বতীর দিকেই আপনার বেশী দুর্বলতা। কিন্তু মিস্টার শংকর, ওই মিসেস লক্ষ্মী ছাড়া মিস সরস্বতীর কোনো মূল্য নেই! লোকে বলে বটে, দুই বোনে খুব ঝগড়া, একই বাড়িতে দু'জনে পায়ের ধুলো দেন না। কিন্তু সেসব অনেক দিন আগেকার কথা। ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে এখন বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে দু'জনের।"

এই ভোরবেলাতেই মিসেস বিশোয়াস নিজের ঠোঁটে লাগানো সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন। বললেন, "দুশ্চিন্তায়, পুরো একটা প্যাকেটের উনিশটা সিগারেট ধ্বংস করে ফেলেছি। পোড়া সিগারেটের টুকরোয় আপনার ঘরখানার যা অবস্থা করে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না। ওই ব্যাটা সহদেবকে খবর দিয়েছি। এখনই এসে পড়ে পরিষ্কার করে দেবে।"

"সহদেব? সে তো রান্না করে।"

"রান্না করে তো কী হয়েছে? পপি বিশোয়াসের পাল্লায় পড়ে সহদেবেরা সব করে", মিসেস বিশোয়াসের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষ্য করলাম না।

মিসেস বিশোয়াস যে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আছেন সে বিষয়ে আমার মনে এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "আমি জানি, লুকিয়ে লুকিয়ে আপনি একখানা ডায়রির খাতায় কীসব লিখে রাখেন। যা-খুশি লিখুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মা লক্ষ্মীকে ব্যাগে পুরতে যেন কোনো অবহেলা না হয়।"

নিজের কথায় ফিরে এলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "মা লক্ষ্মী বোধ হয় আমাকে ডাইভোর্স করে দেবার ফন্দিতে আছেন। কেন গো মা? তোমার পপি এমন কী দোষ করলো? এই শকুন্তলা চাওলা, এই ডায়ানা বেন, এই কুসুমিকা মজুমদার সবাই কলকাতা শহরে কেমন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছে, আর যত কপাল মন্দ আমার!"

"আপনার কোনো জানাশোনা ভাল জ্যোতিষী আছে নাকি, মিস্টার শংকর!" জানতে চাইলেন মিসেস বিশোয়াস।

ওঁকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, "ওসব হাঙ্গামায় যাবেন না, মিসেস বিশোয়াস। কপালে যা লেখা আছে তা তো খণ্ডানো যাবে না।"

মিসেস বিশোয়াস এবার উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, "আমাদের তো ভেঙে পড়লে চলবেও না। আমার এখন দুশ্চিন্তা ওই মিসেস খোসলার ফ্ল্যাট সম্বন্ধে। কালকের ব্যাপার নিয়ে কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হবে কিনা বুঝতে পারছি না।"

সিগারেট শেষ করেই কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "এই জগদীশ জেঠমালানিকে মোটেই বিশ্বাস নেই। কোথায় কীভাবে আমাদের মতো লোকদের বিপদে ফেলে দেয় তার ঠিক নেই। ভাগ্যে লোকটা আমার ও-বাড়ির গোলমেলে অ্যাসিড থ্রোয়িং কেসটার কথা জানে না। ওই খবরটা পেলে হয়তো ধরেই নেবে আমি অপয়া।"

মিসেস বিশোয়াস এবার গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন। বললেন, "কী উপকারই যে করেছেন কালকে, মিস্টার শংকর। কতক্ষণ আর আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকবো? এখনই আমি নিচে ফিরে গিয়ে ঘরখানার দখল নিয়ে নেবো।"

মিসেস বিশোয়াস এবার উঠে পড়লেন। বললেন, "মিসেস কিরণ খোসলার ঘরে গত রাত্রের কথা ভাবলে আমার গা শির শির করছে। ওখানে যে কীভাবে একলা থাকবো, ভাবতে ভয় লাগছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই মিস্টার শংকর। আমাদের মতো মেয়ের ভয়ডরের কথা ভগবানও কানে তোলেন না।"

বিদায় নেবার আগে মিসেস পপি বিশোয়াস জানালেন, "আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার অনেক কথা আছে। একটু পরেই ঘরে আসতে হবে কিন্তু।"

ঘর থেকে পা বাড়িয়ে বললেন, "এখনই জোর করে ধরে নিয়ে যেতাম। কিন্তু মিস্টার জেঠমালানিকে এনি মোমেন্ট এক্সপেক্ট করছি। ওই সব লোককে মোটেই বিশ্বাস করি না। ঘর খালি দেখলে মাথায় কী সব বুদ্ধি চেপে বসবে তার ঠিক নেই। উনি এসে পড়বার আগেই আমার দখল চাই। ভাগ্যে ফ্ল্যাটের দুটো চাবি ছিল—একটা আমার এবং আর একটা মিস্টার জেঠ-মালানির।"

জগদীশ জেঠমালানির গাড়ি একটু পরেই থ্যাকারে ম্যানসনের ফয়ারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। শান্ত সৌম্য মুখশ্রী। ওই স্নিগ্ধ মুখের মালিক যে দিনের পর দিন নানা জঘন্য ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছেন তা অপরিচিত কোনো লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব।

কপালে পুজার একটি লাল সিঁদুরের টিপ আঁকা রয়েছে মিস্টার জগদীশ জেঠমালানির। গাড়ি থেকে নেমে পান চিবোতে চিবোতে তিনি ভিতরে ঢুকে গেলেন। পথে দারোয়ানের সঙ্গে তাঁর প্রসন্ন হাসির বিনিময় হলো।

একটু পরেই জগদীশ জেঠমালানি নিজের কাজ শেষ করে গাড়ি চড়ে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নিলেন। এবং তার কিছুক্ষণ পরেই সহদেব মারফত আমার ডাক পড়লো মিসেস কিরণ খোসলার অ্যাপার্টমেন্টে।

রবারের গদি আঁটা ডিভানের ওপর মিসেস পপি বিশোয়াস আধশোয়া অবস্থায় বিশ্রাম করছিলেন।

আমাকে দেখে মিসেস বিশোয়াস উঠে পড়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে মিস্টার শংকর। তাই এখনই ডেকে পাঠালাম। আপনি ব্যস্ত লোক, কোন্ কাজে হয়তো বেরিয়ে যাবেন, তাই দেরি করতে সাহস পেলাম না।"

ভি-আই-পি অতিথির শেষ সংবাদ যে মিস্টার জেঠমালানিকে বিচলিত করেনি তা দূর থেকেই আমি কিছুটা লক্ষ্য করেছি।

মিসেস বিশোয়াস এবার মুখ খুললেন। "কী লোক বাবা! খুরে খুরে নমস্কার।" নাচের মুদ্রায় নমস্কার জানিয়ে মিসেস বিশোয়াস বললেন,

"ব্যবসা বাণিজ্য যারা নাম করতে চায় তাদের উচিত মিস্টার জেঠমালানি-চরণামৃত সেবন করা।"

সবিস্ময়ে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "যে-লোকটাকে অতো আদরযত্ন করে কালকে আমার কাছে এনে দিলেন, তাকেই যেন মিস্টার জেঠমালানি ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছেন! ভদ্রলোকের কথা শুনে কে বলবে কয়েক ঘণ্টা আগে এতোবড়ো বিপদ সামলেছেন উনি?"

মিসেস বিশোয়াস দুঃখ করেছিলেন অমন অসুখের সময় মিস্টার বিশ্বাসকে এখান থেকে না-সরালেই বোধ হয় ভাল হতো।

"আপনি কী পাগল হয়েছেন, মিসেস বিশোয়াস?" মন্তব্য করেছিলেন মিস্টার জেঠমালানি। থ্যাংক গড প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপোকে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গিয়েছিলাম। না-হলে খুবই মুশকিল হতো।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "মিস্টার জেঠমালানির সমস্ত কাজকর্ম মেসিনের মতো। এখান থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে প্রতুল বিশ্বাসকে নিজের বাড়িতে চালান করে দিয়েছেন। তারপর রেডিওতে দুঃসংবাদ শোনা-মাত্রই আবার মিস্টার বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়েছেন শোক নিবেদন করতে। যেন গত রাত্রের কোনো ব্যাপারই তিনি জানেন না। রেডিওর বিশেষ ঘোষণা শুনেই ছুটতে ছুটতে চলে এসেছেন।"

মিসেস বিশোয়াসের মুখেই শুনলাম, শোক নিবেদন শেষ করেই মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি শোকযাত্রার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন প্রয়াত প্রতুল বিশ্বাসের পরিবারকে। যথাসময়ে নিউ মার্কেট থেকে ট্রাক-টায়ার সাইজের সাদা ফুলের রিদ্ পাড়িয়েছেন বাড়িতে—কিন্তু সেখানে নিজের কোম্পানির নাম লেখেননি মিস্টার জেঠমালানি। লিখেছেন ঃ জনৈক শোকার্ত বন্ধু।' যদি পরে কোনো কারণে পুলিসী হাঙ্গামা হয়, সেই জন্যেই এই বিশেষ সাবধানতা।

শোকযাত্রা শুরু হবার পরেই মিস্টার জেঠমালানি টুক করে একবার মহাশ্মশান ঘুরে এসেছেন। এবং সেখান থেকে সোজা ফিরে এসেছেন পপি বিশোয়াসের সাময়িক আশ্রয়ে।

শোকের কোনোরকম লক্ষণ নেই জগদীশ জেঠমালানির মুখে। বরং পপিকে তিনি বলেছেন, "ঠাকুরের কাছে তিনি স্পেশাল পুজোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মিসেস খোসলার এই অ্যাপার্টমেণ্টে ডাক্তার বদ্যি এলে এবং 'অফিসিয়াল ডেথ' হলে তাঁর এবং পপির হাঙ্গামার শেষ থাকতো না!"

জগদীশ জেঠমালানি এরপর অবশ্য প্রতুল বিশ্বাস সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, এই অকাল মৃত্যুতে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তবে সে-ক্ষতি সম্পূর্ণ আর্থিক। জেঠমালানিজী বলেছেন, মাসের পর মাস কার-খানার শ্রমিক গোলমাল সমাধানের জন্যে তিনি প্রতুল বিশ্বাসের পিছনে বহু অর্থ ঢেলে যাচ্ছিলেন। অনেকদিন ধরে তিনি টাকা হজম করেছেন অথচ কোনো উপকার করেননি। সম্প্রতি কারখানার কিছু শ্রমিক ছাঁটায়ের ব্যাপারে বিশ্বাসজীর কাছ থেকে গোপন প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বলে-ছিলেন, আমাকে একসঙ্গে ফিফটিন থাউজেণ্ড রুপিজ দিলে জেঠমালানির কোনো চিন্তাই থাকবে না। তিনি অর্ধেক শ্রমিককে চাকরি থেকে বিতাড়িত করলেও কারখানায় কোনো গুরুতর হাঙ্গামা হবে না। গেটের সামনে মিটিং করেই এবং গরম গরম কিছু বক্তৃতা করেই প্রতুল বিশ্বাস হাত গুটিয়ে

নেবেন ; বাড়তি কোনো হাঙ্গামা বাধাবেন না।

জগদীশ জেঠমালানির এখনকার দুঃখ, তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবার পথে আচমকা বাধা পড়লো। আগামী কাল থেকে লোক ছাঁটাইয়ের যে গোপন পরিকল্পনা ছিল তা ভেস্তে গেলো, অথচ মরবার আগে বিশ্বাস মশাই পুরো পনেরো হাজার টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে পকেটস্থ করেছেন।

জগদীশ জেঠমালানি এই ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়েছেন। পপি বিশোয়াসকে তিনি বলেছেন, "ভবিষ্যতে তিনি কখনও কাজ হাঁসিল না-হওয়া পর্যন্ত পুরো টাকা হাতছাড়া করবেন না।"

পপি বিশোয়াস এবার নিজেই হাতজোড় করলেন। বললেন, "ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু জেঠমালানি তোমাকে নমস্কার। লোকটা পয়সা চিনেছে বটে! জলজ্যান্ত একটা লোক এইভাবে চোখের সামনে চলে গেল সে সম্বন্ধে কোন দুঃখু নেই—কেবল টাকার হিসেব করছে মিস্টার জেঠমালানি।"

জেঠমালানিরা যে এমন হবেন সে সম্বন্ধে আমার কোনো বিস্ময় নেই। এঁরা এমন না-হলেই আমাদের চিন্তার কারণ। থ্যাকারে ম্যানসনের কাজে যোগ দেওয়া পর্যন্ত এই লোকটি সম্বন্ধে কম কথা তো শুনলাম না। কিন্তু আমার চিন্তা প্রতুল বিশ্বাসকে নিয়ে। এই শ্রদ্ধেয় জননেতা সম্বন্ধে আমার মনে অনেক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। এই সব নেতাদের হাতে দেশের অসহায় মানুষদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে ভাবলে অজানা আশঙ্কায় গা শিউরে ওঠে।

মিসেস পপি বিশোয়াস হয়তো আমার মনের কথা আন্দাজ করতে পারছেন। কিন্তু তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। বললেন, "সব বুঝি—লোকটা ভাল নয়, জেঠমালানির কাছে রেগুলার টাকা খেয়েছে। কিন্তু তবু আমার মনের ভিতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। আহা, জলজ্যান্ত লোকটা ওইভাবে আমার ফ্ল্যাটে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লো অথচ আমি কিছু করতে পারলাম না।"

মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠেছে। তিনি এবার দুঃখ করে বললেন, "আহা, বুকের অমন যন্ত্রণা দেখেও আমি ডাক্তার ডাকতে সাহস পেলাম না। কী কুক্ষণে আমি ভয় পেয়ে মিস্টার জেঠ-মালানি এবং প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপোকে প্রথমে ফোন করতে গেলাম। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে কোনো ডাক্তারকেই আগে ডাকলে ভাল হতো।" ভাইপো এবং জগদীশ জেঠমালানি যে থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটে বাইরের ডাক্তার ডাকতে আগ্রহ দেখাবেন না এবং প্রতুল বিশ্বাসের গোপন অধঃ-পতনের খবরটা চাপা দেবার জন্যেই তৎপর হয়ে উঠবেন তা মিসেস পপি বিশোয়াস এখনও মেনে নিতে পারছেন না।

"যাকগে। কত পাপই তো এই জন্মে একের পর এক করে চলেছি। এ আমার বোঝার ওপর শাকের আঁটি", নিজের পাপবোধ ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে-জন্যে আপনাকে এই অসময়ে বিরক্ত করা। প্রতুল বিশ্বাস সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এখনও ওঁদের কাটেনি। মিস্টার জেঠমালানি এখনও ভয়ে ভয়ে রয়েছেন যদি কোনোরকম ঘটনা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে খুব মুশকিল হবে। উনি তাই আপনাকে স্পেশাল রিকোয়েসট করতে বলেছেন। হাজারখানেক টাকা বাগিয়ে নেবার ইচ্ছে থাকলেও বলবেন, কোনো অসুবিধে হবে না।"

টাকার কথায় আমার গা রি-রি করে উঠলো। জেঠমালানির কথা ভাববার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই আমার। কিন্তু এ ব্যাপারে বেচারা পাপি বিশোয়াসের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে অনেকখানি। এখন নতুন কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়লে তাঁর স্বার্থ যে বিপন্ন হবে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার ঘরের রেডিওটা খোলাই ছিল। কিছুদিন আগে কয়েকটা মৃত রেডিওর ভগ্নাবশেষ থেকে তেলকালিবাবু এই নতুন রেডিওটির পুনর্জীবন ঘটিয়েছেন এবং যন্ত্রটির গুণাগুণ নির্ধারণের জন্যে আমার ঘরে ওটি রেখে দিয়েছেন।

রেডিওতে একটি ভাবগম্ভীর কথিকা পঠিত হলো। সদ্য প্রয়াত সমাজ-সেবী শ্রীপ্রতুল বিশ্বাসের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করলেন শ্রীগণেশ বাগচী। প্রতুল বিশ্বাসের দেশপ্রেম ও ত্যাগ এবং বহুমুখী প্রতিভার নানা দিক সম্বন্ধে প্রতুল বিশ্বাসের আবাল্য সুহৃদ শ্রীগণেশ বাগচী নানা মন্তব্য করলেন।

তেলকালিবাবু যে কখন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন তা আমার খেয়াল হয়নি। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে প্রতুল বিশ্বাসের নামোল্লেখেও আমি এই মুহূর্তে অস্বস্তি বোধ করছি।

"কেমন শুনলেন স্যর!" তেলকালিবাবুর প্রশ্নে আমার অস্বস্তি দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ালো। কী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছেন তেলকালিবাবু?

তেলকালিবাবুর পরবর্তী মন্তব্য আমাকে কিছুটা শান্ত করলো। "এই রেডিওটার কথা জিজ্ঞেস করছি। ফিলিপ্‌সের গলা, মারফির ধড় এবং জি ই সির ব্রেন দিয়ে স্পেশালি তৈরি করেছি ওকে।"

আমার অস্বস্তি এখনও পুরোপুরি বিদায় হয়নি। তাই তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম।

তেলকালিবাবু নিজের মনেই বললেন, "যন্তরটার খোঁজ করতেই আস-ছিলাম। কিন্তু ওই প্রতুল বিশ্বাসের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালাম।"

এবার আমারও থমকে দাঁড়ানোর পালা। তেলকালিবাবুর কথাবার্তা এবার কোনদিকে যাবে?

তেলকালিবাবু বললেন, "আহা, মস্ত বড়লোক ছিলেন এই প্রতুল বিশ্বাস। এই পোড়া দেশে বড় বড় লোক আর থাকবেন না, স্যর। ঠিক যেন মড়ক লেগেছে, আমাদের অনাথ করে গণ্যমান্য মানুষরা—একের পর এক চোখ বুজছেন।"

আমাকে আচমকা ফাঁদে ফেলবার জন্যে তেলকালিবাবু এই সব কথা বলছেন না তো?

ওঁর পরবর্তী কথায় আমার সন্দেহ মোচন হলো। তেলকালিবাবু বললেন, "আহা, প্রতুল বিশ্বাস যে এতো বড়ো মানুষ ছিলেন তা আমি জানতাম না। রেডিওতে শ্রদ্ধাঞ্জলি শুনে আমার চোখে জল এসে গেছে। এসব ক্ষতি কী আর কোনোদিন পূর্ণ হবে?"

আমি এখনও মুখ বুজে বসে আছি। রেডিওটা এবার আমি তেলকালি-বাবুর কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই।

"না স্যার, রেডিও ফিরিয়ে নেবার জন্যে আমি আসিনি। আমি এসেছি অন্য কাজে।"

তেলকালিবাবু এবার আমার তক্তপোশের এক কোণে বসে পড়লেন।

গলার স্বর নামিয়ে বললেন, "একটা উড়ো খবর পেয়েই আপনার কাছে চলে এলাম।"

সামান্য কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন তেলকালিবাবু। "সমস্ত দিন তো এক ফ্ল্যাট থেকে আর এক ফ্ল্যাটে টোটো করে ঘুরে বেড়াই। হাজার রকম খবর আসে এই তেলকালির কানে। কোনো কথারই বিশেষ গুরুত্ব দিই না। কিন্তু আজকে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলাম না। মনে হলো আপনার সঙ্গে একটু আলোচনায় বসা দরকার।"

আমি এবার সোজা হয়ে বসলাম। তেলকালিবাবু বললেন, "কথাটা অবশ্যই আপনার স্বার্থে। না-হলে আমি এ-ব্যাপারে এতো মাথা ঘামাতাম না।"

বিশেষ আগ্রহ নিয়েই আমি এবার তেলকালিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঘরে আমি ও তেলকালিবাবু ছাড়া কেই নেই। তবু তক্তপোশের ওপর বসে অভিজ্ঞ তেলকালিবাবু সন্ধানী দৃষ্টির ফ্লাড লাইটখানা চারদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তৃতীয় ব্যক্তির অদৃশ্য উপস্থিতি এই মুহূর্তে তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে রাজী নন।

তেলকালিবাবু তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। চাপাগলায় বললেন, "এ-জায়গা আর ভাল লাগে না, স্যর। বাপের দেওয়া গলায় প্রাণ-খুলে কথা বলবেন সে-উপায়ও রইলো না আর। আগে কিন্তু কখনও এমন ছিল না। তখন এই বাড়িতে বসে আমরা যার সম্বন্ধে যা-ইচ্ছে আলোচনা করতে পারতাম—কেউ ওসব ব্যাপারে নাক গলাতে আসতো না। কিন্তু দিনে দিনে কী হাল হলো এখানকার!"

তেলকালিবাবুর প্রতি সহানুভূতি জানিয়েই আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁকে অনুরোধ করলাম কী খবর শুনেছেন তা জানাতে।

তেলকালিবাবু বেশ দুঃখের সঙ্গেই বললেন, "কী জানি, স্যর। কী যে হলো এই বাড়ির। দিনে দিনে আরও কত কী দেখবো, কে জানে।"

"আপনি স্যর এবার থেকে কঠোর হস্তে শাসনভার গ্রহণ করুন", উপদেশ দিলেন তেলকালিবাবু।

"কঠোর হবার প্রয়োজন কী হলো, তা তো জানা দরকার", আমি এবার নিজের পক্ষে তেলকালিবাবুর কাছে সওয়াল করি।

তেলকালিবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর বললেন, "বাড়ি-ওয়ালা ভাড়াটে এরা এই ম্যানসন বাড়িতে নিজের খেয়ালখুশীমতো ভোগ দখল করবে তার মানে বুঝি। কিন্তু যারা কেউ নয়, এ-বাড়ির সঙ্গে খাতায়-কলমে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই তারা যখন মাথায় চেপে বসে, মেজাজে লাঠি ঘুরিয়ে বেড়ায় তখনই ভয় হয় এই বুঝি অরাজকতা শুরু হলো।"

তেলকালিবাবু আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকালেন এবং আন্দাজ করলেন যে আমি ওঁর অভিযোগের খেই ধরতে সফল হইনি।

"এখনও বুঝতে পারছেন না? কত আর খুলে বলবো, কত আর ব্যাখ্যা শোনাবো। ভেবেছিলাম ইশারাতেই কাজ ফতে হয়ে যাবে, আমাকে আর সোজাসুজি জড়িয়ে পড়তে হবে না ব্যাপারটায়।" তেলকালিবাবু নিজেও যে এই ব্যাপারে খুব নিরাপদ বোধ করছেন না, তা এবার আমার কাছে দিনের অলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

"যাক। সব কথা আমাকে বলতে গিয়ে শুধু শুধু কেন নিজের বিপদ ডেকে আনবেন?" আমি তেলকালিবাবুকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করি। মনে পড়লো আমি সত্যিই অভাগা। এতই অভাগা যে আমাকে সাহায্য করতে এসেও এ-সংসারে অনেকে বিপদে পড়ে গিয়েছে।

আমার কথা শুনে তেলকালিবাবু নরম হয়ে পড়লেন। বললেন, "নিজের বিপদের ভয় আর করি না, স্যার। বিপদ আর নতুন করে এই তেলকালি বিশ্বাসের কী ক্ষতি করবে?"

তেলকালিবাবু যে নিজের বিপদকে তোয়াক্কা করেন না, এবং আমাকে এই ম্যানসন বাড়ির সমস্ত দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করবার জন্যে সদাসতর্ক থাকেন তা আমার অজানা নয়। যে-সামান্য কয়েকজন মানুষের উপস্থিতিতে আমার কর্মজীবনের এই অধ্যায় এখনও অসহনীয় হয়ে ওঠেনি তেলকালি-বাবু যে তাঁদের অন্যতম তা এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিস্মৃত হইনি।

তেলকালিবাবু চিন্তিত মুখে জানালেন, "আমি ওই জেঠমালানিদের কথা ভাবছি। এদের কিছুই এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না।"

জেঠমালানি প্রসঙ্গ উঠতেই আমি নিজেও একটু সতর্ক হয়ে পড়লাম। তেলকালিবাবু বললেন, "চৌত্রিশ নম্বর ঘরে যখন ওঁদের রাজত্ব ছিল তখন-কার কথা আলাদা। তখন ওঁরা এখানে অনেক কিছুই করেছেন। কিন্তু ওইখান থেকে বিদায় নেবার পরে আমি ভেবেছিলাম ওঁদের পর্ব শেষ হলো।"

একটু থামলেন তেলকালিবাবু। তারপর নিজের বিরক্তি ও আশঙ্কা চাপা দেবার কোনো চেষ্টা না-করেই বললেন, "কিন্তু বড়লোক বিজনেসম্যানদের পর্ব শেষ হয়েও হতে চায় না।"

আমি কোনো মন্তব্য করতে এই মুহূর্তে আগ্রহী নই। তেলকালিবাবুর কানে কোন খবর কতটা গিয়েছে তা জানবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠেছি।

তেলকালিবাবু বললেন, "কী যে ব্যাপার, ভগবান জানেন। আমি শুনছিলাম, মিস্টার জেঠমালানি নাকি এখনও লুকিয়ে-লুকিয়ে এখানে যাতায়াত করছেন! মাথায় আবার কী মতলব আছে, ভগবান জানেন।"

এবার একটু থতমত খেলেন তেলকালিবাবু। তারপর গম্ভীরভাবে নিবেদন করলেন, "কী জানি মশাই! গত রাত্রে মিস্টার জেঠমালানির গাড়ি এ-বাড়ির কমপাউন্ডে দাঁড়িয়েছিল। তারপর হঠাৎ একখানা মিটার ট্যাক্সি এলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাউকে যেন ধরাধরি করে ওই ট্যাক্সিতে চড়িয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। ঠিক যেন ডিটেকটিভ গল্পের মতো! টাকার জন্যে এরা পারে না এমন কাজ নেই। কাকে এখান থেকে এইভাবে অজ্ঞান করে নিয়ে অদৃশ্য হলো কে জানে? ভেবে-ভেবে আমার মাথা ধরেছে—দু'বার অ্যানাসিনের বড়ি খেয়েও মাথাধরা ছাড়লো না।"

তেলকালিবাবু বললেন, "আমার এখন সন্দেহ হয় একখানা ফ্ল্যাটের ওপর। ওই যে মিসেস কিরণ খোসলার অ্যাপার্টমেন্ট। কত সাধ-আহ্লাদ করে স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘরসংসার করবার জন্যে ভদ্রমহিলা ওই ফ্ল্যাটখানা

নিজের হাতে সাজিয়েছিলেন। সেসব স্বপ্ন কোথায় ভেসে গেল—এখন সেই ফ্ল্যাটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়েছে, কিংবা হবে!”

“আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যর। ওই ফ্ল্যাটের দিকে নজর দেবেন একটু। আমার তো ভয় হচ্ছে, মিস্টার জেঠমালানি ওখানেই আবার শিকড় গাড়বার ব্যবস্থা করছেন।” তেলকালিবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হুড়-হুড় করে কথাগুলো বলে গেলেন।

রাত্রের রহস্যজনক দৃশ্য সম্বন্ধে তেলকালিবাবু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই বললেন, “আমি স্যর, ঘড়ির গোলমালে দেড়ঘণ্টা আগেই মর্নিংওয়াকের জন্যে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমি নিজের চোখে জগদীশ জেঠমালানির চকচকে অ্যামবাসাডর গাড়িখানা দেখলাম। ট্যাক্সিটাকে এগিয়ে দিয়ে গাড়িটা যখন ডেনজারাস স্পিডে আমার চোখের সামনে দিয়ে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তখন আপনার গুণধর দারোয়ানগুলো গাঁজা খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।”

তেলকালিবাবু অভিযোগ করলেন, “এদের কথা বলবেন না, স্যর। এদের নাকডাকানোর আওয়াজে ভয় পেয়ে যদি চোরডাকাত এখানে না আসে! কিন্তু তাছাড়া অন্য কোন প্রোটেকশন নেই। কোনদিন যদি শুনি রাত্রে কেউ এ-বাড়ির অর্ধেকখানা ভেঙে ইটগুলো সরিয়ে নিয়েছে অথচ দারোয়ানরা জানতে পারেনি, তা হলেও আশ্চর্য হবো না!”

ভোর হবার অনেক আগে উঠে পড়ে মর্নিংওয়াকে যাবার পথে যে রহস্যজনক দৃশ্য তেলকালিবাবুর নজরে পড়েছে তা ভদ্রলোক কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

তেলকালিবাবু বললেন, “মর্নিংওয়াকটা একেবারে মাঠে মারা গেলো স্যার। কোথায় একটু উচ্চ চিন্তা করবো, পিওর এয়ারের সঙ্গে হাই থট মনের মধ্যে ঢুকিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলবো, তা না শুধুই ওই ট্যাক্সির ভিতরে চ্যাংদোলা করে মানুষ পুরবার দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম। বাড়িতে ফিরে এসেও শান্তি পাচ্ছি না—ভাবতে-ভাবতে দু'খানা ইলেকট্রিক ফ্যানের বিয়ারিং-এ ডবল তেল ফেলে দিয়েছি। শুধু চিন্তা—থ্যাকারে ম্যানসন থেকে কে ওইভাবে চ্যাংদোলা অবস্থায় চলে গেলেন, অথচ তেলকালি বিশ্বাস তাঁকে চিনতে পারলো না?”

খেয়ালী তেলকালিবাবু এবার নিজের পা নাড়াতে শুরু করলেন। আমার নড়বড়ে তক্তপোশখানা সেই সঙ্গে কাতর ক্রন্দন শুরু করেছে, কিন্তু তেলকালিবাবুর সেদিকে খেয়াল নেই।

মাথা চুলকে তেলকালিবাবু বললেন, “সমস্যাটা সমাধান করে রাখা ভাল, স্যার। কোনদিন হয়তো আরও জ্যান্ত মানুষ এই ম্যানসন থেকে চুরি হয়ে যাবে।”

আমি এবার রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তেলকালিবাবু বললেন, “আই অ্যাম গ্ল্যাড যে আপনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এত বড় বাড়ি থেকে চ্যাংদোলা করে কাউকে নিয়ে চলে গেল অথচ আপনি কিছু জানতে পারলেন না এটা মোটেই ভাল কথা নয়।”

তেলকালিবাবু বললেন, “আপনাকে বলতে বাধা নেই, ওই যে মিসেস পাপি বিশোয়াস—বুড়োবয়সে কচি খুকী সেজে লোকের মাথা খাচ্ছেন! ওঁর

সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে দেখা হয়ে গেলো। মিসেস খোসলার ফ্ল্যাটে দু'খানা পাখা সারানোর দাম বাকি ছিল, তার জন্যে তাগাদা দিতে গিয়ে দেখি মিসেস খোসলা উধাও এবং তার জায়গায় মিসেস পপি বিশোয়াস বসে আছেন। কিছু মনে করবেন না স্যর! গেরস্ত ফ্ল্যাটে মিসেস পপি বিশোয়াসকে সশরীরে দেখলেই মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে। উনি কিন্তু হেসে-হেসে আমাকে বললেন মিসেস খোসলা কদিন আর্জেন্ট কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছেন। ওঁর ফ্ল্যাটটা কদিন দেখাশোনা করতেই উনি নিজের কাজকর্ম ছেড়ে এখানে এসেছেন। মিসেস বিশোয়াস আরও বললেন, 'আপনি জানেন না? মিসেস কিরণ খোসলা আমার অনেকদিনের বন্ধু—আমার ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড।"

মুখ বেঁকালেন তেলকালিবাবু। "বিশ্বাস হতে চায় না—তবু মেনে নিতে হলো। এ-সংসারে কে কখন কার ক্লোজ ফ্রেন্ড হয় তা ঈশ্বরই জানেন!"

তেলকালিবাবু বললেন, "আমার অবশ্য কমপ্লেন করা মানায় না। মিসেস খোসলার কাছে যে-টাকা মাসের পর মাস আটকে ছিল তা এককথায় শোধ করে দিতে রাজী হলেন মিসেস বিশোয়াস। ঘণ্টাখানেক পরে আমাকে আসতে বলেছিলেন। তখনও আমার মাথার মধ্যে ওই মিস্টার জেঠমালানির গাড়ি এবং ট্যাক্সির কথাটা ঘুরছে। আমি আর পারলাম না। টাকা নিতে গিয়ে মিসেস বিশোয়াসের কাছে কথাটা তুললাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না।"

"মিসেস বিশোয়াস তো আকাশ থেকে পড়লেন। কে মিস্টার জেঠমালানি? কবে তিনি এখানে এসেছিলেন? ওমা! তাই নাকি? ভদ্রমহিলা বেমালুম ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন। উলটে চাপ দিলেন—ওসব কথা আমাকে ওইভাবে বলবেন না, তেলকালিবাবু। শুনলে আমার ভীষণ ভয় করে। একা একা ফ্ল্যাটে থাকতে হয় আমাকে।"

তেলকালিবাবু এবার গম্ভীরভাবে বললেন, "তবু আপনাকে চুপি চুপি বলছি, একটু নজর রাখবেন স্যর। এবাড়িতে কিছু হলে আপনার ঘাড়েও কিছুটা দোষ চাপবে। একেবারে সমস্ত দায়িত্বটা উড়িয়ে দিতে পারবেন না।"

আমাকে বেশ চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়ে তেলকালিবাবু এবার নিজের কাজে ফিরে গেলেন। রাতের অন্ধকারে যে কাজ নিঃশব্দে ঘটে গিয়েছে বলে আন্দাজ করা গিয়েছিল, তাও মানুষের নজর এড়ায়নি। এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই তবু একজন নীরব দর্শক হিসেবে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছি। বিশেষ করে জগদীশ জেঠমালানির মতো মানুষদের সম্বন্ধে একটু বেশী পরিমাণে সতর্ক হওয়াই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।

মিসেস পপি বিশোয়াস আমাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা আমার নেই। ভদ্রমহিলা এতোদিন দূরে ছিলেন তাই ভাল ছিল। এতো কাছে এসে পড়ে তিনি ক্রমশ আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

তেলকালিবাবু বিদায় নিলেও আমি বেশ কিছুক্ষণের জন্য শান্তি পেলাম না। বিনা নোটিশে ঘরের মধ্যে যিনি সশরীরে আবির্ভূত হলেন তিনি স্বয়ং শ্রীমান মদনা।

মদনা আমাকে একটা স্পেশাল স্টাইলে সেলাম ঠুকলো। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো হিন্দী সিনেমা থেকে এই সেলামের স্টাইলটি যে সে রপ্ত করেছে তাও মদনা আমাকে প্রথম সুযোগেই জানিয়ে দিলো।

মদনার জামাকাপড়ের স্টাইল আরও উন্নত হয়েছে। একগাল হেসে মদনা

এক বিখ্যাত চিত্রতারকার নাম করে বললো, "আপনাকে বলতে আপত্তি নেই স্যার! আমাদের ওখানে দু'দিন চুপি চুপি এসেছিলেন। মিসেস চাওলা স্পেশাল খাতির করলেন। আমাকে বললেন, মদনা, তোমার ওপর দায়িত্ব রইলো। ওঁর যেন কোনোরকম ডিসটার্বেন্স না হয়।"

মোহিত মদনা আমাকে সবিস্ময়ে শোনালো, "আমি তো স্যার, শ্যামলকুমারকে নিজের চোখে দেখে বিশ্বাসই করতে পারি নি। ওঁর কত ছবির টিকিট আমি দুগুণ আড়াইগুণ দামে ব্ল্যাকে ঝেড়েছি। এখন সেই লোকেই আমার তদারকীতে এসেছেন ভাবতে গিয়ে গা শির-শির করে উঠলো, স্যার।"

চিত্রতারকার বুশশার্টখানা মদনা সন্ধানী চোখে দেখে নিয়েছিল। ঠিক ওই রঙ ও ওই ছাঁটে একখানা জামা বানাবার প্ল্যান করে ফেলেছিল মদনা। কিন্তু অচিরেই এই চিত্রতারকার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে মদনা। "না স্যার, এঁরা যেন কেমন," মনের দুঃখ মদনা প্রকাশ করে ফেললো।

"সিনেমাতে এতো ভালো, কিন্তু আমাদের এই সিলভার ড্রাগনে এসে যেন কেমন হয়ে যান।"

"কী হলো তোমার?" মদনাকে প্রশ্ন করি আমি।

ফিসফিস করে মদনা বললো, "সঙ্গে, স্যার, বউকে আনেন না। 'ম্যাগাজিনে' আমি স্যার শ্যামলকুমারের বউয়ের ছবি দেখেছি। এখানে স্যার ওঁর সঙ্গে অন্য মেমসায়েবরা আসেন—মিটার ডাউন মেমসায়েব।"

"মিটার ডাউন ব্যাপারটা কী মদনা?"

ব্যবহারিক বাংলাভাষায় আমার জ্ঞানের অভাব মদনাকে বেশ বিরক্ত করে। মাথা চুলকে সে উত্তর দিলো, "মানে কপালফাটা মেমসায়েব, স্যার।"

কপালফাটা বলতে আমি দুর্ভাগিনী আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। মদনা সঙ্গে সঙ্গে আমার ভুল সংশোধন করে বললো, "না স্যার, কপালফাটা মানে অভাগিনী নয়—অভাগিনীরা কখনও ফিল্মিস্টারের সঙ্গে অ্যাকটো করার জন্যে মদনার কাছে আসতে পারে? কপালফাটা মানে যে দিদিমণির বিয়ে হয়ে গিয়েছে,—কপালে সিঁদুরের গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে।"

মুখ বেঁকিয়ে মদনা বললো, "আমি স্যার ওঁদের কান্ডকারখানা দেখে শেষ পর্যন্ত আর ওই স্টাইলে বুশশার্ট বানালাম না। আমার স্যার মনটা খেঁচড়ে গিয়েছে!"

"মিসেস চাওলার বিজনেস কেমন চলছে, মদনা?" আমি জানতে চাই।

বিজনেসের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না মদনা। "মস্ত বড় বড় লোকেরা পায়ের ধুলো দেন এখানে", এবং সেইটাই মদনার গর্ব।

"আর কত রকমের দিদিমণির সঙ্গে যে চাওলা মেমসায়েবের জানাশোনা আছে। তাঁরা ঘোমটা দিয়ে বোরখা পরে একলা একলা এই সিলভার ড্রাগনের দোতলার স্পেশাল রুমে চুপি চুপি চলে আসেন। কারুর সঙ্গে কারুর কোনো মিল নেই স্যার," মদনা নিবেদন করলো। "কেউ আমনী, কেউ গামলা, কেউ ডবল ডেকার, কেউ খাববা-ডাববা"। ভারতীয় রমণীকুলের বর্ণনায় এমন টেকনিক্যাল ভাষার প্রয়োগ আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না।

মদনা বললো, "চাওলা মেমসায়েবের এখন একটাই দুঃখ। কিন্তু সেখানে আপনি তো কান দিচ্ছেন না।"

"না স্যার, থুড়ি। চাওলা মেমসায়েবের আর একটা দুঃখু আছে সেটা ওঁর মেয়ে। মেয়েই তো ওঁর 'ভবিষসত' কিন্তু কী জানি ছোট দিদিমণি আজ-

-কাল যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকেন।"

মদনা এবার কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, "আপনার জন্যেও বড় মেম-সায়েবের কম দুঃখ নয়।"

"কেন? আমি আবার কী করলাম?" এই ধরনের মন্তব্য আমার অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

মদনা মাথা চুলকোতে লাগলো। তারপর নিবেদন করলো, "বলবো স্যর?"

"অবশ্যই বলবে, মদনা। কেন বলবে না?" আমি এই মুহূর্তে একটু একলা থাকতে চাইলেও মদনার অভিযোগটা জেনে রাখা প্রয়োজন।

মদনা বললো, "চাওলা মেমসায়েবের বাড়তি ঘরের খুব প্রয়োজন। অথচ আপনি অন্য লোককে ঘর দিয়ে দিলেন।"

"ঘর? আমি আবার কাকে ঘর দিলাম?" আমার এবার আকাশ থেকে পড়বার মতো অবস্থা।

"কেন? মিসেস খোসলার ফ্ল্যাটখানা? বড় মেমসায়েবের ধারণা, আপনিই ভিতরে ভিতরে কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। না হলে নতুন ওই মেমসায়েব ওখানে এসে উঠলেন কী করে?"

মদনার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। ব্যাপারটা মিসেস চাওলার কল্পনাপ্রসূত না জেঠমালানি নিজেই এই ধরনের কথা ছড়িয়েছেন, কে জানে?

"এবার স্যর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা! একদিকে চাওলা মেম-সায়েব আর অন্য সাইডে ওই বিশোয়াস মেমসায়েব। দু পার্টিই জাঁদরেল, স্যর। খেলা খুব জমে উঠবে স্যর। আপনি দেখে নেবেন।"

এই রকম কোনো সম্ভাবনার কথা কখনও আমার মাথায় প্রবেশ করেনি। মদনার ভবিষ্যদ্বাণীতে তাই আমার চিন্তা বাড়তে শুরু করলো।

মদনা এবার আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। চুপি চুপি বললো, "কালকে কিছু একটা সিরিয়াস ব্যাপার হয়েছে স্যর।"

"কী ব্যাপার, মদনা?"

মদনা উত্তর দিলো, "গভীর রাত্রে কোনো পার্টিকে বোধ হয় ওই মিসেস বিশোয়াসের ফ্ল্যাট থেকে জোর করে বার করে দিতে হয়েছে। নিশ্চয় মালের ঝোঁকে আনসান কিছু করেছিল।"

মদনা জানালো ব্যাপারটা সে পুরো জানে না। চাওলা মেমসায়েব চুপি চুপি ওঁর জামাইয়ের সঙ্গে কী সব কথা বলছিলেন। মদনাকে দেখে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে মদনাকে আজ ডিউটি থেকে ছেড়ে দিয়েছেন, ওই বিশোয়াস মেমসায়েব সম্বন্ধে খবরাখবর করতে।

মদনা এবার বললো, "আপনি কিছু ভাববেন না, স্যর। আপনি যে মিসেস খোসলার ফ্ল্যাট কাউকে ব্যবস্থা করে দেননি তা আমি বুঝতে পারছি। চাওলা মেমসায়েবের কানে খাঁটি খবরটা আমি তুলে দেবো।"

মদনা চলে যাবার পরেও আমার শান্তি মেলেনি। আপিস ঘরে গিয়ে আরও কিছু পুরনো কাজ সেরে ফেলবার চেষ্টা করলাম। প্রতিদিনের এই বিরক্তিকর কাজের গ্লানি আমাকে ক্রমশ দুর্বল ও নিরুৎসাহ করে তুলছে। থ্যাকারে ম্যানসনের দূষিত পরিবেশে সহজভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেও যেন বাধা ঘটছে আমার।

খাতাপত্র সরিয়ে রেখে এই বাড়ি থেকে দূরে সরে গিয়ে গড়ের মাঠে মুক্ত বায়ু প্রাণভরে গ্রহণ করে মনকে শান্ত করবো ভাবছিলাম।

কিন্তু সেখানেও বাধা পড়লো। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন থানার সাব-ইনসপেকটর গণেশ সরকার। গণেশ সরকারের অঙ্গে পুরো পুলিসী ইউনিফর্ম নেই। খাকি প্যান্টের ওপর একটা ক্রিম রঙের বুশ শার্ট চড়িয়ে নিয়েছেন মিস্টার সরকার।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পুলিসের সাবইনস্পেক্টর গণেশ সরকারকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হলো।

একগাল হেসে গণেশ সরকার অভিযোগ করলেন "অনেকদিন কোনো খবরাখবর নেই। কী ব্যাপার?"

কী ভাবে কী উত্তর দেবো মনে মনে ঠিক করছিলাম কিছু বলবার আগে গণেশ সরকার নিজেই উত্তর দিলেন, "অবশ্য আমাদের জন্যে কোনো খবরা-খবর না-থাকাটাই মঙ্গলজনক। স্রেফ 'আপনি কেমন আছেন? আমরা ভাল আছি', জানাবার জন্যে পৃথিবীর কেউ পুলিসের থানায় যায় না।"

"তা হলে আপনাদের কাছে মানুষ যায় কী জন্যে?" গণেশ সরকার মানুষটি খুব ভাল, তাই প্রশ্নটির উত্তর জানবার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলাম না।

গণেশ সরকার উত্তর দিলেনঃ "এ-লাইনে তো কম দিন হলো না। মাথায় টাক পড়বার সময় হয়ে এলো। এই এইট্টিন ইয়ার্সের অভিজ্ঞতায় দেখলাম, মানুষ থানায় যায় কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। অভিযোগ না-থাকলে কোন্ দুঃখে আপনি থানায় যাবেন বলুন?"

গণেশ সরকার এবার গণপতিবাবুর কথাও তুললেন। বললেন, "আপনার মতো উনিও তো ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলেন। একদিন হঠাৎ ফোন করে-ছিলেন। কী একটা মেয়ে ফুসলনো কেসের ব্যাপারে ভদ্রলোক খুবই ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, আপনার কাছে যাবার জরুরি দরকার হতে পারে। আমি রসিকতা করলাম, বিষয়সম্পত্তির মামলা-মকদ্দমা ছেড়ে শেষে কি প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ শুরু করেছেন আপনি?"

আমি পমার প্রসঙ্গ স্মরণ করে গণেশ সরকারের মুখের দিকে তাকালাম। গণেশ সরকার মৃদু হেসে বললেন, "খুবই মাথাওয়ালা লোক আমাদেব এই গণপতিবাবু। যে কোনো কঠিন প্রশ্নের উত্তর মা সরস্বতীর আশীর্বাদে ওঁর জিভ থেকে স্প্রিং-এর মতো ছিটকে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে আসে!"

এবার গণেশ সরকার জানালেনঃ "গণপতিবাবুর চটপট উত্তরটা শুনে রাখুন। মনে রাখবার মতো স্টেটমেণ্ট! গণপতিবাবু টেলিফোনেই বললেন,

এদেশে মেয়েমানুষও তো বিষয়সম্পত্তি। সুতরাং লাইন পাল্টাবার কথা তুলছেন কেন?' "

গণেশ সরকার বললেন, "গণপতিবাবু শেষ পর্যন্ত এলেন না। অবশ্য না এসে ভালই করেছেন। আমি তো সবাইকে বলি মেয়েমানুষের ব্যাপার থানা পুলিসের বাইরে মিটমাট করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

গণেশ সরকারের জন্যে গরম চা আনাবার ব্যবস্থা করলাম। খবর পেয়ে চায়ের স্টলের মালিক স্বয়ং থানার দারোগাবাবুকে স্পেশাল আপ্যায়নের জন্যে ছুটে এলেন। অর্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও স্পেশাল চায়ের সঙ্গে বিস্কুট এবং টিফিন কেক হাজির হয়ে গেল। চায়ের কাপ যে গরম জলে ডবল ধোয়া তাও আমাদের অজানা রইলো না।

গণেশ সরকার বললেন, "আমাদের মুশকিল কী জানেন, শংকরবাবু লোকে পুলিসকে খাতির করে, কিন্তু ভালবাসে না। সামনে আপ্যায়ন আর পিছনে ঘেন্না কতদিন সহ্য হয় বলুন?"

"ঘেন্না কেন? অনেকে তো পিছনেও আপনাদের গুণকীর্তন করে।" আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই গণেশ সরকারকে শুনিয়ে দিলাম।

গণেশ সরকার আমার কথার ওপর তেমন নির্ভরশীল হলেন না। আপন মনেই বললেন, "মানুষকেই বা দোষ দিই কী করে? থানায় গিয়ে কিছু কিছু পুলিসের যে রূপ দ্যাখে তাতে ভয় বা ভালবাসা কোনোটাই জন্মায় না। মনের মধ্যে যে-ভাব নিয়ে মানুষ পুলিসী হেফাজত থেকে বেরিয়ে আসে, তার নাম ঘেন্না।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গণেশ সরকার বললেন, "সাধারণের দিকে ঘৃণা, আর আমাদের দিকে অবিশ্বাস। দশ-বার বছর সার্ভিস করার পর মানুষের ওপর বোধ হয় কোনো পুলিসের বিশ্বাস থাকে না। মানুষ দেখলেই দারোগাবাবুদের সন্দেহ হয়। আমাদের কলিগদের কেউ কেউ তো নিতান্ত আপনজনকেও সন্দেহ করে। এই রেটে এগিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে স্বয়ং ভগবানের ওপরেও সন্দেহ জেগে যায়, শংকরবাবু।"

আমি সবিস্ময়ে গণেশ সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। গণেশ সরকার বললেন, "চোখের সামনে নিজের সহকর্মীর এই অধঃপতন দেখলে খুবই কষ্ট লাগে—ভাবি চিরকাল তো পুলিস থাকবো না। একদিন তো পড়াচুড়া ছেড়ে পেনসনার হয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। তখন এই গণেশ সরকারের কী গতি হবে?"

অন্য লোকের কথা জানি না। কিন্তু গণেশ সরকারের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। সেকথা সঙ্গে সঙ্গে সরকারমশাইকে শুনিয়ে দিলাম।

কিন্তু গণেশ সরকার নির্দ্বিধায় এই মতামত গ্রহণ করতে পারলেন না। কপাল কুঁচকে তিনি উত্তর দিলেন, "বলছেন তো বটে। কিন্তু মনের ভেতর থেকে পাপ যায় কোথায়? আগে এ-পাড়ার ছোট ছোট চায়ের দোকান পান বিড়ির স্টল দেখলে মায়া হতো। ভাবতাম, আহা, কিছু গরীব লোক এখানে কোনোরকমে করে খাচ্ছে। এদের রক্ষে করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এখন আর মনের সেই অনুভূতি নেই। এই যে আপনার এস্টেটের চায়ের দোকানের মালিক আমাকে আপ্যায়ন করে গেল, অতিথি হিসেব আমার এ-জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। কিন্তু..."

"আপনার মনে অতিথিসুলভ কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ আসছে না", আমি

নিজেই গণেশ সরকারের অসম্পূর্ণ বাক্যটি পূর্ণ করি।

গণেশ সরকার নিজের মনোভাব চাপা দেবার চেষ্টা করলেন না। বললেন, "শুধু কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব নয়, আমি ভাবছি, এ-দোকানেও সন্ধ্যেবেলায় চায়ের বদলে বে-আইনী মদ বিক্রি হয় কিনা?"

এই চায়ের দোকানটি এতোদিনে আমার চেনা হয়ে গিয়েছে। গণেশ সরকারকে বললাম, "লোকটি সৎ। গরম চা বেচে কোনোরকমে প্রাণ-ধারণ করছে। অন্য ব্যবস্থা থাকলে এতোদিনে বড়লোক হয়ে যেতো। কিন্তু এ-বেচারার ধার-দেনা আছে।"

"উত্তমর্ণ নিশ্চয় আপনাদের ওই রামসিংহাসন?" আমি ওই বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত না দিলেও গণেশ সরকার ঠিক জায়গাতেই সন্দেহের ঢিল ছুঁড়ে বসলেন।

গণেশ সরকার এবার মন্তব্য করলেন, "বিজনেস ভাল চললেও সন্দেহ খারাপ চললে আরও সন্দেহ।"

গণেশ সরকারের এই হেঁয়ালি বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু কিছু বলবার আগেই তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "সামান্য কয়েক কাপ চা বেচে খুব রমরমা দেখলে আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় চায়ের পিছনে অন্য কী আছে? আর না-চললে ভয় হয়, পাওনাদারদের চাপে এবং দেনা শোধ করবার লোভে এবার চা ছাড়া অন্য কিছু বেচবার লোভ হবেই। বে-আইনী জিনিস গছাবার জন্যে স্পেশাল টাউটরা তো দিনরাত এ-পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—কতক্ষণ আর তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায়?"

গণেশ সরকার দুঃখ করলেন, "এই কলকাতা মেট্রোপলিটানের ওপর এক এক সময় সমস্ত শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়, শংকরবাবু। গ্রামগঞ্জের সহজ সরল মানুষগুলোকে মোহিনী মায়ায় টেনে নিয়ে এসে মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দেবার জন্যেই যেন এই শহরের সৃষ্টি। গ্রামের রাখাল এখানে এসে ভুয়ো লাইসেন্সের ড্রাইভার হয়, গ্রামের কামার এখানে এসে চোরাই রেলওয়ে মালের দালালী করে, গ্রামের গোয়ালা এখানে এসে চোলাই মদের পরিবেশক হয়, গ্রামের জনমজুর এখানে এসে বাবুধরা পিম্প হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এ-শহরের জল-হাওয়ায় যে কী বিষ ছড়ানো আছে তা ঈশ্বরও জানেন না!"

গণেশবাবুর মুখে এই ধরনের কথাবার্তা শুনবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

গণেশবাবু বলে চললেন, "গ্রামের ইস্কুলমাস্টারের ছেলে এখানে এসে দারোগা হয়ে চেরাগুণ্ডা বদমাশের কাছ থেকে দু হাতে পয়সা নিয়ে পকেট ভর্তি করে; গ্রামের পুরুতের মেয়ে এখানে এসে পতিতা হয়। আপনাকে আর কত বলবো। এসব একটুও বানানো নয়, শংকরবাবু—প্রত্যেকটা কেস আমার নিজের চোখে দেখা। অথচ কেউ কিছু বলে না। কোথাও কোনো প্রতিবাদ ওঠে না। সুসভ্য নগরী বলে কলকাতার পরিচয় দিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। কিন্তু এর থেকে মিথ্যে কথা আর হয় না। আমার আজকাল এক এক সময় মনে হয়, এই কলকাতা শহর একটা পাপের গামলা। হাজার হাজার নিষ্পাপ লোককে বাইরে থেকে ধরে এনে করেও মুক্তি নেই, চিতার আগুনে মাংস ঝলসানোর আগে সে ময়লা উঠবে না।"

এঁটো কাপগুলো ফিরিয়ে নেবার জন্যে চায়ের দোকানের বয়টি এসেছে।

তার দিকে কাপটা এগিয়ে দিলেন এস-আই গণেশ সরকার।

লোকটি চলে যেতে গণেশ সরকার বললেন, "পাপ জিনিসটা ডেনজারাস —কলেরা বসন্তর চেয়েও ছোঁয়াচে, বড্ড তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে।"

ছড়াতে ছড়াতে পাপ যে এই কলকাতা শহরে মহামারীর আকার ধারণ করেছে সে-কথাও উল্লেখ করলেন গণেশ সরকার। বললেন, "এ-পাড়ার পান-বিড়ির দোকানগুলোর কথাই ধরুন না কেন। ক'বছর আগে পান-বিড়ি সিগ্রেট দেশলাইয়ের ওপর নির্ভর করেই এরা বেঁচে থাকতো। তারপর সিগ্রেট কৌটোর আড়ালে দু-একটা দোকানে গাঁজা, সিদ্ধি, চরস ঢুকলো। এখন সে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে! ফলে বিড়ি সিগ্রেটের দিকে কারও নজর নেই। ওটা মুখোস মাত্র—সবার মন পড়ে আছে বে-আইনী ড্রাগস-এ।"

কী যেন ভাবলেন গণেশ সরকার। তারপর বললেন, "তাছাড়াও একটা কথা আছে। দুনিয়াসুদ্ধু লোক যদি খারাপ হয়ে যাবার জন্যে লুকিয়ে গাঁজা সিদ্ধি মদের চোরাই কারবারে মাতোয়ারা হয়ে উঠবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে তাহলে পুলিস কী করতে পারে? বিশ্ব সংসারের মর‍্যাল গার্জেনির দায়িত্ব পুলিসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে অন্য সবাই যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে কী হবে বলুন?"

গণেশ সরকার দুঃখ করলেন, "চোরডাকাত ধরার পর ডিউটির শেষে একটু যে হাত-পা গুটিয়ে বিশ্রাম করবো সে গুড়ে বালি। ডিউটি সেরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় কানে খারাপ খবর এলো।"

খারাপ খবরটা কী জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইলাম। কিন্তু অভিজ্ঞ পুলিস অফিসার গণেশ সরকার আমাকে রহস্যময় অন্ধকারেই রেখে দিলেন।

গণেশ সরকার বললেন, "হেঁজি-পেঁজি ব্যাপার হলে অবশ্যই মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু যেসব নাম উঠলো তাতে বাধ্য হয়েই আমাকে এখানে চলে আসতে হলো।"

গণেশ সরকারের কথাবার্তার ভঙ্গী আমার আর ভাল লাগছে না। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার আগুনটা এবার জ্বলে উঠেছে।

গণেশ সরকার এবার রহস্যের ওপর কিছু আলোকসম্পাত করলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, "একটা কোশ্চেন করতে চাই আপনাকে। যদিও জানি, এতোবড়ো ম্যানসন বাড়ির কোন ঘরে কী ঘটছে তা সব সময় জেনে রাখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।"

গণেশ সরকারকে অবশ্যই জানিয়ে দিলাম, এ-বাড়িতে আমার অলক্ষ্যে অনেক বড় বড় ঘটনা নিঃশব্দে ঘটে যাবার সম্ভাবনাই প্রবল। সামান্য ম্যানেজার হিসেবে সব কিছু জানবার সুযোগ অবশ্যই আমার নেই। তবু যদি গণেশ-বাবুর কোনো কাজে সহায়তা করতে পারি তা হলে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত হবো।

গণেশ সরকার এবার পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে নিজের স্মৃতিকে একটু চাঙ্গা করে নিলেন। তারপর সোজাসুজি বললেন, "কিরণ খোসলা, এমন কোনো নাম আপনার স্মরণে আছে?"

"অবশ্যই আছে। আমাদের এখানে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতেন। ফ্ল্যাট, আলো করে থাকতেন, এমন কথাও কেউ কেউ বলতো।"

গণেশবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি এই কিরণ খোসলা সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে আগ্রহী।

আমি বললাম, “সব সময় সব ফ্ল্যাটের বধূকে আমার চেনবার প্রয়োজন হয় না মিস্টার সরকার। আমরা সাধারণত কর্তাদের সঙ্গেই ব্যবসায়িক কাজ-কর্মগুলো সেরে ফেলি। কিন্তু মিসেস কিরণ খোসলার কথা আলাদা।”

“কেন আলাদা?” ছোট্ট প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন গণেশ সরকার।

আমি প্রস্তুত ছিলাম। “বিশেষ নজর দেবার অবশ্যই কারণ ছিল। বাকি ভাড়া আদায়ে মিস্টার খোসলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত মিসেস কিরণ খোসলাকেই বারবার তাগাদা জানাতে হয়েছে।”

চাপা হেসে রসিকতা করলেন গণেশ সরকার। “অনেক ম্যানেজার তো এমন মধুর সুযোগে খুশীই হবেন!”

বললাম, “অন্য ম্যানেজারের কথা জানি না। তবে যে ভাড়া মেটানোর দায়িত্ব স্বামীর, সে-ব্যাপারে অসহায় গৃহবধূকে বারবার বিব্রত করতে কোনো ভদ্রলোকেরই ভাল লাগতে পারে না।”

“কিন্তু আপনার উপায় ছিল না”, মন্তব্য করলেন গণেশ সরকার।

“ঠিকই ধরেছেন। কারণ মাসের পর মাস ভাড়া জমে যাচ্ছিল এবং দেনা একবার বাড়লে তা শোধ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।”

“শেষ পর্যন্ত কী হলো?” জানতে চাইলেন গণেশ সরকার।

“আমাদের পক্ষে কমেডি—মিলনান্ত নাটক।”

“মানে?” গণেশ সরকারের প্রশ্ন।

“সব বাড়ির কালেকশন সরকার যে স্বপ্ন দেখে তাই এ-ক্ষেত্রে সম্ভব হলো—আমাদের অনাদায়ী ভাড়া একদিন ঝপ করে আদায় হয়ে গেল। আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ রইলো না।”

গণেশ সরকার একটু আশ্চর্য হলেন। “কিরণ খোসলাকে তাহলে আপনারা ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দেননি? আমার ধারণা ছিল ওই ফ্ল্যাট আপনারা খাসদখল করে নিয়েছেন।”

নীরব থাকা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। এই ফ্ল্যাট কিরণ খোসলার দখল থেকে আমার হাতে সোজাসুজি চলে এলে অবশ্যই আমি নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু কলকাতা শহরে মালিকের ফ্ল্যাট অত সহজে মালিকের হাতে ফিরে আসে না—আচমকা ছোঁ মেরে অধিকার কেড়ে নেবার মতো অনেক চিল এই শহরের আকাশে সর্বদা উড়ে বেড়াচ্ছে।

গণেশ সরকার আর একবার তাঁর পকেটের কাগজের দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি বলছেন দেনা শোধ করে দিয়ে কিরণ খোসলা আপনার ভাড়াটেই আছেন। তাহলে মিসেস পপি বিশোয়াসটি কে? একই আকাশে দুটি চাঁদ তো আমাদের এই অঞ্চলে ওঠে না!”

পপি বিশোয়াসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া মাত্রই আমি আরও সতর্ক হয়ে উঠলাম। গণেশ সরকার অভিজ্ঞ পুলিসী প্রথায় এবার কোন্ দিকে অগ্রসর হতে চান তা আমি এখনও আন্দাজ করে উঠতে পারছি না।

“পপি বিশোয়াস। নামটা যেন কেমন কেমন! উনি আবার কী ভাবে এখানে হাজির হলেন?”

আপিসের খাতা খুলে দেখিয়ে দিলাম ওই ফ্ল্যাট এখনও খোসলার নামেই রয়েছে। “ভাড়া নেবার পরে নিজের ফ্ল্যাটে কে কাকে থাকতে দেবেন তা তো আমাদের জানবার কথা নয়।”

"তা সত্যি কথা", গণেশ সরকার আমার সঙ্গে একমত হলেন। "কিন্তু আমাদের কাছে ভুল খবর গেলো লুকিয়ে-লুকিয়ে ওই ফ্ল্যাট আপনারা অন্য কাউকে ভাড়া দিয়েছেন।"

পপি বিশোয়াসের নামটা গণেশ সরকার আবার উচ্চারণ করলেন। বললেন, "এই মহিলাটি যে কেমন হবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এঁর সম্বন্ধে এমনি রিপোর্ট তো তেমন সুবিধের নয়।"

আমি নির্বাক। এই অবস্থায় আমি আদৌ মুখ খুলতে চাই না।

সৌভাগ্যক্রমে গণেশ সরকার আমাকে আর জেরা করলেন না। নিজের মনেই বললেন, "আমাদেরই হলো মুশকিল। ডিউটি শেষ করে কোথায় বাড়ি যাবো, তা না যত সব উড়োখবর। কোত্থেকে এক অজানা মহিলা টেলিফোনে রহস্যজনকভাবে কিছু অভিযোগ করলেন। ভি-আই-পি-দের নাম তুলে কেউ কিছু বললে আমাদের মশাই নার্ভাসনেস এসে যায়। চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমাশ এদের আমরা বুঝতে পারি কিন্তু এই ভি-আই-পিদের আজও চিনতে পারলাম না, শংকরবাবু। ইংরেজ আমলে এসব হাঙ্গামা ছিল না আমাদের—স্বাধীনতার পরে পুলিসের বিগেস্ট প্রবলেম এই ভি-আই-পি-রা।"

গোপনে টেলিফোন করে কে পুলিসের কাছে খবরাখবর দিচ্ছে তা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মাথায় কিছু আসছে না।

গণেশ সরকার আমাকে আপাতত নতুন বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। বললেন, "যা-সব শুনছি, তা আপনাকে এখন বলা যায় না। শুনলে আপনি হয়তো বিশ্বাসই করবেন না। কোনো একজন ভি-আই-পি-র প্রাইভেট অ্যাফেয়ার। সে-সব আপনার শুনে লাভ নেই। এখন আমাকে একবার মিসেস পপি বিশোয়াসের খোঁজ করতে হচ্ছে। আশা করি তাঁকে সশরীরে যথাস্থানে আবিষ্কার করতে পারবো।"

গণেশ সরকার এবার পপি সন্ধানে উঠে পড়লেন। বললেন, "আপনাকে আজ আর জ্বালাতোন করবো না। কাল সকালে আপনার সঙ্গে বোধহয় আরও কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। আপনাকে আজ বিরক্ত করবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কী করবো বলুন? আমাদের কোনো উপায় নেই। ভি-আই-পি-র নাম জড়িয়ে রয়েছে—যথাসময়ে ইনভেস্টিগেশন না চালালে পরে হয়তো বড় কোনো বিপদে পড়ে যাবো।"

গণেশ সরকার আমার কাছে বিদায় না-চেয়েই পপি বিশোয়াসের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এবং অজানা অস্বস্তিতে আমার দেহ সিরসির করে উঠলো। পুলিসের কানে কী খবর গিয়েছে? রহস্যময়ী রমণী দূরভাষ যন্ত্রে কীসের আভাস দিয়েছেন? পুলিস এই রাত্রে মিসেস পপি বিশোয়াসকে নিয়ে কী করবে?

গণেশ সরকারের জন্য অফিস ঘরে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে মিসেস পপি বিশোয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ করে তিনি যে আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলাম।

কিন্তু পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে গণেশ সরকারের মুখ যখন দেখা গেলো না তখন আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। জঠরের মধ্যে হুতাশন ইতিমধ্যেই অস্বস্তিকর পরিবেশ রচনা শুরু করেছেন।

নিজের ঘরে ফিরে এসে এই সময় আমি আজকাল রন্ধনশিল্পে আত্ম-নিয়োগ করি। শত দুঃখের মধ্যেও স্বপাকে আহার আমার অকল্পনীয় ছিল। মাদ্রাজ টিফিন হাউসের অন্ধ্রদেশীয় এক বালকের সহযোগিতায় প্রতি সন্ধ্যায়, একটি টিফিনবাক্সর ব্যবস্থায় আমার রাত্রের ভোজন সমস্যার সমাধান হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি বাদ সেধেছেন তেলকালিবাবু।

তেলকালিবাবু আমাকে বিনীতভাবে উপদেশ দিয়েছেনঃ 'এইভাবে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না, স্যর।'

তেলকালিবাবুর এই আকস্মিক এমার্জেন্সি উদ্বেগ আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। আমি জানতে চেয়েছিলাম, "হঠাৎ সর্বনাশের কী হলো?"

গম্ভীর মুখে তেলকালিবাবু একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আমার দিকে। "একটা কোশ্চেনের সোজাসুজি উত্তর দিন তো, স্যর। বাপ-পিতামহের আশ্রয় ছেড়ে আপনি এই জগাখিচুড়ি পাড়ার থ্যাকারে ম্যানসনে কেন এসেছেন?"

হঠাৎ এই ধরনের শক্ত প্রশ্নের উত্থাপন কেন? প্রশ্নের উদ্দেশ্য যাই হোক, এর উত্তর আমার কাছে একটিই হতে পারে। তেলকালিবাবুকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলাম, "আপনার প্রশ্নের উত্তর কে না জানে? পেটের জন্যে এসেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে তেলকালিবাবু একগাল হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "তা হলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, পেট জিনিসটা যা-তা নয়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, এই জ্বালা দু' রকমের। না-খেয়ে পেটের জ্বালা, আর খেয়ে পেটের জ্বালা। এক সময় আপনার মতো ক্ষিধের জ্বালায় ভুগেছি। তারপর পয়সা রোজগার করে অসাবধানী হয়ে বাইরের দোকান থেকে যা-তা জিনিস-পত্তর খেয়ে সেকেন্ড-টাইম পেটের জ্বালায় ভুগেছি। আপনি স্যর, দিনের পর দিন ওই বাইরের দোকানের খেয়ে নিজের পেটকে আবার ট্রাবলে ফেলবেন না।"

তেলকালিবাবুর ভীতি প্রদর্শনে কাজ হয়েছে। তিনিই আমাকে রান্নার লাইনে হাতেখড়ি দিয়েছেন এবং বলেছেন, "হাত পুড়িয়ে রান্নাটা শিখে রাখুন, স্যর। সারাজীবন কাজে লেগে যাবে। রান্না না-জানা পুরুষমানুষকে শৈশবে জননীর, যৌবনে স্ত্রীর এবং বার্ধক্যে পুত্রবধূর দাসত্ব করতে হয়। সামান্য একটু কড়াখুন্তির খবর রাখলে অনেক স্বাধীনতা—এই যে আমি, গৃহিণী চলে গেলেন বলে কি বেঁচে নেই?"

তেলকালিবাবুর প্রদর্শিত পথে রাত্রে সামান্য কিছু খাবার তৈরি করে নেবার ব্যবস্থা আয়ত্তে এসেছে। কিন্তু আজ আর উনুন জ্বালার মতো-মনের অবস্থা নেই। টেবিলের কোণে রাখা পাঁউরুটিখানাই এ-বেলার সমস্যা মিটিয়ে দেবে।

মনের মধ্যে তখনও ক্ষীণ আশা ছিল, আমার কুইক-ডিনার শেষ হবার আগেই গণেশ সরকার হয়তো আমার এই ঘরেই পুনরায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু আদালতের অনিচ্ছুক করণিকের মতো অতি ধীরে ধীরে পাঁউরুটির টুকরো চিবিয়েও গণেশ সরকারের দেখা মিললো না।

তার বদলে প্রায় ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন স্বয়ং মিসেস পপি বিশোয়াস। "মিস্টার শংকর, কী ভাগ্য আমার! এখনও শুয়ে পড়েননি?" পপি বিশোয়াস উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল মনে হলো।

একি চেহারা হয়েছে মিসেস পপি বিশোয়াসের। ক'ঘণ্টা আগেও তাঁকে দেখেছি—তখন কেমন ফিটফাট, আঁটসাঁট, পরিপাটি হয়ে ঘরের মধ্যে বসে-ছিলেন তিনি।

একদা মিসেস বিশোয়াস বলেছিলেন, "যতই ঝড় উঠুক, যতই বিপদ আসুক—মেয়েদের সব সময় ঝকঝকে থাকতে হয়। দেখলে যেন মনে হয় সদ্য দোকান থেকে আনা ফ্রেশ প্যাকেট, এখনও ওপরের সেলোফান-র‍্যাপিং পর্যন্ত খোলা হয়নি।"

মিসেস বিশোয়াস আরও বলেছিলেন, "রাউন্ড দি ক্লক মেয়েদের ঝকঝকে তকতকে থাকবার অনেক এগজাম্পল আছে।"

আমার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠবার আগেই বেশ জোরের সঙ্গে মিসেস পপি বিশোয়াস বলেছিলেন, "অমন যে অমন মা দুর্গা। অসুরের সঙ্গে দশহাত মরণবাঁচন লড়াইয়ের সময়েও কেমন ফিটফাট অ্যাপিয়ারেন্স রেখেছেন? মনে হবে যেন যুদ্ধের মধ্যে মধ্যেও নিজের মেক-আপ টাচ্-আপ করে নিয়েছেন!"

আজ কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার আগেই মিসেস পপি বিশোয়াসকে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। মিসেস বিশোয়াসের মুখ শুকনো, চুল অবিন্যস্ত ও ঠোঁটের লিপস্টিক প্রায় অদৃশ্য। মুখমণ্ডলে প্রসাধনের প্রলেপও যে অনুপস্থিত তা বুঝে নিতে আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।

আমার তক্তপোশের ওপর বসে পড়লেন মিসেস বিশোয়াস। তাছাড়া কোনো উপায় নেই। সবেধন-নীলমণি চেয়ারখানার একটি পা আজ সকালেই খুলে পড়েছে। অন্য সময় হলে মিসেস বিশোয়াস আমার সঙ্গে রসিকতা করতেন, বলতেন, "একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, মিস্টার শংকর। আপনার ঘরে একটা চেয়ার থাকবে না, এটা মোটেই ভাল কথা নয়।"

আজ কিন্তু মিসেস বিশোয়াস ওসব ছোটখাট সমালোচনার ধার দিয়েই গেলেন না। বরং অসহায়ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, "বসলাম আপনার বিছানায়। এইটুকু হেঁটে এসেই শরীরটা যেন কেমন করছে।"

কারও শরীর খারাপ শুনলে আমার উদ্বেগ বেড়ে যায়। আমি ব্যস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং পপি বিশোয়াসকে বললাম, "কোনো চিন্তা নেই—দরকার হলে আপনি শুয়ে পড়ুন।"

সকৃতজ্ঞ নয়নে পপি বিশোয়াস আমার দিকে তাকালেন—ক্লান্ত দেহকে আরও কিছুটা বিছিয়ে দিলেন আমার বিছানার ওপর। কিন্তু পুরোপুরি শুয়ে পড়লেন না। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বুঁজে রইলেন মিসেস বিশোয়াস, একবার নিজের কপালটাও টিপে ধরলেন। ওই অবস্থা দেখে আমার উদ্বেগও ক্রমশ বাড়তে লাগলো। এখন আমার কর্তব্য কী? মিসেস বিশোয়াস কতখানি অসুস্থ তাও সঠিক আন্দাজ করতে পারছি না।

কোনো কথাবার্তা না-বলে কয়েক মুহূর্ত আমি মিসেস পপি বিশোয়াসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কেমন বোধ করছেন মিসেস বিশোয়াস? কোনো ডাক্তারের খোঁজখবর করবো নাকি?"

ডাক্তারের নাম শুনেই প্রবল আপত্তি করলেন মিসেস বিশোয়াস। এবার তিনি নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়ে বিছানার ওপর অর্ধেক উঠে বসলেন।

মিসেস বিশোয়াস এবার নিজের দম্ভ-থলিকায় হাত ঢুকিয়ে কী খুঁজতে লাগলেন। তারপর করুণভাবে বললেন, "আমার একটু উপকার করবেন, মিস্টার শংকর? অন্য সময় হলে আপনাকে বলতাম না, কিন্তু এখন আর হাঁটাহাঁটি করতে সাহস পাচ্ছি না।"

"কী দরকার বলুন? জল? মাথাধরার ট্যাবলেট? আমার কাছে স্যারিডন থাকে।" আমি মিসেস বিশোয়াসের প্রয়োজন আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম।

"ওসব কিছুই নয়।" বেদনার্ত মুখে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "একটা দেশলাই।"

যে লোক সিগারেট খায় না রাত্রিবেলায় তার কাছ থেকে দেশলাই সাহায্য প্রার্থনা করা অসুবিধার কারণ হতে পারতো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, একটি দেশলাই আজ সকালেই আমি আমদানী করেছি। শ্রীমান মদনা ভালবেসে আমাকে এক প্যাকেট ধূপ প্রীতি উপহার দিয়েছে।

দেশলাইটা ড্রয়ার থেকে বার করে মিসেস পপি বিশোয়াসের দিকে এগিয়ে দিতে গেলাম। কিন্তু মিসেস বিশোয়াস হাত বাড়িয়ে সেটি গ্রহণ করবার উৎসাহ দেখালেন না।

নিজের ব্যাগের মধ্যে হাত পুরে কী একটা বার করতে করতে বললেন, "এতোই যখন করলেন তখন আরও একটু করতে হবে আজ মিস্টার শংকর।"

ব্যাগ থেকে এবার একটা সিগারেট বেরিয়ে এসেছে। সেটিকে দুটো ঠোঁটের মধ্যে বন্দী করে মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "নিজে সিগারেট ধরাই—কিন্তু আমার ভাল লাগে না। আপনি আমার সিগারেটে একটু আগুন দিয়ে দিন, মিস্টার শংকর।"

আগুন জ্বালাতে অনভ্যস্ত আমি এই প্রস্তাবে অস্বস্তি বোধ করলেও, এখন অন্য কোনো পথ নেই। দেশলাইবাক্স থেকে কাঠি বার করে মিসেস বিশোয়াসের সিগারেটে আগুন ধরালাম।

জ্বলন্ত সিগারেটের প্রথম ধোঁয়া গ্রহণ করতে করতে মিসেস বিশোয়াস গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "জানেন, মিস্টার শংকর, এমন একদিন ছিল যখন ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে এই পপি বিশোয়াসের সিগারেটে আগুন জ্বালাবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেতো। আচ্ছা-আচ্ছা পুরুষমানুষরা দামী দামী লাইটার বার করে আমাকে খুশী করবার জন্যে এগিয়ে আসতো। এই সিগ্রেট খাওয়া—এও আমি নিজে থেকে অভ্যেস করিনি। আমার ফার্স্ট

হাজবেণ্ডই জেদাজেদি করে নেশাটা ধরালো। বললো, পপি তুমি স্মোকিং শুরু করো—সিগ্রেট ধরালে তোমাকে র‍্যাভিশিংলি বিউটিফুল দেখায়।”

চিরদিনের মতো হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির এই স্ফুলিঙ্গ সম্বন্ধে আমার কী মতামত থাকতে পারে? আমি জানতে চাইলাম, “এখন আপনি কেমন বোধ করছেন?”

পপি বিশোয়াস সে-প্রশ্নের উত্তরই দিলেন না। শান্তভাবে বললেন, “এই যে আপনি আমার কথা রাখলেন, আমার খুব ভাল লাগলো। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন, মিস্টার শংকর।”

একটু থামলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর হঠাৎ কী ভেবে বললেন, “আপনাকে আর একটা রিকোয়েস্ট করবো?”

“অবশ্যই,” আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, “আমি যদি এখানে মরি—তাহলে সাত ভূতের কেউ যেন আমার মুখে আগুন না দেয়। মিস্টার শংকর, আপনাকে বলা রইলো। প্লিজ আপনি আমার মুখাগ্নি করবেন।”

মিসেস বিশোয়াসের মতো বিনোদিনীর মুখে এমন বেদনাভরা কথা এর আগে আমি শুনিনি। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার চোখ সজল হয়ে উঠছে। আমি কোনো কথা না বলে, একভাবে দুর্ভাগিনী মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

“মিসেস বিশোয়াস, আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?” কিছুক্ষণ পর আমি আবার প্রশ্ন করেছি। ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যে আরও কয়েক-পা এগিয়ে গিয়েছে।

মিসেস বিশোয়াস এবার আড়মোড়া ভেঙে পুরোপুরি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, “শরীরেব অস্বস্তির কারণটা এবার বুঝতে পারছি। অনেকক্ষণ সিগারেট ধরাইনি। উত্তেজনার মাথায় রোগের কারণটা নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।”

“মনে থাকবেই বা কী করে? যাদের আমি দেখতে পারি না, যারা আমার দুচোখের বিষ তাদের কেউ যদি অমন লর্ডলি স্টাইলে আমার সামনে বসে থাকে এবং অমনভাবে শিকারী গোঁফ নাড়ায় তা হলে আমাদের মতো অভাগা ইঁদুরের কী অবস্থা হয় ভাবুন একবার!”

শিকারী বেড়ালটা যে কে হতে পারেন সে সম্বন্ধে অবশ্যই আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব ব্যাপারে বক্তাকে কোনো বাধা না দিয়ে নীরব শ্রোতা হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, “কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শংকর। আমি একটা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট জ্বালাচ্ছি। দেড় ঘণ্টা উপোস দেবার শোধটা আমাকে এবার তুলে নিতে হেল্প করুন।”

“উপোস?”

“উপোস ছাড়া কী উঃ লোকটাকে যদি দেখতেন, আপনার রক্ত আইসক্রিম হয়ে যেতো। তাও পুরো ড্রেসে আসেনি। কিন্তু বুশশার্ট পরলে কী হবে, তলার প্যাণ্ট দেখেই পপি বিশোয়াস আন্দাজ করে নিয়েছে ইনি পুলিসের লোক না হয়ে যান না!”

পপি বিশোয়াস এখনও পুলিসের আচমকা আবির্ভাবের ধাক্কা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি। ওঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর হয়ে

উঠলো। একটু চাপা গলাতেই তিনি বললেন, "দুনিয়াতে সেই ছোটবেলা থেকে আমি কাউকে ভয় করিনি। বাবা, মা, দাদা ইস্কুলের মিসট্রেস, আমার প্রাইভেট টিউটরেস কাউকে আমি এক ফোঁটা ভয় পাইনি। আমার ফার্স্ট হাজবেণ্ড, সেকেণ্ড হাজবেণ্ড তাদেরও আমি ডোণ্ট কেয়ার করেছি। কিন্তু ভূতের ভয়, রাক্ষসের ভয়, ডাকাতের ভয়, পুরুষমানুষের ভয় এসবও আমার কোনোদিন হয়নি। —হবেও না। কিন্তু সাতঘাট ঘুরে এসে এই অবেলায় আমার মনের মধ্যে ভয় ঢুকলো পুলিসের।"

পপি বিশোয়াস বললেন, "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর এই পুলিসে পাকড়ালে আটান্ন ঘাতেও রেহাই নেই।"

পপি বিশোয়াসের চোখ দুটো উত্তেজনায় বড় হয়ে উঠলো। করযুগল কপালে ঠেকিয়ে পপি বিশোয়াস বললেন, "পুলিস, তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার। উঃ! আমার ওই বুটিকের অ্যাসিড থ্রোয়িং কেসটাতেই একটি পুলিস সাব-ইনসপেক্টর দেখেই আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে! সামান্য একটু ব্যাপারে আমার অমন সাজানো বিজনেস শুকিয়ে গেলো।"

এখনও উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন মিসেস পপি বিশোয়াস। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে তিনি বললেন, "যথাসর্বস্ব ছেড়ে দুদণ্ড শান্তি পাবার জন্যে এই থ্যাকারে ম্যানসনে এলাম। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত পুলিস।"

বিচিত্র আক্রোশে পপি বিশোয়াস এবার ঠোঁট উল্টোলেন। বললেন, "আমার দুঃখের কী শেষ আছে? কাল রাতের ঘটনাগুলো ভুলবো বলে, ঘুমের বড়ি খেয়ে সবে আলো নিবিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় দরজায় টোকা। পুলিসের টোকার স্টাইলই অন্যরকম—ভুক্তভোগী মাত্রই ওই সুর চেনে।"

পপি বিশোয়াসের মুখ এবার আরও শুকনো হয়ে এলো। বললেন, "ভাগ্যে সেই সাব-ইনসপেক্টারটা নয়—যে ওই পুরনো কেসে আমাকে ট্রাবল দিয়েছে। এঁর নাম গণেশ সরকার।"

পপি বললেন, "কাঁচা ঘুম থেকে মানুষকে টেনে তোলা। বুঝতেই পারছেন। অন্য লোক হলে আমি ছিঁড়ে খেতাম, জগদীশ জেঠমালানিকেও স্পেয়ার করতাম না। কিন্তু পুলিসের লোক, সব রাগ হজম করে ভিতরে ঢোকাতে হলো। যদিও লোকটি বাইরে খুব ভদ্রলোক—অসময়ে আমাকে ডিসটার্ব করবার জন্যে ক্ষমা চাইলেন।"

"কিন্তু কারও সঙ্গে রাতদুপুরে গপ্পো করবার জন্যে পুলিস আসে না," মন্তব্য করলেন মিসেস বিশোয়াস। "আমি তো বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"তারপর তো আমার কষ্ট। একের পর এক গণেশ সরকারের কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, উত্তেজনায় শরীরটা আনচান করছে, অথচ সিগারেট ধরাতে পারছি না।"

"ধরালেই পারতেন", আমি উত্তর দিই।

"আপনি তো বলে খালাস! এমন পোড়া দেশে জন্মেছি যে মেয়েদের সিগারেট খাওয়াটা কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। জর্দা-দোক্তা খাও কোনো আপত্তি নেই—কিন্তু সিগারেট ধরালেই মেয়েমানুষকে যত নোংরা সন্দেহ"! দুঃখ করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

মিসেস পপি বিশোয়াসকে এব্যার খুব চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তিনি বললেন,

"আমার খুব ভয় লাগছে, মিস্টার শংকর। জেরার চাপে পড়ে লোকটাকে আমি যে কী আবোল-তাবোল বললাম! আমার মাথা ঘুরছে।"

"কী বিষয়ে জেরা হলো?" আমি জানতে চাই।

ছোট্ট একটা হাই তুলে পপি বিশোয়াস বললেন, "আবার কী? প্রতুল বিশ্বাস সম্বন্ধে। কী কুক্ষণে যে মিস্টার জেঠমালানি ওই ভদ্রলোককে আমার কাছে নিয়ে এলেন!"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার এখন ভয় হচ্ছে পুলিস না সন্দেহ করে বসে, ওঁকে এখানে এনে খুন করা হয়েছে। তা হলে তো সর্বনাশের একশেষ!"

"আপনি কী বললেন?" বিষয়টাতে আমি নিজেও আগ্রহী হয়ে উঠেছি।

পপি বিশোয়াস বললেন, "প্রতুল বিশ্বাসের কথা উঠতে আমি তো লজ্জায় মরে যাই। ওঁকে তো বললুম, এমনি কার্টসি কল—সৌজন্য সাক্ষাৎ-কার। কিন্তু ভদ্রলোক একটুও বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না।"

আমার নিজেরও চিন্তা বাড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি জেঠমালানির নাম করেছেন নিশ্চয়।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন মিসেস বিশোয়াস। "আমাকে আপনি এতোটা নীচ ভেবেছেন? খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো আমরা কখনও সোর্স ফাঁস করি না। প্রতুল বিশ্বাস এখানে এসেছেন, এসেছেন। কিন্তু কে তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন, কে তাঁর জন্যে খরচাপাতি করেছে তা বলে ফেললে রাস্তার মেয়ের সঙ্গে পপি বিশোয়াসের তফাৎ কোথায় রইলো?"

পপি বিশোয়াস বললেন, "প্রথমে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। পুলিস যে বড় ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে সে খেয়াল হয়নি আমার।"

পপি বিশোয়াস এখন হাঁপাচ্ছেন। বললেন, "বোকার মতো কী সর্বনাশ যে করে ফেলেছি। আমি বলেছি, মিস্টার বিশোয়াসকে একটু-আধটু চিনতাম সেমি-প্রফেশন্যালি। হোল নাইট তো দূরের কথা লেট নাইট পর্যন্ত মিস্টার প্রতুল বিশ্বাস এখানে থাকেননি। আমি বলেছি মিস্টার শংকর-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম, সেই সময় মিস্টার প্রতুল বিশ্বাস এলেন। যত সময় ছিলেন তার থেকেও কম সময় থাকতেন মিস্টার বিশোয়াস। কিন্তু ওঁর গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তারপর গাড়ির জন্যে অপেক্ষা না করেই উনি চলে গিয়েছেন।"

মিসেস বিশোয়াস বললে, "আমার থেকে বোকা বিশ্ব সংসারে একটাও জন্মায়নি। আমি ভাবলাম, লোকটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে। এই শুনেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে। কিন্তু লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, 'উনি যখন গেলেন, তখন ওঁর শরীর কেমন ছিল।"

আমি পরবর্তী কথা শোনার জন্যে মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

পপি বিশোয়াস বললেন. "হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, মিস্টার বিশোয়াস যখন লুকিয়ে এখানে এলেন তখন ঘামছিলেন। আমি ভেবেছিলুম, নামী লোক—এইভাবে লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আসতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে ঘেমে উঠেছেন। ওঁর যে হাইপ্রেসার তা আমি জানবো কী করে?"

এবার মিসেস বিশোয়াস জানালেন, "আমি তো ওই ঘরের কথা পুলিসকে

বলে দিয়েছি। ওর কী মানে তা আমার জানবার কথা নয়।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এইখানেই তখনকার মতো মিটে গেলো। কিন্তু যাবার আগে মিস্টার সরকার আমাকে গভীর জলে ফেলে গেলেন। বললেন, আপনি যা বলছেন তাতে তো চিন্তার কিছু থাকে না। শুধু মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের যে এইসব সাবজেক্টে আগ্রহ ছিল তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু টেলিফোনে আননোন এক মহিলা আমাদের যা বললেন তা অন্য রকম। যাক, আজ আর আপনাকে ডিসটার্ব করবো না, পরে আবার খোঁজখবর করবো, এই বলে উনি তখনকার মতো চলে গেলেন।"

মিসেস বিশোয়াসের মুখ এবার ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। বললেন, "পুলিস চলে যাবার পরেই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

মিসেস বিশোয়াসকে শান্ত হবার পরামর্শ দিলাম। বললাম, "দুশ্চিন্তা বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে না।"

পপি বিশোয়াস বললেন, "সে রাত্রের খবর তো বেশী লোকের জানবার কথা নয়। কেউ কি মিস্টার জেঠমালানি এবং আমার ওপর নজর রেখেছিল?"

সত্যি চিন্তা হবার কথা। প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপার তাঁদের কিছুটা জানা থাকলে এ-ব্যাপারে মিস্টার জেঠমালানির ভূমিকাও অজ্ঞাত থাকবে না, অথচ মিসেস পপি বিশোয়াস পুলিসের কাছে ওঁদের নামোল্লেখও করেননি।

আমার কথা শুনে মিসেস বিশোয়াস আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। "আপনি বলছেন, পুলিস সোজা মিস্টার জেঠমালানির কাছেও হাজির হতে পারে? এবং পুলিসের জেরার চাপে উনি কী বলে বসবেন কে জানে?"

নিজেকে ধিক্কার দিলেন মিসেস বিশোয়াস। "কী কুক্ষণে পুলিসের কাছে মিথ্যে কথা বলতে গেলাম, মিস্টার শংকর! যা সত্যি ঘটেছিল তাই বলা উচিত ছিল আমার। ওই অসুস্থ লোককে এখান থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে যেতে গিয়ে মেরে ফেলার দায়িত্ব তো আমার ছিল না। কিন্তু এখন পুলিস তো আমাকে আর বিশ্বাস করবে না। সব ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবার পর ভাববে নিশ্চয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল।"

আমি নিজেও এই ব্যাপারে কিছুটা জড়িয়ে পড়ে অস্বস্তি বোধ করছি। একমাত্র আশার কথা প্রতুল বিশ্বাসের মরদেহ অনেক আগেই ভস্মীভূত হয়েছে—পুলিস সেখানে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাবে না। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে মিসেস বিশোয়াস বললেন. "এ কী বিপদে পড়লাম? আর এ-লাইন নয়। সব ছেড়েছুড়ে আমি কাশীবাসী হয়ে যাবো। ভগবান এবারের মতো বিপদ থেকে মুক্তি দাও।"

মুক্তির পথ আমার জানা নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস বললেন. "রাত কতো হলো? যাই, মিস্টার জেঠমালানির সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করিগে।"

মিসেস বিশোয়াস বিদায় নেবার পরেও শান্তি পেলাম না আমি। বেয়ারা এসে খবর দিয়ে গেলো, ইনসপেক্টর গণেশ সরকার টেলিফোন করেছিলেন, আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ তিনি জরুরী কাজে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

সকাল বেলায় পুলিসের সাব-ইনসপেক্টর গণেশ সরকার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তো আসবেন। কিন্তু আগাম খবর পাঠিয়ে এইভাবে আমার অশান্তি বাড়াবার কী প্রয়োজন ছিল?

মনকে সান্ত্বনা দিলাম, তাও তো গণেশ সরকার টেলিফোনে আমাকে পাননি। সরাসরি যোগাযোগ করতে পারলে হয়তো এই রাতটাও কাটতে দিতেন না। একটু পরেই সশরীরে তিনি আবার হাজির হতেন। গণেশবাবু নিজেই একবার আমাকে বলেছিলেন—পুলিসের কী-বা দিন কী-বা রাত! রাতের সঙ্গে বরং রোগ এবং দাগীদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, দুটোই রাত্রে বাড়ে!

গণেশবাবু, আপনি পুলিসের দারোগা—মামলার খোঁজখবর করতে আপনি অবশ্যই যেখানে খুশি যেতে পারেন। কিরণ খোলসার ফ্ল্যাটে যদি কোনো রহস্যময় ঘটনার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের দায়িত্ব আপনার ওপর এসে থাকে, তা হলে আপনি যেখানে খুশি খবর করুন—কিন্তু এই অভাজনের সঙ্গে যোগাযোগের উৎসাহ কেন আপনার? নিজের মনে আমি গণেশ সরকারের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছি।

গণেশ সরকারকে এতোদিন আমি শ্রদ্ধা করে এসেছি, তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়লাভের দুর্লভ সৌভাগ্যও হয়েছে আমার—কিন্তু এই প্রথম, এক ধরনের ঠান্ডা স্যাঁৎসেঁতে সন্দেহের কুয়াশা আমাকে ক্রমশ অবশ ও আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

রাত বাড়ছে, কিন্তু আজ আমার চোখে ঘুম নেই। মিসেস পপি বিশোয়াসের বিশেষ অতিথির রহস্যময় কাহিনীর সঙ্গে আমি নিজেকে কতখানি জড়িয়ে ফেলেছি তা বুঝতে পারছি না।

প্রতিদিন ও প্রতিরাত্রে বিরাট এই থ্যাকারে ম্যানসনের ঘরে ঘরে বিচিত্র নর-নারীরা কত নাটকের সৃষ্টি করছেন—সে সবের দায়িত্ব অবশ্যই আমার নয়। সব ব্যাপারে পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণের ডিউটিও আমার নয়। কিন্তু মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের এই ব্যাপারটাই আলাদা। গণেশ সরকার যখন এসেছিলেন, তখন আমি একেবারেই মুখ খুলিনি। নিজের অজান্তেই মিসেস পপি বিশোয়াসের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে আমি যে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছি এবং তাঁর সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী ও শ্রোতা হয়ে আছি—তা বোধ হয় তখনই গণেশ সরকারকে জানানো উচিত ছিল।

আমার মনে এখন একটি প্রশ্ন। থ্যাকারে ম্যানসনে মিসেস পপি বিশোয়াসের নতুন অধ্যায় সম্পর্কে গণেশ সরকার ইতিমধ্যেই কতখানি জেনে ফেলেছেন?

পপি বিশোয়াসদের জীবনযাত্রার বিবরণ কোনো এক রহস্যজনক পদ্ধতিতে থানা পুলিসের অজ্ঞাত থাকে না। সব খবরই তাঁদের কানে পেঁৗছে যায়, এমন কথা আগেও শুনেছিলাম, তবু বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এ-বিষয়ে যতটুকু সন্দেহ ছিল তা এবার সম্পূর্ণ নিরসন হওয়া উচিত। রাতের গভীরে,

সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন পপি বিশোয়াসের ফ্ল্যাটে কী ঘটলো, তাও পুলিসের কানে পৌঁছে গেল—মধ্যিখানে সময়ের সামান্য একটু ব্যবধান, এই যা।

পপি বিশোয়াসের সমস্ত মহাভারত পুলিসের জানা হলে, আমার উদ্বেগের যুক্তি থাকে না। অনেক সময় আমাদের দুঃখ, পুলিসের যতটুকু জানা প্রয়োজন তা তাঁরা জানবার উৎসাহ প্রকাশ করেন না। আবার অনেক সময় সন্দেহ হয়, অনেক কিছু জেনেও তাঁরা না-জানবার ভান করেন।

এ-সব সমালোচনা যখন দূর থেকে করেছি ,তখন মনের অবস্থা অন্য রকম। কিন্তু এই রাত্রে আমার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার—মূল ঘটনার প্রবাহ থেকে আমি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি কিনা তাও সন্দেহ-জনক।

মিসেস পপি বিশোয়াস এইভাবে বিনা প্রয়োজনে আমার এতো কাছাকাছি এগিয়ে না-এলেই বোধ হয় ভাল করতেন। অকারণে আমিও প্রতুল বিশ্বাসের অস্বস্তিকর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি।

পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে কিছু বিবরণ আমার শোনা আছে। আগামী কাল সকালে আমাকেও ওই চাপে পড়তে হতে পারে ভেবে আমার দুশ্চিন্তা আরও বাড়তে লাগলো।

মনকে সবল করবার জন্যে আমি মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ঘটনাবলী একবার মনে মনে সাজিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলাম। 'প্রতুল বিশ্বাসকে আপনি কী চিনতেন?'

—আমার উত্তরঃ 'এই বিখ্যাত নেতাকে সব লোকই তো চেনেন। এর বাইরে, চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলে সাংবাদিক-পরিবৃত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি।'

কিন্তু এর পরের পুলিসী প্রশ্নটি কী হতে পারে তা আন্দাজ করে আমার দেহ সিরসির করে ওঠে। 'আপনি মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসকে এখানে কীভাবে দেখলেন?'

'অজানা কত লোককেই তো এ-বাড়ির ফয়ারে গাড়ি থেকে নামতে অথবা উঠতে দেখি।' কিন্তু অন্য উত্তর বোধ হয় চলবে না—কারণ মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসকে আমি চিনি না, এ-কথা পুলিস অফিসের ক্যান্টিন বয়ও বিশ্বাস করবে না।

তর্কের খাতিরে ধরা যাক, মাননীয় বিশ্বাস মশায়কে এ-বাড়িতে আমি আসতে দেখেছি। তাতে কী আসে যায়? তাঁর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় গান্ধী-বাদী জননেতা কী কারণে এ বাড়িতে পদধূলি দেবেন তা আমার জানবার কথা নয়।

এখানেও তো পপি বিশোয়াস বেশ গোলমাল বাধিয়ে রেখেছেন। পুলিসকে তিনি বলে বসেছেন, যখন মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস তাঁর গোপন ভিজিটে এসেছেন তখন মিসেস পপি বিশোয়াস আমার সংগে কথাবার্তা বলছিলেন। সাক্ষাতের আসল সময়টাও তিনি এগিয়ে দিয়েছেন।

সময়ের ব্যাপারে পুলিস যদি আমাকে চাপ দিতে শুরু করে তাহলে বেশ বিপদে পড়ে যাবো। পুলিসের কোশ্চেন-অ্যানসার দিতে হবে এই আশঙ্কায় সব মানুষ সব ঘটনা ঘটবার সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় নোট করে নেয় না। সুতরাং এ-ব্যাপারে কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুল হবার প্রয়োজন বোধ হয়

নেই।

কিন্তু আন্দাজ বলে একটা জিনিস আছে। পুলিস হয়তো জিজ্ঞেস করে বসবে, 'আন্দাজ ক'টার সময় মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের আবির্ভাব সংবাদ পেয়ে শ্রীমতী পপি বিশোয়াস আপনার ঘর থেকে মিসেস কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলেন?'

এ বিষয়ে আন্দাজের একটু এদিক-ওদিক হওয়াটা হয়তো মোটেই অস্বাভাবিক হবে না। কিন্তু গণেশ সরকারদের বিশ্বাস নেই। বিভিন্ন মহল থেকে মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের প্রোগ্রামের বিবরণ তাঁরা হয়তো ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছেন। আমি ও মিসেস পপি বিশোয়াস যে সময়ে তাঁকে থ্যাকারে ম্যানসনে দাবি করছি, ঠিক সেই সময় হয়তো কোনো এক ভি আই পি গৃহে তিনি হয়তো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করছিলেন, এবং কে না জানে যে হাই লেভেলের কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের স্পেশাল অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের সময়গুলো সযত্নে ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেন?

মিসেস পপি বিশোয়াসের ওপর আমার রাগ বাড়ছে। অযথা পুলিসের কাছে আমার নাম উল্লেখ করবার কী প্রয়োজন ছিল তাঁর?

পরের ঘটনামালা এবার আমাকে আরও বিব্রত করে তুললো। মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে পপি-সান্নিধ্য অভিলাষে থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে এসেছিলেন—তাতে আমরা কী করতে পারি?

কিন্তু আমি নিজেই কথাগুলোর মহড়া বেশ জোরের সঙ্গে দিতে পারছি না। সেই রাত্রের স্মৃতি হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম। এমন সময় দরজায় জোরে ধাক্কা পড়েছে। "মিস্টার শংকর—মিস্টার শংকর—প্লিজ দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলুন, আমি পপি বিশোয়াস কথা বলছি।" দরজা খুলে দেখলাম, পপি বিশোয়াসের বিস্রস্ত বেশবাস। আচমকা বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে এসেছেন—ভালভাবে তৈরি হয়ে নেবার সময়ও পাননি। আমি ভেবেছিলাম, মিসেস বিশোয়াস নিজেই কোনো সিরিয়াস ট্রাবলে পড়েছেন। কিন্তু পপি বিশোয়াস তখন বলেছেন, "আমার গেস্ট, মিস্টার বিশ্বাস কেমন করছেন! হঠাৎ সিরিয়াসলি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।"

এ সব কথা জেনেও কিছুক্ষণ আগে গণেশ সরকারের কাছে আমি মুখ খুলিনি। এর পরবর্তী ঘটনার প্রধান চরিত্র স্বয়ং মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি ও প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপো। এই অঙ্কের ঘটনামালা সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, যা কিছু শোনার তা আমি মিসেস বিশোয়াসের মুখেই শুনেছি। শুধু দূর থেকে আমি থ্যাকারে ম্যানসনের ফয়ারে জেঠমালানির প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। অসুস্থ প্রতুল বিশ্বাসকে প্রায় চ্যাংদোলা করে গাড়ির পিছনে শুইয়ে দেবার দৃশ্যও দূর থেকে আমি লক্ষ্য করেছি।

এই গভীর রাত্রে পুরনো দৃশ্যটা মানসপটে আর একবার দেখতে দেখতে যে প্রশ্নটা জেগে উঠলো সে হলোঃ মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস কি জীবিত অবস্থায় বাড়ি পেঁাচেছিলেন? না কলকাতার রাজপথে চলমান গাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন?

নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে আমার। কেন শুধু শুধু মিসেস বিশোয়াসের

পাল্লায় পড়ে এই নোংরা ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়ালাম? যা খুব সামান্য ঘটনা ভেবেছিলাম তাই এখন ক্রমশ বেশ জটিল হয়ে উঠে আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে চলেছে।

তা হলে মূল নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া আমিই কি একমাত্র চরিত্র যিনি প্রতুল বিশ্বাসের শেষ অঙ্কের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে রইলেন? সে ক্ষেত্রে তো দায়িত্বের শেষ নেই—পুলিস যদি এই রহস্যের মূলে পৌঁছতে মনস্থির করে তা হলে আমার মতো মানুষের তো কোনোক্রমেই মুক্তি নেই।

প্রতুল বিশ্বাস তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের ত্যাগ ও উপভোগের পর সসম্মানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যথাসময়ে পবিত্র অগ্নি-সংযোগ করে তাঁর মরদেহকে পঞ্চভূতে লীন হতে সাহায্য করেছেন। সমগ্র দেশ তাঁর ত্যাগসর্বস্ব ভাবমূর্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে—শ্রীবিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্রীজগদীশ জেঠমালানি যে চিত্রটি অপ্রকাশিত রাখবার জন্যে গভীর রাত্রে কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলেন তা এখনও প্রচারিত হয়নি। এইখানেই তো নাটকের শেষ হলে ভাল হতো। শেষের পরেও যাতে সব শেষ না হয় তার জন্য রহস্যঘন নারীকণ্ঠ কেন পুলিসকে তৎপর হয়ে ওঠবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে? কে এই দূরভাষিণী? কী তাঁর উদ্দেশ্য? তিনি কি প্রয়াত প্রতুল বিশ্বাসের কোনো শত্রু, যিনি চান গভীর রাতের প্রতুল বিশ্বাসের গোপন ছবিটি সংবাদপত্রের আইন ও আদালত স্তম্ভ মারফত দেশে দেশে প্রচারিত হোক? না, তিনি প্রতুল বিশ্বাসের সবেধন নীলমণি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পিতৃব্যের প্রতি চরম অবহেলার জন্য বিপদে ফেলতে চান? অথবা তিনি সত্যই সন্দেহ করছেন, এই আকস্মিক মৃত্যু নিতান্তই সহজ শোক সংবাদ নয়, এর পিছনে কোনো গোপন চক্রান্তের সুপরিকল্পিত উপস্থিতি রয়েছে?

ঘরের আলো জ্বালিয়ে আমি বিছানার ওপর উঠে বসেছিলাম। এবার শুরু হলো ঘরের মধ্যে পায়চারি।

হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে, আসল ঘটনা যাই হোক, পুলিস তৃতীয় সম্ভাবনার ওপরেই নির্ভর করে বসে থাকবেন। এবং একবার যদি তাঁরা সন্দেহ করে বসেন যে, এর পিছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র আছে এবং প্রতুল বিশ্বাসের মৃত্যু মোটেই স্বাভাবিক নয়, তা হলে আমার নিজের ভূমিকাও বেশ সন্দেহ-জনক হয়ে দাঁড়াবে।

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছি আমি। যা ছিল অতি সামান্য ঘটনা, যার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল নিতান্ত তুচ্ছ তা আমার ও পপি বিশোয়াসের অসাবধানতায় ক্রমশ গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অপরিচ্ছন্ন মৃত্যু কাহিনীর জন্য আমার নিদ্রাহরণের কোনো প্রয়োজনই হতো না, যদি আমি গণেশ সরকারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা অকপটে বর্ণনা করতাম। তা হলে জগদীশ জেঠমালানি ও মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র হয়তো পর্দার অন্তরাল থেকে পুলিসের চোখের সামনে বেরিয়ে আসতেন, কিন্তু আমাকে অকারণে কারও সন্দেহের বিষয়-বস্তু হয়ে উঠতে হতো না।

আমি এই রাত্রে মানসচক্ষে আগামী সকালের জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গণেশ সরকার পুরো ইউনিফর্মপরা অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস সম্পর্কে এতো কিছু জেনেও

আপনি কেন আগের দিন চুপচাপ ছিলেন? পপি বিশোয়াস এবং জগদীশ জেঠমালানির সঙ্গে আপনার তেমন কোনো যোগাযোগ নেই এ কথা কোনো গ্রাম্য বালককে বিশ্বাস করানোও শক্ত হবে কিনা?

মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখটাও এই মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তিনি কি এখনও পরম নিশ্চিন্তে মিসেস কিরণ খোসলার নরম ডবল বিছানায় নিদ্রা যাচ্ছেন? না, আমার মতো তিনিও অনাগত পুলিসী বিপদের আশঙ্কায় ঘুম ত্যাগ করে চুপচাপ বিছানায় বসে আছেন?

মিসেস বিশোয়াসের জন্য আমার অন্য সময় যে মায়া হয় না এমন নয়। অনেক সময় তাঁর দুর্ভাগা জীবনের জন্য আমি দুঃখ বোধ করেছি—আগে-কার মত তাঁকে আমি অপছন্দ করি না। কিন্তু এখন তাঁকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না। নিজের নির্বুদ্ধিতায় এবং জগদীশ জেঠমালানির প্রতি প্রফেশনাল কর্তব্যবশত তিনি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন।

মিসেস পপি বিশোয়াসকে ডেকে বকুনি লাগিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, "কোন সাহসে আপনি প্রতুল বিশ্বাসের সমস্ত ঘটনা বেমালুম পুলিসের কাছে অস্বীকার করলেন? কিসের ভরসায় আপনি জানালেন প্রতুল বিশ্বাস কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে পপি বিশোয়াসের সান্ধ্য সান্নিধ্য উপভোগ করে রাত গভীর হবার অনেক আগেই নিজের পায়ের ওপর নির্ভর করে ট্যাক্সি সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? মিসেস পপি বিশোয়াস কি পুলিসকে এতোই বোকা ভাবলেন যে, তিনি যা বলবেন তাই তাঁরা বিশ্বাস করে নেবেন?"

এই অবস্থায় আমার ও মিসেস বিশোয়াসের কর্তব্য কী? আমি কি গণেশ সরকার আসরে উপস্থিত হবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যতটুকু জানি সব অকপটে নিবেদন করে তাঁর সন্দেহের অপনোদন করবো? তাতে আমার সসম্মানে মুক্তি না মিললেও, অন্তত আমার ব্যক্তিগত পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে, এবং আমাকে কোনো ষড়যন্ত্রের জালে জড়াবার আগে গণেশ সরকার কিছুটা চিন্তা করবেন?

কিন্তু আমি যা জানি তা এইভাবে পুলিসের কাছে নিবেদন করলে মিসেস পপি বিশোয়াসের নিজের অবস্থা কী দাঁড়ায়? তিনি কী এবার গভীরতর বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত হবেন?

নিজেকে অপ্রয়োজনীয় বিপদের হাত থেকে সুরক্ষিত করবার ইচ্ছা থাকলেও, অকারণে মিসেস পপি বিশোয়াসের সর্বনাশ করা অবশ্যই আমার অভিপ্রেত নয়। তাঁর কথাও আমি ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তেমন কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস প্রকৃত ঘটনার অনেক আগেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছেন এই বিবৃতি দিয়ে পপি বিশোয়াস নিজের অবস্থা জটিলতর করে তুলেছেন।

আগে যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করবার চেষ্টাই মিসেস পপি বিশোয়াসের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এখনও বোধ হয় সময় শেষ হয়ে যায়নি —এখনও জালে জড়িয়ে পড়বার আগে নিজে থেকেই সব বলে ফেলার যৌক্তিকতা রয়েছে।

গণেশ সরকারের মুখটা আমি কিছুতেই চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছি না। কোন্ অদৃশ্যলোক থেকে তিনি যেন সবজান্তার ছদ্ম-বেশে আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসিতে মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন।

গণেশ সরকারের সেই অস্পষ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে আমি কাতরভাবে নিবেদন করলাম, "আপনি ওইভাবে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আমাকে বারবার দগ্ধ করবেন না—মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি যা জানি তা কাল সকালেই আপনার কাছে নিবেদন করবো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, এই ঘটনার আমি কতটুকুই বা জানি?"

সাব-ইনসপেক্টর গণেশ সরকারের পুলিসী হাসি তবু বন্ধ হচ্ছে না। আমি সেইদিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম, "আমি নিজেই শুধু সব স্বীকার করে হাল্কা হবার চেষ্টা করছি না—আমি সেই সঙ্গে মিসেস পপি বিশোয়াসকেও দলে টানবার চেষ্টা করছি। এই ব্যাপারে, সে রাত্রের ঘটনাবলীর প্রতি মুহূর্তের ধারাবিবরণী একমাত্র মিসেস পপি বিশোয়াসের পক্ষেই জানা সম্ভব।"

গণেশ সরকারের ছবিটা চোখের সামনে থেকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তর্হিত হলেও দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্কা হচ্ছে না। আমি ভাবছি, মিসেস পপি বিশোয়াসকেও কীভাবে বিপদের হাত থেকে রক্ষে করা যায়।

রাত এখন অনেক। এই সময় কারুরই কিছু করবার থাকে না। কিন্তু আমার মনে হলো, মহামূল্যবান সময় অযথা বয়ে যাচ্ছে। কাল সকালে সূর্য ওঠার একটু পরেই বিপদের ঘন অন্ধকার নেমে আসবে কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে এবং সম্ভবত এই ঘরেও। তার আগেই প্রস্তুতি প্রয়োজন। যা সত্যই ঘটেছে তা মুছে ফেলবার মতো স্পর্ধা আমার নেই—কিন্তু যা হয়নি তার সন্দেহজালে আমি যেন নিজের নির্বুদ্ধিতায় জড়িয়ে না পড়ি।

আমার পক্ষে আর চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। ঘর বন্ধ করে রবারের চটি পরে যথাসম্ভব চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম।

করিডর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমি নেমে চলেছি। থ্যাকারে ম্যানসনেও প্রকৃত রাত্রি নেমে এসেছে। একমাত্র এই অভাগা ছাড়া আর কেউ এখন বোধ হয় এই অভিশপ্ত পুরীতে জেগে নেই।

অন্ধকার। চারদিকে অন্ধকার। কমন প্যাসেজের আলোগুলোও আজ জ্বলে নেই। রামসিংহাসনের সহকারী শীতের ভোরবেলায় আলো না নিবিয়ে আমার ভর্ৎসনা সহ্য করবার ঝুঁকি না নিয়ে গভীর রাতেই সব আলোর সুইচ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে একটা ছোট্ট টর্চ না থাকলে আমাকেও আজ হোঁচট খেতে হতো। 'সব সময় পকেটে একটা টর্চ রাখবেন, স্যর। কোনো দুর্যোগে চন্দ্রসূর্য রসাতলে গেলেও কিছুক্ষণের জন্যে ভাববার সময় পাবেন', তেলকালিবাবুর মহা মূল্যবান উপদেশটি এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেলো।

কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটের সামনে এসে পড়েছি আমি। ঘুমে আচ্ছন্ন থাকলেও মিসেস পপি বিশোয়াসকে ডেকে তুলবো স্থির করে এসেছিলাম।

কিন্তু পুরনো কাঠের দরজার একটা ফাঁকের মধ্য দিয়ে শীর্ণ আলোর রেখা আমার নজরে পড়লো। মিসেস পপি বিশোয়াসের ঘরে শেষ রজনীর আলো জ্বলছে। মিসেস পপি বিশোয়াস কী আমারই মতো ঘুমোননি? না, আজও তাঁর ঘরে কোনো অতিথির পদধূলি পড়েছে?

এক মিনিট ভাবলাম। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে এই সময় বেল বাজানো কী ঠিক হবে? কিন্তু আমার হাতে তো সময় নেই।

আর দ্বিধা নয়—আমি মিসেস বিশোয়াসের ঘরের কলিং বেলের বোতামটা সজোরে টিপে ধরলাম।

অবাক কাণ্ড। মুহূর্তের মধ্যে দরজার আইলেট দিয়ে কেউ আমার দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং পর মুহূর্তেই দরজা খুলে গেলো!

সদ্য বিছানা ছেড়ে উঠে আসার কোনো লক্ষণই নেই মিসেস পপি বিশোয়াসের চোখেমুখে অথবা বেশবাসে। বরং তাজা ফুলের মতো ফিট-ফাট হয়ে রয়েছেন শ্রীমতী পপি বিশোয়াস। মিসেস বিশোয়াস একখানা পাতলা সিল্কের শাড়ি নিপুণভাবে পরেছেন—যেন এখনই কোনো পার্টিতে যোগ দিতে হবে। শুনেছিলাম, প্রকৃত সুবেশিনী রমণীরা সব পরিস্থিতিতেই নিজেদের বেশবাস সম্বন্ধে সজাগ থাকেন। ফরাসী বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন-মস্তক হবার পূর্ব মুহূর্তেও কোনো এক অভিজাত রমণী নাকি নিজের কেশগুচ্ছ ঠিক করে নিয়েছিলেন।

মিসেস পপি বিশোয়াসের ঘরে এখন কোনো অতিথি নেই। নিশ্চিন্তে তিনি আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার সন্দেহের কথা তাঁকে বলে গেলাম। গণেশ সরকারের আসন্ন আগমনের কথাও তাঁকে জানাতে ভুললাম না।

মিসেস বিশোয়াসের সুন্দর হাসিও তাঁর ভিতরের দুশ্চিন্তাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পারলো না। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "তেমন প্রয়োজন হলে শেষের কথাগুলোও পুলিসকে আগাম জানিয়ে দিতে হবে।"

"কিন্তু কী ভাবে?" আমার প্রশ্ন। মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস প্রথম যামিনীতেই বিদায় নিয়েছেন বলে মিসেস বিশোয়াস যে সমস্যা পাকিয়ে তুলেছেন।

নিজের আঙুলের নোখটা দাঁতে ঠেকালেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, "এ জানলে আপনার নামই করতাম না আমি। তবে চিন্তা করবেন না। তেমন বুঝলে পুলিসের কাছে স্বীকার করবো, মাননীয় বিশ্বাস মহাশয় একটু পরে আমার কাছে আবার ফিরে এসেছিলেন এবং আশ্রয় দাবি করেছিলেন। এখানে তিনি মদ্যপানও শুরু করেছিলেন।"

"মদ্যপান? মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস—অসহযোগ আন্দোলনে জাতির জনকের বিশ্বস্ত অনুচর।"

"কেন? পপি বিশোয়াসের কাছে আসতে পারেন লুকিয়ে লুকিয়ে, অথচ মদ খেতে পারেন না?" ব্যঙ্গ করলেন মিসেস বিশোয়াস। "আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, মিস্টার প্রতুল বিশ্বাস আমার এখানে এসেই বলেছিলেন—আজ তুমি মদ ঢালো আমি কোনো আপত্তি করবো না। তোমার এখানে যখন আসতে পেরেছি, তখন ওই জিনিসটাও একটু টেস্ট করে দেখি।"

মিসেস বিশোয়াস এবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। "কী ভাবছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গম্ভীর হয়ে মিসেস বিশোয়াস উত্তর দিলেন, "ভাবছি, পুলিসের কাছে সত্যি কথা বলেও নিস্তার পাওয়া যাবে কিনা।"

মিসেস বিশোয়াস এবার উঠে দাঁড়ালেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "জেঠমালানিকে একটু ভোগাবো ভেবেছিলাম আজ, কিন্তু তা আর হলো না—আমাকে বেরোতেই হচ্ছে।"

কী ব্যাপার? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না-পেরে পপির মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারে আপনার আমার চোখে ঘুম নেই, কিন্তু মিস্টার জেঠমালানির এক ফোঁটা উদ্বেগ নেই। আপনার কথা মতো ওঁর বাড়িতে মেসেজ দিলাম। কিন্তু ওঁর পাত্তা নেই—অথচ টেলিফোনের আশায় আমি রাত জেগে বসে আছি। রেগেমেগে ঘণ্টাখানেক আগে বেডরুম ফোনে মিস্টার জেঠমালানিকে ফোন করলাম। ওঁকে এখানে চলে আসতে বললাম। উনি হয়তো চলে আসতেন—পপি বিশোয়াসের ওইটুকু চুম্বক এখনও আছে। কিন্তু পুলিসের নাম শুনেই অভিজ্ঞ লোক ডবল সাবধান হয়ে গেলেন। বললেন, তুমি লাইন ডিসকানেক্ট করো, আমি এখনই রিং ব্যাক করছি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"একটু পরেই বোধ হয় অন্য কোনো ফোন থেকে আমাকে টেলিফোন করলেন জেঠমালানিজী। বললেন, তোমার ওখানে এতো রাত্রে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। তুমি চলে এসো।"

রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে পপি বললেন, "যাচ্ছি বলে, এখানে চুপচাপ বসে আছি। ঝুলিয়ে রাখতে চাই লোকটাকে। একটু আগেই আবার রিং হয়েছিল কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই ফোন ধরিনি। একটু রাত জাগুক। —ভাববে আমি নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েছি।"

ছোট্ট একটি হাই তুললেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "এখন যা পরিস্থিতি দেখছি, তাতে এই রাত্রে আমার না বেরিয়ে উপায় নেই। ভগবান, কত পাপই আগের জন্মে করেছিলাম—রাত্রে একটু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুবো তাও এই কলকাতার কুকুর-বেড়ালদের জন্যে সম্ভব হবে না।"

পপি বিশোয়াস ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "এবার কোথায়?"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ওঁর তো পুলিসের গন্ধ পেয়ে এখানে আসবার সাহস নেই। তাই নিরাপদ জায়গায়।"

"নিরাপদ জায়গাটি কোথায়?"

"ওমা! এইটুকুও খবর রাখেন না? টোয়েন্টি ফোর আওয়ার টি কর্নারে" —এই বলে বিখ্যাত এক হোটেলের নাম করলেন পপি। "রাত-বিরেতে কারও সঙ্গে স্পেশাল দেখা করতে হলে ওইটাই তো মোস্ট সেফ জায়গা! গেলেন, অথচ কারও নজরে পড়লেন না। স্রেফ চায়ের দোকান তো। সুতরাং কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না—ভাববে কোনো ফরেন ভিজিটরকে মর্নিং ফ্লাইটে এয়ারপোর্টে পেঁৗছে দেবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

মিসেস বিশোয়াসকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। মিসেস বিশোয়াস বললেন; "দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আমার নামও পপি বিশোয়াস!"

আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে—বিপদ আসন্ন। কলকাতার উঁচু মহলে গোপনে অনেকদিন রাজত্ব করার পরে শ্রীমতী পাপি বিশোয়াস এবার সত্যিই গোলমালে জড়িয়ে পড়ছেন। এবং সেই সঙ্গে আমার মাথার ওপরেও ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগানোর খাঁড়া বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে।

অথচ মিসেস পাপি বিশোয়াস এখনও ভেঙে পড়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে রাজী নন। এই গভীর রাতে অপরিচিত আলাপকেন্দ্রে যাবার আগে কেমন পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেনঃ "আমার নামও পাপি বিশোয়াস!"

নিশ্চিত বিপদের মুখেও যারা এমনভাবে সাহস সঞ্চয় করতে পারে, তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তেও যারা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তাদের আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি। সংসারের সর্বক্ষেত্রে বার বার অপমানিত ও পরাজিত হয়ে আমি এই মনোবল বহুদিন আগেই হারিয়েছি—এখন আমার মেনে নেবারই সময়। জীবন-পরীক্ষার প্রায় সব সাবজেকটেই যে ফেল করে বসে আছে অবশিষ্ট একটা বিষয়ে সফল হয়ে সে কী করবে? পরাজয়কে মেনে নেবার মানসিকতায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে আছি, তখন মিসেস পাপি বিশোয়াসের মনোবলকে অবিশ্বাস্য মনে হয়। অজান্তেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

আজ আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। ঘরে ফিরে এসে ঠাণ্ডা বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছি। চোখ বুঁজে থেকেও ঘুমের পাত্তা নেই—সমস্ত দিনের ঘটনাগুলোই ছায়াছবির মতো চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে।

মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছি মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসকে। যা সোজাসুজি সামনা-সামনি করবার মতো সাহস নেই, তা গোপনে করতে গিয়ে আপনি দুজন নিরপরাধ মানুষের জীবনে বিপদ ডেকে আনলেন, মাননীয় প্রতুল বিশ্বাস। আপনি তো জাতির জনকের আহ্বানে একদিন দেশজননীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তবু কেন সব দুর্বলতা স্বীকার করে নেবার মতো মনোবল আপনার হলো না?

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার ঘরে টোকা দিচ্ছে।

হুড়মুড় করে উঠে পড়ে দরজা খুলে দেখলাম মিসেস পাপি বিশোয়াসই ফিটফাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "বেশ মশাই! আলো জেবলে রেখেছেন, অথচ দরজা বন্ধ করেছেন।"

মিসেস বিশোয়াস ততক্ষণে আমার বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়েছেন। বললেন, "চুপি চুপি ফিরে এসে নিজের ঘরে বিছানায় ঝপাং করে শুয়ে পড়বো ভাবছিলাম। কিন্তু দূর থেকে দেখলাম, আপনার ঘরে আলো জ্বলছে। বুঝলাম, বেচারা মিস্টার শংকর নিশ্চয় আমার ফিরে আসবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই সোজা এখানেই চলে এলাম। ভগবান আজ রাত্তিরের ঘুমটা আমার এবং আপনার খাতায় বরাদ্দ করেননি।"

পপি বিশোয়াস আমার অবস্থাটা ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "আহা! দুষ্টু ঘুম চোখের পাশেই ঘুর ঘুর করছে অথচ ধরা দিচ্ছে না—এই অবস্থাটা আমারও জানা। খুব খারাপ লাগে তখন—অথচ কিছু করবার থাকে না। আমি তো ওই অবস্থায় একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাই। সিংগল মেয়েমানুষের সব সময়ের বন্ধু বলতে এই সিগারেট ছাড়া আর কী আছে বলুন?"

পপি বিশোয়াস এব্বারও সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন এবং অনেকখানি ধোঁয়া একসঙ্গে ছেড়ে নিজেকে শান্ত করলেন।

পুলিস হাজতে অথবা থানায় চেনস্মোকারদের যে বিশেষ দুর্গতি হবার আশঙ্কা, তা একবার মিসেস বিশোয়াসকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই মুহূর্তে উত্তেজনা বাড়িয়ে ফেলবার ঝুঁকি নিতে চাই না। হাজতের নাম শুনে মিসেস বিশোয়াসের কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে তার ঠিক নেই। হয়তো এইখানেই কাঁদতে বসবেন।

"কারও সঙ্গে দেখা হলো?" এবার আমি মিসেস বিশোয়াসকে জিজ্ঞেস করলাম।

"হবে না মানে?" ফোঁস করে উঠলেন মিসেস বিশোয়াস। "লুকিয়ে লুকিয়ে গেস্ট হাউস রাখবে, গোপনে গোপনে ভি আই পিদের ডেকে এনে তাদের মাথা চিবোবে, আর বিপদের সময় দেখা করবে না বললে তো চলবে না।"

"আজকাল কিছুই বলা যায় না," আমি মৃদু প্রতিবাদ জানালাম। মিসেস বিশোয়াসের মনে রাখা উচিত তিনি জেঠমালানির মতো বিজনেস-ম্যানের সঙ্গে কাজকর্ম করছেন।

"খুব বলা যায়। না এসে দেখুক না। তারপর কী হয় হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে," বিষধর সর্পিনীর মতো ফোঁস করে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আর একবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস বিশোয়াস। এবং পূর্ব-বর্তী মন্তব্যের সূত্র ধরেই বললেন, "ওখানে গিয়ে কাউকে না দেখলে কী করবো তা তো ঠিক করেই রেখেছিলাম।"

"সোজা মিস্টার জেঠমালানির লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে চলে যেতেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"আমার বয়ে গেছে ওঁর বাড়িতে ধর্না দিতে। সঙ্গে কয়েন নিয়ে গিয়েছিলাম। টোয়েণ্টি ফোর আওয়ার্স টী কর্ণারের পাবলিক ফোন থেকে মিস্টার জেঠমালানিকে জানিয়ে দিতামঃ আমি চললাম থানায়।"

আমি বিস্ময়ে মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমাকে ভেবেছে কী? আমি কী ভিখিরি? আমি সঙ্গে সঙ্গে থানায় চলে গিয়ে প্রতুল বিশ্বাসের কেস সম্বন্ধে যা-যা জানি, তার প্রতিটি অক্ষর নিজ থেকে লিখিয়ে দিয়ে আসতাম। যদি ওরা জিজ্ঞেস করতো এ-সব কথা আগে তুমি বলোনি কেন, তা হলে স্রেফ বলতাম মিস্টার জেঠমালানির ভয়ে।"

একবার ভাবলাম মনে করিয়ে দিই, মিসেস বিশোয়াস নিজেই বলেছিলেন, ক্লায়েণ্টকে তিনি কখনও বিপদে ফেলতে চান না।

মিসেস বিশোয়াস কিন্তু আমি মুখ খোলবার আগেই বলে ফেললেন, "যে ক্লায়েণ্ট নিজের দায়িত্ব পালন করেন না—তাঁর যতটুকু করবার তা

করতে রাজী থাকে না, তিনি আবার ক্লায়েণ্ট কী? ভেবেছিলুম আপনাকেও বলবো না, কিন্তু আপনি জানেন এই কেসটার জন্যে এখনও পেমেণ্ট পাই-নি?"

আবার একটু ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস পাপি বিশোয়াস। বললেন, "ক্যাশ পেমেণ্ট ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সবাই আজকাল কোম্পানির নামে আনসান খরচ দেখিয়ে ভাউচার সই করাতে চায়, বিশেষ করে মিস্টার জেঠমালানি। টাকা দেবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুনিমজীর, দেওয়া ছাপানো রসিদে সই করিয়ে নেবে—হয়তো লেখা থাকবে মাল বিক্রির কমিশন কিংবা......" এবার নিজের হাসি চেপে রাখতে পারলেন না মিসেস বিশোয়াস।

বেশ কিছুটা হেসে নিলেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর বললেন, "উঃ, মরণকালেও আমার হাসি যায় না! যাবে কী করে? যা সব কাণ্ড মিস্টার জেঠমালানির! লাস্ট দু' মাস ভাউচার কী অ্যাকাউণ্টে ছিল জানেন? ইনটিরিয়র ডেকরেশন! আমার কী? আমিও পি মজুমদার বলে সই করে টাকা নিয়ে নিলাম।"

হাসতে হাসতে মিসেস বিশোয়াস জানালেন, "আমি মিস্টার জেঠ-মালানিকে বলেছিলাম, 'ধন্য আপনার ব্রেন। কোথায় আপনার পাপি বিশোয়াস আর কোথায় ইনটিরিয়র ডেকরেশন।' মিস্টার জেঠমালানি কিন্তু মোটেই লজ্জা পেলেন না। বললেন, বম্বের মিস্টার মানসুমানির কাছ থেকে আই-ডিয়াটা পেলাম। মেয়েদের পিছনে খরচটা অনেকে ইনটিরিয়র ডেকরেশন অ্যাকাউণ্টেই শো করে। ভুল কী বলুন? আপনাদের মতো বিউটিফুল লেডিরা কোম্পানির ডেকরেশন ছাড়া কী? শুধু বলতে পারেন, একস্-টিরিয়র ডেকরেশনের খরচটা ইনটিরিয়র ডেকরেশনে দেখাচ্ছি। এই বলে মিস্টার জেঠমালানি নিজেই একটু হেসে ফেলেছিলেন।"

আসল সমস্যার ওপর মিসেস বিশোয়াস কিন্তু কোনো রকম আলোকপাত করছেন না। ওঁর কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে ও-বিষয়টা তিনি কিছু-ক্ষণের জন্যে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছেন। উনি নিজে থেকে কথা না তুললে আমি এই মুহূর্তে কোনো রকম উদ্বেগ দেখাতে চাই না। যা হবার তা তো হবেই।

মিসেস পাপি বিশোয়াস বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলার পরে সেই তো বেরিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলুম পায়ে হেঁটেই চলে যাবো। কিন্তু ওমা! ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীটে যে এতো নেড়ি কুত্তা আছে তো কেমন করে জানবো। একটা কুকুরও বোধ হয় এ পাড়ায় রাত্তিরে ঘুমোয় না। সব দল বেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।"

মিসেস বিশোয়াসের চোখ দুটো এবার বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠলো। "আপনি বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার শংকর। কলকাতার শহরের কুকুররাও মেয়েদের ওপর স্পেশ্যাল নজর দেয়। রাস্তায় পুরুষ-মানুষের ছড়াছড়ি—সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমনি শাড়িপরা আমাকে অসময়ে রাস্তায় দেখলো, অমনি আমাকে ফলো করতে শুরু করলো। আর কী ডাক! শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়।"

মিসেস বিশোয়াসের চোখ আরও বড়ো হয়ে উঠছে। "ওই ডাক শুনে সদর স্ট্রীট, কিড স্ট্রীট, রিপন স্ট্রীটের কুকুরগুলোও বোধ হয় পাড়া ছেড়ে আমাকে দেখতে ছুটে এলো।"

"প্রথমে ভাবলাম, আসছে আসুক। মানুষে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে—তার থেকে কুকুর ভাল। কিন্তু তারপর কুকুরগুলোর কাণ্ড-কারখানা দেখে ভরসা কমে গেলো। যা সময় খারাপ যাচ্ছে! পুলিসে কামড়াবে বলে দাঁত বার করে আছে; এর ওপর যদি আবার রাস্তার কুকুরে কামড়ায় তা হলে উদ্ধার নেই। চোদ্দটা না চব্বিশটা ইনজেকশন নেবার জন্যে ছোটাছুটি করতে হবে—আর যা মোটা ছুঁচ না, আমাদের বুটিকের একটা মেয়ের কাছে তার বর্ণনা শুনেছি। বেচারা তিন মাস লাইনে আসতেই পারেনি।"

"বুঝলাম নিজের পায়ে হেঁটে চলবার স্বাধীনতা কলকাতা শহরে মেয়ে-মানুষদের নেই। ভাগ্যে সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু ততক্ষণে রাজ্যের রিকশওয়ালা ঠুন-ঠুন আওয়াজ করতে আরম্ভ করেছে। তাদের ইচ্ছে আমি রিকশতেই চড়ি। কিন্তু মিস্টার শংকর, রিকশ আমার দু' চোখের বিষ! ফরেনে অনেকদিন থেকে এসেছি তো—মানুষের ঘাড়ে চেপে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।"

আমি মুখ বুঁজে মিসেস পপি বিশোয়াসের কথা শুনে যাচ্ছি। কোনো মন্তব্য করছি না।

একটা সিগারেটের আগুন থেকে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "রিকশওয়ালারা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে, আমার মতলব ট্যাক্সি চড়ার। একজন ততক্ষণে গাড়ি তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছে। লোকটা বোধ হয় আমাকে চেনে। সেলাম-ফেলাম করলে আমাকে। বললে, মাইজী, আপনি তো ঠাকুর ম্যানসনে থাকেন?"

ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে পপি বিশোয়াস আবার চলতে আরম্ভ করেছেন। লোকটা যে তাঁকে চেনে সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

"লোকটা নাছোড়বান্দা। বললো, 'উঠে বসুন মাইজী।' কলকাতার যেখানে যেতে চাইব, সেখানে ফটাফট পৌঁছে দেবে। তবু আমি ট্যাক্সির দিকেই এগিয়ে চলেছি দেখে রিকশওয়ালা আমাকে শুনিয়ে দিলো, মেয়েদের পক্ষে ট্যাক্সির চেয়ে রিকশ অনেক নিরাপদ। মাঝরাতের ট্যাক্সির নাকি অনেক বদনাম আছে।"

মিসেস পপি বিশোয়াস সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। "রিকশওয়ালা যা বলছে তা ডাহা মিথ্যা নয়। কলকাতার এই জঙ্গলে রিকশই যে সবচেয়ে নিরাপদ তা আমারও জানা। কিন্তু রিকশ চড়ে এই রাত্রে টোয়েণ্টি ফোর আওয়ার টি কর্ণারের সামনে নামলে হোটেলের দারোয়ান গোলমাল বাধাবে। রিকশর ওপরে ওদের জাতক্রোধ। ট্যাক্সির ওপরে সন্দেহ অনেক কম—আর প্রাইভেট গাড়ি হলে তো কথাই নেই, খুন করে গাড়ি চড়ে বেরিয়ে গেলেও ওরা সেলাম ঠুকবে।"

মিসেস বিশোয়াস এবার চামড়ার দম্ভথলিকাটির গায়ে হাত বোলালেন। আমাকে বললেন, "জেনে-শুনেই আমি ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। একলা বেরোতে হয় বলেই তো ফরেন থেকে এই ভ্যানিটি ব্যাগ এসেছে। যতক্ষণ ব্যাগ আছে, ততক্ষণ কোনো চিন্তা নেই আমার।"

ভ্যানিটি ব্যাগের ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক ঠেকছে। দস্যু দমনে এই ব্যাগের কী মন্ত্রশক্তি থাকতে পারে, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

মিসেস পপি বিশোয়াস মৃদু হেসে বললেন, "হাত দিয়ে দেখুন না

একবার।"

মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগে হাত! ভগবান আমার মাথায় থাকুন!

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "বেশ বাবা বেশ! ভিতরে হাত ঢোকাবার অনিচ্ছা থাকলে, অন্তত একবার তুলে দেখুন।"

চামড়ার দম্ভ-থলিকা তুলতে গিয়ে আমার শিক্ষা হলো—আলতোভাবে এই ভ্যানিটি ব্যাগ তোলা সম্ভব নয়। ব্যাগের ওজন কত হবে তা আন্দাজ করা শক্ত।

এবার হেসে ফেললেন মিসেস পপি বিশোয়াস, "কী হলো? তুললেন না কেন?"

আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় মাথা চুলকোচ্ছি। মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "ভেবেছিলেন মেয়েদের কসমেটিক্সের কত ওজন হবে! তাই না?"

আমি আবার মাথা চুলকোচ্ছি। মিসেস বিশোয়াস সরলভাবে বললেন, "শুধু ফ্রেঞ্চ কসমেটিকস্ পোরা ফেদারওয়েট ভ্যানিটি ব্যাগও আমার আছে—ফরেন গেস্টরা সন্তুষ্ট হয়ে প্রেজেন্ট করে গিয়েছেন। সে-সব আমি ইভনিং-এ ম্যাচিং শাড়ির সঙ্গে নিয়ে গেস্টদের রিসিভ করবার জন্যে নিজের ঘরে বসে থাকি।"

ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ে দিলেন শূন্যে মিসেস বিশোয়াস। তারপর নিজেই চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগে হাত দিলেন। "আপনি যখন হাত ঢুকিয়ে দেখবেন না, তখন আপনাকেই আমি দেখাচ্ছি।"

ব্যাগের মধ্য থেকে সুগন্ধি কসমেটিকসের বদলে যা বার হলো তাতে আমার চোখ চড়কগাছ! টেনিস বল-সাইজের চকচকে স্টেনলেস স্টিলের কয়েকটি বল মিসেস পপি বিশোয়াসের হাতে শোভা পাচ্ছে। এক একটির ওজন বোধ হয় সেরখানেক হবে। বল নিয়ে খেলতে-খেলতে মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "একবার এক ট্যাক্সিওয়ালাকে ভ্যানিটি ব্যাগের ঝাপটা ঘা দিয়েছিলাম না! অসভ্যতা করতে গিয়ে পাঞ্জাবের নাম জাপানী নাক হয়ে গেলো! ব্যাটাকে পুলিসের হাতেও দেওয়া যেতো, কিন্তু তার অনেক হাঙ্গামা। লাইনে আমাদের কার এতো সময় আছে, মিস্টার শংকর? জানেনই তো, আমাদের প্রফেশনে টাইম ইজ মানি।"

মিসেস পপি বিশোযাস বললেন, "সবচেয়ে দুঃখের কী জানেন? এইসব স্পেশ্যাল সেফটি ইকুইপমেনট কলকাতা শহরে পাওয়াই যায় না—অথচ প্রত্যেক মেয়ের উচিত বেরোবার আগে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হওয়া। যদি আমাকে এই লাইন ছাড়তে হয়, তা হলে ভাবছি ছোটখাট একটা দোকান করবো যেখানে শুধু মেয়েদের আত্মরক্ষার জিনিসপত্তর বিক্রি হবে।"

মাথা ফাটাবার মতো ভারি বলগুলো ব্যাগের অদৃশ্য গহ্বরে ঢুকিয়ে দিলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর বললেন, "আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার টী কর্ণারে তো হাজির হলাম। এবার আমার সঙ্গে ছেলেখেলা করা হয়নি। মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি স্বয়ং এক কাপ কোণা-কফি নিয়ে ঘরের এক কোণে বসে আছেন।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! আমার যা বলবার সব হুড়হুড় করে মিস্টার জেঠমালানিকে শুনিয়ে দিলাম।"

উনিও চুপচাপ আমার কথাগুলো শুনে গেলেন, মিসেস

বিশোয়াস তার বর্ণনা অব্যাহত রাখলেন, "হাত জোড় করে আমি মিস্টার জেঠমালানিকে বলেছি, 'ফর গডস্ সেফ' আমার কাছে আর খাদি ভি-আই-পি পাঠাবেন না, আমার অনেক শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।"

মিস্টার জেঠমালানি নাকি তখনও মিটমিট করে হাসছেন। বললেন, "শখ করে কি আর পাঠাই মিসেস বিশোয়াস—না-পাঠিয়ে উপায় থাকে না যে! লোয়ার লেভেলে ছোটাছুটি করে অনেক ঠকেছি, মিসেস বিশোয়াস। শুনলাম, ক্যালকাটাতেই আমরা ওইরকম বোকামি করি—ডেল্লি, বম্বেতে টপ বিজনেসমেনরা টপ লেভেলেই যোগাযোগ রাখেন।"

আমার দিকে তাকিয়ে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমার তখন ওসব কথা শোনবার মতো মেজাজ নেই। বললাম, আমি নাক কান মলেছি—পপি বিশোয়াসকে আর খাদি ভি-আই-পিদের কাজে পাবেন না। আপনি দয়া করে অন্য ব্যবস্থা করুন, মিস্টার জেঠমালানি—কলকাতা শহরে মেয়ের অভাব নেই। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

"কী উত্তর দিলেন মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি?"

"সেই এক উত্তর। কথাটা মুদ্রাদোষের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে—'ফিকর মাত্ কীজিয়ে।' আমিও তেমনি। কফির কাপটা তেড়েমেড়ে সরিয়ে দিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বললাম, এখনও ফিকর করবো না তো কখন করবো?"

বিরক্তিতে ঠোঁট উল্টোলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "তখন শোনালাম, কাল সকালেই তো পুলিস এসে হাজির হবে। তাতেও ফল হচ্ছে না দেখলাম। জেঠমালানিজী পকেট থেকে এলাচি বার করে নিজের মনেই চিবোচ্ছেন। তখন সোজাসুজি শুনিয়ে দিলাম, আপনাকে আর আড়ালে রাখা সম্ভব হবে কি না জানি না। পুলিস বোধ হয় ইতিমধ্যেই আপনার নামটাও সন্দেহ করছে। যে লোক পুলিসকে উড়ো টেলিফোন করছে, সে যে আপনাকেও সে রাত্রে দেখেনি তার গ্যারাণ্টি কী?"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এবার এলাচি চিবনো বন্ধ হলো। মিস্টার জেঠমালানি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, রাত দুপুর, কিন্তু উপায় নেই। এখনই একবার তিনি প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছেন।"

একটু থামলেন মিসেস বিশোয়াস। ওঁর চোখমুখে উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠছে। "কী যে বলে লোকটা, কিছুই বুঝি না। ঘরে ফিরে যেতে বলে আবার সেই মন্তর আওড়ানো—ফিকর মাত্ কীজিয়ে!"

"কিন্তু আরে বাপ, কাল সকালে পুলিস এলে কী বলবো?" বিরক্তভাবে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "হাবভাব দেখে মনে হলো ঘণ্টাখানেক পরে উনি নিজেই আমাকে টেলিফোন করবেন। কারণ আমাকে ঘরে থাকতে বললেন।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "তা হলে তো আপনার এবার ঘরে ফেরা দরকার। টেলিফোন এসে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।"

কাতর কণ্ঠে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ঘরে ফেরা তো দরকার—কিন্তু আমাদের কী হবে, মিস্টার শংকর?"

এ-প্রশ্নে কী উত্তর দেবো আমি? আমি নিজেই তো নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি—কেন অকারণে এই কুৎসিত ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়লাম?

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমার খুব ভয় করছে, মিস্টার শংকর।

পুলিসের লক-আপে আমি একটা দিনও বাঁচব না। নরক বলে আমি ভাল পুলিস লক-আপের তুলনায়।"

যা আমি বলতে পারছি না, মার্ডার কেসে জামিনও মিলবে না, লক-আপেই থাকতে হবে সন্দেহের নায়ক-নায়িকাদের।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "নেপালে পালালে কেমন হয়, মিস্টার শংকর? ওখানে আমার এক অ্যাডমায়ারার আছেন। কলকাতায় এসে কতবার হাতে পায়ে ধরেছেন নিজের প্যালেসে নিয়ে যাবার জন্যে। আমিই পাত্তা দিইনি—এই ক্যালকাটা সিটি ছেড়ে কে কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে মুণ্ডপাত করবে? কিন্তু এখন. ."

মিসেস পপি বিশোয়াস আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়লেন।

আমার সন্দেহ হলো, সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে। আগামী সকালে মিসেস পপি বিশোয়াসের দর্শন না মিললে আমার ভূমিকা কী হবে? পুলিস এখানে হাজির হলে আমি কী বলবো?

আজ যেন সময় বড়ই দ্রুত বয়ে চলেছে। এত তাড়াতাড়ি ভোর না হলেই যেন ভাল হতো। সকাল মানেই তো সমস্যা।

ভোরের প্রথম পর্বেই আমি মিসেস পপি বিশোয়াসের দরজার সামনে হাজির হয়েছি। উনি এখনও থ্যাকারে ম্যানসন থেকে উধাও হননি। বললেন, "কোথায় আর যাবো? যা-হয় হবে।"

জেঠমালানিজীর সেই বহুপ্রতীক্ষিত টেলিফোন সম্বন্ধে খোঁজ করতে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "হ্যাঁ, ফোন করেছিলেন। কিন্তু সেই এক বুলি —ফিকর মাত্ কীজিয়ে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝবার আগেই লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর যা হয় তুমি সামলাও"—মিসেস বিশোয়াসের স্বরে সন্দেহের বিষ ঝরে পড়লো।

তখন আমারও মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু জেঠমালানিজীর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ অচিরেই পাওয়া গেলো।

সকাল আটটায় থানায় ফোন করেছিলাম। উদ্দেশ্য পুলিস আসবার আগেই আমি স্বেচ্ছায় সব বক্তব্য গণেশ সরকারের কাছে নিবেদন করবো। কিন্তু কোথায় গণেশ সরকার? তিনি একটু আগেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন।

আমার উদ্বেগ আরও বেড়েই চলেছে। তখন দশটা। গণেশ সরকারের আবির্ভাব আসন্ন। আমি উত্তেজনায় ছটফট করছি। গণপতিবাবুকে খবর দেব কিনা ভাবছি। গণপতিবাবুকে ফোন করলাম—কিন্তু এ সময়ে উকিল-পাড়ায় তিনি আসেন না। বেয়ারাকে বললাম, গণপতিবাবু আমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করেন।

এবার আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম। পুলিস আসবার আগেই আমি পুলিসকে সব বলতে চাই।

থানায় ঢুকবার আগেও ভাবছি, আজ আমার সঙ্গে গণেশ সরকারের সম্পর্কটা কী রকম হবে? চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে আমার। হে ঈশ্বর, হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলের কপালে এই দুঃখ তুমি কেন লিখে রাখবে?

এখন আর দ্বিধার সময় নয়। বাইরের মুক্ত পৃথিবীর কাছে বিদায় নিয়ে

আমি থানার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

গণেশ সরকার নিজের টেবিলে বসে জলযোগ সারছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "আরে বসুন বসুন। নগেন, সায়েবকেও চা-টোস্ট দাও।"

আমি তখন ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি। "কী হলো আপনার? বসুন—বসুন।" গণেশ সরকার এখনও পুরনো দিনের মতোই আমাকে আপ্যায়ন করছেন। "মুখ-চোখ অমন হয়ে আছে কেন? থ্যাকারে ম্যানসনে কোনো ট্রাব্‌ল আছে নাকি?" সরলভাবে কথা বলে যাচ্ছেন গণেশ সরকার।

কান্নায় আমার গলা জড়িয়ে আসছে। কীভাবে আমি প্রতুল বিশ্বাস সম্পর্কে আমার বক্তব্য শুরু করবো?

গণেশ সরকার আমার হাবভাব লক্ষ্য করলেন না। বললেন, "আগে চা-টোস্ট খান তারপর আপনার কথা শুনবো।"

আমি নিজের অবসন্ন দেহটাকে টুলের উপর বসিয়ে দিলাম। গণেশ সরকার এখনও আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছেন। জিজ্ঞেস করছেন, গণপতিবাবু কেমন আছেন? গণপতিবাবু যে একটু পরেই আমার খোঁজ নেবার জন্যে এখানে হাজির হতে পারেন তা এখনই বলতে পারছি না গণেশ সরকারকে।

"আপনার তো আজ সকালে আমাদের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল?" আমি ক্ষীণ কণ্ঠে এবার প্রসঙ্গের উত্থাপনা করলাম।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে গণেশ সরকার আমার দিকে তাকালেন। "আপনি ওই প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারটা বলছেন? আজ সকালে একটু পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো। হাই পলিটিক্যাল লেভেল থেকে আমাদের সায়েবের কাছে ফোন এলো মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের পবিত্র নাম যেন নোংরা না হয়। আমাকে সায়েব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সায়েব বললেন, সরকার তুমি ওই ইনভেস্টিগেশন ড্রপ করো। আফটার অল একটা উড়ো টেলিফোনের ওপর নির্ভর করে এতো বড়ো জননেতার পার্সোনাল লাইফে ঢোকবার চেষ্টা করা পুলিসের পক্ষে উচিত হবে না। ডু ইউ এগ্রি?"

গণেশ সরকার বললেন, "আমি ১১০% এগ্রি করে নিজের আপিসে ফিরে এসেছি। ছোট ছোট লোক আমরা, বড় বড় ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে চাকরিটা খোয়াবো? ওই কেস ড্রপ হয়ে গিয়েছে—আমি খাতা ক্লোজ করে দিয়েছি।"

ব্যাপারটা আমার নিশ্বাসই হচ্ছে না। আমার সমস্ত শরীরে বিপদমুক্তির আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। গণেশ সরকার বললেন, "আমি স্যরি, শংকর-বাবু। এই ব্যাপারে আপনাকে শুধু শুধু জ্বালাতন করেছি। আজ যে এনকোয়ারিতে যাবো না তাও আপনাকে জানানো উচিত ছিল। আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লিজ।"

জগদীশ জেঠমালানির আশ্চর্য ক্ষমতার কথা ভেবে আমি স্তম্ভিত।

গণেশ সরকারকে মনে হলো যেন স্বর্গের দূত। আমি সবিস্ময়ে কতক্ষণ তাঁর দিকে বোকার মতো তাকিয়েছিলাম খেয়াল নেই। গণেশ সরকার নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো মশাই? ওইভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?"

আমার এক-পা যে জেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল এবং এমন সহজ মুক্তি যে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না তা গণেশ সরকারকে বলি কী করে?

গণেশ সরকার কিন্তু আমার নীরবতার অন্য অর্থ করে বসলেন। তিনি বললেন, "আপনি অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, এতো বড় কেসটা আমি এক কথায় বস্তাবন্দী করে ফেললাম কেন?"

"না করে উপায় ছিল না, মিস্টার শংকর." নিজেই উত্তর দিলেন, গণেশ সরকার। "প্রাতঃস্মরণীর ভি-আই-পিদের ইদানীংকার কীর্তিকাহিনীর দিকে নজর দিলে হাজতে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। কিন্তু আমরা মশাই সামান্য কর্মচারী, পেটের দায়ে এই পুলিসের চাকরি করতে এসেছি। যেখানে-সেখানে হাত বাড়াতে গিয়ে কি গোখরো সাপের ছোবল খাবো? হায়ার অথরিটি ইনিয়ে বিনিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে আমাদের যা বলেন তা শুনে মানিয়ে গুণিয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

আমি নিজে প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারে এমনভাবে জড়িত যে সাধারণ মানুষের মতো মন্তব্য করতে পারছি না। চুপ করে কথাবার্তা শুনে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

গণেশ সরকার বললন, "আমারও বোকামি হয়েছিল—সামান্য একটা টেলিফোনের ওপর ভরসা করে মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারে এনকোয়ারি আরম্ভ করে দিলাম। এখন কে কে আমার ওপর পার্মানেন্টলি চটলেন তার ঠিক নেই।"

চিন্তিত গণেশ সরকার আমাকে জোর করে চায়ে আপ্যায়ন করলেন। তারপর বললেন, "ওই ভদ্রমহিলা—কী যেন নাম?"

"মিসেস পপি বিশোয়াস?"

"হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে, আমার হয়ে অ্যাপলজি চেয়ে নেবেন। অকারণে ওঁকে ডিসটার্ব করার জন্যে আমি দুঃখিত। উনিও যে অর্ডিনারি উয়োম্যান নন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।"

থানা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো বুকের ওপর থেকে দশ মণ ওজনের ভারি পাথরখানা সরে গেলো।

এসব কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু প্রতি বছর প্রতুল বিশ্বাসের জন্ম-দিবসে তাঁর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয় তা আমাকে কিছু-ক্ষণের জন্য আনমনা করে তোলে এবং থ্যাকারে ম্যানসনে দুঃসহ অন্ধকার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মিসেস পাঁপ বিশোয়াসকে খবরটা এখনই দেওয়া দরকার। কিন্তু তাঁর ঘরে ঢুকে বুঝলাম আসল খবর তাঁর কাছে এসে গিয়েছে।

মিসেস বিশোয়াসের ঘরের মধ্যে কলকালি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি একগাল হেসে হেসে নির্দেশ দিচ্ছেন, "যাবে আর আসবে—এক মিনিট দেরি করবে না কিন্তু, বাবা কলকালি।"

কলকালি যে আজ্ঞা পালনে কোনোরকম শৈথিল্য দেখাবে না তা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলো।

মিসেস বিশোয়াস আমাকে দেখেই বললেন, "কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শংকর। আপনার পারমিশন না নিয়েই এ-বাড়ির লোককে আমি কাজে লাগাচ্ছি। তবে যে-কাজে পাঠাচ্ছি তাতে আপনি না বলতে পারবেন না!"

কলকালি তখন ফিক ফিক করে হাসছে। সকালে কলকালির কিছু জরুরী ডিউটি থাকে সেসব কাজের কী হবে তা আমার জানা দরকার।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এর থেকে জরুরী কাজ আর থাকতে পারে না, মিস্টার শংকর আমি আপনার লোককে কালিঘাটে মায়ের পুজো দিতে পাঠাচ্ছি।"

টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে কলকালি এবার বিদায় নিলো। এবং মিসেস বিশোয়াস চোখ বন্ধ করে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে জানাতে বললেন, "দেখো মা! তোমার দয়া ছাড়া এই অভাগিনী পাঁপর আর কী আছে? বড় জোর রক্ষে করেছো এবার।"

চোখ খুলে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আপনার নামেও পাঁচ টাকা পুজো পাঠিয়ে দিয়েছি মিস্টার শংকর। একটু আগেই মিস্টার জেঠমালানি ফোন করেছিলেন, বললেন, ঠিক জায়গায় কলকাঠি নাড়া হয়ে গিয়েছে, আর কোনো হাঙ্গামা হবে না।"

আমি এবার থানায় গণেশ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ পেশ করলাম। মিসেস বিশোয়াস বললেন, উঃ! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মিস্টার শংকর। আমি ভাবছিলাম, থানা কি অত সহজে ছাড়বে? যদিও মিস্টার জেঠমালানি বলে দিলেন, যদি পুলিস আসে তা হলে অফিসারের নামটা জেনে নিয়ে ওঁকে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পাঠিয়ে দিতে।

মিসেস বিশোয়াস এবার আশা করি থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নিয়ে আমাকে শান্তি দেবেন।

কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না তাঁর হাবভাবে। গম্ভীর হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, "এবার আমার আসল কাজ আরম্ভ হবে।"

কীসের কাজ? এতোদিন তাহলে নকল কাজ হচ্ছিল?

মিসেস পাঁপ বিশোয়াসের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "আমাকে ডোবাবার জন্যে যে লোক ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিল তাকে এবার আমি সুদে-আসলে শায়েস্তা করবো।"

রাগে গুমরে উঠলেন মিসেস পাঁপ বিশোয়াস। "ভাবছেন, আমি ধরতে

পারবো না, কে পুলিশের কানে প্রতুল বিশ্বাসের খবরটা তুলেছিল? আমি সব জেনে ফেলেছি—পাপি বিশোয়াস ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না।"

পাপি বিশোয়াসের এই অগ্নিমূর্তি দেখবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি ওঁর মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "নামটা এখন আপনার কাছে ফাঁস করবো না। তবে জেনে রাখুন, শত্রু নিকটেই আছে। নিরপরাধ পাপি বিশোয়াসকে যখন বিপদে ফেলতে গিয়েছো তখন তোমার মুক্তি নেই!" আমাকে সাক্ষী রেখে অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে পাপি বিশোয়াস যেন প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

যে যেখানেই যুদ্ধ ঘোষণা করুন আমি আর কোনো লড়ায়ে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহী নই। মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ব্যাপারে অকারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। থ্যাকারে ম্যানসনের কাজকর্মে বেশ পিছিয়ে পড়েছি, কালীঘাটের কালীকে প্রণাম জানিয়ে এবার আমি নিজের কাজে মন দিতে চাই।

থ্যাকারে ম্যানসনে আমার স্বল্পপরিসর কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত চলচ্চিত্রের মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই প্রাচীন প্রাসাদের কোটরে কোটরে সংসারের যে বিচিত্র লীলাখেলা চলেছে, তার কিছুটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি—কিন্তু এ বাড়ির টেমপোরারি ম্যানেজার হিসেবে আমি নতুন কিছুই করতে সক্ষম হইনি। পুরনো সেই ট্রাডিশন, বহুদিনের জীবনধারা ঠিক আগের মতোই এখানে নিজের খেয়ালে বয়ে চলেছে। রামসিংহাসনের শাসনই এখানে অপ্রতিহত।

এক এক সময় আমি কত স্বপ্ন দেখেছি। সামান্য যে সুযোগ পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার করে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আমি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবো ; বহুদিনের যেসব পাপ এই প্রাচীন বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হয়েছে তার কিছুটা পরিষ্কার করবো এবং এমনি আরও কত পরিকল্পনা মনের মধ্যে ভিড় করে থেকেছে।

অফিস ঘরে ফিরে এসে আজ আমি হিসেব-নিকেশে মন দিয়েছি। এই থ্যাকারে ম্যানসনকে ইচ্ছে করলেই আমরা কত সুন্দর করে তুলতে পারি।

আমার মনে পড়লো, এখনও পর্যন্ত কোনো কাজ এগোয়নি। এমন কি, আইনের শরণ নিয়ে বহু চেষ্টায় যে তিনখানা ফ্ল্যাট খালি করা হয়েছে তারও কোনো ব্যবস্থা হয়নি। অথচ আজকালকার দরে নতুন ভাড়াটে আমদানি করলে এই তিনখানা ফ্ল্যাট থেকেই বিলাসিনী দেবীর উপার্জন অনেক বেড়ে যেতে পারে। সেবার বিলাসিনী দেবী থ্যাকারে ম্যানসনের বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু আমার পক্ষে বেশী দিন হাত-পা গুটিয়ে এমনভাবে বসে থাকাটাও নীতিসম্মত নয়। বিলাসিনী দেবীকে এ-বিষয়ে অবহিত করবার মতো সময় অবশ্যই আবার এসেছে।

এই সব চিন্তায় যখন বিভোর হয়ে আছি তখন ঘরের মধ্যে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন গণপতিবাবু।

গণপতিবাবু চিৎকার করে বললেন, "কী খবর? কী হলো তোমার?"

চেয়ারে বসে পড়ে গণপতিবাবু জানালেন, "সাত সকালে খুব আর্জেণ্ট কাজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। একটু আগই অ্যাটর্নিপাড়ার বুড়ী ছুঁতে গিয়ে বেয়ারার কাছে শুনলাম তুমি ফোন করেছিলে।"

চোখ বুঁজে বিচক্ষণ গণপতিবাবু বললেন, "কাজের প্রেসার খুব। কিন্তু টু প্লাস টু করে মনে হলো তোমার সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করা দরকার।"

গণপতিবাবুর দূরদৃষ্টি সত্যিই অদ্ভুত। একটা বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, "আপিসের বেয়ারার কাছে শুনলাম তুমি স্পেশাল কিছু বলোনি। কিন্তু আমি ভাবলাম, এতো সকালে আমি যে আইন পাড়ায় আসি না তা তো শংকরের জানা। তবু সে কেন এই অসময়ে খোঁজ করলো? নিশ্চয় কোনো আর্জেণ্ট দরকার। তাই ছুটে চলে এলাম।"

গণপতিবাবুকে কী উত্তর দেবো ভাবছি। যে-বিপদ থেকে অলৌকিকভাবে একটু আগে উদ্ধার পেয়েছি তার কথা যথাসময়ে অবশ্যই গণপতিবাবুকে নিবেদন করতে হবে। কিন্তু এখনই তাঁকে কী খবর দেবো?

সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বিশেষ ভাবতে হলো না। গণপতিবাবু নিজেই বললেন, "যাক! আমার হিসেব যে ভুল সে তো তোমার মুখ দেখেই আন্দাজ করছি। বুঝতে পারছি, এমনিই খোঁজখবর করেছিলে। অথচ আমি ধরে নিয়েছিলাম এস-ও-এস?"

হাল্কা মেজাজে গণপতিবাবু হুকুম করলেন, "এসেই যখন পড়েছি তখন চা জলখাবারের ব্যবস্থা লাগাও। ক'দিন ধরে শান্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়াও করবার ফুরসতও মিলছে না।"

চায়ের দোকানের বয় ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। গণপতিবাবু বললেন, "লক্ষ্মীসোনা আমার, রিপন স্ট্রীটের মোড়ে বটগাছের তলা থেকে গরম সিঙাড়া খান আষ্টেক নিয়ে আয়; আর মুড়ি নিবি মারকুইস স্ট্রীট-ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড় থেকে।"

গণপতিবাবু কোনো কথাই শুনলেন না। মুড়ি ও সিঙাড়ার পয়সা নিজের পকেট থেকে বার করে ছেলেটির হাতে দিলেন। বললেন, "তোমার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। হরি উকিলের বাড়িতে কত মুড়ি সিঙাড়া খেয়েছি। তোমার বাড়ি-ঘরদোর হোক, তখন আবার গিয়ে হইচই করে মাছের ঝোল ভাত দই সন্দেশ খেয়ে আসবো।"

আমার অফিসে বসে গণপতিবাবুর জলখাবারের পয়সা দেওয়াটা তবু ভাল লাগছে না। হাসতে হাসতে গণপতিবাবু বললেন, "ছোটখাট ব্যাপারে এতো মাথা ঘামিও না, শংকর। একদিন রাহাখরচ এবং জলখাবার বাবদ যা পকেটে এসেছে তার সিকিভাগও খরচ হয়নি। পরের অ্যাকাউণ্টের ওই সব পয়সার একটা গতি করতে হবে তো?"

গণপতিবাবু বললেন, "ক'দিন যা এমার্জেন্সি ঘোরাঘুরি হচ্ছে!"

মুড়ির আগেই প্রথম কাপ চা এসে গিয়েছে। গণপতিবাবু বললেন, "আগে লোকে বলতো মরার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। কিন্তু এ যুগে হাই-সোসাইটিতে তা আর সত্যি নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাজকর্ম

শেষ। আজকাল, বড়লোকের ওয়ারিসনদের শ্মশান থেকে ফিরেই প্রচণ্ড ছোটাছুটি করতে হয়। এক মুহূর্ত দেরি করবার উপায় নেই। যত দেরি হবে তত গোলমাল বাধবে!"

গণপতিবাবু হাসছেন এবং আমি বোকার মতো ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। গণপতিবাবু বললেন, "কার যে কী আছে তা আজকাল চোখের দেখা দেখে বলা মোটেই সম্ভব নয়। এই আমার লেটেস্ট কেসটার কথাই ধরো না।"

গণপতিবাবু চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিলেন। "ভদ্রলোককে জনসভায় দেখেছি—গান্ধী জন্মোৎসবে লেকচার শুনেছি—কাগজে কত ছবিও দেখলাম। কিন্তু কিছুই বুঝিনি।"

আমার শরীর সিরসির করছে। ঘুরে-ফিরে গণপতিবাবুও কী একই প্রসঙ্গে চলে আসছেন?

আমি এবার মুখ খুললাম। "আপনি কী মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের কথা বলছেন?"

বিস্মিত হলেন গণপতিবাবু। "হরি উকিলের ছেলেই বটে তুমি! কী করে বুঝে ফেললে তুমি? খাসা ব্রেন তোমার! তোমাকে উকিল করা উচিত ছিল আমার।"

গণপতিবাবুকে কী করে বোঝাই মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের ভূত আমার স্কন্ধে সারাক্ষণ চেপে রয়েছেন।

গণপতিবাবু চাপা গলায় জানালেন, "প্রতুল বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার অন্য রকম আইডিয়া ছিল। মনে মনে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু মৃত্যুর পরেই ওঁর ভাইপোকে নিয়ে হাজির হলেন তোমাদের ওই বরুণা প্রপার্টিজের ডিরেক্টর মিস্টার ভরত সিং। আমার কর্তাও ফোনে বলে দিলেন, যতটা পারো, মিস্টার সিংকে হেল্প কোরো।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গণপতিবাবু বললেন, "তারপর আর কী? মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের বেনামে অনেক কিছু সম্পদ চারদিকে ছড়ানো আছে। তার একটা গোপন লিস্টি ভাইপো বাবাজীবনের হাতে এসে পড়েছিল ঠিক সময়ে। তাই কুইক অ্যাকশন নিতে হলো।"

অ্যাকশনের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন না গণপতিবাবু। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "অর্ডিনারি লোকদের সঙ্গে মহাপুরুষদের কী তফাৎ বলো দিকি?"

অর্ডিনারি লোকদের সব কিছুই অর্ডিনারি এবং গ্রেটম্যানদের সব কিছুই গ্রেট, আমি আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম।

"আগে আমিও ওই রকম ভাবতাম। কিন্তু স্বাধীনতার পর কয়েকজন ভি আই পি স্পেশালি হ্যাণ্ডেল করে আমার ভুল ভেঙেছে। আমি বুঝেছি—অর্ডিনারি লোকরা যা নিজের নামে করেন, মহাপুরুষরা তাই বেনামে করেন। প্রতুল বিশ্বাসের শুধু সোনাদানা হীরে জহরতই ছিল না; অনেক সম্পত্তিও আছে। সেসব ঠিক মতো ভাঙিয়ে খেতে পারলে, বিশ্বাস মশায়ের ভাইপোর তিনপুরুষে কোনো কষ্ট হবে না।"

আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলেন গণপতিবাবু। বললেন. "মরবার পরেই ভাইপোকে আমার সঙ্গে একটু যা ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। বেনামা হীরে

জহরত বিষয় সম্পত্তির ওইটাই অসুবিধে—চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষকরা ভক্ষক হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গণপতি সামন্তর মতো এক্সপার্ট তদ্বিরকারক থাকলে হজমের কাজটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।"

"প্রতুল বিশ্বাসের অনেক সম্পত্তি বুঝি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তা ভগবানের দয়ায় এবং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মন্দ ম্যানেজ করেননি বিশ্বাসমশাই। বিশেষ করে যদি মনে রাখা যায় যে বিশ্বাসমশাই নিজেই গর্ব করে বলতেন যে তাঁর কোনো অসটেনসিব্‌ল মিন্‌স্‌ অফ লাইভলিহুড নেই!"

গণপতিবাবু এবার হেসে ফেললেন। বললেন, "আপাতত কোনো উপার্জনের পথ নেই, অথচ কেউ বেশ সুখে বসবাস করছে এটা কিন্তু একটা অফেন্স। আমাদের জাহান আলী বিশ্বাসকে ওই গ্রাউন্ডেই তো পুলিস অ্যারেস্ট করে থানায় পুরে রেখেছিল।"

গণপতিবাবু এবার কপালে হাত ঠেকালেন। বললেন, "যাকগে যাক, আমাদের ছোট মুখে ওসব বড় কথা মোটেই মানায় না। শুধু এইটুকু দেখছি, মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের অনেক ওয়েল-উইশার আছেন। বরুণা প্রপার্টিজের মিস্টার ভরত সিং যেভাবে বিশ্বাসমশায়ের ভাইপোকে হেল্প করছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। উনি পিছনে না থাকলে অত সহজে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতোগুলো বেনামা সম্পত্তি নিজের দখলে আনা ভদ্রলোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না।"

দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের এই পরিপূর্ণ চিত্রটি পেয়ে আমি সাময়িকভাবে কৃতার্থ বোধ করলাম। এই মহান নেতার জীবন সম্পর্কে এখন আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আমি আর এ বিষয়ে গণপতিবাবুর সঙ্গে আলোচনাও করতে চাই না—নতুন কথা থেকে আবার নতুন কী খবরের আলোকে প্রয়াত প্রতুল বিশ্বাস উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন তার ঠিক নেই।

আমি এবার গণপতিবাবুর সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। থ্যাকারে ম্যানসনে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব—অনাগত কোনো বিপদের অস্পষ্ট ইঙ্গিতও যেন দূর দিগন্তে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই অবস্থায় চন্দ্রোদয় ভবনের বিলাসিনী দেবীর সমস্ত খবরাখবর আমার বিশেষ প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে একমাত্র গণপতিবাবুই আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।

কিন্তু গণপতিবাবু এই মুহূর্তে মচমচে মুড়ি ও হাতে-গরম সিঙাড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। কোনো সিরিয়াস ব্যাপারে তিনি যেন নাক গলাতে এখন প্রস্তুত নন।

মুড়ি চিবোতে-চিবোতে গণপতিবাবু উপদেশ দিলেন, "প্রতুল বিশ্বাস সম্বন্ধে যা বললাম সব ভুলে যাও। আমি হচ্ছি সম্পত্তির ডাক্তার—শক্ত রোগ পেলে তার চিকিৎসা করি। কেন রোগ হলো তার নৈতিক দিক নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের উচিত নয়।"

আরও একখানা সিঙাড়া মুখে পুরে দিলেন গণপতিবাবু। বললেন, "তা ছাড়া উপায় নেই, ভাই। ন্যায়-অন্যায়ের অঙ্কে জড়িয়ে পড়লে এ-লাইন থেকে বিদায় নিয়ে বনবাসী হওয়া ছাড়া গণপতি সামন্তর কোনো উপায়

থাকবে না।"

গণপতি এবার দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকালেন। মুড়ি খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে দিয়ে বললেন, "এতো কাছাকাছিই যখন এসে গিয়েছি তখন একবার মিস্টার ভরত সিং-এর খোঁজ করি। ওঁর সঙ্গে কিছু জরুরী আলাপ আলোচনা আছে।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং লোক এই মিস্টার ভরত সিং", টেলিফোনে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করবার আগে মন্তব্য করলেন গণপতিবাবু।

ডায়াল করতে করতে গণপতিবাবু বললেন, "জার্মান ক্ষুরের মতো ধারালো বুদ্ধি! এই ক'দিন একসঙ্গে কাজ করেই কিছু কিছু নমুনা পেলাম।"

"হ্যালো, হ্যালো মিঃ ভরত সিং? আমি গণপতি বলছি।...হ্যাঁ আমি আপনার খুব কাছে থেকেই ফোন করছি—থ্যাকারে ম্যানসন। হ্যালো, হ্যালো আমি পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আপনার ওখানে চলে যেতে পারি।...হ্যালো, কী বললেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ মিস্টার শংকর, ওঁর অফিসেই আমি বসে আছি।...ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন। তবে কোনো দরকার ছিল না।"

গণপতিবাবু এবার টেলিফোন নামিয়ে দিলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন "এই সব বুদ্ধিমান লোকের মতলব বোঝা মুশকিল। থ্যাকারে ম্যানসনের নাম শুনে বললেন, তিনি নিজেই গাড়ি নিয়ে আসছেন। আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। আমি আপত্তি করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না।"

গণপতিবাবু বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান এই ভরত সিং। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের থেকেও মালিকের প্রতি বিশ্বস্ত। নাগরচাঁদ সুরজলালের এই বরুণা প্রপার্টিজ ভরত সিং ছবির মতো চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং অন্য নতুন দায়িত্বটা টপাটপ নিচ্ছেন।"

"প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপো খুব লাকি—এমন পার্টির সাহায্য পেয়ে যাচ্ছেন," মন্তব্য করলেন গণপতিবাবু।

গণপতিবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, "এদের কাজের ধারাই আলাদা। প্রতুল বিশ্বাসের প্রপার্টির জন্যে সব কিছুই করছে, কিন্তু কখনও স্টেজে অ্যাপিয়ার করছে না। আমরা কারুর জন্যে কিছু করলে, তা সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র রটিয়ে বেড়াই। কিন্তু মিস্টার ভরত সিং-এর মুখে যেন গোডরেজের অটোমেটিক চাবি লাগানো আছে—একটি দরকারি খবর অসাবধান মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বার চান্স নেই।"

"মাননীয় প্রতুল বিশ্বাসের প্রতি এমন সহৃদয়তার কারণ কী?" আমি এবার গণপতির কাছে জানতে চাই।

"নিশ্চয় অনেক উপকার করে গিয়েছেন—না হলে, মৃত্যুর পর এইভাবে ভাইপোকে ওঁরা সার্ভিস দিয়ে যাবেন কেন?" গণপতিবাবু নিজের বিদ্যে-বুদ্ধিমতো উত্তর দিলেন।

এবার একটু মাথা চুলকোলেন গণপতিবাবু। বললেন, "শুধু পাস্ট টেন্স নিয়ে মাথা ঘামালে বিজনেসম্যান হওয়া যায় না। ফিউচার টেন্সের কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন গণপতিবাবু। কিন্তু ঠিক সেই সময় আমাদের অফিস ঘরের পাশেই মোটরের হর্ন বেজে উঠলো।

আওয়াজ শুনেই গণপতিবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, "এই স্পেশাল আওয়াজ ভরত সিংজীর গাড়ি ছাড়া হতেই পারে না।"

পরম সমাদরে গণপতিবাবু এই বিশিষ্ট অতিথিকে আমার আপিস ঘরে নিয়ে এলেন। হর্নের প্রশংসা শুনে ভরত সিংজী বহোত খুশী হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করলেন, ওঁর গাড়ি কিছু ইস্পেশাল নয়—অর্ডিনারি কার, তবে নিজের পছন্দ মতো মল্লিকবাজারের চোরাই ইস্টক থেকে একটা ইস্পেশাল হর্ন তিনি ফিট করিয়ে নিয়েছেন।

"খুব ভাল কাজ করেছেন, মিস্টার সিং—এ-যুগে ভেঁপুই তো সব," ভরত সিংজীর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করলেন গণপতিবাবু।

এই ইস্পেশাল ভেঁপুর সুর গর্ভধারিণী জননীকে শোনাবার ইচ্ছে ছিল ভরত সিংজীর—কিন্তু তাঁর জীবিতকালে সুযোগ্যপুত্র হিসেবে তাঁকে রিকশায় পর্যন্ত চড়াতে পারেননি ভরত সিংজী।

গণপতিবাবু এবার আমার সঙ্গে ভরত সিং-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিনয়ে বিগলিত ভরত সিং বললেন, "আমার কী দুর্ভাগ্য, আপনার মতো লোকের সঙ্গে এতোদিন আলাপের সুযোগ হয়নি।"

"আমার ভাইয়ের মতো এই ছেলেটি। দেখবেন একে।" গণপতিবাবু যথারীতি আমার সম্পর্কে ভরত সিংজীর স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণের আয়োজন করলেন।

"গণপতিবাবুর ব্রাদার মিনস মাই ব্রাদার"—ভরত সিংজী এবার আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ওঁকে আপ্যায়নের চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভরত সিং বললেন, "চা কফি পানের ইচ্ছা হলে একবার বরুণা প্যালেসে পদধূলি দিন। টোয়েণ্টি-ফোর আওয়ার টি কর্ণার তো খোলাই রয়েছে।"

আমরা এখন ওই দোকানে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ভরত সিং পকেট থেকে একখানা ভিজিটিং কার্ড বার করে ফেললেন। বললেন, "এখনকার মতো ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু পরে যেতেই হবে।"

উনি কখন ওখানে থাকবেন তা জানা প্রয়োজন। কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠলেন ভরত সিং। তাঁর থাকা-না-থাকার ওপর কিছুই নির্ভর করছে না। ওই কার্ড দেখালেই টোয়েণ্টি-ফোর আওয়ার টী কর্ণারে সব কিছু ফ্রি হয়ে যাবে। ভরত সিং বললেন, একদম শাই ফিল করবেন না।

গণপতিবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, "রেখে দাও। হোটেলেও যে ফ্রি পাশ আছে, এতোদিন বিভিন্ন লাইনে কাজ করেও খবরটা আমার জানা ছিল না।"

আঁটসাঁট গাঁট্টাগোঁট্টা লরি-টায়ারের মতো চেহারা থেকে বুদ্ধিমানের হাসি বেরিয়ে এলো। ভরত সিং বললেন, "আপনাকে মিথ্যে বলবো না। আমার

কার্ডের সাইজ দেখে বেয়ারা বুঝে নেবে কতখানি আপ্যায়ন করতে হবে। বড় কার্ড হলে, গেস্টকে ওরা বরুণা প্রপার্টিজ হোটেল রুমে ফ্রি থাকবার জন্যে রিকোয়েস্ট করবে। মাঝারি কার্ডে ফ্রি লাঞ্চ আর ডিনার উইথ ড্রিংকস, আর ছোট কার্ডে টী অ্যান্ড স্নাকস।"

ভরত সিংজী এবার বিজনেসের কথা তুললেন। "এক্সকিউজ মি, কিছু মনে করবেন না শংকরসাব, গণপতিবাবুর সঙ্গে কিছু কাজ সেরে নিতেই হবে।"

গণপতিবাবু এবার প্রতুল বিশ্বাসের বেনামা সম্পত্তির তালিকা হুড় হুড় করে বলে যেতে লাগলেন। "এইসব সম্পত্তির ব্যবস্থা রাতারাতি হয়ে গিয়েছে—কোনো বেনামদার যাতে টুঁ শব্দটি না করতে পারে তার জন্যে স্পেশাল স্টেপ নেওয়া হয়েছে।

ভরত সিংজী তবুও যেন পুরোপুরি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। গণপতিবাবু বললেন, "কিছু ভাববেন না। প্রতুল বিশ্বাস মহাশয়ের যা প্রাণের ইচ্ছা ছিল তাই হচ্ছে—প্রিয় ভাইপোটি এখন বংশপরম্পরায় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ওইসব সম্পত্তি ভোগ দখল করবেন এবং আস্তে আস্তে সম্পত্তি বেনাম থেকে স্বনামে নিয়ে আসবেন।"

ভরত সিং-এর পরিপূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে গণপতিবাবু বললেন, "কোনো বেটা বেনামের সুযোগে মাথায় চড়ে বসতে পারবে না। প্রতুল বিশ্বাস মশায় দেশসেবার মাঝে মাঝে পাকা কাজ করে গেছেন। যাদের নামে সম্পত্তি করেছেন, তাদের দিয়ে ব্ল্যাংক কাগজে সই করিয়ে রেখেছেন। একটু বেঁকে বসলেই ওইগুলোতে টাকার অ্যামাউণ্ট বসিয়ে হ্যান্ডনোট করে মামলা ঠুকে দেওয়া যাবে।" প্রয়াত প্রতুল বিশ্বাস নিজেই এই মতলব ফেঁদে গিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে গণপতিবাবু বললেন, "আধা সন্ন্যাসী মানুষের মাথায় এসব বুদ্ধি যে কী করে এলো?"

ভরত সিং কোনো রকম মন্তব্য করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "বাহান্ন নম্বরের কী হলো?"

গণপতিবাবু বললেন, "ওটার এখনও কিছু খবর পাইনি। আজ সকালে যাবো ভেবেছিলাম কিন্তু এখানে আটকে পড়লাম।"

ভরত সিং ওই বাহান্ন নম্বর প্লট সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়লেন। গণপতিবাবু বলতে গেলেন, "বাহান্ন নম্বরে কিছুই নেই—খানিকটা খালি জমি এবং কয়েকটা ঠিকে মাঠকোটা। কোনো পাকা বাড়ি পর্যন্ত নেই।"

ভরত সিং এবার গণপতিবাবুকে নিজের গাড়ি চড়ে একবার বাহান্ন নম্বরের খবরাখবর নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, "আমরা বলছি, আপনি প্লিজ একবার ঘুরে আসুন। শুধু মেডিসিনের ওপর নির্ভর করবেন না, একটু সার্জারির ব্যবস্থা রাখবেন।"

"এখনই আসছি, বলে গণপতিবাবু গাড়ি চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এবং আমি মেডিসিন এবং সার্জারির রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভরত সিং আমাকে সস্নেহে বকুনি লাগালেন, "কী রকম 'মেনজার' আপনি, মেডিসিন সার্জারি জানেন না?" এরপর ভরত সিং ব্যাখ্যা করলেন, "মেডিসিন হলো ক্যাশ টাকা। কিন্তু শুধু ঘুষে সব সময় হয় না—তখন সার্জারি অর্থাৎ গুন্ডামি। কাটাকুটি মাথা ফাটাফাটির ভয়ে অনেকে শান্ত হয়ে যায়।

ভরত সিংজী জানালেন তিনি রেগুলার গীতা পড়েন, যখন যে কাম

প্রয়োজন তা করতে তিনি দ্বিধা করেন না।

ভরত সিং এবার বললেন, "গণপতিবাবু বড় 'সিমপল' মানুষ আছেন। পাকা বাড়িগুলোর ওপর স্পেশাল নজর দিয়েছেন, অথচ বাহান্ন নম্বরকে দেখেননি।"

ভরত সিং হাসতে হাসতে জানালেন, কলকাতা শহরের অঙ্কই পাল্টে গিয়েছে। আগে এখানে মানুষের দাম বেশী ছিল, এবং খালি জমির দাম কম ছিল। এখন মানুষের দাম যত কমছে জমির দাম তত বাড়ছে। গণপতি-বাবু বুঝছেন না, বাহান্ন নম্বরের গোটা কয়েক টিনের বাড়ি ভাঙতে পারলেই সব জমি খালি হয়ে যাবে, তখন ওখানে উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি উঠতে পারে, অনেক দাম পাওয়া যাবে। ওই বাহান্ন নম্বরে একখানা দোতলা বাড়ি থাকলে, ভাড়াটে তোলাই যেতো না, সম্পত্তির কেনো বাজার-দর থাকতো না।

ভরত সিং এবার পকেট থেকে একটু খৈনি বার করে দাঁতের মাড়িতে গুঁজে দিলেন। ভাবনানি ম্যানসনের দারোয়ানী জীবনে অনেক উন্নতি করেছেন। কিন্তু পুরনো এই নেশাটি ছাড়তে পারেননি। ভরত সিং বললেন, বড় বড় মিটিংএ বহুক্ষণ সময় কাটাতে ওঁর তাই খুব কষ্ট হয়। বাথরুমে বেরিয়ে এসে খৈনি নিতে বাধ্য হন, কিন্তু খৈনিতে মুখ বোঝাই থাকায় মিটিংয়ে আর কথা বলতে পারেন না—মুখ বুজে শুধু শুনেই যেতে হয়।

ভরত সিং এবার থ্যাকারে ম্যানসন সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হাতে যখন সময় রয়েছে, তখন বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে নিলেন ভরত সিং। তারপর আফসোস করলেন। পুরনো দিনের বড়লোকদের কোনো দূরদৃষ্টি ছিল না। থাকলে, এই জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখে দিতেন, কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসন তুলতেন না!"

মস্ত বড় লোক এই ভরত সিং, নিজের ক্ষমতার জোরে দারোয়ান থেকে ম্যানেজার এবং ম্যানেজার থেকে নাগর চাঁদ সুরজলালের রেসিডেণ্ট ডিরেকটর হয়েছেন। কিন্তু কী সব আজগুবি কথা বলছেন তিনি?

ভরত সিং বললেন, "ফাস্ট ক্লাশ জমিতে সেকেলে বাড়ি দেখলেই আমার মেজাজ আজকাল খারাপ হয়ে যায়, শংকরসাব।"

পুরনো শহরে পুরনো বাড়ি তো থাকবে।

কিন্তু ভরত সিং ওসব কথা কানেই তুলতে চান না। তিনি আমাকে এবার একটা শক্ত কোশ্চেন করে বসলেন। "জমির সঙ্গে বাড়ির কী তফাৎ বলুন তো?"

জমির ওপরেই বাড়ি হয় জানি। হাঁড়ি আর সরা, স্বামী আর স্ত্রী, জমি আর বাড়ি—এরা মেড ফর ইচ আদার।

ভরত সিং ওসব রসিকতায় মন দিলেন না। বললেন, "আপনাকে একটা খুব সিক্রেট কথা বলে দিচ্ছি। এই সিক্রেটের ওপরেই কলকাতায় অনেকে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।"

কী এমন গোপন খবর? আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। ভরত সিংজী খৈনির রস সামলে বললেন, "জমির কখনও বয়স বাড়ে না, কিন্তু বাড়ি বুড়ী হয়ে যায়। বুড়ীকে ভাগিয়ে আবার ছুকরী বাড়ি তোলো, জমি কোনো আপত্তি করবে না!"

ভরত সিং-এর শ্রীমুখনিঃসৃত এইসব বাণী আমাদের কাছে অমৃত সমান।

দীর্ঘদিন ধরে ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের গহন অরণ্যে গোপনে বিচরণ করে তিনি এইসব অমূল্য সত্য আবিষ্কার করেছেন · ক-মাসের জন্য এই থ্যাকারে ম্যানসনে উড়ে এসে জুড়ে বসে তাঁর বাণীকে উড়িয়ে দেবার আমি কে ?

ভরত সিং খৈনির রস কিছুটা গলাধঃকরণ করে বললেন, "শালা গোর'মণ্ট এবং মামলাবাজ ভাড়াটিয়া না থাকলে এই ক্যালকাটা সোনার ক্যালকাটা হয়ে যেতো!"

জমিজমা সম্পর্কে ভরত সিং-এর অমৃতবাণী আমি নীরবে শ্রবণ করে যাচ্ছি।

ভরত সিংজী আবার ফার্স্টক্লাশ জমিতে সেকেলে বাড়ির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। "গাড়ি চড়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাবার উপায় নেই। চোখ বন্ধ করে রাখতে হয়। দু-দিকে ফার্স্ট ক্লাশ জমির ওপর থার্ড ক্লাশ প্রপার্টি। এসব প্রপার্টিতে সোনা ফলা উচিত ছিল—দেখলেই আমার মাথা ধরে যায়, অথচ যাদের সম্পত্তি সেই সব বাঙালীবাবুদের কোনো খেয়ালই নেই।"

ভরত সিং আমাকে অঙ্কটা সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। "ফার্স্ট ক্লাশ জমির ওপর সেকেলে বাড়ি মানেই সেকেলে ভাড়াটে। সেকেলে ভাড়াটে মানেই মান্ধাতার আমলের মাসিক ভাড়া। হাজার হাজার স্কোয়ারফুট জায়গা দখল করে বসে থাকবে অথচ ঘর রং করবার মতো পয়সাও বার করবে না। অথচ এরা বাড়ি ছাড়বেও না। ফসলে যেমন পোকা হয়, তেমনি বাড়িতে ভাড়াটে—সোনার সম্পত্তি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, পোকার জন্যে কোনো দাম থাকে না।"

বিজ্ঞের মতো হাসতে লাগলেন ভরত সিং। "জমির দাম যদি লাখ টাকা হয়, তার ওপরে ভাড়াটে বাড়ি থাকলেই দাম কমে দশ হাজার হয়ে যায়! কখনও কখনও আরও কম—ভাড়াটিয়াব এমনই মাহাত্ম্য। পুরনো ভাড়াটিয়ার নাম শুনলেই যে ভরত সিংজীর পিত্তি জ্বলে ওঠে তা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

থ্যাকারে ম্যানসনের সমস্ত খবরাখবরই ভরত সিংজী আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে ফেললেন। আমার প্রত্যাশা, ওঁর কাছ থেকে কিছু মূল্যবান উপদেশ পাওয়া যাবে।

ভরত সিং এবার থ্যাকারে ম্যানসনের মালিকের খবরাখবর নিলেন। বিলাসিনী দেবী সম্পর্কে যতদূর যা শুনেছি তা অকপটেই আমি বর্ণনা করে গেলাম। বিলাসিনী দেবীর বর্তমান দুঃখের পিছনে যে ভাবনানি ম্যানসনের ভরত সিং-এর কিছুটা দান আছে তা বোধ হয় ওঁর স্মরণে রাখা উচিত।

ভরত সিং কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। বললেন, "ওঃ! মিস্টার বারিকের কথা বলছেন? মিস্টার বিপুল বারিক আমার কাছে ভাবনানি ম্যানসনের ছোট রুম চেয়েছিলেন, আমি দিয়েও ছিলাম। কিন্তু ওখানে উনি কী করবেন, কাকে নিয়ে আসবেন তা আমি কী করে জানবো?" ভরত সিং ব্যাপারটাকে প্রায় উড়িয়ে দিয়ে, চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর খবরাখবর নিতে লাগলেন।

চন্দ্রোদয় ভবন এবং আমার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওই বাড়ির মালিকদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। যতটুকু খবর রাখি তা নির্দ্বিধায় ভরত সিংকে জানিয়ে দিলাম।

ভরত সিং এবার হঠাৎ নিজের নির্ধারিত প্রোগ্রাম পাল্টে ফেললেন। একটা

ট্যাক্সির দরজা খুলে আচমকা অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে বললেন, "গণপতিবাবুকে আমি মাঝ রাস্তায় ধরে নিচ্ছি, আপনি ভাববেন না।"

গণপতিবাবুকে বোধ হয় ধরা ভরত সিং-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ একটু পরেই ভরত সিং-এর গাড়ি নিয়ে গণপতিবাবু আমার অফিস ঘরে ফিরে এলেন।

ভরত সিং চলে গিয়েছেন শুনে গণপতিবাবু মোটেই আশ্চর্য হলেন না। বললেন, "ওইটাই ওদের স্বভাব। যা বলবে ঠিক তার উল্টো করবে।"

গম্ভীর হয়ে গণপতিবাবু বললেন, "যেভাবে কথাবার্তা বললো তাতে মনে হলো প্রতুল বিশ্বাসের ভাইপোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। অথচ সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। বিশ্বাস মশায়ের ভাইপোর ঘাড়ে বন্দুক রেখে ওই বাহান্ন নম্বর প্লটখানা সিংজী নিজেই হজম করতে চাইছেন। একান্ন এবং তিপ্পান্ন নম্বর প্লট ইতিমধ্যেই ওঁরা কিনে রেখেছেন। বাহান্ন নম্বর জমিখানা কোনোক্রমে হাতে এলেই আর কোনো অসুবিধা থাকে না—মনের সুখে বিরাট ফ্ল্যাট-বাড়ি তোলা যাবে।"

গণপতিবাবু বললেন, "আমার কাছে প্রতুল বিশ্বাসও যা সুরজলাল নাগরচাঁদও তাই—ওরা আমার ফি যখন দিচ্ছে তখন কোনো কিছু বলবার নেই। কিন্তু বাবা, একটু ঝেড়ে কাশো, অত চাপা-চুপি দিয়ে, সামনে শিখণ্ডি খাড়া করে রাখলে কী করে অংকটা বুঝবো?"

গণপতিবাবুর অনুপস্থিতিতে আমার সঙ্গে ভরত সিং-এর কী কথা-বার্তা হয়েছে তার বিবরণ শুনে গণপতিবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। গম্ভীর-ভাবে বললেন, "ব্যাপারটা ভাল করলে না, শংকর। ভিতরের সব কথা ওই ভরত সিংকে বলতে গেলে কেন?"

কথাবার্তা আমি সরল মনেই বলেছি। কিন্তু গণপতিবাবু সন্তুষ্ট হলেন না। "এসব লোককে মোটেই বিশ্বাস নেই। কোনো কিছু না জেনেই বিপুল ব্যারিক এবং পমাকে সে রাত্রে ওঁরা ঘর দিয়েছিলেন তা হতেই পারে না। এখন আবার এইসব খবর নিয়ে গেলো, কেন কে জানে!"

গণপতিবাবু একটু চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ভরত সিং-এর গাড়িখানা যখন রয়েছে তখন একটু নর্থ ক্যালকাটা ঘুরেই আসি। চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে কয়েকদিন হলো যোগাযোগ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, পমার ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে উঠেছে। রাজরানী হয়েও বিলাসিনী দেবী সমস্ত জীবন এক বিন্দু শান্তি পেলেন না।"

বিলাসিনী দেবীর খবরাখবর যথাসময়ে গণপতিবাবুর কাছে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভরত সিং-এর ব্যাপারে আমার চিন্তা হচ্ছে। গণপতিবাবুর মতো মানুষ যখন কিছু আশংকা করছেন, তখন ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

কেন আমি বোকার মতো ওঁর সঙ্গে এতো কথা বলতে গেলাম? আমি নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

আমি এবার একটু শান্তি চাই। থ্যাকারে ম্যানসনের সীমাহীন সমুদ্রে আমি যেন দিশাহারা নাবিকের মতো ভেসে চলেছি। এ-বাড়িতে কোনো হাঙ্গামায় আমি আর জড়িয়ে পড়তে রাজী নই। আমার একমাত্র লক্ষ্য এখন

বিলাসিনী দেবী। চন্দ্রোদয় ভবনের নির্দেশমালার ওপরেই আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ভর করছে—আমি সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু কী কুক্ষণে যে এই শকুন্তলা চাওলা ও মিসেস পপি বিশোয়াসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল! এঁরা কিছুতেই আমাকে দুদণ্ডের শান্তি ভোগ করতে দেবেন না।

তেলকালিবাবু একবার আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "মাঝবয়সী এই সব মহিলা থেকে শত হস্তে দূরে থাকবেন, স্যার। ভুলেও এদের সঙ্গে হাসি-মুখে কথা বলবেন না।" তখন সেই মহামূল্যবান উপদেশের মর্ম বুঝিনি, এখন অবশ্যই আমাকে তার মূল্য দিতে হবে।

শকুন্তলা চাওলা আমাকে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানিয়ে যাচ্ছেন। আমি নানা কাজের অছিলায় সেই নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যাচ্ছি। নিমন্ত্রণের আসরে মিসেস শকুন্তলা চাওলা কী প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন তা আমার অজানা নেই।

শ্রীমান মদনাও আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সে বলে, "ক্যালকাটার কত টপ লোক আমাদের ওখানে আসছেন! বড় বড় পুলিস অফিসার মিসেস চাওলার সঙ্গে ডিনার করতে পারলে ধন্য হয়ে যান, আর আপনি এ-বাড়িতে থেকেও ডিনারে আস-বার সময় পাচ্ছেন না!"

মদনা বলে, "আর ক'টা মাস, স্যর! তারপর আমার কোনো চিন্তাই থাকবে না। ক্যালকাটার সব টপ অফিসারদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যাবে, তখন দিনে ডাকাতি করলেও থানার দারোগাবাবুরা খাপ খুলতে সাহস পাবেন না।"

মদনা এবার ভিতরের খবর দিলো। "আপনি স্যর খান-না-খান মেম-সায়েবের নেমন্তন্ন রিফিউজ করবেন না। চাওলা মেমসায়েবের খুব প্রেস্টিজ-জ্ঞান। ওঁর নেমন্তন্ন কলকাতা শহরের কেউ বারবার রিফিউজ করবেন তা উনি ভাবতেই পারেন না। মেমসায়েবের অভিমান, বুঝতেই পারছেন স্যর।"

এদিকে মিসেস পপি বিশোয়াসও বসে নেই। তিনিও সহদেব মারফত দুদিন হাতে-লেখা আহ্বানপত্র পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, "মিস্টার শংকর, পপি এখনও মরে নি। দয়া করে একবার প্যায়ের ধুলো দেবেন।"

কিন্তু পপি বিশোয়াস থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকতে চাই। এক প্রতুল বিশ্বাসের কেসেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু দূরে থাকবো বললেই সব সময় দূরে দূরে থাকা যায় না। একদিন দুপুরে যখন সামান্য দিবানিদ্রার আয়োজন করছি তখন হুড়মুড় করে মিসেস পপি বিশোয়াস আমার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

পপি বিশোয়াসের মুখের সেই শুকনো শুকনো ভাব কেটে গিয়েছে। তিনি আবার সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তাজা হয়ে উঠেছেন।

"কী মিস্টার শংকর, পপি কী দোষ করেছে, যে চিঠির উত্তরও দিলেন না?" পপি বিশোয়াস বোধ হয় বুঝেই নিয়েছেন যে অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

আত্মগরবে গরবিণী পপি বিশোয়াস বললেন, "মনে হচ্ছে আড়ি করে দিয়েছেন? আমিও তো মিস্টার জগদীশ জেঠমালানির সঙ্গে সারা জন্মের মতো আড়ি করে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম কই?"

জগদীশ জেঠমালানি যে আবার পপি বিশোয়াসকে আয়ত্তের মধ্যে এনে

ফেলেছেন তা আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু কীভাবে তিনি কাজ সমাধা করলেন?

পপি এবার মাথা দুলিয়ে বললেন, "জগদীশবাবুকে আমি সেদিন সাফ বলে দিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না, মিস্টার জেঠমালানি। আপনার পার্টিকে এনটারটেন করতে গিয়ে আমাকে ফাঁসির আসামী হতে হচ্ছিল।"

জগদীশবাবুর উত্তরটাও এবার শুনিয়ে দিলেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "খুব চালাক লোক এই মিস্টার জেঠমালানি। একটুও চটলেন না—মেজাজখানা ঠিক কচি শশার মতন, কিছুতেই গরম করতে পারবেন না। জগদীশবাবু বললেন, মিসেস বিশোয়াস, স্বীকার করছি, প্রতুল বিশ্বাসকে এখানে পাঠিয়ে আমি খুব অন্যায় করেছি। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে, মেডিক্যাল এগজামিন না-করিয়ে কোনো গেস্টকে এখানে পাঠাতাম না। কিন্তু আমার হাতে কতটুকু ক্ষমতা বলুন?"

মিসেস বিশোয়াস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তবুও মুখ হাঁড়ি করে বসেছিলাম। মিস্টার জেঠমালানি খুবই চালাক লোক। কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন, তারপর বললেন, আমারও এই কেসে কম ভোগান্তি হয়নি। একটু প্রাইভেটলি রিল্যাক্সড্ হতে এসে কারুর যে হার্ট-অ্যাটাক হতে পারে তা বিজনেস সার্কেলে কে শুনেছে বলুন?"

মিসেস বিশোয়াসের তবু মানভঞ্জন হয় না। তখন জগদীশ জেঠমালানি বলেছিলেন, "আপনাকে ট্রাবল দিয়েছি, কিন্তু আপনাকে বিপদে ফেলে রেখে পালাইনি। শেষ পর্যন্ত হায়েস্ট মহলে কলকাঠি নেড়ে প্রবলেম সল্‌ভ করেছি।"

"এ-কথা আপনিও অস্বীকার করতে পারবেন না, মিস্টার শংকর", এবার মৃদু ব্যঙ্গ করলেন মিসেস বিশোয়াস। "আপনার ওই গণেশ সরকার আর তো হাতকড়া নিয়ে ফিরে আসেনি।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "তখন আমিও মনের যন্ত্রণায় কান মলে বলেছিলাম, আর গাব খাবো না, গাবতলাতে যাবো না।" কিন্তু গলায় আটকে যাওয়া গাব নেমে যাওয়ার পরেই রাগ কমে গেলো। তখন আবার জেদ ফিরে এলো—গাব খাবো না তো খাবো কী? গাবের মতো আছে কী?" খিল খিল করে হেসে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আমি কিন্তু আর গাবতলায় যেতে চাই না। মিসেস বিশোয়াস বললেন, "মিস্টার জেঠমালানি অবশ্য বলেছিলেন তেমন দরকার হলে উনি ভাবনানি ম্যানসনে একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু হঠাৎ আমারও জেদ চেপে গেলো। যে আমাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল তার প্রতিশোধ না-নিয়ে আমি এই থ্যাকারে ম্যানসন ছাড়ছি না। যে অপমান আমাকে করা হয়েছে তার একটা বিহিত না-করলে আমার নাম পপি বিশোয়াস থাকবে না—আমাকে আপনারা পাঁচি বলে ডাকবেন!"

মিসেস বিশোয়াস আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি এখন এখানেই দু'একজন গেস্ট অ্যাকসেপ্ট করছি। কিন্তু ভয় নেই মিস্টার শংকর—আপনাকে আবার আমার সঙ্গে গাবতলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছি না। আপনার সঙ্গে আমার অন্য কাজ আছে। হাইলি কনফিডেনশিয়াল কিন্তু।"

আমি মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আপনি আমার গা ছুঁয়ে বলুন, কাকপক্ষী পর্যন্ত একথা টের পাবে না। তবে আমি মুখ খুলবো।"

গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করতে আহ্বান জানানোর ব্যাপারটা মিসেস পপি বিশোয়াসের মুদ্রাদোষের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ইতিপূর্বে টেলিফোনেও তিনি অনেকবার এই ধরনের কথা বলেছেন।

সুতরাং, ওঁর কথায় বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। কিন্তু এবার মিসেস বিশোয়াস বেশ সীরিয়াস। মাথা নেড়ে ঘোষণা করলেন, কিছুতেই ছাড়ছি না এবার। এমন গোপন ব্যাপার যে দিব্যি না-করা পর্যন্ত মুখ খুলছি না।"

মিসেস বিশোয়াস এবার নিজের হাতখানা টেবিলের ওপর এগিয়ে দিলেন। "এই কড়ে আঙুলটা ছুঁয়ে বলুন, একটি কথাও আপনার মুখ থেকে বেরুবে না।"

এই মহিলার হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই! অগত্যা ওঁর কথা মতো মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হলো।

খুব খুশী হলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "এ-ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না মিস্টার শংকর। আর একজনের কাছে আমাকে এই-ভাবে শপথ করতে হয়েছে। কী ভীষণ বুদ্ধি তার। সে কী করলো জানেন ?"

মিসেস বিশ্বাস এবার দ্রুতগতিতে তাঁর ব্যাগ থেকে একখানা ফটো বার করে ফেললেন! "আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডের এই ছবি ছুঁয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে যে ব্যাপারটা ভীষণ কনফিডেনশিয়াল থাকবে।"

কবেকার কোন পুরুষ যাঁর সঙ্গে কত বছর ধরে কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি যে আজও মিসেস বিশোয়াসের জীবনে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার আছেন তা আমার জানা ছিল না। মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ওঁর ছবি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে আমার খুব ভয় হচ্ছে। কারুর ছবি অথবা গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে সেই প্রতিজ্ঞা না রাখলে কী হয় জানেন তো ?"

কী আর হতে পারে ? আমি বিপদটা আন্দাজ করতে পারছি না।

উদ্বিগ্ন মিসেস বিশোয়াস কাতরভাবে বললেন, "যাকে ছুঁয়েছেন তার খুব ক্ষতি হতে পারে—এমন কি মৃত্যু ঘটতে পারে। আমার ছোটমাসী তো এইভাবেই মারা গিয়েছিলেন। আমি বাবা কোনো রিস্ক নিতে রাজী নই—মুখ খুলবার আগে তাই আপনাকে দিয়েও দিব্যি করিয়ে নিলাম। কোনো ত্রুটি হলে আমারও মৃত্যু হবে তা হলে।"

মিসেস বিশোয়াস এবার বোকার মতো হেসে উঠলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওঁকে ভীষণ অসহায় মনে হলো। কিন্তু তারপরেই তিনি পুরনো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। ব্যাগ থেকে শেষ সিগারেট মুখে লাগিয়ে প্যাকেটখানা অবহেলাভরে হাতের মুঠোর মধ্যে মুচড়ে দুমড়ে বিধ্বস্ত করলেন ; কাছাকাছি কোনো ওয়েস্টপেপার বাস্কেট খুঁজে না পেয়ে ওটিকে মেঝেতে ফেললেন এবং তখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের হাই-

হিল জুতোর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত চাপ ওই কাগজের বল-এর ওপর প্রয়োগ করলেন।

মিসেস পপি বিশোয়াস যে তাঁর ইস্পাতের নার্ভ ফিরে পেয়েছেন তা ওঁর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার স্টাইল দেখেই বোঝা গেলো। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "তাহলে বিজনেসের কথাগুলো হয়ে যাক, মিস্টার শংকর।"

কাজের কথা শুনতে আমি অবশ্যই প্রস্তুত। মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আপনার তো অনেক লাইনে অভিজ্ঞতা। সেই জন্যেই আপনার সাহায্য চাওয়া!"

এখনও প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে দ্বিধা দেখাচ্ছেন মিসেস বিশোয়াস। এবার তিনি কিছু ইঙ্গিত দিলেন, "আপনি তো এক সময়ে হাইকোর্টে কাজ করতেন. ও-পাড়ার নাড়ি নক্ষত্র তো আপনার জানা।"

"অতোটা না-হলেও কিছুটা আমার জানা-শোনা" আমি ব্যাখ্যা করি।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "একজন বড় ব্যারিস্টারকে খুব আর্জেণ্টলি প্রয়োজন। নাম বলুন তো।"

ব্যারিস্টাররা বার অফ ইংলণ্ডের সভ্য—তাঁরা সাধারণত অ্যাটর্নি অথবা অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে ছাড়া সাধারণ মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না।

মিসেস বিশোয়াস ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না। "রাখুন রাখুন ওসব কথা। ভাল লোক হলে অবশ্যই তাঁর কাছে সোজাসুজি যাওয়া যাবে। আপনি শুধু নামটা বলুন বাকিটা এই পপি বিশোয়াস ম্যানেজ করবে।"

আমি আবার সমস্যায় পড়লাম। "মিসেস বিশোয়াস, ব্যারিস্টার অনেক রকমের হয়।"

"সে তো জানি, ভাল ব্যারিস্টার, খারাপ ব্যারিস্টার, খুব খারাপ ব্যারি-স্টার," ফোড়ন দিলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

"আমি সে-কথা বলছি না। মামলার বিষয় অনুযায়ী ব্যারিস্টার পাল্টাতে পারে। ব্যাপারটা ডাক্তারের মতো। প্রথমেই জানতে হবে—মেডিসিন না সার্জারি। হাইকোর্ট পাড়ায়—দেওয়ানি না ফৌজদারি। মেডিসিন এবং সার্জারির যেমন ডজন ডজন স্পেশাল বিভাগ আছে, তেমনি আইন পাড়াতেও আজকাল বহু রকমের স্পেশালিস্ট। যিনি আয়কর আইনে বিশেষজ্ঞ তিনি বিবাহ সংক্রান্ত মামলায় হয়তো মাথা ঘামাবেন না। যিনি শ্রমিক আইনে স্পেশালিস্ট তিনি হয়তো ট্রেড মার্ক অথবা পেটেণ্ট কেসে ভাল করবেন না।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "উঃ, আমি ট্রেডমার্ক নিয়ে কী করবো—আমাদের এ লাইনে ট্রেডমার্ক বা পেটেণ্ট কিছুই নেওয়া যায় না, সবাই নিজের কপালগুণে করে খায়।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস বিশোয়াস। বললেন, "শুনুন, মিস্টার শংকর। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস—একটা কম বয়সী মেয়ের ভাগ্য এর ওপর নির্ভর করছে। ব্যাপারটা সিভিল না ক্রিমিন্যাল দাঁড়াবে তাও জানি না। আপনি একজন ভাল মানুষ ব্যারিস্টারের নাম করুন—যিনি মেয়েটার সমস্যা বুঝবেন, তার কথা মন দিয়ে শুনে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন।"

"সিভিল এবং ক্রিমিন্যালের মধ্যে অনেক পার্থক্য, মিসেস বিশোয়াস," আমি পপিকে মনে করিয়ে দিলাম।

"তাই বুঝি?" আকাশ থেকে পড়লেন তিনি। "আমি তো দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎই দেখি না। এই তো আমার সঙ্গে আমার ফার্স্ট হাজবেণ্ডের সম্পর্ক ঃ

ডাইভোর্সটা সিভিল ব্যাপার হলো। কিন্তু স্বামী বেঁচে থাকতে হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর খুইয়ে আমি যে লাইনে চলে এলাম, সেটা নাকি ক্রিমিন্যাল ব্যাপার হয়ে গেলো অথচ ব্যাপারটা বিশ্বাসই হয় না—ক্রিমিন্যাল কথাটা শুনলেই গা-টা রি-রি করে ওঠে। ভদ্রঘরের মেয়ে আমরা, ভদ্রভাবে খেটেখুটে দুটো পয়সা রোজগার করছি, দেশের জন্যে অনেক ফরেন একচেঞ্জও 'আর্ন' করছি—এটাকে ক্রিমিন্যাল বললে মেজাজ খারাপ হয় কিনা বলুন?"

যিনি ব্যারিস্টারের সহায়তা চান তিনি কে?"

"না, আমি নই", খিল খিল করে হেসে উঠলেন মিসেস পাপি বিশোয়াস। "যার জন্যে দরকার তার পরিচয় আপনি জানতে পারবেন একসময়, মিস্টার শংকর। আপনারা না-জানা পর্যন্ত সাতকান্ড রামায়ণ শেষ হবে না। তখন বুঝতে পারবেন, বাপ-মা আমার নাম কেন পাপি বিশোয়াস রেখেছিল।"

হাঙগামা না বাড়িয়ে আমি দু'একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের নাম করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "এঁরা খুব ভাল লোক। সরকারী এবং বেসরকারী দুই মহলেই এঁদের যথেষ্ট সুনাম।"

পাপি বিশোয়াস বলেছিলেন, "আপনার একশো বছর পরমায়ু হোক, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। খবরটা যার দরকার তার সঙ্গে এবার যোগাযোগ করতে হবে।" নিজের খেয়ালেই হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, "অতিদর্পে হত লঙ্কা। আমাকে যে বিপদে ফেলেছিল তার কিছুতেই ভাল হবে না, মিস্টার শংকর। পাপি বিশোয়াসকে সে এখনও চেনেনি।"

এর পরের দিনই মদনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ঝকঝকে ইম-পোর্টেড জামাকাপড় পরে শ্রীমান মদনা আমার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলতে এসেছিল।

আমার জন্যে মদনার চিন্তার অন্ত নেই। মদনা বললো, "স্যর, এক আধ-খানা খালি ফ্ল্যাট মিসেস চাওলাকে দিয়ে দিলেই পারতেন।"

এ বিষয়ে কোনো রকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা আমার নেই। মদনা তবু মুখ বন্ধ করলো না। বললো, "আপনার ভালোর জন্যেই বল-ছিলুম, স্যর। এ পাড়ায় গেরস্ত ভাড়াটে আর আসবে না, স্যর। থ্যাকারে ম্যানসন মানেই এখন আমাদের সিলভার ড্রাগন। ওই যে তিনতলায় মিস্টার ঠাকুরের ফ্ল্যাট ছিল। ফিফটিন থাইজেন্ড রুপিজ ক্যাশ দিয়ে ফ্ল্যাটখানা মিসেস চাওলা নিয়ে নিলেন। মিস্টার ঠাকুর এখান থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন।"

খবরটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। মিস্টার ঠাকুরের মতো ভদ্রলোকও যে বেআইনী পথে ভাড়াটিয়া স্বত্ব অন্য কাউকে দিয়ে যাবেন তা আমি আশা করিনি। মদনা একগাল হেসে বললো, "অন্য একজন ওই ফ্ল্যাটের জন্যে দশ হাজার টাকা দাম দিয়েছিল। বড় মেমসায়েব সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ পনেরো হাজার দিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। নগদের নাম নারায়ণ—ক্যাশের সামনে ভদ্রলোক ছোটলোক সব সমান!"

মদনা বললো, "স্যর, আপনাকে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করি—আপনি চাওলা মেমসায়েবের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলুন। আপনার ব্যাপারে মেম-সায়েবের খুব দুঃখু হয়েছে।"

চাওলা মেমসায়েবের রিপোর্টে আমার হাফ-পূর্ববঙ্গীয় রক্ত গরম হয়ে উঠলো। মদনাকে এখনই একটা কড়া কথা শুনিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। কিন্তু তার আগেই মদনা মুখ খুললো।

মাথা চুলকে মদনা বললো, "কাল রাত্রেই বড় মেমসায়েব জামাইবাবুকে বলছিলেন—ওই বাঙালী ম্যানেজারবাবু ভেবেছে কী? এ বাড়ির প্রত্যেক-খানা ঘর আমি নিজের কনট্রোলে আনবো। দেখি ওই ছোকরার কত ক্ষমতা!"

মদনার মুখ এবার অজানা আশংকায় গম্ভীর হয়ে উঠলো। ফিসফিস করে সে বললো, "এরা লোক ভাল নয় স্যর। এরা পারে না এমন কাজ নেই। আমি স্যর, লুকিয়ে চলে এসেছি খবরটা আপনাকে দিতে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন রাজত্ব চালাচ্ছে কে?"

মদনা বললো, "বড় মেমসায়েবই সব। তারপরেই জামাইবাবু। খোদ চাওলা সায়েবের কোনো প্রতিপত্তি নেই। তিনি মেমসায়েবের হুকুম মতো মুখ বুজে কাজকর্ম চালিয়ে যান। মেমসায়েব রেগে গেলে বলেন, তুমি একটা অপদার্থ—গুড ফর নাথিং—আমি হাল না ধরলে এখনও বস্তিতে থাকতে।"

"সায়েব কী বলেন?" আমি জানতে চাই।

মদনা ফিক করে হাসলো। "সায়েব কিছুই বলেন না। মাথা নিচু করে সব কথা হজম করে যান।" মদনা এবার পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের ভাষ্য শুরু করলো। "উপায় নেই স্যর। মেয়েমানুষের রোজগার ভোগ করলে তার গালা-গালিও খেতে হবে। আমাদের কিষটোর নতুন-মা রোজগার করে এবং যখন-তখন কিষটোর বাপকে ঠ্যাঙায়।"

মদনা এবার আরও কিছু ভিতরের খবর দিলো। বললো, "বড় মেমসায়েব না থাকলে এই সিলভার ড্রাগনের বিজনেস কিন্তু একমাসও চলবে না। বড় বড় সব অফিসার তো মিসেস চাওলার খোঁজ করেন, চাওলা সায়েব কিংবা ম্যানেজারবাবুর খোঁজ করেন না। আর উর্বশী দিদিমণির কথাই তো আলাদা। কোনো কাজেই মন নেই। বড় মেমসায়েব তো সেদিন রেগেমেগে বললেন, "তোকে যে-কাজই দিই সে-কাজ হয় না। একটা অর্ডিনারি ছোঁড়ার কাছ থেকে একখানা ফ্ল্যাট পর্যন্ত তুই বার করতে পারলি না।"

ছোট মেমসায়েব কী বললেন জানবার জন্যে আমি মদনার মুখের দিকে তাকালাম। মদনা জানালো, "দিদিমণি কোনো কথাই বললেন না। গম্ভীর হয়ে রইলেন।"

মদনা এবার জানালো, "সব চেয়ে ভাল আছেন জামাইবাবু। এতো বড়ো সিলভার ড্রাগনের ম্যানেজার হয়ে আছেন, ব্যাগভর্তি টাকা রোজগার করছেন। কেউ কিছু বলে না ওঁকে।"

মদনা বললো, "জামাইবাবুর শরীরে স্যর দয়ামায়া নেই। ক'দিন আগে এখানে কর্মচারীদের মাইনে বাড়াবার দাবি উঠেছিল। বড় মেমসায়েব এসটাফের সঙ্গে কথাই বললেন না। জামাইবাবু সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, কাউকে দরকার নেই। যার খুশি সে সিলভার ড্রাগন ছেড়ে চলে যেতে পারে।"

"তারপর যা ব্যাপার হলো না, স্যর। এতো কাছে থেকেও আপনারা জানতে পারেন নি।" মদনা ভিতরের খবর আমার কাছে ফাঁস করলো। "জামাইবাবু ট্রাংকটেলিফোনে ছ'জন গুণ্ডা আনিয়ে নিলেন।"

"কোথা থেকে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মদনা মোটেই অবাক হলো না। "কেন স্যর? কলকাতার বড় বড় পার্টির গুণ্ডা যেখান থেকে আসে—বেনারস থেকে। বেনারসের মিছরী-লালজী নামকরা সাপ্লায়ার। আপনার থ্যাকারে ম্যানসনে দরকার হলে

বলবেন, আমি টেলিফোন নম্বর দিয়ে দেবো। বারো ঘণ্টার মধ্যে গুণ্ডাপার্টি আপনার কাছে এসে যাবে। জামাইবাবু তো বলেছিলেন, বেনারসের মতো জায়গা হয় না—এতো সস্তায় এতো ভাল গুণ্ডা এখন কোথাও পাওয়া যায় না।”

মদনা এবার মিটমিট করে হেসে ফেললো। “বেনারসের গুণ্ডাদের দেখেই তো স্যর কর্মচারীদের এসট্রাইক মাথায় উঠলো। তারা সুড়সুড় করে ল্যাজ গুটিয়ে ডিউটি দিতে লাগলো—বললে, ‘ভিক্ষে চাই না, কুকুর সামলাও।’ কিন্তু বেনারসের গুণ্ডাদের একটা বিশ্রী নিয়ম—সাত দিনের কমে কোনো বুকিং নেয় না। আধ ঘণ্টার কাজ হলেও ওদের এক সপ্তাহ মিনিমাম রাখতে হবে। ফলে সাতদিন ওরা গেটের পাহারায় রয়ে গেলো। ওই সময় এসটাফকে ওরা খুব হেনেস্তা করেছে স্যর—কিন্তু কোনো ব্যাটার মুখ দিয়ে একটা টুঁ পর্যন্ত বেরুলো না।”

মদনা এবার বেনারসের গুণ্ডাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। “স্যর, চেহারা বটে—যেন পাথর কেটে কেটে এদের বানানো হয়েছে। ভোরবেলায় উঠে প্রত্যেকে আড়াইশ’ ডন বৈঠক দেয়। তার পরেই এক পোয়া ভিজে ছোলা খাবে।”

মদনা বললো, “কিন্তু স্যর প্রথম দিন ডিউটিতে এসেই এরা যে কাণ্ড করলো! খোদ চাওলা সায়েবকেই ওরা দোতলায় ঢুকতে দেয়নি, বলেছে, হুকুম নেই ঢোকবার। চাওলা সায়েব আধঘণ্টা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর জামাইবাবু এসে ওঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। চাওলা সায়েবের মুখ টমাটোর মতো লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বড় মেমসায়েব গুণ্ডাদের একটুও বকলেন না।”

এতোগুলো গুণ্ডা এই থ্যাকারে ম্যানসনে এতোদিন থেকে গেলো অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না!

“এরা কোথায় ছিল, মদনা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“কেন? ছাদে সার্ভেণ্ট কোয়ার্টারে? রামসিংহাসনজীর কাছ থেকে জামাইবাবু খাটিয়া ভাড়া নিলেন। খাটিয়ার ভাড়া খুব বাড়িয়ে দিয়েছেন রাম-সিংহাসনজী—প্রতিদিন দেড় টাকা। চারদিনে খাটিয়ার দাম উঠে যায়; কিন্তু কেউ কিছু বলে না। খাটিয়া মানে তো শুধু খাটিয়া ভাড়া নয়; থাকবার পারমিশন। খাটিয়া তো হাওয়ায় ভাসবে না—এই থ্যাকারে ম্যান-সনের কোথাও তাকে তো রাখতে হবে।”

এই সব গুণ্ডাদের সেবাযত্নের ভার মদনার ওপরেই পড়েছিল। মদনা সেই সুযোগে ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছে। মদনা বললো, “কারুর মনেই এখন সুখ নেই, স্যর। গুণ্ডামির বাজারেও এখন ভীষণ কমপিটিশন—রেট খুব পড়ে যাচ্ছে। এখন কুড়ি টাকায় ঠ্যাং ভাঙবার লোক পাবেন—অথচ দু বছর আগেও একশ’ টাকার কমে কেউ কথা বলতো না। এখন স্যর যা বাজার, একশ’ টাকায় খুন করানো যায়। নেহাত এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের কলকারখানাগুলো রয়েছে তাই, না হলে যে গুণ্ডাদের কী অবস্থা হতো!”

“গুণ্ডামির মার্কেট যদি এতো খারাপ থাকে, তা হলে কীসের বাজার ভাল?” আমার জানবার লোভ হয়।

“বুকের ছাতি, হাতের গুলি দেখিয়ে আজকাল ততটা লাভ হয় না, স্যর।

এখন যে বুদ্ধিমানের যুগ। এখন যত পয়সা এই এসমাগলিং-এ, আর চারশোবিশ লোক ঠকানোয়। ওই সব লাইনে এখন খুব চাপ—কাজের লোকদের খুব টানাটানি।”

মদনার কথাগুলো আমাকে এক অজানা জগতে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই যা বিশ্বাস হতে চায় না মদনা তা কত সহজে বলে যাচ্ছে।

মদনা বললো, “শেষ পর্যন্ত বিশ্বেস ছেড়ে বেঁচেছি। গুন্ডারা বেনারস থেকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পেয়ে কোন্নগরে এক কারখানায় চলে গেলো। কিন্তু চাওলা সায়েবের খুব ক্ষতি করে গেছে—চাকরবাকর কারও জানতে বাকি নেই যে, চাওলা সায়েবকে গুন্ডারা তোয়াক্কা করেনি। ওঁর প্রেস্টিজের কিছু রইলো না।”

মদনা এর পরে আবার ফ্ল্যাটের কথা তুলতে গিয়েছিল, আমি উৎসাহ দেখাইনি। মদনা তখনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, শকুন্তলা চাওলার সংগে সহযোগিতা করলে ভালই হতো ; কারণ, বড় মেমসায়েবের এই রাজত্ব বেড়েই চলবে, কেউ তা আটকে রাখতে পারবে না।

মদনাকে শূন্য হাতে বিদায় করলেও শকুন্তলা চাওলার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যদি কেউ এই থ্যাকারে ম্যানসনে ক্রমশই জাঁকিয়ে বসেন তিনি অবশ্যই সুন্দরী মিসেস চাওলা। তাঁর বিরাগ-ভাজন হওয়া আমার পক্ষে যে যুক্তিযুক্ত না তা বুঝতে পেরে আমার দুশ্চিন্তার বোঝা আরও বাড়তে লাগলো। ওঁর হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে আমার কর্মজীবনের শান্তি নষ্ট হতে বসলো।

কিন্তু তারপরেই অঘটন ঘটলো। সন্ধ্যার একটু পরেই সেদিন সমস্ত থ্যাকারে ম্যানসনে প্রবল উত্তেজনা। রাত্রের অন্ধকারে একদল পুলিস ও অসংখ্য সাদা পোশাকের সরকারী কর্মচারীর আকস্মিক উপস্থিতিতে থ্যাকারে ম্যানসনের শান্ত জীবন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এই ধরনের বিরাট ‘রেড’ আমি কখনও দেখিনি। ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্র—মিলিটারি প্রত্যুৎপন্নমতিতে কয়েকখানা গাড়ি এসে থ্যাকারে ম্যানসনের বিভিন্ন গেটের সামনে থমকে দাঁড়ালো। সাদা পোশাকে অনেক লোক যে তার আগে থ্যাকারে ম্যানসনের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি।

তারপর হঠাৎ শ্যামের বাঁশি বেজে উঠলো। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা—এবং সিলভার ড্রাগনের দিক থেকে যিন কিছু আর্তকণ্ঠের চিৎকারও ভেসে উঠলো।

উত্তেজিত সহদেব আমার কাছে ছুটে এসে বললো, “স্যর ভীষণ কান্ড চলছে। রিভলবার হাতে কত লোক যে এসেছে তার ঠিক নেই। থ্যাকারে ম্যানসনের চারদিক ওরা ঘিরে রেখেছে।” সহদেব এমন দৃশ্য কখনও দেখেনি, তাই বেচারা একটু বেশী ভয় পেয়েছে। ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে সে ছাদে চলে গেলো। তার চোখে জল। বৃদ্ধ বয়সে সরকারী গুলিতে খুন হবার সম্ভাবনা আছে জানলে সে নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতাতে আসতো না।

সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে একটু পরে নিজের ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও এক প্লেন-ড্রেস-এর পাল্লায় পড়লাম। বিনীতভাবে সে জানালো, এখন বেরনো চলবে না। এখনই অফিসার আসছেন বিশেষ কাজে। বুঝলাম, অনেকগুলো ফ্ল্যাটের ওপরই নজর রাখা হয়েছে এবং সর্বত্রই জালপাতা

হয়েছে।

নিজের ঘরে নজরবন্দী থাকবার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখপ্রদ নয়। কয়েকবার পায়চারি করে আমার ধৈর্যচ্যুতি হলো।

সাদা পোশাকের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কারা? কী জন্যেই বা এখানে এসেছেন?"

লোকটি যে আমাকে কিছুই জানাতে পারবে না তা সোজাসুজি বলে দিলো। তার সবিনয় নিবেদন, "আমাদের অফিসার এখনই আসছেন—তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন।"

আরও কিছুক্ষণ বন্দী সিংহের মতো পায়চারি করে আমার মেজাজ সপ্তমে উঠলো। ঘর থেকে বেরোবার শেষ চেষ্টায় সাদা পোশাকের প্রহরীর কাছে নিজের পরিচয় দিলাম; নিচে আপিসঘরে যে আমার অনেক কাজ আছে তাও জানালাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

লোকটি ঠাণ্ডা মেজাজে আমাকে জানিয়ে দিলো, আমি এ বাড়ির ম্যানেজার হই আর মালিক হই, তাতে কিছু এসে যায় না। সায়েব এখানে না আসা পর্যন্ত সে কিছুই করতে পারবে না।

হুড়মুড় করে আরও দুজন লোক এবার এসে পড়ে তাঁদের লিস্টি থেকে আমার ঘরের নম্বরটা মিলিয়ে নিলেন। তারপর আমার নামটাও জেনে নিলেন। "আপনি তো এখন থ্যাকারে ম্যানসনের চার্জে আছেন?"

দায়িত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

লোক দুটি এবার ঘোষণা করলেন আমার ঘর সার্চ হবে। "হা ঈশ্বর! আমি কী করলাম?"

"আলী বক্স তুমি এই দরজার সামনে দাঁড়াও। কাউকে ভিতরে ঢুকতে বা বেরোতে দেবে না", আগের লোকটার ওপর নতুন হুকুম হলো।

অফিসারদের অন্য একজন কাগজের লিস্টিতে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সব ফ্ল্যাটে ভাড়াটে আছে?"

বললাম, "না, কয়েকটা ফ্ল্যাট খালি রয়েছে।"

সেগুলোর নম্বর নির্ভুলভাবে পরের পর বলে অফিসারটি আমাকে তাজ্জব করে দিলেন।

"কিছু মনে করবেন না, ওই ফ্ল্যাটগুলোও আমাদের সার্চ করতে হবে। চাবি নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। ওই কাজগুলো আগে সেরে আসি।"

আমার দেহ এবার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। খালি ফ্ল্যাটের চাবিগুলো ড্রয়ার থেকে বার করে নিয়ে আমি বললুম, "চলুন—আমি প্রস্তুত।"

দুই দিকে দুই পর্বতপ্রমাণ দেহরক্ষী নিয়ে আমি এবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রক্ষীদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কে, কেন আপনাদের এখানে আগমন, তা কী জানতে পারি?"

তার উত্তরে একজন বললেন, "তা হলে প্রথমে চৌত্রিশ নম্বর ঘরটাই সারা যাক। আপনার আপত্তি নেই তো?"

গোটা ব্যাপারটাতেই আমার প্রবল আপত্তি; কিন্তু সে-কথা এই মুহূর্তে কে শুনছে? চাপা বিরক্তি প্রকাশ করে জানালাম, "আপনাদের যেখান থেকে খুশী আরম্ভ করুন, যেখানে খুশী শেষ করুন!"

চৌত্রিশ নম্বরের কাছাকাছি এসে এক ঝলকের জন্যে একখানা হলদে

রং-এর কাগজ আমার সামনে ঘুরিয়ে নিলেন জনৈক দেহরক্ষী। কিছু পড়বার আগেই কাগজখানা আবার তাঁর পকেটে ঢুকে গিয়েছে। আন্দাজে বুঝলাম, সার্চ ওয়ারেণ্ট সঙ্গে নিয়েই ওঁরা আজকের এই অ্যাডভেনচারে এসেছেন।

প্রচলিত আইন অনুযায়ী এ'রা কোথা থেকে এসেছেন তা গৃহকর্তাকে জানাতে বাধ্য। কিন্তু আইনের প্রহরীরা ঘটনাস্থলে এসে আইন মান্য করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেন। আইনের এই দুই দীর্ঘদেহী অভিভাবক এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না এবং তাঁদের নিজস্ব পরিচয় দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

চৌত্রিশ নম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে একজন প্রশ্ন করলেন, "এই ফ্ল্যাট কতদিন আমাদের খাস অধিকারে আছে? আমার যথার্থ উত্তর পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, "এর মধ্যে কখনও প্রাইভেটলি কাউকে এই ঘর ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি তো?"

এই প্রশ্নের মধ্যে যে প্যাঁচ ছিল তা আমার আত্মসম্মানে ঘা দিলো! আমি সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়ে দিলাম ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যে কথা বলা বা লুকিয়ে ব্যবসা করার অভ্যাস এ-বাড়ির ম্যানেজারের নেই!

আমার আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হচ্ছে এই সামান্য ব্যাপারটুকুও আইনরক্ষীরা নজর করলেন না। তাঁদের মুখে রহস্যজনক হাসি ফুটে উঠলো। ভাবটা এইরকম ঃ 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই তল্লাসীর কাজে নিযুক্ত রয়েছি এবং এই রকম "সত্যভাষণ" শুনে শুনে আমাদের কান পচে গিয়েছে।'

ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমারও চিন্তা আরম্ভ হলো। সীমা বিদায় নেবার পরে সেই কবে জেঠমালানির ওপর প্রতিশোধ নেবার নেশায় মিস্টার আর সি ঘোষ এই ফ্ল্যাটের অধিকার বিলাসিনী দেবীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আইন মতো আমি চাবি লাগিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, কিন্তু তারপর এই ফ্ল্যাটে আমি এসেছি বলেই মনে পড়ে না।

সীমার স্মৃতিবিজড়িত এই ফ্ল্যাটে ঘুরে যাবার কথা আমার যে মাঝে-মাঝে মনে হয়নি এমন নয়। কিন্তু, কেন জানি না, শেষ মুহূর্তে আমি পিছিয়ে গেছি। যে-সীমাকে আমি স্মরণ রাখতে চাই সে এখান থেকে বিদায় নিয়েছে ; জেঠমালানির ওই পরিত্যক্ত ফ্ল্যাটে যার স্মৃতি বন্দী হয়ে রয়েছে তার নাম সুলেখা। কলগার্ল সুলেখা সেনের সঙ্গে আমি কোনো যোগা-যোগ রাখতে চাই না, এবং সেই কারণেই এই ফ্ল্যাটে ফিরে আসবার উৎসাহ বোধ করিনি।

· আজ আইনের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অকস্মাৎ আমার বিচারবুদ্ধি জেগে উঠলো এবং কে যেন ঠান্ডা জলে ভেজানো গামছা শীতের সন্ধ্যায় আচমকা আমার দেহের ওপর চেপে ধরলো। আমার সমস্ত শরীর অনাগত বিপদের আশঙ্কায় সিরসির করে উঠলো। আমার হঠাৎ মনে হলো, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, পা দুটো ক্রমশ যেন অবশ হয়ে আসছে।

আইনের দুই অভিভাবক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—ওঁদের অভিজ্ঞ দু'জোড়া চোখ আমার মনের গভীরেও উঁকি মারছে নাকি? তাহলে তো বজ্রপাত আসন্ন!

।আমার চিন্তাযন্ত্র এবার দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করেছে! আমার প্রশ্ন ঃ কোন্ সাহসে আমি আইনের অভিভাবকদের সঙ্গে অমন জোরের সঙ্গে

কথা বলছি ? দীর্ঘদিন ধরে সুলেখা সেনের পরিত্যক্ত জেঠমালানির প্রমোদ-ভবনের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ যোগাযোগ নেই। এই ফ্ল্যাটের চাবি আমার জিম্মায় আছে সত্য, কিন্তু রামসিংহাসন চোরাশিয়া নামক দ্বাররক্ষী এখনও তো থ্যাকারে ম্যানসনে সদর্পে আধিপত্য রক্ষা করে চলেছেন। আমার অজ্ঞাতে কোথায় কোন ফ্ল্যাটে তিনি কী বিলি-ব্যবস্থা করেছেন তার ঠিক নেই।

জেঠমালানি পরিত্যক্ত এই ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট একটা চাবি সংগ্রহ করা রামসিংহাসনজীর পক্ষে কোনো কাজই নয়। এবং তিনি যদি গোপনে এই ফ্ল্যাটে ব্যবসায়িক যাতায়াত রেখে থাকেন তা হলে আজ আমার বিপদ আসন্ন। গোপন কোনো খবরাখবর না-পেয়ে আইনের অভিভাবকরা সাধারণত এই ধরনের অভিযানে নির্গত হন না। তাঁরা কী সত্যিই কোনো খবর পেয়েছেন?

আইনের অভিভাবক জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় আপনার চাবি।"

আমার হাত অবশ হয়ে আসছে। এই পরিত্যক্ত ফ্ল্যাট থেকে কোনো কিছু আবিষ্কৃত হলে, কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি নিরপরাধ। আমার অজ্ঞাতে আমারই দারোয়ান এখানে রাজত্ব চালাচ্ছেন এই বক্তব্য দুগ্ধপোষ্য বালকেরও হাসির উদ্রেক করবে!

আমার হাত থেকে চাবি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে একজন রাজপুরুষ ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে লাগলেন।

হঠাৎ আর একজনের খেয়াল হলোঃ "সাক্ষী ?"

প্রথম জন বললেন, "সাক্ষী ধরে নিয়ে এসো তুমি—ততক্ষণ আমি জল থেকে মাছ তুলি! বেঁটে দত্তমশাইকে তুমি ঝটপট হাজির করাও।"

দ্বিতীয়জন বললেন, "বেঁটে দত্তমশাই এখন আসল জায়গায় খুব ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়।"

প্রথমজন বুদ্ধি দিলেন, "স্পেশালি ম্যানেজ করে নিয়ে এসো ওই বেঁটে দত্তকে। নাপিতের অভাবে তো বিয়ে বন্ধ করা যায় না!"

দ্বিতীয়জন এবার ছুটলেন বেঁটে দত্ত নামক নিরপেক্ষ সাক্ষীর সন্ধানে। তিনি যে এই 'বরযাত্রী' দলের সঙ্গে খানাতল্লাসির সাক্ষী হিসেবে থ্যাকারে ম্যানসনে এসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তা আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না!

প্রথমজন এবার হুড়মুড় করে চৌত্রিশ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং বিরাট টর্চ জ্বালিয়ে প্রথম ঘরখানা দেখে নিলেন। এই ঘরেই একদিন জেঠমালানিদের ফার্নিচার বোঝাই ছিল—এইখানেই একদিন সীমার সঙ্গে বিচিত্র এক অস্বস্তির মধ্যে আমার পরিচয় হয়েছিল। আজ সীমার কোনো চিহ্নও এখানে পড়ে নেই।

আইনের অভিভাবক শূন্য ড্রয়িংরুম দেখে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ঘরের দেওয়ালগুলো ঠুকে ঠুকে অদৃশ্য গহ্বরের সন্ধান করলেন। এবারও তিনি নিরাশ হলেন। মনে মনে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি—রামসিংহাসনের মলিন হস্তকে আমি বোধ হয় অকারণেই সন্দেহ করেছি।

আইনের অভিভাবক এবার আলো জেবলে ভিতরের কুটুরিগুলোও তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। ব্যানট্রি এবং টয়লেটের ওপরে বক্সরুমও বাদ গেলো না।

ইতিমধ্যে টাক-মাথা গোপালভাঁড়ের মতো চেহারা এক ভদ্রলোককে নিয়ে দ্বিতীয় অভিভাবক ফিরে এসেছেন। এই গোপালভাঁড়ই যে বেঁটে দত্ত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বেঁটে দত্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখি, কী গুপ্তধন এখান থেকে উদ্ধার করলেন? তাড়াতাড়ি লিস্টি ছাড়ুন—ওখানে সই করে আমি আবার নিচে ফিরে যাবো। ভাল নাটক চলছে ওখানে!"

আমার দিকে তাকিয়ে বেঁটে দত্ত বললেন, "যা-যা রেখেছেন ঝটপট বলে দিয়ে কাজ হালকা করে ফেলুন, স্যার। পড়েছেন যখন যবনের হাতে তখন খানা খেতে হবে সাথে! কোনো চান্স নেই পিছনে পালাবার।"

প্রথমজনের দিকে তাকিয়ে বেঁটে দত্ত বললেন "খুরে-খুরে নমস্কার আপনার বড়বাবুকে—আমাকে ধরে নিয়ে আসবার সময় বললেন কিনা দশ পনেরো মিনিটের কাজ। এখন দেখছি হোল নাইটে লিস্ট্রি পাকা হয় কিনা সন্দেহ। এ-জানলে কে আপনাদের সঙ্গে এখানে আসতো?"

চৌত্রিশ নম্বরে কিছুই পাওয়া যায়নি শুনে বেঁটে দত্ত খুশী হলেন। বললেন, "উঃ বাঁচলাম আমি। কাজ একটু হালকা হলো!"

কিন্তু আইনের অভিভাবক মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আফসোস করলেন, "আমার কপালই খারাপ। আমি সার্চ করতে এলে, সমুদ্রও ড্রাই হয়ে যায়!"

ওঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বেঁটে দত্ত আমাকে অনুরোধ করলেন, "কেন নন কো-অপারেশন করছেন স্যার? ছিটেফোঁটা ছাড়ুন—না হলে ওঁদের উন্নতি হবে না। কথায় বলে, দিও কিঞ্চিৎ না কোরো বঞ্চিত!"

বেঁটে দত্ত তাহলে কি সন্দেহ করছেন যে আমার জানাশোনা জায়গায় বে-আইনী জিনিসপত্র লুকনো রয়েছে?

"হাত চালিয়ে, স্যার," এবার আবেদন জানালেন বেঁটে দত্ত। "বুঝতেই পারছেন, হাতে সময়ের অভাব। আপনারা সবাই সহযোগিতা না করলে, আজকের রাত্রি শিবরাত্রি হয়ে যাবে—কেউ চোখের পাতা বুজবার সময় পাবে না।"

বেঁটে দত্তর ওপর রাগ ছেড়ে যাচ্ছে খুব। কিন্তু কোনোরকম তোয়াক্কা না-করে তিনি বললেন, "আপনার এবং এদের ভালর জন্যেই বলছি। আমার আর কী? আমি তো সরকারের সাক্ষী—আমার না আছে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স, না আছে ইনক্রিমেণ্ট, না আছে প্রমোশন। স্রেফ রাহাখরচের বদলে আমাকে সাক্ষী দিয়ে বেড়াতে হয়; অথচ সায়েবদের চটাবার উপায় নেই। এসব ব্যাপারে সহযোগিতা না-করলে, সামান্য যে-একটু-আধটু কাজ কারবার আছে তা মাথায় উঠবে।"

আমার ওপর ভরসা না-রেখে ওঁরা দুজন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন—কিন্তু জালে মাছ উঠলো না।

বেঁটে দত্ত ছটফট করতে লাগলেন। "টপাটপ ইঁদুর ধরুন, স্যার। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম আজ! সবে সন্ধ্যেবেলায় সবে একটু বেরিয়েছি, আর বড়বাবুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। বললে, দত্তমশাই, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। বেড়াতে আসার নাম করে, এ কোথায় এসে পড়লাম—বাড়িতে পর্যন্ত একটা খবর দেওয়া নেই।"

চৌত্রিশ নম্বরের তল্লাসী শেষ করে আইনের অভিভাবক দুজন আমার দিকে আবার যুগল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমার সম্বন্ধে তাঁদের ভরসা যে একটুও বাড়েনি তা বেশ বুঝতে পারছি।

ওঁরা এবার এগারো নম্বর ফ্ল্যাটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ডরোথি

ওয়াটের ফ্ল্যাটও সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখানেও নিষ্ফল আধ ঘণ্টা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেলো। বেঁটে দত্ত তখনও উদ্ধার-করা মালের লম্বা লিস্টিতে সাক্ষীর সই লাগাবার জন্যে ছটফট করছেন।

এখনও মুক্তি নেই। এবার সেই ভূতুড়ে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট যেখান থেকে একদিন ফিলিপ মেমসায়েবের ট্রাঙ্কবন্দী মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। উনিশ নম্বরের কথা তুলতেই আমি ফ্ল্যাটের চাবি এগিয়ে দিলাম। বিরক্তভাবে বললাম, "আপনারা নিজেরাই সরেজমিনে খোঁজখবর করুন।"

ওঁদের তিনজনকে বেয়ারার সঙ্গে উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে পাঠিয়ে দিতে উত্তেজিত আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অফিস ঘরে এসে বসলাম। কার দয়ায় আজকের এই নাটক এখানে শুরু হয়েছে তা আন্দাজ করতে পারলে ভাল হতো। ভাবছি, এখন আমার কী কর্তব্য? এখনই একবার চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী বেদীকে খবরটা দেওয়া প্রয়োজন। এ-বাড়ির কর্ত্রী হিসাবে দুঃসংবাদ তাঁর কানেই প্রথম পৌঁছনো উচিত। কিন্তু কী বলবো তাঁকে? সার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিরক্ত করে বোধ হয় লাভ হবে না —কারণ এ-বাড়ির দৈনন্দিন সমস্যাবলী সম্বন্ধে বিলাসিনী দেবীর কোনো-রকম ঔৎসুক্য নেই।

এই মুহূর্তে যাঁর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাঁর নাম অবশ্যই গণপতিবাবু। সুখে-দুঃখে বিপদে-আনন্দে একমাত্র গণপতিবাবুর উপদেশ এবং উপস্থিতির ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। এখন কোনো বিপদে পড়লে একমাত্র তিনিই আমার হয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়তে রাজী হবেন।

গণপতিবাবুর নম্বর ডায়াল করবার জন্যে হাতটা বাড়াতে যাচ্ছি ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। কে এই অসময়ে আমাদের স্মরণ করতে চাইছেন?

"হ্যালো, হ্যালো, আমি পপি বলছি," মিসেস পপি বিশোয়াস যে এই দুঃসময়ে আমাকে জ্বালাতন করবেন তা ভাবতে পারিনি।

"হ্যালো, মিস্টার শংকর, কেমন আছেন?" মিসেস পপি বিশোয়াস কি আমার সঙ্গে এখন রসিকতা করছেন?

"আর কিছু বলবার আছে আপনার?" বিরক্ত কণ্ঠে আমি টেলিফোনা-লাপের ইতি টানতে চাইলাম।

পপি বিশোয়াস কিন্তু মোটেই বিরক্ত বোধ করলেন না। বরং খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। এমন অবস্থায় যে কেউ এইভাবে হাসতে পারে তা আমার অকল্পনীয়।

হয়তো আমি সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোন নামিয়ে দিতাম। কিন্তু মিসেস বিশোয়াস এবার প্রয়োজনীয় কথা আরম্ভ করলেন। "আপনার ওপর খুব রেগেছি আমি, মিস্টার শংকর। আপনি কোন্ সাহসে উনিশ নম্বরের চাবি ওদের হাতে দিয়ে নিজে আপিস ঘরে সরে এলেন?"

মিসেস বিশোয়াস একথা জানলেন কী করে? ওঁর চোখে কী টেলিভিশন ক্যামেরা লাগানো আছে?

"আপনি আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না। এখনই ওই উনিশ নম্বরে চলে যান। এখানে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। সুযোগ পেলেই হয়তো কিছু বে-আইনী জিনিস ওখানে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনাকে বিপদে ফেলবে।"

আমি মিসেস বিশোয়াসের দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারলাম না। কিন্তু তিনি কি এই নাটকের ধারাবিবরণী শুনে চলেছেন। আইনের অতিথি-দের আকস্মিক আগমনের সংবাদ তিনি এরই মধ্যে পেলেন কি করে?

মিসেস বিশোয়াস আবার মুখ খুললেন। "মিস্টার শংকর, আপনার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে শুনলাম! শুনুন মিস্টার শংকর, কোনো ভয় নেই আপনার। একদম চিন্তা করবেন না। আপনার ভালর জন্যেই এসব হয়েছে মনে রাখবেন।"

এসব কী বলছেন, মিসেস বিশোয়াস? বাড়িতে সার্চ হলে তার থেকে আমার মতো লোকের কী ভাল হতে পারে?

মিসেস বিশোয়াস আমাকে আশ্বাস দিলেন, "আমার ঘরেও সার্চ হবে নিশ্চয়। কিন্তু এক ফোঁটা চিন্তা করবেন না। কিন্তু প্লিজ আপনি ওদের একলা ছেড়ে দেবেন না, উদোর পিণ্ডি যদি কেউ বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু বিপদের শেষ থাকবে না।"

ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় হয়ে উঠছে। মিসেস বিশোয়াস অনেক কিছুই জানেন মনে হচ্ছে। দেখেশুনে এবারে আমাকে তিনি বিপদে ফেললেন নাকি? কিন্তু এখন ভাববার অবসর নেই। টেলিফোন নামিয়ে ছুটলাম উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে।

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের তালাচাবি নিয়ে তখন ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। আইনের অভিভাবক একবার বেঁটে দত্তর সাহায্য চাইলেন। কিন্তু দত্তমশাই সোজা-সুজি বললেন, "ও-কাজে আমাকে নামাবেন না মশাই, নিরপেক্ষ সাক্ষী কখনও তালা ভাঙায় সাহায্য করে না। উকিলের জেরার সামনে আমার শোচ-নীয় অবস্থা হবে।"

ওঁদের দেরি হওয়ায় আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। মিসেস বিশোয়াস আমার মধ্যে যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন তার হাত থেকে বাঁচা গেলো।

এবারেও আইনের অভিভাবকদের নিরাশ হতে হলো। আধঘণ্টা দেওয়ালে মাথা ঠুকেও ওঁরা কিছু বার করতে পারলেন না। ওখান থেকে এগারো নম্বর ফ্ল্যাট। সেখানেও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এ-ব্যাপারে ওঁরা দু'জন মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না—কিন্তু এখনই হায়ার অফিসারকে রিপোর্ট করতে হবে।

একজন সিনিয়র অফিসার এই সময় এগারো নম্বর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আইনের দুই অভিভাবক এবার জুতোর গোড়ালি ঠুকে স্যালুট জানালো এবং সার্চের খবরাখবর দিলো। বেঁটে দত্ত একটু দুঃখের সঙ্গে বললেন, "কিছু পাওয়া গেলো না স্যার—শুধু শুধু আমাকে খাটালো।"

তরুণ অফিসার ভদ্রলোক এই খবরে আশ্বস্ত হলেন এবং এবার আমার দিকে মুখ ঘুরোলেন।

মুখ দেখেই আমার চেনা-চেনা মনে হলো। অফিসার ভদ্রলোকও বলে উঠলেন, "শংকর না? তুমি এখানে?"

শ্যামলকে ততক্ষণে আমি চিনে ফেলেছি। আমাদের হাওড়া কাসুন্দের ছেলে সে—এক সঙ্গে অনেকদিন "সুর ঝঙ্কার" রেডিওর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী শুনেছি।

শ্যামলকে দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে—বিপদের সময় ঈশ্বর আমাকে মাঝে-মাঝে একটু আলো দেখিয়ে দেন।

শ্যামল বসুরায় আর একবার অফিসার দু'জনের কাছ থেকে আমার

সম্বন্ধে সব খবরাখবর নিয়ে নিলেন। ওঁরা দুজন জানতে চাইলেন, এবার তাঁরা কী করবেন? শ্যামল বসুরায় একটুকরো কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার আপনারা ওই মিসেস বিশোয়াসের ফ্ল্যাটখানা সার্চ করুন।"

শ্যামল বসুরায় অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আপিসে চলে এলেন। শ্যামল যে পরীক্ষা দিয়ে কেন্দ্রীয় কাস্টমসের বড় অফিসার হয়েছে এ-খবর জানা ছিল না।

শ্যামল আমার বিড়ম্বিত জীবনের কিছু কথাও জেনে নিলো। কেমন করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে হাইকোর্ট এবং হোটেলের অজ্ঞাতবাসপর্ব শেষ করে আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনে আশ্রয় লাভ করেছি তাও সে শুনলো।

শ্যামলকে জিজ্ঞেস করলাম, তাকে চা দেওয়া, চলে কি না। "তোমার ঘরে যখন কিছুই পাওয়া যায়নি, তখন চা খেতে আপত্তি কী?"

এরপর শ্যামল কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে বসেছিল এবং তারই মধ্যে আমি বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর খবর যোগাড় করে ফেলেছিলাম।

শ্যামলের কাছেই শুনলাম, আজকের আচমকা আক্রমণে কাস্টমস্ এবং পুলিস দুজনেই অংশ গ্রহণ করছে। তবে স্থানীয় থানার পুলিস নয়—খোদ লালবাজারের সঙ্গেই এই তল্লাসীর গোপন পরিকল্পনা হয়েছিল।

শ্যামল বসুরায় জানালো, "অবাক কাণ্ড! কলকাতা শহরের বুকের ওপর এতো বড়ো বে-আইনী কাজের কেন্দ্র চলছিল, অথচ পুলিস ও আমরা কেউ খবর রাখতাম না।"

শ্যামল বসুরায় নতুন কলকাতায় বদলী হয়েছে এবং অফিসের বড় কর্তা ওকেই এই স্পেশাল অভিযানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

শ্যামল বললো, "ওই সিলভার ড্রাগনের এক-একখানা ঘর থেকে ট্রেজার আইল্যান্ড বেরিয়ে আসছে। সোনা, বিদেশী কারেন্সি নোট, ডিউটি ফাঁকি দেওয়া জাহাজী হুইস্কি, ইমপোর্টেড সিগারেট, ঘড়ি—কী না পাওয়া যাচ্ছে! পুরো লিস্ট বানাতে আজ সমস্ত রাত কেটে যাবে।"

শ্যামল জানালো, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার, একটু আগেই এক ব্যাগ জাল ডলার নোটও পাওয়া গেলো। কেউ বোধহয় ওই মিসেস চাওলাকেও ঠকিয়ে গিয়েছে; কিন্তু জেনে-শুনেও মিসেস চাওলা প্রাণধরে ওগুলো ফেলতে পারেননি!"

আরও শুনলাম, এগারোজন কমবয়সী মেয়েকে সন্দেহজনক অবস্থায় বিভিন্ন খুপরিতে পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা এখন পুলিস দেখে কান্নাকাটি শুরু করেছে এবং মিসেস শকুন্তলা চাওলার নামে যা-তা বলছে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের অ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনার মিস্টার সরকার ওদের নিয়ে নাস্তানাবুদ খাচ্ছেন। প্রতিটি মেয়ের স্টেমেণ্ট নিতে হচ্ছে। ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্টেও বড় কেস হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। হোটেল অথবা বার-এ এইসব মেয়েদের ঢুকতে দেওয়ার আইন নেই।

অ্যারেস্ট? শ্যামলের কাছেই শুনলাম, অ্যারেস্টের তালিকায় শকুন্তলা চাওলা, তাঁর স্বামী এবং সুযোগ্য জামাই রয়েছেন। অতি ধুরন্ধর মহিলা এই শকুন্তলা চাওলা—বলতে চাইছিলেন যে সিলভার ড্রাগনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ লাইসেন্স রয়েছে মিস্টার চাওলার নামে। সৌভাগ্যক্রমে পাশের একখানা ফ্ল্যাটের বাইরে শকুন্তলা চাওলার নেমপ্লেট ছিল এবং ওখান থেকে প্রচুর ডিউটি -ফ্রি ইমপোর্টেড হুইস্কির স্টক পাওয়া

গেলো।

"স্বামীকে এগিয়ে দিয়ে জামাইকেও বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন মিসেস চাওলা। কিন্তু জামাইবাবাজীবন বার-এর ম্যানেজার হিসেবে মাইনে নিয়ে থাকেন। এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত মেয়েরা ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে যেসব স্টেটমেণ্ট দিচ্ছে তাতে কানে তুলো দিতে হয়।"

উর্বশী? তার খবর জানবার জন্যেও আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছি।

"সে কি? উর্বশীর লেটেস্ট খবর রাখো না তোমরা? শ্যামল অবাক হয়ে গেলো।" চব্বিশ ঘণ্টা আগেই সে ভো মা এবং স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এ-বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। কেন, আজকের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখোনি তুমি? পার্সোনাল কলমে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে : 'ইউ, তুমি এই-ভাবে নিজের সর্বনাশ কোরো না। ফিরে এসো। তোমাকে এখনও ক্ষমা করা হবে।" এই 'ইউ' যে উর্বশী সে-সম্বন্ধে বসুরায়ের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

আরও শুনলাম, উর্বশীর সঙ্গে কাস্টমসের কোনো যোগাযোগ হয়নি। অন্য এক অচেনা সূত্র থেকে খবর পেয়েই তাঁরা এই রেডের ব্যবস্থা করেন।

ইমমরাল ট্র্যাফিকের এ-সি মিস্টার সরকারের সঙ্গে উর্বশীর যোগা-যোগ হয়েছে মনে হলো। ভিতরের লোক না বেঁকে বসলে ওঁদের পক্ষে এতো খবরাখবর পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ম্যাকারে ম্যানসন মহাভারতের আর এক পর্ব এবার বোধ হয় শেষ হতে চললো। ঘরে ঘরে তালা পড়লো—তালার ওপর গালা লাগালেন পুলিস ও কাস্টমসের লোকরা। শকুন্তলার চাওলা, জামাই ও স্বামীসহ বিভিন্ন অভি-যোগ থানার হাজতে চলে গেলেন। পিছনে আর এক বিরাট গাড়িতে সিলভার ড্রাগনের বিনোদিনীরাও বন্দিনী অবস্থায় থানায় চালান হলেন।

এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। শকুন্তলা চাওলার সিলভার ড্রাগন যে কোনো-দিন সরকার ও পুলিসের শনির দৃষ্টিতে পড়তে পারে, তা কারও কল্পনায় ছিল না।

আমার সম্বন্ধেও নানা গুজব রটেছে। কারণ অনেকেই খোঁজখবর করতে এসে আমাকে অফিস ঘরের মধ্যে বহাল তবিয়ত দেখে অবাক হয়ে গেলো। তাদের খবর ছিল যে খালি ফ্ল্যাট সার্চ হবার পরে আমাকেও পুলিসের কালো খাঁচায় ঢোকানো হয়েছে।

এর পরেই আমি মিসেস বিশোয়াসের ফোন পেয়েছিলাম। সকাল নটার সময় মিসেস কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটে তিনি মদে চুর হয়ে আছেন। এই ভোর-বেলায় মিসেস বিশোয়াস যে এমন বেসামাল হতে পারেন তা ভাবিনি।

মিসেস বিশোয়াস জড়ানো গলায় আমাকে ওঁর সামনে বসতে বললেন। "কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শংকর, আপনাকে না-ডেকে পারলাম না। আমার এই অবস্থা মাফ করবেন, আজ আমি কোনো আইন-কানুন মানছি না।"

মিসেস বিশোয়াস একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমার ফার্স্ট হাজবেণ্ড প্রায় বলতেন—'অতি দর্পে হত লঙ্কা'! দেখলেন তো মিসেস শকুন্তলা চাওলার চ্যাপটার। ভেবেছিল পুলিস এবং গভরমেণ্ট অফিসার ওর রুমালের খুঁটে বাঁধা আছে। ভেবেছিল, থানায় প্রতুল বিশ্বাস সম্পর্কে উড়ো টেলিফোন করে, টুসকি মেরে আমাকে এখান থেকে বিদায় করবে এবং

এই কিরণ খোসলার ফ্ল্যাটখানা অকুপাই করবে। কিন্তু কী হলো?"

"তোমারে বধিল যে গোকুলে বাড়িল সে!" মন্তব্য করলেন মিসেস বিশোয়াস।

একটু হেসে ফেললেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর বললেন, "অনেক পাপের প্রতিশোধ নেওয়া হলো আজ, মিস্টার শংকর। উর্বশী চাওলা মায়ের অনেক কিছুই জানতো, কিন্তু একটা খবর তেমন রাখতো না। এই মায়ের সঙ্গে জামাইয়ের নোংরা ব্যাপারটা। সেই খবরটা বাধ্য হয়ে কানে তোলাতে হলো। তারপর আমাকে আর তেমন কিছু করতে হয়নি। ওই যে ব্যারিস্টারের নাম করে দিলেন আপনি, উনি খুব হেল্‌প করছেন উর্বশীকে। উনি না থাকলে, ওকে এতোক্ষণ আর জীবন্ত পাওয়া যেতো না।"

আরও একটু ধোঁয়া ছাড়লেন মিসেস বিশোয়াস। "উর্বশী এখন আগুনে পুড়ে-পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছে। ও আর এই সব নোংরা সম্পত্তির সুখ ভোগ করতে চায় না—সে সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে চায়।"

আবার হাসলেন মিসেস বিশোয়াস। "আমি খবর পেলুম, পুলিশ ওই সিলভার ড্রাগনের ভিতরেব খবর উর্বশীর কাছে শুনেছে এবং ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু পুলিসের ওপর শকুন্তলার যা ইনফ্লুয়েন্স—পুরোপুরি বিশবাস করতে পারলাম না। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে সেই কাজ করতে হলো, যা মিসেস চাওলা আমার ব্যাপারে করেছিলেন। কাস্টমসের খোদ কর্তাকে টেলিফোন করে দিলাম।"

মদের ঝোঁকে মিসেস বিশোয়াসের হাসি বেড়েই চলেছে। "মধ্যিখান থেকে আপনার ওপর একটু অত্যাচার হল। কিন্তু উপায় ছিল না—ওই মিসেস চাওলা যদি আপনাকে সন্দেহ করতো তা হলে আরও বিপদে পড়ে যেতেন। আমি সেফটির কথা ভেবে ওঁদের জানালাম, আপনার খালি ফ্ল্যাটগুলোতে এবং ওয়ান মিসেস পপি বিশোয়াসের ফ্ল্যাটেও মিসেস চাওলার বে-আইনী মাল লুকনো থাকে।"

মিসেস বিশোয়াসের ওপর রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারলাম না। সজল চোখে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আই অ্যাম ভেরি স্যারি, মিস্টার শংকর, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ওই মিসেস চাওলা ঠিক আপনাকে সন্দেহ করে বসতো এবং আপনার প্রাণ সংশয় হতো।"

মিসেস বিশোয়াস কাঁদতে-কাঁদতে হাসতে-হাসতে বললেন, "আজ আমার বুকটা খুব হালকা হালকা মনে হচ্ছে, মিস্টার শংকর। অনেকদিনের জমা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছি আমি। আপনি কিছু মনে করবেন না—আজ আমি ভিকটরি সেলিব্রেশন করবো," এই বলে মিসেস পপি বিশোয়াস টেবিলে রাখা হুইস্কির বোতলের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

পরপর নামা-বেনামা সাতখানা ফ্ল্যাটে তালা ঝুললো এবং সরকারী সীল-মোহর পড়লো। থ্যাকসরে ম্যানসনের এতোগুলো ফ্ল্যাটে যে মিসেস শকুন্তলা চাওলা তাঁর নিষিদ্ধ সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তা আমারও জানা ছিল না।

বেচারা মদনা বিভ্রান্ত। সে বললো, "ধম্মের কল বাতাসে সত্যিই নড়ে। আমি স্যার আর এই গোলমেলে লাইনে থাকবো না, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমি এবার গেরস্ত লাইনে ফিরে যেতে চাই।"

এরপর মদনার অনুরোধ ঃ "আমাকে একটা চাকরির জোগাড় করে দিন, স্যার। এনি চাকরি—কোন্ শালা আর এই সব হাঙ্গামায় থাকে।"

মদনা অবশ্য আমার ওপর নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। কয়েকদিনের মধ্যেই সে অনেক খোঁজখবর নিয়েছে। মদনা বলেছিল, ভাবনানি ম্যানসনের প্রাইভেট গেস্ট-হাউস থেকে তার ডাক এসেছিল। "কিন্তু স্যার, আমি নাক-কান মলেছি—নোংরা লাইনে আর থাকবো না।"

মদনা এবার দার্শনিকের মতো কঠিন এক প্রশ্ন তুলেছিল। "আমাকে কী ভগবান পানিশ দিচ্ছেন স্যার?"

"ঈশ্বর তো সবারই মঙ্গল করেন শুনেছি, মদনা। তিনি কেন শুধু শুধু তোমাকে 'পানিশ' দেবেন?"

মদনা সঙ্গে সঙ্গে বললো, "না স্যার, আমার যে অনেক দোষ। সুইপারের ছেলে হয়ে, বাপ-ঠাকুর্দার কাজ ছেড়ে দিতে চাইলাম আমি। তাই হয়তো অসন্তুষ্ট হয়ে আমায় বললেন, দেখাচ্ছি মজা তোর। ময়লা ঝাঁটাকে যখন তোর অতোই ঘেন্না, তখন তার থেকেও ময়লা ঘেঁটে খেতে হবে তোকে।"

কী উত্তর দেবো আমি?

মদনা কিন্তু ভেঙে পড়েনি। সে বললো, "আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না স্যার। স্বয়ং পুলিস আমার কিছু করতে পারলো না, ভগবান তো কোন ছার! আমার একটা ব্যবস্থা হয় যাবে স্যার। আপনি শুধু আমার দুটো উপকার করুন।"

মদনার জন্যে আমি অনেক কিছুই করতে পারি। মদনার প্রথম অনুরোধ ঃ তাকে এ-বাড়ির সিঁড়ির কোণে একটু থাকতে দেবার অনুমতি। মিসেস চাওলার ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সেও আশ্রয়হীন হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্যই আমার কোনো আপত্তি নেই। "মদনা, তুমি যদি আমার বাথরুমে রোজ স্নান সারতে চাও তাতেও অসুবিধা নেই।"

জিভ কেটে মদনা বললো "মরে গেলেও না,, স্যার। আপনি বামুন মানুষ। দয়া করে আপনি থাকতে দিচ্ছেন বলে, আমি আবার কলঘরে স্নানের সুখ চাইবো? এতোবড়ো গঙ্গানদী পাবলিকের জন্যে বয়ে যাচ্ছে কেন? আপনি একদম ভাববেন না।"

মদনার দ্বিতীয় অনুরোধটি আশ্চর্য! মদনা বললো, "আমাকে একখানা ক্যারাকটার সার্টিফিকেট দিন, স্যার।" কলকাতা শহরে এই এক অসুবিধে! ক্যারেকটার থাকুক চাই না থাকুক একটা সার্টিফিকেট চাই-ই, তাছাড়া চাকরি-বাকরির অ্যাপ্লিকেশন করা চলবে না।"

মদনার ক্যারাকটার! এবং সার্টিফিকেট চাইবার লোক খুঁজে পেলো না মদনা? "আমার মতো লোকের সার্টিফিকেট কী হবে মদনা?"

মদনা মোটেই দমলো না। "আসল লোককেই ধরেছি আমি। আপনি তো খোদ ইংরেজ ব্যারিস্টারের কাছে কাজ করে এসেছেন।"

বাধ্য হয়ে মদনার জীবনের সাফল্য কামনা করে ইংরেজীতে প্রশংসাপত্র লিখতে হলো আমাকে—জীবনে এই প্রথম সার্টিফিকেট রচনা। আমার মতো লোকের কাছেও সার্টিফিকেট প্রার্থনা করবার অভাগা মানুষ তা হলে কলকাতা শহরে আছে!

মদনার অনুরোধে সার্টিফিকেট পত্রের ওপরে লিখতে হলোঃ প্রাইভেট সেক্রেটারি টু লেট নোয়েল বারওয়েল, বার-অ্যাট-ল। আমি অবশ্যই সায়েবের সেক্রেটারি ছিলাম না, আমি ছিলাম কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের বাবু। কিন্তু মদনা 'বাবু' কথাটা পছন্দ করলো না। বাবুর সার্টিফিকেটে কাজ হবে না—তার থেকে 'সেক্রেটারি' অনেক সম্ভাবনাময়।

মদনা দু'দিন পরেই ফিরে এসে সুসংবাদ দিয়েছিল। বারওয়েল সায়েবের নামাঙ্কিত সার্টিফিকেট নিষ্ফল হয়নি। সদর স্ট্রীটের ডিকসন সায়েবের কাছে চাকরি পেয়েছে মদনা। "বড় মজার চাকরি স্যার।" অদ্ভুত নেশা এই ডিকসন সায়েবের। নিজের চাকরি-বাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, ডিকসন সায়েব এখন দুপুরে নিজের হাতে রান্না করেন। সেই রান্না আবার ডিকসান সায়েব তারপর বেশ কয়েক বাড়িতে বিলিয়ে আসেন।

মদনা বললো, "আমার খুব ভাল ডিউটি, স্যার। রান্নাবান্নায় ডিকসন সায়েবকে সাহায্য করি, তারপর ডেকচি মাথায় করে, সায়েবের লিস্টি ধরে খাবার বিলি করে আসি। সায়েব নিজে আজকাল সব জায়গায় যেতে পারেন না। কত বুড়োবুড়ী যে আমার জন্যে মুখ শুকিয়ে অপেক্ষা করে থাকে, আপনাকে কী বলবো? আমাদের কিরণ বউদিকে সায়েবের লিস্টিতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আপনার যদি কোনো উপোসী পার্টি থাকে বলবেন, গরম খাবারের ব্যবস্থা করে দেবো।"

"মদনা, চিরকাল তো মিসেস শকুন্তলা চাওলার মোকদ্দমা চলবে না। একদিন নিশ্চয় আবার ওই সিলভার ড্রাগন খুলবে। তখন তুমি কী করবে?"

মদনা সোজা জানিয়ে দিলো, তাকে মালিক করে দিলেও সে আর এই সিলভার ড্রাগনে ফিরছে না। মদনা শুনেছে উর্বশী দিদিমণিকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিস পাহারায় কোন্ এক হোটেলে রাখা হয়েছিল। মিসেস চাওলার লোকরা নাকি সুযোগ পেলেই তাঁকে খুন করে ফেলবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁকে নাকি হুমকি দেখানো হয়েছে। এখন আচমকা উর্বশী দিদিমণির খবরই পাওয়া যাচ্ছে না—কোথায় কোন অজানা ঠিকানায় তিনি চলে গিয়েছেন। কেউ কেউ বলছে, মনের দুঃখে উর্বশী দিদিমণি দেশের বাইরে পাড়ি দিয়েছেন এবং কখনও আর দেশে ফিরবেন না।

মদনার খবরটা মিথ্যা নয়। ইংরিজী কাগজে তথাকথিত 'ইউ'-এর নামে সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন আমারও নজরে পড়েছে। এবং এর পেছনে যে শকুন্তলা চাওলার অদৃশ্য হস্তের স্পর্শ রয়েছে তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু সরকারী শাসনযন্ত্র এবারে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছে। অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে শকুন্তলা চাওলা, তাঁর স্বামী এবং জামাই দীর্ঘ জেলখাটার শাস্তি লাভ করেছেন। সব রকম সুবন্দোবস্ত

থাকা সত্ত্বেও যে অনেক সময় বিপদের মেঘ অপরাধীর ওপর বজ্রপাত করে তার উদাহরণ হিসেবে মিসেস শকুন্তলা চাওলার কাহিনী আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

শকুন্তলা চাওলার এই আকস্মিক পতনে আমি আনন্দিত হবো না দুঃখিত হবো? যে পর্বতপ্রমাণ উচ্চাভিলাষ নিয়ে এই থ্যাকারে ম্যানসনের ওপর তিনি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়। ছলে-বলে-কৌশলে তিনি তিনি যে এই বাড়িটা পুরোপুরি গ্রাস করবার মতো ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন তাও সন্দেহাতীত। সুতরাং শকুন্তলার পতন আমাদের পক্ষে সুসংবাদ। কিন্তু অন্য দিক থেকে অপ্রত্যাশিত অসুবিধার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। মাসের প্রথমে ভাড়া আদায়ের অঙ্ক অকস্মাৎ অনেক কমে গেলো। শকুন্তলা ছিলেন আমাদের ভাড়াটিয়া ভাষায় 'গুড পে-মাস্টার'। একসঙ্গে সাতখানা ফ্ল্যাটের ভাড়া আচমকা বন্ধ হলে বিডন স্ট্রীটের চন্দ্রোদয় ভবনে কী ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবে কে জানে?

চন্দ্রোদয় ভবনের শ্রীমতী বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পেলে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়া চলতো। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তো আমাদের মতো সামান্য কর্মচারীর নাগালের বাইরে রয়েছেন। থ্যাকারে ম্যানসনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যতই নাটকীয় হোক, সে বিষয়ে বিলাসিনী দেবীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

সিলভার ড্রাগন আকস্মিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে আমার কোনো হাত নেই। কোনো ভাড়াটে যদি হঠাৎ ভাড়া দেওয়া বন্ধ করেন তার জন্য ম্যানেজারকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু কবে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে সে বিষয়ে চিন্তা করবার মতো দায়িত্ববোধ অবশ্যই আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়। ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মেরে আমি কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছি। আইনের জটিল প্যাঁচে এইসব ফ্ল্যাট বছরের পর বছর তালাবন্ধ থাকতে পারে। পরিস্থিতি যে মোটেই আশাপ্রদ নয় তার আর একটি কারণ সিলভার ড্রাগনের নায়ক-নায়িকাদের একপ্রস্থ জেলে পাঠিয়েই সরকার সন্তুষ্ট হননি। গুজব যে আরও কয়েকটি বড় বড় অভিযোগ ওঁদের বিরুদ্ধে আদালতে পেশ করা হবে।

সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে যখন কিছুটা হতাশা বোধ করছি ঠিক সেই সময় ভরত সিংজী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

ভরত সিং সামান্য কিছুদিনের মধ্যে আরও মোটা হয়েছেন। উচ্চতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় ভরত সিং ক্রমশ চৌকো হয়ে যাচ্ছেন। গোল মুখখানার পরিধি যেন আর একটু বেড়েছে। ভরত সিং-এর মেজাজ বেশ খুশী খুশী। সম্প্রতি তাঁর ওপর দিয়ে সুরজলাল নাগরচাঁদের বিশেষ কোনো ধকল যাচ্ছে বলে মনে হয় না।

ভরত সিং-এর জামা-কাপড়ের স্টাইলের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। শুনেছি, একদা এই ভরত সিং হলদে রংয়ের খাদি পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে ভাবনানি ম্যানসনে চাকরি করতেন—এমন কি একটি আধময়লা গামছাও তাঁর কাঁধে শোভা পেতো। কিন্তু সে সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। ভরত সিং-এর পরিধানে এখন হাল ফ্যাশানের স্যুট, যার প্রস্তুতকারক পার্ক স্ট্রীটের অভিজাত প্রতিষ্ঠান মিরজা আলী। ওই দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে একদিন ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। ভরত সিং সেদিন

কমপ্লেন করেছিলেন, ইণ্ডিয়ান টেলররা আজকাল ভাল কাজ করতে পারে না। তাঁর দু'খানা মূল্যবান ইংলিশ ড্রেস মেটিরিয়াল তারা প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে। হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, ভরত সিং এবার থেকে হয়তো খোদ স্যাভিল রো থেকেই স্যুট বানিয়ে আনবেন।

যে অদ্ভুত জামাকাপড় পরে ভরত সিং আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তার সবই ফরেন হতে পারে। একমাত্র দিশী জিনিস ওঁর স্ফীত মধ্যপ্রদেশটুকু।

ভরত সিং আমার সঙ্গে খুবই আন্তরিক ব্যবহার করলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, কয়েক সপ্তাহ ফরেনে থাকায় তিনি খোঁজখবর রাখতে পারেননি। ফিরে এসেই মিসেস বিশোয়াসের এক লেডি ফ্রেণ্ডের কাছে খবরাখবব পেয়ে তিনি প্রথম সুযোগেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

"সমবেদনা জানাতে?" আমি জিজ্ঞেস করি মিস্টার ভরত সিংকে।

জিভ কেটে ভরত সিং বললেন, "ঠিক তার উলটো। হিংসে করতে। নিজের চোখে তোমার সৌভাগ্যটা দেখতে এলাম।"

"এ সব কী রসিকতা করছেন, মিস্টার সিং?" আমি সত্যিই ওঁর হেঁয়ালি ধরতে পারছি না।

ভরত সিং বললেন, "সাত সাতখানা ফ্ল্যাটে একসঙ্গে তালা পড়লো—এটা কি কম ভাগ্যের কথা?"

"কী বলছেন মিস্টার সিং? আমার ভাড়া আদায়ের কী অবস্থা হলো একবার ভেবে দেখুন। সামনেই কর্পোরেশনের ট্যাক্স জমা দেবার দিন।"

ভরত সিং নিজের মত পরিবর্তন করলেন না। বললেন, "রেসের জ্যাকপট জিতলেও বাড়ির মালিকরা এতো খুশী হবেন না!"

আমি ভরত সিং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ভরত সিং হালকা মেজাজে বললেন, "আজ আপনি চা খাইয়ে দিন, মিস্টার শংকর। তালা পড়েছে মানেই তো একদিন তালা খোলা হবে, তখন আপনাকে কে দেখে?"

ভরত সিং লোকটি আমাদের লাইনের এনসাইক্লোপিডিয়া। বাড়িভাড়া সংক্রান্ত লিখিত আইন ও অলিখিত কানুন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সীমাহীন। এই রকম বিশেষজ্ঞকে অবশ্যই সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

ভরত সিংজীর জন্যে চা এলো। চায়ে দু'চামচ চিনি দেওয়া থাকে। কিন্তু একবার চুমুক দিয়েই টি-বয়কে তিনি আরও দু'চামচ চিনি 'তুরন্ত' আনবার নির্দেশ দিলেন।

বাড়তি চিনি মেশাতে মেশাতে ভরত সিং বললেন, "ভাগ্যবান স্বামীর বউ মরে, আর ভাগ্যবান বাড়িওয়ালার ভাড়াটেকে পুলিসে জেল দেয়। আপনি আবার স্পেশাল ভাগ্যবান—একখানা নয় দু'খানা নয়—হোলসেল রেটে সাতখানা পাখী এক ঢিলে মারা পড়লো!"

মিটমিট করে হাসছেন ভরত সিংজী। এবং আমি ওঁর হেঁয়ালির রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলাম। মিসেস চাওলার জেলে যাওয়া এবং দরজায় দরজায় তালা পড়া মানেই ভাড়া পড়ে থাকা। পর পর কয়েক মাস ভাড়ার ডিফলটার হওয়া মানেই ভাড়াটের বিপদ ডেকে আনা। কয়েক মাস পরে যখন ওঁরা তালা খুলতে আসবেন তখনই হয়তো অনাদায়ী ভাড়ার জন্যে উচ্ছেদের মামলা করে দেওয়া যায়। সাধারণ সময়ে মিসেস শকুন্তলা চাওলার মতো টেনান্টকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানোর কথা স্বপ্নেও ভাবা যেতো না।

আমার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখে ভরত সিং রসিকতা করলেন, "ব্যাপারটা এবার যেন বুঝেছেন মনে হচ্ছে।"

আমি মূর্খের মতো গর্ব প্রকাশ করলাম। ভরত সিংকে মনে করিয়ে দিলাম, একদা আমি ইংরেজ ব্যারিস্টারের বাবু ছিলাম, সুতরাং আইনের সমস্যা সমাধান আমার কাছে সহজ ব্যাপার!

ভরত সিং কিন্তু পরমুহূর্তেই মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কী বুঝেছো?"

আমি এবার অনাদায়ী ভাড়ার সুযোগে উচ্ছেদ মামলার পরিকল্পনা ওঁকে ব্যাখ্যা করলাম।

চৌষট্টি টাকার স্পেশালিস্ট ডাক্তার যেভাবে জুনিয়র ডাক্তারের সামনে হাসেন সেই ভাবে মিস্টার ভরত সিং আমাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন।

চায়ের কাপে চোঁ-চোঁ আওয়াজ করে ভরত সিং বললেন, "অতো অর্ডিনারি পয়েন্ট হলে ভরত সিং মাথা ঘামাতো না। অনাদায়ী ভাড়ার জন্যে উচ্ছেদের মামলা তো যে কোনো বটতলার উকিল করতে পারে, তার জন্যে এই সব ব্রেন দরকার হয় না," এই বলে ভরত সিং নিজের এবং আমার মাথার দিকে আঙুল দেখালেন।

"তা হলে?" ব্যাপারটা যে খুব সহজ নয় তা এবার বোঝা যাচ্ছে।

ভরত সিং বললেন, "নিয়ে আসুন আপনার খবরের কাগজের রিপোর্ট।"

যে খবরের কাগজে কিছুদিন আগে শকুন্তলা চাওলার সপরিবারে জেল শাস্তি ভোগের খবরটা বেরিয়েছিল তা পুরনো খবরের কাগজের স্তূপ থেকে খুঁজে বার করলাম।

"নো নো, দিস ইজ ব্যাড," আমাকে ইংরিজীতে বকুনি লাগালেন ভরত সিং। "এই সব মূল্যবান দলিল তুমি এখনও কেটে নিয়ে ফাইলবন্দী করো-নি? খবরের কাগজের একটা লাইন অবহেলা করি না আমি। বরুণা প্রপার্টিজ সম্বন্ধে কিছু বেরোলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে কেটে নিয়ে ফাইলে রেখে দিই। এই সব কাটিং সোনার চেয়ে দামী, মিস্টার শংকর।"

ভরত সিং এরপর আবার বললেন, "হাউ লাকি ইউ আর! সত্যি আপনাকে হিংসে করতে ইচ্ছে হচ্ছে। নিজের অজান্তে আপনি সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন।"

তালার উপর তালা ঝুলছে—এর সঙ্গে সোনার খনির সম্পর্ক কী? আমি মিস্টার ভরত সিং-এর কথাবার্তায় আর তেমন ভরসা রাখতে পারছি না।

শূন্য চায়ের কাপটা টেবিলের এক কোণে সরিয়ে দিলেন ভরত সিং। পকেট থেকে সুগন্ধ রুমাল বার করে নাকের ডগা মুছে নিলেন। তারপর তিনি নাটকীয়ভাবে আমাকে জেরা শুরু করলেন।

"মিসেস শকুন্তলা চাওলার এসটাব্লিশমেন্ট রেড করেছিল কারা?"

"কাস্টমস ও পুলিস। পরের দিন আবগারী বিভাগের ইনসপেকটরও যোগ দিয়েছিলেন।"

"কাস্টমস কী কী কেস করেছিল ওঁদের বিরুদ্ধে?" ভরত সিং-এর প্রশ্ন।

"কাগজের রিপোর্ট পড়ে বুঝলাম ডজনখানেক কেস—বেআইনী সোনা রাখার অভিযোগ, বেআইনী ডলার এবং পাউন্ড রাখার কেস, বিনা লাইসেন্সে জাহাজী সিগারেট ও মদের বোতল রাখার অভিযোগ, আরও কত কী!"

"ফার্স্ট ক্লাস। এই সব প্রত্যেকটি অভিযোগে ওঁদের সাজা হয়েছে?"

প্রশ্ন করলেন মিস্টার ভরত সিং।

"জেল এবং জরিমানা দুই-ই", আমি উত্তরে জানাই।

ভরত সিং বললেন, "নাউ এক্সাইজ কেস। ওঁরা কী করলেন?"

"বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা", আমি উত্তর দিলাম। "ওঁরা ক্রেট-ক্রেট বিলিতী মদের ওপর ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যে কী একটা কেস করেছেন। ওই সব মদের স্টক তাঁরা বাজেয়াপ্ত করার নোটিশও দিয়েছেন। আর তৃতীয় কেসটা আরও কড়া। ক'দিন আগেই সিলভার ড্রাগনের বার-লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। মিসেস চাওলার বার-লাইসেন্স চেক করতে আসবার সাহস এর আগে কারুর ছিল না। এখন আরও একটা সিরিয়াস কেসের আসামী হলেন ওঁরা—বিনা অনুমতিতে মদের ব্যবসা চালানো।"

ভরত সিং আবার ব্যারিস্টারি স্টাইলে প্রশ্ন করলেন, "একসাইজ কেস-গুলোতে কী হলো?"

"সে রিপোর্টও সংবাদপত্রের আইন ও আদালত স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েক মাস জেল খাটবার এবং জরিমানা দেবার হুকুম দিয়েছেন আদালত।"

ভরত সিংজী বললেন, "গুড। কিন্তু আমাদের পয়েণ্ট এখনও শেষ হয়নি। লাস্ট বাট নট দি লিস্ট—পুলিস। তাঁরা কী করলেন?"

"থানার পুলিস নয়—লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের অ্যাসি-সটেন্ট কমিশনার সদলবলে এসেছিলেন।"

"তাঁরা কী করলেন?" আবার প্রশ্ন তুললেন ভরত সিংজী।

"ডজনখানেক মেয়েকে সিলভার ড্রাগনের ছোট ছোট খুপরি থেকে তুলে নিয়ে গেলেন ওঁরা। আমরা ভেবেছিলাম ওদেরও হাজতবাস হবে। কিন্তু থানায় ওদের আলাদা-আলাদা স্টেটমেণ্ট নিয়ে তখনকার মতো ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার।"

ভরত সিংজীঃ "এদের সম্বন্ধে কাগজে কি বেরিয়েছে?"

"পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইনে এই সব মেয়েদের ধরা হয়। এবং তারা আদালতে একের পর এক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলে যে মিসেস শকুন্তলা চাওলা এবং তাঁর সুযোগ্য জামাই প্রকাশ্যে এই ঘৃণ্য ব্যবসা চালাতেন। অর্থের অভাবে মেয়েরা এ-লাইনে এসেছে এবং তাদের রোজগারের প্রধান অংশ এনট্রান্স ফি হিসেবে মালিকদের হাতে নিয়মিত তুলে দিয়েছে।"

"এই কেসে কী হয়েছে?"

"আদালত ওই সব মেয়েদের কোনো শাস্তি দেননি। কিন্তু অর্থের লোভে পতিতালয় পরিচালনার অভিযোগে শকুন্তলা চাওলা ও তাঁর জামাইকে আবার জেলে পাঠিয়েছেন।"

ভরত সিং বললেন, "অর্থাৎ প্রমাণ হয়েছে যে মিসেস চাওলা ঘৃণ্য কাজে এই থ্যাকারে ম্যানসনের ঘরবাড়ি ব্যবহার করেছেন।...নাউ, এবার বলুন, থ্যাকারে ম্যানসনের এই গৃহস্থ বাড়ি আপনি মিসেস চাওলাকে পতিতালয় হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন?"

"অবশ্য নয়।" মিস্টার সিং-এর প্রশ্নে আমার কাল হয়ে উঠলো।

মিস্টার সিং বললেন, "এইটাই সুবর্ণ সুযোগ। আইনে বলছে, বেআইনী কাজে ভাড়াটে বাড়ি ব্যবহারের অধিকার ভাড়াটের নেই। টুক করে এই সুযোগে মামলা ঠুকে দিন—এই সব ফ্ল্যাট এখনই আপনার হাতে ফিরে আসবে। ইমম-

রাল ট্রাফিক আইনের মামলার রায়ের কপি ঝটপট জোগাড় করে নিন, তারপর উচ্ছেদের মামলা ঠুকুন। স্ট্রাইক দ্য আয়রন হোয়েন ইট ইজ রেড—বুঝলেন মিস্টার শংকর," এই বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন ভাবনানি ম্যানসনের প্রাক্তন ম্যানেজার এবং সুরজলাল নাগরচাঁদের দক্ষিণ হস্ত শ্রীভরত সিং।

মিস্টার ভরত সিং-এর অমূল্য উপদেশ আমার সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলো। একই সঙ্গে এতোগুলো ফ্ল্যাট রাহুমুক্ত করার সুযোগ নাকি খুব কম ভাগ্যবানের জীবনেই এসে থাকে।

ভরত সিং আরও বলেছিলেন, "মিস্টার শংকর, তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি। তাই এই স্পেশাল ফর্মুলা দিলাম। বহু সাধনা করে এইসব ওষুধ আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। টম-ডিক-হ্যারিকে এই জ্ঞান আমি কিছুতেই দিতাম না।"

কী জানি? ভরত সিংজী যে কেন আমার ওপর এতো সদয় হলেন, তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু তিনি যে সত্যিই আমার ওপর দয়াপরবশ হয়ে এসব বুদ্ধি দিচ্ছেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

ভরত সিংজী বলেছিলেন, "মিস্টার শংকর, আমি তো সামান্য গেটকীপার থেকে এই বরুণা প্রপার্টিজের রেসিডেন্ট ডিরেকটর হয়েছি। আপনিও একদিন আমার মতো উন্নতি করতে পারেন যদি চোখ-কান খোলা রাখেন, যদি দেওয়ালের ওপর ভবিষ্যতের লেখাগুলো পড়তে পারেন।"

ভরত সিংজী এবার সস্নেহে পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, "মিস্টার শংকর, জমিজমা বাড়িঘরদোরের এই রিয়েল এসটেট বিজনেস শেয়ার মার্কেট এবং ঘোড়ার রেসিং-এর থেকেও 'একসাইটিং—ইফ ওনলি' এই ব্যবসার রহস্যটা একবার বুঝতে পারো।"

ভরত সিংজী চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিলেন। কী ভেবে তিনি আবার বসে পড়লেন। বললেন, "সাধারণ লোকের ধারণা, কেবল জুট, গানি এবং শেয়ারের ফাটকাতেই কলকাতার স্পেকুলেটররা অঢেল পয়সা করেছে। তুমি জেনে রাখো, এর থেকে কম পয়সা করেনি কলকাতার জমিজমার ফাটকাবাজরা।"

· "জমিজমা-বাড়িঘরদোরে আর একটা মস্ত সুবিধে রয়েছে। জমি ইজ গডেস লছমি। পাটের দাম আচমকা ধ্বসে গিয়ে স্পেকুলেটরকে ডোবাতে পারে—কিন্তু ক্যালকাটার গডেস কালী এমনই পাওয়ারফুল যে এ শহরের আশেপাশে জমির দাম সেই জোব চার্ণকের সময় থেকে শুধু বেড়েই চলেছে।"

আমি মন দিয়ে ভরত সিংজীর কথা নীরবে শুনে যাচ্ছি। ভরত সিংজী বললেন, "ভাবনানি ম্যানসনের পাশে সেকালের সায়েরবাড়িগুলো যখন একের পর এক সুরজলাল নাগরচাঁদকে কিনিয়ে দিয়েছিলাম, তখন অনেকেই আমাকে বদ্ধপাগল ভেবেছিল। কেউ কেউ বলেছিল, বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে আমি সুরজলাল নাগরচাঁদকে পথে বসাচ্ছি।

সুরজলালজী তখন শেয়ার এবং জুটের ফাটকা থেকে টু পাইস কামিয়ে অন্ত কোনো ভদ্রলাইনে সরে আসবার সুযোগ খুঁজছেন। জহুরী লোক ওঁরা—আমার মতলব নিয়ে নিলেন। বললেন, একের পর এক বাড়ি কিনে যাও।”

নিজের কৃতিত্বে গর্বিত ভরত সিংজী বললেন, “তোমাকে যখন সব খবরই দিচ্ছি তখন আরও একটা সিক্রেট শুনে রাখো। জমিজমা সম্পত্তি কেনবার সময় কখনও দু'চার পয়সার জন্যে টানাটানি করতে নেই। আমাদের বরুণা প্রপার্টিজের পলিসি হলো বাজার দর থেকে একটু বেশী প্রাইসে প্রপার্টি কেনা। যার দাম একশ টাকা তাকে একশ এক টাকা দাও।”

আমার মুখের দিকে তাকালেন ভরত সিংজী। “ভাবছেন, আমরা টাকা নষ্ট করছি এইভাবে? মোটেই না। জাস্ট দ্য অপোজিট। আমাদের এখন সুনাম হয়েছে যে, লোকে প্রথমে এসে আমাদের কাছেই সম্পত্তি অফার করে। দরাদরি করে লেবু তেতো করলে কী হয় তার দু'একটা উদাহরণ শুনবে?”

ভরত সিংজী বললেন, “ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানির নাম শুনেছো? বহুদিনের পুরনো সায়েব কোম্পানি। সায়েবদের নবাবীতে বিজনেসের যে অবস্থাই হোক, কোম্পানির বিলডিং এবং ল্যানডেড প্রপার্টি অনেক ছিল। সায়েবরা ওই কোম্পানিকে প্রথমে গোয়েঙ্কাদের কাছে অফার করেছিলেন। কুড়ি লক্ষ টাকা হলেই অমন কোম্পানি হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসে। কিন্তু গোয়েঙ্কাজীর সেই পুরনো স্বভাব—দরদস্তুর না করলে ওর ভাত হজম হয় না। বুড়ো হরিদাস গোয়েঙ্কা বললেন—নাইনটিন লাখ। অপ্রস্তুত সায়েবরা বললেন, কালকে ফাইনাল বলবো।”

“ভিতর থেকে সিক্রেট খবর পেয়ে আমাদের নাগরচাঁদজী সেই রাত্রেই ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানির মিডলটন সায়েবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, সায়েব আমি দরাদরির ওই মেছোবাজার মেণ্টালিটি নিয়ে তোমার কাছে আসিনি। আমি তোমাকে সাড়ে কুড়ি লাখ টাকার অফার দিলাম। মিডলটন সায়েব খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাকা কথা দিয়ে দিলেন। পরের দিন খবর পেয়ে হরিদাস গোয়েঙ্কা টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে সায়েবের কাছে চলে এলেন। মিডলটন সায়বকে বললেন, 'তোমাকে আমি টোয়েণ্টি-ওয়ান লাখ অফার করছি।' কিন্তু মিডলটন সায়েব বাচ্চা। সোজা গোয়েঙ্কাকে বলে দিলেন, তুমি বড্ড দেরিতে এসে পড়েছো মিস্টার গোয়েঙ্কা। সুরজলাল নাগরচাঁদের সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গিয়েছে।”

একগাল হেসে ভরত সিংজী বললেন, “তখন হরি গোয়েঙ্কার যা অবস্থা! দেখলে আপনার চোখে জল এসে যাবে! হরি গোয়েঙ্কা সায়েবের হাত ধরে বলেছেন, আমি গডের নামে শথপ করছি, আর কখনও দরদস্তুর করবো না, আমাকে ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানি কিনতে দাও। এই কোম্পানি না পেলে আমার বুক ফেটে যাবে। কিন্তু সায়েব বাচ্চা অত সহজে ভেজবার পাত্র নয়। সোজা বলে দিলো, তুমি বরং সুরজলাল নাগরচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করো—ওঁরা হয়তো তোমাকে ফেট্‌লওয়েল কুলেন আবার বিক্রি করতে পারেন।”

ভরত সিংজী জানালেন, লজ্জার মাথা খেয়ে বুড়ো হরিদাস গোয়েঙ্কা তখন ভরত সিংজীর মাধ্যমে নাগরচাঁদজীর কাছে আবেদন করেছিলেন ফেট্‌লওয়েল কুলেন কোম্পানি না কিনতে পারলে তাঁর নাকি ফ্যামিলিতে প্রেস্টিজ

থাকবে না। আদরের ছোট নাতিকে জন্মদিনে একটা বিলিতী কোম্পানি উপহার দেবেন বলে তিনি নাকি নাতবউকে চিঠি লিখে বসে আছেন।

নাগরচাঁদজী তো প্রথমে বুড়ো গোয়েঙ্কাকে এড়াবার জন্যে সাউথ ইণ্ডিয়া ট্যুরে বেরিয়ে গেলেন, ফিরলেন পনেরো দিন পরে। আদরের নাতির বার্থডে এগিয়ে আসছে দেখে অধৈর্য হরিদাস গোয়েঙ্কা ইতিমধ্যে কুড়ি লাখ টাকার কোম্পানির জন্যে তিরিশ লাখ টাকা অফার করলেন। কিন্তু সুরজলাল নাগরচাঁদ কোম্পানির মালিকরা নরম হলেন না। এই ভরত সিংজী শেষ পর্যন্ত হরি গোয়েঙ্কার সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এলেন, তাঁরা খুব দুঃখিত, কিন্তু এখন কিছুই করবার নেই। কারণ নাগরচাঁদজীর ফ্যামিলি অ্যাসট্রোল-জার কোষ্ঠি বিচার করে এখন কেবল কিনতেই পরামর্শ দিয়েছেন, বেচলে কোষ্ঠির ফল খুব খারাপ হবে। হরি গোয়েঙ্কাজী বরং এর থেকেও ভাল কোনো বিলিতী কোম্পানি কিনে নাতির জন্মদিনে উপহার দিন!

ভরত সিংজী এবার হরিদাস গোয়েঙ্কার কল্পিত দুঃখে হাসতে লাগ-লেন। বললেন, “দু'নম্বর উদাহরণ দিই আপনাকে। একটা এগজাম্পলে আপনার পুরোপুরি বিশ্বাস নাও হতে পারে।”

“অমন গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল। মাত্র ফিফটি থাউজেণ্ড রুপিজের দরা-দরিতে সুবলপুরের রায়দের হাত থেকে ফসকে গেলো। সুবলপুরের ফেমাস রায় ফ্যামিলি—টাকার কুমীর। কিন্তু বুড়ো মিস্টার রায়ের পুরনো হ্যাবিট, পুরো দামে এক কথায় তিনি কোনো সম্পত্তি কিনবেন না। মিস্টার রায়ের ছোট ছেলে অবশ্য প্রাইভেটলি গ্রেট ইণ্ডিয়ানের মালিক মিস্টার স্টিভেনকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, ‘আপনি বরং গোড়াতেই একটু দাম বাড়িয়ে বলুন, যাতে বাবা কিছুটা দরাদরির স্যাটিসফ্যাকশন পান।’ কিন্তু স্টিভেন সায়েবও একগুঁয়ে লোক। তিনি বললেন, ‘ফিকস্ড প্রাইস’ এই ফিলজফির ওপরেই সমস্ত ব্রিটিশ নেশন দাঁড়িয়ে আছে। আট লাখ টাকার হোটেলের জন্যে সাড়ে আট লাখ চেয়ে, তারপর আবার আট লাখে রফা করা আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।’ রায়দের এমনই ব্যাড লাক যে ঠিক ওই সময় সিমলার এক পার্টি এসে এক কথায় আট লাখে রাজী হয়ে গেলেন। ওই পার্টির হাতে পুরো ক্যাশ ছিল না—কিন্তু স্টিভেন সায়েব তাতেও আপত্তি করলেন না। আড়াই মাসের মধ্যে কিস্তিতে টাকা নিতে রাজী হলেন এক কথায়!”

ভরত সিংজী হেসে বললেন, “সুরজলাল নাগরচাঁদের পলিসিতে যে বোকামি নেই তা এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?”

আমাকে অবশ্যই ওঁর সঙ্গে একমত হতে হলো। সব সময় সস্তায় কিনতে চেষ্টা করা যে নিরাপদ নয় তা অবশ্যই বুঝতে পারছি. মিস্টার রায়ের মতো এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা পোস্টাপিসে খাম পোস্টকার্ড কিনতে গিয়েও দরাদরির জন্য উসখুস করেন!

ভরত সিংজী বললেন, “মাথায় একটু বাড়তি বুদ্ধি থাকলেই বিজনেস করা যায়—তারজন্যে ক্যাপিটাল দরকার হয় না। আপনিও ইচ্ছে করলে এই রিয়েল এসটেটের বিজনেসে ঢুকে পড়তে পারেন।”

আমার কাছে একশ টাকাও নেই, আমি আবার কীভাবে বিজনেসে নামবো?

ভরত সিংজী প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "যাঁরা এই কলকাতায় এখন কোটি কোটি টাকার বিজনেস করছেন তাঁরা ক'পয়সা সঙ্গে নিয়ে এই শহরে এসেছিলেন? সুরজলালজীর বাবা তো এক টাকা দশ আনা পকেটে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে নেমেছিলেন। এই যে আমি। নিজের অ্যাকাউণ্টে একখানা ছোট ম্যানসনের মালিক হয়েছি, আমার ক্যাশ কী ছিল।"

ভরত সিংজী যে এতখানি গুছিয়েছেন তা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। ভরত সিং আমাকে ভরসা দেবার জন্যে ব্যাখ্যা করলেন, "দেখুন, বড় বড় শহরে ক্যাপিটালের অভাব নেই—লাখ লাখ টাকা খাটাবার জন্যে হাজার হাজার কুঁড়ে এবং বোকা লোক রেডি হয়ে বসে আছে। যা অভাব তা হলো বিজনেস আইডিয়ার। ঠিক মতো বুদ্ধি বার করতে পারলে, বিজনেসের পয়সা হাওয়া থেকে এসে যায়। বিবেকানন্দ স্বামীই তো বলে গিয়েছেন, পয়সার অভাবে কখনও কোনো বড় কাজ আটকে থাকে না। ছোটবেলায় এক মিটিংয়ে আমি কথাটা শুনেছিলাম। তারপর এ লাইনে হোল লাইফ কাটিয়ে বুঝেছি, বিবেকানন্দ স্বামী টপ বিজনেসম্যান ছিলেন।"

ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অন্ধকারের ওপরে ভরত সিংজী এবার তাঁর দূরদৃষ্টির আলোকসম্পাত করলেন। বললেন, "কলকাতার ভবিষ্যৎটা রঙীন ছবির মতো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অতীতে ছিল—জমি কেনো। জমি কাউকে ঠকায় না। এর পর এলো জমির ওপর বাড়ি করার পর্ব। তারপর এলো ভাড়া বাড়ানোর যুগ। যেন-তেন-প্রকারেণ বাড়িভাড়া বাড়িয়ে চলো। রেণ্ট কনট্রোলের দয়ায় পুরনো বাড়ির ভাড়া বাড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন আবার নতুন যুগ আসছে কলকাতার সায়েব পাড়ায়। ব্রহ্মা বিষ্ণুর পরে মহেশ্বর—এবার ভাঙার পালা।"

ভরত সিংজীর ভবিষ্যৎদৃষ্টি আমার কাছে তেমন স্পষ্ট হচ্ছে না। ভরত সিং বোধ হয় তা বুঝতে পারলেন। মৃদু বকুনি লাগিয়ে বললেন, "এতোদিন বড় ব্যারিস্টারের চেম্বারে কাজ করে আপনার কী লাভ হলো, মিস্টার শংকর? খুব সহজ জিনিসটাও মাথার মধ্যে ঢোকাতে পারছেন না।"

দাঁত বার করে হাসতে লাগলেন মিস্টার ভরত সিং। বললেন, "শুনুন, মিস্টার শংকর—এখন যে ভাঙবে সে জিতবে। যে রাখতে চাইবে সে হেরে যাবে। আপনি তো জানেন, লর্ড শিভা হচ্ছেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল, তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু কেউ পেরে ওঠেন না। এবং শিভাই হচ্ছেন ইনচার্জ অব ডিমলিশন।"

কর্পোরেশনের ডিমলিশন স্কোয়াডের ম্যানেজার হিসেবে নটরাজ শিবকে কল্পনা করতে বেশ কৌতুক বোধ করছি।

কিন্তু ভরত সিংজী মোটেই রসিকতা করছেন না। তিনি গম্ভীরভাবেই তাঁর গোপন সংগ্রহের কয়েকটি মূল্যবান রত্ন আমাকে উপহার দিতে শুরু করলেন।

ভরত সিংজী বললেন, "আরব দেশে মরুভূমির তলায় তেলের খনি আছে। আর আমাদের এই সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায় ছোট ছোট জমির ওপর টাকার খনি রয়েছে। ঝুটঝামেলা ম্যানেজ করে, এ-পাড়ার একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি থেকে ভাড়াটে বিদায় করো। তারপর উদ্ধার সিং অ্যাণ্ড কোম্পানিকে খবর দিয়ে ওইসব বাড়ি তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলো। সেইসঙ্গে আর্কিটেক্টকে

খবর দাও। দোতলা তিনতলা বাড়ির যুগ শেষ হয়েছে—সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় ওসব বাড়ির দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার নেই। এখন দশতলা, পনেরোতলা, বিশতলা বাড়ির যুগ।"

ভরত সিংজী এবার আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। "কী ভাবছেন, মিস্টার শংকর? যেভাবে ক্যালকাটা এগিয়ে চলেছে সেভাবে হিসেব করলে তিন বছরের মধ্যে পাঁচতলা বাড়িও সিক লিস্টে পড়ে যাবে—ডিমলিশন কনট্রাক্টর উদ্ধার সিং-এর তাই তো ধারণা। সে তো অনেক বাড়ি সম্বন্ধে অ্যাডভান্স এস্টিমেট করে রাখছে।"

উদ্ধার সিং লোকটির নাম আমি আগে শুনিনি। কিন্তু ভরত সিং-এর বর্ণনায় মনে হলো, এই লোকটিকে 'পুরনো-বাড়ির কসাই' বলা চলতে পারে।

ভরত সিংজী বললেন, "জমির ওপর পুরনো বাড়ি একবার খালি করতে পারলে আর কোনো চিন্তা নেই। বাড়ি ভাঙার জন্যে উদ্ধার সিংকে এক পয়সাও দিতে হয় না। বরং উদ্ধার সিংই বাড়ির পুরনো ইট, কাঠ, পাথর এবং রাবিশের জন্যে নগদ টাকা গুনে দিয়ে যাবে।"

ভরত সিংজী স্বীকার করলেন, "সব চেয়ে শক্ত ব্যাপার এই ভাড়াটের 'উকুন' সাফ করা।"

ও ব্যাপারেও ভরত সিংজীর নিজস্ব গবেষণা আছে। ভরত সিংজী বললেন, "ভাড়াটে বিদেয় করবার জন্যে ভগবান যখন দুখানা হাত দিয়েছেন তখন দুটোরই সদ্ব্যবহার করতে হবে। এক হাত ভাড়াটের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে এবং আর অন্য হাত তার ঘাড়ে ধাক্কা দেবার জন্যে সর্বদা রেডি রাখতে হবে।"

ভরত সিংজী এবার ব্যাখ্যা করলেন, "শুধু ঘাড়ধাক্কা দেবার যুগ কলকাতা থেকে চলে গিয়েছে, মিস্টার শংকর। মামলার নাম করে উকিল মুহুরীরা শুধু আপনার কাছ থেকে মাসের পর মাস পয়সা নিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি ফল কিছুতেই পাওয়া যাবে না। তাই আমরা অনেক পয়সাটা উকিলের পিছনে না ঢেলে ভাড়াটের পিছনেই ইনভেস্ট করি। নগদ নারায়ণের দৌলতে অনেক ভাড়াটে সুড় সুড় করে পুরনো বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।"

"ওখানেও সুরজলাল নাগরচাঁদের পলিসি খুব ক্লিয়ার—দু'পাঁচ হাজার টাকার জন্যে আমরা জল ঘোলা করি না। আজকেই তো ভাবনানি ম্যানসনের এক ভাড়াটের মালপত্তর আমাদের নিজস্ব লরিতে পার্কসার্কাসে পৌঁছে দিয়ে এলাম।"

"এসব সার্ভিস দিতেই হয়," আমাকে উপদেশ দিলেন মিস্টার ভরত সিং। "উঠে যেতে রাজী হলে আমরা গঙ্গাজলে ভাড়াটের পা পর্যন্ত ধুইয়ে দিতে রেডি আছি।"

সুরজলাল নাগরচাঁদের রেসিডেনট ডিরেকটর ভরত সিং-এর কর্মজীবনে অভাবনীয় সাফল্যের কারণগুলো এতোদিন পরে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভরত সিংজী আজ যেন জ্ঞানের কল্পতরু হয়েছেন। কোনো কিছু গুপ্ত-বিদ্যা তিনি আমাকে দান করতে দ্বিধা বোধ করছেন না।

ভরত সিংজী বললেন, "মামলা-মোকদ্দমা অথবা ক্যাশ ইনসেনটিভ—এই

দুই ওষুধে শতকরা নিরানব্বুইজন টেনাণ্টকে বিদায় করা যায়। কিন্তু এক পারসেণ্ট কেস আছে যা মিঠে কড়া কোনো ওষুধেই নরম হতে চায় না। তাদের নিয়েই বড় বড় পার্টিরা বিপদে পড়ে যান। চোখানি প্রপার্টিজের মিস্টার চোখানির তো হার্ট অ্যাটাক হলো এক জোড়া ভাড়াটের দাপটে। সেভেন লাখ রুপেয়া আটকে গেলো মিস্টার চোখানির—এদিকে ওই ভাড়াটে লোয়ার কোর্ট থেকে হাইকোর্ট, হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছেন। যেদিন সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরুলো এবং ট্রাঙ্ক টেলিফোনে খবর এলো যে মিস্টার চোখানির জিত হয়নি, সেইদিন রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার আগে মিস্টার চোখানি বুকে পেন ফিল করতে লাগলেন।”

“অথচ আমার নাড়ী দেখুন—সব সময় শান্তভাবে রয়েছি, কোনোরকম একসাইটমেণ্ট নেই,” এই বলে ভরত সিং নিজের হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। সহজে যারা আমার মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে জমিজমা বাড়ি ঘরের লাইন যে তাদের জন্যে নয় তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।

হাত গুটিয়ে নিয়ে ভরত সিং বললেন, “একটা টেনাণ্টের জন্যে মিস্টার চোখানির করোনারি অ্যাটাক হলো অথচ সুরজলাল নাগরচাঁদের ফাইলে ওইরকম এগারোখানা কেস ছিল এক সময়।”

ভরত সিং বললেন, “নাগরচাঁদজীকে জিনিয়াস বলতে পারেন। ওই এগারোটা পার্টির ওপর আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু নাগরচাঁদজী শান্তভাবে আমাকে উপদেশ দিলেন, শাস্ত্রে বলছে যা সারানো যায় না তা সহ্য করে নিতে হয়। চোখানিয়াজী নতুন প্লটে ক'খানা ফ্ল্যাট তুলতেন?” আমি বললাম, “আশিখানা। নাগরচাঁদজী উত্তর দিলেন, “একজনের জন্যে আশিখানা ফ্ল্যাট আটকে গেলো। তার থেকে ওই ভাড়াটেকে একখানা নতুন ফ্ল্যাট দিয়ে হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেললেন না কেন? চোখানিয়াজী না হয় ভাবতেন যে উনআশিখানা ফ্ল্যাটের স্কীমই নিয়েছেন তিনি।”

ভরত সিং বললেন, “বিশ্বাস করবেন না, নাগরচাঁদজীর ওই স্কীমে আমি এগারোটা কেসই ফয়সালা করে ফেললাম তিন দিনের মধ্যে।”

ভরত সিংজী বললেন, “সে-তুলনায় আপনার কথা ভাবলে আমার হিংসে হচ্ছে, মিস্টার শংকর। আপনার ল্যান্ডলেডি হাউ লাকি সি ইজ এবং হাউ লাকি ইউ আর। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সাত-আটখানা ফ্ল্যাট এবার আপনি খালি করে ফেলতে পারবেন।”

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম ভরত সিং-এর প্রতি। তিনি বললেন, “এ তো সামান্য ব্যাপার। তোমাকেও আমার দরকার হবে মিস্টার শংকর। তখন তুমি নিশ্চয় আমাকে হেল্প করবে।”

“কী দরকার বলুন?” আমি ভরত সিংজীর মুখ খুলতে অনুরোধ করলাম।

কিন্তু ভরত সিংজী আজ আর বেশী-দূর এগোলেন না। বললেন, “আজ তুমি নিজের কাজে এগিয়ে যাও। ল্যান্ডলেডির কাছে গিয়ে নিজের সম্বন্ধে ক্রেডিট নাও। আমার ব্যাপারে আমি আসবো—খুব শীঘ্র তোমার সঙ্গে দেখা হবে।”

ভরত সিংজী এবার আরও এক স্টেপ এগিয়ে গেলেন। বললেন, “বিনা ক্যাপিটালে বিজনেসের কথা হচ্ছিল না? এই তো আপনার সামনে সুবর্ণ সুযোগ। আটখানা ফ্ল্যাট থেকে মিসেস চাওলাকে বিদায় করে, চারখানা ফ্ল্যাট

বেনামে নিজেই ভাড়া নিয়ে নিন আপনি। ওই ক'খানা ফ্ল্যাটের সেলামির টাকায় একটা ছোটখাট বিজনেস শুরু করে দিন। দেখবেন ক'বছরের মধ্যে আপনি নিজেই টাকার ওপর শুয়ে আছেন।"

ভরত সিংজী এবার উঠে পড়লেন। যাবার আগে আমাকে সর্ববিষয়ে সব রকম সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এবং জানালেন তিনি শীঘ্রই আমার কাছে অন্য ব্যাপারে আসবেন।

এই 'অন্য' ব্যাপারটা কী হতে পারে, আমি একলা বসে-বসে ভাবতে ভাবতে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম।

চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে বেশ কয়েক-বার চেষ্টা করেছি। জরুরী কথাবার্তা বলবার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতে দেখে চন্দ্রোদয় ভবনের দারোয়ানজী আমাকে মৃদু বকুনি লাগিয়েছেন। "বাবুজী, কেন আপনি এখানে এসে চুপচাপ বসে থাকেন ?" সাংসারিক কোনো কাজে মাতাজীর এখন নাকি মন নেই। ঘুমনোর সময়টুকু বাদে সব সময় তিনি ঠাকুরঘরে বসে আছেন। একবার মাত্র কয়েক-মিনিটের জন্য বেরিয়ে এসে তিনি সামান্য কিছু খেয়ে নেন—তাও রান্না ভাত নয়, ঠাকুরের প্রসাদ। প্রসাদ গ্রহণের পর দ্বিতীয়বার স্নান শেষ করে, তিনি আবার ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়েন এবং চামর নাড়িয়ে ঠাকুরকে ঘুম পাড়ান।

ভিতরের কর্মচারীদের কাছ থেকে আরও খবর পাওয়া গেলো। জরুরী তারবার্তা পেয়ে কোন্ সুদূর তীর্থস্থান থেকে বিলাসিনী দেবীর মন্ত্রদাতা গুরুদেবও চন্দ্রোদয় ভবনে পদধূলি দিয়েছিলেন। সব অশান্তির শীঘ্রই সমাধান হবে এমন ভরসা অবশ্যই তিনি বিলাসিনী দেবীকে দিয়েছেন, কিন্তু পরিবর্তে বারো হাজার গুপ্ত বীজমন্ত্র প্রতিদিন পুনরাবৃত্তির গুরু-নির্দেশ মিলেছে। এই মন্ত্রপাঠ কতদিন ধরে চলবে তা একমাত্র বিলাসিনী দেবী ছাড়া কেউ জানে না।

অগত্যা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু তার আগে বিলাসিনী দেবীকে থ্যাকারে ম্যানসনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ পত্র ওখানকার কাগজ-কলমেই লিখে ফেলেছি। বিশেষ করে শকুন্তলা চাওলার বিরুদ্ধে আইন-আক্রমণের সুযোগটা যে অবিলম্বে নেওয়া প্রয়োজন তাও জানিয়েছি তাঁকে। এ বিষয়ে আমি মিস্টার ভরত সিংএর নাম উল্লেখ করতেও দ্বিধা করলাম না। তাঁর গোপন পরামর্শ যে বিলাসিনী দেবীর স্বার্থের পক্ষে মহা-মূল্যবান হতে পারে তাও লিখে দিলাম।

সাক্ষাতের সুযোগ না মিললেও বিলাসিনী দেবী সম্পূর্ণ নীরব রইলেন না। পূজা ও প্রার্থনার মধ্যেও বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে ওঠেন নি তা কয়েক দিনের মধ্যেই জানা গেলো। চন্দ্রোদয় ভবনের একজন দূত দিন দুই পরে থ্যাকারে ম্যানসনে এসে জানিয়ে গেলেন, শকুন্তলা চাওলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেন আমি নিজেই গ্রহণ করি। দূত

আরও জানালেন যে এ-ব্যাপারে আমি যেন ভরত সিংজীর উপদেশ গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত না হই।

তার পরের দিনই গণপতিবাবু কাগজ-পত্তর বগলে করে হাজির হলেন। বললেন, "ছোটখাট বৈষয়িক ব্যাপারে বিলাসিনী দেবীকে বিব্রত কোরো না, শংকর।"

"ছোটখাট বিষয়! শকুন্তলা চাওলার মামলার বিষয়টা আমাদের মতো ম্যানেজারের জীবনে বৃহৎ এক ঘটনা।"

গণপতিবাবু মৃদু হাসলেন। "তোমাদের কাছে বৃহৎ ঘটনা। কিন্তু সংসারের কেসানার শিকল কেটে মুক্তির জন্য যিনি ছটফট করছেন তাঁর কাছে কোন ঘরে কোন্ ভাড়াটে রইলো তাতে কী এসে যায়?"

গণপতিবাবু বললেন, "তোমার কোনো চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি। এই নাও তোমার পাওয়ার।"

"পাওয়ার?"

'হাওড়া কোর্ট এবং হাইকোর্টের সব ব্যাপার এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি? পাওয়ার গো। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি—আম মোক্তারনামা। তোমার নামেই আমমোক্তারনামা লিখে দিয়েছেন বিলাসিনী দেবী, যাতে ওই জাঁদরেল মহিলার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমার সময় ওঁকে কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।"

পাওয়ারখানা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে গণপতিবাবু বললেন, "আমি খুব খুশী হয়েছি, শংকর। হরি উকিলের ছেলের মতোই বুদ্ধি দেখিয়েছো তুমি। এবার ওই সিলভার ড্রাগনের চাওলাগুষ্টিকে ঝাড়ে বংশে নিপাত করবার যে মতলব তুমি দিয়েছো তা অ্যাটর্নিপাড়ার বড় বড় উকিলের মাথাতেও আসতো না।

ছাত্রের কৃতিত্বে গর্বিত গণপতিবাবু বললেন, "বড় বড় ব্যারিস্টার কেন, এই গণপতি সামন্তও এবার তোমার কাছে হার মেনেছে। এতোদিন উল্টো সিধে, নরম, মেডিসিন সার্জারি কত উপায়ে কত ভাড়াটাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছি। ওই তো আমার কাজ, ভাঁড়াটে এবং ঠিকে-প্রজা উচ্ছেদ করে বাবুদের হয়ে খাস দখল নেওয়ার জন্যেই তো আমার জন্ম! তবু এই মকরধ্বজের কথা আমার মাথায় কখনও আসেনি। শকুন্তলা চাওলার বিরুদ্ধে কেস ফাইল করলেই দেখবে পাশুপত অস্ত্রের মতো কাজ হবে।"

গণপতিবাবু বিড়ি ধরালেন। তারপর বললেন, "চন্দ্রোদয় ভবনের বড়বাবুর কাছে ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে নিজেই একবার বইপত্তরগুলো নেড়ে দেখলাম। ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে যা ইচ্ছে করা যায় এই ধারণা একেবারে ভুল। পরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে, তাকে না জানিয়ে সেখানে মেয়েমানুষের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অপরাধের ক্ষমা নেই।"

গণপতিবাবু এবার আমার পিঠ থাবড়ালেন। "এখনকার জজরা আই-টি অ্যাক্ট সম্বন্ধে খুবই স্ট্রিকট। ইস্কুল কলেজ মন্দির গীর্জার দেড়শ গজের মধ্যে কোনো ভাঁটিখানা শুঁড়িখানা গজিয়ে উঠুক তাই তাঁরা চান না, ব্রথেল তো দূরের কথা। এ-ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই হবে না কারণ হাতে-নাতে ধরে দেবার হাঙ্গামা নেই। বে-আইনী শুঁড়িখানা এবং পতিতালয় চালাবার জন্যে ইতিমধ্যেই চাওলা মেমসায়েবের শাস্তি হয়ে গিয়েছে!"

গণপতিবাবু বললেন, "অ্যাদ্দিন এ-লাইনে কাজ করছি কিন্তু এ রকম কেস করবার সুযোগ পাইনি। আমার বাবুদের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে একজন হাফ গেরস্ত আছে—কিন্তু হাতে-নাতে ধরে কে কেস প্রমাণ করবে?"

গণপতিবাবু আরও জানালেন, "নিজের হাতে কেসটা চালাবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে দেওঘরে গিয়ে ক্যাম্প ফেলতে হবে। মস্ত বড় এক সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল বেধেছে—বাবুদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যে কতদিন যে ওখানে থাকতে হবে তার ঠিক নেই।"

গণপতিবাবু আমাকে ভরসা দিলেন, "তোমার জন্যে আমার এক ফোঁটা চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা আমার থেকেও ভালভাবে করে ফেলবে। সেই কথাই আমি চন্দ্রোদয় ভবনে বলে এসেছি।"

বিদায় নেবার আগে গণপতিবাবু আরও জানালেন, "চোখের আড়ালে হচ্ছি বলে মনের আড়াল হবে না। সুযোগ পেলেই আমি খোঁজখবর করবো।"

এর জন্যে আমি গণপতিবাবুকে ধন্যবাদ জানাতে গেলাম। হাঁ হাঁ করে উঠলেন গণপতিবাবু। "কোনো ধন্যবাদ আমার পাওনা নেই। এই যে এখানে আমি আসি, কথায় কথায় যে বিলাসিনী দেবীর কাছে ছুটে যাই—এসব অকারণে নয়। তোমাকে যে এই থ্যাকারে ম্যানসনে আজেবাজে লোকের পরিবর্তে বসাতে পেরেছি এও আমার বিশেষ সুবিধে। কেন এসব করেছি একদিন জানতে পারবে, কোনো কিছুই তোমার অজানা থাকবে না। তখন তোমারও হয়তো ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন না-আসা পর্যন্ত একটু সাবধানে, চারদিকে নজর রেখে চলতে হবে।

একবার ইচ্ছে হলো গণপতিবাবুকে বলি এখানে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না। হাইকোর্টে এবং হোটেলের স্বর্গমর্তের পরে ফ্ল্যাট বাড়ির এই নরকবাস আমার পক্ষে ক্রমশই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সায়েব পাড়ার প্রাচীন গলির পুরনো বাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে সংসারের এতো বিষ এমনভাবে জমা হয়ে আছে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে গণপতিবাবু এবার আমাকে অন্য কোনো সুযোগ দিন।

গণপতিবাবু কিন্তু কথা বলবার সুযোগই দিলেন না। আমার ভাগ্যদেবতা যে প্রসন্ন সূর্যের মতো এবার সমস্ত অন্ধকার বিতাড়িত করবেন সে বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গণপতিবাবু এরপর জরুরী কাজের মোকাবিলার জন্যে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নিলেন। আমার সব প্রশ্নের উত্তর ওঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা গেলো না।

কিন্তু এখন আমি তেমন চিন্তিত হচ্ছি না। গণপতিবাবু না-থাকলেও ভরত সিংজী আছেন। আইনের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

আইন বিষয়ে সত্যিই কোনো অসুবিধা হলো না। ভরত সিং যেন অন্তর্যামী তিনি যেন আগাম জেনে বসে আছেন যে বিলাসিনী দেবী ভাড়াটিয়া বিতাড়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ওপরেই অর্পণ করবেন।

ভরত সিং বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, মিস্টার শংকর। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে সুরজলাল নাগরচাঁদের উকিল-ব্যারিস্টারের অভাব নেই। সেনেট হল্-এর থামের মতো বড় বড় ব্যারিস্টার এই ভরত সিং-এর টেলিফোন পেলে দশ মিনিটে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে দেন। কার সঙ্গে কনসালটেশন চান বলুন? কাউকে যদি এখান আনিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় তাও ব্যবস্থা

হয়ে যাবে।”

ভরত সিংজীর মনোবল দেখে আমি তাজ্জব। নাম করা ব্যারিস্টারদের সম্পর্কে অর ডিগনাম না।

স্যানডারসন মরগ্যানের কর্তারাও এতো জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না।

“পারবেন কী করে?” এবার উল্টো চাপ দিলেন ভরত সিং। পুরো ফি অ্যাকাউণ্ট-পেয়ী চেকে পাঠালে ওঁদের মন পাওয়া যায় না। সুরজলাল নাগরচাঁদের সামান্য রহস্য এবার ব্যাখ্যা করলেন ভরত সিং। “আমাদের পলিসি অন্য। যে যেভাবে পেমেণ্ট চায় তাকে সেইভাবে খুশী করো। একই অ্যামাউণ্ট পেমেণ্ট করছি আমরা কিন্তু চেক বই না-দেখিয়ে ক্যাশ গুণে এবং রসিদের কথা না তুলে ডবল্ ডিভিডেণ্ড আদায় করছি আমরা। কয়েক-জন বাঘা-বাঘা ব্যারিস্টার এই ভরত সিং-কে অবলাইজ করবার জন্যে বড় বড় সায়েব কোম্পানির ব্রীফ ফেলে রেখে আমাদের কাজে মন দিচ্ছে!”

একদম চিন্তা না-করবার নির্দেশ দিলেন ভরত সিং। বললেন, “এমন সব লোক দিয়ে দিচ্ছি যারা অর্ধেক ফি নিয়ে ডবল কাজ করে দেবেন। এই ভরত সিং-এর ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন।”

কথাগুলো যে একদম মিথ্যে নয় তা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। ভরত সিংএর নির্দেশিত পথে গণপতিবাবুর অনুপস্থিতি আমি বুঝতেই পারলাম না। বিভিন্ন আদালতে একাধিক মামলা শকুন্তলা চাওলা, তাঁর স্বামী, জামাই ও সিলভার ড্রাগনের নামে রুজু হয়ে গেলো।

ভরত সিং আমাকে আরও উপদেশ দিলেন, “টাটকা খবরগুলো ল্যাণ্ড-লেডির কাছে গরম গরম পৌঁছে দিন।”

ল্যাণ্ডলেডির নাগাল পাওয়া যে খুব শক্ত তা ভরত সিং-এর কাছে আর চেপে রাখা গেলো না। কিন্তু ভরত সিং আমার কথার ওপর গুরুত্ব দিলেন না। হাসতে হাসতে বললেন, “মেনসুইচকে সবাই নাগালের বাইরে রাখতে চেষ্টা করে। আমাদের কাজ হলো মেনসুইচের কাছাকাছি থাকা, না-হলে কোনো কাজই করতে পারবেন না।”

এবার ভরত সিং বললেন, “কী বলছেন, মিস্টার শংকর? আমি নিজেই তো ইমপর্ট্যাণ্ট একটা ব্যাপারে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম, কোনো অসুবিধে হলো না!”

“পেলেন ওঁকে?” আমি একটু অবিশ্বাসের সঙ্গেই জেরা করলাম।

“খুব সহজ ব্যাপার। প্রথমবার ট্রাই করে ফেল হলাম। তখন নিজে বিডন স্ট্রীটে হাজির হয়ে একটু রিসার্চ করতে হলো। দশ টাকা খরচ করেই জানতে পারলাম, প্রতিদিন সাতটা পঁয়তাল্লিশের সময় মিনিট পনরোর জন্যে মাতাজী ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যেও তিনি চুপ করে ব্যালকনিত বসে থাকেন। মাতাজীর দু'নম্বর টেলিফোনটা যে ব্যালকনিতেই আছে সে খবরও পেয়ে গেলাম। তারপর কোনো অসুবিধে হলো না। ভগবান্ আমাদের মাথাকে সবচেয়ে টপ হাইটে রেখেছেন কেন? মাথা খাটাবার জন্যে, মিস্টার শংকর।”

এবার আমাকে আরও উপদেশ দিলেন ভরত সিং। বললেন, “সব সময় টেলিফোন করতে সাহস না হলে চিঠি লিখে দিন। মালিককে নিয়মিত গরম

গরম রিপোর্ট দিয়ে যাবেন, যাতে ভুল বুঝবার অবকাশ না হয় কখনও।"

অভিনব পন্থায় এবং ভরত সিং-এর কূট পরিকল্পনায় অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে শকুন্তলা চাওলার বিরুদ্ধে আমাদের মামলাগুলো আদালতে উঠেছিল। "ওরা জেলে থাকতে থাকতে কেল্লা ফতে করুন", এই উপদেশ দিয়েছিলেন ভরত সিং।

বন্দী কেউটের মতো ফোঁস ফোঁস করছিলেন শকুন্তলা চাওলা। এই মামলায় যাতে তাঁদের মুক্তি পর্যন্ত পিছিয়ে যায় সে-ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন উকিলরা। কিন্তু ভরত সিং-এর নির্দেশিত পথে তাঁদের সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

আইনের রহস্যময় রথ যে কখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার কখন যে অদৃশ্য ইঙ্গিতে মেল ট্রেনের মতো ছুটতে থাকে, তা নির্ধারণ করা আমার পক্ষেও শক্ত হয়ে উঠলো। ভরত সিং-এর সান্নিধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝলাম যে আইন পাড়ার শিক্ষা আমার অসম্পূর্ণ ছিল, ব্যারিস্টারের বাবু হিসেবে অনেক কিছুই আমার অজানা ছিল।

শকুন্তলা চাওলার সঙ্গে এইভাবে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার অনেক অলিখিত বিপদ আছে। শত্রু যদিও এই মুহূর্তে পরাজিত ও বিপর্যস্ত, তবুও এর শেষ কোথায় কে জানে ? শকুন্তলা চাওলারা বন্দীশালার অভ্যন্তর থেকেও নিরন্তর বাধা দিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা রাখেন।

কিন্তু ভরত সিং-এর প্রদর্শিত পথে আইনের রণাঙ্গণে আমরাও দ্রুত-গতিতে এগিয়ে চলেছি এবং আমাদের প্রচেষ্টার ফলাফল জানতে তাঁর বেশী সময় লাগবে না।

শকুন্তলার সঙ্গে সংগ্রামের শেষ অঙ্কের পর্বেই থ্যাকারে ম্যানসনে এক অপ্রত্যাশিত অতিথির আবির্ভাবে ঘটেছিল।

তখন সকাল দশটা। আইনপাড়ার এক দিকপালকে পাকড়াও করবার জন্যে শকুন্তলা চাওলার নথিপত্র আমি আপিস ঘরে বসে এক মনে গুছিয়ে ফেলছি। ঠিক সেই সময় বেয়ারা এসে বললো, "স্যার আপনি একবার আসুন। দু'জন ভদ্রলোক আপনাকে জরুরীভাবে খোঁজাখুঁজি করছেন।"

আপিস থেকে বেরিয়ে ফয়ারের কাছেই এই অপরিচিতদের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁরা আমাকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন—আমাদের গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে।"

আরও শুনলাম, তাঁরা গাড়ি ভিতরে এনে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গেটের দারোয়ান বাধা দিয়েছে। এই বদলী দ্বাররক্ষকটি রাম-সিংহাসনের সাময়িক অনুপস্থিতিতে দিবারাত্র প্রহরীর কাজ করছে এবং কয়েক দিনের মধ্যে অনেক অপকর্ম বন্ধ করছে। টেলিগ্রাম পেয়ে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে বিদায় নেওয়ায় রামসিংহাসনজী বোধহয় প্রয়োজনীয় গোপন ট্রেনিং দিতে পারেননি !

অপরিচিত দুই সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে গেটের বাইরে এসে অপেক্ষমান ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। ট্যাক্সির পিছন দিকে এক কঙ্কালসার দেহ কুণ্ডলি পাকিয়ে কোনোরকমে শুয়ে আছে। এই দেহ যতই শীর্ণ হোক তাকে না চেনবার কোনো কথাই ওঠে না।

বরদাপ্রসন্ন হালদার না ?

সেই কবে তীর্থযাত্রার তীব্র আকর্ষণে আমার ওপর আচমকা সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বরদাপ্রসন্ন এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কয়েকবার তিনি পোস্টকার্ডে বিভিন্ন তীর্থস্থানের খবরাখবর দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা। সংসারবিরাগী বরদাপ্রসন্ন শেষ পর্যন্ত তীর্থের দেবতার কাছেই আত্মনিবেদন করেছেন এমন গুজবও চন্দ্রোদয় ভবন থেকে শুনেছি। কিন্তু তাঁকে এইভাবে আবার দেখবো তা কল্পনা করিনি।

বরদাপ্রসন্নের দেহ অস্থিসার। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—বেশ কয়েকদিন ওদিকে কারও নজর পড়েনি।

সাক্ষাৎকারী যুবক দুটি বললেন, তাঁরা বারাণসী থেকে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গী হয়েছেন, ওঁরা ওখানকার কলেজের ছাত্র।

ওঁরা অনুরোধ করলেন, "দারোয়ান ঢুকতে দিলো না। কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুরোধ যদি কিছুক্ষণের জন্য ওঁকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে বিশ্রাম নেবার অনুমতি দেন।"

দারোয়ান, তুমি কাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে ঢুকতে দাওনি! আমি কেন, স্বয়ং বিলাসিনী দেবীরও ক্ষমতা নেই বরদাপ্রসন্ন হালদারকে এই বাড়িতে প্রবেশের বাধা দেওয়ার। সেই ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের আদি ব্যবস্থা অনুযায়ী বরদাপ্রসন্ন যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তিন তলার হাফ-ফ্ল্যাটে তাঁর অবাধ অধিকার। এখানকার চাকরির সঙ্গে এই ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই।

ট্যাক্সির দরজা খুলে আমি বরদাপ্রসন্নের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। "কালী কালী ব্রহ্মময়ী তারা আমার"—দুর্বল কণ্ঠে সেই পুরনো আবৃত্তি না শুনলে আমি এই বৃদ্ধকে চিনতেও পারতাম না।

চোখ মেলে তাকালেন বরদাপ্রসন্ন। আমাকে চিনতে পারলেন তিনি। আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বহু কষ্টে তিনি বললেন, "আবার আসতে হলো। আমাকে একবার সব ঘুরিয়ে দেখাও।"

বরদাপ্রসন্নের ঘর খালি ছিল। দ্রুতগতিতে তালা খুলিয়ে, সেই ঘর পরিষ্কার করিয়ে আমরা একটা স্ট্রেচারের সাহায্যে ওঁকে সেই পুরনো ঘরে তুলে ফেললাম। পথের শ্রান্তিতে বরদাপ্রসন্ন তখন আবার সংজ্ঞাহীন।

দুজন সঙ্গীর একজন বললেন, বারাণসীতে গঙ্গার ঘাটে কয়েকমাস আগে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে তাঁর আলাপ। সংসারে বীতশ্রদ্ধ বরদাপ্রসন্ন কর্ম-জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে নানা তীর্থ পরিক্রমা করে অবশেষে পবিত্র তীর্থ বারাণসীতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "আর না। এইখানেই মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবো আমি। আমার আর কোনো অচরিতার্থ বাসনা নেই।"

অপর সঙ্গী বললেন, "বারাণসীতে দেহরক্ষার জন্যে কত মানুষ প্রার্থনা করে। আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বরদাপ্রসন্ন অকস্মাৎ পালটে গেলেন। কাতরভাবে সবাইকে অনুরোধ করলেন, একবার আমাকে থ্যাকারে ম্যানসনে নিয়ে চলো।"

"কোথায় থ্যাকারে ম্যানসন? সেখানে আপনার আপনজন কে আছে?" ছেলেরা বরদাপ্রসন্নকে জিজ্ঞেস করেছে।

কলকাতার থ্যাকারে ম্যানসনে বরদাপ্রসন্নর কেউ নেই। হয়তো তাঁকে ওখানে ঢুকতে দেওয়াও হবে না। তবু বরদাপ্রসন্ন একবার দু'চোখ দিয়ে সেই বাড়িখানা দেখতে চান। অগত্যা দুজন ছাত্র তাদের কাজকর্ম ছেড়ে এই

বৃদ্ধকে কলকাতা দেখিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছে।

ভাবনানি ম্যানসনের ডাক্তার ভড়কে খবর দেওয়া হলো। বরদাপ্রসন্নকে পরীক্ষা করে তিনি বিশেষ আশা দিতে পারলেন না। বললেন, "ওঁর কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকলে তা অপূর্ণ রাখবেন না।"

বরদাপ্রসন্ন ইঙ্গিতে আমাকে ওঁর মুখের কাছে কান আনতে অনুরোধ করলেন। তারপর বহু কষ্টে বললেন, "কাশীতে গিয়েও মুক্তি পেলাম না। এই পুরনো বাড়িটা ঘুমের মধ্যেও আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল। কালী, কালী ব্রহ্মময়ী আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, হালদার বংশের ছেলে—কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাবি তুই?"

একটু পরেই বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন, "তেলকালি, কলকালি, কাটা-কালী, রক্ষেকালী এরা সব কোথায়? তাদের ডেকে পাঠাও।"

তেলকালি এবং কলকালি খবর পেয়েই ছুটে এলেন। কিন্তু দারোয়ান কালী তো বরদাপ্রসন্নর আমলেই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। তেলকালিবাবু সে-কথা কয়েকবার বলার পরে বরদাপ্রসন্নর খেয়াল হলো।

এরপর বরদাপ্রসন্ন অদ্ভুত এক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন, "আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনের সব ঘরগুলো দেখবো। তেলকালি, কলকালি—পারবি আমাকে দেখাতে?"

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তেলকালিবাবু কোথা থেকে ছোট্ট একটা খাটিয়া জোগাড় করে আনলেন। তারপর সেই খাটে শুইয়ে জীবন্ত বরদাপ্রসন্নকে ওঁরা একে একে সমস্ত ফ্ল্যাটে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন।

ঊনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের কাছে এসে তেলকালিবাবু বললেন, "মনে পড়ছে? ফিলিপ সায়েবের ফ্ল্যাট। এখনও খালি পড়ে রয়েছে। বউকে খুন করে বাক্সর মধ্যে পুরে রেখে ফিলিপ সায়েব পালিয়েছিলেন, আর ফেরেননি।"

"সে কী গো?" অবাক হয়ে গেলেন বরদাপ্রসন্ন। "তোমরা একবার খাট নামাও।" খাট নামাবার পরে হাঁপাতে লাগলেন বরদাপ্রসন্ন। বললেন, "হতেই পারে না। এই তো সেদিন কাশীতে আমার সঙ্গে ফিলিপ সায়েবের দেখা হলো। পরিবারের শোকে লোকটা বিবাগী হয়ে পথে পথে ঘুরছে। একবারও তো মনে হলো না বউকে খুন করে পালিয়েছে!"

তেলকালিবাবু বললেন, "সংসারে এমনই হয়, স্যার। যেখানে বেশী ভালবাসা সেখানেই বেশী ঘেন্না। ঘেন্নার পরে হয়তো আবার ভালবাসা।"

থ্যাকারে ম্যানসনে আজ এক স্মরণীয় দিন। বরদাপ্রসন্নর খাট একের পর এক ফ্ল্যাট থেকে অন্য ফ্ল্যাটের সামনে চলে আসছে। একের পর এক রুদ্ধদ্বার খুলে গৃহবাসীরা স্বাগত জানাচ্ছেন বরদাপ্রসন্নকে।

বরাদাপ্রসন্নর চোখে জল। মাঝে মাঝে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। তেলকালিকে বলছেন,, "তেলকালি, বড় ময়লা। আবার সব চুণকাম করো, চুণকাম করো—এতো ময়লা মার্টিন সায়েব সহ্য করতে পারবেন না!"

থ্যাকারে ম্যানসনে যেখানে যত ঘর আছে তার পরিক্রমা শেষ করে বরদা-প্রসন্নের খাটকে ওঁর নিজস্ব ঘরে আনা হলো। তেলকালিবাবু ইতিমধ্যেই সে-ঘর দ্বিতীয়বার পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন।

বরদাপ্রসন্ন এবার বললেন, "তেলকালি, আমার ছবির পোঁটলাটা বার করো।"

তেলকালিবাবু দ্রুত বরদাপ্রসন্নর ট্রাঙ্ক থেকে ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের ছবিখানা ঘরের কোণে টাঙিয়ে দিলেন। স্ত্রীর ছবিখানা বরদাপ্রসন্ন নিজের বুকের ওপর রাখলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলে, আমাকে হয়তো ফিরতে হতো না। কিন্তু এখানে বাক্সর মধ্যে ফেলে রাখার শাস্তি পেলাম। কাশীতে গঙ্গার ধারে শুয়ে শুয়েও আমার মুক্তি হলো না। রোজ আমাকে স্বপ্নে দেখা দিতো, বলতো, ফিরে এসো, ফিরে এসো—আমার মুক্তি পেলুম না। সেই ফিরতে হলো।"

বরদাপ্রসন্ন হালদার সেই রাত্রেই থ্যাকারে ম্যানসনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর শেষ কথা : "তেলকালি—বড় ময়লা, বড় ময়লা। চুণকাম করো, চুণকাম করো—এতো ময়লা মার্টিন সায়েব সহ্য করতে পারবেন না।"

কোথাকার কোন বরদাপ্রসন্ন! ক'দিনেরই বা পরিচয় আমার সঙ্গে? তবু তাঁর আকস্মিক পুনরাবির্ভাব এবং মৃত্যু আমার মনের মধ্যে গভীর বেদনার আগুন জ্বালিয়ে গেলো। বেশ তো ছিলেন তিনি এই থ্যাকারে ম্যানসনের পঙ্কিল পরিবেশ থেকে বহু দূরে তীর্থপথের দেবতাদের সান্নিধ্যে। সেখানে দেহ রাখলে আমরা এমনভাবে তাঁর বিয়োগ ব্যথায় কাতর হতাম না। কিন্তু এক অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণে কেবল মরবার জন্যেই যেন তিনি ফিরে এলেন স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এই থ্যাকারে ম্যানসনের সীমানায়।

বরদাপ্রসন্নর শেষ মুহূর্ত যে আসন্ন, মৃত্যুর দূত যে অদূরেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে তা অনভিজ্ঞ আমি কিন্তু মোটেই বুঝতে পারিনি। হাল্কা খাটিয়ায় ফ্ল্যাট পরিক্রমা শেষ করে বরদাপ্রসন্নকে আমরা শুইয়া দিয়েছিলাম তাঁর নিজস্ব ঘরে।

বরদাপ্রসন্ন বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে আমরা তাঁর ঘরখানি এতোদিন ব্যবহার না করে রেখে দিয়েছি। বিছানায় শুয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বরদাপ্রসন্ন আমাকে বলেছিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, আমার কোনো আশ্রয়ই এখানে নেই। তোমরা আমাকে লজ্জা দিলে শংকর। এ-জানলে কোনকালে আমি এখানে ফিরে আসতাম। একবার যারা এই থ্যাকারে ম্যানসনের জল খেয়েছে তাদের মোহমুক্তি নেই—বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে বসেও আমি এই থ্যাকারে ম্যানসনকে ভুলতে পারলাম না।"

বরদাপ্রসন্নর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমাকে একলা কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন আমি ফিরে এলাম বলো তো?"

এর উত্তর আমি জানবো কী করে? আমি মাথা নিচু করে নির্বাক হয়ে ওঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে বাবার বয়োবৃদ্ধ মুহুরিমশাই থাকতেন—আমি তাঁকে মাস্টারমশাই বলে ডাকতাম। আজ এই মুহূর্তে বরদাপ্রসন্নর জরাজীর্ণ মুখটি দেখে বার বার মাস্টারমশায়ের কথাই মনে হতে লাগলো। কোথায় জন্মেছিলাম, কোন্ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলাম, কী স্বপ্ন দেখেছিলাম, আর সংসারের দেবতার বিচিত্র খেয়ালে আত্মীয়-পরিজনহীন হয়ে নিঃসঙ্গ আমি এখন কোন্ পরি-

স্থিতিতে এসে পড়লাম!

বরদাপ্রসন্ন আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "বড় ভুল করে ফেলেছিলাম। অভিমান করে, মনের মধ্যে অভিযোগ নিয়ে এই থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে গিয়েছিলাম, তাই মায়ার বাঁধন কাটাতে পারলাম না, আবার ফিরতে হলো।"

বরদাপ্রসন্ন এবার বললেন, "তোমাকেও ভুল বুঝেছিলাম, ভাই। আমার মনের মধ্যে ওই রামসিংহাসন চৌরাশিয়া এমন সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে আমাকে অপমান করে বিদায় করবার জন্যেই তোমাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে চাকরি দেওয়া হয়েছে। গণপতিবাবু তোমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে এখানে স্পেশাল কোনো অপকর্ম করতে চান, এমন সন্দেহও মনের মধ্যে ছিল। এতোদিন পরে বুঝলাম, আমার হিসেবে ভুল হয়েছিল। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ভাই। তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা করো, তোমাদের যা কিছু অভিযোগ আছে তা তুলে নাও না-হলে যে এখান থেকে খালাস হবার অর্ডার মিলবে না।"

এখান থেকে খালাস বলতে বরদাপ্রসন্ন যে ইহলোক থেকে মুক্তির কথা বলছেন তা আমি বুঝিনি।

বরদাপ্রসন্ন এই অপরিচিত পরিবেশে আমাকে ভালবাসা এবং ভরসাই দিয়েছিলেন, তাঁর মনের মধ্যে যে অপ্রসন্নতার আগুন ছিল তার সন্ধান আমি পাইনি—সুতরাং ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর বিরুদ্ধে তো আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু বরদাপ্রসন্ন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, দুর্বল কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ক্ষমা করলে তো ভাই?"

সজল চোখে আমি বরদাপ্রসন্নের শীতল হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছিলাম। বরদাপ্রসন্ন আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সাবধানে থেকো ভাই। এ-বাড়ির জন্মলগ্নে দেবতাদের বিরক্তি রয়েছে—এখানে কেউ তো সুখ পাবে না। মার্টিন সায়েব পাননি, তাঁর বউ পাননি। কালোয়ার গুপ্তরা পাননি, কালীঘাটের হালদাররা পাননি, অর্ধচন্দ্র গুপ্তরা পাননি। এমন কি বেচারা তেলকালির ভাগ্যেও সুখশান্তি জোটেনি। তোমার জন্যেও আমার কেমন ভয় হয় ভাই। তুমি বরং দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মন্ত্র জপ করো প্রতিদিন।"

বরদাপ্রসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও থ্যাকারে ম্যানসনের সমস্ত সংবাদ শুনবার জন্যে অসীম আগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমিও অনেকদিন পরে একজন উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে একের পর এক বিস্তারিত খবর দিতে লাগলাম।

সিলভার ড্রাগন ও শকুন্তলা চাওলার সাম্প্রতিক খবরও বরদাপ্রসন্ন মন দিয়ে শুনলেন। এমন একজন বেপরোয়া ভাড়াটে, যিনি একদিন হয়তো পুরো থ্যাকারে ম্যানসনকেই গ্রাস করে ফেলতে পারতেন, তিনি যে নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে কারাগারে বন্দিনী এবং আমরা তাঁর উচ্ছেদের ব্যবস্থা সুগম করে ফেলেছি শুনে বরদাপ্রসন্ন হালদার কিন্তু খুশী হলেন না।

তিনি আমাকে আবার কাছে ডাকলেন। আমার কানে কানে ক্ষীণকণ্ঠে বরদাপ্রসন্ন বললেন, "ওরা যা করছে তার শাস্তি ওরা নিজেরাই পাবে। তুমি কিন্তু ওই সিলভার ড্রাগনকে ভিটেছাড়া করিও না—বাস্তু সাপকে বিদায় করতে নেই, তাতে গেরস্তর ক্ষতি হয়।"

মৃত্যুর আগে বরদাপ্রসন্নের মুখে এই ধরনের কথা শুনে আমি অবাক

হয়ে গিয়েছিলাম। মিসেস চাওলার দূত আমার অলক্ষ্যে এই অল্পসময়ের মধ্যে বরদাপ্রসন্নের সঙ্গে যোগাযোগ করলো নাকি? কিন্তু বরদাপ্রসন্ন যাই বলুন, এ-ব্যাপারে আমরা আদালতের মাধ্যমে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি, এখন আচমকা পিছু হটবার কোনো কারণ নেই।

বরদাপ্রসন্নের আকস্মিক মৃত্যু থ্যাকারে ম্যানসনে আমাদের ওপর শোকের কালোছায়া বিছিয়ে গেলো। কে এই বরদাপ্রসন্ন—তিনি আমাদের আত্মীয় নন, আপনজন নন। কর্মজীবনে প্রতিদিনের যে যোগসূত্র ছিল তাও তো বেশ কিছুদিন আগে ছিন্ন হয়েছিল। তবু কলকালি, তেলকালির চোখে জল। বেচারা সহদেব, সেও নানা কাজের ফাঁকে বরদাপ্রসন্নর জন্য চোখের জল ফেলেছে।

আমার সঙ্গে যখন সহদেবের দেখা তখন কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ ফুলে উঠেছে। সহদেব বললো, "হালদার মশাই বড় মুখ করে আমার কাছে সিঙি মাছের ঝোল আর ভাত খেতে চাইলেন, অথচ আমি কিছু করতে পারলাম না।"

আমি ভাবলাম, হয়তো সহদেবের পয়সার অভাব ছিল। বললাম, "আমার কাছ থেকে সিঙি মাছ কেনবার পয়সা চেয়ে নিলে না কেন, সহদেব?"

সহদেব এবার ভেঙে পড়লো। "হুজুর, এক জোড়া সিঙি মাছের আর কত দাম? যতই সময় খারাপ হোক, আপনার আশীর্বাদে হালদারমশাইকে একদিন মাছ কিনে দেবার মতো ক্ষমতা আমার আছে। একবার তো ভাবলাম চলে যাই বউবাজার মার্কেটে—বেস্ট, জ্যাকলা মাছ ওখানেই পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস পেলাম না, হুজুর।"

কান্নায় সহদেবের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এলো। "পণ্ডিতমশাই তো সব জেনে-শুনে আমার কাছে খেতে চাননি যাবার সময় আমি কেন পাপের বোঝা বাড়াই, হুজুর? মৃত্যুর পরে ওপরে উঠেই তো উনি জানতে পারবেন আমি সুইপারের ছেলে! "সহদেবের কান্না আর থামতে চায় না।"

কাঁদতে-কাঁদতে সহদেব বললো, "যাবার আগে পণ্ডিতমশাই খুব দুঃখু পেয়ে গেলেন। আমাকে বারবার বললেন, কী হলো তোর, সহদেব? আমাকে একটু মাছের ঝোল-ভাত খাওয়ালি না? আমি বকুনি হজম করে গেলাম, মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, পণ্ডিতমশায় যাবার সময় আমার হাতে খাবেন না—আমি পরিচয় ভাঁড়িয়ে এখানে কুক-বেয়ারার কাজ করছি, আমি জাতে সুইপার।"

কলকালি নিজেও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। মনের দুঃখে ক'দিন সে ছাদের ঘরে চুপচাপ বসে রইলো—বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের সেই বঙ্গ-রমণীর সাময়িক সান্নিধ্য উপভোগের কথা তার মনেই রইলো না। কলকালি বললো, "হুজুর, বড় বিপদে পড়ে গেলাম। পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে পাইপ কিনবার জন্যে একশ টাকা আগাম নিয়েছিলাম। সে আর শোধ দেওয়া হয়নি। পণ্ডিতমশাই একদিন যখন খোঁজ নিয়েছিলেন, তখন মিথ্যে হিসেব দিয়েছিলুম। পণ্ডিতমশাই সরল মানুষ, উনি মানুষকে সন্দেহ করতে পারতেন না, আমার হিসেব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হুজুর, নিজের হিসেবে নিজে তো গড়বড় করা যায় না। আমি জানতাম, ওই একশ টাকা আমি বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটে এক রাত্রে নয়-ছয় করে এসেছি।"

একটু থামলো কলকালি। তারপর বললো, "একটা কিছু করুন, হুজুর।

পণ্ডিতমশায়ের টাকাগুলো আমার বুকের মধ্যে পেরেকের মতো বিঁধছে। দেবতাকে ঠকিয়েছি জানতে পারলে বলরাম বোস ঘাট স্ট্রীটের ওই মেয়েমানুষ আমাকে আর আস্ত রাখবে না।”

অমন যে অমন তেলকালিবাবু তিনিও আমাকে বললেন, “একটা কিছু করুন, স্যার। তিন পুরুষের খেস্টান হলেও, শ্রাদ্ধ-শান্তির কথা যে জানি না এমন তো নয়। বরদাপ্রসন্নবাবুর না-হয় তিন কুলে কেউ নেই—কিন্তু আপনিই যখন মুখাগ্নি করলেন তখন বাউনের ছেলে হিসেবে আপনার ঘাড়েই তো কিছুটা দায়িত্ব চাপলো।”

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বরদাপ্রসন্নর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনের কর্মচারি আমরা সামান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। তেলকালিবাবু বললেন, “আপনি তো বাউনের ছেলে, গীতা থেকে খানিকটা পাঠ করুন।”

তাই করলাম। সবাই হাত জোড় করে উদার অনন্ত আকাশের তলায় বসে আমার অনভ্যস্ত কণ্ঠে গীতার বাণী শুনলো।

তারপর তেলকালিবাবু একখানা কালো বই হাতে এগিয়ে এলেন। ধরা গলায় বললেন, “পণ্ডিতমশাই পুজোর প্রসাদ বিলোতে এসে মাঝে মাঝে আমার ঘরে বসে পড়তেন ; বলতেন, শোনাও দেখি তোমাদের বাইবেলের গপ্পো। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমিও একটু পাঠ করি।”

কার আপত্তি থাকতে পারে? সবার চোখেই জল। তেলকালিবাবু ততক্ষণে মথি লিখিত সুসমাচারের অংশ পড়তে শুরু করেছেন।

কাণ্ড বাধালো সহদেব। সে এসে হাত জোড় করে বললো, “হুজুর, আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি একটা কাজ করে ফেলেছি। আজ আপনারা সবাই আমার রান্না একটু খেয়ে যাবেন।”

খেতে বসে তেলকালিবাবু বললেন, “শ্রাদ্ধের দিনে সিঙি মাছের ঝোল আর ভাত! তোর মাথায় কী কোনো বুদ্ধি নেই সহদেব?”

সহদেব কথাটা কানেই তুললো না। বললো, আপনাকে আর এক পিস সিঙিমাছ দিই, স্যার?” তারপর মুহূর্তের জন্য অসহায়ভাবে সহদেব আমার মুখের দিকে তাকালো, তেলকালিবাবুর অভিযোগের উত্তর সে দিতে পারলো না।

কলকালি সেদিন চুপ করে বসেছিল। একবারও মুখ খোলেনি। কিন্তু সেও যে মনে মনে মতলব এঁটেছে তা দু-দিন পরেই জানতে পারলাম।

শকুন্তলা চাওলার মামলার তদ্বির করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বাধা পড়লো। স্বয়ং পাঁপ বিশোয়াস আমার খোঁজ করলেন।

“আমাকে ভুলেই গেলেন, মিস্টার শংকর,” পুরনো অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করলেন মিসেস পাঁপ বিশোয়াস।

দুশ্চিন্তার প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে পাঁপ বিশোয়াস এই ক'দিনেই সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তাজা হয়ে উঠেছেন। পাঁপ বিশোয়াসের চোখেমুখে উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের দীপ্তি, এই ক'দিনেই তিনি বয়সের কাঁটাকে কয়েক ঘর পিছিয়ে দিয়েছেন।

মিসেস পাঁপ বিশোয়াস বললেন, “বেশ লোক আপনি! আপনাদের মাথার ওপর দিয়ে এতো হাঙগামা গেল অথচ আমাকে একটু খবর দিলেন না ; আমার কাছে চাঁদাও নিলেন না। আমি কি আপনার পর?”

লজ্জায় চুপ করে রইলাম। পপি বিশোয়াস বললেন, "এর মধ্যে অবাক কাণ্ড, আপনাদের কলকালি—ওই যে লোকটা জলের কল সারায়। অন্য দিন ট্যাঁকে ডবল পয়সা না গুঁজলে কাজের কথাই তোলে না। কিন্তু আজ একেবারে উল্টো লোক! আমার বিশ্বাসই হয় না।"

কী ব্যাপার? কলকালি আবার কী নতুন হাঙ্গামা বাধালো। আমি পরবর্তী খবর সংগ্রহের জন্যে মিসেস পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকালাম।

পপি বিশোয়াস জোর করে আমার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিলেন। বললেন, "যত কাজই থাক আপনার আজ আপনাকে সহজে ছাড়ছি না। ক'দিন খুবই ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়েছেন। আর ওই কলকালির ভিতরের ব্যাপারটা না-জানা পর্যন্ত মনের মধ্যে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে।"

পপি বিশোয়াস নিজেই এবার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা মিস্টির বাক্স বার করে আনলেন। বাক্সটা আমার সামনের টেবিলে রেখে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমাকে আসল খবরটা দিতে হবে।"

"কী খবর জানতে চাইছেন?" পপি বিশোয়াসের এই অহেতুক কৌতূহল আমার কখনও পছন্দ হয় না, কিন্তু ওঁর ব্যবহারে এমন সরলতা আছে যে রাগও করতে পারি না।

"কার খবর আবার? আপনার ওই কলকালির। রাতারাতি লোকটার হলো কী?" পপি বিশোয়াস কপট উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

কলকালি হঠাৎ আমাকে না জানিয়ে কী করে বসলো? এই সব লোককে নিয়ে আমার চিন্তার শেষ কোনোদিন হবে না।

পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার কাছে কিন্তু একেবারে সত্যি কথা বলবেন। আপনাদেব ওই কোর্টকাছারির সত্যি কথা নয়—জেনুইন সত্যি। শুনেছিলুম, আপনাদের এই কলকালি একজন প্রেমিক লোক। ভবানিপুরের কোন ঘাটের কাছে নাকি বহুদিন লাভ-অ্যাফেয়ার্স চালিয়ে যাচ্ছে।"

এসব খবর যে গোপনে-গোপনে মিসেস পপি বিশোয়াসের কানেও পৌঁছে গিয়েছে তা আমার আন্দাজ ছিল না। এ-বিষয়ে আমার নিজস্ব কোনো বাড়তি কৌতূহল নেই।

কিন্তু মিসেস পপি বিশোয়াসের মতো সংসারের আগুনে বারবার দগ্ধ মহিলাদেরও এই প্রেমের কাহিনীতে কৌতূহলের সীমা নেই। 'অল দি ওয়ার্লড লভস দ্য লাভার'—বলতেন সত্যসুন্দরদা। কথাটা আজও আমাদের এই পঙ্কিল পরিবেশেও মিথ্যে হয়নি।

পপি বিশোয়াস বললেন, "কী ব্যাপার, বলছেন না কেন? কলকালি কি শেষ পর্যন্ত ওই বলরাম বোস ঘাট স্ট্রীটে বিয়ে-থা করে বসলো নাকি?"

"তার আগে আমাকে বলুন, আজ সকালে কলকালি কী এমন কাণ্ড করলো, যার থেকে আপনার মনে এইসব প্রশ্ন উঠছে।"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "এখানে আমারও তো কিছুদিন হলো। এখানকার হালচাল মোটামুটি আমিও বুঝে নিয়েছি; আপনাদের ওই কলকালির চরিত্রটা বুঝতে আমার বাকি নেই। আর সবাইকে ডোণ্টকেয়ার করা যায়, কিন্তু কলকালিকে সন্তুষ্ট না রেখে এখানে দু'দিন বসবাস করা যাবে না—পাইপ এবং কলের যা অবস্থা! টয়লেট রুম টিপটপ না-থাকলে ভিজিটরদেরও খুব অসুবিধে হয়।"

অপরিচিত টয়লেট রুমে ঢুকে আচমকা ফুটো সিস্টার্নের জল মাথায় এবং দেহে স্প্রে হলে যে কোনো অতিথির মুড যে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে তা বোঝালেন মিসেস পপি বিশোয়াস। তারপর বললেন কলকালি এতোদিন এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে মিসেস পপি বিশোয়াসের কাছ থেকে বেশ কিছু পয়সা নিয়মিত আদায় করে চলেছে।

কিন্তু আজ একেবারে উল্টো পুরাণ! "একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে!" মন্তব্য করলেন মিসেস বিশোয়াস।

"আজ কলকালি কোনো পয়সা চাইলো না। বরং মিষ্টির এই প্যাকেটটা আমার হাতে তুলে দিলো। কেন মিষ্টি কিছুই বললো না। বরং নিজেই কলঘরে ঢুকে সিস্টার্ন পাইপ এবং বিবককগুলো সারালে। তারপর একটি পয়সাও দাবি না করে চলে গেলো।"

মিষ্টির বাক্স খুলে দেখলুম বরদাপ্রসন্নর প্রিয় ছানার গজা এবং লবঙ্গলতিকা রয়েছে। পুজোর প্রসাদ হিসেবে অনেকবার ওই দুটি মিষ্টির সদ্ব্যবহার করেছি।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "নিশ্চয় কোনো স্পেশাল ব্যাপার। কারণ মিষ্টির ডিসট্রিবিউশন লিস্টে শুধু আমি একা নই। দেখলুম, কলকালির থলিয়ায় আরও অনেকগুলো বাক্স রয়েছে।"

কলকালি যে পুরনো অপরাধ স্খালনের জন্যে এই পথ বেছে নেবে তা আমি আন্দাজ করিনি। মিসেস বিশোয়াসকে গোড়ার ইতিহাস না প্রকাশ করেই বললাম, "বিশেষ কোনো কারণ নেই। বরদাপ্রসন্নর তো আর কেউ নেই—তাই একজন পুরনো সহকর্মী হিসেবে কলকালি তার দায়িত্বের বোঝা বইবার চেষ্টা করছে।"

মিসেস বিশোয়াস আমার কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। অনাত্মীয় সহকর্মীকে যে এখনও এমনভাবে ভালবাসা যায় তা বোধ হয় তাঁর কল্পনাতীত ছিল।

মিসেস বিশোয়াস বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। রঙীন প্রজাপতির মতো যে চঞ্চলভাব আজ এখানে এসেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করছিলাম তা হঠাৎ যেন অদৃশ্য হলো। ঝলমলে জামাকাপড় পরা এক বিমর্ষ রমণীমূর্তি আমার সামনে অসহায়ভাবে বসে আছেন।

মিসেস বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তিনি যেন কিছু বলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না।

"কিছু বলবেন?" আমি জানতে চাই।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "এই বরদাপ্রসন্ন বাবুর ব্যাপারটা দেখেশুনে হঠাৎ নিজের সম্বন্ধে আমার চিন্তা হচ্ছে, মিস্টার শংকর। বরদাপ্রসন্নবাবুর তো আপনজন কেউ ছিল না, কিন্তু কেমন সসম্মানে চলে গেলেন তিনি। এখন আমি ভাবছি আমার কথা। আমার কী হবে বলুন তো? আমার না আছে আপনজন, না আছে তেলকালি, কলকালি, সহদেবের মতো সহকর্মী। আমার লাইনে যারা আছে তাদের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি—তারা পরস্পরকে ঘেন্না করে, চান্স পেলে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে আমার দেহটা তারা কুকুর দিয়েও খাইয়ে দিতে পারে।"

"আঃ, মিসেস বিশোয়াস, কী সব বলছেন আপনি," আমি ওঁকে সামলাবার চেষ্টা করলাম।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "কী জানি ভাই, আমার ভীষণ ভয় করছে। এখানেও কষ্ট, আবার মরার পরেও আমাদের মতো মেয়ের জন্যে নরক যন্ত্রণা তো লেখাই আছে।"

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "একটু ফেবার করবেন, মিস্টার শংকর। যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, পুলিসে যেন আমার বডিটা টানা-ছেঁড়া না-করে। আমার হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে এই কাগজের টুকরো রইলো। আমি লিখে রাখছি, আমার কিছু হলে যেন আপনাকেই বডি দিয়ে দেয়। আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন," এই বলে মিসেস বিশোয়াস রঙীন রুমালে চোখের জল মুছতে লাগলেন।

ভরত সিংজী মামলার ব্যাপারে আমাকে খুব সাহায্য করলেন। আইন-পাড়ার গোপন কানুনগুলো দীর্ঘদিনের সাধনায় তিনি যে এমনভাবে আয়ত্ত করেছেন তা আমার জানা ছিল। উকিল মুহুরী পেস্কার পেয়াদা সাক্ষী-সাবুদের নিজস্ব তালিকা তিনি এমনভাবে তৈরি করেছেন যে বোতাম টিপলেই কাজ শুরু হয়ে যায়—যা করতে আমার লাগতো দশ সপ্তাহ তাই দশ ঘণ্টায় হয়ে যায়। আইনের রথ হাওয়া গাড়ির মতো বায়ুবেগে চলতে পারে না বলে যাদের বিশ্বাস তাদের একবার ভরত সিংজীর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

"প্যানেলে শুধু উকিল-মুহুরী রাখলেই কাজ হয় না, মিস্টার শংকর—আপনার নিজস্ব পেস্কার-পেয়াদা সাক্ষীসাবুদও রাখতে হয়," ভরত সিংজী আমার কাছে রহস্যের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

উকিল মুহুরী না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ!

"সাক্ষীসাবুদই তো আজকাল সবচেয়ে ডিফিকাল্ট। কোথায় আপনি জেনুইন সাক্ষীর জন্যে খোঁজখবর করবেন? তাঁর সন্ধান পেলেও ঠিক সময় তাঁকে কীভাবে যথাস্থানে হাজির করবেন—আজকাল গৃহস্থ লোকের সময়ের যে বিশেষ অভাব। ঘরের খেয়ে আদালতে গিয়ে সত্যিকথা বলবার উৎসাহ কারও নেই। তাই এই মাইনে-করা সাক্ষীর প্যানেল রয়েছে—প্রতি মাসে কিছু কিছু মাসোহারা দিতে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক সময়ে সাক্ষীর অভাব হচ্ছে না।"

ভরত সিংজী বললেন, "খুবই অভিজ্ঞ সাক্ষী এইসব—একটু রিহার্সাল দেওয়ালেই ফার্স্ট ক্লাশ সার্ভিস পাওয়া যায়। জেরার তোড়ে এদের কাহিল করা প্রায় অসম্ভব, মিস্টার শংকর। বাঘা বাঘা উকিল হার মেনে বসে পড়েন।"

ভরত সিংজী কেমন সহজে গোপন কথা বলে চলেছেন। সরকারী মহলে এসব খবর পৌঁছুলে যে কী ফল হতে পারে তা ভদ্রলোক নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন না।

কিন্তু ভরত সিংজী মোটেই দমলেন না। লাল-লাল দাঁত আর একবার বিকশিত করে বললেন, "আপনি কোন যুগে রয়েছেন, মিস্টার শংকর? পাখী-পড়ানো সাক্ষী না-থাকলে পুলিসের কী অবস্থা হবে একবার

ভেবেছেন? জেলখানা একেবারে খালি হয়ে যাবে, একটি কেসেও আসামীর শাস্তি হবে কিনা সন্দেহ। অনন্ত কাল ধর এই সিস্টেম চলে আসছে—এর টেকনিক্যাল নাম 'পকেট সাক্ষী'।"

"আগেকার যুগে তবু পকেট সাক্ষী নিজের পকেটেই থাকতো। এখন সব সময় পুলিসের অত হাঙ্গামা পোষায় না।" ভরত সিংজী এবার মনে হচ্ছে বাড়তি কিছু খবরাখবর দেবেন। কিন্তু হঠাৎ বোধ হয় তাঁর খেয়াল হলো, আমি বাইরের লোক।

ভরত সিংজী আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "টপ সিক্রেট খবর—মরে গেলেও আমার মুখ দিয়ে এসব কথা বেরোয় না। কিন্তু আপনার কথা আলাদা—এখন আপনি আমার 'ফিরেন্ড', আমার ঘর কা আদমী, আপনার কাছে কিছুই চাপাবো না। আপনার এসব জানা দরকার—কারণ এতোদিন আইনপাড়ায় এবং সায়েবপাড়ায় ঘোরাঘুরি করেও আপনার কোনো জ্ঞান হয়নি!"

কেমন শান্তভাবে ভরত সিংজী আমার অভিজ্ঞতাকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলেন, কিন্তু আমি রাগ করতে পারলাম না। হাইকোর্টের গায়ে টেম্পল চেম্বার্স-এর তিন তলায় সায়েব ব্যারিস্টারের অফিসে আইনের যে শিক্ষা লাভ করেছিলাম তার সঙ্গে উঁচু মহলের এই নিচু আইনের বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে, গোপনে-গোপনে আর এক বিচিত্র আইনের রাজত্ব বহুদিন ধরে এই দেশে চলে আসছে, তাকে অস্বীকার করবার মতো দুঃসাহস কার আছে?

ভরত সিংজী বললেন, "আপনাকে জানাতে লজ্জা নেই, এই অধমকে পুলিস ফ্রেন্ডদেরও মাঝে-মাঝে পকেট সাক্ষী সাপ্লাই দিয়ে হেল্প করতে হয়। আইভি ডানসিং স্কুলে গতকাল যে পুলিস রেড হয়েছে তার খবর আজকের কাগজে দেখেছেন তো? টেন লেডি ডানসিং টিচার অ্যান্ড ম্যানেজার অ্যারেসটেড। খুব শক্ত এইসব পাবলিক প্লেস অ্যাটাক করা। সবাই জানে ডানসিং ট্রেনিং-এর নামে এসব জায়গায় কী হয়, কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলা বারণ বা কিছু করবার সাহস কারও নেই। সরকার বুঝে-সুঝে এমন নিয়ম-কানুন করেছেন যে অর্ডিনারি পুলিস অফিসাররা ওখানে নাক গলাতে পারবেন না, অন্তত একজন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অফ পুলিসকে চাই।"

ভরত সিংজী একটু থামলেন। আমার মুখের ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে ভরত সিংজী আবার শুরু করলেন, "শুধু অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার হলেই কাজ হবে না। টোপ চাই।"

"টোপ?"

ফিক করে হেসে ফেললেন ভরত সিংজী। "খুব ডিফিকাল্ট অ্যালাইনমেন্ট এই টোপের। মুখটা অচেনা হবে। পুলিশ তাকে কখানা সই-করা নোট দেবে। এমনভাবে সইকরা যে হঠাৎ নোট দেখলে সই খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সেই নোট নিয়ে টোপ অর্ডিনারি খদ্দের সেজে ডানসিং ইস্কুলে যাবে, লেডি টিচার পছন্দ করব। তারপর স্পেশাল কিছু খরচাপাতি করে, টিচার এবং ম্যানেজারকে বোঝাবে যে ওয়েস্টার্ণ ডান্স শেখবার জন্যে এখানে আসেনি। এখানে সে এসেছে অন্য উদ্দেশ্যে—যে উদ্দেশ্যে অনেকেই এখানে এসে থাকে।"

আমি অবাক হয়ে ভরত সিংজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ভরত

সিংজী বলে চলেছেন, "টোপের দায়িত্বটা কত সিরিয়াস বুঝছেন তো? অন্য ভিজিটররা যা করতে আসেন পুলিসের খরচায় ওঁদেরও সেই এক অভিজ্ঞতা কিনতে হয়। তারপর এক সময় বাঁশি বেজে ওঠে। হই-চই করে পুলিশ ঢুকে পড়েন, কোনো জিনিস আর জানতে বাকি থাকে না। ম্যানেজারের ক্যাশ বাক্স সার্চ করে সইকরা নোট পাওয়া যায়, লেডি টিচারের কাছেও সই-করা নোট বেরিয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে টোপের হাতে হাঁড়ি-টোপকে এরপর কোর্টেও যেতে হয়, সেখানেও সাক্ষী দিতে হয়।"

ভরত সিংজী বললেন, "স্পেশাল রিকোয়েস্টে আমাকে গতকাল দুজন টোপ সাপ্লাই করতে হলো। এইসব কাজে মাইনে করা সাক্ষীদের পাঠাতে ইচ্ছে করে না আমার, কিন্তু উপায় কী?"

পুরনো কথার জের টেনে ভরত সিংজী বললেন, "সোসাল সার্ভিস করতে হলো।"

আমিও ভরত সিংজীর কথা বিশ্বাস করছি দেখে মৃদু বকুনি লাগালেন তিনি। "আপনাকে নিয়ে আর পারা গেলো না। এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি কী করে থ্যাকারে ম্যানসনে কাজ করছেন?"

আমি একটু বিব্রত হয়ে ভরত সিংজীর দিকে তাকালাম। ভরত সিংজী আবার বকুনি লাগালেন, "আমি সোস্যাল সার্ভিস বললাম আর আপনি মেনে নিলেন? মোটেই সোস্যাল সার্ভিস নয়, ওটা তো মিটিং কা বাত। ওই যে-বাড়িতে ডানসিং ইস্কুল রয়েছে ওটার মালিক নাগরচাঁদ সুরজলাল। কোনোরকমে একটা কেসে ফাঁসিয়ে ওদের জেলে পাঠাতে পারলে আমাদের আর দেখে কে?"

আমার পিঠে এক চাপড় মারলেন ভরত সিংজী। "আর বোকা সাজবেন না, মিস্টার শংকর। একই গেম খেলছি আমরা যে-গেমে আপনি শকুন্তলা চাওলাকে আইটি অ্যাক্টে জেলে পাঠালেন। কি ক্লিন গেম খেললেন আপনি —কেউ আপনার কথা জানতে পারলো না, অথচ যা চাইলেন তাই হয়ে গেলো।"

ভরত সিংজীকে আমি বোঝাতে গেলাম, শকুন্তলা চাওলাকে জেলে পাঠানোর ব্যাপারে আমি কোনো গেমই খেলিনি, ব্যাপারটা আচমকা হয়ে গিয়েছে! কিন্তু ভরত সিংজী ওসব কথা কানেই তুললেন না। ভারী গলায় হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "নাউ হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? আমার উকিল মুহুরীরা আপনাকে সবরকম সাহায্য করছে তো?"

এ বিষয়ে সত্যিই আমার কোনো অভিযোগ নেই। সমস্ত কাজ অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

মিস্টার ভরত সিং তবু বললেন, "আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি নিজেই খোঁজখবর নেবো আজ। কোর্টের ব্যাপারই হলো, সব সময় উকিল-মুহুরীর, সামনে ক্লায়েন্টের মুখ বেঁকিয়ে থাকতে হবে। যদি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তো অ্যাক্সিলারটর থেকে পা সরে আসবে এবং মামলা আর এগুবে না।"

ভরত সিংজী এতো ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু সেদিনই খবরাখবর নিয়ে আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করলেন। বললেন, "আপনার স্টার এখন খুব ফেভারেবেল, মিস্টার শংকর।"

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা আমার ওপর অকস্মাৎ সদয় হয়েছেন তা ভাববার

কোনো কারণ-নেই। অস্বস্তিকর একঘেয়েমি আমার সমস্ত শরীরকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু ভরত সিং আমাকে ছাড়লেন না।

মৃদু বকুনি লাগিয়ে তিনি বললেন, "আপনি যদি লাকি না হন, তা হলে কে লাকি ? শকুন্তলা চাওলার মামলা যেভাবে বোম্বাইমেলের স্পিডে এগোচ্ছে তা লাকি স্টার ছাড়া কখনও হয় না। আমার তো লোভ হচ্ছে, আমার বরুণা প্রপার্টিজের মামলাগুলোয় আপনাকে জড়িয়ে রেখে আপনার লাকি স্টারের বেনিফিট কাজে লাগাই !"

ভরত সিংজী এবার ব্যাখ্যা করলেন, "আপনার গুডলাক অস্বীকার করে উপায় নেই। শকুন্তলা চাওলা অ্যান্ড পার্টি যে উত্তর দিয়েছে সেটা আমি মিস্টার ঘটকের ওখানে পড়ে এলাম। ওকে উত্তরই বলে না। পুওর মিসেস চাওলা বোধ হয় জেল থেকে তেমন কোনো ভাল লাইয়ারকে এনগেজ করতে পারেননি! কিংবা উকিলকে ঠিক মতন ব্রীফ করেননি!"

"মানে ?"

"মানে খুবই সিম্পল। আপনি নিজেও উকিলের বাবু ছিলেন, আপনারও আঁতে লেগে যেতে পারে। কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, আমাদের সুরজলালজী বলেন, উকিল হলো গরুরগাড়ির বলদের মতো। সব সময় পিছনে লেগে থেকে হ্যাট-হ্যাট না করলে বেস্ট জিনিস বেরোয় না।"

কী অদ্ভুত সব আইডিয়া। আইনপাড়ার বিশেষজ্ঞদের কানে এসব কথা পৌঁছয় কিনা জানতে ইচ্ছে হয়।

ভরত সিংজী বললেন, "শকুন্তলা চাওলার ডিফেন্স খুবই উইক। যেখানে নিজের বিজনেসের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেখানে মিসেস চাওলা গডেস দুর্গার মতো টেন হ্যান্ডস নিয়ে ফাইট করবেন ভেবেছিলাম।"

সামান্য একখানা বাড়িতে মিসেস চাওলার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে কেন, আমি বুঝতে পারছি না।

ভরত সিং ফোঁস করে উঠলেন। "কী বলছেন, মিস্টার শংকর ? বিজনেস প্রেমিসেস না থাকলে বিজনেসের আর রইলো কী ? বিশেষ করে এই ধরনের স্পেশালিস্ট বিজনেস—কত বছর ধরে একটা জায়গায় গুডউইল তৈরি করতে হয়, দেশে বিদেশে নাম ছড়াতে কত সময় লাগে।"

একটু থেমে ভরত সিং বললেন, "পুলিসের সঙ্গে গোলমাল নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আজ ঝগড়া হয়েছে কাল ভাব হতে বাধা কী ? কলকাতার কত বার-এ, কত রেস্তোরাঁয়, কত ডানসিং স্কুলে, কত বিউটি সেলুনে কতবার পুলিশ এলো, মেয়েদের ভ্যানে তুললো, মালিককে পাকড়িয়ে থানায় নিয়ে এলো, কাগজে একটু-আধটু খবর ছাপা হলো, তারপর আবার সব কিছু ব্যাক-টু নর্মাল। ঐ মিসেস চাওলাই তো বলতেন, পুলিশ এবং আমরা মেড্ ফর ইচ আদার। আমাদের না হলে পুলিসের চলে না, আবার পুলিস না হলে আমাদের চলে না।"

সমস্ত সমস্যার ওপর অভিজ্ঞ ভরত সিংজী অভিনব আলোকপাত করছেন। ভরত সিংজী আবার শুরু করলেন, "যা -বলছিলাম। দুটো পুলিশ এসেছে, কাস্টমসের রেড হয়েছে এটা বড় খবর নয়। বড় খবর পুলিসের কাটা খাল দিয়ে আপনার মতো কুমীরের ঢুকে-পড়া। বিজনেস প্রেমিসেস যেতে বসেছে অথচ মিসেস চাওলা ওই রকম উইক ডিফেন্স পুট আপ করছেন

ভাবা যায় না!"

পুওর মিসেস চাওলা!" সহানুভূতি প্রকাশ করলেন মিস্টার ভরত সিং। এর ওপরে আমাদের মিস্টার ঘটক যে-খেলা খেলেছেন!"

উকিল মিস্টার ঘটক আবার কী নতুন চাল দিলেন? বিষয়টা এখনও অমার অজ্ঞাত।

মিস্টার ভরত সিং-এর মুখ আত্মবিশ্বাসের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তাঁর নির্বাচিত উকিল যে একটা কাজের কাজ করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। মিস্টার ভরত সিং বললেন, "অদ্ভুত বুদ্ধি এই মিস্টার ঘটকের। কেসটা উঠেছে জজ মিস্টার খাসনবীশের আদালতে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে কেসটা ওখানেই ঠেলেছেন মিস্টার ঘটক। এর মানে বুঝছেন?"

জজের কাছে কেস উঠছে এর মানে না বুঝবার কী আছে?

কিন্তু মিস্টার ভরত সিং সন্তুষ্ট হলেন না। "আই অ্যাম স্যার টু সে ব্যাপারটা আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি মিস্টার শংকর।"

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম।

মিস্টার ভরত সিং এবার জয়ের হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "ভীষণ মরালিস্ট জজ এই খাসনবীশ। আই-টি অ্যাক্টে ভাড়াটের জেল হয়েছে শুনলে, অন্য কোনো আর্গুমেণ্ট কানে তুলবেন না—এক অর্ডারে ভাড়াটে বিদায় করে দেবেন। কী রকম জজ জানেন এই খাসনবীশ?"

বুঝছি জজদের ব্যাপারেও মিস্টার ভরত সিং অনেক রিসার্চ করেন। মিস্টার ভরত সিং তা অস্বীকার করলেন না। "অবশ্যই রিসার্চ করতে হয়। না হলে মামলা-মোকদ্দমা চালাবো কী করে?" মন্তব্য করলেন মিস্টার ভরত সিং। "এই খাসনবীশ জজের কথাই ধরুন না কেন? লাস্ট ইয়ারে আই টি-অ্যাক্ট অনুযায়ী দু-মাস সশ্রম জেলের বিরুদ্ধে এক পার্টি ওঁর কোর্টে আপীল করলো। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। জজ সাহেব যেমনি শুনলেন কচি কচি মেয়েদের ভাঙিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিল, অমনি শো-কজ নোটিশ ছাড়লেন, কেন তোমার শাস্তি বাড়ানো হবে না কারণ দেখাও। আপীল করে আইনকে কলা দেখাতে গিয়ে উলটো ফল হলো, খাসনবীশ আসামীর জেলের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন।"

ভরত সিং সানন্দে বললেন, "এই সব জেনেশুনেই তো মিস্টার ঘটক তদ্বির করিয়ে শকুন্তলা চাওলার উচ্ছেদের মামলাটা ওর ঘরে ফেলিয়েছেন - দেখুন না এবার কী ফল হয়!"

ভরত সিংকে আমি ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, "আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো ভাষা আমার নেই। আপনি যেভাবে সাহায্য করছেন, এই-ভাবে কেউ সাহায্য করে না।"

ভরত সিং হেসে বললেন, "আপনাকে আমি লাইক করে ফেলেছি। এবং একবার যাকে আমি পছন্দ করি, তার জন্যে আমি সব করি। আপনি এতো কিন্তু কিন্তু করছেন কেন মিস্টার শংকর? হয়তো আপনার সামান্য কাজে লাগছি আমি, কিন্তু দরকার হলে আপনার কাছ থেকেও আমি হেল্প পাবো না কি?"

মামলা দ্রুতবেগে চলছে এবং মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে ফলাফল

জানতে পারা যাবে। জজ খাসনবীশ সম্বন্ধে মিস্টার ভরত সিং-এর ঘোষণা ভুল প্রমাণিত হয়নি। তিনি বেশ কড়া প্রকৃতির মানুষ। এবং মামলাকে অনির্দিষ্ট কাল ধরে টেনে নিয়ে যাবার বিরোধী। মিসেস চাওলার উকিল বিভিন্ন অছিলায় যথাসম্ভব সময় নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু জজ খাসনবীশ সোজা জানিয়ে দিয়েছেন—কোনো কারণেই এই মামলা আর মুলতুবী রাখা চলবে না।

মিস্টার ভরত সিং আমাকে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। মিস্টার ঘটককে আমি বলে দিয়েছি, অন্য পক্ষের উকিল যেন আর একটা দিনও না নষ্ট করতে পারে।"

এর পরেই আমি ভুল করে ফেলেছিলাম। বোকার মতো আমি নিবেদন করেছিলাম, "আপনি আমাদের জন্য এতো করেছেন, অথচ আপনার জন্যে আমরা হয়তো কিছুই করতে পারবো না।"

সেইদিনই মিস্টার ভরত সিং আমার কাছে ফিরে এসেছিলেন। দু'একটা আজে-বাজে কথার পর মিস্টার ভরত সিং বললেন, "মিসেস পাপি বিশোয়াসকে চেনেন আপনি?"

"এ-বাড়িতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন—না চিনে উপায় কী?"

আমার উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন না ভরত সিং। বললেন, "ওসব মামুলী কথা ছাড়ুন, মিস্টার শংকর। আমি জানি ভদ্রমহিলা আপনাকে খুব বিশ্বাস করেন। আপনার সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা ওঁর।

আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, মিস্টার সিং, আমার সম্বন্ধে ওঁর কী ধারণা তা মাপজোক করতে আমি বিশেষ উৎসাহী নই। কারণ ওঁর বিরুদ্ধেও উচ্ছেদের মামলা আনতে হতে পারে আমাকে। বাড়ির মালিককে কিছু না-বলেই উনি সাবটেনানসি নিয়ে বসেছেন।"

"আরে মিস্টার শংকর, অতো রাগ করবেন না। দুদিন পরেই তা অনেক-গুলো ফ্ল্যাট খালি পেয়ে যাচ্ছেন—তখন আপনাকে দেখে কে? এক আধজন মিসেস পাপি বিশোয়াসকে না হয় একটু সহ্য করলেনই। তিনি তো আপনার কোনো ক্ষতি করছেন না," মিস্টার ভরত সিং এবার করুণা ও ক্ষমায় বিগ-লিত হয়ে উঠলেন।

মিস্টার ভরত সিং এবার বললেন, "ইউ হ্যাভ টু ডু মি এ ফেভার। নাথিং ভেরি স্পেশাল। মিসেস বিশোয়াসের কাছে আমার সম্বন্ধে একটু বলে দেবেন—জাস্ট পুট ইন এ ওয়ার্ড। ভরত সিংকে আপনি তো চিনে গেছেন—সেইটুকু বলে দিলেই যথেষ্ট।"

ভোরবেলায় থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটে ব্যালকনিতে বসে মিসেস পাপি বিশোয়াস সূর্যসেবা করছিলেন। কোনো রকম দ্বিধা না করে মিসেস বিশো-য়াস সেখানেই আমাকে নিয়ে গেলেন। বললেন, "শরীরে প্রত্যহ একটু সূর্যের আলো লাগাবেন, মিস্টার শংকর। তা হলে কোনো রকম রোগবিরোগ হবে না। সাহেব-মেমেরা আজকাল কীরকম সূর্য-হ্যাংলা হয়েছে জানেন তো? গায়ে একটু আলো লাগাবার জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে সমুদ্রের ধারে বসে থাকছে। অথচ আমরা সূর্যের দেশের লোকরা রোদ এড়িয়ে থাকতে পারলেই বাঁচি।"

মিসেস পাপি বিশোয়াস দীর্ঘ তনুদেহের ওপর একটা ঢোলকা গাউন পরে নিয়েছেন। বোধ হয় আমি আসবার আগে ওটি খুলে রেখেই সূর্যস্নান

করছিলেন তিনি।

সূর্যস্নানের প্রশংসায় আবার মুখর হয়ে উঠলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। চোখের কালো চশমাটা একটু মুছে নিয়ে তিনি বললেন, "সূর্যস্নানের মূল্য একদিন আমরা আবার বুঝবো। হাজার হোক সূর্যের রহস্য তো আমাদের থেকে তো কেউ বেশী বোঝেনি। আমার ফার্স্ট হাজবেন্ড অতো তো সায়েব লোক। কিন্তু সকালে উঠে সূর্য প্রণাম করতেন ঃ 'ওং জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং...শুনে শুনে আমারও মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।"

বেতের চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "দেখবেন, একদিন আমরা আবার সূর্যের নজরে পড়বার জন্যে ছটফট করবো।"

"সব চেয়ে মজা কি জানেন ?" মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "দেখছি, সান বেদিং-এর সময় আমার সিগারেটের নেশা কমে যায়। এই দেখুন না, আধঘন্টার ওপর বসে আছি অথচ একটাও সিগারেট খাইনি !"

মিসেস বিশোয়াস এবার সূর্য প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন, "সূর্যের গুণের শেষ নেই, মিস্টার শংকর। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, কাগজে পড়লাম, সূর্যের আলো দেহে লাগালে মেয়েদের বয়স কমে যায়। আপনি লেডি পাকড়াশির নাম শুনছেন তো ? উনি রিসেন্টলি সূর্যস্নানের জন্যে আলাদা বেদিংরুম তৈরি করিয়েছেন বাড়ির ছাদে।"

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, হঠাৎ আমার মাথায় এই ভূত চাপলো কেন ?"

খিলখিল করে হেসে উঠলেন মিসেস বিশোয়াস। "নিশ্চয় একটা কোনো উদ্দেশ্য আছে, মিস্টার শংকর। বিনা উদ্দেশ্যে পপি বিশোয়াস যে কোনো কাজ করে না তা তো আপনার এতোদিনে জানা উচিত।"

"তা যাকগে আমার কথা। আপনার কোনো দরকার আছে কিনা বলুন ?"

মিস্টার ভরত সিং-এর কথাটা কীভাবে তুলবো ঠিক করতে না পেরে আমি মাথা চুলকোতে লাগলাম।

"কী হলো আপনার ? অমনভাবে মাথা চুলকোচ্ছেন কেন ?" মিসেস পপি বিশোয়াসের প্রশ্ন থেকেই বুঝলাম কোনো কিছুই তাঁর নজর এড়াচ্ছে না।

আমি এখন ভরত সিং-এর কথা ভেবে-ভেবে নির্বাক। মিসেস পপি বিশোয়াস সস্নেহে বললেন, "আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডের ঠিক এই মুদ্রাদোষ ছিল। কোনো কিছু বলবার ইচ্ছে হয়েছে অথচ ভাষা আসছে না, তখন মাথা চুলকোতে আরম্ভ করতেন। মাথা চুলকোনোর ভঙ্গী দেখেই আমি পরে বুঝতে পারতাম উনি কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না।"

কেন এই মহিলা সংসারের পিছল-পথে দীর্ঘদিন ঘুরেও কথায়-কথায় প্রথম স্বামীর উল্লেখ করেন তা আমি বুঝি না।

মিসেস পপি বিশোয়াস আজকাল বোধ হয় আমার মনের ভিতরটা

দেখতে পান। আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, "আমার বুটিকের ফরেন গেস্টরা অনেক ভাল ছিল, মিস্টার শংকর। দিশী গেস্টদের সঙ্গে তাদের অকাশ-পাতাল তফাৎ এ-কথা স্বীকার করতে একটুও লজ্জা নেই আমার।"

সব ব্যাপার তীব্র স্বদেশীয়ানা অবশ্যই প্রত্যাশা করা যায় না। তবু মিসেস বিশোয়াস বললেন, "আমি যে একজন ইন্ডিয়ান তা সব সময় আমার মনে থাকে, ইন্ডিয়া ছাড়া আমাদের যে গতি নেই তাও আমার অজানা নয় তবু ইন্ডিয়ান গেস্টদের সঙ্গে সায়েব গেস্টদের তুলনা করলে লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে যায়, মিস্টার শংকর।"

এই প্রসন্ন নির্মল প্রভাতে পপি বিশোয়াসের পেয়িং গেস্টদের অপরিছন্ন ইতিবৃত্ত শোনবার কোনো উৎসাহ নেই আমার। কিন্তু মিসেস পপি বিশোয়াস নিজেই আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন এবং একবার মুখ খুললে আর বন্ধ করতে চান না।

মিসেস পপি বিশোয়াস সূর্যসেবিতা হতে হতে বললেন, "ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা অনেক দিনের সাধনায় মানুষকে সম্মান করতে শিখেছে, রিল্যাকসেশনের জন্যে কোথাও গিয়ে তাই তাঁরা পুরোপুরি অমানুষ হতে পারে না। আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমার বুটিকের এয়ার-কন্ডিশন মেজানাইন ফ্লোরে ইংলিশ এয়ারলাইনের কত গেস্টের সঙ্গে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আমার ফার্স্ট হাজবেন্ড সম্পর্কে গপ্পো করেছি—ঠিক যেন ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, যা-খুশি তাই নিয়ে ডিসকাশন করেছি। এতো ভদ্র আপনাকে কী বলবো! পয়সা কখনও খোলাখুলি গুণে দেয় না, সব সময় একটি খামের মধ্যে পুরে টুক করে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তার মধ্যে রেখে দেয়—যেন কোনো চিঠি দিচ্ছে। আপনাকে ফিল করতে দেবে না যে দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ক্যাশ রয়েছে।"

একটু থামলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, "নগদ জিনিসটা বড় নোংরা, মিস্টার শংকর। অবস্থার বিপাকে হাত পেতে অবশ্যই নিতে হয়, কিন্তু কেমন যেন একটু অস্বস্তি লাগে। সায়েবগেস্টরা সেটা বোঝে মিস্টার শংকর। তারা জানে, একটা মেয়েকে কয়েকখানা নোট দিচ্ছে বলে তার মাথা কিনে নিচ্ছে না। টাকার হামানদিস্তে দিয়ে ছিঁচলেই মেয়েমানুষের সব কিছু পাওয়া যায় না। বডিটাই সব নয়—মুড বলেও একটা জিনিস আছে।"

ভোরবেলায় মিসেস পপি বিশোয়াস আচমকা কী বিষয় যে উত্থাপনা করলেন! কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। আমি ছাড়া এ-সংসারে মনের সব কথা খুলে বলবার মতো লোক বেচারা মিসেস বিশোয়াসের আর একজনও বোধ হয় নেই। যা-বলছেন বলেই চলুন মিসেস পপি বিশোয়াস।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, "আমার বুটিকের ফরেন গেস্টরা কী-রকম জানেন? আমার বার্থ-ডেতে রঙীন গ্রিটিং কার্ড পাঠায়। সুন্দর-সুন্দর গিফ্‌টও চলে আসে। কত ব্যস্ত লোক ওঁরা, দুনিয়া চষে বেড়াতে হয়, কিন্তু তারই মধ্যে নিজের সৌজন্যবোধটুকু হারিয়ে ফেলে না ওরা। ফলে ওদের সঙ্গে সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যায়। আর আমাদের ইন্ডিয়ান গেস্টদের কথা বলবেন না! প্রত্যেকটি লোক যেন আগের জন্মে আকবর বাদশা ছিলেন। অর্ধেক সময় নিজের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা—আলটু-ফালটু নাম বলে ঠকাতে চায়। ভাবে পয়সা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে, রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাটলেটের অর্ডার দেওয়া আর মিসেস বিশোয়াসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিকস

করা এক জিনিস।"

মিসেস বিশোয়াস মুখ বিকৃত করলেন। "বেশ ছিলাম, আমার বুটিক-এ। এই থ্যাকারে ম্যানসনে এসে প্রাণ আইঢাই করে ওঠে। সায়েবদের কত গুণ কী বলবো আপনাকে। ইংলিশ এয়ারলাইনের গেস্টরা, আপনি বিশ্বাস করবেন না, রেগুলার আমাকে ব্রেড-অ্যান্ড-বাটার লেটার পাঠিয়ে যেতেন।"

রুটি-মাখনের চিঠি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করতেই মিসেস বিশোয়াস বললেন, "ব্রেড-অ্যান্ড-বাটার লেটার জানেন না ? অবশ্য জানবেনই বা কী করে, আপনি তো ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসের খবর রাখেন না। আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডের সঙ্গে যখন ঘর করেছি তখন কোনো নেমন্তন্ন থেকে ফিরলেই নিজের হাতে গৃহস্বামীনীকে ধন্যবাদ-পত্র লিখতে হতো। কারুর কাছে কোনো ফেভার পেলেই ভদ্রসায়েবরা তাকে নিজের হাতে-লেখা ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠায়। এটা ওদের ভদ্রতার অঙ্গ।"

"ওই সব চিঠির দাম তখন বুঝতাম না, ভাবতাম ওইটাই নিয়ম। এখন থ্যাকারে ম্যানসনে এসে দুঃখ পাচ্ছি, দাঁত থাকতে তো দাঁতের মর্যাদা বুঝিনি!" দুঃখ করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

থ্যাকারে ম্যানসনের নির্বাসন জীবন যে মিসেস পপি বিশোয়াসের ভাল লাগছে না তা বেশ বুঝতে পারছি।

মিসেস পপি বিশোয়াস আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। "ভুলে যান আমার বর্তমানের কথা। আমার তো তবু ভাববার মতো একটা অতীত আছে, অনেকের তো তাও থাকে না!"

একটু থামলেন মিসেস বিশোয়াস। "অতীতটা ইচ্ছে করলেই কত সুন্দর হতে পারতো। একটুর জন্যে সব বানচাল হয়ে গেলো। ওই যে আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডের কথা বলছিলাম। যখন মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে না-নিয়েই বেরিয়ে যেতো তখন কিছুই বুঝতাম না। ফিরে এসে লোকটা ঠিক আপনার মতো মাথা চুলকোতো। আমি সরল মনে কোনো সন্দেহ করিনি ; কিন্তু আমার ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকতো তাহলে ওই মাথা চুলকোনো দেখেই ধরে নেওয়া উচিত ছিল যে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। নিষিদ্ধ ফলের দিকে নজর বলেই অতো দ্বিধা।" দুঃখ করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

কিন্তু দুঃখের মধ্যে ডুবে থাকবার মতো মানুষ নন মিসেস বিশোয়াস। কিছুক্ষণের চেষ্টায় তিনি আবার হাসিতে ঝলমল করে উঠলেন। বললেন, "প্লিজ কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শংকর। অতীতের কথা ভেবে কষ্ট পাবার মেয়ে পপি বিশোয়াস নয়—ভবিষ্যতের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যেই আমার জন্ম। যখন ভবিষ্যৎ থাকবে না তখন পপি বিশোয়াসও থাকবে না, আপনি দেখে নেবেন!"

"বলুন আপনার কথা।" আহ্বান জানালেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আমার দ্বিধা কাটাবার জন্যে পপি বিশোয়াস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মামলা মোকদ্দমা কেমন চলছে ? যা খবর পেলুম তাতে মিসেস শকুন্তলা চাওলা তো মামলা লড়বার জন্যে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।"

ব্যাপারটা অস্বীকার করা গেলো না।

মিষ্টি হেসে মিসেস বিশোয়াস বললেন, "লড়বে কী করে ? গঙ্গার জল যে অনেক দূর গড়িয়েছে!"

"কী ব্যাপার?"

"শোনেননি ব্যাপারটা? কন্যা উর্বশী যে স্বামীর বিরুদ্ধে ডাইভোর্সের মামলা ফাইল করেছে। আমি যা শুনলাম, উর্বশী ভয় দেখিয়েছে, বেশী গোলমাল করলে, স্বয়ং গর্ভধারিণী জননীকেই সে ডাইভোর্স মামলার কো-রেসপনডেন্ট করবে। মিসেস শকুন্তলা চাওলা এবার নরম হয়েছেন।"

মিসেস পাপি বিশোয়াস এবার বললেন, "অনেক অপরাধ করেছে, অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছে শকুন্তলা চাওলা। তার শাস্তি জীবনকালেই পেয়ে গেলো। একদিকে ভাল, না-হলে নরকে গিয়ে কষ্ট পেতো।"

"আপনি জেনে রাখুন, উর্বশী এবার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মনের দুঃখে হংকং না কোথায় গিয়ে সে নতুন জীবন শুরু করতে চায়—কলকাতায় যতক্ষণ এই থ্যাকারে ম্যানসন আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন তার পক্ষে সব ভুলে থাকা সম্ভব হবে না।"

"আমি ভেবেছিলুম, এবারেও শকুন্তলা চাওলা লড়াই করবে। কিন্তু ওইখানে আমার হিসেব ঠিক হয়নি। যত অপকর্ম এবং অনাচারই করুক, শকুন্তলা সত্যিই মেয়েটাকে ভালবাসতো। শুনেছি খুব কান্নাকাটি করেছে জেলে।"

উর্বশী এখন কোথায়? ওঁর খবরাখবরও বা মিসেস পাপি বিশোয়াস কীভাবে পেলেন?

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "এই থ্যাকারে ম্যানসনে বন্দী হয়ে বসে থেকে এসব খবর জোগাড় করা কী সম্ভব হতো? কিন্তু মিস্টার জেঠমালানি এখন আমার ওপর খুব প্লিজড। উনিই সমস্ত খবরাখবর দিচ্ছেন—ওঁরা জানেন না এমন খবর কলকাতা শহরে আছে কিনা সন্দেহ। ওঁদের খুরে-খুরে নমস্কার," মিসেস বিশোয়াস এই মুহূর্তে মিস্টার জেঠমালানির ওপর সন্তুষ্ট না বিরক্ত তা ঠিক বোঝা গেলো না।

আমার চোখের সামনে এবার মিস্টার ভরত সিং-এর ফুটবলের মতো গোল মুখখানা ভেসে উঠছে। তিনি যেন অদৃশ্যলোক থেকে চোখের ইশারায় আমাকে বলছেন, "তুমি কি ভুলে গেলে কেন আজ মিসেস পাপি বিশোয়াসের সংগে দেখা করতে এসেছিলে?"

আমার চোখের তারা থেকে ওই গোলমুখটা কিছুতেই মুছে যাচ্ছে না। গোলমুখের মালিক আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, "আমি আপনার জন্যে অনেক করেছি, মিস্টার শংকর। এই শকুন্তলা চাওলাকে বাড়িছাড়া করবার মামলায় আমি না-থাকলে আপনার কী দশা হতো?"

অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ-কথাও বলা যাবে না যে কলকাতা শহরে উকিলের অভাব নেই মিস্টার ভরত সিং। কারণ প্রকৃত পরিস্থিতি হলো, পয়সা ছড়াতে না পারলে উকিল-ব্যারিস্টারের বেশ অভাব আছে এই শহরে। বিলাসিনী দেবীর কাছ থেকে কাঁচা পয়সা চেয়ে নিয়ে এসে মামলা করার কথাই ওঠে না। তিনি যে মামলার অনুমতি দিয়েছেন এই যথেষ্ট। যদি একবার বরদাপ্রসন্নবাবুর শেষ পরামর্শ ওঁর কানে পৌঁছয় যে বাস্তু সাপকে বাড়ি থেকে তাড়িও না, তাহলে এখনই হয়তো মামলার অনুমতি তিনি ফিরিয়ে নেবেন। মাছের তেলেই মাছ ভাজবার রীতি এই অঞ্চলে—থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়াটিয়ার টাকাতেই উচ্ছেদের মামলা চলা উচিত। কিন্তু হঠাৎ রোজগার কমে গিয়েছে থ্যাকারে ম্যানসনের। এতোগুলো ফ্ল্যাটে

ভাড়াটিয়া নেই, এবং শকুন্তলা চাওলার অনেকগুলো ফ্ল্যাটে তালা ঝুলছে এবং একপয়সা ভাড়া আদায় হচ্ছে না।

ভরত সিংজী একবার উপদেশ দিয়েছিলেন, "চন্দ্রোদয় ভবনে মাসিক রেমিট্যানস কমিয়ে দিন। এবং মামলায় খরচ করুন। আপনি তো আর নিজের উন্নতির জন্যে মামলা করছেন না, থ্যাকারে ম্যানসনের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কোর্ট-ঘর করছেন।"

কিন্তু সে-ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। বিলাসিনী দেবীর গোমস্তা বলেছিলেন, "মাসিক জমার টাকা কমাবেন না, শংকরবাবু। এই বিডন স্ট্রীটের হাতির খোরাক চালাতে গিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মা-ঠাকরুন তো ওসব নিয়ে মাথা ঘামান না। মধ্যিখান থেকে পুজো-আচ্চা এবং পুরুতকে দান-ধ্যানের খরচ বেড়েই চলেছে। কী করে যে সংসার চালাচ্ছি সে আমিই জানি। মা-ঠাকরুনকে বলতে মায়া হয়—বুঝি ওঁর ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে।"

আমি তাই ওখানকার টাকা কমাতে পারছি না। টান পড়ছে মেরামতির খরচে, ইলেকট্রিক এবং কর্পোরেশনের পাওনা বেড়ে চলেছে। সব ঘরে নতুন ভাড়াটে বসলে তখন আর কোনো অসুবিধা থাকবে না—বরং নতুন রেটে ভাড়া দেওয়ার ফলে রোজগার অনেক বেড়ে যাবে।

ভরত সিংজীকে এসব কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। এবং উনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন—"এখনই ভাড়া দেবার কথা ভাববেন না। আগে শকুন্তলা চাওলার মামলাটা গুছিয়ে নিন।"

কিন্তু টাকার চাকার ওপরেই মামলা চলে একথা কি ভরত সিংজী ভুলে যাচ্ছেন?"

"মোটেই ভুলিনি, মিস্টার শংকর," আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন ভরত সিংজী। "আপনি শুধু মামলা নিয়ে মাথা ঘামান। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার দেওয়া উকিল মুহুরী সাক্ষী মামলা চলা কালে আপনার কাছে একটি পয়সা চাইবে না। মামলা শেষ হোক তখন হিসেবে বসা যাবে। এবং তখন আপনাকে দেখে কে! এক-একটা ফ্ল্যাট থেকে যা পাগড়ি পাবেন তাতেই চারটে মামলার খরচ উঠে যাবে।"

অঙ্কটা যতই সহজ হোক, ভরত সিংজী সাহস না-দিলে আমার পক্ষে এখনো সম্ভব হতো না। তার জন্যে অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতাবোধের কারণ আছে। প্রতিদানে ভরত সিংজীর সাহায্যে না-লাগলে আমি কী করলাম?

পপি বিশোয়াস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর ভরসা দিলেন, "যদি কিছু বলবার থাকে ঝটপট বলে ফেলুন। আমার সঙ্গে আপনার তো লজ্জার সম্পর্ক নয়।"

এবার আমি মুখ খুললাম। "সুরজলাল নাগরচাঁদের বরুণা প্রপার্টিজ।"

"শুধু বরুণা কেন? ওঁদের আরও কত প্রপার্টি আছে। একদিন হয়তো দেখবেন, এই সদর স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট এ-সবই ওঁদের হাতে চলে গিয়েছে; বললেন মিসেস পপি বিশোয়াস। উনি যে বিষয়সম্পত্তির বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ নন তা বুঝতে পারছি আমি।

আমি আর সময় নষ্ট না করে বললুম, "ওঁদের ওখানে একজন খুব ভাল লোক আছেন। আমাকে খুব হেল্প করছেন সম্প্রতি।"

আমার মুখের দিকে বিশেষ আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "প্রপার্টি লাইনে ভাল লোক! কী জানি, আপনি যখন বলছেন,

তখন হলেও হতে পারে।” মন্তব্য করলেন মিসেস পপি বিশোয়াস।

আমি এবার একটু এগিয়ে গেলাম। “আমি বরুণা প্রপার্টিজের রেসিডেন্ট ডিরেকটর ভরত সিং-এর কথা বলছি। ভদ্রলোক কোথা থেকে শুনেছেন আপনার সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা। ভদ্রলোকের আপনার সঙ্গে কী প্রয়োজন আমি জানি না, উনি নিজেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, শুধু ওঁর সম্বন্ধে আপনার কাছে একটু বলে দিতে বলেছেন।”

মিসেস পপি বিশোয়াস এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। “প্রয়োজনটা কী আমি জানি ; আমাকে ইতিমধ্যেই ওঁরা সাউন্ড করেছেন। কিন্তু একটা লোক তো ডবল হতে পারবে না।”

কী বিষয়ে সাউন্ড করেছেন আমি আন্দাজ করতে পারছি না। মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, “ক্যালকাটার সোস্যাল লাইফে এই পপির মতো মেটিরয়াল যে একটার বেশী নেই তা এতোদিনে দিনের আলোর মতো প্রমাণ হচ্ছে।” গভীর আত্মতুষ্টির সঙ্গে মিসেস বিশোয়াস বললেন, “একমাস আগেও অফার করলে আমি মিস্টার সিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুযোগটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গিয়েছে।”

কী এমন সুযোগ মিসেস বিশোয়াসের জীবনে আসতে পারে? আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে সাহস পাচ্ছি না।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, “আপনাদের ওই ভরত সিং অনেক খেটেখুটে ওপরে উঠে এবার একটু গায়ে হাওয়া লাগাতে চায়। আর কেন হাওয়া লাগাবে না বলুন? টাকা তো মরবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া দেখছে তো নিজের মনিবদের এবং কলকাতার টাকাওয়ালা লোকের কাণ্ড-কারখানা। একদিন এই পপি বিশোয়াসকে আপনাদের এই ভরত সিং পাত্তা দেয়নি, কোনো কো-অপারেশন পাইনি ওর কাছ থেকে। এখন আমাকে হোল-টাইম অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওদের নতুন হোটেল ডে-অ্যান্ড-নাইটে। আমার একটা মুখোশও থাকবে—ম্যানেজার কাসটমার রিলেশন, যাতে কোনো সামাজিক অসুবিধে না হয়। খুবই লোভনীয় অফার বলতে পারেন। এক সপ্তাহ আগে হলে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়তাম। ভরত সিংকে আপনার থ্রু দিয়ে কাকুতিমিনতি করতে হতো না। কিন্তু...”

এইখানেই একটু থামলেন মিসেস পপি বিশোয়াস। বললেন, “ব্যাপারটা আপনাকে বলে ফেলাই ভাল। যদিও খবরটা এখনও টপ-সিক্রেট।”

টপ-সিক্রেট খবরের ওপর কখনও হুমড়ি খেয়ে পড়তে নেই। তাই আমি অহেতুক কৌতূহল দেখালাম না।

মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, “এবার আপনি বুঝতে পারবেন আমি কেন সূর্যস্নানে ইনটারেস্টেড হয়েছি। সূর্যদেব হয়তো কিছু দিনের জন্যে আমার কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবেন।”

আমি এখনও নিরুত্তর। মিসেস পপি বিশোয়াস বললেন, “কাউকে যেন বলবেন না—আমি লন্ডন প্যারিস রোম কোপেনহাগেন ফ্রাঙ্কফুর্ট বেড়াতে যাচ্ছি। লং টুর।”

পাসপোর্ট ভিসা সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে মিসেস পপি বিশোয়াসের। মিসেস বিশোয়াস এবার একটু হেসে ফেললেন। “কার সঙ্গে যাচ্ছি বলুন তো? ঠিক উত্তর দিতে পারলে প্যারিস থেকে এক শিশি স্পেশাল পারফিউম এনে দেবো।”

কে এই ক্ষণজন্মা? আমি মাথা চুলকোতে লাগলাম। "আপনার ইংলিশ এয়ার লাইনের কোনো পুরনো বন্ধু?"

"আপনার মাথা!" বকুনি লাগলেন মিসেস বিশোয়াস। উত্তর ঠিক না হলেও একটা পারফিউম এনে দেবো আপনাকে। কনসোলেশন প্রাইজ।"

উত্তরটা শুনে আম একটু চমকে উঠলাম। স্বয়ং জগদীশ জেঠমালানি যে এই পর্বের নায়ক তা ভাবতে পারিনি। জগদীশ জেঠমালানি দেশের মাটিতে অ্যাডভেঞ্চারে নামতে দুঃসাহসী হননি। তার পরিবর্তে এই অভিনব পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। কারও কোনো নজর পড়বে না। মিসেস পপি বিশোয়াস একদিন আগে গোপনে ফ্রাঙ্কফুর্টে চলে যাবেন এবং পরের দিন এয়ারপোর্টে মিস্টার জেঠমালানিকে রিসিভ করবেন। তারপর শুরু হবে ওঁদের যুগলভ্রমণ যার অন্য নাম ওভারসিজ বিজনেস ট্যুর।

জগদীশ জেঠমালানি এর আগে কখনও ফরেনে যাননি। পপির সান্নিধ্য ও অভিজ্ঞতা দুই তাঁর বিশেষ কাজে লাগবে।

মিসেস বিশোয়াস বললেন, "অনেকদিন বিদেশে যাইনি। মনটা কেমন আনচান করছে। সুযোগটা যখন এলো তখন হাতছাড়া করলাম না, মিস্টার শংকর। এখানে কেউ জানতেও পারবে না। মিস্টার জেঠমালানির অনেক টাকা আছে কিন্তু ইউরোপের তেমন কিছুই জানেন না। আমিই প্রোগ্রাম তৈরি করেছি।"

শুনলাম, মিসেস বিশোয়াসের একই সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিস্টার জেঠমালানির লোকভয় খুব। তিনি নজরে পড়তে চান না, তাই বললেন, তুমি একদিন আগে চলে যাও।

"মিনিমাম ছ'সপ্তাহ—আট সপ্তাহও হতে পাবে", জানালেন মিসেস বিশোয়াস। তারপর বললেন, "দেখবেন, এর মধ্যে যেন আমার ফ্ল্যাটেও ডবল তালা ঝুলিয়ে দেবেন না। দেখি আপনারও কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। মিস্টার জেঠমালানি এখন থেকে আমার কথা হয়তো শুনবেন, ও কে বলে ভাল কোনো কোম্পানিতে আপনার একটা চাকরি করে দেওয়া যায় কিনা।"

যাবার আগে মিসেস বিশোয়াস আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন। "যাই ভাই। আপনি ছাড়া কারও কাছ থেকে তো বিদায় নেবার নেই।"

জগদীশ জেঠমালানির ছবি কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তিনি ইউরোপে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা ও চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত আছেন।

এই ছবি দেখেছি এবং নির্জনে হেসেছি। খবরের কাগজের ছাপানো লাইনগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে সত্যের কতটুকুই বা আমরা জানতে পারি?

বিদেশের মাটিতে পা দেবার আগেই এরোপ্লেন থেকে আমাকে ছোট্ট চিঠি লিখেছেন মিসেস পপি বিশোয়াস। "আপনার কথা একটুও ভুলিনি, ভাই। এখানে অফুরন্ত সুযোগ পাবো মিস্টার জেঠমালানিকে আপনার কথা বলবার।"

মিসেস পপি বিশোয়াস কবে ফিরে আসেন সেই প্রতীক্ষায় বসে আছি।

মিসেস বিশোয়াসকে নিজের অজ্ঞাতে কোনো এক সময়ে আমি ভালবেসে ফেলেছি—তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো ঘৃণা নেই। কোনো অভিযোগ নেই।

মিসেস বিশোয়াস আরও একটা রঙীন ছবি পাঠিয়েছেন। আমার সম্বন্ধে জগদীশবাবুর সঙ্গে যে অনেক কথাবার্তা হয়েছে তাও জানিয়েছেন। আমাকে চিন্তা করতে বারণ করেছেন মিসেস বিশোয়াস।

কিন্তু তারপরেই বোমা ফাটলো। নতুন ঘটনার বিবরণ আমার কানে প্রথমে না পৌঁছে, অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লো।

মিস্টার ভরত সিংকে খুব বিরক্ত মুডে দেখলাম একদিন। মিস্টার সিং বললেন, "শুনেছেন আপনার মিসেস বিশোয়াসের কাণ্ডকারখানা?"

দেখলাম মিস্টার সিংএর কিছুই অজানা নেই। মিস্টার সিং বললেন, "ফ্রড বলতে যা বোঝায় তাই। মিস্টার জেঠমালানির কাছ থেকে ফরেনে যাবার সমস্ত খরচ নিয়েছেন মিসেস বিশোয়াস। টিকিটের দাম, হোটেল খরচ ছাড়াও আরও অনেক টাকা। কিন্তু তার পরেই বিশ্বাসঘাতকতা!"

শুনলাম মিসেস পপি বিশোয়াস আচমকা জগদীশ জেঠমালানিকে ছেড়ে উধাও হয়েছেন। জগদীশবাবুর অনুমতি নেবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। অপমানিত মিস্টার জেঠমালানি ফরেন প্রোগ্রাম কাটছাঁট করে দেশে ফিরে এসেছেন।

মিসেস বিশোয়াস সম্পর্কে নানা কুৎসিত গুজব ছড়িয়েছেন মিস্টার ভরত সিং! জগদীশ জেঠমালানির নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কেও বহু মন্তব্য হয়েছে। মিসেস বিশোয়াস নাকি ওখানে গিয়ে বেশী দামী কোনো পার্টি পেয়ে গিয়েছেন। অনেক টাকা রোজগার করে নিয়ে তিনি আবার ফিরে আসবেন। মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি আফশোস করেছেন, বাঙালী মেয়েদের তিনি আর কখনও বিশ্বাস করবেন না। তাঁর উচিত ছিল, পপি বিশোয়াসের পাশপোর্টখানা নিজের পকেটে রাখা, তাহলে পাখী এমনভাবে উড়ে পালাতো না।

এ সংসারে এখন বোধ হয় আমি ছাড়া পপি বিশোয়াস সম্পর্কে চিন্তা করবার কেউ নেই। অনেক রাত্রে কাজ থেকে ফিরে এসে আমি ভেবেছি ওঁর কথা—বিদেশের অজানা পরিবেশে আত্মীয় পরিজনহীন মিসেস বিশোয়াসের কী হলো? কোনো বিপদে পড়লেন না তো? নির্লজ্জ স্বার্থপর জগদীশ জেঠমালানিদের ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কথা নয়।

মিসেস পপি বিশোয়াস, আপনার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই—কিন্তু পাকেচক্রে থ্যাকারে ম্যানসনের এই অজানা পরিবেশে আপনি আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। নানা দুঃখের মধ্যে আমাদের সম্পর্কের অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে, আপনি যে আমার এমন আপনজন তা আজ এই নিদ্রাহীন রাত্রে বুঝতে পারছি। আপনি কোথায় গেলেন? আমার ভয় হচ্ছে, আর কখনও আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

মিসেস বিশোয়াসের সঙ্গে সত্যিই আমার আর দেখা হয়নি। কিন্তু ছোট্ট একটা চিঠি পাঠিয়ে তিনি আমার দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়েছিলেন। প্রিয় শংকরবাবু, এই চিঠি পেয়ে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এখানে আকস্মিকভাবে আমার ফার্স্ট হাজবেন্ডের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেলো। ডিপ্লোম্যাটিক চাকরি খুইয়ে প্যারিসের এক ফ্ল্যাটে অসুস্থ অবস্থায় কোনো রকমে দিন কাটাচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, যার জন্যে সে আমাকে ত্যাগ

করেছিল সে নিজেই ওকে ছেড়ে পালিয়েছে। ওর এখন দুঃখের সময়। সেবা যত্নের প্রয়োজন। ঠিক সময়েই এবার বোধ হয় ঈশ্বর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। পুরনো অধ্যায়টা আমি নতুনভাবে শুরু করতে চাই। আমি ওর কাছেই রয়ে গেলাম।

থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটের চাবিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। চাবিটা না পেলে আপনাকে হয়তো আর একটা মামলায় জড়িয়ে পড়তে হবে। আপনার অনেক দুশ্চিন্তা আছে, আর বাড়াতে চাই না। এই বিদেশে আশ্চর্য এক নতুন পরিবেশে আমার অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়েছে। আশা করছি কোনো দোকানে ছোটখাট কাজকর্ম জুটে যাবে। আপনাদের কথা প্রায়ই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। আপনাকে ভোলা শক্ত হবে। ঈশ্বর আপনাকে ভালো রাখুন। আপনি আমার জন্যেও একটু প্রার্থনা করবেন। অনেক অপমান ও যন্ত্রণার সমুদ্র পেরিয়ে এসে সুদূর বিদেশে আপনার পপিদি এবার যেন একটু শান্তি পায়, এবার সেও যেন বিজয়িনী হয়। স্নেহাশীর্বাদ রইলো। ইতি।

পুঃ আমার ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটা সুটকেস ছাড়া কিছুই নেই। ওটা আপনার কাছে রাখবেন। বিয়ে হলে ভাই বউকে ওটা দেবেন, বলবেন এক হারিয়ে-যাওয়া দিদির শুভাশীর্বাদ।

পপি বিশোয়াসের খবরটা কল্পনায় রঙীন হয়ে ওয়াকিবহাল মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব খবরের উৎস কে, কীভাবেই বা এতো দ্রুত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে তা জানবার সাধ্য আমার নেই।

জগদীশ জেঠমালানিকে একদিন দেখলাম। কেমন শান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি, চোখের কী নিরীহ চাহনি—কে বলবে এই জেঠমালানিই এমন শক্তিধর, থ্যাকারে ম্যানসনের আশপাশের বিজনেস ওয়ার্লডের তিনিই জগদীশ্বর। জগদীশ জেঠমালানি ফিনলে কোম্পানির 'সাচ্চা হীরা' আদ্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরেছেন। চোখে সাধারণ একটি চশমা—কাচের পাওয়ার একটু বেশীর দিকে।

আমার সঙ্গে এই প্রথম মুখোমুখি আলাপ, কিন্তু এমনভাবে কথা বললেন, যেন থ্যাকারে ম্যানসন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না! হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন জগদীশ জেঠমালানি। বললেন, "আপনার সঙ্গে একদিন, অনেকক্ষণ ধরে কথা হবে। আমি সবে দেশে ফিরেছি, একটু কাজকর্ম গুছিয়ে নিই।" বিনয়ের অবতার জগদীশবাবু বললেন, "ফিকর মত কীজিয়ে—রাজু, আমার ভাগ্নে, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সে-ই আপনাকে নিয়ে আসবে, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।"

ভরতসিংজীর মেজাজ অন্য রকমের। তিনি আনন্দে দন্তকৌমুদি বিকশিত করে বললেন, "শুনেছেন মিস্টার জেঠমালানির কথা? রাইটলি সার্ভড্।"

আমি মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছি না। উৎফুল্ল ভরত সিংজী উপদেশ দিলেন, "যে ফ্ল্যাটে আপনার ফ্রেন্ড মিসেস পপি বিশোয়াস থাকতেন সে সম্বন্ধে একটু রিসার্চ করুন। ফ্ল্যাটটা জগদীশজী নিজের নামে করিয়েছিলেন? না

মিসেস বিশোয়াসের সঙ্গেই পুরনো ভাড়াটে মিসেস কিরণ খোসলার অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়েছিল ?”

ভরত সিংজী বললেন, “হাতটা একটু দিন, মিস্টার শংকর। আপনার সঙ্গে একটু হ্যান্ডশেক করি। এই রকম লাকি হ্যান্ড হোল ক্যালকাটার প্রপার্টি ওয়ার্ল্ডে আর একটাও নেই। মনে হচ্ছে, বিনা হাঙ্গামায় আপনার আর একটা ফ্ল্যাট খাস হলো—অলমোস্ট ওয়ার্ল্ড রেকর্ড! জোব চার্নকের আমল থেকে কলকাতার কোনো, প্রপার্টি ম্যানেজারের এমন একের পর এক সাকসেস হয়নি!”

আমার হাতখানা টেনে নিয়ে মিস্টার ভরত সিং দীর্ঘ সময় ধরে সাহেবী কায়দায় মর্দন করলেন। তারপর বললেন, “মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি এবার রাইট এডুকেশন পেয়েছেন!”

আমি মিস্টার ভরত সিং-এর মুখের দিকে তাকালাম। মিস্টার সিং বললেন, “রাইটলি সার্ভড্! মিসেস বিশোয়াসের এপিসোড আমি সহজে ভুলবো না। সুরজলাল নাগরচাঁদের অফার টার্নডাউন করবার মতো কোনো মেয়ে কলকাতায় নেই বলেই আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু মিস্টার জেঠমালানি ওই মিসেস বিশোয়াসকে স্পেশাল সুড়সুড়ি দিলেন।”

মিস্টার ভরত সিং এবার হাসতে লাগলেন। হাসির ধাক্কা সামলে বললেন, “মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি বেরোলেন এক্সপোর্ট প্রমোশন ট্যুরে। উইডোয়ার মানুষ, এখানে তেমন স্বাধীনতা পান না, অথচ একটু হাওয়া খাওয়া দরকার। বেশ করেছো ফরেনে গিয়েছো। কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মিসেস বিশোয়াসের জন্যে কী ব্যবস্থা হয়েছিল শুনেছেন?”

আমি আর এ সব ভিতরের খবর কোথা থেকে শুনবো ?

মিস্টার ভরত সিং বললেন, “নিজের গাঁট থেকে এক পয়সা খরচ করতে মিস্টার জেঠমালানি রাজী নন। লেডি কমপ্যানিয়নের খরচও কোম্পানির বিজনেস এক্সপেণ্ডিচার হিসেবে দেখাতে চান! মিসেস পপি বিশোয়াসকে কোম্পানিতে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলেন— স্পেশাল অ্যাসিসটেণ্ট, এক্সপোর্ট প্রমোশন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন হাওয়া খেতে!”

আবার হাসি শুরু হলো মিস্টার ভরত সিং-এর! “মিস্টার জেঠমালানির জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে এখন মিস্টার শংকর।”

এসব রসিকতায় অংশ গ্রহণ করবার মতো মানসিক অবস্থা এখন আমার নেই। কিন্তু মিস্টার ভরত সিং নাছোড়বান্দা। বললেন, “অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি, মিস্টার জেঠমালানির খরচে ফরেনে গিয়ে মিসেস বিশোয়াস ওখানে অন্য কোনো পার্টিকে সিলেক্ট করে বসেছেন। সব জেনে-শুনেও কিছু করতে পারলেন না, মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি। অন্তত ছ' মাসের জন্য কনট্রাক্ট করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তখন খেয়াল হয় নি!”

মিস্টার ভরত সিং বললেন, “মনের দুঃখে বেচারা জগদীশ জেঠমালানি ফরেন প্রোগ্রাম মাঝ রাস্তায় বন্ধ করে দেশে ফিরে এলেন। এবং আমাকে কি বললেন জানেন?”

প্রশ্ন করেই আবার হাসতে লাগলেন ভরত সিং। তারপর নিজেই জানালেন, “ভাগ্নের শরীর খারাপের খবর পেয়েই তিনি ফরেন প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে আর্জেণ্টলি ফিরে এসেছেন।”

“এত যদি না হাসি, কিসে হাসবো বলুন?” মিস্টার ভরত সিং-এর হাসি

থামতেই চায় না।

মিস্টার ভরত সিং আমাকে উপদেশ দিলেন, "আপনাকে ভিতরের সব খবর দিয়েছিলাম। মিসেস পপি বিশোয়াস কবে ফিরবেন সন্দেহ। আপনি ওই ফ্ল্যাটটাও দখল করে নিন জগদীশ জেঠমালানি বুঝুক কলকাতার বিজনেস ওয়ার্লডে এখনও দু একটা বুদ্ধিমান লোক বেঁচে আছে!"

এক বিচিত্র অস্বস্তি এবার আমাকে ঘিরে ধরছে! মাথার ভিতরটা দপ দপ করছে। নির্লজ্জ স্বার্থপরতার এমন বিচিত্র জগৎ যে কলকাতা শহরে রয়েছে তা আমার জানা ছিল না।

আমি এখন একটু শান্তি চাই। একটু একলা থাকতে চাই আমি। মিস্টার ভরত সিংকে তখনকার মতো দূরে সরিয়ে দিয়ে আমি একটু আমার আপনজনদের কথা ভাবতে চাই।

বসে আছি একলা। চারতলার এই ছোট্ট ঘরে আমি ছাড়া কেউ নেই।

"এই মুহূর্তে তুমি কাদের কথা ভাবতে চাও?" মনের গভীর থেকে কে যেন আমাকে প্রশ্ন করলো।

আমি আমার প্রিয়জনদের একটু স্মরণ করতে চাই। সংসারের এই সুকঠিন পথের বিশ্রামহীন পরিক্রমায় আমার পদযুগল ক্ষতবিক্ষত, আমার দেহ অবসন্ন, আমার মন নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমি দু দণ্ডের স্নেহ ও শান্তি চাই, হে ঈশ্বর!

স্নেহ! সংসারের এমন অগ্নিপরীক্ষার পরেও আমার স্নেহতৃষ্ণা মিটলো না, আমি এখনও মানুষের ভালবাসা প্রত্যাশা করি!

আমার চোখের সামনে এই মুহূর্তে মিসেস পপি বিশোয়াসের ছবি ভেসে উঠছে। কে তুমি? কেন এইভাবে দু দিনের জন্যে এখানে এসে এমনভাবে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় নিজের স্থান সংগ্রহ করে নিলে? আমার হাতে পপিদির পাঠানো ফ্ল্যাটের চাবি। আমার টেবিলে ছোট্ট ছিমছাম সেই ছোট্ট চামড়ার সুটকেস যা আমি একটু আগেই কিরণ খোসলার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করে এনেছি।

কিরণ খোসলার ঘরে পপি বিশোয়াসের আর কোনো স্মৃতিচিহ্ন ছিল না। কেমন সহজে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়ান পপি বিশোয়াসরা। ঐ সুটকেসটুকু ছাড়া আর কোথাও পপি বিশোয়াসের জীবনযাপনের কোনো চিহ্ন নেই। অথচ আমার এই ছোট্ট ঘরটুকু আমি অসংখ্য স্মৃতিচিহ্নে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছি।

পপি বিশোয়াসের শেষ চিঠির শেষ লাইনগুলো আমি আবার পড়লাম। যাবার আগে এইভাবে নিবিড় আত্মীয়তাপাশে জড়িয়ে ফেলবার কী প্রয়োজন ছিল পপি বিশোয়াসের? আর আমি তো সংসারের বিচিত্র পথে উদাসী সৃষ্টিকর্তার আপন খেয়ালে ভেসে চলেছি, আমার তো নিজের সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ নেই, তবু মিসেস বিশোয়াস কেন এইভাবে আমার কথা ভেবে আগাম উপহার পাঠিয়ে গেলেন?

মিসেস বিশোয়াস, আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আপনার মাধ্যমে নতুন এক বিশ্বের অভিজ্ঞতা আমি হৃদয়ের গভীরে সঞ্চয় করেছি। কিন্তু আপনার ঠিকানা জানা থাকলে, আপনার ওই ছোট সুটকেসটুকু আমি গ্রহণের অক্ষমতা জানিয়ে ফেরত পাঠাতাম। এই মুহূর্তে কোথায় আপনি, মিসেস বিশোয়াস? যেখানেই থাকুন, আপনি সুখী হোন, অনেক পরাজয়ের

পর অবশেষে আপনি বিজয়িনী হোন এই প্রার্থনা করি। আপনাকে যেন কোনোদিন এই থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরতে না হয়।

কিন্তু ছোট্ট এই সুটকেসটা নিয়ে আমি কী করি? এটা কী আমার সম্পত্তি? না, আমি কেবল, মিসেস বিশ্বোয়াসের ইচ্ছা অনুযায়ী এর রক্ষণাবেক্ষণ করছি? এই সুটকেসের ওপর কার অধিকার?

আইন ও স্নেহের জটিল জট ছাড়ানোর মানসিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে মন্দ লাগছে না। কোন্ কর্ম ফলে কাসুন্দের ছোট্ট গলি থেকে বেরিয়ে জীবনের এই বিচিত্র রাজপথে এসে দাঁড়ালাম, ভাবতে এক অদ্ভুত অবসাদে দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে। কোনো অবাস্তব সুখস্বপ্নের সুকোমল প্রশ্রয়ে নিজের ক্লান্ত দেহখানা সমর্পন করবার এক দুরন্ত ইচ্ছা আমাকে দূর থেকে হাতছানি দিচ্ছে।

তাকে আমি ভুলে থাকবার চেষ্টা করছিলাম। মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবার জন্যে বার বার উদ্যোগী হয়েও ব্যর্থ হয়েছি। তার নাম সীমা। এই ক'দিন কয়েকবার মনের কোণে উঁকি মেরে সে উধাও হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজ আবার অন্য কারণে তার নাম মনে পড়ে গেলো। অনেকদিন পরে মদনা এসেছিল আমার সংগে দেখা করতে। পাগলা সাহেবের সংস্পর্শে এসে মদনা এরই মধ্যে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে। কে বলবে, কয়েক সপ্তাহ আগে এই মদনাই চুরি জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছুই জানতো না। মদনার মুখে শান্তশ্রী ছড়িয়ে পড়েছে। মদনা বললো, "আপনাদের আশীর্বাদে খুব ভাল আছি স্যর। আমার কোনো চিন্তা নেই। ভোরবেলায় উঠে পাগলা সায়েবকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করি। এক-একদিন এক এক রান্না। কোনোদিন ইংলিশ, কোনোদিন মোগলাই, কোনোদিন ম্যাড্রাসি, আবার কোনোদিন স্রেফ বাঙালীখানা। আজ হয়েছিল রাইস, ফ্রায়েড ব্রিনজল, লেনটিল সুপ আর গার্ডেন হচপচ। বুঝলেন কিছু?"

আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লামঃ "ভাত, বেগুনভাজা, ডাল এবং চচ্চড়ি।"

"উঃ, আপনার যা মাথা। ঠিক ধরেছেন", তারিফ করলো মদনা। তারপর বললো, "পাগলা সায়েব যে কী সুন্দর রাঁধেন আপনাকে কী বলবো! আমিও কড়া নজর রেখে সব শিখে নিচ্ছি।"

"কোন দিন দেখবো তুই হয়ত ম্যাডানস গ্রীল খুলে বসেছিস", আমি রসিকতা করি।

"না স্যর, আমি পাগলা সায়েবকে ছাড়বো না", মদনা আমাকে জানিয়ে দিলো। "লোককে ফ্রি খাইয়ে যা আরাম সে-আরাম কোথাও পাওয়া যায় না। আমি তো নিজে এক দিকে খাবার ডিসট্রিবিউশনে বেরোই, কত লোকের সঙ্গে যে দেখা হয়ে যায়, আপনাক কী বলবো। এক একজন মুখ শুকিয়ে আমার জন্যে বসে থাকে, আমি একটু দেরি করলে তাদের খাওয়াতেও দেরি হয়ে যায়। ঝড় জল বৃষ্টি যাই হোক, আমাকে তাই বেরোতেই হয়, স্যর।"

মদনা বললো, "আমার খুব দুঃখু হয়, স্যর। এতোদিন আমি বড্ড দুষ্টু ছিলাম। পাগলা সায়েবকে বললে বিশ্বাসই করেন না, শুধু হাসেন। সায়েব বলেন, 'মানুষ কখনও খারাপ হয় না, প্রত্যেক মানুষের ওপরেই তো ভগবানের ভালবাসা আছে।"

মদনা সায়েবের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। "কী মুশকিল বলুন তো

স্যর! সায়েব তো আগেকার মদনাকে বা থ্যাকারে ম্যানসনের মিসেস চাওলাকে দেখেননি। দেখলে নিশ্চয় একথা বলতেন না।"

"হয়তো বলতেন, মদনা। এই সব মানুষদের কথাবার্তা বোঝা ভার—এদের চোখে ভগবান অন্য দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন।"

মদনা বললো, "খাবার ডিসট্রিবিউশন করতে গিয়ে কত রকমের যে মানুষ দেখি। আমার খুব ভাল লাগে। কেউ কেউ খাবার নিয়ে টানাটানি করছে, আবার কেউ কেউ বলছে, এ সপ্তাহে আমার কিছু টাকা এসেছে তোমরা অন্য কাউকে খাবার দিয়ে এসো। পাশের বাড়িতেই মিসেস পিনটো রয়েছেন, আমার থেকেও অভাবী, ওঁকে তোমরা দ্যাখো।"

মদনার কথাবার্তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে। আমাদের এই পাপ-পুরীর গণ্ডি পেরিয়ে মদনা নতুন এক আনন্দময় জগতের সন্ধান পেয়েছে। মদনা সত্যিই ভাগ্যবান।

আমাদের কথার মধ্যেই বিনা নোটিসে মিস্টার ভরত সিং ঢুকে পড়লেন। মিস্টার সিং প্রথমে আপিস ঘরে আমার খোঁজ করেছিলেন। সেখানে আমার দেখা না-পেয়ে সোজা উঠে এসেছেন ওপরে। "হ্যালো মিস্টার শংকর, এইভাবে লুকিয়ে থাকা চলবে না। খবর পেয়েই আমি ছুটে এসেছি।"

মদনা অভিজ্ঞ, কোনো কথা না বলে ঘরের বাইরে যে টুল ছিল সেখানে বসে পড়লো।

মিস্টার ভরত সিং তাঁর ডান হাতখানি করমর্দনের জন্য এগিয়ে দিয়ে বললেন, "কংগ্রাচুলেশন, মিস্টার শংকর।"

অভিনন্দনের কারণ জানবার আগেই ডান হাতটা মিস্টার ভরত সিং-এর দিকে এগিয়ে দিতে হলো। হাতখানা ফিরে পাবার পর মিস্টার সিং বললেন, "কোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানেই সুখবরটা পেলাম। একটু আগেই মামলার রায় বেরিয়েছে। মিসেস শকুন্তলা চাওলার একটা কথাও শোনেন নি জজ—বাড়ি থেকে তাকে উচ্ছেদের হুকুম দিয়েছেন।"

সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু ভরত সিংজী মনে হলো আমার থেকেও উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, "হিসট্রিতে কোনো বাড়িওয়ালার এতো বড় ভিকটরি হয়নি।"

সুসংবাদটা এখনই চন্দ্রোদয় ভবনে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে আমার কিছু কর্তব্য আছে। মিস্টার ভরত সিংকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। বললাম, "মিস্টার সিং, এই মামলায় আপনি যে সাহায্য করেছেন তা আমি কোনোদিন ভুলবো না।"

ভরত সিং হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

আমি বললাম, "মিস্টার সিং, জানি আপনি টপ হোটেলের দার্জিলিং চা-এ অভ্যস্ত। কিন্তু আজ আপনাকে ছাড়ছি না। আমাদের থ্যাকারে ম্যানসনের চা একটু টেস্ট করতেই হবে।"

"স্যামপেনের বদলে চা!" রসিকতা করলেন মিস্টার ভরত সিং। "অল রাইট। আপনি যা খুশী অফার করুন, আমি আপত্তি করবো না।"

শ্রীমান মদনা বাইরে বসে আমাদের সব কথা শুনছে তার প্রমাণ পেলাম। তড়াং করে উঠে সে বললো, "চায়ের দোকানে বলে আসবো, স্যর?"

"তোমার জন্যেও অর্ডার দিও, মদনা। তিনটে ডবল হাফ, নয়া পাত্তি, গরম জলে ডবল ধোলাই।"

ওসব স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন মদনার মুখস্ত—তাকে আবার মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চায়ের গেলাস সমেত মদনা ফিরে এলো। মিস্টার ভরত সিং বিলিতি কায়দায় গেলাসে গেলাসে ঠুকেই বললেন, "চিয়ার্স।"

আমি বললাম, "আজই আমি মামলার রায়ের কপি নেবার ব্যবস্থা করছি।"

"তারপর ঝটপট ফ্ল্যাটগুলো দখল নিয়ে নিন, মিস্টার শংকর", পরামর্শ দিলেন মিস্টার ভরত সিং।

আমি আবার ধন্যবাদ জানালাম মিস্টার সিংকে। "আপনার পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া এই অসম্ভব সম্ভব হতো না, মিস্টার সিং।"

মিস্টার সিং হাসলেন। তারপর হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে নিলেন। "আমার এখন সময় খারাপ যাচ্ছে। হয়তো আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"

কোনো রকম দ্বিধা না করে মিস্টার সিং বললেন, "মিসেস পপি বিশোয়াসকে আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম আমার হোটেলে জয়েন করতে। মিস্টার জেঠমালানির খপ্পরে পড়ে উনি আমাকে রিফিউজ করলেন। তারপর মিসেস চাওলার সিলভার ড্রাগনের কয়েকটি আনএমপ্লয়েড মেয়েকে চান্স দিলাম। কিন্তু কী বলবো আপনাকে—একেবারে গুড ফর নাথিং। নো ওয়ান্ডার সিলভার ড্রাগনের রেপুটেশন এতো নিচু ছিল।"

গম্ভীর হয়ে উঠলেন মিস্টার ভরত সিং। ইতিমধ্যে আমার কান গরম হয়ে উঠেছে। মিস্টার সিং এবার বললেন, "আমি শুনেছিলুম, মিসেস বিশোয়াসের ওপর আপনার খুব হোল্ড ছিল, কিন্তু আমার হয়ে আপনি তেমন করে বললেন না!"

আমার নাক কান জ্বলতে শুরু করেছে। মিস্টার ভরত সিং-এর মুখের ভাব আবার পাল্টে গেলো। "মিস্টার শংকর, এবার কিন্তু আমাকে না বলবেন না। সুলেখা সেনের সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতেই হবে।" একটু থামলেন মিস্টার সিং। বললেন, "দেখবেন! যেন জিজ্ঞেস করে বসবেন না, হু ইজ সুলেখা সেন?"

চায়ের কাপ শেষ করে মিস্টার ভরত সিং উঠে পড়লেন। "সুলেখা এখন কোথায় থাকে?"

আমি বললাম, সুলেখার কোনো খবর আমি রাখি না। তার ঠিকানা অবশ্যই আমার জানা নেই। এই বিরাট শহরের জনারণ্যে সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু মিস্টার ভরত সিং আমার কথার ওপর তেমন গুরুত্ব দিলেন না। বললেন "প্লিজ, সুলেখার ঠিকানাটা জোগাড় করে দিন আমার খুব উপকার হবে।"

"খুব সম্ভবত সুলেখা এ শহরেই নেই, মিস্টার সিং", আমি কাতরভাবে বললাম। মিস্টার সিং যে সুলেখার খবরাখবর নিচ্ছেন এটাই আমার ভাল লাগছে না।

ভরত সিং দরজা পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন, "সুলেখা কোথাও যায়নি, মিস্টার শংকর। সে এখানেই আছে। ক'দিন আগেই এসপ্ল্যানেডের বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি। আমার সঙ্গে গাড়িতে তখন মিস্টার নাগরচাঁদ ছিলেন, তাই গাড়ি থামিয়ে খোঁজখবর করতে

পারলাম না কিন্তু সেই থেকেকেই সুলেখার কথা মনে হচ্ছে আমার—তারপর খেয়াল হলো, সুলেখার সঙ্গে যোগাযোগের আপনিই বেস্ট পার্সন।”

ভরত সিং চলে গেলেন। আমার হঠাৎ মনে হলো, খুব ভাল হয়েছে। অল্পের জন্যে সুলেখা বেঁচে গিয়ছে। ভাগ্যে ওর সঙ্গে সেদিন মিস্টার ভরত সিং-এর ওর যোগাযোগ হয়নি।

সুলেখা। সীমা। তোমার কথা তো আমি প্রায় ভুলে গিয়ে বেশ ছিলাম। সীমা, তুমি কি সত্যিই এখনও কলকাতায় আছো? না, মিস্টার ভরত সিং তোমারই মতো আর কাউকে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে?

“স্যর।” মদনার গলা। মদনা বোধ হয় কয়েকবার নিচু গলায় আমাকে ডেকেছে। আমার খেয়াল হয়নি।

আমি মুখ তুলে মদনার দিকে তাকালাম। “তুমি এবার যেতে পাও, মদনা?”

মদনা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, “আপনি কী সুলেখা দিদি-মণির খোঁজ করছেন? যে-দিদিমণি ওই ফ্ল্যাটে থাকতো?”

মদনার মুখখানা মুহূর্তের জন্যে রহস্যময় হয়ে উঠলো।

সুলেখা দিদিমণি ছাড়া এই মুহূর্তে আমি আর কার খোঁজ করতে পারি? মদনা, তোমার আন্দাজে মোটেই ভুল হয় নি। থ্যাকারে ম্যানসনে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ দেখা দিয়ে সেই যে অদৃশ্য হয়ে গেলো আর দেখা নেই।

একবার ভাবলাম সুলেখা সম্বন্ধে কোনো আগ্রহই দেখাবো না। অভিজ্ঞ তেলকালিবাবু বহুদিন আগেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বলে-ছিলেন, “সার যতটুকু প্রাপ্য দেবেন, যেখানে যতটুকু কর্তব্য করবেন, কিন্তু ওই পর্যন্ত—কখনও জড়িয়ে পড়বেন না, স্যর।”

তেলকালিবাবুর কথাগুলো কানে ঢোকা মাত্রই আমি মুখ তুলে ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। ব্যাপারটা বুঝতে তেলকালিবাবুর একটুও দেরি হয় নি। বলেছিলেন, “মনে ধরছে না বুঝতে পারছি। কিন্তু সারা জীবন এই থ্যাকারে ম্যানসনে কাটিয়ে যা শিক্ষা পেয়েছি তা হলো, সত্যি কথা সব সময় সত্যি মনে হয় না, তাকে মেনে নিতেও মন চায় না।”

আমাকে বিশেষভাবে সাবধান করে দেবার জন্যেই যেন তেলকালিবাবু সেদিন মুখ খুলেছিলেন। তেলকালিবাবু বলেছিলেন, “এই কর্মস্থল বড় বিপজ্জনক জায়গা স্যর। এক এক সময় এমন মোহিনী মায়ায় ঢেকে থাকে যে মনে হয় এটাই বুঝি আমাদের জগৎসংসার—এখানেই যেন জন্ম হয়েছিল আমাদের আর এখানেই যেন মরণ হবে। আসল সত্যটা ভুলে কেউ-কেউ কর্মক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে। আর জড়িয়ে পড়লেই দুঃখ বিনা সুখ নেই, স্যর।”

তেলকালিবাবুর কথাগুলো আমি যে ইতিমধ্যে বেমালুম হজম করে ফেলেছি এমন নয়; কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর সাবধানবাণী আমার অশান্ত মনকে সংযত রাখতে পারছে না। আমি চোখের সামনে সীমার শান্ত ছবিটা

দেখতে পাচ্ছি, তার সব খবর জানবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

মনের মধ্যেও আর এক সাবধানী মন আছে। সেই মন আমাকে তেলকালি-বাবুর অমূল্য উপদেশ আবার স্মরণ করিয়ে দিল। বললো, " ধীরে বন্ধু,

আমি নিজের পক্ষে সওয়াল করলাম, "থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজার হিসেবেই তো আমি সীমার খোঁজ করছি।"

ভিতরের আমি এই উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হলো না। "যে যতক্ষণ এই ম্যানসন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আছে ততক্ষণ তার সম্বন্ধে তুমি অবশ্যই আগ্রহী থাকতে পারো ; কিন্তু এই চার দেওয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে যারা দূরে সরে গিয়েছে তাদের সম্বন্ধে চিন্তা তোমার এক্তিয়ারের বাইরে।"

ভিতরের আমির বক্তব্যে হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সীমার শেষ সংবাদের জন্যে আমার অবুঝ মন ছটফট করছে। নতুন খবরের জন্য আমি অধীর আগ্রহে মদনার মুখের দিকে তাকালাম।

আমার মনের মধ্যে যে এমন আলোড়ন চলেছে তা শ্রীমান মদনা বুঝতেই পারলো না। সে সরল মনে বললো, "সুলেখাদির খবর দরকার নাকি স্যর? আমাকে তো বলেনি।"

এসব কথা কাকেই বা বলা যায়! মদনার সঙ্গে সুলেখা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে সুফল লাভ হতে পারে তা আমি এর আগে ভাবতে পারি নি। মদনা এখনও আমার সঙ্গে কতটুকু আলোচনা করবে বোধ হয় বুঝতে পারছে না। আরও একটু সময় নেবার জন্যে সে তাই বোকার মতো জিজ্ঞেস করলো, "যে-দিদিমণি ওই চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতেন তাঁর খবর তো?"

আমি যে চৌত্রিশ নম্বরের সেই দিদিমণির খবরই খুঁজছি তা আবার মদনাকে বোঝাতে হলো।

মদনা এবার বললো, "আমি তাঁকে দেখেছি, স্যর।"

সীমাকে দেখেছে মদনা—সীমা তা হলে কলকাতার এই জনারণ্যে চির-দিনের মতো হারিয়ে যায় নি।

মদনার মুখের দিকে আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি। মদনার দ্বিধা আমার সহ্য হচ্ছে না।

"মদনা, কোথায় দেখলে সীমাকে?"

"সীমা? তিনি আবার কে? আমি তো সুলেখা দিদিমণির কথা বলছি—মিসেস সেন, যিনি চৌত্রিশ নম্বরে থাকতেন।" মদনা বেশ গোল-মালে পড়ে গেলো।

"হ্যাঁ মদনা, আমি সুলেখা দিদিমণির কথাই বলছি", ভুলটা আমাকেই সংশোধন করে নিতে হলো।

মদনা এবার মাথা চুলকোতে লাগলো। সুলেখার ব্যাপারটা সে বোধ হয় ঠিক স্মরণ করতে পারছে না। "সুলেখা দিদিমণি, কোথায় যে দেখলাম?" মদনা আরও জোরে মাথা চুলকোচ্ছে।

আমার ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে পড়ছে। মদনা এবার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে শুনিয়ে দিল, "আজকাল কত জায়গায় যে যাই—কত লোকের সঙ্গে যে দেখা হয়, কিছুই ঠিক থাকে না।"

মদনা আরও ব্যাখ্যা করলো, "আমার জুতোয় যদি মিটার থাকতো তা হলে বোধ হয় সায়েব পাড়ার সমস্ত গলির নাম সেখানে ছাপা হয়ে থাকতো।"

মদনার এইসব হেঁয়ালি বক্তব্যে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, মদনা, কোথায় তোমার সঙ্গে সীমার দেখা হলো? এই দেখাও কি চলমান কলকাতার কোনো বাস স্ট্যাণ্ডে? তা হলে তো কোনো লাভ হবে না। সীমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হতে পারে কোথায়?

মদনা এখনও ভ্রু কুঁচকে ভাবছে। আমার কাছে সে আবেদন করলো, "দু' মিনিট সময় দিন, স্যর—এখনই মনে পড়ে যাবে। মদনার ব্রেনে একবার যা ঢোকে তা পালাতে পারে না, বেরিয়ে আসতে বাধ্য। আমি স্যর সি আই ডি লাইনে গেলেও খুব উন্নতি করতে পারতাম।"

নিজের সম্বন্ধে মদনার যে কখন কী মনে হয়! একবার বলেছিল, সিনেমা লাইনে গেলে সে মস্ত হিরো হতে পারতো। এখন আবার সি আই ডি সাজবার স্বপ্ন!

মদনা আসলে সুইপার লাইনের কাজ ছাড়া সব চাকরিতেই আগ্রহী। কোনো দায়িত্বই ঘাড়ে নিতে সে ভয় পায় না।

মদনার মাথা চুলকানো হঠাৎ থেমে গেলো। "পেয়েছি স্যর", উৎফুল্ল মদনা এবার একটু জোরেই চিৎকার করে উঠলো।

মদনা বললো, "তাই বলি, হাতের জিনিস কোথায় যাবে! আমার স্যর একটা মাত্র মুশকিল, কাকে জেগে দেখেছি আর কাকে ঘুমিয়ে দেখেছি তা মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়।"

কী বলছে মদনা? আবার কোনো গোলমাল পাকিয়ে না বসে মদনা।

একগাল হেসে মদনা বললো, "আমি যে স্যর রোজ রাত্রে স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্নের মধ্যে অনেক লোক আমার সঙ্গে কথা বলে যায়। এই তো সেদিন আপনার সঙ্গেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত কথা হল। আমি দেখলাম, আপনি থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে দিয়ে মস্ত অফিসার হয়েছেন। আপনার সামনে বেয়ারা পিছনে বেয়ারা।"

মদনার অপ্রাসঙ্গিক কথা বন্ধ করবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। সে প্রবল উৎসাহে বলে চললো, "সুলেখা দিদিমণিকেও একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম স্যর। রাজরানী হয়ে গিয়েছেন। টকটকে লাল 'সিল্কের' শাড়ি পরে ফরেন গাড়ির মধ্যে বসে আছেন। সামনে টুপি এবং ড্রেস-পরা ড্রাইভার। সুলেখা দিদিমণি গাড়ি থামিয়ে আমাকে রাস্তা থেকে ডাকলেন। কত কথা হলো। সুলেখা দিদিমণির দুই হাত ভর্তি সোনার চুড়ি। দিদিমণি যেন আরও ফর্সা হয়েছেন।—রঙ ফেটে পড়ছে। গা থেকে ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ ছাড়ছে।"

"তারপর?" আমি কখন গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছি এবং বোকার মতো পরের ঘটনা জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি।

মদনা উত্তর দিলো, "তারপর সব বাজে, স্যর। আপনার সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন কিনা খেয়াল হচ্ছে না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। কোথায় সুলেখা দিদিমণি। আমি পাগলা সায়েবের বাড়িতে সিঁড়ির তলায় ঘুমোচ্ছি—গোটা কয়েক হারামজাদা মশা রক্তের লোভে সায়েব পাড়ায় পড়েছে, আর কাউকে না পেয়ে আমার ওপরেই ফিস্টি করছে।"

মদনা বললো, "আমি ভাবলুম, ভোরবেলার স্বপ্ন—এ তো মিথ্যে হবে না। হয়তো সুলেখা দিদিমণি সত্যিই কোথাও রাজরানী হয়েছেন।"

"কিন্তু স্যর", মদনা আবার আরম্ভ করলো। "ভোরবেলার এই স্বপ্ন-

টপ্প সব 'ভোকাস'। সুলেখা দিদিমণির সংগে যখন দেখা হলো তখনই বুঝলাম।"

মদনা আমাকে কম-আঁচে এই ভাবে দগ্ধে মেরো না। সুলেখার সব খবর জানবার জন্যে আমি ছটফট করছি।

মদনা আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, "সেদিন ফ্রি লাঞ্চ নিয়ে আমি মিস ওয়াইপারের ফ্ল্যাটে ঢুকছি, ঠিক সেই সময় সিঁড়ির মুখে কার সংগে দেখা হলো জানেন, সুলেখা দিদিমণির।"

"সুলেখা দিদিমণি আপনি? এখানে?" মদনা সেদিন চিৎকার করে উঠেছিল।

সুলেখাও পুরনো লোক দেখে চিৎকার করে উঠেছিল, "মদনা? তুই এখানে?"

"আমি দিদি, লাইন চেঞ্জ করেছি। এখন আমি গেরস্ত লাইনে চলে এসেছি, এখন আমি পাগলা সায়েবের পেসাদ বিতরণ করে বেড়াই।"

মদনা আমাকে বললো, "বুঝলাম দিদিমণি ওখানেই থাকেন। কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম আপনি এখন কী করেন, তখন দিদিমণি কোনো উত্তরই দিলেন না। মুখটা ফিরিয়ে নিলেন, যেন আমার কথাটা কানেই ঢোকেনি।"

এই মিস ওয়াইপারই বা কে? সীমা নিজেও বা ওখানে কী করছে? এসব প্রশ্নের উত্তর মদনার কাছ থেকে জানতে চাওয়ার চেষ্টা করে বোধ হয় নিজেই বললো, "মিস ওয়াইপারের সাতকুলে কেউ নেই। আমার জন্যে লাভ নেই। কিন্তু মদনা আমার কাজে লাগবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। সে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকেন। বলেন, থ্যাংক ইউ। তারপর প্যাকেট নিয়ে নড়বড় করতে করতে নিজের ঘরে ঢুকে যান।"

মদনা বললো, "এখন নড়বড় করছেন, কিন্তু পাগলা সায়েবের কাছে শুনেছি এক সময় মিস ওয়াইপার খুব জাঁদরেল মেমসায়েব ছিলেন। কোন্ এক আপিসে সেক্রেটারির কাজ করতেন। সেখানের বেয়ারাগুলো মেম-সায়েবকে দেখলেই থরথর কাঁপতো, আর এখন মিস-ওয়াইপার নিজে কাউকে না-দেখেই সবসময় কাঁপছেন!

মিস ওয়াইপারের ইতিবৃত্তটা মদনা মনের মধ্যে একবার রিহার্শল দিয়ে নিলো। তারপর বললো, "ওয়াইপার মেমসায়েবের এ-রকম হবার কথা নয়। আপিস থেকে রিটায়ার করবার সময় অনেক টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক টাকা, স্যর কিছু কিছু লোকের একদম সহ্য হয় না। এমনি বেশ আছে, খেটে খাচ্ছে, কোনো হাঙ্গামা নেই। কিন্তু যেমনি টাকা এলো অমনি হাঙ্গামা শুরু হলো। টাকা আবার উবে যাবে তবে হাঙ্গামার শেষ হবে।"

মদনা বললো, "মিস ওয়াইপারের ঘটনাটা দেখুন না। যেমনি রিটায়ারের টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন অমনি নিজের ভাইপোটা বিগড়ে গেলো। কত আশা করে ভাইপোটাকে কাছে রেখেছিলেন, নিজের খরচে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিলন, কিন্তু সেই ভাইপোই টাকার গন্ধে মানুষখেকো বাঘের মতো হয়ে উঠলো। প্রথমে ব্যবসা করবো বলে পিসীর কাছ থেকে কিছু ক্যাশ আদায় করলো। সে-টাকা যে জলে গেলো তা তো বুঝতেই পারছেন।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মদনা বললো, "তারপরেও মেমসায়েবের কিছু ছিল। বুঝে-সুঝে

চললে একটা মানুষের চলে যেতো। কিন্তু ভাইপো, স্যর, ততক্ষণ অন্য মতলব ফেঁদেছে। বুড়ী একদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখলো হিসেব মিলছে না। ভাইপো পিসীর সই জাল করে মোটা টাকা তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।"

দুঃখের সঙ্গে মদনা বললো, "মেমসায়েবের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। মামলা মোকদ্দমা চলছে তো চলছেই। ভাইপোর কোনো পাত্তা নেই। আর মামলা যে কবে শেষ হবে ভগবান জানেন। আমাদের পাগলা সায়েব না-থাকলে খুব বিপদ হতো মেমসায়েবের।"

মদনা আমাকে মিস ওয়াইপারের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলো। "কোনো হাঙ্গামা নেই, স্যর। সুলেখা দিদিমণির সঙ্গে আপনার মিটিং করিয়ে দিতে আমার পাঁচ মিনিট লাগবে।"

কিন্তু কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমি সীমাসন্ধানে বেরোতে চাই না। সীমা আমার কাছে সেবার একলা এসেছিল, আমাকে একলা ফেলে রেখে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এবার আমিও একলা যেতে চাই তার কাছে।

মদনা আমার যন্ত্রণার কথা বুঝতে পারলো না। সে বললো, "বুঝেছি, আপনি অনেক কাজে জড়িয়ে আছেন এখানে। আপনার সময় নেই। কোনো চিন্তা নেই, স্যর, মদনা তো রয়েছে আপনার হুকুম তামিল করতে। আমি সুলেখা দিদিমণিকে খবর দিয়ে আসছি, বলে দিচ্ছি থ্যাকারে ম্যানসনে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। ওই ভরত সিংজীর কথাও বলবো নাকি দিদি-মণিকে? উনিও তো দিদিমণির জন্যে ছটফট করছেন।"

মদনাকে বললাম, তাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু মিস ওয়াইপারের ঠিকানা এবং ওই বাড়িতে পৌঁছবার পথনির্দেশ পেলেই আপাতত আমার প্রয়োজন মিটবে। একটা কাগজ টেনে নিলো মদনা। তারপর সন সন করে ঠিকানা লিখে ফেললো।

"সায়েবের কাছে গিয়ে তোর যে খুব উন্নতি হয়েছে, মদনা" আমি স্বীকার করতে বাধ্য হই।

"উপায় কী স্যর? আমার হাতের-লেখা দেখে পাগলা সায়েব বললেন, 'ভেরি ব্যাড হ্যান্ডরাইটিং।' আমি বললুম, "আমরা ছোটলোক, আমাদের হাতের লেখা ভাল হবে কী করে? লিখতে পারি এই যথেষ্ট।' কিন্তু পাগলা সায়েব ছাড়নেওয়ালা নন! কোনো কথা শুনলেন না। রোজ সকালে রান্না চাপিয়ে আমার হাতের-লেখা নিয়ে পড়েন। কাজকর্মের ফাঁকে একটু-আধটু বিড়ি টানবো সে সুখ উবে গিয়েছে। এখন আমাকে সময় পেলেই সায়েবের লেখার ওপর দাগা বোলাতে হয়।"

কপট বিরক্তির সঙ্গে মদনা বললো, "ক'মাস পরে আমার হাতের লেখা চিনতেই পারবেন না, স্যর। ঠিক মনে হবে কোনো ভদ্দরলোক লিখেছে।"

আগেকার সে মদনা যে নেই তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমার। পাগলা সায়েবের সান্নিধ্যে পরশমণির স্পর্শে মদনা ক্রমশ অন্য এক মদনায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

"তোর হলো কি মদনা?" আমি রসিকতা করি। "তুই যে সত্যি পাল্টে গেলি।"

মদনার চোখজোড়া সজল হয়ে উঠলো। বললো, "এখন দুঃখু হয়, স্যর। কত অন্যায় করেছি, কত সময় শুধু শুধু নষ্ট করেছি।"

"তোর দোষ কী মদনা? তোকে তো কেউ পথ দেখিয়ে দেয়নি। তোকে

নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিতে হয়েছে।”

মদনা চোখের জল মুছে বললো, “পথ যে একটা আছে তাই তো জানা ছিল না, স্যর।”

মদনার ব্যাপারটা আমার কাছে এক মধুর বিস্ময়ের মতো মনে হয়। হেসে বললাম, “মদনা, তুই গাড়ির ওয়াইপার চুরি করিস না, পকেট মারিস না, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করিস না, সন্ধ্যাবেলায় ফেনার কোম্পানির পাশে উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারের জন্মস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে বাবু ধরিস না তুই গাঁজা খাস না, তোর মুখে বিড়ি সিগারেট জ্বলে না তোর হলো কী? এতো ভাল হয়ে তুই করবি কী”

মদনার মুখে নির্মল হাসি ফুটে উঠলো। “কী যে করবো কিছুই জানি না, স্যর তবে বুকটা বড় হালকা মনে হয়। মনে হয় যেন বিরাট একটা পাথরের তলায় এতোদিন আমি চাপা পড়েছিলাম।”

মদনার চোখের জল এখনও বন্ধ হয়নি। মদনা বললো, “যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি তাই বলা হয়নি। বাবার কথা বড্ড মনে পড়ছে, স্যর। আমাকে ত্যজ্যপুত্তুর করেছেন, তবু শুধু ওঁর কথা মনে পড়ছে। বাবাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনে অনেক কষ্ট দিয়েছি, স্যর। আমি লিখলে উনি বিশ্বাস করবেন না। আপনি দেশের ঠিকানায় বাবাকে আমার কথা একটু লিখে দেবেন, বলবেন আমি ঝাঁটা ধরি না বটে, কিন্তু সে মদনা আর নেই, বাবা যেরকম চাইতেন মদনা সেই রকম হয়ে গিয়েছে।”

বাবার ঠিকানা লেখা একটা সাদা পোস্টকার্ড নিঃশব্দে আমার টেবিলে ফেলে রেখে মদনা নত মস্তকে দ্রুতবেগে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

থ্যাকারে ম্যানসনে আমার জীবন মহাভারতের বনবাস পর্ব তা হলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আমি মদনার মতো রত্নাকরকে চোখের সামনে পরিবর্তিত হতে দেখেছি। মদনার মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ বাবাকে চিঠি লিখতে-লিখতে আমার নিজের চোখই সজল হয়ে উঠলো।

চিঠিটা দ্রুত শেষ করে, ডাকবাক্সে ফেলবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েও আমার মনের চঞ্চলতা কমলো না। আমার অন্ধকার মনের পর্দায় একটি মুখ এবার সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। ছবিটা বড় হতে হতে ক্রমশ যেন আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। ওই মুখ, ওই চাহনি, ওই রহস্য এক-জনেরই। সীমা, তুমি কি এখন সীমা? না সুলেখা? বলো, বলো ওইভাবে আমার দিকে নির্বাক ছবির মতো তাকিয়ে থেকো না।

ফাল্গুনের এক ম্লান অপরাহ্নে অশান্ত আমি নিজেকে আর স্তব্ধ রাখতে পারলাম না। থ্যাকারে ম্যানসনের ওপরতলায় আমার ঘরে কুইন ভিক্টোরিয়া আমলের ‘চাম’ তালা ঝুলিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম এক অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে।

থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বেরিয়ে আসবো বললেই বেরনো যায় না।

নান সমস্যা আমাকে আটকে রাখবার জন্যেই যেন হঠাৎ মাথা গজিয়ে ওঠে।

বেয়ারা জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় চললেন স্যর?"

সরল মনেই সে প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু কী বলবো আমি? এর যথার্থ উত্তর কী আমার জানা আছে? অনেকদিন পরে এক অস্পষ্ট স্মৃতি অকস্মাৎ রঙিন চলচ্চিত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমি অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি।

"আমি বেরোচ্ছি, শ্রীধর। আমারও বেরুতে ইচ্ছে করে", আমার কণ্ঠস্বরে বোধ হয় একটু চাঞ্চল্য ফুটে উঠলো।

শ্রীধর আমার সঙ্গে একমত। সে হঠাৎ বলে বসলো, 'তা তো বটেই। আপনার কেন আপনজন থাকবে না?"

আপনজন! শব্দটা যেন কোনো অদৃশ্য দেওয়ালে মাথা ঠুকে আবার আমার কানে বিচিত্র ভঙ্গীতে ফিরে এল—আপনজন, আপনজন, আপনজন।

"কে তোমার আপনজন? আপনজনের সন্ধানে কোথায় চলেছো তুমি?" এক অপ্রিয় আমি গম্ভীর-মুখে আমার কানের কাছে জেরা শুরু করেছে। নিজের কাছেও নিজের উত্তর দিতে এক-এক সময় দ্বিধা আসে, অনিচ্ছুক আমি এই মুহূর্তে সবাইকে এড়িয়ে চলতে চাই।

শ্রীধর ঘোষণা করলো, "তেলকালিবাবু আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে বললেন, সায়েব যখন আপিসঘরে নেই তখন নিশ্চয় নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন।"

এই সময় আবার কেন বাধা? আমি নিঃশব্দে কারও নজরে না-পড়ে থ্যাকারে ম্যানসনের প্রাইভেট রাস্তা দিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের জনস্রোতে মিশে যেতে চাই।

পালানো অত সহজ হলো না। শ্রীধরকে কিছু না-বলে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু বিকল লিফটের সামনে ফয়ারের কাছে তেলকালিবাবুর কাছে ধরা পড়ে গেলাম।

"ঠিক বলেছি, বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছেন। উনি আর কোথায় যাবেন!" তেলকালিবাবু আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আমি মুখে অমায়িক হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি।

তেলকালিবাবু বললেন, "যত সব বাজে কথা! ওরা আমাকে বললো, ম্যানেজারবাবু বেরিয়ে গিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করিনি। মুখের ওপর বলে দিয়েছি, হতেই পারে না। আপনার তো পিছুটান নেই, আমি জানি। টান থাকলেই মন বসে না, বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণটা ছটফট করে।"

তেলকালিবাবু কি আমার মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন না আকস্মিক-ভাবেই কোনো কিছু না-জেনেই এই ধরনের কথা বলছেন?

"কিছু ভাববেন না, স্যর।" তেলকালিবাবু পরিস্থিতি হাল্কা করতে সচেষ্ট হলেন। "ব্যাপারটা ঠিক টু প্লাস টু অঙ্কের মতো। আমার ওয়াইফ সেবার যখন আমার ওপর রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে গেলো, তখন আমার ওই ছুক-ছুকে রোগ ধরেছিল। কাছেই তো আমার শ্বশুরবাড়ি, শিয়ালদার কাছে ফরডাইস লেনে। এখান থেকে যেতে পনেরো মিনিট লাগে। কিন্তু মনে হতো বউ যেন আমাকে ছেড়ে কোন্ তেপান্তরের দেশে চলে গিয়েছে, তাকে খুঁজতে আমার অনেক সময় লেগে যাবে।"

আমার গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়েছে। তেলকালিবাবুকে পাশ কাটিয়ে

আমি বেরিয়ে যেতে পারছি না। স্মৃতিভারে বিষণ্ণ তেলকালিবাবুর অনুজ্জ্বল মুখের দিকে আমি একভাবে তাকিয়ে আছি।

তেলকালিবাবু বললেন, "তখন আমি ডিউটিতে মন বসাতে পারতাম না। কাজকর্ম কোনোরকমে ম্যানেজ করে এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে পালাবার জন্যে শরীরটা চনমন করতো। মায়ার বাঁধন বড় কঠিন বাঁধন, স্যর। বিকেল হলেই ছুটতাম ফরডাইস লেনে মানভঞ্জনের পালা অভিনয় করতে।

তেলকালিবাবু এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "যে লোক কখন বেলা পড়বে বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছটফট করতো সেই লোক কেমন হয়ে গিয়েছে দেখুন, স্যর। একবার বাইরে যাবার কথা মনেই পড়ে না। এই থ্যাকারে ম্যানসনের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে তা ভুলেই গিয়েছি, স্যর। স্বাস্থ্যের ভয়ে সকালবেলায় একটু বেরোতাম, তাও বন্ধ করে দিয়েছি। মরবার পরে আমার বউকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সময়েও বোধ হয় আমার কষ্ট হবে।"

তেলকালিবাবু এবার হুঙ্কার ছাড়লেন, "আমার কথা ছেড়ে দিন স্যর, আমি তো দুনিয়ার বার। আমার জন্যে যারা ভাবতে পারতো আমি তো তাদের মাথা চিবিয়ে খেয়ে বসে আছি। আমি এখন অন্য ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছি।"

"কীসের ফ্যাসাদ?" অহেতুক গোলমালে জড়িয়ে পড়বার পাত্র তো তেলকালিবাবু নন।

তেলকালিবাবু বললেন, "মানময়ী গার্লস ইস্কুল বলে এক বায়োস্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম মিসেস তেলকালির সঙ্গে। তাতে একটা গান বড্ড মনে ধরেছিল—ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা। আমি স্যর সত্যিই ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা অথচ আমিই কিনা শুধু শুধু জড়িয়ে পড়ছি!"

"কী ব্যাপার, তেলকালিবাবু?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"আর কী ব্যাপার! ঐ হতভাগা কলকালি," উত্তর দিলেন তেলকালি।

কয়েকদিন আগে কলকালির নামে দেশ থেকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসেছিল: "মাদার সিরিয়াস। কাম আর্জেন্ট।" সেই টেলিগ্রাম দেখে আমি তৎক্ষণাৎ কলকালির ছুটি মঞ্জুর করেছি।

"কী ভুল যে আপনি করেছেন, স্যর। আমি হলে কিছুতেই ছুটি স্যাংশন করতাম না।" তেলকালিবাবু এবার আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন।

"যে লোক কখনও ছুটি চায় না—আর বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, তাকে ছুটি দেবো না কখনও হয়?" আমি এবার তর্ক করি তেলকালিবাবুর সঙ্গে।

"আপনাকে কত সাবধান করবো স্যর। এটর্নি পাড়ায় কাজ করেছেন, অথচ টেলিগ্রামটা কোন্ আপিস থেকে এসেছে দেখলেন না! আজকে সকালে আমার কাছে রহস্যটা ভেদ হলো। যা ভেবেছি তাই। মাদার সিরিয়াস হলেন ওড়িষ্যার কোরাপুট ডিসট্রিক্টে, আর টেলিগ্রাম বুকিং হলো কলকাতায় কালীঘাট পোস্টাপিসে!"

আমি ডিটেকটিভের নজর দিয়ে কলকালির পাওয়া টেলিগ্রামখানা যাচাই করে দেখিনি। সরল মনে কাগজখানা টেবিলের ওপর রেখে কলকালিকে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছি।

তেলকালি বললেন, "আপনি যখন ব্যাপারটা আমাকে বললেন তখনই আমার সন্দেহ হচ্ছিল। ব্যাটা কলকালির মা তো অনেকদিন গত হয়েছেন, কলকালির বয়স তখন সাত বছর। মাদার থাকলে তবে তো 'সিরিয়াস' হবেন—মাথা থাকলে তবে তো মাথাব্যথা! আমি তখন জোর করে বলতে পারলুম না, কবে যেন কলকালির মুখেই ওর ছোটবেলার কথা শুনেছিলাম। আপনার আপিসে গিয়ে টেবিলে রাখা টেলিগ্রামটা দেখেই আমার সন্দেহ পাকা হলো।"

কলকালি সেই চারদিনের জন্যে দেশে গিয়েছে, আর দেখা নেই। ইতি-মধ্যে দশদিন অতিবাহিত হয়েছে। এ-বাড়িতে সবার অনুপস্থিতি সহ্য হয়, কেবল প্লাম্বার কলকালি ছাড়া। যেকোনো সময়ে যে কোনো দুর্গতি হবার সম্ভাবনা।

গতকাল সকালেও আমি কলকালির জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। তেল-কালিবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথাবার্তা বলেছি।

"আপনি তো গতকালই বললেন, দেশের ঠিকানায় একটা তার পাঠাবেন।

"সে টেলিগ্রাম তো আমি কালকেই পাঠিয়েছি, তেলকালিবাবু," আমি উত্তর দিই।

"টাকাটা স্রেফ জলে গেলো! তখনই আপনাকে বারণ করা উচিত ছিল, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে কারও বিরুদ্ধে রিপোর্ট করাটা মহাপাপ। তাই চুপ করে রইলাম," বললেন তেলকালিবাবু।

টেলিগ্রামের পিছনে কোন্ গভীর রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে তা এখনও আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

তেলকালিবাবু এবার বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। "কলের পাইপে দিনের পর দিন প্যাঁচ দিলেও ব্যাটা কলকালির মধ্যে যে এতো রস জমেছে তা আমি কোনোদিন আন্দাজ করতে পারিনি।"

"কী বলতে চাইছেন তেলকালিবাবু?"

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন তেলকালিবাবু। "আপনি বয়ঃ-কনিষ্ঠ—আপনাকে কী আর বলবো! এর নাম কলকাতা শহর! এখানে কোনো পুরুষমানুষ সেফ নয়!" তেলকালিবাবু হঠাৎ যেন নিরাপত্তাসচেতন হয়ে উঠলেন।

এক মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলেন তেলকালিবাবু। তারপর বললেন, "বলরাম বোস ঘাট স্ট্রীটের সেই বাঙালী মেয়েমানুষটি। যার খোঁজে কলকালি মাঝে-মাঝে আচমকা উধাও হয়ে যেতো। সেখানেই যে এতো কাণ্ড হচ্ছে তা আমার আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। বলরাম বোস ঘাট স্ট্রীট থেকে কালীঘাট পোস্টাপিস তো বেশী দূরে নয়।"

তেলকালিবাবু বললেন, "কলকালি হতচ্ছাড়ার বাইরেটা শুকনো বাঁশের মতো, কিন্তু তার ভিতরে যে এতো আখের রস ছিল তা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন?"

আমি বিস্তারিত সংবাদ জানবার আগ্রহে কোনো রকম মতামত প্রকাশ করলাম না।

তেলকালিবাবু বললেন, "আমি ভেবেছিলুম, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল কেস। দেশের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনো গোলমাল বেঁধেছে, সেইসব সামলাবার জন্যে শ্রীমান কলকালি টেলিগ্রামে ছুটি নিয়েছে। কিছু কিছু লোক মশাই

মিথ্যে টেলিগ্রাম আনিয়ে ছুটি নিতে খুব মজা পায়।”

আমি মন দিয়ে তেলকালিবাবুর কথা শুনে যাচ্ছি। টেলিগ্রাম দেখে বোকা বনে যাওয়ায় কলকালির বিরুদ্ধে আমার কোনো রাগ নেই।

তেলকালিবাবু মন্তব্য করলেন, “আমার সমস্ত ক্যালকুলেশনটাই ভুল, এখন দেখছি। এই টেলিগ্রামের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির কোনো সম্পর্ক নেই।”

“তা হলে এর পিছনে কী আছে?” আমি এবার একটু চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

তেলকালিবাবু এবার মুখের হাসি চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে জানালেনঃ “প্রেম!”

প্রথমে একটু দ্বিধা করলেন তেলকালিবাবু। তারপর সহজ মেজাজে বললেন, “আপনি বয়সে অনেক ছোট কিন্তু পোস্ট অনেক বড়, আপনার কাছে কিছুই লুকানো উচিত হবে না। কলকালির মাথায় হঠাৎ প্রেমের ভূত চেপেছিল। বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের ওই মেয়েমানুষটিকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছে, আমাদের কলকালি। বিজনেসে পার্টনার হয়েছিল আগে, এখন লাইফ পার্টনার করে নিলো।”

“এদেশটাও বিলেত হয়ে গেলো স্যর। কলের মিস্ত্রিরও আগে প্রেম পরে বিবাহ!” মন্তব্য করলেন তেলকালিবাবু।

চোখদুটো বড় বড় করে তেলকালিবাবু বললেন, “আপনি যখন ভাবছেন, ‘মাদার সিরিয়াস’, তখন কলকালি হনিমুনে বেরিয়ে, অনেকদিনের সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে নিচ্ছে।”

ঠকেছি বুঝতে পেরেও আমার কিন্তু কলকালির ওপর একটুও রাগ হচ্ছে না। বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের সেই বাঙালী মেয়েটির সঙ্গে তার জটিল সম্পর্কটা যে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে ভাবতে আমার আনন্দ হচ্ছে। অল দি ওয়ার্লড লাভস দি লাভার— সুখী হোক কলকালি।

তেলকালিবাবুকে বললাম, “ভালই হয়েছে। বিয়ে-থা হলে মানুষের দায়িত্ববোধ অনেক বেড়ে যায়। তাছাড়া বিকেলের দিকে ওই যে মাঝে-মাঝে কলকালির পাত্তা পাওয়া যেতো না, তা আর হবে না।”

তেলকালিবাবু আমার কথাগুলো শুনলেন। তারপর বললেন, “এখনও সবটা বলা হয়নি, স্যর।”

“বিয়েই যখন হয়ে গিয়েছে তখন আর কী বলার থাকতে পারে?”

তেলকালিবাবু বললেন, “ব্যাটার আপনাকে লিখতে সাহস নেই ; তাই আমাকে চিঠি লিখে জড়িয়ে ফেলেছে। কেন রে বাবা? আমি কি চিরকাল তোদের মোক্তারি করবো?” অসহায় প্রতিবাদ জানালেন তেলকালিবাবু।

ফস করে একটা চিঠি পকেট থেকে বার করে ফেললেন তেলকালিবাবু। “এই দেখুন কাণ্ডটা হতভাগা কলকালির। লিখেছে, বউ-এর ইচ্ছে নয় কলকাতা ফেরার। বলরাম বসু ঘাট স্ট্রীটের চ্যাপটারটা মুছে ফেলে দুজনে ওখানে নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে অনেক। সেখানে প্লাম্বিং-এর একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে কলকালি—থ্যাকারে ম্যানসনে সে আর কোনোদিন ফিরবে না।”

কলকালি ছাড়া-এ-বাড়ির খুব অসুবিধা হবে। তবু আমি তার ওপর রাগ করতে পারছি না। প্রেমিক কলকালির ওপর বরং আমার আকর্ষণ বাড়ছে।

তেলকালিবাবু কিন্তু তেমন খুশী হতে পারলেন না। নিজের মনেই ওরা নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায়। তাই পুনায় পালিয়েছে কলকালি ; বললেন, "সবাই ভেবেছে কী? চেনা-জানা একে একে সবাই চলে যাবে ; আর এই হতভাগা তেলকালি একা এখানে বন্দী হয়ে থাকবে? আর সবার জন্য মোক্তারি করবে?"

তেলকালিবাবু একটু রেগে উঠলেন, "মেয়েমানুষই শনি, স্যর। অমন যে অমন কলকালি, তাকেও এক কথায় হাজার মাইল দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। এই যে আপনি, সামনে পিছনে মেয়েমানুষের ছায়া নেই বলেই শান্তভাবে এতো কাজ করতে পারছেন। একের পর এক ভাড়াটে তাড়িয়ে ওয়ার্লড রেকর্ড করছেন। মেয়েমানুষ সব্বনাশা, স্যর," এই সাবধান মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে তেলকালিবাবু লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সায়েব পাড়ায় ফাল্গুনের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। আমি রাজপথে নেমে এসেছি।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে সান্ধ্য জনস্রোত শান্ত নদীর স্রোতের মতোই আপন মনে বয়ে চলেছে। আমার মনের ভিতর ছাড়া এই আশ্চর্য পল্লীর অন্য কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই।

আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছি ; কিন্তু তবু যেন সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আরও অনেক দ্রুতগতি আমার প্রয়োজন—আমি যে অনেক পিছিয়ে পড়েছি, আমি যে অনেক দেরি করে ফেলেছি।

সদর স্ট্রীটের মোড়ে এসে পড়েছি আমি। এ-সময় এখানে কেউ ব্যস্ততা দেখায় না। এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের ঘরে ফেরার টান নেই।

অনেক দিন আগে সদর স্ট্রীটের এক দোতলা বারান্দা থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ওপারে সূর্যোদয় দেখে রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্চর্য কবিতা লিখে-ছিলেন— নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। হলদে রংয়ের সেই বাড়িটা দূর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ কি সদর স্ট্রীটের সান্ধ্য দেখেন নি তাহলে তো একটা কবিতা লিখতে পারতেনঃ সদর স্ট্রীটে সূর্যাস্ত, অথবা নির্ঝরের নিদ্রাগমন।

রিকশার ঠুন ঠুন ঘণ্টা বেজে উঠলো। "আইয়ে সাব। ফটাফট—চটপট, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়া, বাংগালী!"

রিকশার ঠুন ঠুন বেড়েই চলেছে। রিকশাওয়ালা যেন আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের লাইন ধরেই আবৃত্তি করছেঃ পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে রিকশাওয়ালা ছাড়বে না। এবার সে খুব কাছে এগিয়ে এলো। এবং হঠাৎ আমাকে দেখেই চমকে উঠলো। "সেলাম হুজুর। কসুর মাফ কীজিয়ে।"

মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি!

"হুজুর, আমার বাবা শাজাহান, ঠাকুরে মেনসনে রিকশ রাখতেন।"

"তোমার বাবা কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি। শাজাহানকে আমি চিনতাম।

"বাবা 'প্রালেসিস' হয়ে ট্যাংরা বস্তিতে শুয়ে আছেন হুজুর। আমি তাই ইস্কুলে নাম কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি।" ছেলেটির যে এখনও রিকশ টানবার বয়স হয়নি, তা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম।

"তোমার নাম?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আকবর, হুজুর।"

শাজাহানের ছেলে আকবর। ইতিহাস-ভূগোলের সব কিছু ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের এই আজব সন্ধ্যায় আমার চোখের সামনে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

"আইয়ে সাব। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। যেখানে হুকুম করবেন, সেখানে।" আকবর আমাকে বিনামূল্যে রিকশ ভ্রমণের নিমন্ত্রণ জানালো।

কিন্তু আমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি। আজ আমি নিজের পায়ে এগিয়ে যাবো, কারও ওপর আমি নির্ভর করতে চাই না।

সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার দুহাতে সরিয়ে আমি আপন মনে এগিয়ে চলেছি। আমার পকেটে একটা ঠিকানা লেখা রয়েছে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে পৌঁছতে চাই।

কিন্তু কে যেন আমার মনের মধ্যে বার বার ফিস ফিস করে বলছে, তোমার দেরি হয়েছে। অনেক দেরি করে ফেলেছো তুমি। এই পথ ধরে ওই ঠিকানার উদ্দেশে অনেকদিন আগেই তোমার ছুটে চলে আসা উচিত ছিল।

আজও যে দ্রুতবেগে আমার ইচ্ছার দিকে ছুটে যাবো সে-উপায় নেই। পদে পদে বাধা। আমাকে দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন অসংখ্য লোক এই পথের ধারে অপেক্ষা করছে।

"হুজুর? এই রাস্তায় আপনি!" আর একজনের কণ্ঠস্বর আমার কানে গেলো।

লোকটার দিকে তাকালাম আমি।

"আমি শাহাবুদ্দীন, হুজুর। আগে আপনাদের রাজমিস্ত্রীর কাজ করতাম, হুজুর।"

"তারপর তো হঠাৎ আসা বন্ধ করলে, আমাকে আবার নতুন লোক আনাতে হলো।"

"আমি যাওয়া বন্ধ করিনি হুজুর। রামসিংহাসনজীকে যে নজরানা দিতাম তা পছন্দ না হওয়ায় উনি অর্ডার দিলেন থ্যাকারে ম্যানসনে আর ঢুকবে না।"

রামসিংহাসন চৌরাশিয়ার আরও একটা পরিচয় পাওয়া গেলো।

"হুজুর বুড়ো হয়েছি। পা কাঁপে। এখন খুব উঁচু ভারার উপর উঠতে পারি না। ছোটখাট 'রিপিয়ারের' কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হবে হুজুর।"

উঃ! পৃথিবীতে আর কত দুঃখ আছে? হে ঈশ্বর, আমাকে একটু আলোকের ইঙ্গিত দাও।

"শাহাবুদ্দীন, তুমি আমার সঙ্গে পরে দেখা কোরো। তোমার হাত একটু কাঁপলেও কাজ পাবে তুমি। আজ আমি চলি।"

"যান হুজুর। বুঝেছি, আপনার দেরি হয়ে গিয়েছে।" শাহাবুদ্দীন আমার পথ ছেড়ে দিলো।

শাহাবুদ্দীন তুমি ঠিক বুঝেছো, আমার সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি এবার চলার বেগ অনেক বাড়িয়ে দিলাম।

ফাগুনের এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার ক্লান্ত সদর স্ট্রীট, এমন বিষণ্ণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যে ভয় হচ্ছে সমস্ত কাজকর্ম অবহেলাভরে সরিয়ে দিয়ে যার সন্ধানে আমি পথে বেরিয়ে এসেছি তার দেখা মিলবে না।

অস্বস্তিকর এই পল্লীতে আজও কেন এতো ভীড়? আমি তো চলার বেগ বাড়িয়ে দিয়েছি, তবু আমার গতিকে শ্লথ করবার জন্যে এতো মানুষ কেন এমন ভাবে সব ফুটপাথের ওপর অকারণে দাঁড়িয়ে আছে?

দূর শতাব্দীর কোন্ এক অখ্যাত দশকে বিশ্বপ্রকৃতির আশীর্বাদধন্য ঈশ্বরপুত্র একদা এই পথে বিচরণকালেই যুগযুগান্তরের রহস্যজাল ছিন্ন করে জরাজীর্ণ মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী উপলব্ধির সিংহদ্বারে পৌঁছবার পথ-নির্দেশ করেছিলেন—'আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান!' তারপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ পাশবিক কামনার উত্তপ্ত নিশ্চল এই সদর স্ট্রীটকে বিষময় করে তুলেছে। সেই পথ ধরেই অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণে আমি এগিয়ে চলেছি আমার অনাবিষ্কৃত লক্ষ্যের দিকে।

টোটী লেন পেরিয়ে সদর স্ট্রীটের ওপর সম্পূর্ণনির্ভরশীল সেই ছোট্ট গলিটা অবশেষে খুঁজে পেলাম। যার প্রবেশ আছে অথচ প্রস্থান নেই এমন অদ্ভুত বেহিসাবী একচোখা গলি কলকাতা শহরে কত আছে কে জানে? ইলেকট্রিক আলোর পোস্ট আছে কিন্তু আলো নেই এই বেনামা গলিতে। অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের উদ্দেশে কিছু অপ্রিয় মন্তব্য স্বগতোক্তির মতো মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। ছোট্ট একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ মনে হলো চার্নক সাহেবের অভিশপ্ত শহরটাই এক অন্ধকার কানা গলির মতো—কলকাতায় কেবল প্রবেশ আছে, প্রস্থান নেই; এখানে একবার ঢুকলে অদৃশ্য আকর্ষণে কেবল পাক খেয়ে মরতে হয়; মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

হাড়গোড়বারকরা একটা জরাজীর্ণ পিতামহ ভবনের সামনে আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। মদনার বর্ণনার সঙ্গে এই ছোট্ট বাড়িটা মিলে যাচ্ছে। নম্বরের কথাও মদনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

একটু পিছিয়ে এসে একখানা অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ির কাঠের গেটের সামনে দাঁড়ালাম আমি। রাস্তার এই দিক থেকে আমার লক্ষ্যস্থলকে একটু ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। নিচের ভাঙা ঘরখানায় একটা কেরোসিন ল্যাম্পের অ্যানিমিয়াগ্রস্ত আলো এ-বাড়ির অন্ধকারকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। বিশ্বভুবনের তোয়াক্কা না-করে এক বৃদ্ধ ধোপা সেই অন্ধকারে আপনমনে রঙবেরঙের জামাকাপড় ইস্ত্রি করে যাচ্ছে।

দূর থেকে কিছুক্ষণ ধোপার কাজকর্ম লক্ষ্য করলাম। ইস্ত্রি ছাড়া লোকটার আর কোনোদিকেই নজর নেই। এবার তাহলে এই সত্যসুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া যাক—পাড়ার খবরাখবর ধোপার চেয়ে কে ভাল জানবে? ধোপার কাছে পাঠানো কাপড়ের বিবরণ থেকে যে কোনো সংসারের একটা ছবি অঙ্কের

মতো এঁকে ফেলা যায়। বাড়িতে ক'জন আছেন, তাদের মধ্যে ক'জন পুরুষ ক'জন নারী, শিশু অথবা বালক-বালিকাই বা ক'জন—এসব অভিজ্ঞ ধোপার কাছে অজ্ঞাত থাকে না।

বৃদ্ধ সত্যসুন্দর তার কাজ বন্ধ না-করেই আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। তার হাত ও মুখ এক সঙ্গে চলতে লাগলো।

"এ-পাড়ায় বাঙালী থাকে না, বাবুজী," রামঅবতার একটা প্রমাণ সাইজের ফ্রক আয়ত্তে আনতে-আনতে আমাকে জানালো।

"ইণ্ডিয়ানদের পাড়া এ নয়, বাবুজী, এখানে সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাব-মেমসাব", রাম অবতার আমাকে মনে করিয়ে দিলো।

"পুরো সাহেবপাড়া?" আমি জিজ্ঞেস করি। "ইণ্ডিয়ানদের এখানে জায়গা নেই?"

রাম অবতার রঙীন ফ্রকের ওপর সামান্য জল ছড়িয়ে গরম ইস্ত্রির লম্বা টান দিলো। চোখের সামনে সেই জল বাষ্পে পরিণত হয়ে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ করলো। ফিরিঙ্গিপাড়ার জামাকাপড়ের গন্ধটা কেমন যেন অস্বস্তি-কর!

রাম অবতার বললো, "ইণ্ডিয়ান থাকবে না কেন? সব সালোয়ার কামিজ। আগে এখানে প্যাণ্ট এবং ফ্রক ছাড়া কিছুই থাকতো না। ফিফটিন আগস্টের পর থেকে ফ্রক কমে যাচ্ছে বাবুজী—সব মেমসাব বিলাইত চলে যাচ্ছে, আর ফিরছে না।"

রাম অবতার আমার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে। "আপনি বাঙালী শাড়ির খোঁজ করছেন?"

"শাড়ির আবার বাঙালী অবাঙালী!" আমি ভুল ধরবার চেষ্টা করি রাম অবতারের।

সে কিন্তু আমার সঙ্গে মোটেই একমত হলো না। "কী বলছেন, বাবুজী? সিন্ধি জেনানার শাড়ি, পাঞ্জাবী জেনানার শাড়ি, বাঙালী জেনানার শাড়ি দেখলেই বোঝা যায়।" রঙচঙ ভঁজভোঁজ সব নাকি আলাদা।

রাম অবতার বললো, "কেন মিথ্যে বলবো, বাবুজী, এ-পাড়ায় বাঙালী মেয়েরা যে আসে না এমন নয়। কিন্তু তারা কিছুক্ষণের জন্যে চুপি চুপি এসে চুপি চুপি চলে যায়। রিকশওয়ালা ভোঁদালাল ওদের কাছ থেকে মোটা টাকা কামায়। কিন্তু এই রাম অবতার ধোপার একটা আধলা লাভ হয় না। এইসব মাইজীরা কোন্ দুঃখে এখানে নোংরা কাপড় কাচতে দিয়ে যাবে? তাদের আসা-যাওয়ার কোনো ঠিক নেই।"

তা হলে এ-পাড়ায় কোনো বাঙালী মেয়ে বসবাস করে না ধরে নিতে হবে?

"দাঁড়ান, হুজুর," রাম অবতার এবার একটু চিন্তা শুরু করলো। আরও দুখানা মডার্ন ছাঁট-এর ফ্রক ইতিমধ্যেই গরম লোহার চাপে নবযৌবনা হয়ে উঠেছে।

রাম অবতার এবার ঝুঁকে পড়ে তক্তপোশের অন্য দিকে রাখা কতকগুলো কাপড়ের দিকে নজর দিলো। বেড কভার এবং বেড শিটের ভিড় থেকে হঠাৎ একখানা রঙীন শাড়ি বেরিয়ে এলো।

রাম অবতার বললো, "ভুলে গিয়েছিলাম, বাবুজী। একখানা বাঙালী শাড়ি ক'দিন হলো ঘুরেফিরে আসছে বটে।"

আমি যেন এবার একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। রাম অবতার বললো, "দাঁড়ান বাবুজী, আমার জেনানাকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখি।"

রাম অবতারের স্ত্রী অদূরে রাস্তার ওপরে একমনে হুঁকো টানছিল। তার সঙ্গেই কীসব কথা বলে এলো রাম অবতার।

তারপর আমাকে বললো, "হ্যাঁ, বাবুজী, এই বাড়িতেই এক কম বয়সী বাঙালী মেমসাব এসেছেন।"

"একখানা শাড়িই ঘুরে ফিরে আসে, বাবুজী। আমার বউ নিয়ে আসে সব সময় সাজো কাচতে হয়, বাবুজী।"

সাজো কাচার রহস্যটা আমার জানা ছিল না। "সাজো জানেন না, বাবুজী?" রাম অবতার আমার জ্ঞানের অভাবে বিস্মিত হলো? "সাজো হচ্ছে, 'আর্জেণ্ট-সে-আর্জেণ্ট'!"

রাম অবতারের কাছেই এবার শিখলাম, সাজো মানে সকালবেলায় কাপড় দিয়ে সন্ধ্যের আগেই ফেরত নিয়ে যাবে। কাপড় পাওয়া মাত্রই সাবুন লাগিয়ে সাফ করে ফেলতে হবে, ভাঁটিতে পাঠানোর জন্যে অপেক্ষা করা চলবে না। সাজোর কাপড় সঙ্গে-সঙ্গে ইস্ত্রি হয়ে যাবে, যদিও তাতে মাড় দেবার সময় থাকে না। রাম অবতার আমাকে বোঝালো, "সাজোর কাপড় ধোপার ঘরে রাত্রি কাটায় না, বাবুজী।"

কাপড়টার দিকে ইতিমধ্যেই আমি চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। এই কাপড়টা যদি সত্যিই সীমার হয়। তাহলে সাজোর অর্থ কী?

সীমা, সীমা—আমার অশান্ত মন উদ্বেল হয়ে উঠছে।

মনকে বকুনি লাগালাম। একখানা রঙীন শাড়ি দেখে আমি কীভাবে ধরে নিচ্ছি সীমাকে খুঁজে পেয়েছি আমি?

বাইরের দিকে তাকালো রাম অবতার। বললো, "এতোক্ষণে তো কাপড় নিয়ে যাবার কথা, বাবুজী। বাঙালী মেমসায়েব সন্ধ্যের আগেই আমার জেনানার কাছে চলে আসেন।"

"সাজোর কাজে আমার বউ খুব খুশী, বাবুজী", রাম অবতার অকপটে স্বীকার করে।

এই কাজে খুশী হবার কী আছে, আমি বুঝতে পারি না। রাম অবতার বললো, "সাজো মানেই নগদ 'পিমেণ্ট' বাবুজী। আমাকে খাটিয়ে ঝটাঝট সাজোর কাজ করিয়ে পয়সাটা বউ নিয়ে নেবে। বিড়ি কিনবে, কিন্তু আমাকে একটাও দেবে না, সব নিজের জন্যে রেখে দেবে।"

রাম-সীতার এই পারিবারিক ঝগড়ার মধ্যে ঢোকবার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। সাজো শাড়ির মালিকেরা সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এখানে অপেক্ষা করাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ ছিল, আমার অধৈর্য মন আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী নয়। আমার পদযুগল অদৃশ্য কোনো হাইকমাণ্ডের নির্দেশে হঠাৎ চলমান হয়ে উঠলো।

বৃদ্ধ বাড়িটার মধ্যে আমি এবার সাহস করে ঢুকে পড়লাম। পৌরসভার সতর্ক বাস্তুকারদের শ্যেন চক্ষু ফাঁকি দিয়ে এই সব জরাজীর্ণ বাড়ি এখনও কীভাবে চার্নক সায়েবের শহরে দাঁড়িয়ে আছে তা আমার মতো অভাজনের বুদ্ধির অগম্য। আমার পদভারেই সিঁড়ির কয়েকটা প্রপিতামহ-ইট নড়ে-চড়ে উঠে নিজেদের অস্তিত্ব ও অস্বস্তি একই সঙ্গে ঘোষণা করলো।

সিঁড়ির রেলিং কালের অবহেলায় তার অর্ধেক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছে।

যে-টুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুতে হাত পড়তেই ছোট-খাট ভূমিকম্প শুরু হবার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। একতলা-দুতলার মাঝামাঝি সিঁড়ির হাফ-ল্যান্ডিং-এ এক শীর্ণকায়া ইঙ্গবঙ্গ তনয়ার সঙ্গে দেখা হলো। এই অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে আমার পদশব্দে এই বৃদ্ধা অকস্মাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন।

বৃদ্ধা বলে উঠলেন, "গুড্ ইভনিং, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

কী আশ্চর্য! এই পরিবেশে এই অপরিচিতাই আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন!

ইতিমধ্যে আমি বৃদ্ধার দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে এসেছি। বৃদ্ধা হঠাৎ বলে উঠলেন, "দিন, আপনার প্যাকেটটা এগিয়ে দিন।"

কী প্যাকেট? কাকে এগিয়ে দিতে পারি আমি? ভদ্রমহিলার দৃষ্টিশক্তি যে অতি ক্ষীণ এবং গুরুতর কোনো ভুল যে হয়ে গিয়েছে তা এবার আমি আন্দাজ করতে পারছি।

আমাকে এবার জিজ্ঞেস করতে হলো, "আপনি কার জন্যে অপেক্ষা করছেন? কী চাই আপনার?"

"আপনি মিস্টার ডিকশনের কাছ থেকে আসেননি? আপনার নাম মিস্টার মদনা নয়? ও! আই অ্যাম স্যরি। ও-বেলা ওঁরা ফুড-প্যাকেট পাঠাতে পারেননি। এ-বেলা মিস্টার মদনা চলে আসবেন বলেছিলেন।"

এই মহিলার পরিচয় আমার কাছে আর অজ্ঞাত রইলো না। ইনিই তাহলে মিস্ ওয়াইপার। সীমার সন্ধানে আমি তাহলে ঠিক জায়গায় এসে পেঁচেছি।

"সীমা বলে কোনো বাঙালী মেয়ে এখানে থাকে?" এবার আমি খোঁজ করলাম।

"হোয়াট?" একটু বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করলেন মিস্ ওয়াইপার। "সীমা? না, ওই নামে কোনো মেয়ে এখানে থাকে না।"

এমনও হতে পারে, সীমা এখানেই ছিল, এখন আর থাকে না।

একটু নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "সীমা বলে কেউ এখানে থাকতো কী, মিস্ ওয়াইপার?"

নিজের নাম শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন মিস্ ওয়াইপার। "তুমি আমার নাম জানলে কী করে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমি মিস্টার মদনার বন্ধু।"

মদনার নামটা মন্ত্রের মতো কাজ করলো। মিস্ ওয়াইপার বললেন, "কিছু মনে কোরো না—আমি চোখে দেখতে পাই না। আমার হাত-পা নড়বড় করে। চোখে দেখতে পেলে আমি নিজেই রোজগার করে খেতে পারতাম, এমনভাবে আমাকে আপনার বন্ধুর ওপর নির্ভর করতে হতো না।"

"কী নাম বললেন?" মিস্ ওয়াইপার আবার জিজ্ঞেস করলেন।

আমি আবার বললাম, "সীমা।"

"না, ওই নাম শুনিনি, জেন্টলম্যান। এখানে একজন মাত্র বেঙ্গলী গার্ল আছেন, সুলেখা।"

"সুলেখা!" কোন্ ঘরে তিনি থাকেন জানতে চাইলাম।

মিস্ ওয়াইপার আমার কথাবার্তায় বেশ অবাক হয়ে গেলেন। যে লোক সীমাকে খুঁজতে এসেছে সে সুলেখার খবর পেয়ে কী করে সন্তুষ্ট হয়?

আমি এর উত্তর না-দিয়েই দ্রুত উপরে উঠে এলাম। সুলেখার দরজাটা

মিস্ ওয়াইপার আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দরজা বন্ধ। সুলেখার দরজা আমার নাকের সামনে বন্ধ রয়েছে। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। দরজার ওপাশেই সীমা আছে ভাবতেই এক অদ্ভুত অনুভূতির তরঙ্গ আমার দেহের মধ্যে প্রবাহিত হলো। দ্বার খোল, দ্বার খোল ওরে গৃহবাসী।

সীমা, তুমি দরজা খুলছো না কেন? আমি এসেছি।

দরজায় টোকা দেবার জন্যে হাতটা বাড়িয়েও দরজা স্পর্শ করতে পারলাম না। বিদ্যুতের প্রবাহে হাতটা হঠাৎ যেন আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে।

কালো দরজাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো। সময় সন্ধ্যা, গায়িকার নাম সুলেখা—দ্বার রুদ্ধ। এখন তো আচমকা কড়া নাড়ার সময় নয়—

সুলেখা। সুলেখা নামটা আমার কাছে এই মুহূর্তে বিষের মতো মনে হচ্ছে। এ বাড়িতে তা হলে সুলেখাই বসবাস করে। সুলেখাকে খোঁজ করবার জন্যে তো আমি এইভাবে পাগলের মতো ছুটে আসি নি। সীমা, তুমি কোথায়? তুমি কী তা হলে সুলেখার কাছেই আত্মসমর্পণ করলে শেষ পর্যন্ত?

রুদ্ধ দরজা খোলবার কোনো ইংগিত নেই। ভিতর থেকে যেন ইংরিজী গানের সুর ভেসে আসছে। আর আমার মনের উত্তেজনা ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। দরজায় টোকা দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। আমি এবার মন্থর পদক্ষেপে আমার অতীতকে ভুলে গিয়ে থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে যেতে চাই। সেখানে আমার অনেক কাজ। সে সব অবহেলা করে এইভাবে বেরিয়ে আসাটাই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়নি। নিজেকে ভর্ৎসনা করার মতো কাজ করে ফেলেছি, সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে বন্ধ দরজাটার দিকে আর একবার আমি করুণভাবে তাকালাম। আমার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হয়ে এই রুদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরছে। সীমা, তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না আমি। সুলেখা তোমরাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকো আমাদের এই অভিশপ্ত জন্মভূমিতে। আমাদের মহান জনগণমন অভিভাবকবৃন্দ অসহায় রমণীদের জন্য এই পথই খুলে রেখেছেন।

এবার ফেরার সময়। কিন্তু এতো পথ পেরিয়ে এসে হঠাৎ আমার পা দুটো যেন আমার নির্দেশ মানতে গড়িমসি করছে। আমার চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্যে সীমাকে দেখতে চাইছে।

আমার মনের মধ্যে কিন্তু কোনো দুর্বলতা নেই। দেহের এই অসহযোগিতা সাময়িক দুর্বলতার প্রকাশ মাত্র, আমি তাকে প্রশ্রয় দেবো না।

দ্বার খোল, দ্বার খোল, ওরে গৃহবাসী। একদা সদর স্ট্রীটের অধিবাসী সেই ঈশ্বরপুত্রই তো অতিথিকে রুদ্ধ দুয়ার খোলবার আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন। আর সীমা, তুমি দরজা বন্ধ করে রেখেছো।

যাবার সময় এলো। আর এইভাবে এখানে অপেক্ষা করা সংগত নয়। যাবার আগে জানিয়ে যাওয়ার লোভ আমি কিছুতেই সংবরণ করতে পারছি না।

পকেট থেকে সাদা কাগজের টুকরো বার করে ফেললাম। কাকে লিখবো

আমি? কলম হাতে সেটাও ঠিক করে উঠতে পারছি না।

আমার কলম লিখলো, "সীমা, অনেক পথ পেরিয়ে অবশেষে আপনাকে খুঁজে পেলাম। কিন্তু দুয়ার রুদ্ধ। সুলেখার রুদ্ধ দ্বারে টোকা দেবার মতো সাহস আমার নেই। তাই ফিরে চললাম। মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করুন। —ইতি।"

দরজার ফাঁক দিয়ে চিঠিটা আমি ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। আমার হৃদয় আজ শূন্য, আমার মন রিক্ত, সংসারে কারও কাছে আর কোনো প্রত্যাশা নেই আমার।

সিঁড়ির হাফ ল্যান্ডিং-এ মিস্ ওয়াইপারকে দেখতে পেলাম না। তিনি হয়তো মিস্টার মদনার বিলম্বে অধৈর্য হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ভেবেছিলুম, ওঁকে একবার বলে যাবো সুলেখাকে জানাতে তাঁর পুরনো এক বন্ধু অনেক খোঁজ করে এখানে এসেছিল।

হাফ ল্যান্ডিং থেকে নিচে পর্যন্ত নামতেও আমার অনিচ্ছুক দেহটা অনেক সময় নিলো। কারুর ওপরেই আমি এখন জোর খাটাতে পারছি না, এমন কি নিজের ওপরেও নয়।

আমি এবার রাস্তায় নেমে এসেছি। দূরে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য হলুদ রঙের বাড়িটার পিছন দিক দেখা যাচ্ছে। ওই বাড়িতে বসেই তিনি লিখে-ছিলেনঃ

না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

একটা অর্বাচীন মদনার বয়সী দালাল আমাকে ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছে। সে এবার সুযোগ বুঝে তার পরিচিতা রমণীদের দৈহিক গুণাবলীর বর্ণনা দিতে শুরু করলো। বকুনি লাগাতেই সে সরে গেলো, কিন্তু যাবার আগে তার বিরক্তি প্রকাশ করে গেলো, "বুঝেছি ফালতু মাল। সন্ধ্যেবেলায় এখানে জ্বালাতন কেন বাবা?"

এবার আমার দৃষ্টি হঠাৎ রাম অবতারের ভাঙা ঘরের দিকে চলে গেলো এবং সেদিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত দেহ অদ্ভূত এক অভিজ্ঞতায় সিরসির করে উঠলো। নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

অবিশ্বাসের চোখটা আমি একবার মুছে নিলাম। না আমি ভুল দেখছি না। রাম অবতারের ধোপাঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সীমা। মনে হলো, সীমার সামনেই রাম অবতার কাপড়ের ওপর ইস্ত্রি চাপিয়ে গরম গরম ডেলি-ভারির জন্যে দ্রুতবেগে কাজ করে যাচ্ছে।

'সীমা, সীমা।' আমি শরীরের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে গলা

ফাটালাম।

কিন্তু কোনো শব্দ নেই কেন? কী আশ্চর্য! আমি অকস্মাৎ আবিষ্কার করলাম, আমার গলা দিয়ে কোনো স্বর বার হচ্ছে না।

মনের ভিতর থেকে কে যেন অকস্মাৎ স্বরনালিকে নিস্তব্ধ হবার আদেশ দিয়েছে। 'সীমা, সীমা—আমি তোমারই জন্যে অনেক চেষ্টায় এখানে হাজির হয়েছি,' আমি এবার বলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এবারও আমার কণ্ঠ স্তব্ধ।

ভিতর থেকে কেউ এবার আমাকে সাবধান করে দিলো। 'কে সীমা? সীমা তো অনেক দিন সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে—এখানে তো সুলেখা সেন। সুলেখা সেনদের এতোদিনেও চিনলে না তুমি?'

ইস্ত্রি করা শাড়িটা ইতিমধ্যে সীমা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে! খুচরো পয়সা মিটিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে সীমা এবার রাম অবতারের গ্যারেজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

অদূরের এক ল্যাম্পপোস্ট আমাদের এই নাটকীয় পুনর্মিলনের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্যেই যেন হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সরকারী পোস্টের আলোয় চলমান সীমার ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে আমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

আর বিলম্ব না করে সীমার কাছে এগিয়ে যাবো ভাবছি, এমন সময় ছায়া-কালো-কালো এক তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে আমার সন্দিগ্ধ মন সচেতন হয়ে উঠলো।

হয়তো সদর স্ট্রীট এবং টোটী লেনের গলি-উপগলির কোনো নিত্যযাত্রীর সচল ছায়া—আমার আড়ষ্ট হবার কোনো হেতু নেই। কিন্তু লোকটাকে যেন আমার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? ছায়া-শরীর ক্রমশ এগিয়ে আসছে, এবং আমি ততই দ্রুতগতিতে স্মৃতির অতল গভীরে অসংখ্য পরিচিত জনের মুখ-চ্ছবির সঙ্গে এই মুখকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।

কে তুমি? কোথায় তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার? আমার স্মৃতি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে না, কিন্তু তুমি কী সত্যিই আমার অপরিচিত?

ছায়ামূর্তি এবার আমারই মতো রাম অবতারের শরণাপন্ন হলো। এবং জানতে চাইলো সুলেখা সেন নামে কোনো বাঙালী জেনানা এই গলির কোথায় থাকে।

রাম অবতার জানালো, নামধামের খোঁজ সে রাখে না। তবে এক বাঙালী জেনানা এখনই পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। চলমান সুলেখাকে আঙুল দিয়ে রাম অবতার আগন্তুককে দেখিয়ে দিতেই সে দ্রুতবেগে সুলেখার ছায়া অনুসরণ করে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরে ফেললো।

থমকে দাঁড়িয়েছে সুলেখা। লোকটা এবার সুলেখাকে ভালভাবে দেখে নিচ্ছে। তারপর সে কী যেন বলছে সুলেখাকে—এই দূরত্ব থেকে আমি তা বুঝতে পারছি না। সুলেখাও যেন লোকটাকে কী বলছে? কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে।

আমি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। লোকটার কথাগুলো শুনবার জন্যেই যেন আমার পা দুটো আচমকা টপ-গিয়ারে সচল হয়ে উঠলো।

আমার পায়ের শব্দে লোকটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। সুলেখা তাকে কী

বলছিল ভগবান জানেন, কিন্তু আমার উপস্থিতি লোকটাকে দুর্বল করে তুললো। মুহূর্তের মধ্যে অ্যাবাউট টার্ন করে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো এবং যাবার আগে চোখের সার্চ লাইট জ্বালিয়ে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখে নিলো।

এবার আমি সুলেখার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আমাকে দেখে সুলেখার বিস্ময়ের শেষ নেই।

সুলেখা এবার মুখ তুলে তার আয়ত চোখজোড়া প্রস্ফুটিত পদ্মর মতো বিকশিত করে আমার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলো। মন্ত্রমুগ্ধ আমিও কী করবো ভেবে না পেয়ে সুলেখার দিকে দৃষ্টির ফ্লাডলাইট জেবলে দিয়েছি।

অনেক দিন আগে অবিস্মরণীয় এক চলচ্চিত্রে দীর্ঘ দিনের বিলম্বে দুই চরিত্রের পুনর্মিলন দৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলাম। দুই চরিত্রের সেই শব্দহীন গতিহীন দৃষ্টি বিনিময় শেষই হতে চায় না—অনন্তকাল ধবে তারা যেন এইভাবে পরস্পরের দিকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। আমি অনুভব করছি, সুলেখার কাজলচোখের বিচ্ছুরিত আলো আমার সমস্ত দেহের ওপর বসন্ত বাতাসের মতো বিচরণ করছে। আমিও সুলেখার দিকে দৃষ্টির ফ্লাডগেট খুলে দিয়েছি—বহুদিনের বন্দী চিন্তা ড্যামের জলরাশির মতো সুলেখাকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে।

অখ্যাত গলির নিঃশব্দ নাটক এবার সরব হয়ে উঠলো। সুলেখা বলে উঠলো, "আপনি!"

তিন অক্ষরের একটি মাত্র শব্দ। কিন্তু তারই মধ্যে শত শত কাব্যের নির্যাস কোনো অলৌকিক উপায়ে বন্দী হয়ে রয়েছে। হাজার বছর ধরে যেন আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, অবশেষে কে যেন পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে আমাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি!' অর্থাৎ 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'

পথের ওপর এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যে আমার পক্ষে দুঃসাধ্য তা সুলেখা বুঝতে পারলো। কিন্তু সুলেখা বোধ হয় ঠিক করতে পারছে না আমায় নিয়ে কী করবে?

কী আশ্চর্য মেয়েদের ধর্ম। কেমন অনায়াসে তারা দ্বিধার হিমশীতল আবরণ ছিন্ন করে প্রসন্ন সূর্যের মতো বেরিয়ে আসতে পারে, কত সহজে তারা নিজের দুঃখ বুকের লকারে লুকিয়ে রেখে অপরের কথা ভাবতে পারে।

সুলেখা এবার বলে উঠলো, "আপনি অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন।"

আমার জ্বরাক্রান্ত তপ্ত শরীরে কে যেন স্নিগ্ধ স্নেহের হাতখানি বুলিয়ে দিলো। অন্নের সন্ধানে, জীবিকাব মায়ামরীচিকায় প্রলুব্ধ হয়ে, সংসারের শান্ত আশ্রয় ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়বার পরে এমন কথা আর কখনও শুনিনি। আমার শরীর-স্বাস্থ্যের ওপর কারও প্রসন্ন কল্যাণময়ী দৃষ্টি তো পড়েনি আমি নিজেও প্রত্যাশা করিনি।

কত দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল আমার ও সুলেখার মধ্যে, আমাদের দু জনের এই সাক্ষাৎকার কী কঠিন হতে পারতো—কিন্তু সুলেখা কেমন অবলীলাক্রমে ব্যাপারটা সহজ করে দিলো। এমন সহজ হবার শক্তি ঈশ্বর বোধ হয় মেয়েদেরই দিয়েছেন—দস্যু রত্নাকরকেও তারা জিজ্ঞেস করতে পারে, আপনি অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন।

সুলেখার শীর্ণ শরীরের দিকে এবার আমার নজর পড়লো। আলোর

যতই অভাব থাক, আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, সুলেখা সত্যিই অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে ; তার গায়ের রঙটাও যে পুড়ে গিয়েছে তা বুঝবার মতো দৃষ্টিশক্তি এখনও আমার রয়েছে।

যে-প্রশ্নটা আমারই প্রথম করা উচিত ছিল সুলেখা সেটাই আগে কেড়ে নিয়েছে। এখন বোধ হয় জিজ্ঞেস করার মানে হয় না, 'আপনিও কিন্তু বেশ রোগা হয়ে গিয়েছেন।'

প্রথম রাউণ্ডের পরাজয় মেনে নিয়েই না হয় এই প্রশ্ন করা গেলো। কিন্তু তার অর্থ দাঁড়ায়, আমি জানতে চাইছি, এই রোগা হওয়ার পিছনে কোন্ প্রতিকূল পরিস্থিতি কাজ করছে? সমৃদ্ধির অনুপস্থিতিই তো মানুষকে কৃশকায় করে তোলে—স্বাস্থ্যহীনতার সঙ্গে ব্যর্থতার নিবিড় সংযোগের কথা সংসারে কে না জানে?

সুলেখা ততক্ষণে আমাকে হারিয়ে দিয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। কেমন সহজে সে বললো, "খুব খাটছেন অথচ কিছু খাচ্ছেন না নিশ্চয়।" সুলেখার অভিযোগে স্নেহমিশ্রিত শাসনের সুর।

আমিও বোকার মতো সুলেখার কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছি। সুলেখাকে যে সব প্রশ্ন আমার করা উচিত ছিল তা বেমালুম হজম করে নিজের কথাই বলতে লাগলাম।

সুলেখার প্রশ্নের উত্তরে আমি কেমন সহজে বলে গেলাম, ইদানীং পরিশ্রম সত্যিই বেড়েছে। তার প্রধান কারণ যে বিভিন্ন ফ্ল্যাটবাসীর নাটকীয় জীবনযাত্রা এবং আদালতের আইনযুদ্ধ, তাও সুলেখাকে শুনিয়ে দিলাম। অমন যে-অমন মিসেস শকুন্তলা চাওলা তিনিও যে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে উৎপাটিতা হয়েছেন সে খবরও সুলেখাকে জানিয়ে দিয়ে আনন্দ বোধ করলাম।

"আপনার তা হলে এখন অনেক ঘর", রসিকতা করলো সুলেখা।

হিসেব করে আমি বললাম, "ঠিক বলেছেন, আমি দশখানা ফ্ল্যাট খালি করে ফেলেছি।"

"কার জন্যে?" সুলেখার রসিকতার আমেজ এখনও কাটেনি।

"কার জন্যে আবার? যাঁদের চাকরি করি তাঁদের জন্যে। এসটেট অফ লেট অর্ধচন্দ্র গুপ্ত—ম্যানেজিং ট্রাস্টি শ্রীমতী বিলাসিনী দাসী।"

"বিলাসিনীর বিলাস বাড়ানোর জন্যে আপনি কৃচ্ছ্রসাধন করছেন!" মিষ্টি সুরে কথা বললো সুলেখা।

জেরার স্রোতের সামনে পড়েছি আমি। "সহদেব নেই? ওর সঙ্গে খাবারের একটা ব্যবস্থা করে নিলেই পারেন," রাস্তায় দাঁড়িয়েই সুলেখা আমার দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

খাবার কথা সহদেব যে আমাকে বলেনি এমন নয়। কিন্তু সহদেব এখন এ-বাড়িতে নিজের অধিকারে নেই। মিসেস কিরণ খোসলার সার্ভেণ্ট হিসেবেই ওপরে থাকবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মিসেস 'খোসলার ফ্ল্যাট এখন আমাদের খাস দখলে। বেচারা সহদেব এখানে আছে, থাকুক। কিন্তু মাসিক রেটে তার সঙ্গে ভাতের ব্যবস্থা করলে, আমার সম্বন্ধে মুখরোচক গুজব রটতে বেশী সময় লাগবে না। রামসিংহাসন চৌরাশিয়া তো এই ধরনের সুযোগের জন্যেই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। তার অনন্ত সুখের পথে আমিই তো একমাত্র কাঁটা। শকুন্তলা চাওলার সিলভার ড্রাগন বন্ধ হওয়ায়

সে আর্থিক দিক দিয়ে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতোগুলো ফ্ল্যাট খালি পড়ে থাকায় হাজার হাজার টাকা পাগড়ী রোজগারের সম্ভাবনায় তার হাত নিসপিস করছে, বেয়াড়া ম্যানেজারবাবুর মতিগতি সে মোটেই বুঝে উঠতে পারছে না।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সুলেখা এবার একটু এগিয়ে গেলো। ওর ঘরের দরজা পর্যন্ত আমি যে দেখে এসেছি এবং বন্ধ দুয়ার দেখে আমি যে ভুল করেছি সে খবর সুলেখা জানতে পারলো না।

সুলেখা আমাকে নিয়েই এগিয়ে চলেছে। তার গন্তব্যস্থান যে মিস্ ওয়াইপারের ফ্ল্যাট সে সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ নেই। আমি কোনো প্রশ্ন না তুলে বোকার মতো ওর সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলছি।

সুলেখা এবার থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন?"

মন যা চায় ঈশ্বর অনেক সময় যে তা জুগিয়ে দেন, এই সহজ সত্যটুকু তো সুলেখার জানা উচিত।

সুলেখা হেসে উঠলো আমার কথায়। ও যেন আমাকে বলতে চাইছে, মন যা চায় ঈশ্বর যদি সত্যিই তা জুটিয়ে দিতেন তাহলে এ পৃথিবীতে মেয়েদের অনেক দুঃখ কমে যেতো।

সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সুলেখা বললো, "এখানেই থাকি।" তারপর হাসলো সুলেখা। সেই হাসি যেন ইঙ্গিতে আমাকে বলবার চেষ্টা করছে, 'মন না-চাইলেও আমাকে এখানে থাকতে হয়। এছাড়া আমার উপায় নেই।'

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বিনা প্রতিবাদে আমি সুলেখার পিছন পিছন ওপরে উঠে এসেছি। দরজার ফাঁক দিয়ে এখনও চটুল সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। চাবি লাগিয়ে দরজার ল্যাচ খুলে ফেললো সুলেখা। তারপর এগিয়ে গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিলো। রেডিওর আওয়াজে বোকা বনে গিয়ে আমি ধরে নিয়েছিলাম দ্বার রুদ্ধ, সুলেখা ভিতরেই আছে।

"রেডিও বন্ধ না করেই বেরিয়ে পড়েছিলেন বুঝি?" আমি সুলেখাকে বলতে চাই, অভ্যাসটা ভাল নয়।

সুলেখা জানালো, ইচ্ছে করেই সে রেডিও খুলে রেখে গিয়েছে। চোরকে বোকা বানাবার জন্যে। রেডিওর আওয়াজ শুনেই চোর বুঝবে ঘরে লোক জেগে আছে!

সুলেখার নিরাভরণ ঘরে কিছুই নেই। মানসচক্ষে আমি থ্যাকারে ম্যানসনের সেই সোফা সেট কার্পেটে মোড়া চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ছবিটা দেখে নিলাম —জেঠমালানির ওই ঘরেই কতদিন আগে সুলেখার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এই ঘরে একখানা তক্তপোশ ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই। চেয়ারের অভাবে আমাকেও ওই তক্তপোশে বসতে হলো।

সুলেখা আমার বারণ শুনলো না। কেরোসিন ঢেলে ছোট্ট এক জনতা স্টোভে জল বসিয়ে দিলো। জল গরম না-হওয়া পর্যন্ত সুলেখা নিজের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত রইলো। আমার সঙ্গে তেমন কোনো কথাই বললো না। আমাকে কোনো প্রশ্ন করে অস্বস্তিতেও ফেললো না, সুলেখা—যেন অনেক দিনের ব্যবধানে আমাদের এই দেখা নয়, আমি যেন এই ভুতুড়ে বাড়িতে সুলেখার সঙ্গে দেখা করতে প্রতি সন্ধ্যায় চলে আসি।

চায়ের কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দেবার পরে আমি লক্ষ্য করলাম সুলেখার হাতে কোনো কাপ নেই। সুলেখা বললো, "আমি এখন চা খাবো না।" কিন্তু আমার কেন জানি না সন্দেহ হলো এ ঘরে একটার বেশী কাপ নেই।

সুলেখাকে আমি এখন কোনো লজ্জায় ফেলতে চাই না। আমাদের হাতে সময় অল্প—অথচ অনেক কথা জমা আছে।

সুলেখা, তুমি জানতে চাইছো, কেমন করে তোমার ঠিকানা খুঁজে পেলাম আমি? তার জন্যে যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয় সে শ্রীমান মদনা।

"মদনা!" ওই ছেলেটিকে এ বাড়িতে আসতে দেখেছে বটে সুলেখা। মিস্ ওয়াইপারের কাছে মাঝে মাঝে মদনা কী যেন নিয়ে আসে। কিন্তু মদনা ছেলেটিতো সুবিধের নয়।

"মদনা এখন ভাল হয়ে গিয়েছে। থ্যাকারে ম্যানসনে যে সব কাজে সে জড়িয়ে পড়েছিল তার থেকে সে বেরিয়ে এসেছে।"

"তাও ভাল," স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো সুলেখা। "আমার কী রকম ভয় হয়ে গিয়েছে, একবার যে জড়িয়ে পড়ে সে আর এ-সংসারে বেরিয়ে আসতে পারে না। আমার বাবার কথাই ধরুন না। কবে কোথায় কী এক হিসেবের গোলমাল করেছিলেন—তার জন্যে জেল খেটেছেন, মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন, তবু হিসেব মেটেনি। বাবাকে দেখলেই লোকে চোরমাস্টার বলতো। দূরে গ্রামে গিয়েও শান্তি পেলেন না বাবা। আমাকে বললেন, অন্তত তুই এখান থেকে পালা। চোরমাস্টারের মেয়ে বলে তোর গায়েও ছাপ পড়ে যাবে, সে ছাপ আর উঠবে না।"

সেই কতদিন আগে ধোঁয়াটে এক সন্ধ্যায় সীমা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে থ্যাকারে ম্যানসনে হাজির হয়েছিল। দেশ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আশ্রয় সন্ধানী সীমা আবিষ্কার করেছিল মিস্টার জেঠমালানির চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট এখন তার আয়ত্তের মধ্যে নেই; সে ফ্ল্যাটের চাবি থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজারের ড্রয়ারে সুরক্ষিত রয়েছে।

সীমা সেদিন তুমি আমাকে খোলাখুলি কিছু বলোনি—কিন্তু তোমার সমস্যা বুঝে নিতে আমার দেরি হয়নি। তোমার যে আশ্রয় প্রয়োজন সেই চিন্তা মাথায় নিয়েই তোমাকে বসতে বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

মনের এই চিন্তা এবার আমার মুখ খুলে দিচ্ছে। "সেদিন একটু পরেই ফিরে এসে দেখলাম আপনি নেই। আপনাকে অনেক খুঁজেছিলাম, কিন্তু কোথাও খোঁজ পেলাম না।"

সীমার ঠোঁট দুটো অনুভূতির উষ্ণ স্রোতে থরথর করে কাঁপছে। সীমা জিজ্ঞেস করলো, "আপনি সেদিন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন?"

"আমি কী করবো তার ব্যবস্থা পাকা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এসেছিলাম। সীমাকে আমি কোথায় না খুঁজেছি? তেলকালিবাবুর ঘরেও ছুটে গিয়েছিলাম আমি, শুনলাম সেখানে একবার দেখা দিয়ে আপনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।"

সীমা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সীমা বিশ্বাসই করতে চায় না, ওর আশ্রয় খোঁজবার জন্যেই হঠাৎ আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম।

সীমা এবার কান্নায় ফেটে পড়লো। চোখের জলকে বাধা না দিয়েই সীমা হঠাৎ অভিযোগের সুরে বললো, "সেদিন আমাকে একটু ইঙ্গিত দিলেন না কেন? আপনার মুখ দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মনে হলো, সুলেখার সঙ্গকে আপনি ভয় পান। মিষ্টিমুখে কোনো রকমে সুলেখাকে বিদায় না করলে আপনি গোলমালে জড়িয়ে পড়বেন।"

সীমা! অভিমানিনী সীমা, আমাকে না বুঝেই সে রাত্রে আমাকে হাঙ্গামার হাত থেকে মুক্ত রাখবার জন্যেই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে এসেছিল।

নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। মনের মধ্যে যা অনুভব করি, মুখের ভাষায় তা প্রকাশ করতে আমার এতো দ্বিধা কেন? আমার বিষণ্ণ মন বিনা প্রতিবাদে আমার তিরস্কার গ্রহণ করছে। সীমা যে সেদিন সুলেখাকে চির বিদায় দিয়ে সীমা স্বর্গের ইন্দ্রাণীরূপেই আশ্রয়ভিখারিণী হয়েছিল তা বুঝবার মতো দূরদৃষ্টি সেদিন আমার কেন হলো না?

অভিমানিনী সীমা, সেদিন লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলে আমাকে। সেদিন কেন আরও কয়েক মিনিট সময় আমাকে মঞ্জুর করলে না?

সীমা বললো, "বাবা তো কিছুই জানতেন না। জানতে চাইলেন, তোর চাকরিটা এখনও আছে? বাবাকে বললাম, অনেক দিন এখানে পড়ে আছি, বোধ হয় নেই। বাবা তখন আপনার কথাই বললেন। তোর ওই বান্ধবীর ভাই, যেখানে রাত কাটিয়ে এলাম—ছেলেটিকে খুব ভাল মনে হলো।' বাবাকে বললাম, কলকাতার ছেলেরা ভাল হয় না বাবা। বাবা বিশ্বাস করলেন না, বললেন, আমার সঙ্গে মজা করিস না। তুই ওই ছেলেটির কাছে যা, ওর পরামর্শ মতো চল।"

পরামর্শ! আমার পরামর্শ মতো জীবনে চলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ধূসর সন্ধ্যায় যে সীমা লজ্জাবনত মস্তকে এসেছিল ; আমার চাপা স্বভাবই তাকে অজানা অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আমার পরামর্শ তো অতি সহজ ছিলঃ সুলেখাকে বিদায় জানাও—তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সীমা তোমার আপন ঐশ্বর্যে নবজীবনের সূত্রপাত করো।

কিন্তু কী যে হলো! "সীমা, সেদিন আপনার সন্ধানে আমি ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের অন্ধকার পথেও নেমে এসেছিলাম। রিকশাওয়ালাদেরও জিজ্ঞেস করেছি আমি, সুলেখা দিদিমণিকে তারা দেখেছে কিনা। কিন্তু কোথায় সীমা? সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।"

'সীমা সে রাত্রে কোথায় ছিল?' আমার জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আশ্রয়হীন পরিচয়হীন সঙ্গতিহীন সুলেখাদের জন্যে এই অরণ্যনগরীতে রাতের কী অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে থাকতে পারে তা কল্পনা করে আমি শিউরে উঠলাম। প্রশ্ন করবার সাহস উধাও হয়ে গেলো। হে ঈশ্বর, রত্ন-মালায় উদ্ভাসিত এই ঐশ্বর্যময়ী নগরীতে এতো গৃহ, এতো প্রাসাদ, কিন্তু কোথাও অসহায়া রমণীর রাতের আশ্রয় নেই। এখানে বহু তারকাখচিত হোটেল আছে, শ্বেত প্রস্তরে বাঁধানো শত কক্ষের উপাসনাগার আছে, রঙীন মখমলে মোড়া সরকারী বেসরকারী অতিথিশালা আছে, কিন্তু নিরাশ্রয়া নারীর জন্য এক বিন্দু স্থান নেই। হে ঈশ্বর, তোমার রহস্যময় খেয়ালে যদি কোনোদিন আমি খ্যাতিমান ধনবান হই, তাহলে আমি এক অবারিত-

স্বার গৃহ নির্মাণ করব, কোনো নিরাশ্রিতাকে আমি অরণ্যের অজানা অন্ধকারে ঠেলে দেবো না।

সীমা আবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। সীমা বললো, "আপনাদের ওই মিস্টার ভরত সিং, ওঁর সঙ্গে সে রাত্রে থ্যাকারে ম্যানসান থেকে বেরোতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। ভরত সিং আমাকে ওয়ার্ম ইনভিটেশন জানিয়েছিলেন, তাঁর বরুণা প্রপার্টির্জের গেস্ট হাউসে আসতে। কিন্তু......" আমি লক্ষ্য করলাম সীমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুচ্ছে না।

সে রাত্রে সীমা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে ব্যর্থ হয়েছে! ভরত সিং-এর বরুণা প্রপার্টির্জ যতই সুখের হোক সেখানে যেতে চায়নি সীমা।

অনন্যোপায় সীমা শেষ পর্যন্ত ছুটেছিল হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। কাল্পনিক এক পেটের যন্ত্রণার বিবরণ সে রাত্রে তাকে ফ্রি-বেড জুটিয়ে দিয়েছিল। বিনামূল্যে এমন অভিনব অথচ নিরাপদ রাত্রিবাসের কথা এর আগে আমি শুনিনি।

বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধিও অনেক সময় হয়তো এমনিভাবেই খুলে যায়। উত্তেজিত সীমা এখন হাঁপাচ্ছে। মাত্র একটি রাতের নিরাপত্তার বর্ণনা দিয়েছে সে, কিন্তু বারো ঘণ্টা পরে আবার রাত্রি নেমে আসে এই কলকাতা শহরে; এবং অনেক রাত্রির অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে সীমা আজ আমার মুখোমুখি হয়েছে।

সেই সব অগণিত রাত্রির কুটিল ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত কে টিঁকে রয়েছে? সীমা না সুলেখা? কিন্তু সে খবর জানবার কী অধিকার আমার আছে? সীমা তো এই মুহূর্তে আমাকে বলতে পারে, অনেক হয়েছে, এবার আপনি বিদায় নিন।

সীমা না সুলেখা? কার দিকে তাকিয়ে আছি আমি? প্রাচুর্যের কোনো ইঙ্গিত নেই এই প্রাচীন পুরীতে। কিন্তু এই শহরের সুলেখারাও ধাপে ধাপে এই পর্যায়ে নেমে সর্বনাশের অতল অন্ধকারে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়।

সীমা, ঘরের দেওয়ালে আমার মাথা খুঁটতে ইচ্ছে করছে। সেদিন কেন তুমি ওইভাবে আমার মনের কথা না জেনে অভিমানে বিদায় নিলে?

অভিমান নয়। সীমা বলছে, আমাকে সে কোনো রকম দ্বিধার মধ্যে ফেলতে চায়নি। সীমা চেয়েছে, আমি যেন এগিয়ে যাই—সংসারের দুর্গম দুরন্ত পথে আমি যেন বিজয়ীর মতো অগ্রসর হই; দুঃখ রজনীর শেষে সাফল্যের সূর্য যেন আমার কপালে জয়টীকা এঁকে দেয়।

কী আশ্চর্য বিশ্বাসের সঙ্গে সীমা অথবা সুলেখা কথা বলে চলেছে। সাফল্যহীন এই সংসারে আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার মতো একজন

রমণী তা হলে আজও বেঁচে আছে।

সীমা/সুলেখা, তোমরা দু'জনে আমাকে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছো। আমি সুলেখার খবর নেবার জন্যে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বেরিয়ে সদর স্ট্রীটের স্রোত ঠেলে এই একচক্ষু গলিতে উপস্থিত হইনি। সুলেখাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে জগদীশ জেঠমালানি ও ভরত সিংরা তো সর্বদা রয়েছেন। আমি খুঁজছি সীমাকে, সেই ছোট্ট মেয়েটিকে, যার ভাল বিয়ে দেবার টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে পোস্টাপিসের তহবিল তছরুপের দায়ে বাবা জেলে গেলেন, জেল থেকে বেরিয়ে যে মেয়ের সঙ্গে আমার চোখের সামনে তিনি পুনর্মিলিত হলেন, যে-মেয়েকে সুখী দেখবার জন্যে বাবার চোখে ঘুম নেই।

সীমা বললো, "অনেক ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই মিস্ ওয়াইপারের কাছে এসেছি। ভাগ্যে এখানে এসেছিলাম!"

এই হাওয়া-বাতাসহীন অন্ধকার ভাঙা ঘরে আশ্রয় পাবার মধ্যে সৌভাগ্যের কী থাকতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছি না। সীমা কিন্তু কিছুই চেপে রাখলো না। সরলভাবেই বললো, "মিস্ ওয়াইপারকে খাবার দিতে এসে মদনা আমাকে দেখলো, তারপর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলো।"

আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও কারো জীবনে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে পারে। আমার মনের মধ্যে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দীপশিখা জ্বালিয়ে দিচ্ছে সীমা।

আমি এবার মিস্ ওয়াইপারের খবর নেওয়া শুরু করেছি। যথাসর্বস্ব হারিয়ে মিস্ ওয়াইপার এখন ঘর ভাড়া দিতে শুরু করেছেন। বাড়িটা অবশ্যই মিস্ ওয়াইপারের নয়—তাঁরও বাড়িওয়ালা আছে: তাঁর সঙ্গে ভদ্রমহিলার কী ব্যবস্থা সুলেখা জানে না। তবে মনে হয়, অনেকদিনের ভাড়া জমা পড়েনি। এদিকে খিদের জ্বালায় লজ্জার মাথা খেয়ে মিস্ ওয়াইপার নিজের ঘরখানাও কয়েক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

এই অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের তুলনায় আমাদের থ্যাকারে ম্যানসন এখন তো স্বর্গলোক। সুলেখা সম্বন্ধে আমার এখনও অনেক কিছু জানবার আছে। মধ্যিখানের দিনগুলো কী হলো? এখনও তার চলে কীভাবে? এ সব প্রশ্নের উত্তর চাই আমার—সুলেখা কত দূর নেমেছে তা অবশ্যই আমাকে জানতে হবে। কিন্তু এ সব প্রশ্ন এই সন্ধ্যায় কীভাবে তুলবো?

সুলেখা কিন্তু তার সেই মধুর স্বভাব এখনও হারায়নি। আমার সম্বন্ধে তার চিন্তা যেন বেশী। সুলেখা বললো, "থ্যাকারে ম্যানসনের খবর সব বলুন। কলকালি, তেলকালিবাবু এঁরা সব কেমন আছেন?"

"তেলকালিবাবুর সেই যথাপূর্বম্ তথাপরম। যত রাজ্যের যন্ত্রপাতিতে তেল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কলকাতায় এখন কত নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে। কত জায়গা থেকে লোভনীয় চাকরির সুযোগ এসেছে। ওঁর গুণের তুলনায় এখানে আর ক'টাকা মাইনে পান? কিন্তু থ্যাকারে ম্যানসন ছেড়ে কোথাও তেলকালিবাবুকে কল্পনা করা যায় না। অদ্ভূত লোক এই তেল-কালিবাবু। গতকাল আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন, 'হঠাৎ যদি মারা যাই, তাহলে আমার যথাসর্বস্ব বেচে এই থ্যাকারে ম্যানসনের সবাইকে স্পেশাল ভোজ দিয়ে দেবেন—মাছ মাংস ডিম কোনোটাই যেন বাদ না যায়। আর আমার

টেবিলে রাখা ভিক্টোরিয়া আমলের পিতলের চাবি-তালাটা অনুগ্রহ করে নিজের হাতে কফিনের মধ্যে দিয়ে দেবেন। এই তালাটা আমার নিজস্ব, আমার ঠাকুর্দা ঘরে এই তালাচাবি লাগিয়ে আমার বিধর্মী বাবাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিলেন, তারপর মৃত্যুকালে বাবাকে এই তালাচাবি উপহার পাঠিয়েছিলেন।"

সুলেখার অগাধ শ্রদ্ধা তেলকালিবাবুর ওপর। বললো, "ও রকম মানুষ হয় না। ওঁকে একটু দেখবেন, ওঁর কথা শুনে চলবেন।"

কলকালির শুভবিবাহের কথাও বলতে হলো। ওর মনের ভিতর যে এতো রং ছিল তা কে জানতো? সুলেখার মুখটা মুহূর্তের জন্য লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

আরও অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলোচনা হলো। নিজেকে কেমন সহজে মুছে ফেলে দিয়ে সুলেখা আমাদের থ্যাকারে ম্যানসনের খবরাখবর নিচ্ছে। সুলেখা যেন আমাদের কত আপনজন। সুলেখার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে বললাম, "থ্যাকারে ম্যানসনে সুখের দিন আগতপ্রায়। অনেকগুলো ফ্ল্যাট এক সঙ্গে খালি হয়েছে। নতুন যুগের মানুষদের ওখানে ভাড়াটে হিসেবে বসাবো। কলকাতার অফিসপাড়া ঠেলতে ঠেলতে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাবছি, বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে কোনো অফিসকে এখানে নিয়ে আসবো। বিলাসিনী দেবীর অনেক সুবিধে হবে - ভাড়ার অঙ্ক দশগুণ বেড়ে যাবে ; আগাম টাকা খরচ করে ঘরদোর সারিয়ে নিতেও অফিস দ্বিধা করবে না। থ্যাকারে ম্যানসনে নতুন এক যুগ শুরু হয়ে যাবে।"

'আপনার সুখের দিন তাহলে আগত," সুলেখা সরল মনেই আনন্দ প্রকাশ করলো।

"আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। এতো সহজে কলকাতার কোনো বাড়ি রাহুমুক্ত হয়নি। আমি এখন স্বপ্ন দেখছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, থ্যাকারে ম্যানসন তার অকালবার্ধক্য এড়িয়ে নতুন রঙে ঝকঝক করছে : রামসিংহাসনের রামরাজত্বের অবসানে নিয়মের রাজত্ব চালু হয়েছে ডেভিড এ্যালকাট মার্টিন সায়েবের বাড়িতে।"

"আপনার তখন কোনো সাধ অপূর্ণ থাকবে না," সুলেখা হঠাৎ বলে ফেললো।

কথাটা আচমকা বলেই সে লজ্জাবতী লতার মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলো। ওর মুখের রং গোলাপী হয়ে উঠছে মনে হলো।

আমার মনের মধ্যেও এবার বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। আমার আর কোন্ সাধ অপূর্ণ আছে তা খুঁজে বার করবার জন্যে মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। স্মৃতির সতর্ক প্রহরীরা যেন ওপর মহলের জরুরী আদেশে বিদ্যুৎগতিতে মনের সর্বত্র সন্ধান শুরু করেছে। আমার কী আর অপূর্ণ সাধ থাকতে পারে? একটি ইচ্ছাই তো কোহিনূর হীরকখণ্ডের মতো কোনো সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠহারে সংলগ্ন হবার জন্য নির্জন অন্ধকারে নিস্তব্ধ প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুনে চলেছে। সীমার মুখের দিকে তাকাচ্ছি আমি। সীমা, তুমি কী এই হীরকখণ্ডের কথা জানো না?

মুখ খুলতে যাচ্ছি। কিন্তু এমন সময় দরজায় একটু জোরে টোকা পড়লো। সীমার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে ধাবিত হলো। তারপর বোধ

হয় হাঙ্গামা বিদায়ের জন্যেই সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। দরজা খোলামাত্রই মিস্ ওয়াইপার মুখ বাড়িয়ে দিলেন। "কংগ্রাচুলেশন, ইয়ং লেডি," মিস্ ওয়াইপার কেন সীমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন? ভদ্রমহিলা বোধ হয় ঘরের কোণে আমার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নি।

মিস্ ওয়াইপার বললেন, "হোয়াট এ বিউটিফুল কার!" ওঁর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

"কে?" সীমা একটু অধৈর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলো। "সেই লোকটা নাকি?"

ওয়াকিবহাল মিস্ ওয়াইপার বললেন, "না, মিস্টার ভরত সিং নন—ওঁকে তো আমি চিনি।"

সুলেখা যে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে তা যে-কেউ বলতে পারে। তার গলা থেকে কয়েকটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো যা দূর থেকে আমার বোধগম্য হলো না।

মিস্ ওয়াইপার বললেন, "না, এবার ইমপোর্টেড জার্মান গাড়ি এসেছে ফ্রম মিস্টার জেঠমালানি।"

জেঠমালানি! নামটা আমার কানে পেঁছানো মাত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মনের সমস্ত আলো অকস্মাৎ নিবে গেলো। নিশ্চিদ্র অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন সর্বনাশা খনি গহ্বরের অতলে অসহায় ভাবে নেমে যাচ্ছি। জেঠমালানি... জেঠমালানি তুমি এখানে কেন? আমি তারস্বরে প্রশ্ন করতে চাইলাম, কিন্তু বিষাক্ত অন্ধকার যেন আমার স্বরনালিকেও চেপে ধরেছে।

সীমার মুখের দিকে তাকালাম আমি। না, এতো সীমা নয়, আমি তো সুলেখা সেনের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছি! সদর স্ট্রীট, টোটী লেনের এই অপরিচ্ছন্ন পল্লীতে সীমাদের কে কবে খুঁজে পেয়েছে? সীমাকে এখানে পাওয়া যায় না, ওরে মূর্খ মন আমার।

সুলেখা! সে এখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে আমার মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে, কিন্তু পরবর্তী সংলাপের সূত্র খুঁজে না পেয়ে বিচলিত হয়ে উঠছে।

সুলেখা সেন, তুমি ওইভাবে আমার দিকে তাকিও না। মিস্টার জেঠমালানির ইমপোর্টেড জার্মান গাড়ি এবং থ্যাকারে ম্যানসনের শংকরবাবুর একই সময়ে উপস্থিতিতে তোমার বিব্রত হবার প্রয়োজন নেই।

সুলেখা এখনও বোধ হয় আমার প্রতি সৌজন্য বজায় রাখতে চায়। আঁখি পদ্ম বিকশিত করে সে বললো, "প্লিজ, একটু অপেক্ষা করুন।"

সুলেখা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে পায়ে চটি গলিয়ে নিলো। কাঠের সিঁড়িতে আমি সুলেখার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

পদধ্বনির প্রতিধ্বনি এবার আমায় ব্যঙ্গ করছে। মিস্ ওয়াইপার আবার উঁকি মেরে আমায় দেখলেন। তাঁর মুখে ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, "সুলেখাকে আমি হিংসে করতে পারছি না। পুওর গার্ল। এক প্ল্যাটফরমে দুখানা ট্রেন একসঙ্গে রিসিভ করা যায় না!"

আমার নিশ্বাস জুন মাসের হাওয়ার মতো তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমি দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। রাম অবতারের ইস্ত্রি ঘরের কাছে ইমপোর্টেড গাড়িখানা তখনও সমস্ত পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির কাঁচের জানলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুলেখা ভিতরের অধিষ্ঠাতা দেবতাটিকে

কিছু নিবেদন করছিল। অকস্মাৎ আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সুলেখা সজাগ হয়ে উঠলো। মুহূর্তের জন্য বাক্যালাপ বন্ধ করে সে পিছিয়ে এলো। তারপর আমার কাছে মিনতি করলো, "আপনি যাবেন না, শংকরবাবু।"

এখন থাকার সময় নয়। আমার অসহিষ্ণু দেহ এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার ফার্নেসে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সুলেখা কী বুঝলো কে জানে! সে আবার বললো, "আপনি থাকুন—কথা আছে।"

আমারও তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কথা জমেছিল সীমার জন্য। কিন্তু জেঠমালানির এই সান্ধ্য উপস্থিতি তো সব কথার ইতি টেনে দিয়েছে। আমার সমস্ত শরীর গাড়ির লোকটাকে দেখে রী রী করছে।

সুলেখা কিন্তু গাড়ির দিকে ফিরে যায়নি, কোন ল্যাম্পপোস্টকে সাক্ষী রেখে সে এখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আজ নয়, শীঘ্র আবার দেখা হবে," এই বলে এবার আমি গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছি। ক্ষীণ দুর্বল নারীকণ্ঠের মিনতি যেন আমাকে অনুসরণ করতে চাইছে, কিন্তু মিস্ ওয়াইপারের ব্যঙ্গোক্তি আমার দেহে অ্যাসিডের মতো ছড়িয়ে দিয়েছে—একই প্ল্যাটফর্মে একাধিক ট্রেন একসঙ্গে দাঁড়ায় না।

আমার দেহ জ্বলছে। এই অবস্থায় আমি ইমপোর্টেড গাড়ির দেবতাটিকে দেখে নিয়েছি। মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি নন। কিন্তু নিশ্চয় তাঁর কোনো স্পেশাল গেস্ট, অথবা বিশ্বস্ত কর্মচারি! লোকটি আমার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—অকুস্থলে আমার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি বোধ হয় এই মান্যবরকে বিরক্ত করেছে।

জগদীশ জেঠমালানি, তোমার মানিব্যাগে অনেক টাকা, সমাজে অনেক প্রতিপত্তি, উচ্চমহলে অনেক ধরাধরি থাকতে পারে, কিন্তু আমি তোমাকে তোয়াক্কা করবো কেন? তোমার সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই।

আলো-আঁধারের সর্পিল পথ ধরে আমি ফিরে চলেছি থ্যাকারে ম্যানসনে। সীমা, এতোদিন পরে তোমাকে এই ভাবে খুঁজে না-পেলেই আমার ভাল হতো। হে ঈশ্বর, আজ আমি পরাজিত, অপমানিত—আমার শেষ স্বপ্নটুকুও চোখের সামনে ছিন্নভিন্ন হয়েছে।

ইমপোর্টেড গাড়ির হেডলাইট এবার আমার ওপর এসে পড়লো। শত্রু-সন্ধানী সৈন্যবাহিনীর সজাগ প্রহরী যেন সার্চলাইটের আলো জ্বালিয়ে অনুপ্রবেশকারীকে শিকারী কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে একটু পাশে সরে যেতেই ড্রাইভার এবং গাড়ির ভি আই পি আমাকে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন।

এই সন্ধানী দৃষ্টি অন্য সময় আমার বিরক্তির কারণ হতো। কিন্তু আজ আমি কোনো প্রতিবাদ করবো না। পৃথিবীর সব মানুষ এখানে এসে আমার পরাজয়ের শেষ পর্ব স্বচক্ষে দেখুন। সংসারে সীমা বলে কেউ রইলো না; সুলেখাই শেষ পর্যন্ত চার্নক সায়েবের এই শহরে টিকে রইলো। ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদের এই নগরীতে সুলেখাদেরই সম্ভাবনা আছে, তা বুঝতে পেরে সীমারা কত সহজে সুলেখা হয়ে যায়।

থ্যাকারে ম্যানসনে রাতের দ্বাররক্ষী আমাকে একটা স্যালুট উপহার দিয়েছিল। লজ্জায় অপমানে আমার মাথা নত হয়ে রয়েছে। কাকে তুমি সম্মান জানাচ্ছো অজগর সিং? সংসারের সমরাঙ্গণে বারবার পরাজিত মানুষদের

স্যালুট প্রাপ্য নয়।

দূরে থেকে রামসিংহাসনও আমাকে লক্ষ্য করলো। সে এমনভাবে তাকাচ্ছে যে মনে হচ্ছে, রামসিংহাসনের সন্দেহ ম্যানেজারবাবু আজ দারুপান করে মাতোয়ারা হয়েছেন।

আজ আমার চোখে ঘুম নেই। নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে বারবার মাথা খুঁড়েও কৃপালাভ বঞ্চিত হলাম আমি। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতেও মন চায় না। অশান্ত আমি সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছি। ডেভিড ক্যালকাটা মার্টিনের অভিশপ্ত পুরীতে এই মুহূর্তে কেউ জেগে নেই। শুধু আমার বুকের ভিতরটা দুরারোগ্য যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠছে।

ঐশ্বর্যময়ী এই ভুবনে জন্মগ্রহণ করেও আমি তো কখনও কিছু চাইতে সাহস করি নি, আমি তো নতমস্তকে স্রষ্টার সকল ইচ্ছার কাছে নত স্বীকার করেছি, জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার আসনটি খুঁজে নেবার সাহস পর্যন্ত হয়নি, তবু আজ আমার এই হাহাকার কেন?

সুনীল আকাশের সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলী, আপনারা অন্তত আমার কথা শ্রবণ করুন। সীমার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। মহান স্রষ্টার এই সংসারে সীমারা কেন বিজয়িনী হয় না? সীমাকে মুক্ত করবার জন্যেই তো আমি ছুটে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সুলেখাকে বিসর্জন দিয়ে সে নির্মল জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু জেঠমালানির ইমপোর্টেড গাড়িখানা আমার বুকের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সুলেখাকে পিছনে ফেলে আমি চলে এসেছি। সুলেখা আমাকে পিছন থেকে ডেকেছিল বটে, কিন্তু জেঠমালানির সঙ্গে তার যোগাযোগ যখন অক্ষুণ্ণ তখন আমার উপস্থিতির কোনো অর্থ হয় না। সুলেখার কথা স্মরণ করলেই অপমানে, ব্যর্থতায়, ঘৃণায় সমস্ত দেহ জ্বলতে শুরু করছে।

"স্যার আপনি এখানে এতো রাত্রে?" সহদেব ভোর রাতে আমাকে হঠাৎ আবিষ্কার করলো।

"শরীর খারাপ নাকি স্যার?" সহদেব আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি ঘুমোওনি?" সহদেবকে আমি প্রশ্ন করি।

"এই সময়েই তো রোজ উঠি আমি। না-হলে চানাচুরের কাঠি, ডাল, বাদাম, কুচো নিমকি ভাজা কখন শেষ করবো? সকাল ছ'টার মধ্যে সহদেবের প্যাকেট রেডি স্যার।"

সহদেব আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখলো। "না, জ্বর তো হয়নি। তবু আপনি বিছানায় শুয়ে থাকুন। অনেক সময় ভিতরটা গরম হয়, অথচ বাইরে কিছু বোঝা যায় না।"

সহদেব আমার সঙ্গে ঘর পর্যন্ত এলো। সহদেবকে বলতে ইচ্ছে করছে, তুমি ঠিকই বলেছো—বাইরেটা কেমন শান্ত, অথচ ভিতরে একটা ফার্নেস জ্বলছে।

সহদেব জিজ্ঞেস করলো, "কাল সন্ধ্যেবেলায় আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? অনেকে আপনাকে খোঁজ করতে এসেছিলেন। ডে অ্যান্ড নাইট হোটেলের ওই ভরত সিং সায়েব, তেলকালিবাবু এবং আরও অনেকে আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনি বেরিয়েছেন শুনে তেলকালিবাবু তো অবাক—কারণ আপনি তো ওসময় বড় একটা বেরোন না। নিশ্চয় খুব জরুরী কোনো দরকার পড়ে গিয়েছিল। দরকার মিটেছে তো স্যার?" সহদেব কেমন সরল

মনে আমাকে জিজ্ঞেস করছে।

কোনো কোনো অভাগার দরকার কখনও মেটে না, এই সহজ সত্যটুকু সহদেবকে বোঝাবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন ঘুমের কোলে শুয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই।

এই প্রসন্ন ভোরবেলায় ঘুমের দেবী আমার ওপর অবশেষে সুপ্রসন্না হলেন। ইঁট কাঠ কংক্রিটের ক্লেদাক্ত জঙ্গলকে পিছনে ফেলে রেখে আমি ভেসে চললাম স্নিগ্ধ মুক্তির আলোকিত পথে।

স্বপ্নের মধ্যেই নিদ্রার দেবী আমাকে আশার-সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করলেন। ক্লান্ত পথিক, দুঃখরাত্রির অবসান হয়েছে, এবার তুমি ওঠো, জাগো। তোমার দুঃখ কীসের? এই প্রথম তুমি কর্মজীবনে বিজয়ী হয়েছো. তোমার প্রতিষ্ঠা এখন সুনিশ্চিত। বিভূতিদার হাত ধরে, হাওড়া কাসুন্দিয়ার গলি থেকে ভাগ্যহত যে কিশোর একদিন জীবিকাসন্ধানে সায়েব ব্যারিস্টারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল, নগরের অগণিত রাজপথ জনপথ পেরিয়ে অসংখ্য ব্যর্থতা হতাশার বাধা ডিঙিয়ে অনেক অপরিচিতজনের করুণায় ধন্য হয়ে অবশেষে সে সাফল্যের আলোকিত আশ্রয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। থ্যাকারে ম্যানসনকে সে রাহুমুক্ত করেছে, অনেকগুণ উপার্জন বাড়িয়ে, নতুন নাগরিকদের বসতি স্থাপন করে এখানে নতুন যুগের সূচনা করবে সে। শংকর-এর দুঃখরাত্রির অবসান আসন্ন--এখানেই শুরু হবে চিন্তাহীন এক নবজীবন।

কর্মজীবনে আমার আর কোনো দুঃখ নেই। অবশেষে আমি সাফল্যের আশীর্বাদ লাভ করতে চলেছি। শুধু ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গতম কোণটি কার অশরীরী উপস্থিতিতে রহস্যময় হয়ে উঠছে। কে তুমি? সীমা? - না, তোমাকে তো সুলেখা বলে স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে। সুলেখা, প্লিজ, তুমি দূরে সরে যাও, আমি একটু একলা থাকতে চাই। তোমাকে সদর লেনের বাড়িতে রেখে আমি তো বিনা প্রতিবাদে চলে এসেছি। আমি তো তোমাকে তিরস্কারও জানাইনি, তবু কেন এইভাবে আমার নিদ্রার বিঘ্ন ঘটাতে এসেছো তুমি? সুলেখা, তুমি দূরে সরে যাও, অনেক দূরে। আমি তোমাকে ভুলতে চাই, সুলেখা।

"ঘুমের ঘোরে কীসব বিড়বিড় করছেন? স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?" তেলকালিবাবু আমাকে বেশ লজ্জায় ফেলে দিলেন।

তেলকালিবাবুই এখন আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন। সূর্য ইতিমধ্যে শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে পা দিয়েছে। আমি ধড়মড় করে উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম অন্তত দু ঘণ্টা আগে আমার উঠে পড়া উচিত ছিল।

ঘুমনোর জন্য লজ্জা নেই, কিন্তু তেলকালিবাবু আমার মুখ দিয়ে কী শুনেছেন কে জানে! তেলকালিবাবু আমাকে শান্ত করলেন। স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন. "সুলেখা দিদিমণির কথা আমিই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি, আর আপনি ওঁর জন্যে চিন্তা করবেন এ আর কী আশ্চর্য কথা? দিদিমণি সেই যে হঠাৎ দেখা দিয়ে কোথায় চলে গেলো, আর খবর দিলো না! ভেবে-ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাই না। বড় লক্ষ্মীময়ী মেয়ে ছিল আমাদের সুলেখা দিদিমণি।"

আমি চুপ করে রইলাম--জাগ্রত অবস্থায় আর লজ্জায় পড়তে চাই না।

তেলকালিবাবু বললেন, "আই অ্যাম ভেরি স্যরি, স্যার। আপনার কাঁচা

ঘুম আমি কিছুতেই ভাঙাতাম না। কিন্তু আর দেরি করতে সাহস পেলাম না। তার ওপর সহদেবের কাছে এইমাত্র শুনলাম আপনার শরীরও খারাপ, অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে ঘুরে বেড়িয়েছেন।”

আমি এখনও নীরব। তেলকালিবাবু সস্নেহে বললেন, “ঘুমকে অবহেলা করবেন না, স্যার। আমার ওয়াইফ যাবার সময় আমার ঘুম কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। ঘুমের অভাবে আমি এক একদিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াই—আমার অতিবড় শত্রুরও যেন এই রোগ না হয়।”

তেলকালিবাবুর চোখ দুটো অবশ্যই লাল হয়ে আছে। কিন্তু নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে তিনি বললেন, “কথাগুলো না-বলা পর্যন্ত আমি ছটফট করছি, স্যার। আপনার ঘুম ভাঙাবার রিস্কও নিয়ে নিলাম।”

কী এমন জরুরি খবর? আমি বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসলাম।

তেলকালিবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, “আপনাকে খবর না-দেওয়াটা মহাপাপ হবে, তাই ছুটে এলাম।”

কী খবর হতে পারে আন্দাজ করতে পারছি না। সুলেখার ব্যাপারটা তেলকালিবাবুর জানা হয়ে গেল নাকি? ক্ষণেকের দুর্বলতায় আমি নিজের সীমানা অতিক্রম করে ভুল করিনি।

সীমানা অতিক্রম করে ভাল করিনি।

তেলকালিবাবু এবার নিচু গলায় বললেন, “ঐ মিস্টার ভরত সিং, যিনি আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসেন।”

“হ্যাঁ, শুনলাম গতকালও খোঁজ করতে এসেছিলেন। অনেক ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে ফ্রেন্ডলি পরামর্শ করি—খুব পরোপকারী ভদ্রলোক,” আমি নির্দ্বিধায় আমার মতামত জানিয়ে দিই।

“ফ্রেন্ডই বটে!” তেলকালিবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। “টাকার নেশা থাকলে বিশ্বসংসারে কখনও ফ্রেন্ডলি হাওয়া যায় না, মিস্টার শংকর!”

তেলকালিবাবু বললেন, “আপনার কাছে সদাশয় বন্ধু সেজে রয়েছেন, আপনাকে হাজার রকম ফ্রেন্ডলি পরামর্শের নামে ভিতরের খবরাখবর জোগাড় করছেন, আপনাকে শিখণ্ডী করে একের পর এক ভাড়াটিয়া বিদায় করছেন, আর তলে-তলে চন্দ্রোদয় ভবনে বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করে এই থ্যাকারে ম্যানসন কিনে নেবার চেষ্টা করছেন!”

আমি চমকে উঠে তেলকালিবাবুর দিকে তাকালাম। ভরত সিং কখনও তো এ-ব্যাপারে আমার কাছে মুখ খোলেন নি।

তেলকালিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, “বিলাসিনী দেবীর বড়ই দুর্দিন। মেয়েটা কথা শোনেনি। বিপুলভূষণ বারিকের সঙ্গেই পমা শেষ পর্যন্ত কাশীতে পালিয়েছে।”

“মেয়ে যখন চাইছে তখন মেনে নিলেই হয়,” আমি পমার দিকটাও বিবেচনার চেষ্টা করি।

“কী বলছেন, স্যার?” তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তেলকালিবাবু। “প্রাণ চাইলেই কী সব কিছু করা যায় এই সংসারে? ওই বিপুলভূষণ বারিক। এখন খবর পাওয়া গিয়েছে লোকটার একটা বিয়েও আছে—ফার্স্ট ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার না করেই সেকেন্ড ইনিংসে খেলতে নেমেছে। মনের দুঃখে বিলাসিনী দেবীর পাগলের মতো অবস্থা। আর সেই সুযোগে আপনার ওই ভরত সিং স্পেশাল জ্যোতিষী পাঠিয়ে ওঁকে বুঝিয়েছে বিলাসিনী

দেবীর সব অশান্তির মূলে এই থ্যাকারে ম্যানসন। বাস্তুপূজায় অনাচার হওয়ায় বাস্তুদেবতারা এই বাড়ির আদি থেকে কুপিত—যিনিই এ-বাড়ির মালিক হয়েছেন—তিনিই একের পর এক অভিশাপের বলি হয়েছেন।"

খবরটা শুনে আমি স্বম্ভিত। কারণ বরুণা প্রপার্টিজের রেসিডেন্ট ডিরেকটর ভরত সিং। আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময় বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দেন নি।

তেলকালিবাবু বললেন, "আপনি ভাবতে পারেন, বাড়ির মালিক যে-ই হোক তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তাছাড়া ভরত সিং-এর সঙ্গে আপনার স্পেশাল সম্পর্ক আছে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ হবে না, স্যার। আমাকে সোর্স জিজ্ঞেস করবেন না—কিন্তু ভিতরের খবর শুনে রাখুন, বিলাসিনী দেবীর কাছ থেকে জলের দামে কিনতে পারলে এই থ্যাকারে ম্যানসন বলে আর কিছু থাকবে না। বিক্রিওয়ালা ডেকে ইট-কাঠ-পাথর ভেঙে ভেঙে বিক্রি করে দেবে আপনাদের ভরত সিং, তারপর হয়তো আকাশ-ছোঁয়া কোনো দেশলাই বাক্স উঠবে এই জমিতে। দেখেননি সাহেবপাড়ার নতুন নতুন বাড়িগুলো, তাকালে আমার গা রি-রি করে ওঠে।"

এখন কী কর্তব্য? তেলকালিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ হলো অনেক। তিনি বললেন, "বাধা দিন, স্যার। বিলাসিনী দেবীর কীসের দুঃখ? বাড়িটা রাখলে অনেক লাভ হবে ওঁর। প্রয়োজন হলে ভাল বামুন নিয়ে যান, ওঁর কথা মতো স্পেশাল স্বস্ত্যয়ন করিয়ে নিন। একেবারে হাত গুটিয়ে নেবেন না, স্যার। এ-বাড়িতে বহুলোকের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, এক কথায় একে ভাঙা চলবে না।"

সারাদিন বৃথা ঘুরে বেড়ালাম আমি। খালি ফ্ল্যাটগুলোর জন্যে নামকরা কোম্পানি থেকে লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে। আগাম টাকা ছাড়াও, নিজের খরচে তাঁরা থ্যাকারে ম্যানসনকে নতুন রঙে সাজিয়ে নেবেন। নতুন লিফট বসবে, নতুন পাম্পে গভীর টিউবওয়েল থেকে জল উঠবে। বিলাসিনী দেবীর যে কোনো শর্ত বিবেচনা করতে রাজী আছেন তাঁরা।

কিন্তু কোথায় বিলাসিনী দেবী? চন্দ্রোদয় ভবনে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো না। ভোরবেলায় কোন্ এক হস্ত-রেখাবিদের সন্ধানে তিনি চলে গিয়েছেন।

বিডন স্ট্রীট থেকে ট্রামে চড়ে সোজা ধর্মতলায় এসেছি। সেখান থেকে ওল্ড পোস্টাপিসের আদালতী পাড়ায়। লায়ন অ্যান্ড বড়াল এটর্নি অপিসে গণপতিবাবুর জন্যেও অপেক্ষা করেছি কিন্তু গণপতিবাবুও উধাও। বিষয়-সম্পত্তির কাজে তিনি কলকাতার বাইরে গিয়েছেন, কখন ফিরবেন কেউ জানে না।

ক্লান্ত দেহে থ্যাকারে ম্যানসনে উপস্থিত হয়েছি। ফেরার পথে বরুণা প্রপার্টিজ-এ মিস্টার ভরত সিং-এর খবর করেছি। কিন্তু তিনিও আর্জেণ্ট কাজে সেই ভোরবেলা থেকে উধাও কেউ তাঁর পাত্তা জানে না।

উদ্বেগভরা নিষ্ফলা দিনের শেষে বিছানায় আত্মসমর্পণ করেও শান্তি নেই। সীমার মুখখানা আবার মনের মুকুরে উঁকি মারছে। সুলেখা না সীমা? আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের শেষ সাক্ষাতের দৃশ্যটা চেষ্টা করেও বুক থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। সীমা কাতরভাবে বলছে, আপনি যাবেন না। আর আমি আবার আসবো বলে সদর লেনের গলি থেকে বেরিয়ে

আসছি।

হঠাৎ মনে হচ্ছে, অন্যায় করেছি আমি। সুলেখা যত অন্যায়ই করুক, সুখের লোভে পাপের যত গভীরেই সে প্রবেশ করুক, তার মুখের ওপর সত্য কথা বলে এলাম না কেন? কেন আমি মিথ্যা বললাম, "আবার আসবো।"

আবার আসবে? সীমার অস্পষ্ট ছবি যেন কোন্ সুদূর থেকে প্রশ্ন করছে। সীমা বিশ্বাস করে নিয়েছে আমি তাকে মিথ্যা বলছি না। আমার আবার আসার জন্যেই সে যেন সদর লেনের সিঁড়ির সামনে সময় গুনছে।

না, আর কোনো দুর্বলতা নয়—সুলেখার ভাবনায় সময়ের অপচয় করে কোনো লাভ হবে না আমার। সদর লেনের চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি নিজেকে নিদ্রার কোলে সমর্পণ করলাম।

ফাল্গুনের বিদায় বেলায় আজ আকাশে অপ্রত্যাশিত বাদলের ইঙ্গিত। পথহারা মেঘের দল কোনো দৈবদুর্বিপাকে সাতপুরুষের আশ্রয় হারিয়ে এই থ্যাকারে ম্যানসনের আকাশ জবরদখল করেছে। একটু পরেই বর্ষা শুরু হলো, সদর লেনের চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি নিজেকে নিদ্রার কোলে সমর্পণ করলাম।

আজ ভোরে আবার চন্দ্রোদয় ভবনে হাজিরা দিয়েছি। কিন্তু কোনো ফল হলো না। গেটের দারোয়ানজী জানালেন, আমি আসবার আগে আজও বিলাসিনী দেবী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। তিনি কোথায় যান, কী করেন, কী তাঁর পরিকল্পনা তা এ-বাড়ির কেউ জানে না।

দারোয়ানজীদের অভিজ্ঞ দৃষ্টি থেকে কিছুই বাদ যায় না। কথাবার্তায় জানলাম, ভরত সিং-এর মতো একটি লোক কদিন এখানে ঘন ঘন যাতায়াত করেছেন। তাঁরই সঙ্গে বিলাসিনী দেবী গতকালও চন্দ্রোদয় ভবন থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন।

আজও কী ভরত সিংজী সকালে এসেছিলেন? দারোয়ানজী মাথা নাড়লেন —আজ ভরত সিং নয়, অন্য কারুর সান্নিধ্যে বিলাসিনী দেবী বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছেন।

আমার হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রহস্যময় এই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? আমারও যে একবার বিলাসিনী দেবীর সঙ্গে সত্বর সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন। থ্যাকারে ম্যানসন আর এই পরিবারের মাথার ওপর বোঝা হয়ে থাকবে না। অনেক অর্থের সম্ভাবনা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে: বিখ্যাত কোম্পানির প্রপার্টি ম্যানেজার মিস্টার গৌরহরি ঘোষ গতকালও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

গম্ভীর মুখে আমি থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে এসেছি। দৈনন্দিন কাজ-কর্মের স্রোতে বাধা পড়ার কোনো ইঙ্গিত নেই। আমাদের আপিসঘরে, থ্যাকারে ম্যানসনের মেন গেটে, এবং ঘরে ঘরে জীবনধারা একইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই।

তেলকালিবাবু চুপিচুপি বললেন, "ঐ রামসিংহাসনটার ওপর একটু নজর রাখবেন, স্যার। ফাঁকা ঘরগুলো লুকিয়ে ভাড়া খাটিয়ে পয়সা রোজ-গারের জন্যে ওর ফণা লক-লক করছে। রিকশাওয়ালাদের পার্কিং ফি বাড়িয়েছে, তলার বাথরুমের রেট ডবল করেছে, এমন কি এ-বাড়ির ঝি-গুলোর কাছে চৌথ আদায় করছে। মাইনের সিকিভাগ রামসিংহাসনের

পকেটে জমা না দিলে এ-বাড়িতে কোনো ঠিকে-ঝি টি'কতে পারবে না। এই রামরাজত্ব আর সহ্য হয় না স্যার।"

এর একটা বিহিত প্রয়োজন। আগামীকাল আমি নিজেই কোনো একটা ব্যবস্থা নেবো। রামসিংহাসনের সিংহাসন এবার সত্যিই কম্পমান হবে।

কিন্তু পরবর্তী প্রভাত আমার জন্যে এক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ বয়ে আনলো। ভোরের আলো ফুটবার একটু পরেই পুলিসের সাব-ইনসপেক্টর গণেশ সরকার গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে থানায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

"সীমা অথবা সুলেখা বলে কাউকে চেনেন?" গণেশ সরকার শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

সীমাকে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে নিষ্ঠুরভাবে সদর লেনের মোড়ে হত্যা করে গিয়েছে।

গণেশ সরকার বললেন, "আন-আইডেণ্টিফায়েড উয়োম্যান বলে চালান হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ভ্যানিটিব্যাগে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেল।"

সীমার চিঠিঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ আপনার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। আমার মন বলছিল, আপনি নিশ্চয় আসবেন ; এ-সংসারে অন্তত একজন আছেন যিনি সীমাকে কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করবেন না।

আপনি এলেন না। ভয় হচ্ছে হয়তো আপনি আসবেন না, কিন্তু আপনাকে যে আমার কিছু বলার আছে। সেদিন আপনি কী ভাবলেন কে জানে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সুলেখার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি নতুন করে জীবন শুরু করবার জন্যে কলকাতায় ফিরে এসেছি। এখন একটা টেলারিং-এর দোকানে কাজ করি, আর দিনরাত শর্টহ্যান্ড শিখি—মেয়েদের মুক্তির ওই একটা পথই তো এখনও খোলা আছে। শর্টহ্যান্ড শেখা শেষ হলে আমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না। কিন্তু সুলেখাকে হরণ করবার জন্যে এই শহরে কত জন যে তৈরি হয়ে আছে। কোথাও এক সপ্তাহের বেশী টি'কতে পারি না। ঘুরতে ঘুরতে, পালাতে-পালাতে অবশেষে এই মিস্ ওয়াইপারের কাছে আশ্রয় নিয়েছি ; কিন্তু এখানেও ছায়া। বিশ্বাস করুন, যে-দৃশ্য দেখে আপনি সেদিন ঘৃণাভরে চলে গেলেন তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না আমার ; গাড়িটা খোঁজখবর নিয়ে হঠাৎ হাজির হয়েছিল। কিন্তু না বলতে গেলেও অপমানের বোঝা বইতে হয়।

আমার একটা আশ্রয় বিশেষ প্রয়োজন। নিরাপদ আশ্রয়—যেখানে সুলেখাকে শিকার করবার জন্যে কেউ ছুটে আসতে পারবে না। মাত্র কিছুদিনের জন্যে, তারপর আমি তো ভাল চাকরি পেয়ে যাবো—তখন আপনার এবং আমার কোনো চিন্তা থাকবে না। একবার কিন্তু আসা চাই, না হলে কেমন করে জানবো সীমা ক্ষমা পেলো কিনা?

প্রণাম রইলো। —ইতি সীমা"

নামের আগে একটা শব্দ লেখার পরে কাটা হয়েছে। একটু চেষ্টা করতেই তা পড়তে পারলাম 'তোমারই'—কিন্তু কী ভেবে সীমা সেটা রাখতে সাহস

পায়নি।

"সীমা! সীমা!" আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। সীমা, আমি কেন তোমাকে বুঝলাম না?

লাসকাটা ঘরে পুলিস-ডাক্তারের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত সীমার দেহের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমিই নিয়েছিলাম। রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে গণেশ সরকার দেশ থেকে খবর পেয়েছিলেন সীমার বাবা কয়েক মাস আগেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেই সীমা ফিরে এসেছিল কলকাতায়। বিশ্বসংসারে সীমার দেহের কোনো দাবিদার এখন নেই।

গণেশ সরকার বলেছিলেন, "কী আশ্চর্য এই শহর! জ্যান্ত মেয়েমানুষের দেহের কত দাবীদার, কিন্তু ডেডবডির জন্যে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। হ্যাঁ বললে অসহায় মেয়েদের নরকে ঠেলে দেবে, না বললেও খুন হবে।"

রাতের গভীরে সীমাকে আমি কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলাম। চিতা নিবলো শেষযামিনীতে। আমার জীবনের এক অধ্যায়কে ভস্মীভূত করে যখন ফিরলাম তখন ভোরবেলার সূর্য সবেমাত্র পূর্ব আকাশে তার রক্তিম আবির্ভাব ঘোষণা করছেন। থ্যাকারে ম্যানসন তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন, কেবল তেলকালিবাবু ও সহদেব আমার জন্যে সারা রাত জেগে বসে রয়েছেন।

ছাদের ওপর থেকে তেলকালিবাবু আপন মনে রক্তাক্ত পূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুহূর্তের জন্য তিনি আমাকে দেখে নিলেন। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে কান্না চেপে রেখে বললেন, "কী আশ্চর্য! বিশ্বপ্রকৃতির কোথাও শোকের চিহ্ন নেই। কাঁদবেন না স্যার, ঐ শুনুন পাখির গান শুরু হয়েছে, ভোরের হাওয়ায় গাছের পাতা নাচছে, ঈশ্বর আমাদের কাঁদতে বারণ করছেন।"

আমার কাঁধের তেলকালিবাবুর উষ্ণ হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। সহদেব হঠাৎ বলে উঠলো, "দিদিমণির ছাইটা এখানেই উড়িয়ে দিন, স্যার। এই ঠাকরে ম্যানসন থেকে দিদিমণি তো আলাদা নয়।"

সহদেব ঠিকই বলেছে। দিদিমণি তো এখানেই ফিরে আসতে চেয়েছিল। সীমা, জীবনে যে আশ্রয় তোমাকে আমি দিতে পারিনি মরণে সেই স্বীকৃতি-টুকু তুমি নাও। এ-বাড়ির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চিরদিনের মতো মিশে থাক তোমার দেহভস্ম। পরম স্নেহভরে, মহামূল্যবান ঐশ্বর্যের মতো ভস্মরাশিকে নিজের হাতে ছড়িয়ে দিলাম থ্যাকারে ম্যানসনের ছাদে। তেলকালিবাবু ততক্ষণ কান্না চাপবার জন্যে নিজের ঘরে ঢুকে গিয়েছেন ; সহদেবও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সাক্ষী রইলো নীল আকাশের নীরব সূর্য। মুখ ফেরাতে গিয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো কুশণ্ডিকার শেষে সীমার সিঁদুর-রাঙানো সীমান্তরেখার মতোই পূবের আকাশ সিঁদুরে সিঁদুরে রাঙন হয়ে উঠেছে।

হে ঈশ্বর, হে সর্ব সুখ ও দুঃখের ভাণ্ডারী, আর কতদিন? হে ভৈরব, ভক্তপানে চাহ।

কিন্তু আমার পরীক্ষার এখনও শেষ হয়নি। নিদ্রাবিহীন শ্মশানে প্রহরার শেষেও আজ আমার মুক্তি নেই। উদ্বিগ্ন মুখে তেলকালিবাবু আমার ঘরে ঢুকলেন।

"ক্ষমা করবেন, স্যার। কিন্তু খবরটা আপনাকে দেওয়া প্রয়োজন", তেল-কালিবাবু নিজেকে দোষী মনে করছেন।

"কত জন্মের পুণ্য করলে তবে আপনার মতো মানুষের ভালবাসা পাওয়া

যায়, তেলকালিবাবু। আমাকেই আপনি ক্ষমা করবেন, কাজের চাপে আপনার ওপর কত অবিচার করেছি আমি।"

তেলকালিবাবু বেশ বিব্রত বোধ করলেন আমার কথায়। "সেই যেদিন এমনি ভোরবেলায় মর্নিং-ওয়াক থেকে ফিরবার পথে আপনাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনের গেটের সামনে প্রথম দেখলাম, সেদিনই তো আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। আমার ছেলেটা, মাই এলডেস্ট সন বেঁচে থাকলে তো ঠিক আপনার বয়সীই হতো।"

কান্না সামলে নিলেন তেলকালিবাবু। বললেন, "খবরগুলো দিয়ে দিই। মিস্টার ভরত সিং ডিফিটেড। বিলাসিনী দেবী ওঁকে বাড়ি বিক্রি করলেন না।"

"অনেক দুঃখের মধ্যে একটা ভাল খবর।"

"ভাল কই?" তেলকালিবাবুর মুখ এবার অন্ধকার হয়ে এলো। "আরও খারাপ খবর। শুনলাম, ভরত সিং যখন সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে যাচ্ছে তখন এক ভদ্রলোক বিলাসিনী দেবীকে জানিয়ে দিলেন, এই ভরত সিংই পমা ও বিপুল বারিককে ভাবনানি ম্যানসনে স্পেশাল ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ওখানেই বিপুল বারিক রেগুলার গোপনে যাতায়াত করতেন।"

"ধর্মের কল তাহলে এখনও বাতাসে নড়ে", আমি নিজের মনোভাব চাপতে পারলাম না।

কিন্তু তেলকালিবাবু মোটেই উৎফুল্ল হলেন না। বললেন, "বড় ডিফিকাল্ট স্টেটমেন্ট, স্যার। অধর্মের হাওয়াতেই তো ধর্মের কলকে সারাক্ষণ নড়তে দেখলাম। বিলাসিনী দেবীকে গোপন খবরটা দিয়েছিলেন মিস্টার জেঠমালানি। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে, শুনছি মিস্টার জগদীশ জেঠমালানিই শেষ পর্যন্ত এই থ্যাকারে ম্যানসন কিনে নিচ্ছেন।"

নিচ্ছেন না, নিয়েছেন। একটু পরেই চন্দ্রোদয় ভবন থেকে ফোন এলো, মিস্টার জগদীশ জেঠমালানির নির্দেশ যেন আমি মান্য করি।

ফোন নামিয়ে আমি আপিসঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ইচ্ছা, একবার সদর লেনের সেই অন্ধকার গলিতে সীমার শেষ আশ্রয়টুকু আর একবার দেখে আসবো। কিন্তু আপিসের দরজার কাছেই বাধা পড়লো। একটা পিওন-বুক্ হাতে স্বয়ং রামসিংহাসন চৌরাশিয়া আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পিওন-বুকেতে সই লাগাবার পরে রামসিংহাসন একটা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

নিজের কোম্পানির প্যাডে চিঠি লিখেছেন স্বয়ং জগদীশ জেঠমালানি। তিনি আমার অতীত কাজকর্মের জন্য প্রশংসা করে জানিয়েছেন যে থ্যাকারে ম্যানসনে আমার চাকরি শেষ হলো—উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট। মিস্টার রামসিংহাসন চৌরাশিয়া থ্যাকারে ম্যানসনের ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট।

আরও কয়েকদিন থ্যাকারে ম্যানসনে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন রামসিংহাসন চৌরাশিয়া। কিন্তু আমার ভাগ্যের দেবতা যখন সব শাস্তিই উইথ ইমিডিয়েট দিয়েছেন, তখন এখানেই বা বিলম্ব কেন?

যে ছোট্ট সুটকেসটা হাতে করে অনেকদিন আগে এই অজ্ঞাত পল্লীতে জীবিকার সন্ধানে উপস্থিত হয়েছিলাম সেই সুটকেস এবং পাপি বিশোয়াসের

উপহার দেওয়া ব্যাগটা রিকশার ওপরে তুলে শেষবারের মতো আমি সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না আশা-নিরাশা ভরা আশ্চর্য বাড়িটার দিকে পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। নগর সভ্যতার এক আশ্চর্য অধ্যায়কে আমি এই ঘরের মধ্যে ঘরে আবিষ্কার করেছি। আমার অস্তিত্বের এক অংশকে এই রহস্য-পুরীর মধ্যে চিরদিনের মতো বন্দী রেখে, আমি আবার পথে বেরিয়ে পড়েছি।

রিকশাওয়ালা আমাকে আর সময় দিলো না। গাড়িটা সচল হয়ে উঠলো। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার চোখ দুটো হঠাৎ সজল হয়ে উঠলো। সদর স্ট্রীটে রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনে গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়ে পরিচিত রিকশাওয়ালা একবার আমার দিকে তাকালো। আমি কার জন্য কাঁদছি, সীমা না থ্যাকারে ম্যানসন, তা অশিক্ষিত রিকশাওয়ালা বুঝতে পারলো না, সদর স্ট্রীটের ভিড় সরিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্যে সে ঠুং ঠুং আওয়াজ করতে লাগলো।